প্রকাশক ঃ সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বংকিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৫৫

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

লেখকের কথা

বেশ কয়েকবার কলকাতায় গিয়ে থাকার সুবাদে অসাধারণ কিছু মানুষের সংগে আমার পরিচয় ঘটার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের কাছ থেকে এত পেয়েছি, আমার জীবনে তাদের প্রভাব এত বেশি যে আমি স্থির করে ফেললাম, বিশ্বের এক অত্যাশ্চর্য প্রান্ত আনন্দ নগরের মানুষজনের জীবনের গল্প আমাকে শোনাতেই হবে।

এই গল্পে নারী আছে, পুরুষ আছে, শিশু আছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এরা সকলেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে এমন এক শহরে, যার আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা কল্পনাতীত। অবিশ্বাস্যরকম জটিল বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও মানুষ কী ভাবে বাঁচতে শেখে, সহমর্মীতা ও ভালবাসার প্রেরণা পায়, এই কাহিনীতে সে কথাই বলতে চেষ্টা করেছি।

'দি সিটি অফ জয়' লেখার আগে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমি তিন বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছি। বহু লোকের ব্যক্তিগত ডায়েরি এবং চিঠিপত্র আমাকে দেখতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলা, হিন্দি ও উর্দু দোভাষীর সাহায্য নিয়ে আমি দু'শ'রও বেশি লোককে 'ইন্টারভিউ' করেছি। বইয়ের যাবতীয় সংলাপ ও বিবৃতির ভিত্তি হল এইসব সাক্ষাৎকার।

কাহিনীর কুশীলবরা প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছেন। কাজেই কিছু কিছু চরিত্র এবং ঘটনাকে আমি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এখানে পাল্টে দিয়েছি। তাহলেও যে কাহিনী বর্ণনা করেছি তা পুরোপুরি বাস্তবানুগ।

ব্যাপক গবেষণার ফল হলেও এই বইতে ভারতবর্ষের সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছি, এ কথা কখনোই বলব না। ভারতের প্রতি আমার ভালবাসা গভীর। ভারতবাসীর বুদ্ধিমত্তা, কৃতিত্ব এবং প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠার অধ্যবসায় আমাকে মুগ্ধ করে। এই দেশের মহত্ত্ব, গরিমা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমি বিশেষ-ভাবে অবহিত। সুতরাং পাঠক যেন মনে না করেন, সমগ্র ভারতীয় সত্তাই কাহিনীর এই সীমিত পরিসরে প্রতিবিম্বিত। বরং এই বই গোটা দেশের এক ক্ষুদ্র অংশ কলকাতার ক্ষুদ্রতর প্রান্ত আনন্দ নগরেরই প্রতিচ্ছবি।

দোমিনিক লাপিয়ের

আনন্দ
নগর

প্রথম অধ্যায়

তুমিই জগতের জ্যোতি

এক

মানুষটার- চেহারা মোগল যোদ্ধাদের মতন। তার মাথায় এক ঝাঁক শক্ত ঘন কোঁচকান চুল ; গালের পাশ দিয়ে নেমে এসে মোটা জুলপি নোয়ানো পুরু গোঁফের সংগে মিশেছে। বলিষ্ঠ খাট চেহারার এই মানুষটার লম্বা লম্বা হাত দুটো পেশী-বহুল আর ধনুকের মতন বাঁকান দুটো পা। তবে দেখতে যেমনই হ'ক না কেন, বত্রিশ বছর বয়সের হাসারি পাল নেহাতই একজন নিরীহ চাষী। পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসীর একজন, জীবনধারণের জন্যে যাদের মাতা ধরিত্রীর কাছে কৃপা-করুণা চাইতে হয়।

খড়ের ছাউনি আর মাটির দেয়াল লেপে হাসারি তার দু'ঘরের কুঁড়ে বানিয়েছে বাঁকুলি গ্রামের প্রান্তে! ভারতের উত্তর-পূর্বের এক অংগরাজ্য হলো এই পশ্চিমবংগ। মাপে স্কট্ল্যান্ডের চেয়ে বড় এই পশ্চিমবংগের জনসংখ্যা বৃহত্তর লন্ডনের জন-সংখ্যার পাঁচগুণ বেশি। বাঁকুলি এই পশ্চিমবংগেরই এক ছোট্ট গ্রাম এবং হাসারির দু'ঘরের কুঁড়ে এখানেই অবস্থিত। হাসারির বউয়ের নাম অলকা। অলকা যুবতী এবং ফর্সা। তার চোখ দুটি ভারি পবিত্র। যখন তাকায় মনে হয় যেন দেবদূতের দৃষ্টি। তার নাকে আছে সোনার নথ ; আর পায়ে মল। যখন সে হেঁটে যায়, তখন ঝমঝম শব্দ হয়। তিন সন্তানের মা অলকার বড়টি মেয়ে, নাম অমৃতা। তার বয়স বছর বারো। বাপের বাদামি চোখ আর মায়ের গায়ের রঙ পেয়েছে সে। পরের দুটি ছেলে, নাম মনোজ আর শম্ভু। মনোজের বয়স দশ বছর আর শম্ভুর দু'বছর। ছেলে দুটির গড়ন-পেটন বেশ বলিষ্ঠ। মাথায় ঘন কালো চুলের রাশি এলোমেলো হয়ে আছে অযত্নে। ছেলে দুটি ভারি ছটফটে। গিরগিটি দেখলে তার পিছনে দৌড়বে পুকুরের পাড় দিয়ে। এতেই ওদের যত মজা। তাই মোষ চরানোর চেয়ে এই কাজটিই তাদের ভাল লাগে। হাসারির বাপও থাকে পরিবারের সংগে একজন হয়ে। তার নাম প্রদীপ। রোগা চেহারার প্রদীপের বলিরেখাবহুল শীর্ণ মুখখানায় শোভা পাচ্ছে শ্বেতগুচ্ছের মতন একজোড়া পাকা গোঁফ। হাসারির মা নলিনীর কোমরভাঙা শরীরটা নোয়ানো। মার মুখখানা আখরোট ফলের মতন দাগকাটা। হাসারির পরিবারে আরও মানুষ আছে। দুই ভাই, তাদের বউ ছেলেমেয়ে—সব মিলিয়ে মোট ষোলজনের পরিবার হাসারির।

মাথা নিচু দরজা দিয়ে কুঁড়েতে ঢুকলে তাপদগ্ধ গ্রীষ্মেও একটা ঠাণ্ডা আমেজ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি কনকনে শীতের রাতে কুঁড়ের ভেতরটা থাকে বেশ আরাম-দায়ক গরম। ঘরের কোলে টানা বারান্দা। লালসাদা বোগনভিলা ফুলের ঝাড় দিয়ে বারান্দাটা ছাওয়া। সেই ছায়ায় বসে অলকা কাঠের ঢেঁকিতে পা দিচ্ছিল। ঢেঁকির মুখে একটা কাঠের মুষল, অলকার পায়ের চাপে মুষলটা উঠছে নামছে আর শব্দ হচ্ছে টিকটাক। পাশে বসে আছে অমৃতা। মুঠো ভর্তি ধান সে ঢেলে দিচ্ছে মুষল-টার তলায়। খোসা ছাঁটাই হবার পর ধান থেকে চালগুলি বেরিয়ে আসছে। একটা ধামায় ভর্তি করে অমৃতার ঠাকুমা সেগুলি ঢেলে দিয়ে আসছে উঠোনের মাঝখানে বাঁশের ঠেকা দিয়ে তৈরি গোলাঘরে। এই গোলাঘরটাই হলো এই পরিবারের সম্বৎ-সরের আশ্রয়। এটি আবার পায়রাদেরও থাকার জায়গা।

ওদের কুঁড়ের চারপাশে যতদূরে দৃষ্টি যায় শুধু ধানের ক্ষেত। সোনা রঙের এই ধানক্ষেতের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে বৈচিত্র্যের মতন কতকগুলো রঙের ফোঁটা। কোথাও ঘনসবুজ আম বাগান, কোথাও ফিকে রঙের তাল-তমালরাজী আবার কোথাও বা বাঁশের ঝাড়। চতুর্ভুজাকার ধানক্ষেতগুলি সেচনালার আঁটসাট বাঁধনে যেন সেলাই করা। নালার জলে প্রতিফলিত হয়ে আকাশের নীলিমা ঝলমলে জরির মতন দেখায়। পুকুর আর ডোবার ওপর ঝোলে সরু বাঁশের সাঁকো। পুকুরের জলে ফুটে থাকে পদ্ম আর শালুক। জলের বুকে রেখা টেনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় হাঁসের দল। হাতে পাঁচন-বাড়ি নিয়ে আলের উপর দিয়ে মহিষের দল তাড়িয়ে নিয়ে যায় রাখাল বালকেরা। ওরা চলে যাবার পর রাঙামাটির ধুলো ওড়ে ওদের পিছনে। এক-সময় শেষ হয় এই শ্বাসরোধকারী উত্তপ্ত দিন। রক্তবর্ণ গোলাকার চাকার মতন মার্তণ্ডদেব পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েন। তখন দক্ষিণ-সমুদ্রের বুক থেকে ভেসে আসা বাতাস সোহাগস্পর্শ দিয়ে সকলের তাপিত দেহ জুড়িয়ে দেয়। উদার এবং সীমাহীন বিস্তৃত ক্ষেতভূমির উপর দিয়ে ভেসে আসে অগণিত পাখিদের কল-কাকলি। উড়তে উড়তে ওরা নীচু হয়ে নেমে আসে প্রায় ধানক্ষেতের বুকের কাছা-কাছি এবং আসন্ন রাত্রিকে আহ্বান জানায়। বাঙলাদেশ গান ও গীতিকাব্যের দেশ। জ্যোৎস্না রাতে রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমগীতি বাঁশির সুরের দোলায় ভাবৈশ্বর্য ছড়ায়। তখন পরম প্রেমময়ী শ্রীরাধা গোপিনী সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের নৃত্যসঙ্গিনী হন এবং মহাভাব বিকশিত করেন।

সূর্য অদৃশ্য হবার পর গোধূলিক্ষণ আসে। গোধূলি অর্থাৎ গাভীরা যখন ক্ষেত থেকে রাতের আশ্রয়ের জন্যে গোয়ালে ফেরে। হাসারিও এদের সঙ্গে হাল কাঁধে নিয়ে ফেরে। হাঁটার সুবিধের জন্যে তার পরনের কাপড়খানা হাঁটুর ওপর টেনে তোলা। হাসারি ঘরে ফেরে শিস দিতে দিতে খুশীর মেজাজে। সন্ধ্যা যত আসন্ন হয় ততই মাথার ওপর কপোতকুলের ঘূর্ণিচক্র বাড়তে থাকে। তেঁতুল গাছের মাথায় ঘরে ফেরা চড়ুই পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ যেন বধির করা ঐকতান শুরু করে দেয় তখন। গায়ে শ্রীরামচন্দ্রের তিন আঙুলের ছাপ নিয়ে দুটো কাঠবিড়াল গাছের গায়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। বকেরা ব্যস্ত হয় দ্রুত বাসায় ফিরতে। রাস্তার নেড়ি কুকুরটা মাটি শুঁকে শুঁকে খুঁজে বেড়ায় একটা উপযুক্ত থাকার জায়গা। তারপর ক্রমশ পাখিদের কলকাকলি থেমে যায়। ক্ষীণ হয়ে আসে ঢেঁকির টিকটাক শব্দ। পৃথিবীর বুকে নেমে আসে নিরবচ্ছিন্ন নিশীথিনীর নৈঃশব্দ। কিন্তু এই নৈঃশব্দ স্থায়ী হয় না। ঝিঁঝির ছন্দোময় ঐকতানে ভেঙে যায় রাতের নৈঃশব্দ।

গরম দেশে সূর্যাস্তের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অন্ধকার নেমে আসে। সূর্যাস্তের আগে একদণ্ড এবং পরে একদণ্ড, এই দুই দণ্ডের মিলন সময় হলো সায়ংসন্ধ্যাকাল। প্রতিদিনের মতন সেদিনও ঠিক এই সময়ে হাসারির বউ অলকা সায়ংসন্ধ্যাকাল পালন করছিল। শাঁখ বাজিয়ে রাত্রিকে সে আবাহন করলো। তার এক মনদ প্রদীপ জেলে বাস্তু থেকে অপচ্ছায়া বিতাড়ন করলো। তাদের ধারণা যে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একশ' বছরের বিশাল বটগাছতলাটি প্রেতপিশাচ মুক্ত হয় এই সন্ধ্যা-বিধি পালনের দ্বারা। সন্ধ্যাবিধি পালন শেষ হবার পর শুরু হলো গাভীচর্চা। গাভীটিকে গোয়ালে বাঁধা হলো বটে, কিন্তু অবাধ্য ছাগলটা বাগ মানতে চাইছিল না। সবাইকে সে এদিক ওদিক ছোটাচ্ছিল। অবশেষে তাকেও খোঁটায় বেঁধে উঠনের কাঁটা-তারের বেড়াটা টেনে বন্ধ করে দিল হাসারি। হাসারি জানে যে গোয়ালের সুরক্ষা না

হ্লে শেয়ালের পেটে যাবে সবাই। সন্ধ্যাবিধির পরে আছে ধর্মানুষ্ঠান রীতি। ভারতবর্ষের প্রায় সব হিন্দুর সংসারেই পারিবারিক আরাধ্য দেবদেবী আছেন। এঁরাই সেই সংসারের অভিভাবক। ভালমন্দ যাই হ'ক, এঁরাই যেন তার দায় নেন। ভারতবর্ষ যেমন প্রাচীন দেশ তেমনি প্রাচীন এই ধর্মীয় রীতি। সংসারের যিনি কর্ত্রী তিনিই এই রীতি পালন করেন। তাই হাসারির মা আলোর নৈবেদ্য দিয়ে ঠাকুরদেবতার মুখ দেখলেন। এঁরা হলেন রাম এবং সীতা, যিনি মর্ত্যে ফলোপধায়ী দেবী বলে পূজিতা। আর আছেন পদ্মাসনা লক্ষ্মী আর গজমুখ গণেশ। লক্ষ্মী হলেন ঐশ্বর্যের এবং গণেশ সৌভাগ্যের দেবদেবী। হাসারির মা'র ঠাকুরঘরে আরও দুজন দেবতার পট আছে। পট দুটি পুরনো, মলিন। এদের একজন হলেন ননীচোরা গোপাল। নন্দদুলালের এই ভঙ্গিটি হিন্দুঘরে খুব আরাধ্য। অন্যজন হলেন হিন্দু পুরাণের কিংবদন্তির নায়ক বানর দেবতা হনুমান।

সব শেষ হলে মেয়েরা যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, হাসারি তখন দুইভাইকে নিয়ে বাপের কাছে এসে বসলো। যুঁই ফুলের মদির গন্ধ বাতাস ভারি করে তুলেছে। অন্ধকার রাতকে বিদ্ধ করছে জোনাকির আলো। তারাভরা আকাশের মধ্যে ম্লান হয়ে আছে একফালি চাঁদের জোছনা। প্রতিপদের চাঁদ। শিব, যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনিও মস্তকে চন্দ্রকে ধারণ করেন, তিনি ত্রিনেত্র এবং মঙ্গলময় ; তিনিই জগতের ত্রাণকর্তা এবং দারিদ্র্যদুঃখদহনকারী। সেই শিবকে নমস্কার করলো ওরা। ওরা চারজনেই সেদিন গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল। হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে বুড়ো প্রদীপ স্বগতোক্তি করে বলে উঠলো, 'কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না। যার প্রতিকার নাই তার জ্বালা সইতেই হবে।'

হাসারির বাপ মনে করতে পারে না পুকুরের এই পদ্মগুলো ঠিক কত যুগ ধরে এইভাবে ফুটছে আর শুকিয়ে যাচ্ছে। তার জন্ম থেকে কত পদ্মই ত ফুটলো আর ঝরে গেল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বুড়ো বললো, 'আমার আর পুরনো কথা কিছু মনে পড়ে না। সব হারিয়ে গ্যাচে কর্পূরের মতন। কত কথা বেমালুম ভুলে গেছি। অনেক বয়েস ত হলো। এবার যেতে পারলেই হয়। কে জানে আর ক চুপড়ি চাল মাপা আচে আমার!' তবে একথা ঠিক যে বুড়ো প্রদীপ জানতো যে এতদিন তারা বেশ সম্পন্ন চাষী ছিল। ছ'টা ধানের মরাই ছিল তাদের। আর ছিল আট একর উর্বর জমি। ছেলেদের ভবিষ্যতের সংস্থান করে দিয়েছিল প্রদীপ। মেয়েদের ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছিল উপযুক্ত পণ দিয়ে। বুড়োবুড়ির শেষ দিন ক'টা যাতে শান্তিতে কাটে তারও সংস্থান করেছিল। একটুকরো জমি আর পৈত্রিক এই ভদ্রাসনটা দেখিয়ে বুড়িকে বলেছিল, 'যদ্দিন না যমে নিচ্ছে তদ্দিন আমরা বুড়োবুড়ি এখানে বেশ কাটাতে পারবো। কি বলো?'

কিন্তু বুড়ো প্রদীপের কামনার মাপটা একটু বড় হয়ে গিয়েছিল। একখণ্ড এই জমিটা তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া। তখনকার জমিদার খুশী হয়ে দান করে গিয়েছিল অনুগত প্রদীপের বাপকে। সে আজ কতদিনের কথা। তারপর কত ঘটনা ঘটেছে। আগের সেই জমিদার মরেছে। মরেছে প্রদীপের বাপ। হঠাৎ একদিন নতুন জমিদারের পেয়াদা এসে জানিয়ে গেল, জমিটা যেন ফেরতের ব্যবস্থা করে প্রদীপ। কোনো দানপত্র লিখে যায়নি জমিদার। নেই কোনো সাক্ষীসাবুদ। তবুও প্রদীপ হাতছাড়া করলো না জমিটা। নতুন জমিদার আদালতে নালিশ করলো। তারপর এক-

দিন কোর্ট থেকে পেয়াদা এল। কোর্টের নির্দেশ মত জমি ও বসতবাটী দুটোই বাজেয়াপ্ত করলো নতুন জমিদার। মানুষ ও নয় একটা পাষণ্ড নতুন জমিদারটা। মকদ্দমার খরচ তুলতে প্রদীপকে শেষমেশ ছোট্ট মেয়ের বিয়ের প'ণের টাকাটাও খায় করতে হয়েছিল। এমনকি ছোট ছেলেদুটোর জন্যে রাখা দুটুকরো বাস্তু জমিও নষ্ট করে ফেলেছিল সে। মানুষটার সারা জীবনের আক্ষেপ তাই নিয়ে। নতুন জমিদারটা মানুষ নয়, পাষণ্ড। ওর হৃদয়টা মানুষের নয়। 'নির্দয় শেয়ালের রিদয় ওর।' প্রায়ই সে কথা বলতো প্রদীপ।

তবে বুড়োর বড় ভাগ্যির জোর তাই হাসারির মতন এমন সুসন্তান পেয়েছিল ও। হাসারি পাল হলো প্রদীপের বড় ছেলে। সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছে হাসারি। পরিবারটাকে একটা ছাতের তলায় নিয়ে এসেছে সে। শুধু তাই নয়, বাপের মনে কোনো অভিমানের আঁচ উঠতে দেয় নি। প্রদীপই যে এখনো পরিবারের কর্তা, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল সংসারের সবাইকে এবং প্রদীপকেও। তবে বুড়ো প্রদীপ কর্তা সেজে বসে নি। সে সংসার চেনে। কার কি পাওনাগণ্ডা, কতটা কার দায় আর দাবি, তা সে জানতো। শুধু নিজের সংসার নয়। গ্রামের মধ্যেও সে এই সম্পর্কটা বজায় রেখেছিল। সে জানতো সাধারণ চাষীকে বেঁচেবর্তে থাকতে হলে মহাজনদের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলে চলবে না। এই ঘনিষ্ঠতাটাই তার তুরুপের তাস। 'জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে না'; এই আপ্তবাক্যটি সে মেনে চলতো এবং ছেলেদেরও বুঝিয়েছিল সেটি। তাই ছেলেমেয়েদের চোখে মানুষটা কখনও অশ্রদ্ধেয় হয় নি। তবুও মানুষটা যেন কার ইঙ্গিতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। মাথার ওপর নিজস্ব একখানা চালও থাকলো না তার শেষমেশ।

তাহলেও হেরে যাওয়া মানুষটার গর্বের একটাই জায়গা ছিল। সেটা তার তিনটি সুসন্তান। বলতোও সে কথা বুড়ো প্রদীপ। 'আমি হেরে গেলেও আমার তিনটি সুসন্তান আচে গো। আমার কত বড় ভাগ্যি যে এমন তিনটি সন্তান পেয়েচি!' তা সে কথা বলার কারণ ছিল প্রদীপের। বাংলাদেশের একজন গরিব চাষী পরিবার তার। সে তুলনায় তার পাওনাগণ্ডা অনেক বেশি। চাষীর ঘরে যা থাকে তার ঢের বেশি সম্পদ আছে তার ঘরে। ছোট্ট একটা গোলা আছে। আছে খড়ের পর্যাপ্ত মজুত, দুটো গাই, একটা মোষ, একটুকরো জমি আর সম্বৎসরের ধান। কিছু জমানো টাকাও আছে তার কাছে। লক্ষ্মীপ্রতিমার মতন তিনটে ব্যাটাবউ। আহা! যেমন রূপ তেমনি গুণ তাদের। তাই সুখও তার ঘরভরা। প্রদীপ স্বপ্ন দেখতো পঞ্চপাণ্ডবের মা হবে এই ব্যাটাবউরা। তখন সবাই বলবে পালেদের ঘরে ঐশ্বর্য না থাক, সুখ আছে, আছে আনন্দ। সেদিন আসছে যেদিন পদ্মগুলি শিশির ভেজা হবে। আসবে ফসল তোলার কাল ; তখন বুকভরা আশা আর মাঠভরা কাজ নিয়ে, ফুলে ফুলে ঈশ্বরের জয়গান গাওয়া হবে। সেই ত্বরার কাল এল বলে।

দুই

কিন্তু প্রদীপ পাল আর তার পরিবারের ভাগ্যে জমা ছিল এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটের কাল, যখন দারুণ এক পরীক্ষার মুখোমুখি হলো তারা। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের সেই ব্যাপক নিষ্ঠুর অবিস্মরণীয় সমাজব্যাধি, অর্থনীতিবিদরা আধুনিক

পরিভাষা দিয়ে যার ব্যাখ্যা করেছেন অনিবার্য দারিদ্র্যচক্র. সেই বিষাক্ত তিক্ত কাল-চক্রের বলি হলো বাংলাদেশের এককোটি চাষী পরিবারের সংগে প্রদীপ পালের পরিবারও। যার ফলে সমাজ কাঠামোর ধাপগুলি বেয়ে তরতর করে নেবে এল লক্ষ লক্ষ মানুষ। চাষী হলো ভাগচাষী, ভূমিহীন চাষী, পরে জনমজুর। সবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে সমাজচক্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং হারিয়ে গেল। এই অনি-বার্য ক্রমাবনতি ঠেকিয়ে রাখা যায় না, উল্টো গতি দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠাও যায় না। এই দুর্বার স্রোতের মুখে মানুষ কেবল তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে, তাকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ, এক দারিদ্র্য ডেকে আনে আরো নির্মম আর এক দারিদ্র্য। যত রঙিন ঝলমলে করে আঁকা হ'ক না কেন, দারিদ্র্যের পোশাকটি বদলায় না, তা দারিদ্র্যই থাকে, অন্য কিছু হয় না। যেমন জল দিয়ে ধুলেও কয়লার ময়লা রঙ বদলায় না. তেমনি বদলায় না দারিদ্র্যের চেহারা।

জমিদারের সংগে মামলা লড়তে গিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ পাল। যা হক, আদালত থেকে মাত্র আধ একর ধেনো জমি তার নামে জোটে। এই জমি থেকে যে ধান পাওয়া যেত, তা দিয়ে পালেদের পরিবারের দরকারটা সিকিভাগও মিটতো না। প্রদীপ আর তার ছেলেদের পরেব জমিতে ভাগচাষ কবে ঘাটতি মেটাতে হতো। মালিকরা নিত তিনভাগ আর প্রদীপরা পেত বাকি ভাগটার আধাআধি। ফলে ভাতের অভাব থেকেই গিয়েছিল ওর সংসারে। তখন ওরা ফলমূল আর শাক-সবজি খেয়ে দিন কাটাতো। এইভাবে বছর দুয়েক কোনবকমে টিকে ছিল ওরা। সেই সময় নাগাদ দুটো ছাগলও কিনেছিল ওরা। শুধু তাই নয়. বুড়ো বটগাছটার নিচে যে মন্দির আছে সেখানে নিয়ম করে পুজোটাও দিতে যেত তারা।

কিন্তু তৃতীয় বছবে বিপদের ধাক্কাটা আর যেন সামলাতে পারলো না বুড়ো প্রদীপ আর ছেলেরা। বছবের মাঝামাঝি নাগাদ তাদের জমিব পুরো ফলনটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল পরগাছার উৎপাতে। তখন একটাই পথ জানা ছিল প্রদীপের। গ্রামের একমাত্র পাকা বাড়ির মালিকের কাছে সে গেল। ইঁটের দেয়াল আর টালির ছাউনির একখানাই বাডি ছিল গ্রামে আর সব বাড়ির মাথা ছাড়িযে উঠেছিল এব টালির ছাত।

তবে প্রদীপ একা নয়। একে একে গ্রামেব প্রায সবাইকেই যেতে হলো গ্রমেব মহাজনেব কাছে। বন্ধকী গয়নার কারবার করে পেটমোটা লোকটা রীতিমত টাকা-ওলা মানুষ হয়েছে। সুদখোর এই মহাজনটাকে মনে মনে অপছন্দ করলেও, এর কাছে গরিব গ্রামবাসীদের আসতেই হয। তাব চকচকে টাক বিলিয়ার্ড বলের মতন মসৃণ এবং সেই-ই হলো গ্রামের আসল মানুষ। সারা দেশটা জুড়েই ছড়িয়ে আছে এরা আর সর্বত্রই আসল মানুষ হয়ে আছে এই রক্তশোষক বাদুড়েরা। সুতরাং এই মানুষটার সাহায্য নিতেই হলো প্রদীপকে। পুরো জমিটা বন্ধক দিযে যে ক'মণ ধান সে পেল তার দেড়গুণ তাকে ফেরত দিতে হলো প্রথম ফসল কাটার পরেই। বছরটা সত্যিই বঞ্চনার বছর ছিল প্রদীপ পালের কাছে। একদিকে যেমন ধারকর্জ, অন্যদিকে তেমনি অর্থাভাব। ঘরে মজুত খাবার যেমন নেই, তেমনি খাদ্য কেনার পয়সাও নেই। সে যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। প্রদীপের এক ছেলে দিন মজুরি ধরলো। অন্তত দুটো নগদ পয়সার মুখ দেখতে পারবে এই ভরসায়। ততদিনে অভাবের চাকাটা প্রদীপের গলার ওপর চেপে বসেছে যেন। এরই মধ্যে একটা ঘটনায় এই দুরবস্থাটা আরও সংগিন হয়ে উঠলো। বৈশাখের গোড়াতেই ঝড়বাদলের এক তাণ্ডব খাম-

গাছালির খ‍ুটি ধরে ফেলে দিল মাটিতে। নষ্ট হলো অনেক কাঁচা আম আর খারকেলা। ষোষ আর গাভী দ‍ুটোও বেচে দিল ওরা। গাই দ‍ুটো সংসারের অনেকখানি জ‍ুড়ে ছিল। বিশেষ রানী গাইটা। কিছ‍ুতেই যেতে চাইছিল না। গলার রশি টেনে রেখে-ছিল আর তার বোবা চোখ দিয়ে যেন মিনতি ঝরে পড়ছিল। শেষমেশ ডাক ছেড়ে চেঁচাতে শ‍ুর‍ু করলো গাইটা। সবাই তখন থমকে গেছে তার রাগ দেখে। সবাই ভাব-ছিল, হয়ত এটা কোনো খারাপ লক্ষণ, নাকি রাধা কুপিতা হলেন?

গাই দ‍ুটো বেচার পর ঘরে আর কেউ দ‍ুধ পেত না। গোবরও জ‍ুটতো না ওদের। গ্রামের গরিব সংসারে গোবর এক অপরিহার্য বস্তু। এর সংগে কাটা খড় মিশিয়ে সব সংসারেই ঘ‍ুটে বানানো হয়। সাশ্রয় হয় সংসারের। তাই প্রদীপের নাতিরা আশপাশ থেকে গোবর কুড়িয়ে আনা শ‍ুর‍ু করলো। কিন্তু ক্রমে এমন হলো যে ওদের দেখলেই পাড়া-পড়শিরা তাড়া করতো। তখন ওরা চ‍ুরি করা শিখলো। শ‍ুধ‍ু গোবর নয়; আরও অনেক কিছ‍ু চ‍ুরি করা শিখলো ওরা। বাগানের ফল-ফ‍ুল‍ুরি, প‍ুকুরের মাছ, ব‍ুনো ফ‍ুল—যা পেত মাইল সাতেক দ‍ুরের হাটে গিয়ে বেচতো। এইভাবে উঞ্ছব‍ৃত্তি করে ওরা রোজগারের ধান্দায় ঘ‍ুরে বেড়াত।

টাকাপয়সার অভাবটা দ‍ুটো ঘটনায় আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো একসময়। হাসারির ছোট ভাইটার কঠিন ব্যারাম হলো। একদিন কাশতে কাশতে রক্ত বমি করলো সে। গরিবের সংসারে অস‍ুস্থ হয়ে পড়াটা যেন একটা অভিশাপ। এর চেয়ে মরা ভাল। কিন্তু মরা ত হাতের পাঁচ নয়। হাসারির তখন মরিয়া অবস্থা। সম্বল শ‍ুধ‍ু মাটির ভাঁড়ের সঞ্চয়। স‍ুতরাং সেটি ভেঙে জমানো প‍ুঁজি নিয়ে সে ছ‍ুটলো গ্রামের পণ্ডিতের বাড়ি। ডাক্তার, বদ্যি বা ওষ‍ুধ-পথ্য নয়। এখন দরকার ঠাকুরের কাছে মানত, একটি বিশেষ প‍ুজা। এই অধিকার আছে শ‍ুধ‍ু গ্রামের প‍ুরোহিতের। একমাত্র তিনিই পারেন অনিবার্য নিয়তি রোধ করতে।

কিন্তু পরের ঘটনার ঝাপটায় আরও গভীর দারিদ্র্যের পাঁকে ড‍ুবে গেল হাসারি। তখন সংসারের হাল ধরেছে সে। তার ব‍ুড়ো বাপ প্রদীপ চলে গেছে আড়ালে। তব‍ুও প্রদীপের সম্বন্ধ করা ছেলের সংগে ছোট বোনটার বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করতে হিম-সিম খেয়ে গেল হাসারি। বিয়ের খ‍ুটি-নাটি অন‍ুষ্ঠানবিধি থেকে শ‍ুর‍ু করে ভোজন-আপ্যায়ন সবই আছে। কোনো কিছ‍ুরই ত্র‍ুটি হলে চলবে না। তার ওপর আছে বিয়ের পণের যোগাড় এবং অন্য যৌতুক। ওরা যৌতুক হিসেবে চেয়েছে একটা সাই-কেল একটা ট্রান্‌জিস্‌টর রেডিও, মেয়ের গায়ের দ‍ু-একটা গয়না, আর দ‍ুভরি সোনা। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার টাকার বন্দোবস্ত হাতের কাছে মজ‍ুত রাখা দরকার। ভারতবর্ষের সমাজ-কাঠামোয় এই পণপ্রথা এত নিবিড়ভাবে মিশে গেছে যে আইনের আশ্রয়টিও লোকের কাছে অবান্তর মনে হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। আইনের বিচারে পণপ্রথা নিষিদ্ধ হলেও সমাজের নাকের ওপরই তা দিব্যি চাল‍ু আছে।

দেশাচারের খাঁই আরও বড়। বিয়ের রাতের যাবতীয় উৎসবের খরচ মেয়ের বাপের। আদর-আপ্যায়ন, ভ‍ুরিভোজ থেকে শ‍ুর‍ু করে প‍ুরোহিত বিদায় অব্দি সবট‍ুকু দায় মেয়ের অভিভাবকের। বস্তুত এমন নিষ্ঠ‍ুর প্রথার দাম এক কানাকড়িও নয়। তব‍ুও এর নির্দয় থাবাটি ঘাড় পেতে মেনে নেয় মান‍ুষ। কারণ সমাজে কন্যা-দান এক মহা প‍ুণ্য কর্তব্য। সালঙ্কারা কন্যাকে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় না করা পর্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ পিতার কাজ সম্প‍ুর্ণ হয় না। মেয়েকে শ্বশ‍ুরবাড়ি পাঠিয়ে

তবে নিস্তার পায় বাপ, সংসারে তাঁর একটা বড় কর্তব্য পালন হয়। আর তখনই সে নিশ্চিন্ত মনে শেষ বিচারের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে।

সুতরাং প্রদীপকে আরও একবার যেতে হলো মহাজনের কাছে। অন্তত হাজার দুয়েক টাকার কর্জ তাকে পেতেই হবে। নলিনী অর্থাৎ হাসারির মার শেষ সম্বল ক'টা গয়না সংগে নিয়েই সে গেল। একটা সোনার লকেট, দুটো সোনার দুল আর দুগাছা রুপোর বালা। এ সবই প্রদীপের বিয়েতে পাওয়া যৌতুক, নলিনীর বাপের দেওয়া। হাতে গয়না ক'টা নিয়ে ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল প্রদীপ। তার মনে হয়েছিল সামাজিক ব্যাধিটা আপাত নিষ্ঠুর মনে হলেও, তার একটা অন্য মূল্যও আছে, যখন সেগুলো অসময়ের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। বলতে কি, গরিবের সংসারে সাশ্রয় বলতে ত এইটুকুই! যা হ'ক, প্রদীপের দুহাজার টাকার দায় মিটিয়ে দিল মহাজন। তবে পাওনার অর্ধেক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাকে। তার ওপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের মাশুল ধার্য হলো। মাসে পাঁচ টাকা হারে বছরে ষাট টাকা প্রদেয় হলো প্রদীপের, যতদিন না বন্ধকী দেনা পুরো শোধ হয়। বলা বাহুল্য, নলিনী সেগুলো ফেরতের আশা করে নি। কারণ, দেনা শোধ করে গৃহস্থবধূর হাতে সেগুলো আর ফিরে আসে না। স্বামীর সংগে ঘরকন্নায় এতদিন ধরে এই গহনাগুলিই সে আনন্দ উৎসবের দিনে পরেছে। এখন থেকে সে রিক্তহস্ত হলো। সবার অলক্ষ্যে নলিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সেদিন।

অনুষ্ঠানের দায় উদ্ধার হলো। বাকি রইলো আপ্যায়ন-পর্ব। বরযাত্রীদের ভূরিভোজে রুই মাছ চাই। সে ব্যবস্থাটুকু যেন ছেলেরা করে। হাসারিও জানতো তার কর্তব্যের কথা। অসময়ের ব্যবস্থা সে করেই রেখেছিল। যেবার চীন-ভারত যুদ্ধ লাগে তার আগের বছরে ভাল ফসল হয়েছিল। তাই পুকুরে সে 'কছু পোনা ছেড়েছিল। এখন সেগুলোই বড় হয়েছে। বরযাত্রীদের পাতে পড়বে বড় বড় রুইমাছের চাকা। অবাক হবে আবার খুশীও হবে তারা।

বুড়ো প্রদীপ নিজের মনে মনেই ভাবছিল। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললো, 'সন্ধ্যে হতে চললো, কিন্তু সূর্যির এখনও কি তেজ! য্যানো আগুনের গোলা। তার মানে আমাদের নিয়তির চাকা এখনও পুরো ঘুরে নাই।'

পুরানো দিনগুলির কথা হাসারি ভাবছিল। 'পলি মাটির দেশ আমাদের। মাটির রঙ ফ্যাকাশে। তা যে রঙই হ'ক তিনি যে মোদের মা ধরিত্রী! তিনি ভূদেবী। তাই আর কোনো মাটিই দ্যাখলাম না আমি। এই মাটিকেই ভালবেসেছি: মনে হয়েছে ইনিই আমাদের মা। মায়ের য্যমন পৃথক রূপ নাই, ভালমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর নাই, ঠিক তেমনটি। তাই মা য্যাখন কাঁদে ব্যথা পায় আমরাও কাঁদি, ব্যথা পাই।'

সেটি জ্যৈষ্ঠ মাস। ঘোর গ্রীষ্ম ত্যাখন। দেশ গাঁ আগুনের তাপে জলে পুড়ে খাক্। তবুও রোজ আকাশ পানে চেয়ে থাকতাম। চেয়ে চেয়ে চক্ষু ব্যথা হতো। তবুও চেয়ে থাকতাম। আমার পেত্যয হতো একটা কিছু হবে। ক্রেমে ক্রেমে আকাশ ময়ূরের পেখমের বর্ণ নিচ্ছিল। গেরামের পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন একটা পূর্ণিমের পরেই বর্ষা নামবে। উনি বড় জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। জানতেন বোঝাতেন ঢের। পুরানো মানুষ। গেরামের সব মানুষকে চিনতেন। বড় ঘরের সজ্জন মানুষ উনি। সাধক ওঁর জেবন। অমন ঘরের মানুষ উনি: আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বড়। তাই প্রত্যেক নতুন বছরের প্রেথম দিনে বাড়ির কত্তারা ওঁর কাছে যেত বর্ষফল

জানতে। আমাদের পিতাঠাকুরও যেতেন। পণ্ডিত আঁক কষে সব বলে দিতেন। কখন সুসময়, কখন অসময়। বলে দিতেন কখন ফসলের ভাল ফলন হবে, কখন মন্দ ফলন হবে। বলে দিতেন গেরামের সব মানুষের ভাগ্যফল। বলে দিতেন বারব্রতর কতা, পুত্রকন্যার বিয়ের কতা। যা বলতেন সব নিভ্ভুল। বিয়ের মাস চলে গেলে মাটিতে বীজ পোঁতা হয়। মাটি ত্যাখন গভ্ভবতী হন। তা সেবারটি গ্রহনক্ষত্রের কথা হিসাব করে ঠাকুরমশাই বলে দিয়েছিলেন যে, বছরটি বড় ভাল যাবে। বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরা হবে। মাঠে মাঠে ফসল, গোলায় গোলায় ধান। এমন পুণ্যি বছর একবারই আসে দশবছরে, য্যাখন রোগ-বালাই থাকে না, মহামারী লাগে না, পঙ্গপালের অত্যাচার নেই। এমন বছরটি জেবনে ক'বারই বা আসে! তা পণ্ডিতমশাই জানতেন সব।'

তাই ছেলের হাত ধরে প্রদীপ একদিন গেল সেই বটগাছতলায়, যেখানে মা-গৌরীর মন্দির আছে। গ্রামের সবাই এসেছিল সেদিন। বটগাছতলা থেকেই শুরু হয়েছে ধুধু চাষের জমি। হাসারির বাপ এক দানা বীজ রাখলো দেবীর পায়ের কাছে, তারপর গড় করে বললো, 'মা, তোমার পায়ে অপ্পন্ করলাম।' হাসারি তাকিয়েছিল দেবী প্রতিমার দিকে। তিনিই ভগবতী, মাতা অন্নপূর্ণা, সকল লোকের ঈশ্বরী। তিনিই সবাইকে অন্ন দেন, আনন্দ দেন, সৌভাগ্য দেন। তিনি শিবের প্রাণপ্রিয়া এবং সৌভাগ্যবিধাত্রী। তিনি ত্রাণকারিণী, অভয়দায়িনী এবং করুণাসিন্ধু-স্বরূপা জননী। তাই-ই হলো। তিনদিনের মধ্যেই সেবার প্রথম ঝড়জল নামলো। ছড়িয়ে পড়লো নিশ্চিত আশ্বাসবাণী। রোয়া বীজ প্রথম জল পেয়ে ডগমগে হয়ে উঠলো।

হাসারিও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, সেই বছরটা বাঁকুলির চাষীদের সহায় হবেন ঈশ্বর। প্রদীপ তাই দেরি করে নি। মহাজনের কাছ থেকে আরও দুশো টাকা কর্জ করে বসলো। তা থেকে পঁচিশ টাকা নিয়ে হাসারি ভাড়া করলো একজোড়া বলদ। টাকা চল্লিশ খরচ পড়লো বীজ কিনতে। বাকিটা দিয়ে কেনা হলো সার আর পোকা মারার ওষুধ। বাপবেটা শুধু নয়, সারা গ্রামের মানুষ জানতো এবার তারা ফাঁকিতে পড়বে না। মুখ ফিরিয়ে নেবেন না ভাগ্যদেবী। শুধু প্রত্যাশা মতই নয়, তার চেয়েও ঢের বেশি ফলন হবে। তাই ঘণ্টায় ছ'টাকা হারে একটা পাম্পসেটও ভাড়া করে ফেললো হাসারি আর তার ভাইরা। তারপর শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

রোজ সকালে বাপবেটায় মিলে জমির ধারে গিয়ে বসতো আর স্বপ্ন দেখতো কেমন করে একটু একটু করে ডাগর হচ্ছে ধানের সবুজ ডগা। পণ্ডিত বলে দিয়েছিলেন যে, বর্ষা নামবে জষ্ঠির শেষ নাগাদ। দিনটাও বলে দিয়েছিলেন। একটা শুক্রবার। বারটা খুব শুভ নয়। তা হ'ক। বর্ষা বর্ষাই। সে যখন আসে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না তার। যা কিছু সঞ্চিত, সে সব ধুয়ে মুছে যায়, কারণ সঙ্গে আনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

তিন

সারা বাঁকুলি গ্রামখানা, মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা, পশু, পাখী, সবাই মিলে আকাশের

দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সাধারণত, বর্ষার কিছু আগেই কালবৈশাখীর ঝড় হয়। তখন আকাশ কালো হয় আর দৈত্যের মতন মেঘের দল পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে পেঁজা তুলোর মত কালো মেঘের দল একটার ওপর একটা গড়িয়ে পড়ে। এর পিছনে আসে আর এক প্রস্থ ঘন মেঘ। তার আঁচলে যেন সোনালী জরির কাজ। এই অতিকায় মেঘপুঞ্জের মুখ ফেটে বেরিয়ে আসে বালির ঝড়। সবশেষে যে মেঘ-পুঞ্জ ধেয়ে আসে তার রঙ ঘন কালো। তখন পৃথিবী ঢাকা পড়ে যায় তার ছায়ায়। খানিক পরেই শুরু হয় মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি ও গর্জন। সেই গভীর ধ্বনিতে থমথম করে বিশ্বচরাচর। মনে হয় পৃথিবী তৈরি হচ্ছে শেষ মুহূর্তটির জন্য। তখন আকাশের বুক চিরে ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ। মনে হয় যেন বহ্নিদেবতা মর্ত্যলোকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন তাঁর অশনি। এর খানিক পরেই নেমে আসে করুণাধারার মতন জলধারা। বড় বড় জলের ফোঁটা তৃষিত মাটির ওপর পড়ে হারিয়ে যায় মাটির তৃষ্ণার মধ্যে। আদুল গায়ে ন্যাংটো ছেলেরা আহ্লাদে খুশীতে ঝাঁপাঝাঁপি করে বৃষ্টিধারার মধ্যে। বড় মানুষরাও আনন্দে উন্মাদ হয়। আর ঘরের কোলে দাঁড়িয়ে ঘরের মেয়েরা ভগবানের কাছে কৃতার্থ হৃদয়ের গোপন কৃতজ্ঞতা জানায়।

জলই জীবন। আকাশ থেকে রেতঃপ্রপাতের মতন বৃষ্টিধারা নেমে আসে; মাতা-ধরিত্রী গর্ভবতী হন, পৃথিবীব নবজন্ম হয়, শুরু হয় জীবনের জয়গান। বর্ষাগমের কয়েক দিনের মধ্যেই মাটির বুকে জেগে ওঠে নবপল্লব। কীট-পতঙ্গ অধিকসংখ্যায় বেড়ে ওঠে, বেরিয়ে পড়ে ভেকের দল আর সরীসৃপ এবং পাখির কূজন স্বপ্নায়িত কবে তাদের নীড় বাঁধা। তখন যে দিকে তাকাও সবুজের সমারোহ, যেন দিকবিদিক আবৃত করে রেখেছে ঘন সবুজ একখানি গালিচা। দিনে দিনে দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী হয় উদ্ভিদ। তখন স্বপ্ন আর বাস্তব যেন দুঁহু কোলে মাখামাখি হয়ে যায়। অব-শেষে একদিন নভোমণ্ডল মেঘে বহুবর্ণের ইন্দ্রধনু ওঠে। এই প্রতীক রেখা দেবরাজ ইন্দ্রের ধনু। তিনি দেবতাদের রাজা, তাই আকাশের বুকে তাঁর ধনুর উদয় হলে গ্রামের চাষীরা আশ্বস্ত হয়। তারা ভাবে আর বুঝি দেবতার রোষ মানুষকে ভোগ করতে হবে না। ইন্দ্রধনু শান্তির প্রতীক। দেবে মানবে তখন রেষারেষি নেই, দ্বন্দ্ব নেই। এবার পূর্ণ হবে ফল ফলাবার আশা।

এ বছর পাল পরিবারের নিজস্ব ধানের জমির মাপ আধ একরের কিছু বেশি। হিসাব মত ধানের ফলনের পরিমাণ দশ মণের কিছু বেশি। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসের খাদ্যসঞ্চয়। কিন্তু বাকি দিনগুলি? তখন অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ফলনের জন্যে যখন পুরুষেরা যাবে জমিদারেব জমিতে দিনমজুর খাটতে। এ কাজে ঝুঁকি অনেক। সারা মাসে মাত্র তিন-চার দিনের কাজ। দিনমজুরির হার তিন টাকা, সঙ্গে জলপানি মুড়ি ও দুটা বিড়ি।

পণ্ডিত বলেছিল বর্ষা নামবে জ্যৈষ্ঠের শেষের এক শুক্রবার। তা সেদিনটা এল এবং চলেও গেল। আকাশ তেমনি নির্মেঘ এবং যেন আগুনের পিণ্ড। পরের দিন-গুলোও তেমনি কাটলো। ধারালো মসৃণ সাদা ইস্পাতের মতন আকাশের চেহারা একটুও বদলাল না। ধানের চারাগুলো ইতিমধ্যে হলুদ হতে শুরু করেছে। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠরা স্মৃতি তোলপাড় করে মনে করবার চেষ্টা করলো শেষবার কবে অসময় গেছে। কেউ বললো গান্ধীজীর তিরোধানের বছরটি এমনি অসময়ের বছর ছিল। সেবার নাকি আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে বর্ষা নেমেছিল। আর একবার নাকি পয়লা আষাঢ়েই বৃষ্টি নামে এবং ভাদ্র পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেবারটি ছিল অতি-

বর্ষণের বাহার। বর্ষার শুরুতেই ধানের কচি চারাগুলো জলে ডুবে যায়। মোটকথা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি কোনটাই যে বাঞ্ছিত নয়, তা সবাই জানতো।

ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে পরম আশাবাদীও উৎকণ্ঠামুক্ত হলো না। তবে কি সত্যিই ভগবান রুষ্ট হয়েছেন? প্রতিবেশীদের নিয়ে হাসারি ছুটলো গ্রামের পণ্ডিতের কাছে। পণ্ডিত বিধান দিল যে সর্ববিঘ্ননাশক অনাথবন্ধু গণেশকে সন্তুষ্ট করতে হবে তবে বিঘ্ন নাশ হবে এবং কার্যসিদ্ধি হবে। অর্থাৎ বাঞ্ছিত বর্ষার আগমন ত্বরান্বিত করবেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। সুতরাং ভক্তিযুক্ত মনে গণেশকে পুজো করতে হবে। গ্রামের মানুষ ধার-কর্জ করে বামুন পণ্ডিতের হাতে দুটো ধুতি, একখানা শাড়ি আর কুড়িটা টাকা দেবার পর, পুজোর আয়োজন হলো। ঘিয়ের প্রদীপ জেবলে মন্ত্রপাঠ করে গণপতি বন্দনা করলো ব্রাহ্মণ।

কিন্তু গণেশ বা অন্য কোনো দেবতাই ওদের প্রার্থনা হয়ত শুনতে পাননি। সুতরাং বিঘ্ন নাশ হলো না এবং বর্ষাও এল না। নিরুপায় হাসারি একদিন পাম্প ভাড়া করে আনলো এবং তার ক্ষেতে জলসেচ করালো। একটানা ছ'ঘণ্টা জল-সেচের পরদিন দেখা গেল যে সদ্য ওঠা চারাগুলি ডগমগে হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার জমির পাশেই পড়ে থাকা অন্যদের ক্ষেতের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জলের অভাবে চারাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। সবাই বুঝতে পারছিল যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এবার কোনো ফলনই হবে না। দূরে দিগন্তে মহামারীর করাল ছায়া দেখে মানুষজন মনে মনে শিউরে উঠছিল।

আর কেউ এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে না। মহাজনের ট্রানজিস্টর রেডিওর ঘোষণা সবাই শুনেছে। সবাই জানে যে এবার এ বর্ষা দেরি করে আসবে। এখনো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেই এসে পৌঁছয়নি বর্ষার মেঘ। কিন্তু কোথায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ? বাঁকুলি থেকে কত দূরে? মোটকথা রেডিওর ঘোষণা ওদের নতুন কিছু শেখাতে পারলো না। হাসারি বললো, 'নতুন আর কি শেখাবে রেডিও। বর্ষার যে দেরি আছে তা আমরা জানতাম।' জ্যৈষ্ঠীর শেষ নাগাদ গ্রামে বাউলের দল এল। ওদের পরনে গেরুয়া পোশাক। গ্রামের পথঘাট ঘুরে ঘুরে ওরা কৃষ্ণের নামগান শোনায়। একদিন গৌরীমায়ের মন্দিরে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওরা গান ধরলো। কারও হাতে একতারা, কারও হাতে করতাল। বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওরা গান ধরলো। গানের উদ্দেশ্য হলো ভ্রাম্যমাণ মেঘকে আহ্বান করা। 'ও মনের পাখি! এমন ঘুরে বেড়িও না। তুমি জানো এতে আমাদের কত ক্লেশ হয়। তুমি দুদণ্ড দাঁড়াও আর আমাদের জল দাও।'

গ্রামে একটাই জলাশয়। দেখতে দেখতে জলাশয়ের জল প্রায় তলানিতে এসে ঠেকলো। গ্রামবাসীদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। পাম্প দিয়ে জল তুলতে কতদিন লাগতে পারে তার হিসেব করছিল ওরা। একদিন পাঁকের ভেতর থেকে মাছ তুলে আনলো ওরা আর সকলের মধ্যে বিলি করে দিল। এত দুঃখের মধ্যেও এটা যেন আশাতীত এক আনন্দের ঘটনা ওদের কাছে। অন্তত একদিন ওরা পেট পুরে মাছ খেতে পারবে। অনেকে আবার 'শুঁটকী' করে রাখলো ভবিষ্যতের জন্যে।

হাসারির ক্ষেতের ধান আর বেশিদিন সবুজ থাকলো না। রোদের দাবদাহে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল ফসল। সেই ঝলমলে সবুজ ভাবটা ধীরে ধীরে চলে গেল। পাঁশুটে হয়ে যাচ্ছে ধানের ডগা। ক্রমে খসে খসে পড়তে লাগলো ধান। এমন স্বাস্থ্যবতী চারাগুলো চোখের সামনেই মরে হেজে যাচ্ছে। হায় হায় করে

উঠানের হাসারির প্রান্তে। এত মজুরি ভালবাসার এই পরিণাম! বিমর্ষ হাসারি পাথরের মতন স্থির চোখে তাকিয়েছিল তার ক্ষেতের দিকে। এ বিপদ কি কাটাতে পারবে সে? তবে শুধু একা হাসারি নয়। সারা গ্রামখানাই বিমূঢ় হয়ে গেছে এই আকস্মিকতায়। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তিটুকু তারা যেন হারিয়ে ফেলেছে। বোধহয় তারা তখন ফকিরের কথা ভাবছিল, ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে খেদ করে যে গাইতো, 'হায়! আমার সোনার ফসলের গোলাঘরের চাবিটা কে নিল গো! ও সোনা যে আমার আর রইল না!' বাস্তবিক, সেদিন বাঁকুলির সবাই যেন চাবিটা হারিয়ে ফেলেছিল।

সারাটা রাত গুম হয়ে ভাবলো হাসারি। যা বাস্তব সত্য মানতেই হবে তা। কিন্তু এখন কি করবে সে? পরদিন সকালে বাপ-ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলো সে। হাসারির বাপ প্রদীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যা বললো তাতে দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল হাসারির। প্রদীপ মাথা নেড়ে বললো, 'এ মরশুমে ফসল আর হবেক নাই। এই শ্যাষ।' কথাটা কানে গেল হাসারির মা'র। তাড়াতাড়ি কলসির ঢাকা খুলে চাল মাপতে বসলো সে। হাসারি জানে এভাবে চললে দু'মাসের সঞ্চয়ও ঘরে নেই। তারপর কি হবে? কি হবে তা সে জানে না। এইটুকু মাত্র জানে যে বড় দুঃসময় তাদের। আড়ালে চোখের জল মুছে হাসারির মা অবশ্য সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'ভয় কি বাবা! চারমাস খুব ভালোই চলে যাবে। তারপর একবেলা আনাজ-তরকারি খেয়ে চালাবো।' হাসারি কোনো জবাব দিল না। সে জানে এটা মিথ্যা। সর্বৈব মিথ্যা। কখন বুড়ো প্রদীপ এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি কেউ। হাসারির মার কাঁধে একটা হাত রেখে প্রদীপ বললো, 'আমরা বুড়ো-বুড়ি রোজ নাই বা খেলাম। বাচ্চারা দুটি অন্ন পাক।' স্বামীর কথায় যেন বড় একটা আশ্বাস পেল হাসারির মা। ঘাড় নেড়ে সায় দিল সে।

কিন্তু পালেরাই নয়, গ্রামের অনেক পরিবারের সম্বল শূন্য হয়ে গেছে ততদিন। এই বাস্তবচিত্র যে কত রূঢ় তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটা ঘটনায়। গ্রামের সবচেয়ে গরিব সহায়হীন শ্রেণী হলো হরিজনরা। তারা চেয়ে-চিন্তে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খায় এবং কষ্টে-সৃষ্টে একধারে পড়ে থেকে জীবন যাপন করে। তারা বুঝেছিল যে এবার এক দানা শস্যও মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকবে না, যা কুড়িয়ে পাওয়া যাবে। একদিন ওরা তাই সদলবলে গ্রাম থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ না বললেও সবাই বুঝলো ওরা গেছে ষাট মাইল দূরের শহর কলকাতায়। একে একে অনেকেই তাদের অনুসরণ করলো। শুরু হলো মানুষের মহামিছিল। দেখা গেল বাঁকুলির ভিটেমাটি ছেড়ে দলে দলে মানুষ চলেছে হাঁটাপথ ধরে কলকাতা নামক মরীচিকা শহরের দিকে।

তবুও হাসারিরা টিকে ছিল। কিন্তু যে দিন প্রতিবেশী অজিত ভদ্রাসন ছেড়ে কলকাতা যাবার কথা বললো সেদিন হাসারির মনটা ধক্ করে উঠেছিল। অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা দুই পরিবারের। মনে লাগাই স্বাভাবিক। ভদ্রাসন ছেড়ে দেবার আগে বুড়ো অজিত কুলুঙ্গি থেকে ঠাকুরের পট নামাল। ভিটের প্রদীপ নেভাল। তারপর ঠাকুরের পটগুলো একটা কাপড়ে বেঁধে পুঁটুলি করলো। পুঁটুলির মধ্যে বন্দী ঠাকুর কি হাসছিলেন? হয়ত তাই। অজিতের বড় ছেলে দোরগোড়ার পাশে একটা গর্তের মধ্যে কিছু চাল আর ফুল রেখে দিল। এটা বাস্তু-সাপের খাদ্য। যতদিন তারা ফিরে না আসে ততদিন এই ভদ্রাসন রক্ষা করবেন বাস্তুসাপ। কিন্তু যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে

কালো বেড়ালটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল ওদের। এ কি অলক্ষণ! অজিতের মন বিষন্ন হয়ে গেল। স্থির করলো সে আগে যাত্রা করবে। বাকিরা অন্য পথে যাবে। যাত্রার আগে পোষা পাখির খাঁচার দরজা খুলে দিল অজিতের ছেলে। খাঁচার বন্দী পাখি মুক্ত হ'ক, উড়ে যাক বনে। কিন্তু দোর খোলা পেয়েও তখনি উড়ে গেল না পাখি। কিছুক্ষণ বসে রইল খাঁচার মধ্যে তারপর এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফাতে লাফাতে চললো ওদের পিছু পিছু। অজিত আর পরিবারের সবাই তখন বাঁকুলি গ্রামের কাঁচা রাস্তার ধুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে।

গ্রীষ্ম কাটলো, কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টিও হলো না সেবার। এখন শীতের বীজ বোনার কাজ শুরু করতে হয়। কিন্তু জল ছাড়া বপন হবে কি করে? অর্থাৎ এ ফসলটাও নিষ্ফল যাবে। হাসারিদের একটা গাই তখনও ছিল। কিন্তু মর্মান্তিক দশা তার। জিরজিরে হাড় ক'খানা চামড়ার সংগে লেগে আছে শুধু। অনেকদিন ধরেই খড়-ভুষি কিছুই দিতে পারে নি তাকে। একদিন ভোরবেলায় হাসারি দেখলো কলাগাছের ছায়ায় জিভ বার করে ধুঁকছে গরুটা। হাসারি বুঝতে পারছিল গাঁ-ঘরে আর একটা জীবও বেঁচে থাকবে না।

শকুনের মতন ওত পেতে ছিল কসাই। পরদিন ঠিক সন্ধান করে হাজির হলো। মাত্র পঞ্চাশ টাকায় মুমূর্ষু গরুটাকে গাড়িতে তুললো। যাবার সময় লোকটা হাসারিকে আর একটা নতুন গাই কেনার পরামর্শ দিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে আরও গাই মরার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন শবগুলো মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেল চামড়াওলারা।

অঘ্রাণও পেরিয়ে গেল। বাঁকুলির তখন শোচনীয় অবস্থা। কোথায় গেল সেই শ্যামল-সুন্দর গাঁয়ের শ্রী। মানুষজন কমে গেছে। যারা আছে তারাও যেন মরে আছে। ঘরে শিশুর হাসি নেই। গোয়ালে গরু নেই। ঘরে দুধ নেই। এমনকি শাক-পাতা সেদ্ধ করার জ্বালানিও নেই। ঘরে শ্রী নেই, স্বাস্থ্য নেই। উলঙ্গ শিশুরা চঞ্চলতা ছেড়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বেলুনের মতন তাদের পেটগুলো ফোলা ফোলা। সবাই ধুঁকছে। হয় জ্বরজ্বারি নয়তো আমাশা বা পেটের রোগে যে কটা মরে হেজে গেল সেই কটাই বেঁচে গেল। আসলে, উৎকট বুভুক্ষার দাপটে বাচ্চাগুলো ছন্ন-ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াত।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি শোনা গেল যে জেলা শহরে সরকারী ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। কুড়ি মাইল দূরে জেলা শহর। প্রথম প্রথম কেউ যেতে চাইছিল না। 'আমরা চাষী, ভিখিরি লই।' বললো অনেকে। হাসারি ওদের বোঝালো, 'সরকার ত্রাণ দিচ্চে মেয়ে আর বাচ্চাদের জন্যে। আমাদের জন্য এ ত্রাণ লয়।' দিনকয়েক পরেই সর-কারের লোক এসে জানিয়ে গেল নতুন সরকারী উদ্যোগের কথা। 'কাজের বদলে খাদ্য'—এই নতুন কর্মোদ্যগ নিয়েছে সরকার। কর্মকাণ্ডের বিশাল পরিধি; অনেক কাজ, যেমন খাল কাটা, রাস্তা সারাই, জলাশয় গভীর করা, দীঘির পাড় উঁচু করা, গাছ বসানো ইত্যাদি। হাসারি বলেছিল, 'রোজ আমাদের দিত এক সের করে চাল। সেটাই সারা পরিবারের একদিনের খাবার। আর রোজ রেডিও থেকে বুলতো দেশে কোথাও অভাব লাই। ভাণ্ডারে মজুত আছে অনেক খাদ্য।'

মাঘ মাস নাগাদ একটা দারুণ দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। গৌরীমা'র থানের পাশে যে কুয়োটা আছে তার জল শুকিয়ে গেছে। কয়েকজন নেমে গেল তরতর করে। উঠে এল মুখ শুকনো করে। যা রটেছে তা মিথ্যে নয়। কুয়োর তলায় জলধারার

উঠে শুকিয়ে গেছে। গ্রামে আরও তিনটে কুয়ো আছে। তাদের জলের বরাদ্দ বেঁধে দেওয়া হলো, যাতে সবাই জল পায়। কিন্তু সেখানকার জলও পর্যাপ্ত নয়। তাই প্রথমে এক বালতি, পরে আধ-বালতি, এইভাবে জলের বরাদ্দ কমতে লাগলো একটু একটু করে। শেষ পর্যন্ত জলের বরাদ্দ দাঁড়ালো এক ঘটি। তাও আবার পান করতে হবে সবার চোখের সামনে বসে। শেষ অবধি অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে লাঠি হাতে চৌকি বসলো কুয়োর ধারে। শোনা গেল কয়েক মাইল দূরে বুনো হাতির দল একটা ডোবা আগলে দাঁড়িয়ে আছে এবং যাকে দেখছে তাকেই তেড়ে আসছে।

দেখতে দেখতে মাইলের পর মাইল চাষের জমির চেহারা হয়ে উঠলো মরা এবং শুকনো। পাথরের মত শক্ত মাটির জায়গায় জায়গায় গভীর ফাট। বড় বড় গাছ-গুলোর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে বোবা কান্না। চেহারাগুলো দেখলে সত্যিই জল আসে চোখে। পাতাঝরা শুকনো অনেকগুলো গাছ ইতিমধ্যেই মরে গেছে।

শেষ অবধি চেষ্টা করেছিল কিন্তু ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না প্রদীপ। একদিন সবাইকে ডাকলো বুড়ো। ধুতির গিঁট খুলে বার করলো পাঁচখানা দশটাকার নোট আর দুটো একটাকা। তারপর সেই টাকা ক'টা হাসারির হাতে দিয়ে বললো, 'তুমি আমার লায়েক বেটা। তুমার হাতেই আমার সম্বল তুলে দিলুম। তুমি কলকেতায় গিয়ে একটা কাজ খুঁজে লাও। কলকেতা বড় শহর, একটা যা হয় কিছু জুটবেকেই। তখন আমাদের কিছু পাঠিও। শুধু তুমিই পার আমাদের বাঁচাতে।' হাসারি তখন বাপের পায়ের ধুলো নিল। প্রদীপও ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলো। তখন শক্ত করে ছেলের কাঁধটা ধরেছিল প্রদীপ। হাসারির মা নিঃশব্দে কাঁদছিল।

পরদিন ভোরেই যাত্রা করলো হাসারি। প্রথম সূর্যের আলো যখন সবে গায়ে মেখেছে দিগন্ত, যখন সবে ফিকে হচ্ছে কালো রাত, তখনই বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাত্রা করলো হাসারি। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। একহাতে অমৃতা অন্য হাতে একটা ঝোলা নিয়ে আগে আগে চলছে হাসারি। পিছনে চলেছে অলকা আর তার দুই ছেলে মনোজ ও শম্ভু। হাসারির ঝোলার মধ্যে একটা জামা আর এক-জোড়া চটিজুতো ঢুকিয়ে দিয়েছে অলকা। অলকার বাপের বাড়ি থেকে জামাইকে যৌতুক দিয়েছিল ও দুটো। এমনভাবে ভিটেমাটি আর ভদ্রাসন ছেড়ে আগে কখনও যায় নি হাসারি। তাই কিছুতেই মনটা শান্ত করতে পারছিল না সে। অচেনা-অজানা জায়গা। পদে পদে ভয় আর আশঙ্কা ছড়িয়ে আছে সেই শহরে। কে জানে কি লেখা আছে ভাগ্যে! মনোজ আর শম্ভু ভারি খুশী। ওরা নাচতে নাচতে চলেছে অজানার দিকে, যেন অভিযান করতে চলেছে তারা।

চার

পুরো সকালটা লেগে গেল স্টেশনে পৌঁছতে। কিছুটা বাসে চড়ে ওরা যখন স্টেশনে পৌঁছলো তখন বেশ বেলা। তারপর রেলের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে রাতটুকু কাটিয়ে হাসারিরা যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলো তখন সবে ভোর হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে হাসারি তাজ্জব। প্লাটফর্মে নামার সঙ্গে সঙ্গেই জনস্রোত যেন তাদের গ্রাস করে ফেললো। কয়েকটা মুহূর্ত যেন ঢিপির মতন ওরা স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকলো। সব দিক থেকেই

স্রোতের মত মানুষ আসছে যাচ্ছে। মাথায় পাহাড়ের মত বোঝা নিয়ে কুলিরা দিব্যি চলেছে। সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র ফেরি করে বেড়াচ্ছে ফেরিওয়ালা। হাসারি আর তার বউ অলকা জীবনে এতরকম বিক্রির জিনিস দেখে নি। কোথাও পিরামিডের মতন উঁচু করে সাজানো কমলালেবু। তার পাশেই নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের পসরা। ছুরি, কাঁচি, তালা, ব্যাগ, চিরুনি, গায়ের কাপড়, ধুতি, শাড়ি কি নয়! তাছাড়া আছে জুতো পালিশওলা, মুচি, চিঠিপত্তর মুসাবিদা করার লোক, জ্যোতিষী। ভিড়ের সংগে মিশে আছে গায়ে ছাইমাখা সাধুবাবা। কুড়ি পয়সার বিনিময়ে পুণ্যকামী যাত্রীর মুখে কয়েক ফোঁটা গংগার জল ঢেলে দিচ্ছে। এই কোলাহলের আবর্তে পড়ে হাসারিরা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে তখন। কি করবে, কোথায় যাবে? রাতটাই বা কোথায় কাটাবে?

হাসারি কিছুক্ষণ ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্যহীন ভাবে এলোমেলো ঘুরলো। ঘুরতে ঘুরতে তার নজরে গেল বড় হলঘরটার একটা কোণের দিকে। সেখানেও ওদের মতন একটা বিহারী পরিবার সংসার গুছিয়ে বসেছে। ওদের সঙ্গে একটা উনুন, একটা স্টোভ আর খানকয়েক কলাইকরা বাসন। দলটাকে দেখে হাসারির কেমন যেন ভরসা হলো। দলবল নিয়ে ওদের কাছে যেতেই লোকগুলো তাড়াতাড়ি তাদের পরিবারের সংগে হাসারির পরিবার ছেলেমেয়েদের বসিয়ে দিল, যাতে পুলিশের নজর না পড়ে এদের দিকে। হাসারির মতন এই পরিবারটিও চাষী পরিবার। তবে এরা বাঙালী নয়। সামান্য বাংলা বলতে পারে। ওরাই বললো যে, পাছে অনাহারে থাকতে হয়, তাই ছেলেমেয়েদের ভিক্ষে করতে পাঠিয়ে দিয়েছে। লজ্জার কথাটা বলাব সময় বেশ সংকোচ হচ্ছিল ওদের। হাসারি বললো ওর গাঁয়ের একজন নাকি বড়বাজার অঞ্চলে মুটেগিরি করে। তার সন্ধান করতেই সে বেরোবে। ওরা পরামর্শ দিল হাসারি যেন ছেলেমেয়েদের তাদের কাছে রেখে একা বেরোয়। হাসারি মনে মনে ভারি স্বস্তি পেল ওদের কথা শুনে। হাসারি তখন কিছু খাবার কিনতে বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই বেশ ক'টা সিঙাড়া কিনে আনলো সে। বিচিত্র চেহারা আর স্বাদের এই রকম খাদ্যবস্তুর সংগে চাক্ষুস কোনো পরিচয় ছিল না হাসারির। যাই হ'ক, নতুন বন্ধুদের সংগে ভাগ করে সিঙাড়া খেল হাসারিরা। ছেলেমেয়েরা খুব খুশী, খুশী হলো অলকাও। কাল রাত থেকে পেটে কিছুই পড়ে নি তাদের। খুব আগ্রহ নিয়েই সবাই মিলে সিঙাড়া খেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের হেপাজতে বউ ছেলেদের রেখে হাসারি বেরোল স্টেশন চত্বর থেকে, যেন, ঝাঁপ দিল অগণিত মানুষের সমুদ্রে।

হাসারিকে দেখেই বোঝা যায়, শহরে সে আনকোরা নতুন। তাই এই নতুন আমদানীটিকে ঘিরে ফেরিওয়ালাদের মধ্যে যেন উৎসাহের প্লাবন উঠলো। চকিতে তারা ঘিরে ধরলো হাসারিকে তাদের বিক্রির পসরা নিয়ে। কেউ কলম বেচছে, কেউ বা নানারকম রঙ করা মিষ্টান্ন, কেউ লটারির টিকিট। ভিখিরীর দল প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ছে। একটা কুষ্ঠ রুগী তার জামা ধরে টানাটানি শুরু করলো। হাসারি রীতিমত বিভ্রান্ত। কোনরকমে এদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সে একটু এগিয়ে গেল। কিন্তু সে জায়গাটা যেন গতি আর শব্দের একটা ঘূর্ণাবর্ত। বাস, লরি, ট্যাক্সি, ঠেলা, ঘোড়ার গাড়ি, মোটর বাইক সবাই যেন তারস্বরে চীৎকার করছে আর পাগলের মতন চক্রাকারে ঘুরছে। সবাই চেষ্টা করছে আগে যাবার কিন্তু পারছে না। শব্দের জটলা আর বিশৃঙ্খলায় এলোমেলো হয়ে এক ভয়ঙ্কার ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। বাস মোটরের হর্ন, ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ, ঘোড়ার গাড়ির

ঘণ্টা। সব মিলিয়ে যে ধ্বনিময় জগতের সৃষ্টি হয়েছে তার লক্ষ্য বোধহয় একটাই, কে কতটা শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। হাসারির মনে হচ্ছিল এদের সমবেত শব্দ হয়ত প্রথম কালবৈশাখীর বজ্রপাতের শব্দের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সে ভাবলো এবার বোধহয় শব্দের আঘাতে তার মাথাটা ফেটে যাবে।

কিন্তু তার সবচেয়ে অবাক লাগছিল ট্রাফিক পুলিসটাকে দেখে। এত কোলাহলের মধ্যেও লোকটা কেমন যেন নির্বিকার। নির্বিবাদে হাতের খেটেটা নাড়িয়ে সে যানবাহনগুলোকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে। ভিড় ঠেলে ওর কাছেই হাসারি বড়বাজার জায়গাটার হদিস নিতে গেল। লোকটা প্রায় আকাশের দিকে হাতের বেঁটে লাঠিটা উঁচিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিল। হাসারি অবাক। আকাশচুম্বী হাওড়া ব্রিজের গায়ে জড়াজড়ি করা ইস্পাতের গ্রন্থিগুলোর দিকে লোকটা হাতের লাঠি উঁচিয়ে আছে। ওর নাম বড়বাজার? পুলিসটা ঘোঁত ঘোঁত করে বললো, 'ওর ওপাশে।' অর্থাৎ বড়বাজার নামক জায়গাটার অবস্থান সেতুর ওপাশে এবং কলকাতা ও হাওড়া নামক এই যমজ দুটি শহরের সেতুবন্ধ হলো এই ব্রিজ — পৃথিবীর সবচেয়ে জনাকীর্ণ এবং ব্যস্ত সেতু।

প্রতিদিন দশ লক্ষাধিক মানুষ এবং লক্ষাধিক যানবাহন এই সেতুর ওপর দিয়ে পারাপার করে। পারাপারের সময় গাড়ি ও মানুষের এমন জট পাকায় যা দেখে সমুদ্রের বুকে ভয়াবহ জলাবর্তের কথা মনে হয়। হাসারি একবার তাকিয়ে দেখলো সেই আবর্তের দিকে। তারপর অপ্রতিহত আকর্ষণে গিয়ে পড়লো সেই ঘূর্ণাবর্তের একেবারে মধ্যিখানে। তার এপাশে-ওপাশে তখন শুধু গাড়ি আর মানুষ। ফেরিওয়ালারা বসে গেছে রাস্তার ওপরে। ক্ষিপ্রহাতে বেচাকেনা চলছে। গাড়ি ঘোড়ার জন্যে নির্দিষ্ট সংকীর্ণ সারির মধ্যে সবরকম যানবাহনই আছে এবং এমন দুর্ভেদ্য জটলা সৃষ্টি করেছে যে. মানুষ গলার ফাঁকও নেই। পাথরের ঢিপির মত নিশ্চল হয়ে গেছে ট্রাম। তাদের পেরিয়ে যেতে গিয়ে আটকে পড়েছে মালবাহী লরিগুলো এবং রাগে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। লাল রঙের দোতলা বাসের গা থেকে ঝুলছে আঙুরের থোকার মতন মানুষ। কয়েকটা বাস বিপজ্জনকভাবে একপাশে হেলে আছে। হঠাৎ দেখলে ভ্রম হবে এই বুঝি কাত হয়ে গেল। ঠেলাগাড়িগুলো বোঝাই করা ভারি ভারি মালপত্তর নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে হতভাগ্য মালবাহকের নির্দেশে। লোকটার হাতের দড়াদড়া শিরাগুলো দেখে মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি বিদীর্ণ হবে হাতের পেশী। দুঃসহ বোঝা আর যন্ত্রণায় দুমড়ে যাওয়া মুখ নিয়ে ঘোড়ার মত কদম ফেলে ছুটে চলেছে কুলিরা। একদল ছুটছে কাঁধে বাঁক নিয়ে— বাঁকের দুপাশে ড্রামভরা দুধ বা অন্য পানীয়। একপাশ দিয়ে চলেছে মোষ, গরু. ছাগলের পাল। একটা লোক ছড়ি হাতে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শব্দের তাড়া খেয়ে অবোধ জানোয়ারগুলো মাঝে মাঝে গাড়ির গোলক ধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে আর ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করছে। ওদের দেখে হাসারির মনে হলো. 'আহা! কি কষ্ট!' হয়ত তখন তার মনে পড়ে যাচ্ছিল ফেলে আসা গ্রামখানির সেই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার কথা।

ব্রিজটুকু পেরিয়ে হাসারি এসে পড়লো কলকাতার দিকে। এদিকটায় মানুষ এবং গাড়ির জটলা আরও ঘন। হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল একটা অদ্ভুত চেহারার শকট। দুচাকাওলা এই গাড়ির সঙ্গে লাগানো দুটো শকট-দন্ড এবং দন্ডদুটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ যাত্রীসহ গাড়িটা অবলীলায় টেনে নিয়ে চলেছে।

হাসারি এই প্রথম মানুষটানা রিক্সা দেখলো। দেখে তার অবাক লাগছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কি আশ্চর্য এই শহরটা। এখানে ঘোড়ার মতন মানুষও গাড়ি টানে! যত সে বড়বাজার এলাকাটার কাছাকাছি যাচ্ছিল, ততই এই বিচিত্র শকটটি তার নজরে পড়তে লাগলো। কখনো মানুষ কখনো মালপত্র নিয়ে টানতে টানতে চলেছে একটা লোক আর তাকে দেখে হাসারি ভাবছে, এমন একটা গাড়ি টানার ক্ষমতা কি তার হবে না? গাড়ি টেনে সে কি দুটো পয়সা রোজগার করতে পারবে না?

বড়বাজার এলাকাটিতে সর্বক্ষণই ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে আর জট পাকাচ্ছে। রাস্তার ধারের আকাশছোঁয়া উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসারি অবাক হয়ে ভাবছিল কেমন করে বাড়িগুলো এমন অনায়াসে দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য সরু সরু গলি একটার সংগে আর একটা কাটাকুটি করে যেন জাল বুনেছে। মাথাঢাকা অপ্রশস্ত ফুটপাতের গায়ে মৌচাকের মতন ছোট ছোট দোকানঘর। দোকানঘরগুলোর মধ্যে বেচাকেনার গুঞ্জন চলেছে অবিরত। রাস্তা জুড়ে ফেরি-ওলারা বসে গেছে ফুলের পসরা নিয়ে। কতরকম টাটকা ফুল বেচছে ওরা, গোলাপ, যুঁই, গাঁদা ইত্যাদি। ছোট ছোট ছেলেরা কুঁড়ির মধ্যে সুতো পরিয়ে মোটা মোটা মালা আর নানারকম গয়না তৈরি করছে। মালার সংগে লাগানো লকেটটাও ফুলের তৈরি এবং জরির সুতো দিয়ে বাঁধা। মোটা মালাগুলো দেখতে বোড়াসাপের মতন। ফুলের মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে জায়গাটা। দশটা পয়সা দিয়ে হাসারি কতকগুলো গোলাপের পাপড়ি কিনলো। এগুলো সে শিবঠাকুরের পায়ে দেবে। রাস্তার ধারে একটা কুলুঙ্গির মধ্যে কালো পাথরের লিঙ্গ-মূর্তিটা সে দেখতে পেয়েছে। ভক্তি-ভরে এঁরই পূজা করে এঁকে তুষ্ট করবে হাসারি এবং ইনিই তার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। তার বাঞ্ছিত মানুষটির সংগে তার দেখা করিয়ে দেবেন এই ত্রিকালজ্ঞ দেবতাশ্রেষ্ঠ মহাদেব।

হাসারি যত এগোচ্ছে ততই দুপাশের দোকানগুলো তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এবার সে যেখান দিয়ে যাচ্ছিল সেখানে দোকানদারেরা নানারকম গন্ধদ্রব্য বিক্রি করে। রঙবেরঙের শিশিবোতল দিয়ে সাজানো দোকানগুলো থেকে ভুরভুর করে নানারকম মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সেগুলো পেরিয়ে যেখানে সে এসে পড়লো সেটা ঢাকা গলিপথ।

এটা সোনাপট্টি। কাঁচের শো-কেসের মধ্যে সাজানো রত্নালঙ্কার থেকে ঠিকরে পড়ছে আলো। একসংগে এত গয়না হাসারি আগে দেখে নি। নিজের চোখকে সে যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না এই প্রাচুর্য দেখে। বোধহয় কয়েকশ' দোকান সার সার চলে গেছে। যাবতীয় রত্ন-অলঙ্কার খাঁচার দরজার আড়ালে যত্ন করে রাখা আছে, যেন খুব দামী বন্দী এরা। হাসারি দেখলো ধনী মেয়েরা খাঁচা খুলে ভেতরে ঢুকছে আর দোকানী তার পিছনে রাখা লোহার সিন্দুক খুলে গয়না বার করে তাদের দেখাচ্ছে। এইভাবে তালাবন্ধ সিন্দুক কতবার খুললো আবার বন্ধ করলো, কিন্তু একবারও চাবি দিতে ভুল করলো না। সোনা ওজন করার দাঁড়িপাল্লাটি অত্যন্ত যত্ন আর অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সংগে ব্যবহার করছে। হিসাবে একটুও ভুল হচ্ছে না কারও। হাসারির মনটা ব্যথা পেল যখন দেখলো তার মত গরিব বাড়ির বউরাও সসংকোচে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার রেলিং পর্যন্ত পৌঁছতে তারা ধাক্কাধাক্কি করছে। হাসারি হঠাৎ ভাবলো শহরের স্বর্ণ-

কারবারও সুদখোর মহাজন। এরাও টাকা সুদে খাটায়, বন্ধকী কারবার করে।

সোনাপটি ছাড়িয়ে শাড়িবাজার। জমকাল চেহারার শাড়িগুলোর দিকে চাইলে চোখ ফেরানো যায় না আর সেই উপাদেয় পরিবেশের মধ্যে মেয়েরা যেন কৃতার্থ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসারি অবাক হয়ে চেয়েছিল চুমকি আর সোনার জরি বসানো শাড়িগুলোর দিকে। আলো পড়ে ঝলমল করছে সেগুলো। তার মনে হলো নিশ্চয়ই এসব বিয়ের শাড়ি।

সেদিনটা খুব গরম। ঠেলাগাড়ি করে ঠান্ডা জল ফেরি করে বেড়াচ্ছে ফেরি-ওলারা টুং টুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে। হাসারিও পাঁচ পয়সা দিয়ে এক গেলাস ঠান্ডা জল খেল। জল খেয়ে খানিক স্বস্তি পেল সে। তখন সে যাকে দেখছে তাকেই তার গ্রামের চেনা লোকটার কথা জিজ্ঞেস করছিল। কিন্তু এইরকম জনারণ্যের মাঝখান থেকে আসল মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া অবশ্যই একটা অলৌকিক ব্যাপার। তাহলেও অন্ধকার না নামা পর্যন্ত তার খোঁজার বিরাম হলো না। পরে তার মনে হয়েছিল যে এইভাবে কয়েক লক্ষ অপরিচিত মানুষের ভিড়ের ভেতর থেকে একজন চেনা লোক খুঁজে বার করা বোধহয় দশ বিঘে জমি চাষ করার চেয়েও বেশি খাটুনির। শেষমেশ খোঁজা বন্ধ করে সে পাঁচটা কলা কিনে তার ফুটপাতের আস্তানায় যখন ফিরে এল, তখন সবাই আগ্রহভরে তার অপেক্ষায় বসে ছিল। হাসারির হাতের কলা ক'টা প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল ছেলেমেয়েরা। সে রাতটা কোনরকমে স্টেশনের মেঝেতে শুয়েই রাতটা কাটলো ওদের। পুলিসের উৎপাত হলো না।

পরদিন ভোর থেকেই হাসারি তার অভিযান শুরু করলো। আজ তার সঙ্গে আছে মনোজ। ওরা দুজনে অন্য দিকে খুঁজতে বেরুলো। এদিকটা কামারশালা। সেখানটা খুঁজে ওরা গেল বিড়ি বাঁধাইয়ের কারখানার দিকে। খালি গায়ে মজুররা বিড়ি বাঁধছে আবছা আলো-অন্ধকার ঘরের মধ্যে। এত কম আলো ঘরের মধ্যে যে, লোকগুলোর মুখটাও ভালো করে চেনা যায় না। উঁকিঝুঁকি দিয়ে হাসারি তার চেনা মানুষকে খোঁজবার চেষ্টা করছিল। যে শুনতে চাইল তাকেই বললো প্রেম-কুমারের কথা। কিন্তু এভাবে মানুষ খোঁজা যেন খড়ের গাদা থেকে এক দানা চাল খোঁজার সামিল। প্রেমকুমার নামে শ'য়ে শ'য়ে লোক থাকতে পারে এখানে। হয়ত কারও চেহারার আদলও ওর মতন। যা হ'ক, সে দিনটাও নিষ্ফল কাটলো। ফেরার সময় গোটা ছয়েক কলা কিনে তারা ফিরে এল হাওড়া স্টেশনে এবং কলা দিয়ে রাতের ভোজনপর্ব সমাধা করে স্টেশনের চত্বরে শুয়ে পড়লো। বলা বাহুল্য, সে রাতটাও পুলিসের উপদ্রব হলো না।

তৃতীয় দিনটাও এইরকম নিষ্ফল কাটলো হাসারির। তখন পকেট শূণ্য হয়ে গেছে। কলা কেনার পয়সাও নেই। সারাটা দিন খালি পেটে খোঁজাখুঁজির পর হাসারি যখন স্টেশনে ফিরে এল, তখন বাপের বা স্বামীর গর্ব করার মতন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই মানুষটার। সে তখন যথার্থই একজন নিঃস্ব রিক্ত মানুষ। তার অবস্থা দেখে অলকা পরামর্শ দিল পরদিন সকালে ছেলেমেয়েদের ভিক্ষে করতে পাঠাবে। হাসারির আহত পৌরুষ যেন চাবুক খেল বউয়ের প্রস্তাব শুনে। তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠলো। যেন বলতে চাইল, 'আমরা ভিখিরি নই!' কিন্তু বাস্তব সত্য যা, তাকে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়? আরও একটা দিন অপেক্ষা করেও যখন বাঞ্ছিত মানুষটির খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন নিরুপায় স্বামীর চোখের সামনে দিয়েই ছেলেমেয়েদের ভিক্ষে করতে পাঠিয়ে দিল অলকা। হাসারির মুখ থেকে

একটাও প্রতিবাদের কথা বেরোল না।

বিষণ্ণ, পরাজিত হাসারি ভাঙা মন নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লো। আজ সে ঠিক করেছে সোনার হরিণের খোঁজ করে দিনটা নষ্ট করবে না। বড়বাজারের মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল একটা ছোটখাট কারখানার পাশ দিয়ে। যেতে যেতে সে দেখলো একটা ঠেলাগাড়ির ওপর কুলিরা ভারি ভারি লোহার পাত তুলছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন উবু হয়ে বসে পড়লো আর গলগল করে অনেকটা রক্ত বমি করলো। দৃশ্যটা দেখেই বিমূঢ় হয়ে সেখানেই স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে গেল হাসারি। অতখানি রক্তবমি করে লোকটা মাটিতে নেতিয়ে পড়ে আছে। অন্য কুলিরাও স্তম্ভিত। হঠাৎ কারখানার ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে গালাগালি করতে লাগলো কুলিদের। হাসারির কি মনে হলো তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গিয়ে জানাল যে সে ওর জায়গায় কাজ করতে চায়। একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো মালিক, কারণ মালটা ঠিক সময়ে পৌঁছনো দরকার। মজুরী ঠিক হলো তিন টাকা, তবে টাকাটা সে মাল খালাস করে ফেরার পর পাবে।

কি ঘটলো তা ঠিকমতন বোঝার আগেই হাসারি ঝাঁপিয়ে পড়লো কাজে। অন্যাদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে ঠেলাগাড়ির ওপর মাল তুলতে লাগলো। ঠেলাগাড়িটা নিয়ে কোথায় যেতে হবে স্পষ্ট করে মালিক ওদের বলে নি। সন্তর্পণে ব্যাপারটা সে এড়িয়ে গেছে। ফলে হাসারি খানিকটা মূর্খের স্বর্গে বাস করছিল। তার মনে হচ্ছিল তিনটে টাকা রোজগার করা খুব আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। তাদের গন্তব্যস্থল বেশ দূরে। ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে তাদের যেতে হবে। মাল বোঝাই ঠেলা নিয়ে ওরা ব্রিজে উঠলো। এই পথটুকু উঠতে জন্তুর মত তাদের পরিশ্রম করতে হলো। কিন্তু মাঝবরাবর এসে ঠেলাগাড়ি থেমে গেল। আর এক ইঞ্চিও ঠেলে তোলা যাচ্ছে না ঠেলাগাড়িকে। হাসারির মনে হলো তার ঘাড়ের রক্ত-ধমনীগুলো এবার বোধহয় ছিঁড়ে যাবে। পিছন থেকে একটা পুলিস তাড়া দিচ্ছে। 'আগে বাড়ো! রাস্তা ছোড় দেও!' হাতের বেঁটে লাঠিটা দিয়ে সে ক্রমাগত পিটিয়ে যাচ্ছে ঠেলাগাড়ির গায়ে। পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছে মোটর-গাড়ির হর্ন। শশব্যস্ত হয়ে সবচেয়ে বয়স্ক কুলিটা নিচু হয়ে কাঁধের চাড় দিল একটা চাকার ওপর। আর অন্য সবাই মিলে ঠেলাটা সামনের দিকে ঠেলতে লাগলো। গাড়ি এবার সত্যিই এগোল।

হাসারি সেদিন ফিরলো সন্ধ্যের একটু পরেই। শরীরে আর যেন একটুকু বল নেই। তবে ক্লান্ত হলেও অন্যদিনের মতন একেবারে ফুরিয়ে সে যায় নি। বুকের মধ্যে সূক্ষ্ম গোপন একটা গর্ব সে লুকিয়ে এনেছে। শহরে তার প্রথম রোজগারের টাকাটা দেখিয়ে সবাইকে সে চমকে দেবে। কিন্তু স্টেশনে ফিরে সে নিজেই চমকে গেল। কোথায় সব? আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। সবাই হারিয়ে গেছে যেন। এমনকি বিহারী পরিবারের লোকগুলোও কাছেপিঠে নেই। ধক্ করে কেঁপে উঠলো হাসারির বুকখানা। সারা স্টেশন চত্বর সে প্রায় চষে ফেললো। কিন্ত সন্ধান পেল না। তখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে খুঁজতে লাগলো। শেষমেশ যেদিকটায় বাসগুলো দাঁড়ায়, তার পাশের ফুটপাতের ওপর ওদের বসে থাকতে দেখলো। হাসারিকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো অলকা। ছেলেমেয়েগুলো হতভম্ব হয়ে এক-পাশে দাঁড়িয়ে রইল। হাসারি শুনলো পুলিস তাদের জোর করে স্টেশন চত্বর থেকে বার করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় : ফের ঢুকলে বলেছে জেলে পুরে দেবে।

অহল্যে? এখন কোথায় যাবে তারা? রাত হয়ে আসছে। সবাইকে নিয়ে হাসারি আবার হাঁটতে শুরু করলো। বিরাট হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে শহরে এল। তারপর শুরু হলো অবিরাম পথ চলা। ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে। তাহলেও কলকাতার রাস্তা ফাঁকা হয় নি। তখনও মানুষের থিকথিকে ভিড় এবং চিৎকার ও ঠেলাঠেলি। তারই মধ্যে পথ করে চলেছে গ্রাম বিতাড়িত ক'টা ভাগ্যাবিড়ম্বিত প্রাণী। অলকার পরনের সস্তা শাড়ির খুঁট ধরে চলেছে ছোট মেয়েটা। কোলের ছেলেটাকে কোলে নিয়েছে অলকা। হাসারির হাত ধরে অবাক হয়ে দুপাশ দেখতে দেখতে চলেছে মনোজ। কিন্তু আরও কত পথ তাদের হাঁটতে হবে? তখন রাত বেশ ঘন। দোকানপাটের আলো নিবে যাচ্ছে একে একে। ফুটপাতের ওপর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে অনেক মানুষ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে লোকগুলো সবাই বুঝি মরে গেছে। আরও খানিক চলবার পর ওরা একটা খালি জায়গা দেখতে পেল। পাঁচটি প্রাণী আপাতত সেখানেই থামলো। খানিকটা উন্মুক্ত জায়গার একপাশে একটি তেলেঙ্গি পরিবার সংসার পেতেছে হাঁড়ি, কড়া, উনুন নিয়ে। সংসারের গৃহিণী তাওয়ায় রুটি সেঁকছিল। ওদের দেখে কর্তাকে ইসারা করে কিছু একটা বললো। ওরা হিন্দি ভাষাটা ভাঙা ভাঙা বলতে পারে। হাসারি সেটুকুও পারে না। মহিলা এরপর হাসারিদের সবাইকে একখানা করে গরম রুটি খেতে দিল। ফুটপাতের খানিকটা জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিল হাসারিদের ব্যবহারের জন্য। এই উষ্ণতার ছোঁয়াটুকু পেয়ে যেন বর্তে গেল হাসারি। তার বুকের ওপর জমে থাকা পাথরখানা তাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছিল। এখন তাতে প্রাণের স্পর্শ লাগলো। নতুন করে বাঁচার তাগিদ পেল হাসারি। তার মনে পড়লো আজই বিকেলে সে একটা নিষ্ঠুর সত্য আবিষ্কার করেছে। এই নিষ্প্রাণ শহরটা এত উদাসীন যে কেউ মরে গেলেও তার দিকে ফিরে তাকায় না এ শহরের মানুষ। বরং যে জায়গাটা সে খালি করে গেল, সেটাই ভরাট করতে ছুটছে সবাই। ওই কুলির জায়গাটাও সে এমনি করে ভরাট করেছে। না করতে পারলে তাকে হয়ত পরিণাম ভোগ করতে হতো।

পাঁচ

যে শহরটাকে 'অমানবিক' ভাবতে হাসারির একটুও দ্বিধা হয় নি, সেটা আসলে এক মায়াবিনী শহর। এই কপটী শহরের ছলাকলায় ভুলে একদা প্রায় ষাট লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ এখানে জড়ো হয়েছিল দুটি খেতে পাবার আশায়। কিন্তু ষাটের দশকেও কলকাতা শহরটা এমন নিষ্ঠুর উদাসীন হয়ে ওঠে নি। যদিও অবক্ষয়ের লক্ষণগুলো গত পঞ্চাশ বছর ধরে শহরটায় শরীর বিষিয়ে দিয়েছিল, তাহলেও কলকাতা সেই ষাটের দশকের গোড়ায় এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম এক কর্ম-তৎপর সমৃদ্ধ নগরী ছিল। তার বন্দর আর অসংখ্য শিল্পদ্যোগ, যেমন কাপড় কল, চটকল, ময়দার কল, সার কারখানা, ইস্পাত কারখানা ইত্যাদির জন্যে গড় দিনমজুরীর আয়ের ক্ষেত্রে কলকাতা শহরের স্থান ছিল তিন নম্বর। বোম্বাই এবং দিল্লির ঠিক পরেই। সারা দেশের মোট আন্তর্বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ এবং বহির্বাণিজ্যের পঞ্চাশ ভাগের দায়িত্ব ছিল হুগলী নদীর। যার পূর্বপারে অবস্থিত কলকাতা নামক

শহরটা তিনশ' বছর আগে আচম্বিতে গড়ে উঠে। শহরের ব্যাঙ্কগুলো থেকেই তখনো দেশের সম্পদের শতকরা তিরিশভাগের লেনদেন হতো। এই শহরটা তখন যে আয়কর দিত তার পরিমাণ ছিল মোট ধার্য করের এক তৃতীয়াংশ। একদা যার বাজারচলতি নাম ছিল 'রুর অফ ইণ্ডিয়া', তার আমদানিক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ছিল সারা ফ্রান্সের উৎপন্ন কয়লার দুগুণ এবং লোহা ছিল উত্তর কোরিয়ার সমতুল্য। তখন শহরের কলকারখানা আর গুদামে ঢোকানো হতো এই অঞ্চলের উৎপন্ন প্রভৃত খনিজ দ্রব্য যেমন তামা, ম্যাংগানীজ, ক্রোমিয়াম, বক্সাইট, অভ্র ইত্যাদি। এ ছাড়াও আসতো হিমালয় থেকে নানারকম দামী দামী কাঠ, আসাম এবং দার্জিলিং থেকে চা এবং সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন পাটের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

শহরে যোগানদার অঞ্চল থেকে প্রতিদিন কলকাতার বাজারে যত কাঁচা আনাজ, ফলফুলুরি বা খাদ্যবস্তুর আমদানি হয় তার যোগান অবিচ্ছিন্ন। এই অবিরাম যোগানের প্রধান হলো বাংলার গ্রাম থেকে আসা ধান, বিহার থেকে কাঁচা আনাজ, কাশ্মীর থেকে আপেল, বাংলাদেশ থেকে ডিম, অন্ধপ্রদেশ থেকে মাংস, উড়িষ্যা থেকে মাছ, সুন্দরবন থেকে মধু, পাটনা থেকে তামাক ও পান পাতা এবং নেপাল থেকে পনির। কলকাতা হলো এসিয়ার সবথেকে বৈচিত্র্যময় এবং জীবন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র যার বাজারে পাওয়া যায় প্রায় আড়াইশ রকমের সুতীবস্ত্র এবং পাঁচ হাজার রকম রংয়ের শাড়ি। তবে এখানকার বিপণীতে পেঁছিবার আগে যে বিশাল অঞ্চল পেরিয়ে পণ্যেরা আসে, সেই অনুন্নত অংশে হাসারির মত লক্ষ লক্ষ গরিব চাষী বা মজুররা অত্যন্ত খেলো আয়োজন নিয়ে জীবনধারণ করে। বন্ধ্যা মাটির বুকে যে সর্বনাশা জীবন তারা যাপন করে, তাতে না আছে ছন্দ না আছে বৈচিত্র্য। তাই যখনই সর্বনাশের ছায়া দেখে, তখনই যে পথ দিয়ে পণ্যাদি আসে কলকাতার বাজারে, সেই পথ ধরেই তারাও এসে পেঁছিয় কলকাতার বাজারে সওদা হতে।

ভৌগোলিক যে পরিমণ্ডলে এই শহরটা অবস্থিত সেটা একদিকে যেমন ধনাঢ্য, অন্যদিকে তেমনি মন্দভাগ্য। অনাবর্ষণ বা অতিবর্ষণের প্রভাবে প্রায়ই অঞ্চলটা খরা বা বন্যাকবলিত হয়। তাছাড়া আছে আরও নৈসর্গিক বিপর্যয় যেমন ঝড়তুফান বা ভূকম্পন। ধর্ম নিয়ে দাংগা বা রাজনৈতিক পার্টি চালাচালির ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটে ছেড়ে জড়ো হয় এই শহরে। এই বিরামহীন যাত্রার আর শেষ নেই। পৃথিবীর কোথাও দিনের পর দিন ধরে এমন ভাবে লক্ষ লক্ষ ভিটে ছাড়া মানুষ শুধু আশ্রয়ের সন্ধানে একটা শহরে এসে ভিড় করে নি। ১৯৩৭-এর পনেরোই জানুয়ারি তারিখে বিহারে ভূমিকম্প হলো। মারা গেল কয়েক লক্ষ মানুষ আর যারা বেঁচে রইল তাদের ছুঁড়ে দেওয়া হলো কলকাতার দিকে। এর বছর দুয়েক পরে বাংলায় যে মড়ক হলো তাতে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক মরলো আর কয়েক লক্ষ মানুষ কলকাতায় চলে এল। দেশভাগ হলো ১৯৪৭-এ এবং ভারত স্বাধীন হলো। দুটো ঘটনার দারুণ প্রতিক্রিয়া আত্মস্থ করলো এই কলকাতা শহরটা। কয়েক লক্ষ হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে এসে জুটলো এই শহরে। ১৯৬২ সালে চীনের সংগে এবং পরবর্তীকালে দুবার পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণামটাও পেয়েছিল এই শহর। ১৯৬৫তে এমন ঘূর্ণিঝড় হলো যার ফলে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল এই শহর। এই ঘূর্ণিঝড় ছিল প্রায় দশটা তিন মেগাটোন হাইড্রোজেন বোমার মতন শক্তিসম্পন্ন, যা অনায়াসে নিউ ইয়র্কের মতন একটা শহরের ঘাড় ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলতে পারে। একদিকে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যদিকে বিহারের ভয়াবহ

খরা। ফলে কলকাতাই হয়ে উঠলো মার খাওয়া মানুষের অনিবার্য আশ্রয়। এইভাবে একের পর এক মানুষের ভাগ্যবিড়ম্বনার সঙ্গে শহরটাও বিড়ম্বিত হয়েছে। আশ্রয়ের খোঁজে দলে দলে মানুষ ছুটে এসেছে এই শহরের বুকে। হাসারি পালও আশ্রয়হারা মানুষের সঙ্গে তাই কলকাতার হাতছানি পেয়েই যেন ছুটে এল এই শহরের দিকে।

এইভাবে একটার পর একটা ঢেউ এসেছে আর কলকাতা সবাইকে তার বুকের খোপের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছে। জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে অবস্থা এমন হলো যখন কলকাতা হয়ে উঠলো পৃথুল একটা মানুষের পিণ্ড, যার আকার নেই, রঙ নেই। ফলে এক কোটি মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা বরাদ্দ হলো মানুষ পিছু বারো বর্গ ফুট। আর চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ ছন্নছাড়া মানুষ, যাদের সেটুকুও জুটলো না, তারা বস্তিঘরের তিন বর্গ ফুট আশ্রয়ের শাসন মেনে নিয়ে আত্মতৃপ্ত হয়ে রইলো। পরিণামস্বরূপ পৃথিবীর সেরা অবক্ষয়িত শহরের একটা হয়ে উঠলো কলকাতা। ফলে এই গুপ্ত ক্ষয়ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়া শহরটা কখন যে তার দশ-বিশতলা উঁচু বাড়িগুলো নিয়ে ভেঙে পড়বে কেউ বলতে পারে না। সেই আসন্ন অমঙ্গলের আঁচটা মাঝে মাঝে আগাম পাওয়া যায়, যখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে একটা পুরনো বাড়ি, তার টলমলে ছাত, জরাজীর্ণ দেওয়াল আর ভাঙা পাঁচিল নিয়ে। বট অশ্বত্থের বড় বড় শিকড় গভীর হয়ে গেঁথে গেছে এইসব বাড়ির দেওয়ালে আর চাড় দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছে। এক একটা অঞ্চলের চেহারা এমন ভাঙা-চোরা যে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি বোমা-বিধ্বস্ত হয়েছে জায়গাটা। নতুন করে গড়ে তোলার কোনো প্রয়াসও নেই, আর সেইজন্যই ধসা পাঁচিল ও ভাঙা বাড়ির দেওয়ালগুলো হয়ে উঠেছে রাজনীতির শ্লোগান, পোস্টারের প্রদর্শনী বোর্ড। সব-চেয়ে মারাত্মক হলো অবলীলায় পড়ে থাকা শহরের আবর্জনা ও জঞ্জালের স্তূপ। এই জঞ্জালের স্তূপ ক্বচিৎ অপসারিত হয় ; অন্যথায় রোগজীবাণুবাহী লক্ষ লক্ষ মশা, মাছি এবং কীটের সূতিকাগারে পরিণত হয় এই স্তূপ।

গ্রীষ্মের সময় এই বহুব্যাধিগ্রস্ত আবর্জনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে রোগ মহামারী। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওলাওঠা বা সান্নিপাতিক রোগে মারা যাওয়াটা খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। তখন দৈনিক বা মাসিক কাগজে লেখালেখি করে অনেক প্রতিবাদ উঠেছে কিন্তু অবস্থার তেমন সুরাহা হয় নি। ক্রম-উপচীয়মান আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্গত বিষবাষ্প আজও মানুষের নাকে আসে এবং শরীর অবসন্ন হয়ে যায় সেই কলুষ-ঘ্রাণ নিয়ে। আজও শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামত না হয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকে। মাটির তলার ফাটা পয়ঃপ্রণালী আর ফাটা জলের পাইপ থেকে চুঁইয়ে পড়া জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সব মিলিয়ে কল-কাতার চালচিত্রটি আজও কোন নতুন আশ্বাস বয়ে আনে না মানুষের মনে। কলকাতা হয়ে ওঠে এক 'মুমূর্ষু নগরী'।

তবুও মানুষ যেন উপচে পড়ছে এই শহরে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ঘরহারা মানুষ এর রাজপথ, কানাগলি আর ফুটপাতের ওপর আছড়ে পড়ছে। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, পথেঘাটে সওদা নিয়ে বসছে জীবিকা অর্জন করতে এবং শহরবাসের কোন নিয়ম না মেনে যত্রতত্র সংসার করছে। রাজপথ হয়ে উঠছে এলোমেলো এখানে ওখানে গজিয়ে উঠছে মন্দির ; মানুষ আর গাড়ির জটলায় ভয়াবহ যানজট তৈরি হচ্ছে অহরহ আর নিয়মিত পথ দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে পথ-

চারী। পথঘাটের যেখানে সেখানে বসে মানুষ মলমূত্রাদি ত্যাগ করছে আর প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় স্নানাদি করছে অথচ একটুও অপ্রতিভ হচ্ছে না।

সেই সব দিনগুলোতে প্রত্যেক দশটি পরিবারের মধ্যে অন্তত সাতটি পরিবারের গড় আয় ছিল দৈনিক দুটাকা, যা দিয়ে এক সের চালও কেনা যেত না। কলকাতা যে সত্যিই নিষ্ঠুর আর অমানুষ শহর, হাসারি সেই সত্যটি আবিষ্কার করে ফেলেছিল শহরে পা দিয়েই। ফুটপাতে পড়ে থাকা মুমূর্ষু মানুষের দিকে তাকিয়েও দেখছে না উদাসীন মানুষেরা। নির্বিবাদে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ মাঝে মাঝে বিপ্লবাগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠছে শহরে। তখন চড়া সুরে মানুষ সাম্যবাদের শ্লোগান দিচ্ছে, হচ্ছে রাজনৈতিক হাঙ্গামা। মারখাওয়া মানুষের বাঁচার স্বপ্ন যে সাম্যবাদের মধ্যে নিহিত, সেই সত্যটা সগৌরবে ঘোষিত হচ্ছে। কলকাতায় ক্ষুধার লড়াইয়ের পাশাপাশি হয় সাম্প্রদায়িক লড়াই, তখন মুখ্য অনুভূতি হয় মানুষে মানুষে অবিশ্বাস। কিন্তু সবচেয়ে অসহ্য হলো এখানকার আবহাওয়া। টানা আটমাস দারুণ তাপে শরীরে জ্বালা ধরে। মনে হয় সব শুকিয়ে গেছে। নাই রস নাই। তখন রাস্তার পিচ গলে, হাওড়া ব্রিজের ধাতব অংশ দিনের বেলা চার ফুট স্ফীত হয়। তখন মনে হয় যথার্থই এই শহরের আরাধ্যা দেবী কালী, যিনি দিগম্বরা যিনি শিবোপরি আরূঢ়া, যিনি মুণ্ডমালিনী ভয়ংকরী। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে মাঝে মাঝে তাই এই সর্বনাশা অবস্থার কথা সাড়ম্বরে লেখা হয়, তখন মনে হয় বোধহয় ক্রোধ ছাড়া এ শহরের আর কিছু দেবার নেই।

অথচ এই মহানগরীর একটা ঐতিহ্যপূর্ণ অতীত আছে এবং কলকাতার পুরনো মানুষরা সেই মর্যাদাময় অতীতটার কথা মনে করে শ্লাঘা বোধ করে। সেই মর্যাদাময় অতীত হলো শ্বেতকায় ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের মোহ। কিছু ইংরেজ বণিকের খেয়ালীপনায় কলকাতার জন্ম হয়েছিল ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই জন্মলগ্ন থেকে ১৯৪৭-এর পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত বণিকের হাতের মানদণ্ডটি ধীরে ধীরে কেমন করে রাজদণ্ডে পরিণত হলো তার নীরব সাক্ষী এই কলকাতা মহানগরী। প্রায় আড়াইশো বছর ধরে কলকাতা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের স্বপ্নের শহর। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই শহর থেকেই শাসন চালিয়েছে ইংরেজ বড়লাটেরা। তখন এই দেশের জনসংখ্যা আজকের মার্কিন মুল্লুকের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি ছিল। তখন কলকাতার রাজপথ দিয়ে ইংরেজ সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ করে যেত। অভিজাত ইংরেজ রমণী ফিটন গাড়ি চড়ে বা শিবিকায় বসে রাজপথ দেখতে দেখতে যেত যেমন যেত লণ্ডনের ম্যালে। বিধ্বস্ত কলকাতার বুকে এখনো সেইসব প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে যাদের মোটা মোটা থাম্মা আর সুদৃশ্য ঝুলবারান্দাগুলি দেখে সেই ঐতিহ্যবাহী অতীতটা মনে পড়ে যায়। যে সরণী দিয়ে একটা (১৯১১) সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং রানী মেরী সোনার পাত মোড়া শকটে চড়ে দু সারি গোরা হাইল্যাণ্ডার সৈন্যব্যূহের মধ্য দিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তারই শেষ প্রান্তে প্রায় ত্রিশ একর জমির হৃদয়স্থল থেকে উঠেছে জমকাল এক প্রাসাদ-ভবন। ১৩৭ কক্ষবিশিষ্ট এই প্রাসাদে থাকতেন তখনকার ইংরেজ বড়লাটবাহাদুর। এর আধুনিক নাম রাজভবন। ইংল্যাণ্ডের সুদৃশ্য কেড্‌ল্‌স্টোন ভবনের আদলে এই রাজভবন তৈরি হয়। মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া এর বিশাল ড্রয়িংহলের ভিতরের রূপসজ্জার ক্ষেত্রে লর্ড ওয়েলেসলীর অনেক অবদান আছে। তাঁরই প্রত্যক্ষ উৎসাহে বারো জন সিজারের আবক্ষ

মূর্তি এই ঘরে বসানো হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যাহিত পরেই বাংলার রাজ্যপালের সরকারী বাসভবনরূপে এই প্রাসাদ-ভবনের হস্তান্তর হয় নি। সেই অন্তর্বর্তী সময়ে রাজভবনে যেমন বিলাসবহুল খানাপিনা হতো তা আমাদের সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। উৎসব সন্ধ্যায় মহামান্যা ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি, রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসতেন। তাঁকে ঘিরে থাকতো উর্দী পরা সেনানায়ক আর তাদের সহকারীরা। দুজন ভারতীয় বেহারা রাজপ্রতিনিধির মাথার ওপর সিল্কের টানাপাখা ব্যজন করতো। আর সামরিক রক্ষীরা হাতে রূপার পাত মোড়া বল্লম নিয়ে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতো।

এমন দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যমণ্ডিত সুরম্য ভবন আরও আছে এ শহরে। কোথাও কোথাও সাধারণ মানের ঘরবাড়ির ভিড়ে তারা হারিয়ে গেছে। এইরকম এক মনোরম উদ্যানভবন হলো-ক্রিকেট মাঠের স্টেডিয়ামটি। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে এই মাঠেই প্রাচ্যের প্রথম ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একদিকে ক্যালকাটা টিম অন্যদিকে ইটন্ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সেদিন যে খেলাটি হয়, তাতে ক্যালকাটা টিমের অধিনায়ক ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ওয়াল-পোলের নাতি। এর অনতিদূরেই রয়েছে পরিখা বেষ্টিত উন্নত কেল্লাভবন। আটশ' একর ভূমির উপর গড়ে উঠেছে কেল্লানগরী এবং পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গংগা নদীর পবিত্র জলধারা। এই কেল্লাভবনের নির্ম্মাণ-সৌকর্য দেখবার মত। জমকাল এই কেল্লাভবনটি তৈরি হয়েছিল তিনটি অস্ত্রাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে। কেল্লাভবনের নাম ফোর্ট উইলিয়াম। বস্তুত, এশিয়ার মাটিতে ইংরেজদের বিপুল রাজতন্ত্রের সযত্ন রক্ষক ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম।

তবে প্রাচীন গৌরবময় স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি হলো ময়দানের অপর দিকের বিস্ময়কীর্তি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার তেষট্টি বছরের রাজত্বকালটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্যেই এই স্মারকভবন ভারতবর্ষের জন-সাধারণের দানে তৈরি হয়েছিল। এই মহামতী সম্রাজ্ঞী মনে করতেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের ভাল করার এক দৈবী প্রেরণা তাঁর মধ্যে মূর্ত আছে এবং শ্বেতকায় মানুষদের প্রতিভূ হয়ে তিনি সেই সদিচ্ছা পালন করছেন। আধুনিক ঢংয়ের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর রুচিহীন জঞ্জালের মধ্যে এই মার্জিতরুচির ভবনটিতে সমাদরণীয় নানারকম শিল্পবস্তুর সংগ্রহশালা আছে। অবশ্য এই শিল্পসংগ্রহগুলি ঔপনি-বেশিক রক্ষণশীলতার গণ্ডী কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তা না পারলেও শিল্প-বস্তুর এমন সুনিপুণ নির্বাচন সচরাচর দেখা যায় না। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই অভিজ্ঞান শিল্পবস্তুগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে আজকের কালের মানুষ তাদের চুলচেরা বিচার করে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে অনেক-গুলো গৌরবময় ভাগ আছে। সেই সব গৌরবময় অধ্যায়গুলো ঘটা করে দেখানো হয়েছে সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্তি বসিয়ে। সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্তির সঙ্গে রাজপ্রতিনিধি-দের প্রতিমূর্তিও সেখানে প্রদর্শিত আছে। তাছাড়া আছে কীপলিঙ্-এর একখানা তৈলচিত্র। আছে গোল হাতলওলা বক্রাগ্র তরবারি। তরবারির গোল হাতলটাতে সোনা ও দামী পাথর বসানো। এই সব তরবারি দিয়েই ব্রিটিশ জেনারেলরা একটার পর একটা যুদ্ধ জয় করে তাদের রাজার হাতে সোনার ভারত তুলে দিয়েছিল। আর আছে সাতসমুদ্রপারের মানুষদের জন্যে মহারানী ভিক্টোরিয়া যে ভালবাসার বাণী পাঠিয়ে-ছিলেন, তার পাণ্ডুলিপিটি।

গরমকালের নির্দয় তাপ, নানারকম রোগ মহামারী, সাপ, শেয়াল বা রাতবিরেতে বাঘ হায়নার উপদ্রব সত্ত্বেও কলকাতা তার ভাগ্য নয়ন্তা ইংরেজবাবুদের জন্যে মোটা-মুটি সহজ আর শৌখিন জীবনধারা উপহার দিয়ে এসেছে। প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে ইংরেজবাবুরা দিন শুরু করতো ঘোড়ায়টানা ফিটন্ গাড়ি চড়ে মসৃণ রাজপথ দিয়ে বেড়িয়ে। তারা বেড়াত অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়ায়, ম্যাগনোলিয়ার নিবিড় ঝোপে কিংবা শালবীথির তলায়। পরের যুগে ফিটন্ গাড়ির জায়গা নিল মাথা খোলা মোটর গাড়ি। বড়দিনের সময় কলকাতার ময়দানে যেন আমোদের হাট বসতো। ঘোড়দৌড়, পোলো, রেস আরও কত যে প্রলোভন ছিল তার ইয়ত্তা নেই। মোহিনী কলকাতার হাতছানি উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না বাবু ইংরেজদের। আসতো বিলা-সিনী ইংরেজ রমণীরাও। প্যারিস ও লণ্ডনের হাল ফ্যাশনের পোশাকের আমদানি হতো এই কলকাতাতেই প্রথম। বিলাসিনী রমণীকুল কিংখাব ও মস্‌লীনের অংগ-বাসগুলি পরে তাদের নিভৃত বিলাসকক্ষে মোহিনী সাজে সাজতো। ম্যালভেন্ট এবং সীরেট নামে দু'জন বিখ্যাত ফরাসী কেশচর্চাকারের বিলাসবহুল বিপণি ছিল এই সব বিলাসিনীদের আড্ডাস্থল। শোনা যায় সেকালের কোনো এক তীক্ষ্ন ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন ধনী ব্যবসায়ী প্যারিস থেকে এই দু'জন বিখ্যাত কেশকারকে কলকাতায় এনে ব্যবসা শুরু করে।

এমন নিঃসংকোচ আমোদের হাট প্রাচ্যের আর কোনো শহরে ছিল না বলেই কলকাতাকে বলা হতো 'প্যারিস অব দি ইস্ট'। তখন কোনো সরকারী পার্টি'ই নদী-বক্ষে বিহার ছাড়া জমতো না। আঁকাবাঁকা নদীপথে সাহেবরা প্রমোদভ্রমণে বেরোত। প্রায় জনা চল্লিশ মাঝিমাল্লা মাথায় লাল-সবুজ পাগড়ি পরে নৌকা বাইত। তাদের গায়ে থাকতো সাদা ফতুয়া। কোমরে জড়ানো থাকতো সোনালী চাদর। মাঝে মাঝে নদীর ধারের রাস্তা দিয়েও তারা বিলাস-ভ্রমণ করতে বেরোত ইডেন গার্ডেন পর্যন্ত। শোনা যায় প্রাচ্য-স্থাপত্যকলার অনুরাগী কোনো একজন বড়লাট ইডেন গার্ডেনটিকে মনোরম করতে সুদূর বর্মা মুল্লুক থেকে একটি প্যাগোডা আনান। তখন ইডেন গার্ডেনে রোজ সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর বাদ্যবাদনের অনুষ্ঠান হতো। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্যে এই ঐকতান বাদনের নিয়মিত অনুষ্ঠান হতো। সন্ধ্যের পর ইংরেজ রাজপুরুষরা তাস খেলতে যেত কাছাকাছি কোনো ক্লাবে। কলকাতায় সে সময় এমন অসংখ্য ক্লাব ছিল যেগুলো পুরোপুরি ইংরেজদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। ক্লাবে ঢোকার মুখে নির্দেশনামা টাঙানো থাকতো, 'কুকুর এবং ভারতীয়দের জন্যে নিষিদ্ধ।' এই নির্দেশনামা ছিল ব্রিটিশ কলকাতার প্রকাশ্য গর্ব। এরপর শুরু হতো নাচগান এবং পানাহারের পর্ব। চৌরঙ্গী হাউসের বিলাসবহুল বলরুমের কাঠের মেঝের ওপর অনুষ্ঠিত হতো উদ্দাম বলনাচ। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত চলতো খানাপিনা। শুধু খানাপিনা আর নাচগানে যাদের অরুচি, তাদের জন্যে নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। তখন থেকেই কলকাতার সমাদর ছিল এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে। রোজ সন্ধ্যায় তখন নিউ প্লে হাউস নাট্যমঞ্চে সেক্সপীয়ারের একটা করে নাটকের অভিনয় হতো। তাছাড়া তৎ-কালীন লণ্ডনের সর্বাধুনিক নাট্যপ্রযোজনাগুলোও কলকাতার অনেকগুলো মঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হতো। 'ক্যালকাটা' নামক গবেষণা বইতে জিওফ্রে মুরহাউস নামে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লিখেছেন যে এই শতাব্দীর গোড়াতে মিসেস রিস্‌টৌট নামে ইংরেজ সমাজের উঁচুতলার একজন রুচিশীল মহিলা তাঁর বাস-

ভবনের বিরাট বৈঠকখানাটি মঞ্চে রূপান্তরিত করে দেন। শুধু তাই নয়, ইউরোপের নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় যে নাট্যপ্রযোজনাগুলো উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয়েছে সেগুলো এখানে অভিনীত হতো। পুরনো ওল্ড থিয়েটারের মঞ্চটি ধন্য হয়ে আছে অ্যানা প্যাভ্‌লভার একটি নৃত্যানুষ্ঠানের স্মৃতি বুকে ধারণ করে রাখার জন্যে। নাচের জগত থেকে বিদায় নেবার কিছু আগে প্যাভ্‌লোভা কলকাতায় আসেন এবং নাচের অনুষ্ঠানটি করেন। দি ক্যালকাটা সিম্‌ফোনি অর্কেস্ট্রার পরিচালনায় প্রতি রোব-বার যে কনসার্ট বাজতো তার স্রষ্টা ছিল একজন বাঙালী সওদাগর। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুকাল পরেই এশিয়ার প্রথম থ্রি স্টার রেস্তোঁরা কলকাতা-তেই চালু হয়। চৌরঙ্গী রোডের ওপর এই তিন তারা ফির্‌পো রেস্তোঁরা ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কলকাতার অভিজাত সমাজে সুস্বাদু এবং উপাদেয় ভোজ্যবস্তু রান্নার জন্যে বিশেষ সমাদর পেয়ে এসেছে। কলকাতার ইংগ-বংগ সমাজ ফির্‌পোর তৈরি খাবার খেয়ে আনন্দে আত্মহারা হতো। সেন্ট পল্‌স্‌ গির্জায় একটা পৃথক আসন রাখা যেমন মর্যাদার ব্যাপার ছিল, তেমনি সব আত্মসচেতন ইংরেজ ফির্‌পোর ডাইনিং হল-এ একটা ডিনার টেবিল সংরক্ষিত রাখতো। ফির্‌পো রেস্তোঁরার ডাইনিং হলটি ছিল ইংরিজি এল হরফের মত। এর মালিক ছিল একজন ইতালিয়ন এবং সেই-ই ছিল সর্বেসর্বা। তার মেজাজটিও ছিল রাজা-উজিরের মত। কারো চেহারা বা পোশাক মনের মতন না হলে তাকে অপদস্থ হতে হতো। ফির্‌পো বলরুমটি সারা এশিয়াব শ্বেতকায়দের কাছে এক অনিবার্য রোমান্টিক আকর্ষণ ছিল।

এ হলো কলকাতার বিদেশী সমাজের একটা ছবি। পাশাপাশি আর একটা ছবিও কম মনোজ্ঞ নয়। অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন বাঙালী সংস্কৃতিটি কলকাতা শহরের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক। আঠারো শতক থেকেই কলকাতা হয়ে উঠেছে দেশের মণীষীদের সাধনভূমি। এঁদের মধ্যে দার্শনিক আছেন, বিজ্ঞানসাধক আছেন আব আছেন কবি, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ। অর্থাৎ সংস্কৃতির সব দিকেই বরেণ্য মানুষদের স্বভূমি হয়ে আছে কলকাতা। প্রাচ্যের প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতাব মানুষ মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিজ্ঞানসাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আন্ত-র্জাতিক নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এই কলকাতাতেই কাজ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের মত এমন মহান দুজন অধ্যাত্মবাদী সাধকের সাধনপীঠ ছিল এই কলকাতাই। এই ধারাবাহিকতা আজও অম্লান। একালের আর একজন অধ্যাত্ম-সাধক হলেন শ্রীঅরবিন্দ। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে মৌল গবেষণা এবং আধুনিক চলচ্চিত্র নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম এ কালের কল-কাতার এক বিশেষ অবদান।

ভাগ্যের ফেরে কলকাতা তার মর্যাদার আসন থেকে একেবারে বিচ্যুত হয় নি। আজও সারা দেশের সৃষ্টিশীল মানুষ কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতা আজও সারা দেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে আলোক-মন্দির হয়ে আছে। আর সেইজন্যেই কলকাতা আজও জীবন্ত। কলেজ স্ট্রীটের শতশত বইয়ের দোকানগুলি আজও ঠাসা থাকে পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তান্দোলনের স্মারকগ্রন্থে। সর্বকালের মানুষের হৃদয়ের কথা লুকিয়ে আছে এখানকার হাজার হাজার ছাপা বই, ইস্তাহার আর দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে। শুধু ইংরিজি নয়, ভারতীয় সব ভাষা এবং ইওরোপীয় অনেক ভাষার চিন্তাশীল রচনা এখানে পাওয়া যায়। কলকাতার মোট জনসংখ্যার মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলা। কিন্তু বাঙালী লেখকের

সংখ্যা রোম বা প্যারিসের মিলিত লেখক সংখ্যার চেয়ে বেশি। বাঙলা ভাষায় যত প্রবন্ধ পুস্তক আছে, তত আলোচনাগ্রন্থ লণ্ডন বা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় না। এখানকার প্রকাশকের সংখ্যাও দেশের অন্য শহরের প্রকাশকের চেয়ে বেশি। এখানকার নাট্যমঞ্চে নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনা হয়। নিয়মিত উচ্চাংগ সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। এই সব অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতারী রবিশংকর যেমন অংশ নেন, তেমনি অংশ নেন অখ্যাত এবং সাদামাটা শিল্পীরাও। সারা দেশে যত অপেশাদার নাট্যসংস্থা আছে, তাদের অর্ধেকের শিকড় রয়েছে এই শহরের মাটিতে। এমনকি সংস্কৃতিবান বাঙালী দাবি করে যে, ইংরেজদেরও অনেক আগে ন্যলীয়রের নাটক তারাই বাঙালীর ঘরে ঘরে পেঁীছে দিয়েছে।

তবে হাসারির মত লক্ষ লক্ষ ভিটে ছাড়া মানুষের কাছে কলকাতার এই অতুচ্চ সংস্কৃতি বা তার ঐতিহ্যময় অতীতের কোন দাম নেই। তারা কলকাতায় এসেছে ক্ষুন্নিবৃত্তির দুটো খুদকুঁড়ো পাবে এই আশা নিয়ে। যে আশা তাকে পরদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়। এতবড় শহরটায় দুটো রুটির টুকরো বা ভাতের কণা পাওয়া যায় বৈকি ! নইলে জলে ডুবে যাওয়া বা খরায় শুকিয়ে যাওয়া ভিটেমাটি ছেড়ে লক্ষ লক্ষ ভাঙাচোরা মানুষ শহরের দিকে ছুটে আসবে কেন?

ছয়

আরও একটা দিন অনর্থক খোঁজাখুঁজি করলো হাসারি, কিন্তু বড়বাজারের কোথাও গ্রামের সেই চেনা মানুষের হদিস পেল না। সন্ধ্যের মুখে ফিরে এল তার ফুটপাতের সংসারে। তবে সেদিন তাকে সফল মানুষের মতন দেখাচ্ছিল। মুখের হাসিটা দেখে অলকারও তাই মনে হলো। তার ধারণা হলো মানুষটা নিশ্চয় সফল হয়েছে। হয় গ্রামের চেনা মানুষটার খোঁজ পেয়েছে, নয়ত কাজের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু হাসারি কিছুই পায়নি। সে যা পেয়েছে তা অন্যরকম অনুভূতি। ছেলে-মেয়েদের জন্যে কিছু নিয়ে আসার যে তৃপ্তি বাপের মুখে ফুটে ওঠে, সেই তৃপ্তি খানিকটা চুরি করে নিয়েছে হাসারি। দু ঠোঙা মুড়ি কিনে এনেছে ছেলেমেয়েদের জন্যে। মুড়ির দানাগুলো বেশ শক্ত। অনেকক্ষণ লাগবে চিবোতে। অন্তত অনেক-ক্ষণ ধরে দাঁতগুলো চিবোনোর কাজ করতে পারবে। সবাই মিলে ভাগ করে মুড়ি চিবোনোর আনন্দ উপভোগ করলো ওরা। ছোট ছেলেটাকে ডেকে তার হাতে নিজের ভাগের ঠোঙাটা তুলে দিল হাসারি। ছেলেটা যেন কৃতার্থ হলো। আরও খানিকটা মুড়ির জন্যে সে করুণ চোখে চেয়েছিল।

কিন্তু স্বামীর দিকে চেয়ে অলকার বুকটা দুমড়ে উঠলো। সব ঘরেই সংসারের কর্তার জন্যে আলাদা যত্নআত্তির ব্যবস্থা থাকে। কারণ, তার পরিশ্রমেই সংসারের চাকা ঘোরে। কলকাতায় আসার পর থেকে হাসারির দাম কমে গেছে। এখন সে ফুটপাতের মানুষ। গালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। দুই গালে গভীর দুটো গর্ত। অমন কালো চকচকে চুল ভাবনা চিন্তায় সাদা হয়ে গেছে। কেমন যেন অকালে বুড়িয়ে গেল মানুষটা। হায় হায় করে উঠলো অলকার মন। হাসারি তখন তার শরীরটা টানটান করে ছড়িয়ে দিয়েছে ফুটপাতের ওপর। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা গোপন নিশ্বাস ফেললো অলকা। মনে পড়ে গেল বিয়ের সময়কার

সেই সমর্থ সুশ্রী চেহারাটা। পালকি থেকে বর নামতেই সবাই হাঁ করে হাসারির দিকে তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, সত্যিই বরের মতন দেখাচ্ছিল হাসারিকে। অলকাদের বাড়ির সামনে তেরপল টাঙানো হয়েছে। বরকে সবাই তেরপলের নিচে নিয়ে এল। পুরোহিতমশাই মাথায় তুলসীপাতা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অলকার বেশ মনে পড়ে ছবিটা। অনুষ্ঠানের পর অলকার মা, খুড়ীমারা যখন তাকে অপরিচিত হাসারির কাছে বসিয়ে দিয়ে গেল, তখন ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল তার। অলকার তখন সবে পনেরো চলছে। হাসারি তখন বোধহয় আঠারো বছর বয়সের যুবক। ওরা বিয়ের আগে কেউ কাউকে দেখে নি। তাই অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়েছিল হাসারি। তারপর আস্তে আস্তে নাম জিজ্ঞেস করলো। আরও একটা কথা বলে-ছিল ও। অলকার মনে আছে কথাটা। সারা জীবন মনে থাকবে। হাসারি বলেছিল, 'তুমি কি সোন্দর দেখতে! আমায় তোমার পছন্দ হয়?' অলকা শুধু মুখ টিপে হেসেছিল। কোন জবাব দেয় নি। বিয়ের দিন বউকে বেশি কথা বলতে নেই। লোকে বেহায়া বলবে। তবে স্বামীকে ভাল লেগেছিল তার। তাই একটু একটু সাহস নিয়ে সেও একটা কথা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল স্বামীকে। 'তুমি লিখতে পড়তে জানো?' হাসারি ছোট্ট জবাব দিয়ে বলেছিল, 'না।' তারপর ঈষৎ গর্ব করে বলেছিল, 'আমি অনেকরকম কাজ জানি।' হবেও বা। তবে স্বামীর অমন দৃঢ় জবাবটা শুনে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল তার দিকে অলকা। আজ তার মনে পড়ছে সে কথা। তাকিয়েছিল অবাক হয়ে। তাদের বাড়ির পাশের অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িটার মতন সবল আর নির্ভরশীল মনে হয়েছিল হাসারিকে। অলকাকে তিনটে ছেলেমেয়ে উপহার দিয়েছে যে সবল নিরেট মানুষটা, তার এই হাল হয়েছে এখন। দারুণ ভেঙে গেছে শরীরটা হাসারির। কেমন যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে চেহারাট। অথচ সেই বিয়ের রাতের মানুষটা ছিল ঠিক বিপরীত। যে ভাবে সাঁড়াশির মতন তাকে জাপটে ধরেছিল, ভয় পেয়ে গিয়েছিল অলকা। যদিও মা-খুড়ীমারা কি সব বলে দিয়েছিল, কিন্তু অলকার তখন কিছুই মনে পড়ে নি। সে শুধু থরথর করে কাঁপছিল। শেষ পর্যন্ত হাসারিই তার ভয় ভাঙিয়ে দেয়। জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভয় কি তোমার? আমি তোমার সোয়ামী না! আর তুমি আমার কে জানো? তুমি হবে আমার ছেলেমেয়ের জননী।'

ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে পুরনো কথাগুলো ভাবছিল অলকা। হঠাৎ কাছে-পিঠে কোথা থেকে তুমুল চেঁচামেচির শব্দ পেল সে। হাসারিদের ফুটপাতে জায়গা দিয়েছে যে মাদ্রাজী পরিবারটি চেঁচামেচিটা সেখান থেকেই উঠছে। একটু আগে ওরা জানতে পেরেছে ওদের মেয়ে মায়া তখনও ফেরে নি। ভারি মিষ্টি আর নরম গড়ন মায়ার। পিঠের ওপর নেমেছে একরাশ কাল চুল। চোখ দুটিও তেমনি কাজলকালো আর গভীর। রোজ সকালে মায়া চৌরঙ্গীর বড় হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে। বিদেশী মানুষরা ওই সব হোটেলে ওঠে। ওদের টাকাও অনেক। ইচ্ছে করলেই ওরা কাউকে দু-দশ টাকা দিতে পারে। কিন্তু ওখানে সবাই ভিক্ষে করতে পারে না। ওটা নাকি সোনার খনি এবং এই অঞ্চলের অবাধ মালিকানা এমন একটা দলের হাতে দেওয়া আছে, যাদের অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ হাত পাততে পারে না। মায়া সেই দলের কৃপা পেয়েছে। সারাদিন দাঁড়িয়ে সে যা পায় তার সবটা তুলে দেয় দলের পাণ্ডার হাতে। বদলে সে রোজ-খোরাকি পায় পাঁচ টাকা। মায়ার অনেক ভাগ্যি তাই এই কৃপাটুকু পেয়েছে। সাধারণত সবল

সুস্থ মানুষ দিয়ে ভিক্ষে করায় না। হাত-পা ভাঙা মানুষ বা বিকলাঙ্গ বাচ্চা ছেলে-দের দিয়ে এরা ভিক্ষে করায় যাতে বিদেশী লোকগুলোর সহানুভূতি মেলে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের চাকাওলা কাঠের গাড়িতে বসিয়ে কিংবা মায়ের কোলে হাড়জিরজিরে পাখির ছানার মতন শুকনো শিশুকে দিয়ে ভিক্ষে করায়। শোনা যায় এই সব খঞ্জ বিকলাঙ্গ শিশুদের নিয়মিত যোগান দেবার একটা দল আছে কলকাতায়। তারা শিশু চুরি করে এবং বিকলাঙ্গ ক'রে মোটা টাকায় বিক্রি করে।

যুবতী মায়ার বড় সংকোচ হতো এমন দীনভাবে নিজেকে মেলে ধরতে। তার মনে হতো সে যেন নারীত্বের অবমাননা করছে। তাই রোজ সকালে ভিক্ষে করতে যাবার আগে সে মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো। কিন্তু ফুট-পাতের সংসারে মানবাত্মার এই চরম অপমান আর লাঞ্ছনার দৃশ্যটি বিরল নয়। শুধু পেট ভরাবার দু-মুঠো অন্ন যোগাড় করতে কত মানুষ নিজেকে ছোট করছে তার হদিস কে রাখে! তবুও মায়া সংসারকে ঠকায় নি। সে জানতো তার রোজগার করে আনা পাঁচটা টাকার অনেক দাম। অন্তত বেঁচে থাকার আর না খেয়ে মরার মধ্যে একটা যে তফাত আছে যেটা বুঝিয়ে দিত তার আনা পাঁচটা টাকা।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলায় মায়া ফিরলো না। ক্রমশ রাত বাড়তে লাগলো কিন্তু মায়ার দেখা নেই। মায়ার বাপ-মা দুজনেরই দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগলো। কি হলো মেয়েটার কে জানে! ভরা যুবতী মেয়ে, দেখতে শুনতে ভাল। শহরের রাস্তায় এমন মেয়েদের দিকে বিপদগন্ধ শুঁকে শুঁকে আসে। ওরা একবার উঠছে বসছে, একবার আনমনে হাঁটছে আর দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে কি সব বলছে। হয়ত বা অভিসম্পাত দিচ্ছে নিজেদের ভাগ্যকে। মাস তিনেক হলো তারা ফুটপাতে সংসার পেতেছে। এই তিনমাসে তারা শিখেছে জেনেছে অনেক। শহরের রাস্তায় বেওয়া-রিস যুবতী মেয়েদের কপালে কি ঘটে তারা এখন জানে। ওত পেতে আছে শিকার-সন্ধানী আড়কাঠি। যুবতী মেয়েদের ফুসলে চেনা গণ্ডীর বাইরে বের করে আনে তারা। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ কিংবা আরব দেশের বড় বড় শহরের মেয়েধরা চক্রের হাতে তাদের বেচে দেয়। হতভাগ্য মেয়েগুলোর ভাগ্যে এরপর কি ঘটে জানা যায় না। যারা অতটা মন্দভাগ্য নয় তাদের কলকাতারই বেশ্যালয়ে চালান করে।

ফুটপাতের প্রতিবেশী এই পরিবারটির এমন দুরবস্থার সময়ে অলকা চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। ঘুমন্ত স্বামীকে ডেকে সব বললো। সব কথা শুনে হাসারিও অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলো। তার মনে হলো মেয়েটাকে খুঁজে বের করা দরকার। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গুম্ হয়ে যাবে মেয়েটা। সুতরাং মায়ার বাপকে সঙ্গে নিয়ে হাসারি খুঁজতে বেরোল অন্ধকারে। কিন্তু গভীর রাতে অন্ধকার রাস্তা এবং অলিগলি ধরে মানুষ খুঁজে বার করা মোটেই অনায়াস কাজ নয়। রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে মানুষ। সব পথই একরকম মনে হচ্ছে অন্ধকারে। জটিল এই গোলকধাঁধায় না হারিয়ে থাকাটাও রীতিমত কঠিন ব্যাপার বিশেষ তাদের মত গ্রামের মানুষদের পক্ষে যারা সরল এবং চেনা জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

পুরুষ দুজন বেরিয়ে যাবার পর অলকা এসে বসলো মায়ার মা'র পাশটিতে। মায়ার মা'র বসন্ত দাগ ধরা শুকনো গাল বেয়ে অঝোরে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। অলকাও চুপচাপ। কি সান্ত্বনা সে দেবে এই মহিলাকে! মায়ার মা'র কোলে আরামে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা। অন্য বাচ্চা দুটো ফুটের ওপর শোয়ানো। তাদের গায়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো। ওরাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পৃথিবীর কোনো

আলোড়নই ওদের এই সাধের ঘুম থেকে জাগাতে পারবে না। ঘুমের দেশের গাম্ভীর মায়ায় ঢেকে দিয়েছে তাদের সব অভাব আর নৈরাশ্য। পেটের খিদের যন্ত্রণাও ওদের টেনে তুলতে পারবে না ঘুম থেকে। রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া লরির ঘড়ঘড় আওয়াজ বা ট্রামের কর্কশ শব্দও তাদের কানে ঢুকবে না।

ফুটপাতের ওপর খড়ির দাগ টেনে সংসার সাজিয়েছে মানুষগুলো। দেখে মনে হয় বোধহয় এরা চিরকাল থাকবার অধিকার পেয়ে গেছে। ছোটমত একটা ছাউনি তৈরি করেছে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে। একদিকে রান্না অন্যদিকে থাকা-শোওয়া। এটাই ওদের ঘরকন্না। রান্নার জন্যে একটা তোলা উনুন আর খানকয়েক বাসনকোশন। শোওয়াটা যন্ত্রতন্ত্র। কঠিন সিমেণ্টের মেঝেই তাদের শয্যা। এতেই ভারি খুশী ওরা। বর্ষাকাল না হলে কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। তবে পৌষ মাঘ মাসে যখন গা হিম করা উত্তরে বাতাস বয়, তখন শীতল কঠিন মেঝের এই শয্যাটি তাদের কাছে নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু তেমন অবস্থা বেশি দিন সইতে হয় না। ক'টা দিনই বা শীত থাকে! তবে যে ক'টা দিন শীত থাকে, সে ক'টা দিন বড় কষ্টে রাত কাটে তাদের। তাদের মনে হয় মৃত্যুও বোধহয় এমনি প্রাণহীন শীতল। তখন আশপাশে পড়ে থাকা মানুষের কাশির ধমকের শব্দ তাড়া করে আসে ঘুমন্ত মানুষদের। অলকার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর হলো ফুটপাতের ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে রাত কাটানো। সকাল বেলায় সারা গায়ে চোরের মারের ব্যথা ফুটে ওঠে। তবে সবচেয়ে নিষ্ঠুর হলো ওদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করা একটা আলোকিত বিজ্ঞাপনের ছবি। কোনো এক লেপ-তোষকের কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়ে ওদের অবস্থাটা মুখ ভেঙচে বিদ্রূপ করছে যেন। পুরু মোলায়েম গদির ওপর শুয়ে মহারাজা স্বপ্ন দেখছেন আর ভাবছেন, 'উপহার দিতে হলে এমন একখানা গদিই উপহার দিতে হয়!'

বেশ কয়েক ঘণ্টার পর মানুষ দুজন ফিরে এল বটে, তবে মেয়েটা ছাড়াই। ওরা ফেরার পর থেকেই স্বামীর চালচলনে কিছুটা তফাত নজরে পড়লো অলকার। সেই অবসন্ন ভাবটা একদম নেই। হাসারির মনে এখন দিব্যি স্ফূর্তি। মায়ার বাবারও একই ভাব। দুজনে গলাগলি করে বসে হাহা করে হাসছে। অলকা বুঝতে পরলো তার স্বামী নেশা করে এসেছে, নইলে এমন অবস্থায় এরকম ব্যবহার করতে লজ্জাবোধ করতো। কিন্তু মানুষটা কি শহরে এসে অমানুষ বনে গেল! ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতন দেখাচ্ছিল অলকাকে। বিজ্ঞাপনের আলোয় অলকার মুখচোখের ভাব দেখে হাসারির বোধহয় অনুতাপ হচ্ছিল নিজের দুষ্কর্মের জন্যে। নিঃশব্দে গুটি গুটি নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লো সে। হাসারির দেখাদেখি মায়ার বাবাও তাই করলো। মায়ার মা নির্বাক স্তব্ধ মুখে সবই দেখেছিল। কিন্তু একটাও কথা বলে নি। রাগ বা বিস্ময় কিছুই হয় নি তার। যেন এটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে সে। শহরবাজারে এমন পাপের ঠেক্ পদে পদে, যেখানে কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে হতাশ মানুষ তাদের দুঃখবেদনাগুলো ভোলবার জন্যে সস্তার নির্জলা ফুর্তি ঢকঢক করে গলায় ঢালে।

বাকি রাতটা মায়ার মা'র কাছে বসে রইল অলকা। কিন্তু কি সান্ত্বনা সে দিতে পারে এই মহিলাকে। শোকে পাথর হয়ে গেছে মায়ার মা তখন। তার পনেরো বছরের ছেলেটা এখন হাজতবাস করছে। রোজ রাত্তিরে সে কোথায় যেন যেত আর সকাল হলেই ফিরে এসে বাপের হাতে দশটা করে টাকা দিত। দুমাস হলো সে আর আসে না। পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে ছেলেটা। ওয়্যাগন ভাঙার দলে পড়ে-

ছিল সে। এখন ধরা পড়ে হাজতবাস করছে। এই দু'মাস ধরে তাকে মনে পড়েছে সর্বক্ষণ। বিশেষ, যখন ছোট অপোগণ্ডগুলো খিদের জ্বালায় চেঁচিয়েছে। অলকা পাশটিতে বসে চুপ করে ভাবছিল। 'কি দুর্ভাগ্যি ওর! স্বামী মাতাল, ছেলে চোর আর মেয়ে! কোথায় হারালো কে জানে! ঘর ছেড়ে যে যায় সে কি ফেরে! কে জানে, অদেষ্টে কি লেখা আছে!'

তখন সবে ভোর হয়েছে। একটু একটু করে অন্ধকার পাতলা হচ্ছে। ঠিক তখনই মায়া ফিরে এল। মায়ার মা যেন বাঘিনীর মতন লাফিয়ে পড়লো মেয়ের ঘাড়ে। 'কুথায় ছিলি সারা রাত?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো মায়া। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। মুখখানা সেই সকালের প্রথম নরম আলোয় ভাঙা ভাঙা দেখাচ্ছিল মায়ার। বিতৃষ্ণায় তাকাল সে মা'র মুখের দিকে। মায়ার মা অবাক। মেয়ের ঠোঁটে আবছা লাল রঙ শুকিয়ে গেছে। গা দিয়ে বেরুচ্ছে সস্তা সেন্টের গন্ধ। মায়াও তাকিয়েছিল। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর মায়ের দিকে অবহেলায় একটা দশ টাকার নোট প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে, ঘুমন্ত ভাইদের দিকে যেতে যেতে বললো, 'আজ আর ওরা কাঁদবে না।'

সাত

এই মরীচিকা শহরের ফুটপাতেই সংসার পেতে দিনযাপন করছে তিন লক্ষাধিক মানুষ। বাকিরা জটলা বেঁধে থাকে কাদামাটি এবং বাঁশ-কাঠ দিয়ে তৈরি হাজার তিনেক নোংরা বস্তিপল্লীর মধ্যে।

বস্তি আর কুঁড়ে এক নয়। গ্রাম থেকে না খেতে পাওয়া মানুষ দলে দলে এসে শহরের এইসব ইতর পল্লীতে জড়ো হয়। তারা আশা-ভরসা ছেড়েই এখানে এসে বাস করে। তাই বস্তিতে বাস করা মানুষ এই পরিবেশে যা পায়, তা হলো চরম হতাশা আর বঞ্চনা। এখানকার সব কিছুই যেন একজোট হয়ে মানুষকে এই অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানকার সব মানুষ কাজ পায় না, যারা পায় তাদেরও মজুরী ভীতিকর রকমের কম। শিশুশ্রম অত্যন্ত সুলভে পাওয়া যায় এখানে। এখানকার মানুষের সঞ্চয় নেই। গেরস্থালীর জিনিসপত্র বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে ভাতের ব্যবস্থা করতে হয় তাদের। এদের ঘরে খাবার মজুত থাকে না। এরা প্রতি-মুহূর্তের দরকার মেটায় দশ পয়সার নুন, কুড়ি পয়সার কাঠ, একটা দেশলাই বা এক চামচ চিনি কিনে। এদের জীবনে কোন নিভৃতি নেই, তার জন্যে আপসোসও নেই' একটা ঘরে দশ-বারোজন অনায়াসে বাস করছে। প্রায় বন্দী শিবির জীবনের মত তারা বস্তিতে বাস করে। কিন্ত সবচেয়ে অলৌকিক ব্যাপার হলো যে, এই উৎকট নিষ্ঠুর জীবনযাপনের মধ্যেও বস্তির মানুষ মানবতাবাদ হারিয়ে ফেলে না। শুধু তাই নয়, তাদের মর্যাদাহীন জীবনযাপনকে ছাপিয়ে তাদের মানবতাবাদ মাঝে মাঝে এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে, সেটি এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় সভ্য মানুষের সমাজে।

বস্তির মানুষরা যথার্থই মানবতাবাদ চর্চা করে। তারা শিখেছে কি করে ভাল-বাসতে হয়। তাদের এই অভ্যাসে কোন ফাঁকি নেই। তাই সব জাতের মানুষ সব ধর্মের মানুষকেই তারা সইতে পারে। মত নয়, মানুষটাকেই তারা বড় করে মানে।

তারা বিদেশীকে যেমন সম্মান করে ঘরে আনে, তেমনি দীনদুঃখী অনাথ আতুরকে বুকে তুলে নেয়। যারা দুর্বল তারা পায়ের তলায় চাপা পড়ে থাকে না। অনাথরা নতুন করে বাপ-মা পায়। বুড়োবুড়িরা পায় যত্ন-আত্তি সেবা।

পৃথিবীর সর্বত্রই গরিব মানুষের থাকবার আলাদা পল্লী আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে নতুন করে জীবনধারণের আকুলতা নেই। এখানে সেই আকুলতা আছে। নির্বাসিত মানুষ নতুন পরিবেশের কাঠামোতে নতুন ঢংয়ে জীবনধারা রচনা করে। হয়ত এই নতুন ধারার জীবনযাত্রায় কিছুটা বিকৃতি আছে, কিন্তু ফাঁকি নেই। তাই দারিদ্র্যটা এদের মধ্যে একটা আলাদা সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। কলকাতার গরিব মানুষরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন হয় না। তাদের পুরনো ঐ তহ্য, বিশ্বাস, সংস্কার সব নিয়েই তারা নতুন সমাজ গড়ে। তারা বুঝতে পারে তাদের দোষের জন্যেই তারা গরিব হয় নি। এ এমন এক সমাজব্যাধি যা বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে আসে ভুল সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে।

কলকাতার সবচেয়ে পুরনো আর বড় বস্তিটার অবস্থান কলকাতার চৌহদ্দির ঠিক বাইরে। হাওড়া স্টেশনে যেখানে হাসারিরা প্রথম নেমেছিল সেখান থেকে পনেরো মিনিটের হাঁটা পথে পৌঁছনো যায় সেখানে। একদিকে কলকাতা-দিল্লী হাইওয়ে, অন্যদিকে রেলের উঁচু পাড়—এই দুই সীমানার মধ্যে এই বস্তিটা গুঁজে দেওয়া হয়েছে। হাইওয়ের পাশে দুটো চটকল। এই চটকলের মালিক বোধহয় মানুষের ভাল করার প্রেরণায় খানিকটা জলাজমি ভরাট করে এই বসতপল্লীটা তৈরি করিয়েছিল তার কারখানার শ্রমিকদের জন্যে। সে আজকের কথা নয়। এই শতাব্দীর শুরুতে ঘটনাটা ঘটেছিল। তারপর ত কত বদল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। চটকল দুটো উঠে গেছে। কলের আসল শ্রমিকরাও অনেকে মরে হেজে গেছে। বস্তি-পল্লীও আর তার পুরনো সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই। এক বিশাল উপনগরীতে পরিণত হয়েছে এটা। এই পল্লীতে এখন সত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ বাস করে। এরা বাস করছে যে জায়গাটার ওপর সেটার পরিধি একটা ফুটবল স্টেডিয়ামের দুগুণ। সত্তর হাজার মানুষের মধ্যে দশ হাজার মানুষের ঘর-সংসার আছে। এরা বিভিন্ন ভাষাভাষী। হরেকরকম এদের ধর্মবিশ্বাস। এই জনসমষ্টির মধ্যে শতকরা তেষট্টি ভাগ মুসলমান, সাঁইত্রিশ ভাগ হিন্দু। অন্য যে ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে যেমন, শিখ, জৈন, ক্রিশ্চান ইত্যাদি, এদের সংখ্যা নগণ্য। এই বস্তিপল্লীর নাম আনন্দ নগর।

মাথানিচু চালাঘর আর সূচ্যগ্র জমি, এই নিয়ে এক-একটা সংসার। চালাঘরের মাথাটা লাল টালি দিয়ে ছাওয়া। সরু সরু গলি। বস্তি না বলে শ্রমিক কলোনী বলাই ভাল এই উপনগরীকে। এই উপনগরীর একটা অস্বস্থিকর গোপন গর্ব আছে। মাত্র এক বর্গমাইল পরিধির মধ্যে দুলক্ষ মানুষ ঠাসাঠাসি করে বাস করে এখানে। ঘনবসতির ক্ষেত্রে এটা একটা রেকর্ড। প্রায় গাছপালাহীন ধু-ধু পরিবেশের মধ্যে এখানকার মানুষ বাস করে। কাক বা শকুন ছাড়া অন্য পাখি দেখা যায় না। এখানকার ছেলেমেয়েরা ঝোপঝাড় দেখে নি। দীঘি বা বন কাদের বলে জানে না তারা। এখানকার বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিষ। ফলে প্রায় প্রতি-বছর প্রতি সংসারেই এই বিষের ক্রিয়ায় অন্তত একজন মারা যায়। বছরের আট মাস গ্রীষ্মকাল। তখন মানুষ গরু সবাই যেন হাপরে সেঁকা হয়। তারপর বর্ষা নামলে কাদা-গোবর আর বিষ্ঠায় মাখামাখি পথ-ঘাট-ডোবা এক হয়ে যায়। হাত-

ধরাধরি করে আসে নানারকম রোগব্যাধি। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, আমাশয় ত' আছেই; আর আছে অপুষ্টিজনিত রোগ। ফলে এখানকার মানুষের গড় আয়ুষ্কাল খুব কম। গরু-মোষের খাটালে গোময় পরিবৃত অবস্থায় গোয়ালা দুধ দোয় এবং রোগ-জীবাণু-বাহী সেই দুধ অবলীলায় শিশু, বৃদ্ধরা পান করে। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এখানে চরম। প্রতি দশজন সক্ষম মানুষের মধ্যে ন'জন মানুষের দৈনিক গড় আয় এক টাকারও কম। সর্বোপরি আছে কলকাতা নামক মহানগরীর মানুষের নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্য আর উদাসীনতা। মানুষের পরিচয় দিয়ে এদের সমাদর করা হয় না। মহা-নগরীর মানুষ মিছিল বা অবরোধ সংগঠনের জন্যে এদের ভাড়া করে নিয়ে যায়। ফলে সমাজের মূলস্রোত থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আনন্দ নগরের মানুষজন হয়ে উঠেছে ভীষণ চরিত্রের সমাজবিরোধী। এরা যেন সমাজের গাঁজলা, দূষিত এবং বাতিল। তাই যে আঁস্তাকুড়েতে এরা থাকে সেটা হয়ে উঠেছে আর এক পৃথিবী।

পর পর বেশ কয়েকটি দেশত্যাগের ঘটনার ঠেলা খেয়ে এই চড়ায় এসে আটকেছে অনেক জাতির মানুষ। এদের মধ্যে আছে কাশ্মীর এবং পঞ্জাব থেকে আসা খাঁটি আর্য, আছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বেতীয়ার ক্রিশ্চান, আছে নেপাল, ভুটান থেকে আগত মঙ্গোলীয়, আছে তিব্বতী, আছে বাঙালী, মারোয়াড়ি, পাগড়িধারী শিখ, আছে আফগানী মহাজন, আছে কেরলীয় এবং তামিলবাসী। দক্ষিণ ভারতীয় এই কৃষ্ণবর্ণ তামিলবাসীরা আলাদা থাকে এবং শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে জীবনধারণ করে। এদের জীবিকা শূকরপালন। আছে সংসারত্যাগী সাধুবাবা। গায়ে ছাই মেখে ছোট ছোট কুঁড়েতে আশ্রম বানিয়ে বাস করে। আছে গেরুয়াপরা বাউল। একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে মাধুকরী জীবনযাপন করে। আর আছে মুসলমান দরবেশ, সাধু, ফকির, সূর্যউপাসক পার্শী এবং গোঁড়া জৈনধর্মাবলম্বীরা। কিছু চীনে দাঁতের ডাক্তারও বাস করে এই মহামিলন কেন্দ্রে। সমাজের এই বিচিত্র নক্সায় হিজড়াদেরও একটা ছোট্ট উপনিবেশ আছে। আনন্দ নগর নামক পোতাশ্রয়ে এরা সবাই আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু বহুজাতিক সমাজের শিরোমণি হয়ে আছে স্থানীয় মাস্তানরা। এরাই শাসক এখানকার। আনন্দ নগরের যাবতীয় সমস্যা এরাই সমাধান করে। খাটালের দরদাম, চোলাই মদের বেচাকেনা, ভাড়াটে উচ্ছেদ, প্রতিশ্রুতি ভাঙার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা, কালোবাজারীদের শায়েস্তা করা, বেশ্যাসমস্যা সমাধান করা—সবই এরা করে। এর ওপর আছে ইউনিয়ন পরিচালনা করা এবং রাজনৈতিক জোয়ার-ভাঁটার ওপর নজর রাখা।

নানান ভাষাভাষী এবং নানান জাতির এই জনসমষ্টি যেন টাওয়ার অফ ব্যাবেলের সমাবেশ সম্পূর্ণ করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মত সঙ্কর জাতির মানুষও। ইংরেজ সৈনিক এবং হরিজন রমণীর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এই সংকর জাতি। কিন্তু তবুও সমাবেশ যেন সম্পূর্ণ নয়। পীতবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণের মানুষ থাকলেও শ্বেতকায় ভাইকিং এবং কেল্ট জাতির কোন প্রতিনিধিত্ব এই মহা-মিলন কেন্দ্রে নেই। আশা করা যায় একদা এই সম্মেলন সম্পূর্ণ হবে।

আট

হাসারি পাল যেদিন সংসার ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতায় এসে পেঁাছেছিল, তার ঠিক হপ্তাখানেক পরে এসে পেঁাছলো আর একজন আগন্তুক। হাওড়া স্টেশনের গর্ভগৃহে যে মানুষটা নামলো সে একজন ইউরোপীয়। ছিপছিপে চেহারার মানুষটার হাবভাব একটুও ছটফটে নয়। তার খড়্গ নাকের তলায় সরু একটা গোঁফ আছে। কপালখানা বেশ চওড়া। চলাফেরা ইত্যাদি বেশ ঢিলেঢালা। দেখতে অনেকটা মার্কিন অভিনেতা জ্যাক নিকলসনের মত। তার পরনে জীন্সের প্যান্ট আর একটা এদেশী সার্ট। পায়ে বাস্কেটবল খেলার জুতো। কাঁধ থেকে ঝুলছে একখানা কাপড়ের থলি। তার মধ্যেই যাবতীয় তল্পাতল্পি। গলায় ঝোলানো কালো ধাতুর একটা ক্রুশচিহ্ন। এই ক্রুশচিহ্নটাই জানিয়ে দেয় সে কে। ঠিক তাই; বত্রিশ বছরের স্তেফান কোভালস্কীকে দেখলে বোঝা যায় যে সে একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক। জাতিতে একজন পোলীশ সে।

কলকাতায় আগমন তার কাছে যেন এক মহাপথপরিক্রমার শেষ শীর্ষে পেঁাছনো। পোলাণ্ডের ছোট্ট খনি শহর ক্রাশ্নিক থেকে শুরু হয়েছিল এই যাত্রা। কোভালস্কী এই শহরেই জন্মায় ১৯৩৩ সালে। কোভালস্কীর বাপঠাকুর্দা দুজনেই ছিল খনি মজুর। তাই তার ছেলেবেলাটা কেটেছে খনির বিষণ্ণ পরিবেশে। সকাল হলেই সে দেখতো তার বাবা নেমে যাচ্ছে পাতালের গহ্বরে। যখন তার বয়স মাত্র পাঁচ, তখন একদিন তার বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে রেলগাড়ি চড়ে চলে আসে উত্তর ফ্রান্সের খনি অঞ্চলে। এখানে স্তেফানের কাকারা থাকে। তারাও খনি মজুর। তাছাড়া ফ্রান্সের খনি মজুরদের মজুরীর হার পোলাণ্ডের খনি মজুরদের চেয়ে ছ-সাতগুণ বেশি। তাই ক্রাশ্নিক ছেড়ে এসেছে কোভালস্কীর বাবা। এখন থেকে সে ফ্রান্সের কয়লাখনিতে কাজ শুরু করলো। এর কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা স্তেফান কোভালস্কী দেখলো একটা য়্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এসে থামলো তাদের ঘরের সামনে। ওরা গাড়ি থেকে তার বাবাকে নামালো। বাবার মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানো আছে। সারা উত্তর ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলোয় তখন ধর্মঘট চলছে। হাজার হাজার খনি শ্রমিক সামিল হয়েছে এই ধর্মঘটে। কয়লা উৎপাদন থেমে গেছে সম্পূর্ণ। কর্তৃপক্ষের লোকের সঙ্গে মারামারির সময় ওরা তার বাবার মুখটা আগুনে পুড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই স্তেফানের বাবার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে শান্ত ধর্মপ্রাণ মানুষটা যেন বদলে গেছে। দেখতে দেখতে স্তেফানের বাবা হয়ে উঠলো দুর্ধর্ষ বিপ্লবী মনোভাবের লোক। কর্তৃপক্ষের চোখরাঙানির পরোয়া সে করতো না। তাই ক্যাথলিক ওয়ার্কিং মেন্স্-এর ইউনিয়ন ছেড়ে সে সরাসরি নাম লেখাল চরম বামপন্থী দলে। এই অতি-বিপ্লবী মার্কসিস্ট লীগের প্রশ্রয়ে থেকে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়লো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। তার নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখটার ওপর তালি দেওয়া থাকতো বলে, অনেক দূর থেকেই তাকে চেনা যেত। তার বদনাম রটে গিয়েছিল 'জলদস্যু'। অনেকরকম সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল স্তেফানের বাবা। শিল্পে বিশৃংখলা আনার ষড়যন্ত্রের সামিল হয়ে যায় সে। ফলে একদিন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলো। এর পরের ঘটনা খুবই

আকিস্মিকভাবে। একদিন ওখানকার মেয়র এল তাদের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। নির্বিরোধী মধুর স্বভাবের স্তেফানের মা তাঁর জীবনের সবচেয়ে নিদারুণ দুঃসংবাদটা শুনলেন মেয়র নামক লোকটার কাছে। তিনি জানলেন তাঁর স্বামী জেলকুঠুরির মধ্যে গলায় দাঁড় দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

স্তেফান শুধু অসহায়ের মত বাবার এই পরিণতি দেখেছিল কিন্তু কিছু করতে পারেনি। বয়ঃসন্ধির এই কালটায় এতবড় দুর্ঘটনাটা তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে শরীরের এমন হাল হলো যে জীবন-সংশয় দেখা দিল। পাড়া-পড়শীরা তার শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল। স্তেফান সেই দিনগুলোতে নিজেকে পুরোপুরি কোলাহল থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে যীশুর পবিত্র ছবির সামনে বসে ধ্যান করতো। ছবিখানা বাবাই দিয়েছিলেন তার প্রথম উপাসনার দিনে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে মুক্ত করার পরের ছবি এটি। ঝাপসা হয়ে গেছে যীশুর পবিত্র মুখখানি। সেই অনুপম মুখখানির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকতো স্তেফান। তার তখনকার সঙ্গী ছিল আরও টুকিটাকি দু-একটা জিনিস। ফ্রান্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা এডিথ্ পিয়াফের একটা ছবি, শার্ল দ্য ফুকোর একটা জীবনী, যিনি ধনী এবং অভিজাত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও শেষ জীবনে সাধু হয়ে যান। ক্রনিনের লেখা 'দি কিজ্ অব দি কিংডম' বইটার পোল ভাষার অনুবাদ। এগুলোই ছিল তার সারাক্ষণের সঙ্গী। একদিন সকালে ইস্কুল যাবার সময় মাকে চুমু খেয়ে স্তেফান তার অভিপ্রায়ের কথা জানালো। বললো, 'মা, আমি ধর্মপ্রচার করবো। সংসার করবো না।'

জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নেবার আগে স্তেফান কোভালস্কীকে অনেক ভাবতে হয়েছে। পরবর্তীকালে ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে দুটো কারণের কথা তার মনে হয়েছে। 'একটা আমার বাবার অমন শোচনীয় মৃত্যু। ঘরের মধ্যে আর যেন টিকতে পারতাম না। পালিয়ে বাঁচতে চাইছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটাই আসল। আমার মনে হতো বাবা যেটা বলপ্রয়োগ করে পারে নি, সেটাই আমি মানুষের কাছ থেকে চেয়ে নেব। তখন উত্তর ফ্রান্সের এইসব খনিতে আফ্রিকা, যুগোশ্লাভিয়া, সেনেগাল প্রভৃতি দেশ থেকে মজুররা কাজ করতে আসতো। এরা সবাই মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ। বাবাও যে এমনি এক দেশান্তরী মানুষ সে কথা ভোলে নি। তাই সবাইকে নিয়েই বাবা তার বিপ্লবী পতাকা মাথায় তুলে রেখেছিল। সবাই ভাবতো এটা যেন একটা বৃহৎ পরিবার আর আমার বাবা যেন সেই পরিবারের কর্তা। বাবাকে সবাই খুব মান্য করতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা আমাদের ঘরে বসে নানা বিষয়ে আলাপ করতো। তখন টেলিভিশন চালু হয় নি। তা সত্ত্বেও তারা বসে থাকতো। যা মনে আসতো বলতো। তবে সংহতি ন্যায়বিচার এসব নিয়েই বেশি কথা হ'ত। কিন্তু একদিনের একটা ঘটনায় যেন সুরটা কেটে গেল। সেনেগাল থেকে আসা একটা ছেলে বাবার একটা কথার সরাসরি প্রতিবাদ করে বসলো। বাবার কোনো কথাই সেদিন সে মানতে চায় নি। স্পর্ধা দেখিয়ে বলেছিল, "আপনি ত' সবসময়ই বলেন আপনি আমাদের সব জানেন। কি জানেন? কতটুকু জানেন? কিসের কষ্ট আমাদের, কি ভাবে আমরা বেঁচে আছি জানেন? কেন দেশ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছি তা কখনও জানতে চেয়েছেন?

চলুন আফ্রিকায়। দেখবেন কিভাবে আমরা বেঁচে থাকি, আর কেনই বা দেশ থেকে এতদূরে এসে খনির তলায় বসে পাথর ভাঙছি। ঘরে আমাদের ভাত নেই, ভাই।" সেদিন ছেলেটার কথা শুনে আমার মন যেন কেঁদে উঠেছিল। ঘটনাটার কথা কখনো ভুলতে পারি নি।'

সত্যিই তাই। সেদিন আফ্রিকার কথা শুনে স্তেফানের কিশোর মন তোলপাড় হয়ে যায়। মনে পড়ে গিয়েছিল কয়েক বছর আগেকার কয়েকটা ঘটনার কথা। ১৯৪০-এর এক দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরের একটা দৃশ্য তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। নাৎসী বাহিনীর তাড়া খেয়ে কয়েকজন অসহায় বেলজিয়ান তাদের খনি এলাকায় প্রাণ বাঁচাতে ঢুকে পড়ে। ইস্কুল থেকে ফিরে রোজ সে তাদের খাবার-দাবার দিতে যেত। পরবর্তীকালে নাৎসীদের হাতে ইহুদী ছেলেমেয়েদের নিগ্রহের ঘটনাও সে দেখেছে। নাৎসীদের খোঁয়াড়ে আটক রাখা ইহুদী ছেলেমেয়েদের দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠতো। কাঁটাতারের বেড়ার এপার থেকে স্তেফান আর তার বাবা-মা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে রুটি আর চীজ ছুঁড়ে দিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এমনি করেই তারা সামান্য বরাদ্দ থেকে খাবার-দাবার অপরকে যুগিয়েছে নিজেরা না খেয়ে। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এই অবিচার আর অন্যায় দেখে। মানুষকে ভালবাসা আর তাদের সেবা করার মনোভাবটি তখনই জেগে উঠেছিল তার মনে এবং সেই প্রেরণাই আজও অম্লান হয়ে আছে তার মনে।

বাড়ি ছেড়ে স্তেফান প্রথমে গেল বেলজিয়ামে। সেখানে একটা ছোট্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলো। বছর তিনেক সেখানে সে ছিল। সেখানে যে উপদেশগুলি সে পেত তার থেকে সাধারণ মানুষের নিত্য অভাব আর বঞ্চনার দূরত্ব অনেক। তাই মন ভরতো না স্তেফানের। কিন্তু খ্রীষ্টের অমৃতবাণীগুলি গভীরভাবে পাঠ করতে করতে বঞ্চিত অভাবগ্রস্ত মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের সমব্যথী হবার প্রেরণাটি সে ক্রমেই পেতে লাগলো। তখন প্রত্যেক ছুটির সময় সে বাড়ি যেত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সে সময় পাহাড়পথে হেঁটে প্রায়ই সে প্যারিস যেত। তখন এ্যাব পের্ নামে একজন সন্ন্যাসী রাজনীতিকের খুব দাপট ছিল প্যারিসে। তিনি আবার ফরাসী সংসদের সদস্যও ছিলেন। মাথায় শামলা পরে আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তিনি গরিব দুঃস্থ মানুষদের ঘটা করে সেবা করতেন। বড় লোকদের ভাঁড়ার থেকে ফেলে দেওয়া পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে যা পেতেন সেই পয়সা দিয়ে তিনি গরিব মানুষদের অভাব মোচন করতেন। কিন্তু ওঁর এই নেতাগিরি ঠিক পছন্দ হ'ল না কোভালস্কীর।

কোভালস্কী তখন ঠিক পথটি খুঁজে পেতে চাইছিল। এই হদিসটি দিলেন অন্য একজন সন্ন্যাসী। ইনি একজন স্পেন দেশীয় খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী; এঁর নাম পাদ্রে ইগ্‌নাশিও ফ্রেলী। তিনি যে ফ্র্যাটার্‌নিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেটির প্রতিষ্ঠা হয় গত শতকে। এই সম্প্রদায়ের নিঃস্বার্থ সেবাকর্ম ভাটিক্যানের আশীর্বাদধন্য। যারা সেবাধর্মে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেইসব উৎসর্গীকৃত সাধারণ মানুষদের পবিত্র মানবসেবায় ব্রতী করাই এই ফ্র্যাটার্‌নিটির পবিত্র উদ্দেশ্য ছিল। যাতে তারা আমৃত্যু এই সেবাধর্মে বৃত থাকে এবং নিঃস্বার্থভাবে তা পালন করে সেটি দেখতেন এই ফ্র্যাটার্‌নিটি। ইওরোপের সব শহরেই, বিশেষ করে শিল্পনগরীতে এইরকম সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলো ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত, সারা বিশ্বেই এই ফ্র্যাটার্‌নিটির প্রতিষ্ঠান আছে। যেখানেই পীড়িত মানুষ আছেন সেখানেই তাদের

সেবায় নিযুক্ত আছে এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী পুরোহিতরা। ফ্রান্সেও এমন অনেকগুলি সেবা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে।

স্তেফান কোভালস্কী যে দিনটিতে খ্রীস্টীয় যাজকরূপে অভিষিক্ত হলো সেটি তার জীবনের একটি মহৎ দিন। দিনটি ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্ট। অন্যভাবেও দিনটি পবিত্র। মেরী মাতার ভোজনোৎসবের দিন সেটি। তখন তার বয়স ঠিক সাতাশ বছর। সেদিনই রাত্রের ট্রেনে কোভালস্কী বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। স্তেফানের মা তখন হাসপাতালে শুয়ে ছেলের আসার দিন গুনছেন। তিনমাস ধরে বুকের অসুখে ভুগছেন এবং হাসপাতালে বন্দিনী জীবনযাপন করছেন। ছেলেকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর তার হাতে যত্ন করে কাপড়মোড়া একটা ছোট্ট কৌটো দিলেন। কৌটোর মধ্যে তুলোর ভাঁজের ভিতরে ধাতুর তৈরি কালো রঙের একটা ক্রুশচিহ্ন। ক্রুশচিহ্নটি হাতে নিয়ে কোভালস্কী দেখতে পেল তার গায়ে খোদাই করা আছে দুটি তারিখ। একটা তার জন্মদিনের তারিখ, অন্যটা তার যাজক-পদে বৃত হবার দিনের তারিখ। ছেলের হাতে ক্রুশচিহ্নটি তুলে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, কখনো এটি কাছছাড়া করো না বাবা! যেখানেই যাবে সঙ্গে নিয়ে যেও। সব বিপদ-আপদ কেটে যাবে। ইনি তোমায় রক্ষা করবেন।'

স্তেফান কোভালস্কী জানতো যারা সত্যিকার ব্রাত্যজন, সমাজে যাদের ঠাঁই নেই, তারা সবাই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ। স্তেফান তাই ঠিক করেছিল সে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে মানবসেবার কাজ শুরু করবে। মনে মনে এইভাবেই সে তৈরি হচ্ছিল। এমনকি যত্ন করে স্প্যানিশ ভাষাটাও শিখে ফেলেছিল। কিন্তু ফ্র্যাটার্-নিটির তরফ থেকে তাকে ভারতবর্ষ নামক বিস্ময়কর দেশটিতে গিয়ে কাজ করতে বলা হলো। স্তেফানের কাছে ঘটনাটা সেদিন ঈশ্বরাদেশ বলে মনে হয়েছিল।

সত্যিই বিস্ময়কর এই উপমহাদেশ ভারতবর্ষ। যেমন বিশাল বিপুল তার সম্ভাবনার ভাণ্ডার তেমনি দুর্নিবার তার চরমতম দারিদ্র্য। একদিকে যেমন প্রগাঢ় নিবিড় আধ্যাত্মিকতা জড়িয়ে আছে এ দেশের বাতাসে, অন্যদিকে আছে বর্বর বৈপরীত্য। রাজনৈতিক দলাদলি, জাতপাতের ঝগড়া আর নিষ্ঠুর মারামারি। ভারতবর্ষ যেমন সাধুসন্তের জন্মভূমি—গান্ধী, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মনোভূমি, তেমনি আবার দুর্নীতিপরায়ণ অর্থগৃধ্নু রাজনৈতিক নেতাদের ধাত্রী-ভূমি। যে দেশ সফল অন্তরীক্ষযান তৈরি করে অন্তরীক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, সেই দেশেরই প্রতি দশজনের মধ্যে আটজন মানুষ গোযান ছাড়া আর কোন দ্রুততর যান চড়ে নি। কত না রূপৈশ্চর্য এই দেশটার! কত না বৈচিত্র! কিন্তু যখন কলকাতা, বোম্বাইয়ের মতন আধুনিক শহরের বস্তিপল্লীগুলো চোখে পড়ে তখন তার বীভৎস চেহারা দেখে আঁতকে ওঠে মানুষ। এ দেশ যেমন মহান, সুউন্নত যেমন এর ঐতিহ্য, তেমনি নিরতিশয় মন্দ যেটি, সেটিও সহজলভ্য এখানে। এই বিস্ময়কর বৈপরীত্য আর অসঙ্গতি যেন অনায়াসে পাশাপাশি বাস করছে এই দেশের বুকে। ভাব দুটি এমন পাশাপাশি থাকার দরুণ একের স্পন্দন অনুরণিত হচ্ছে অন্যতে। ফলে আরও মানবিক আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এই দেশ।

এই হাতছানি যে পেয়েছে তার পক্ষে সুস্থির থাকা মুশকিল। স্তেফান কোভালস্কীও তাই মনে মনে যথেষ্ট অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে রেসিডেন্ট ভিসার জন্যেও সে আবেদন পেশ করে রেখেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার অনুরোধটি মাসের পর মাস ধরে সযত্নে শুধু লালন করলেন এবং ক্রমাগত স্তেফানকে জানিয়ে

গেলেন যে ভিসা আসছে। এই অসহায় এবং যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষার পালা চললো পাঁচ বছর ধরে মাসের পর মাস। টুরিস্ট ভিসা আর রেসিডেন্ট ভিসার তফাত আছে। শেষোক্ত ছাড়পত্রটি অনুমোদন করে ভারত সরকারের দিল্লিস্থ বিদেশ মন্ত্রক দপ্তর। স্তেফানের আবেদনপত্রে তাঁর পরিচয় দেওয়া ছিল খ্রীশ্চান ধর্মযাজক। সে সময় বেশ কিছুদিন ধরে যাজক শ্রেণীর কোন বিদেশীকে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। সরকারের তরফ থেকে যদিও কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নি, তাহলেও এর অন্তর্নিহিত কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। সে সময় এ দেশের হিন্দুদের গণধর্মান্তরকরণের নিন্দনীয় প্রবণতা ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

যা হোক, এই দীর্ঘ অপেক্ষার কালটি আলস্যে কাটায় নি স্তেফান। প্রথমে সে আলজিরিয়দের একটা বস্তিতে ওদের সঙ্গে থাকতে লাগলো। সেখান থেকে আর একটা বস্তিতে। সেনেগাল থেকে কিছু দেশান্তরী মানুষ এই বস্তিতে থাকতো। ফ্র্যাটারনিটির নির্দেশ মতন স্তেফান সব ব্যাপারেই বস্তিবাসীদের সঙ্গে এক হয়ে যেত। তারা যে কাজ করতো, যে খাবার খেত, যে শয্যায় শুতো, সবেরই ভাগ নিয়েছে স্তেফান। ফলে মাটিতে যেমন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়েছে, ক্যান্টিনের তৈরি পচা খাবার খেয়েছে, তেমনি বৃত্তির কাজও করেছে। কখনও হয়েছে ফিটার মিস্ত্রি, কখনও অপারেটর, কখনও বা স্টোরকীপার।

এইভাবে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে সেবার কাজ করতে করতে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেল। যাজক বৃত্তিতেও পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা জমা হলো তার। ১৯৬৫ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে স্তেফান স্থির করলো, এমনভাবে আর সে অপেক্ষা করবে না। কারণ অপেক্ষার কাল ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে গেছে। ফ্র্যাটারনিটির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-পরামর্শ করে স্তেফান একটি টুরিস্ট ভিসার জন্যে আবেদন করলো। এবার সে নিজের পরিচয় দিল কারখানার সুদক্ষ শ্রমিক। বলাবাহুল্য পরদিনই সরকারী মোহর দেওয়া তিন মাসের ভারতবর্ষ বাসের অনুমোদন পেয়ে গেল স্তেফান। সেই মূল্যবান ছাড়পত্রটি হাতে নিয়ে শুরু হলো স্তেফান কোভালস্কীর এক দুঃসাহসী আবিষ্কারের অভিযান। সে মনে মনে স্থির করলো কলকাতায় পেঁৗছেই রেসিডেন্ট পারমিটের জন্যে সে আবেদন করবে।

ভারতবর্ষের প্রধান তোরণদ্বার হলো বম্বাই বন্দর। গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া! পশ্চিমকূলে অবস্থিত এই প্রধান বন্দরটি দিয়েই গত তিনশ' বছর ধরে অগণিত গোরা সৈন্য আর ব্রিটিশ শাসকরা সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদটি শক্ত করতে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্তেফান কোভালস্কীও এই উপমহাদেশে এসে পেঁৗছলো। কিন্তু তখনই কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো না। আগেই সে মনে মনে স্থির করে রেখেছে যে, কলকাতায় পেঁৗছবে একটু ঘুর পথে যাতে দেশটার সঙ্গে একটা মোটা মাপের ঘনিষ্ঠতা তার হয়। সুতরাং বম্বাইয়ের বিখ্যাত রেলস্টেশন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের নয়া গথিকশৈলির বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্পের মুন্সিয়ানা দেখতে দেখতে ত্রিবান্দ্রমগামী একটা ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা অসংরক্ষিত কামরায় সে উঠে বসলো।

ট্রেন গড়িয়ে গড়িয়ে চললো সব স্টেশনে থামতে থামতে। যেখানেই গাড়ি থামছে সেখানেই হুড়মুড় করে লোকজন নেমে পড়ছে, আবার উঠছে ট্রেন ছাড়ার সময়। স্তেফান অবাক হয়ে দেখলো গাড়ির যাত্রীরা তাদের শারীরিক দাবিগুলো যেমন

মূত্রত্যাগ, স্নান, হাতমুখ ধোওয়া ইত্যাদি মেটাচ্ছে প্ল্যাটফর্মে নেমে। খানিক পরে স্তেফানও ওদের মত হয়ে গেল এবং গাড়ি থামলেই থিকথিকে মানুষের ভিড়ের মধ্যে সে নেমে পড়তে শুরু করলো। কিন্তু একটা ঘটনা থেকে সে বুঝতে পারলো যে সবাই তাকে সরাসরি ভারতীয়দের দলে ফেলতে চায় না। স্টেশন থেকে কমলালেবু কিনে ফেরিওলাকে সে একটা টাকা দিয়েছিল। কিন্তু লোকটা খুচরো ফেরত দিল না এবং এমনভাবে তাকাল যেন সাহেব মানুষের ফেরত চাওয়ার অধিকার নেই। ঘটনাটার কথা স্তেফান মাকে লিখেছিল। আরও লিখেছিল, 'তারপর কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে সবে দুটো কোয়া মুখে ফেলতে যাব, দেখি আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা মেয়ে। তার মাথায় একঝাঁক জটপাকানো চুল আর কালো ভ্রমর দুটি চোখ। মেয়েটির দিকে তাকাতেই সে ফিক করে হেসে উঠলো। আমি পুরো লেবুটা তার হাতে দিতেই সে নাচতে-নাচতে চলে গেল। কোথায় যায় দেখি ভেবে তার পেছন পেছন গেলাম। মেয়েটা তখন ভাইবোনদের সঙ্গে ভাগ করে কমলালেবু খাচ্ছিল।' কোভালস্কী যখন মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে তখন তাকে ঘিরে ঘুরছিল একটা বাচ্চা জুতোপালিসওলা। 'কিন্তু তখন হাসি ছাড়া আর কিছু আমার দেবার নেই। কিন্তু আমার মোলায়েম হাসির উপহারটি নিয়ে তার পেট ভরবে না। সুতরাং থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে এক কোণে পড়ে থাকা কলাটা পালিসওলা ছেলেটাকে দিলাম। সাধ ছিল সকলের চোখের আড়ালে গিয়ে সেটিকে উদরস্থ করার। কিন্তু সে সাধটি মিটলো না। বরং আমার মনে হতে লাগলো, বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি এবং অনিবার্যভাবে বুভুক্ষার কবলে নিমজ্জিত হতে চলেছি।'

গাড়ির মধ্যে বিপুল পরিমাণ যাত্রীর ভিড় ত ছিলই, আরও যা ছিল তারও আকর্ষণ অনেক। ছিল অপরিমিত তাত, গলাজ্বালাকরা ধুলো এবং ধোঁয়া, নানারকম উৎকট গন্ধ এবং অসংখ্য মানুষের কলরবধ্বনি, তাদের হাসি-কান্না-ঝগড়া, সব মিলিয়ে রেলকামরাটা হয়ে উঠেছিল মানুষ জানার এক আদর্শ স্থান। ভারতীয় খানার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হলো একটা স্টেশনের রেস্তোরায়। সেদিনের অভিজ্ঞতাটা প্রায়ই তার মনে পড়ে যায়। 'আমি অবাক হয়ে আমার আশপাশের লোকদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। ডানহাতের ক'টা আঙুল দিয়ে কেমন অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওরা ভাতের নাড়ু পাকাচ্ছে আর গরম ঝোলের মধ্যে চুবিয়ে মুখে চালান করছে।' ভাতের নাড়ু ভাঙছে না, হাতে ছেঁকা লাগছে না—তার মনে হচ্ছিল এ যেন এক অভিনব ব্যায়ামকৌশল। তার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছিল যে, অপরিমিত আদা, লঙ্কা এবং মসলাপাতির হত্যাকারী আচরণ কেমন অনায়াসে রফা করছে এদের মুখ গলা বা উদরের নিরাপত্তা। হয়ত ওদের মত হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার চেষ্টাটা হাস্যকর হয়ে গিয়েছিল। তাই সবাই হা হা করে হেসে উঠলো। রোজ এমন মজা ত জোটে না কপালে! একজন খাঁটি সাহেব উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে ভারতীয় হবার—এর চেয়ে আমোদের ব্যাপার আর কি হতে পারে!

অতঃপর মাদ্রাজ শহরের কাছাকাছি বস্তিতে দিনকতক কাটিয়ে স্তেফান কোভালস্কী কলকাতায় এসে পৌঁছলো ঠিক দশদিন পরে।

যত দুরবস্থাই হ'ক, এমনকি দারিদ্র্যের দরুন কলকাতার ফুটপাতে পড়ে থাকতে হলেও একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ তার নিত্যকার অভ্যাস বদলাতে পারে না। তাই কলকাতার রাজপথে প্রথম ট্রামগাড়ির চলার ঘর্ঘর শব্দ কানে যেতেই হাসারি ঘুম থেকে উঠে পড়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে। রাস্তার ওপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খোলা নর্দমা। তারই ধারে আরও দশজন মানুষের সংগে হাসারিও লুংগি তুলে বসে যায়। হাসারির জীবনে এটা এখন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য পুষ্টির অভাবের দরুন বেশিক্ষণ সময় তাকে বসতে হয় না। শারীরিক দরকারটা মেটাতে সবাই পাশাপাশি বসে পড়ে, কেউ কারও দিকে তাকায় না। নিয়মটা প্রায় জীবনের একটা অংগ হয়ে গেছে তাই লজ্জাও পায় না কেউ। পুরুষদের আগে মেয়েরা সেরে আসে। অলকাও তাই হাসারির আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তারপর হাসারি এসে দাঁড়ায় ফুটপাতের হাইড্রেনটার সামনে। এই ঘোলা কলের জল সরাসরি হুগলী নদী থেকে পাম্প করে তোলা হয়। এই ঘোলা জলেই ওরা রোজ স্নান করে। হাসারির পালা এলে সে ফুটপাতের ওপর থেবড়ে বসে। ক্ষারের তৈরি গোল বল সাবান দিয়ে গা-মাথা ঘষে মাথায় জল ঢালে। এই নিত্য স্নানের অভ্যাসটি এদেশের গরিব মানুষদের একটা আবশ্যকীয় বিলাসিতা। শীত হ'ক, বর্ষা হ'ক, কপালে আহার জুটুক আর না জুটুক, এই প্রাচীন এবং পুরুষানুক্রমিক শুদ্ধিকরণের ধারাটি চলে আসছে। সুতরাং যুববৃদ্ধ সবাই এই পবিত্র ট্র্যাডিশন মেনে চলে এবং স্নানসমাপনান্তে দেহমন শুদ্ধ করে।

স্নান শেষ করে হাসারি তার দুই ছেলেকে সংগে নিয়ে বড়বাজারের দিকে রওনা হলো। বড়বাজারে কেনাবেচার বস্তুর সমাবেশ এত বিপুল যে খাদ্যবস্ত প্রায়ই পড়ে থাকে এবং পরের দিন সেই বাসি খাবার কম দামে বেচা হয়। হাসারি আর তার ছেলের মত গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে এমনি শত শত হতভাগ্য পরিবার। এরা সবাই ঘুরে মরছে সেই অলৌকিক এবং পরম বাঞ্ছিত মানুষটির সন্ধানে। তাদের আশা যে চেনা লোকটিকে তারা খুঁজে পাবেই। সে মানুষ যে কেউ হতে পারে। হতে পারে গ্রামের বা জেলার বা প্রদেশের কোনো আত্মীয়, কিংবা তাদের স্বজাতি বা বন্ধু অথবা বন্ধুর চেনাজানা কেউ; মোটকথা এমন কেউ যার দ্বারা অলৌকিক ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হবে। একবেলা বা একদিনের একটা জীবিকা যে জুটিয়ে দিতে পারবে অথবা টানা বেশ কিছু দিনের। সেই পরম বাঞ্ছিত মানুষটির খোঁজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে দরিদ্র হাসারি পালের মত পরিবাররা। তাই বিরামহীন এই খোঁজার শেষ নেই। কিন্তু এই অন্বেষণ যেন এ দেশের সামাজিক কাঠামোতে মোটেই অবাস্তব নয়। কারণ, সত্তর কোটি মানুষের এই বিশাল সমাজচিত্রে সবাই কোন না কোন সূত্র ধরে একে অপরের সংগে যুক্ত হয়ে আছে। তাই চালচিত্রে সকলেরই ঠাঁই আছে। ব্যতিক্রম বোধহয় হাসারি পাল। কারণ, এই 'নির্দয় নিষ্ঠুর' শহরটা শেষমেশ হয়ত তাকে ঠাঁই দেবে না এখানে। আজ নিয়ে ছ'টা দিন কেটে গেল। এখনও পর্যন্ত সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষটার খোঁজ সে পেল না। সারা বড়বাজারটা সে চক্কর দিয়ে বেড়ায় একটা কাজের জন্য। কখনও ঠেলাগাড়ির পেছনে পেছনে ছোটে, কখনও ঠেলা

মালিক বা দোকানদারদের হাতে পায়ে ধরে। কিন্তু কেউ তাকে কাজ দেয় না। আজও এমনি করে অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে মানুষটা একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলে দুটোকে বসিয়ে দিয়ে এসেছে বাসি খাদ্যসামগ্রীর স্তূপের মধ্যে। কিন্তু তার পেটে সকাল থেকে একটা দানা পড়ে নি। পেটের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ক্ষিদের তান্ডব। মাথাটা হয়ে গেছে অসম্ভব হালকা। কোথাও এতটুকু আশার আলোও যেন দেখতে পাচ্ছে না সে। চোখ বুজে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল হাসারি। হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাকে কিছু বলছে। স্বপ্নের মত একটা আশার বাণী তার কানে ভেসে এল। কেউ যেন তার কানে ফিসফিস করে বললো, 'কিরে? কিছু রোজগার করতে চাস?'

চোখ খুলে হাসারি দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে মতন একটা লোক, চোখে চমশা পরা লোকটাকে দেখে আপিসবাবু বলেই মনে হয়। বাজারের কেউ নয় সে। হাসারি অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। এক সময় মাথাটা হেলিয়ে সে সায় দিল। লোকটা তখন সরাসরি হাসারির চোখের দিকে চেয়ে বললো, 'তবে আমার সংগে সংগে চল্। যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে তোর শরীর থেকে ওরা একটু রক্ত বের করে নেবে। তার দরুন তোকে ওরা তিরিশটা টাকা দেবে। তোর পনেরো, আমার পনেরো।' বিস্ময়ের ধাক্কায় হাসারির চিন্তাশক্তি তখন যেন লোপ পেয়ে গেছে! 'এজ্ঞে! আমার রক্তের দাম তিরিশ ট্যাকা,—গরিব মানুষের রক্তের দাম তিরিশ ট্যাকা?' লোকটা এবার ধমকে উঠলো হাসারিকে। 'রক্তের আবার গরিব বড়-লোক কি রে বেটা? রক্ত রক্তই। পণ্ডিতই বল্ আর রাস্তার বাউণ্ডুলেই বল্, সব রক্তই এক। ওই যে পেটমোটা মাড়োয়াড়িটা নোটের গাদা বানাচ্ছে ওর যা তোর রক্তও তাই।' লোকটার সার যুক্তি। সুতরাং হাসারির ভাবনার কোনো কারণ ছিল না। তাহলেও একটু যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, সেটুকু ঝেড়ে ফেলে সে লোকটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলো।

চশমা পরা বেঁটে লোকটা একজন দালাল। কলকাতার মত শহরে যেখানে অর্থ উপার্জনের সামান্যতম ফিকির আছে, সেখানেই ঝাঁকে ঝাঁকে মধুলোভী মানুষের ভিড় হয়। এরা সবাই পরাশ্রয়ী মানুষ। এদের বাজার-চলতি নাম মিড্‌ল্‌ম্যান বা ফড়িয়া। এদের কাজ হলো খদ্দের ধরা। চশমা পরা লোকটাও এমনি এক খদ্দের ধরা দালাল। সারা কলকাতা জুড়ে অসংখ্য গোপন রক্তশোষক কেন্দ্র আছে। চাহিদা বৃদ্ধির সংগে সংগে এগুলি অনিবার্যভাবে শহরের বুকে গজিয়ে উঠেছে। এমনই এক প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কের সংগে যুক্ত হয়ে মিডিলম্যানের কাজ করে লোকটা।

মানুষের এই অসহায়তার সুযোগ নেয় সমাজের কিছু অসাধু, নীতিহীন ক'টা টাকার জন্যে যা কিছু করতে প্রস্তুত। সাধারণত হিন্দুরাই এদের শিকার হয়।

মানুষ যখন বাঁচার আর কোন রাস্তা খুঁজে পায় না তখনই বোধহয় সে রক্ত বিক্রির কথা ভাবে। তখন শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার সেটাই শেষ উপায় হয় তার কাছে। মানুষের এই অসহায়তার সুযোগ নেয় সমাজের কিছু অসাধু, নীতিহীন কারবারী মানুষ, যারা প্রকৃত অর্থে অর্থগৃধ্নু এবং তাদের ভাগ্য গড়ে নেয় এইভাবে। কলকাতার মত বিশাল জনবহুল শহরের হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোতে বছরে বেশ কয়েক লক্ষ বোতল রক্ত লাগে। যেহেতু সরকারী পরিচালনাধীন ব্লাড ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র চার কি পাঁচ, তাই এই অপ্রতুল সংগ্রহ দিয়ে বিশাল চাহিদা মেটানো যায় না। সুতরাং চাহিদা মেটাতে অনিবার্য ভাবেই অসংখ্য গোপন ব্লাড ব্যাঙ্ক গজিয়ে

উঠেছে শহরের সর্বত্র। বেসরকারী এই উদ্যোগকারীদের প্রধান কাজ হলো তাদের এই দুষ্কর্মের সঙ্গে একজন ডাক্তারকে জড়িয়ে রাখা যাতে তার নামে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে একটা আবেদন নথিভুক্ত করে রাখতে পারে। প্রারম্ভিক এই বাধাটি কেটে গেলে উদ্যোগকারীরা অন্য কাজগুলো করে অনায়াসে। একটি বাড়ি ভাড়া করা, একটি রেফ্রিজারেটর কেনা কিংবা একজন ডিসপেন্সারি এ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা ইত্যাদি কাজগুলো অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এইভাবে খুঁটিনাটি-গুলো সেরে নিতে পারলেই এক ফলাও ব্যবসার স্বপ্ন দেখা যায়, যার বাৎসরিক লেনদেনের পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার মত। তবে স্বপ্নের সবটুকুই রঙিন হয় না। সাধারণত এ সব কারবারে প্রতিদ্বন্দিতা খুব তীব্র হয়। তাই লেনদেনে জোয়ার-ভাঁটা খেলে এবং লাভের অংক কমবেশী হয়। তবে হাসারি পাল যে দল-টির খপ্পরে পড়েছে সেটি এ শহরে সব থেকে সুসংগঠিত দল। এমনি অসংখ্য অসাধু সংগঠন তারা ছড়িয়ে রেখেছে সারা দেশে এবং ঐশ্বর্যশালিনী নব নব ভাবনার আশ্রয় নিয়ে তাদের পরিচালিত করছে। এদের ব্যবস্থাপনা এত নিখুঁত যে বোধহয় ভুয়া কারবারীদের স্বর্গ নেপল্‌স্ বা নিউ ইয়র্কের অসাধু কারবারীরাও এদের সুপরিকল্পিত কর্মোদ্যোগ দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠবে।

চশমা পরা উপকারী লোকটির পিছু পিছু ছায়ার মত চলেছে হাসারি। রাজ-পথ, গলিপথ ঘুরে চোরঙ্গী পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা পার্ক স্ট্রীট পেঁছিলো। পার্ক স্ট্রীটের বিলাসবহুল রেস্তোরা এবং নাইট ক্লাবের অংশটা পেরিয়ে কিছুটা গেলেই অনেকগুলো রক্ত বিক্রির ডিস্পেনসারি আছে। এদের মধ্যে একটা ডিস্-পেন্সারির ঠিকানা ৪৯ নং র‍্যান্ডাল স্ট্রীট। আগে এটা একটা গ্যারেজ ছিল। ওরা দরজার গোড়ায় পেঁছতে না পেঁছতেই রোগাটে মুখের একটা লোক ওদের ইংগিতে দাঁড়াতে বললো। পানের রঙে লোকটার মুখটা টকটকে লাল। ওরা থামতে লোকটা এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'রক্ত দেবে?' হাসারি দেখলো তার সঙ্গের লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিল। রোগা মুখের লোকটা তখন চোখের ইসারায় তাকে অনুসরণ করতে বললো। চলতে চলতে রোগা লোকটা বললো, 'আমি আর একটা জায়গা জানি যারা চল্লিশ টাকা দেয়। আমার পাঁচ আর বাকীটা তোমাদের দু-জনের। রাজী থাকো ত' বলো?

এই লোকটাও মাড়াইযন্ত্রের একটা ধারালো দাঁত। আর একটা প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকের হয়ে শিকার ধরে বেড়ায়।

সি. আর. সি., এই আদ্যক্ষর তিনটি তিনজন মালিকের নাম এবং এদের নামেই এই প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কের কারবারটি চলছে। শহরের অন্যতম পুরনো ব্লাড ডিসপেন্সারি এটি। উদারতা দেখিয়ে এরা দশ টাকা বেশি দেয় না। রক্তদাতার শরীর থেকে দু আউন্স রক্ত বেশি টেনে নেয় এরা এবং দশটা টাকা বেশি দেয়। তবে খালি পেটের যে মানুষটা রক্ত দিতে এসেছে তার কাছে এই অতিরিক্ত পাওনার দাম আছে। টাকার পারিশ্রমিক ছাড়াও আর একটা পুরস্কার মেলে রক্তদাতাদের, একটি কলা এবং তিনটি গ্লুকোজ বিস্কুট।

শহরের একজন সুপরিচিত হেমাটোলজিস্ট এই সি আর সির অন্যতম মালিক। এর নাম ডাক্তার রানা। ভুয়া কারবারের যে জাল চারিদিকে ছড়ানো আছে তার একটা শক্ত খুঁটি এই লোকটা। বলা যায় চাকার আর একটা হিংস্র দাঁত সে। আবার সরকারী ব্লাড ব্যাঙ্কেরও একজন ডিরেক্টর সে। ফলে বেশি পারিশ্রমিকের লোভ

দেখিয়ে রক্তদাতাদের সি আর সির দিকে পরিচালিত করা মোটেই অসাধ্য কাজ নয়। তার জন্যে যা দরকার তা হলো কিছু লোকের সাহায্য যারা কানাকানি করে খবরটা ছড়িয়ে দিতে পারবে এবং গ্রাহক এলে সুকৌশলে জানিয়ে দেবে যে বিশেষ গ্রুপের রক্তটি পাওয়া যাবে সি আর সি নামক প্রাইভেট ব্লাড ব্যাংকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে আবশ্যিকভাবে করণীয় যে পরীক্ষাবিধি ধার্য করা আছে তার প্রায় কিছুই পালন করে না প্রাইভেট রক্তসংগ্রাহকরা। অথচ পরীক্ষাগুলো খুবই সাধারণ এবং মোটেই খরচ সাপেক্ষ নয়। রক্তকণিকায় হেপাটাইটিস বি এবং যৌনব্যাধিজনিত ভাইরাস সংক্রমণের অস্তিত্ব দেখাই এই পরীক্ষাবিধির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সামান্যতম এই পরীক্ষাবিধিও প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি পালন করে না, কারণ এই ভুয়া কারবারীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো লাভের অংক বাড়ানো।

হাসারিকে ওরা একটা টুলের ওপর বসতে বললো, তারপর একজন লোক এসে ওর ওপর হাতে একটা রবারের নল টানটান করে বেঁধে দিল। আর একজন এসে ওর কনুইয়ের খাঁজে একটা সূঁচ ফুটিয়ে দিল। ও লোকদুটো এবার বোতলের মধ্যে জমা পড়া রক্তের দিকে চেয়ে থাকে। হাসারিও দেখছিল। বোতলের মধ্যে রক্তের পরিমাণ যত বাড়ছে ততই তার শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছিল। মশক থেকে জল বের করার পর সেটা যেমন হাল্কা হয়ে যায় তেমনি হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল দেহখোল থেকে রক্ত শুষে নেবার পর। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাসারির শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, সারা মুখে ঘামের বড় বড় ফোঁটা, শরীরে কেমন যেন শীত শীত ভাব। লোকগুলো যা বলাবলি করছে তা কানেও ঢুকছিল না। বরং তার মনে হচ্ছিল অন্য গ্রহ থেকে যেন অদ্ভুত ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। এইসময় নাগাদ সেই চশমাপরা উপকারী লোকটা তার শরীরটা ঝাঁকিয়ে দিল হাসারির দৃষ্টির সামনে। হাসারি চিনতে পারলো তাকে। তারপর দুটো হাত দিয়ে কেউ যেন তাকে শক্ত করে টুলের ওপর চেপে ধরলো। তখনই তার চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। নেতিয়ে পড়লো সে ওদের হাতের ওপর।

এদের কাছে এ ধরনের ঘটনা এত তুচ্ছ যে লোক দুটো প্রায় অচেতন হাসারির দিকে একবার চেয়েও দেখলো না। এমন দৃশ্য তারা রোজই প্রায় দেখছে। পয়সার লোভে লোকগুলো রক্ত বেচে দিতে আসে তারপর নেতিয়ে পড়ে। শুধু রক্ত কেন হয়ত শরীরের হাড়মজ্জাও বেচে দিতে তৈরি এরা।

হাসারি আবার যখন চোখ খুললো তখন তার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে। সাদা পোষাক পরা একটা লোক তার মুখের সামনে একটা কলা ধরে ঠাট্টা করে বলে উঠলো, 'কলাটা খেয়ে নাও তো! দেখবে শরীরে ভীমের বল পাচ্ছ!' লোকটা হ্যা হ্যা করে হেসে এবার একটা রসিদ বই নিয়ে এল, তারপর হাসারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'নাম কি?' লোকটা এরপর রসিদ বইতে খসখস করে কি সব লিখলো। তারপর বই থেকে কাগজটা ছিঁড়ে হাসারিকে হুকুম করলো, 'সই করো!' লোকটার দেখানো জায়গায় একটা কাটা চিহ্ন দিয়ে চল্লিশটা টাকা পেল হাসারি। যে শকুন দুটো তাকে এখানে এনেছে এবার তাদের সঙ্গে বখরা করবে সে বাইরে গিয়ে। কিন্তু হাসারি জানলো না যে, সে পঁয়তাল্লিশ টাকার রসিদে সই করে চল্লিশ টাকা পেল। যে লোক দুটো তার শরীর থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে তারাও এর ভাগ নিল।

অনেক পথ মাড়িয়ে অনেক কষ্ট করে হাসারি যখন তার ফুটপাতের ছোট্ট সংসারে

ফিরে এল তখন মাথাটা হাল্কা হয়ে গেছে। শরীরটা টলছে নেশা করা লোকদের মত। ওর ভাগের সাড়ে সতেরো টাকা থেকে সে পাঁচটা টাকা বাজে খরচ করবে ঠিক করেছিল। তাই ফেরার পথে পাঁচ টাকার বরফি সন্দেশ কিনে এনেছে ছেলে-মেয়েদের জন্যে। আর এনেছে কয়েক ঠোঙা মুড়ি। এই নিষ্ঠুর অমানুষ শহরে তার প্রথম রোজগারটি এইভাবে স্মরণীয় করে রাখতে চাইছিল সে। শুধু তার ছেলেমেয়ে নয়, ফুটপাতের প্রতিবেশী পরিবারটিও যেন এই আনন্দের অংশ পাক এটাই তার কামনা ছিল। আর একটি গোপন কামনা সে এতকাল মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। যেতে আসতে সে রোজই দেখতো ফুটপাতের গায়ে কুলুঙ্গির মধ্যে ছোট্ট ছোট বাহারি দোকানগুলো পান মসলা সাজিয়ে যেন হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। আজ সেইরকম একটা বাহারি দোকানের সামনে সে এসে দাঁড়াল। নিস্পৃহ উদাসীন-তায় একমনে খিলি করে পান সাজছে দোকানী। হাসারির হাতে দোকানী একটা পান সেজে দিল। চুন, খয়ের আর মিষ্টি মসলা দেওয়া পানটা মুখে পুরে অননু-ভূত এক আনন্দের শিহরন হ'ল যেন হাসারির মনে। তার মনে হলো সে যেন নতুন উদ্যম পেল।

স্বামীকে ওইভাবে আসতে দেখে অলকার বুকটা ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিল। 'হা ভগবান! মানুষটা কি আবার নেশা করেছে?' কিন্তু হাসারির দুহাত ভর্তি মুড়ির ঠোঙা আর মিষ্টির বাক্স দেখে বুকটা অন্য আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে উঠলো। 'চুরি, ডাকাতি করে নি তো ও?' কথাটা মনে হতেই প্রায় ছুটেই সে স্বামীর কাছে গেল। কিন্তু ছেলেমেয়েরা তার আগেই বাপের কাছে পৌঁছে গেছে। মরা হরিণ মুখে করে আনা বাঘের সামনে ছানারা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি হাসারির ছেলেমেয়েরাও ছেঁকে ধরলো বাপকে। তারপর ছিনিয়ে নিল তার হাতের ঠোঙাগুলো।

এই টানাটানি আর হুড়োহুড়ির মধ্যে হাসারির হাতের খাঁজের মধ্যে ছোট্ট লাল বিন্দুটার দিকে কারো নজর পড়লো না।

দশ

হ্যাঁ! শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গাতেই সে পৌঁছতে পেরেছে ভেবে মনে মনে ভারি খুশী হলো স্তেফান। শুধু খুশী নয় তৃপ্তিতে ভরে গেল তার মন। হঠাৎ অনেক কিছু পেলে মনটা যেমন ভরা হয়ে যায় তেমনি পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল নিজেকে। সে ভাবলো সে ঠকে নি। ঠিক এইরকম একটা পরিবেশই ত' মনে মনে সে কল্পনা করেছিল! এইরকম নোংরা থিকথিকে আবর্জনাময় পরিবেশ, যেখানে মানুষ জন্তু শিশু নারী সবাই এক হয়ে গেছে কাদামাটির দেওয়াল আর টিনের চালার তৈরি ছোট ছোট পায়রার খোপের মধ্যে। এদের ঘিরে রেখেছে অজস্র গলিপথ আর আবর্জনায় ভরপুর হয়ে থাকা খোলা ড্রেন। বাতাসে বিষের ছোঁয়া, তবুও বুক ভরে টানছে সেই বাতাস। আকাশের বুক চিরে উঠেছে যেন শব্দের পাহাড়। সে এক কোলাহলময় বিচিত্র পরিবেশ। সবাই কথা বলছে চেঁচিয়ে, চড়া সুরে বাজছে লাউডস্পিকারের গান, কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ ঝগড়া করছে। স্তেফান কোভালস্কীর মনে হয়েছে ঠিক এমনটিই সে চেয়েছিল তাই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এনে ঈশ্বর যেন সেটিই মিলিয়ে দিলেন তাকে। পরবর্তীকালে

স্তেফান ভেবেছে, 'যেখানে আমার থাকার কথা সেখানেই শেষ পর্যন্ত পেঁছোনোর পুরস্কারটি আমি পেলাম। মনেপ্রাণে যেটি চেয়েছি, পশ্চিমী দুনিয়ার কোনো মানুষের কপালে যা জোটে নি, তাই-ই আমায় পাইয়ে দিলেন ঈশ্বর। শুধু উল্লাস খুশী নয়, আমার মন যেন কৃতার্থ হলো তাঁর করুণায়। এত খুশী হয়েছিলাম যে মনে হচ্ছিল খালি পায়ে জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারি।'

মাত্র ক'টা দিন আগেই সে হাওড়া স্টেশনে নেমেছে। যেদিন নেমেছে সেদিনই স্তেফান কলকাতার বিশপের সংগে দেখা করতে গিয়েছিল। একটা চমৎকার ঔপনিবেশিক বাংলো ধরনের বাড়িতে বিশপ থাকেন। বাংলো বাড়ির চারপাশে ছড়ানো বাগানটি যেন বাংলো বাড়ির ঔপনিবেশিক মর্যাদাটি রক্ষা করছে। বিশপ মহোদয় এদেশে বহুদিন বসবাসকারী একজন ইংরেজ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনে সাদা জোব্বা, মাথায় লাল রঙের আঁট টুপি এবং আঙুলে পাদরীর আংটি। বিশপ মহোদয়ের সাজপোশাক চালচলন সবটাই মার্জিত, বনেদী।

আত্মপরিচয় দিয়ে স্তেফান সরাসরিই বললো, 'আমি গরিব মানুষদের সংগে একত্রে থাকতে চাই।'

প্রধান ধর্মযাজক একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তার কোনো অসুবিধে হবে না। এখানে গরিবরা সর্বত্রই আছে।' এই বলে স্তেফান কোভালস্কীর হাতে গংগার ওপারের শ্রমিক পল্লীর মধ্যে অবস্থিত এক ভজনালয়ের পাদরীর নামে সই করা নিজের পরিচয়পত্র দিলেন।

বিশপের সই করা সেই পরিচয়পত্র নিয়ে স্তেফান যখন গংগার ওপারে পেঁছলো তখন বেশ বেলা। দূর থেকেই দুই গম্বুজওলা সাদা রঙের গির্জার মাথাটি দেখা যায়। গির্জা ভবনটিরও চোখ জুড়ানো কারুকার্য দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। জানলায় জানলায় চিত্রশোভিত রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়েছে গির্জার মধ্যে। সেখানে শোভা পাচ্ছে খ্রীশ্চান সাধুসন্তদের পাথরের প্রতিমূর্তি। একপাশে রাখা আছে একটি দানপাত্র। সিলিং থেকে ঝুলছে বৈদ্যুতিক পাখা। পাখার তলায় যে আসনগুলি পাতা সেগুলি নির্দিষ্ট আছে সম্মানিত ভক্তদের জন্যে। আশ্রমের নামটিও যেন পথেঘাটে পড়ে থাকা অসংখ্য নিরাশ্রয় মানুষকে ব্যংগ করছে। চওড়া তোরণদ্বারের মাথায় ঝলমলে অক্ষরে লেখা আছে এই খ্রীষ্টীয় আশ্রমের নাম, 'আওয়ার লেডি অফ দ্য লাভিং হার্ট'।

এই যাজনপল্লীর যিনি প্রধান অর্থাৎ এই প্যারিশের (Parish) যিনি রেক্টর তিনি একজন গোয়ানীজ। তাঁর নাম ফাদার এ্যালবের্তো কার্দিয়েরো। ভদ্রলোকটির গায়ের রঙ যেমন ঘোর কালো, তেমনি কালো তাঁর মাথার সযত্নে আঁচড়ান চুল। গোল মুখ, ভরাট চিবুক এবং প্রসৃত উদর সমেত তাঁর গোলাকার চেহারাটি দাম্ভিক এবং পরিপাটি। ফলে ধপধপে সাদা পাদরীর পোশাকটি পরে যখন ইনি চলাফেরা করেন, তখন তাঁকে গরিব মানুষের আপনজন বলে মনে হয় না মোটেই। বরং মনে হয় যেন পরম সম্মানিত কোনো রোমক রাজপ্রতিনিধি। ফলে তাঁর সেবার জন্যে খ্রীশ্চান ভৃত্যকুল সর্বদাই তটস্থ হয়ে আছে। তাঁর এই আশ্রমবাস যাতে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যময় থাকে তার জন্যে তারা সদাই সচেষ্ট।

এই পরিবেশে জীন্সের প্যান্ট আর বাস্কেটবল জুতো পরে একজন বিদেশী ফাদার দুম করে এসে পড়ায় আশ্রমের ধর্মীয় চেহারাটা হঠাৎ যেন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ফাদার এ্যালবের্তো তাই যে প্রশ্নটা করলো সেটি

তার ক্ষেত্রে সংগত। লোকটা স্তেফানের আপাদমস্তক দেখে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি পাদরীর পোশাক পরেন না?'

'পরি। তবে আপনাদের দেশে বিশেষ গরমকালে ওই পোশাকে ঘুরে বেড়ানো খুব আরামের হয় না।'

'হুঁ।' একটা ছোট নিশ্বাস ফেললো ফাদার। তারপর সখেদে বললো, 'আপনাদের মানে বিদেশীদের মানিয়ে যায়। কেউ কিছু ভাবে না। তাই খেয়াল-খুশি মতন আপনারা চলতে ফিরতে পারেন। সম্মান ভক্তিরও হানি হয় না। কারণ আপনারা সাদা চামড়ার মানুষ। কিন্তু আমাদের বেলায় ঠিক উল্টো। ভারতীয় পাদরীদের বেলায় এই পোশাকটাই হলো পরিচয়। আবার নিরাপদ আশ্রয়ও বলতে পারেন একে। দেশটা ধর্মের তো! তাই ধর্মের নামে এখানকার মানুষ খাতির-সম্মানটা আমাদের দেয়।'

ফাদার কর্দিয়েরো এবার বিশপের চিঠিটা পড়লো। তারপর জিজ্ঞসু চোখে স্তেফানের দিকে তাকালো।

'সত্যিই কি আপনি বস্তিতে গিয়ে থাকতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই ত এখানে এসেছি।'

ফাদার কর্দিয়েরো যেন আঁতকে উঠলো স্তেফানের কথা শুনে। গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। একসময় পায়চারি থামিয়ে স্তেফানের দিকে সরাসরি চেয়ে বললো, 'কিন্তু একজন খ্রীশ্চান যাজকের ব্রত তা নয়।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে স্তেফান তাকিয়েছিল। ফাদার বলে চললো, 'এখানকার মানুষ শুধু অপরের ঘাড়ে থাকতে চায়। তাদের সেবার জন্যে যদি আঙুলের ডগাটা এগিয়ে দেন ত পুরো হাতটাই চেয়ে বসবে তারা। না বন্ধু, না। শুধু একসংগে থেকে আপনি তাদের কোন উপকার করতে পারবেন না। এতে ওদের কুঁড়েমি উস্কে দেওয়া হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না। কোনদিন ওরা স্বাবলম্বী হতে শিখবে না।' কথাটা শেষ করে ফাদার এবার স্থাণুর মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো স্তেফানের সামনে। তারপর বললো, 'তাছাড়া আপনি ত চিরকাল এখানে থাকবেন না। একদিন যেতেই হবে। তখন ওরা আমার কাছে এসে নালিশ করবে যে ওদের জন্যে প্যারিশ থেকে কিছুই করা হয় নি। আমাদের মানে ভারতীয় পাদরীদের যদি এরকম নালিশ শুনতে হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ওরা আমাদের একটুও খ্যাতিরসম্মান করবে না।'

বস্তিতে গিয়ে ওদের সংগে থাকার প্রস্তাবটা কর্দিয়েরোর মাথাতেই আসে নি। তবুও স্তেফান কোভালস্কীর মনে হয়েছিল যে ফাদারের এই অনিচ্ছা ঠিক নির্দয়তা নয়। আসলে এ দেশের সাধারণ মানুষ থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখবার প্রবণতা ওদের মধ্যে অনেকদিন ধরেই আছে। এ মনোভাবটা সম্ভবত এসেছে এ দেশের চিরাচরিত স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ধারণা থেকে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ফাদার কর্দিয়েরো বুঝতে পারলো স্তেফান কোভালস্কীর মনের ইচ্ছেটা এবং সেই মত একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহকারীর হাতে স্তেফানের দেখাশোনার ভার ছেড়ে দিল। সেই খ্রীশ্চান যুবকটিই কাছের বস্তি উপনগরী আনন্দ নগরে স্তেফানের জন্যে একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল।

পরের দিন বেলা পাঁচটা নাগাদ স্তেফানকে সংগে নিয়ে সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটি বস্তি উপনগরের গেটের সামনে গিয়ে পৌঁছলো। তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে।

ডুবন্ত সূর্যের লাল আলো যেন ধূসর ভাপের আবরণে ঢাকা পড়ে ফিকে দেখাচ্ছে। সর্বত্র উনুন জ্বলছে, রাতের রান্নার যোগাড় করছে গৃহস্থ। নাকে লাগছে পোড়া গন্ধ। সরু গলিপথে বাতাস যেন থমকে আছে পাকানো ধোঁয়ার জটে। জ্বালা করছে গলা আর ফুসফুস। তখন সমস্ত বস্তি জুড়ে একটাই শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল —অসংখ্য মানুষের বুকের খাঁচা থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা কাশির ঐকতান।

কলকাতায় আসার আগে ভারতবর্ষের বস্তিজীবন সম্বন্ধে একটা আলগা ধারণা স্তেফানের হয়েছিল। মাদ্রাজ অঞ্চলে একটা খনি মজুরের বস্তিতে কয়েকটা দিন সে ছিল খোলামেলা পরিবেশে গড়ে ওঠা সেই বস্তিতে অধিবাসীরা মন থেকে আশার আলো নিভিয়ে দেয় নি। রোজ সকালে কাজে যাবার আগে তারা ভাবতো এই হতাশা থেকে একদিন মুক্তি পাবেই। একদিন না একদিন ওরা ঠিক শ্রমিক কলোনীর পাকা বাড়িতে উঠে যাবে। কিন্তু এখানকার বস্তিবাসীরা ঠিক উল্টোটি ভাবে। তারা জানে যে এখানেই তারা চিরকাল থাকবে কারণ এখানকার জীবনযাপন আর কর্ম-ধারার সংগে তারা যেন আপনা আপনি মিশে গেছে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গাইডের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে স্তেফানের মনে হলো এখানকার মানুষগুলো কি সত্যিই 'স্বভাব কুঁড়ে', যেমনটি ফাদার কর্দিয়েরো বলেছিল? বরং বিপরীতটাই মনে হলো স্তেফানের। এদের স্বভাব যেন পিঁপড়েদের মতন। সবাই কিছু না কিছু কাজ করছে। থুনখুনে বুড়ো থেকে শুরু করে সবে হাঁটতে শেখা বাচ্চাটা পর্যন্ত কাজের পসরা নিয়ে দোরগোড়ায় বসেছে। কেউ বেচছে, কেউ কিছু বানাচ্ছে, কেউ মেরামত করছে, কেউ কাঁসা-পিতল ঝালাই করছে, কেউ ছেঁড়া-ফাটা সেলাই করছে, কেউ আটা দিয়ে কিছু জুড়ছে। এইভাবে এতটা রাস্তা এই কর্মচাঞ্চল্য দেখতে দেখতে স্তেফান যখন গাইডের ইংগিতে থামলো, তখন তার সারা শরীর টলছে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন আকণ্ঠ মদ খেয়েছে।

ওরা যেখানে এসে থামলো সেটা জানালাহীন একটা চোর-কুঠুরি। দুটো মোটা তক্তা জোড়া দিয়ে কুঠুরির দোর বানানো হয়েছে। দোরের গায়ে ঠিকানা লেখা ৪৯ নম্বর নিজামুদ্দিন লেন। উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখলো সংগের লোকটা। মাটির মেঝে, মাথায় টালির ছাত। মাঝে মাঝে টালি সরে গেছে। সেই ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। চওড়ায় তিন ফুট আর লম্বায় ছ'ফুট ঘরখানায় কোনো কিছু নেই। নেই বিদ্যুৎ, নেই কলের জল। কিন্তু কোভালস্কীর ভারি পছন্দ হয়েছে ঘরখানা। মনে মনে তারিফ করলো লোকটার পছন্দের। 'ঠিক এমনটিই চেয়ে-ছিলাম। অভাব আর দারিদ্র্যের সংগে ঠিক যেন মানিয়ে যায় ঘরখানা। বাড়তি পাওনা হলো এই পরিবেশ। একেবারে আদর্শ।'

দোরগোড়া দিয়ে বয়ে চলেছে পাঁক ভর্তি খোলা নর্দমা। নালার পাঁক তুলে জড়ো করেছে ঘরের সামনে। নালার বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা তক্তা দিয়ে ঢেকে তৈরি হয়েছে একটা চায়ের দোকান। দোকানের মাথাটা বাঁশের ছাউনি দিয়ে ঢাকা। চায়ের দোকানের মালিক হিন্দু। এ এলাকার আর সবাই মুসলমান।

খানিক পরেই ঘরের মালিক এল। বেশ মজবুত চেহারার লোকটা বাঙালী। পরনে প্যান্টসার্ট। দেখলেই মনে হয় বস্তির মধ্যে একজন পয়সাওলা লোক। বেশ খানকয়েক ঘরের মালিক সে। লোকটা পাশের দোকান থেকে কয়েক কাপ চা আনাল; তারপর কোভালস্কীর আপাদমস্তক সরু চোখে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'ফাদার আপনি এখানে ঠিক থাকবেন ত'?'

'নিশ্চয়ই!' তারপর লোকটাকে স্তেফান জিজ্ঞেস করলো, 'কত ভাড়া দিতে হবে?'

'পঁচিশ টাকা। ভাড়াটা আগাম দিতে হবে।'

স্তেফানের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সঙ্গী আঁতকে উঠলো লোকটার কথা শুনে। 'এই ঘরের ভাড়া পঁচিশ টাকা? যার একটা জানলাও নেই? এ'ত দিনে ডাকাতি!' স্তেফান অবশ্য ইঙ্গিতে থামিয়ে দিল লোকটাকে। বললো, 'আমার এতেই হয়ে যাবে।' এই বলে পকেট থেকে টাকা বার করে লোকটার হাতে দিল। 'এই নিন, তিন মাসের ভাড়া আগাম।' পরে তার মনে হয়েছিল সে যথার্থই ভাগ্যবান। নইলে এমন ঘরে তাকে দশ-বারোজন লোকের সঙ্গে থাকতে হতো। 'এতো খুশী হয়েছিলাম সেদিন ঘরখানা পেয়ে যে আকাশের চাঁদও বরাবরের জন্যে ছেড়ে দিতে পারতুম।'

দেনা-পাওনা মিটলে ফাদার কার্দিয়েরোর দূত একটুও সময় নষ্ট না করে আনন্দনগরের অন্য খ্রীশ্চানদের সঙ্গে স্তেফানের আলাপ করিয়ে দিল। খ্রীশ্চানপল্লীর মানুষগুলো চরমতম দরিদ্র। তারা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না যে জীন্স পরা সাদা চামড়ার এই সাহেব লোকটা একজন পাদরী। কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের সন্দেহ কেটে গেল, ওমনি স্তেফানকে তারা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলে ধরে নিল। 'আমি হয়ে উঠলাম ওদের পরিত্রাতা।' পরবর্তীকালে স্তেফান যখনই সেই পুরনো কথা ভেবেছে, তখনি সেইসব ঘটনা মনে পড়ে গেছে। একটি যুবতী মেয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে আছড়ে পড়লো তার পায়ের ওপর। 'বাবা! আমার খোকাকে আশীর্ব্বাদ করে যাও! তুমি এয়েচ এ আমাদের কত ভাগ্যি। সব্বাইকে আশীর্ব্বাদ করে যাও বাবা!' তারা সবাই তখন স্তেফানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। ওদের মাথায় হাত দিয়ে সবাইকে আশীর্ব্বাদ করলো স্তেফান। ওরা যখন বুঝলো যে স্তেফান ওদের সংগে এই বস্তিতে থাকতে এসেছে, তখন সবাই মিলে ওর ঘর গুছিয়ে দিল। কেউ আনলো বালতি, কেউ ছেঁড়া মাদুর, কেউ একটা তেলের কুপি। একখানা কম্বলও দিয়ে গেল একজন। স্তেফানের মনে হচ্ছিল যারা বেশি গরিব তাদেরই দেবার আগ্রহ যেন সব থেকে বেশি। সে রাত্রে যে লোকটা তাকে ঘরে পেঁছে দিয়ে গেল, তার হাত ভরা ছিল নানান উপহারে।

এমনি করে শুরু হলো স্তেফানের নতুন জীবনের প্রথম সন্ধ্যাটি। এই সন্ধ্যার অস্তিত্ব যেন নিবিড়ভাবে তার সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই যখনই সে কথাটা ভেবেছে তখনই মনে মনে ফিরে গেছে সেই দিনের সন্ধ্যায়। 'তখনই বেশ রাত হয়ে গেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রাতটা একটু তাড়াতাড়ি নামে। তেলের কুপিটা জ্বালিয়ে দিলুম। যারা কুপিটা দিয়েছে সেই মানুষগুলো বোধশক্তিহীন অসাড় নয়। তাই যাবার সময় ক'টা দেশলাইয়ের কাঠিও পাশে রেখে গেছে। এরপর ওদের দেওয়া মাদুরটা মেঝেতে পেতে মাটির দেয়ালে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম এবং আমার থলিটা খুললাম। মার্সেল শহরের আরবী পাড়া থেকে এটা কিনেছিলুম। ঝোলা থেকে বের করলুম আমার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, আমার টুথব্রাশ, একটা ছোট্ট ওষুধের বাক্স। আমার কারখানার সতীর্থরা এই ওষুধের বাক্সটা আমায় দিয়েছিল। এরপর বের করলাম একটা আণ্ডারপ্যান্ট আর একখানা সার্ট। সবশেষে বের করলুম জেরুজালেমের পবিত্র বাইবেলখানি। এককথায় এগুলোই আমার যাবতীয় সম্পত্তি যা আমার অধিকারে তখন ছিল। বাইবেলখানা হাতে নিয়ে

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা ছবি বেরোল তার ভেতর থেকে। আমার সর্বক্ষণের সংগী এই ছবিখানা যা দুঃসময়ের দিনেও আমার কাছ ছাড়া হয় নি কখনও। ধীরে ধীরে ছবির ভাঁজ খুললাম। তারপর নিবিষ্ট মনে অনেকক্ষণ ধরে ঠায় চেয়ে রইলাম ছবিখানার দিকে।'

ছবিখানি তুরীনের বস্ত্রাচ্ছাদিত পবিত্র যীশুর মূর্তি। স্তেফানকে ছবিটা তার বাবা দিয়েছিলেন। যীশুর মুখের ছাপটি যেন অবিকল ফুটেছে ছবিতে। চোখ দুটি মাটির দিকে নামানো, গাল দুটি ফোলা, ভুরুর মাঝখানে সরু ফোঁড় এবং ছেঁড়া-খোঁড়া দাড়ি—এই মানুষটিই একদিন ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই সন্ধ্যায় স্তেফানের মনে হচ্ছিল যেন বস্তির শহীদদের মধ্যে যীশু অবতারস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। 'আমার মত একজন দায়বদ্ধ খ্রীশ্চানের কাছে বস্তির সবাইকেই যীশুর মত মনে হচ্ছিল। যেন সব মানুষের মুখই যীশুর মুখ। গোলগোথার উত্তুংগ শীর্ষদেশ থেকে মানবজাতির উদ্দেশে ঘোষণা করে বলছেন যে হেরে যাওয়া বাতিল মানুষের সব যন্ত্রণা সব আশা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছে। তাই ত' আমার এখানে আসা! যেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর আর্তকান্নার স্বর 'আমি তৃষ্ণার্ত' আমার কানে গেছে। যারা প্রতিদিন ক্রুশদণ্ডে আরূঢ় হচ্ছে অথচ বিচার পাচ্ছে না, তাদের চাপা বোবা মুখে ভাষা দিতেই আমার আসা। একটুও আক্ষেপ না রেখে এমন বীরের মত মরতে পারে না পশ্চিমের কোনো মানুষ। যীশুর এই বিগ্রহটি স্থাপন করার যোগ্যস্থান তাই এই বস্তির ঘর।'

মাটির দেওয়ালে দুটো দেশলাই কাঠি পুঁতে স্তেফান কোভালস্কী ছবিটা টাঙাল। খানিক পরে সে প্রার্থনা করতে বসলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। বোধহয় খানিকটা সময় লাগবে এই নতুন পরিবেশটা মানিয়ে নিতে। সে যখন এইসব কথা নিবিড়ভাবে ভাবছিল, তখন দোরগোড়ায় পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটা মেয়ে। তার খালি পা, গায়ের জামাটাও শতছিন্ন, কিন্তু চুলের বেণীর গোড়ায় একটা ফুল গোঁজা। মেয়েটার হাতে এ্যালুমিনিয়ামের একটা কানা উঁচু থালা। থালার ওপর ভাত তরকারি। ভারি যত্ন করে সে ভাত তরকারির থালাটা স্তেফানের সামনে রাখলো। ছোট ছোট হাত জড়ো করে স্তেফানকে নমস্কার করে ফিক করে হাসলো, তারপর ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। 'আমার মনে হলো পরম করুণাময় ঈশ্বর মেয়েটির রূপ ধরে আমার আহার্য পাঠিয়ে দিলেন। অপরিচয় সত্ত্বেও আমার এই ভাই-বোনেরা ক্ষুধার অন্ন পরিবেশন করছে। তাই ওদের মত হাত দিয়ে ওদের দেওয়া ক্ষুধার অন্ন গ্রহণ করতে লাগলাম। সেই নিঃস্ব জীবনের তন্ময় গভীরতার মধ্যে সব কিছুই যেন সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এমনকি ভাতের কণার সংগে আঙুলের ছোঁয়াও তখন আমার কাছে সুস্পষ্ট ইংগিতবাহী মনে হচ্ছিল। যেন ভাতের কণাগুলো প্রাণহীন খাদ্যসামগ্রী নয়, নয় শুধু পেটভরানোর বস্তুবিশেষ। এ যেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। অন্নময় প্রাণ।'

ন'টা নাগাদ রাস্তার কোলাহল প্রায় থেমে এল। কিন্তু বস্তির জীবনযাপন তখনও স্তব্ধ হয়ে যায় নি। কোভালস্কীর কানে আসছিল আশপাশ থেকে ভেসে আসা মানুষের আলাপ, তাদের কথা-কাটাকাটি, বচসা, হাসিকান্না ইত্যাদি। এরপর শুরু হলো আজানের ধ্বনি, সংগে কোরানপাঠ। সেটা থামতে না থামতেই শুরু হলো সমবেত কণ্ঠের 'ওম' মন্ত্রপাঠ। 'ওম' মন্ত্রপাঠ ভেসে আসছে চায়ের দোকানের ভিতর থেকে। স্তেফানের মনে হলো এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে

এই 'ওম' ধ্বনির মধ্যে। তাই 'ওম' মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে হিন্দুর আধ্যাত্মসত্তাটি আপ্লুত এবং মন ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়। দক্ষিণ ভারতের একটা ছোট্ট গ্রামে স্তেফান কোভালস্কী সর্বপ্রথম এই 'ওম' মন্ত্র শোনে। সেদিন থেকে ওম' মন্ত্রের অনুরণন তার মনে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তার সেদিন মনে হয়েছিল যে 'ওম' মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাকুলতা এত প্রগাঢ় যে অন্য ধর্মের প্রার্থনাতেও এই মন্ত্রের অভিষেক হতে পারে। তাই সে নিজেও এই মন্ত্রোচ্চারণে অভ্যস্ত হতে চেয়েছিল যীশুর কাছে প্রার্থনা নিবেদনের মধ্যে ওম' মন্ত্রোচ্চারণ একটা অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দভাব মনে আনে। এ মন্ত্র যেন হৃদয়স্থল থেকে সরাসরি উৎসারিত হয়। 'সেই রাত্রে আমি যখন প্রথম ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওম' মন্ত্রোচ্চারণ করলাম, তখন এমন এক অনুভূতি হলো যেন আমি ঈশ্বর সমীপে এসেছি, ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। এই নিবিড় উপলব্ধি আমায় আরও একধাপ তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। আমার মনে হলো এই হতাশাপীড়িত বস্তিপল্লীর মধ্যে আমার আসার কারণ বোধহয় এই উপলব্ধি।'

মাঝরাতের খানিক পরেই আনন্দ নগরের সব গুঞ্জন থেমে গেল। তখন আর শোনা যাচ্ছে না মানুষের বিস্রম্ভালাপ, মন্ত্রোচ্চারণ, নামাজপাঠ, শিশুর কান্না বা কাশির ধমক। আনন্দ নগর তখন নিমগ্ন হয়ে গেছে ঘুমে। ক্লান্তি আর অবসাদে প্রায় অসাড় স্তেফানও চোখ বুজে শুয়ে পড়ার দরকার বোধ করছিল। সার্ট আর জীন্স্-এর প্যান্টটা মুড়ে বালিশ বানিয়ে ফেললো স্তেফান। তারপর মাদুরের ওপর পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। তখনই সে আবিষ্কার করলো যে লম্বায় ঘরখানা ঠিক তার শরীরের মাপের অর্থাৎ ছ'ফুট। দেওয়ালে টাঙানো যীশুর ছবির দিকে শেষবারের মতন তাকিয়ে কুপিটা সে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল এবং চোখ বুজলো। অপরিসর ঘরের নিরেট অন্ধকারে তার মন ভরে গেল এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দে যা সে পাঁচবছর আগে তার অভিষেকের প্রথম দিনটিতেও পায় নি।

কিন্তু তখনি ঘুমোতে পারলো না। বরং ঠিক তার মাথার কাছে এক অপরিচিত শব্দের ঐকতান-বাদন শুনে সে ভয় পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি কুপিটা জেবলে সে যা দেখলো তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল স্তেফানের। এক দল ইঁদুর বাঁশের খুঁটি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠছে আর শব্দ করতে করতে দেওয়াল বেয়ে নেমে আসছে। এই সমবেত শব্দটাই স্তেফানকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। স্তেফান ভাবলো কাউকে না জানিয়ে সে ওদের তাড়িয়ে দিতে পারবে। এইভেবে সে ওদের জুতো পেটা করা শুরু করলো। কিন্তু নিষ্ক্রমণ যত দ্রুত হলো চালের ফুটো দিয়ে ওদের আগমণ তার চেয়েও দ্রুততর হতে লাগলো। বস্তুত, এই সমবেত আক্রমণের বিপুলতায় পরাস্ত হয়ে শেষ অবধি রণে ভঙ্গ দিতে হলো স্তেফানকেই। তার মনে হলো অবস্থা যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন, এই নতুন অবস্থাটি তাকে মানিয়ে নিতেই হবে, কারণ এই জীবনধারার সঙ্গে ঘটনাটা অবিচ্ছেদ্য হয়ে জড়িয়ে আছে। সুতরাং ওদের নিরবচ্ছিন্ন দৌরাত্ম্যের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই ভেবে সে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো জ্যান্ত একটা কিছু যেন তার চুলের মধ্যে বিলি কাটছে। তাড়াতাড়ি উঠে সে কুপিটা জ্বালালো। তারপর মাথা ঝাঁকাতেই দেখলো ঘন চুলের মধ্যে থেকে একটা উৎকট মাপের কেন্নো মাটিতে পড়লো।

স্তেফান চিরকালই মহাত্মা গান্ধীর অবিচল ভক্ত। তাঁর অহিংস নীতিও তার জীবনের নীতি। তবুও বিশাল মাপের এই জন্তুটাকে সে ক্ষমা করতে পারলো না। জুতো দিয়ে পিষে ফেললো সেটা। আবার কুপি নিবিয়ে শুয়ে পড়লো স্তেফান এবং 'ওম' মন্ত্র জপ করতে লাগলো, তাতে বিক্ষুব্ধ মনটা কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু আনন্দ নগর তার জন্যে আরও বিস্ময় জমিয়ে রেখেছিল এবং একটি একটি করে ঝাঁপি থেকে সেগুলো বার করতে লাগলো। ভারতীয় মশককুলের একটা আলাদা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এদের দংশনচাতুর্য ভারি সূক্ষ্ম। দংশন করার আগে এরা মানুষকে ত্যক্তবিরক্ত ক'রে সহ্যের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। হতাশ এবং দুর্বল মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হলে এরা হুলটি ফোটায়। ফলে বিষম পীড়নের পূর্বানুভব পর্বটাই সব থেকে যাতনাকর হয়। পীড়নের এই প্রথাটা যতটা না ভারতীয় তার চেয়ে অধিক চৌনিক বলেই অনুমান হলো স্তেফানের।

এই অবস্থায় মাত্র ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে পড়েছিল কোভালস্কী। হঠাৎ ঘুম ভাঙলো দারুণ একটা শব্দে। তার মনে হলো কাছেই কোথাও বোমা ফেটেছে। তাড়াতাড়ি ঘুমচোখে দরজা খুলে সে দেখলো গলির মুখে দাঁড় করানো কয়লার গাড়ি থেকে কয়লা নামানো হচ্ছে এবং পাশেই দাঁড়িয়ে আছে খোঁড়া দোকানদার। দোর দিয়ে ফের শুতে যাচ্ছিল কোভালস্কী, কিন্তু হলো না। সে দেখতে পেল যে দুটো আবছা মনুষ্যমূর্তি গুটিগুটি গাড়ির তলায় ঢুকছে। হঠাৎ দোকানদারের নজরে পড়ে গেল তারা। সংগে সংগে শুরু হলো বর্ষার ধারার মত অবিরাম গালিবর্ষণ। ছোঁচা হলেও চোর দুটোর হাড়েমাসে বোধহয় মর্যাদাবোধ তখনও কিছু ছিল। তাই গালাগালির জ্বালা থেকে মুক্তি পেতেই ছুটে পালাল। মনে মনে হেসে উঠলো স্তেফান কোভালস্কী। কিন্তু লোকদুটোর পদশব্দ মিলোতে না মিলোতেই শুনতে পেল আর একটা শব্দ। বলাবাহুল্য এর স্বর আলাদা। প্রথমে ঝপাং তারপরেই আর্তনাদ। স্তেফান বুঝতে পারলো পলাতকরা অন্ধকারে ঠাহর করতে পারে নি এবং আড়াআড়ি বয়ে যাওয়া চওড়া নালার মধ্যে পড়ে গেছে। শব্দ লক্ষ্য করে স্তেফান তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে গেল। কিন্তু তিন পা যাবার আগেই অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা অদৃশ্য হাত শক্ত করে তার পথ আটকে দিল। স্তেফান এক পা-ও এগোতে পারলো না।

অন্ধকারে লোকটার মুখখানা দেখতে না পেলেও স্তেফান বুঝেছিল লোকটা কি চায়। 'আনন্দ নগরের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে আমার ঢুকে পড়াটা অনধিকার বলেই মনে হয়েছে তার। তাই সে সেটা চায় নি।'

এগারো

রক্ত বেচা টাকায় হাসারি পালের পাঁচজনের সংসারে আহার জুটলো মোট চার দিন। এই ক'টা দিন ওরা সবাই প্রধাণত কলা খেয়ে পেট ভরিয়েছে। কলকাতা শহরে একমাত্র এই ফলটাই সস্তায় বিকোয়। তাই এ দেশের গরিব মানুষের কাছে এই ফলটি যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপে গৃহীত হয়। এর পুষ্টিগুণও বেশি, তাই হিন্দুদের পূজার্চনাতে এই ফলের ব্যবহার অনিবার্য। শুধু ফলটিই নয় ; দুর্গাপূজার মত প্রতিমা পূজাতে কলাগাছের চারারও ব্যবহার হয়। লালপাড় শাড়ি

দিয়ে কলাগাছের চারাটি মুড়ে মা-দুর্গার বেদির নিচে রাখা হয় এবং নিত্য পুজো হয় গণেশের স্ত্রীরূপে।

হাসারি পালের বড় ছেলে দুটি বড়বাজার থেকে খুঁটে খুঁটে যা নিয়ে আসে সেই দিয়েই ওরা পেট ভরায়। হাসারির রক্ত বেচা টাকার শেষ ক'টা পয়সা দিয়ে অলকা খানকয়েক ঘুঁটে কিনে আনলো। তারপর ফুটপাতের প্রতিবেশী গেরস্থর উনোনে আঁচ দিয়ে আনাজের খোসার একটা ঝোল রাঁধলো। যেদিন সেটুকুও জুটলো না সেদিনই সাহস করে হাসারি একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেললো। সে ঠিক করলো আবার কিছুটা রক্ত বেচে দেবে সে।

ডাক্তারি মতে হাসারির এই সিদ্ধান্তটা নিছক পাগলামি। তবে এই অমানুষ শহরে এমন পাগলামি অনেকেই করে। দুঃসময়ের দিনে যখন দারিদ্র্য বুকে চেপে বসে তখন এমন ক্ষ্যাপামি অনেককেই করতে হয় নিছক বাঁচার প্রয়োজনে। মেডিকেল রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে, এমনিভাবে অনেকেই প্রতি হপ্তায় রক্ত বেচতে যায়। সাধারণত তারা বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। হয় রক্তহীনতায় ভুগে পথে ঘাটে মরে পড়ে থাকে, কিংবা মাদার টেরেসার হোম বা ওই রকম কোনো সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানের বিছানায় শুয়ে নিভন্ত বাতির শেষ শিখার মতন জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ নিভে যায়। ওই রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন রক্তদাতার রক্তে হেমোগ্লোবিনের ভাগ ন্যূনতমের চেয়েও কম থাকে। কিন্তু কলকাতা শহরে এমন ক'টি ডাক্তারখানা বা ডিস্পেনসারি আছে যারা রক্তে হেমোগ্লোবিনের স্বল্পতা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়? বোধহয় একটিও না। যা-হোক, হাসারির জানা ছিল না যে তার রক্তে আবশ্যকীয় আধেয় বস্তুটির অভাব পূরণের বিকল্প ব্যবস্থাও আছে।

সেদিন সি আর সি নামক বেসরকারী ব্লাড ব্যাংকে রক্তের দাম এত বাড়তির দিকে ছিল যে দরজায় রক্তদাতাদের ভিড় হয়ে যায়। ফলে আশপাশের রক্তগ্রহণ কেন্দ্রের দালালরা শিকার ধরবার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেশি দরের লোভ দেখিয়ে দল ভাঙার চেষ্টা করছিল তারা। হাসারিকে দেখেই এমনি একজন আড়কাঠি তার পাশটিতে এসে দাঁড়ালো, তারপর ফিসফিস করে বললো, 'চল্লিশ টাকা! তিরিশ তোমার, দশ আমার! লোকটা পাকা ঘুঘু। তার সামনের দুটো দাঁত সোনা বাঁধানো। বেশ্যারা যেমন মক্কেলের কাছে নিজেদের দর কমিয়ে দেয় তেমনিভাব করছিল লোকটা। কিন্তু হাসারির দুশ্চিন্তা হলো। তিরিশ টাকা! অর্থাৎ আগের পাওনার প্রায় দ্বিগুণ! শেষমেশ টাকাটা সে পাবে তো ঠিক! কিন্তু হাসারি জানতো না যে কলকাতা শহরে পাট বা সরষের তেলের মত রক্তের দরেরও ওঠা নামা হয়। এটা সাধারণত নির্ভর করে দালালদের বিষয়বুদ্ধি আর নজরের তীক্ষ্ণতার ওপর। শিকারের ভালমানুষির যাচাই যদি নির্ভুল হয় তাহলে তাকে লুঠ করতেও বেগ পেতে হয় না। প্রথম নজরেই হাসারির বাঁ হাতের কনুইয়ের খাঁজের সূঁচ বেঁধানো জায়গাটা সে দেখে ফেলেছিল এবং বুঝে গিয়েছিল যে এ লাইনে হাসারি আনকোরা নয়।

হাসারিকে সঙ্গে নিয়ে লোকটা যেখানে গেল সেটা আর একটা বেসরকারী ব্লাড ব্যাংক। নাম প্যারাডাইস ব্লাড ব্যাঙ্ক। যথার্থই প্যারাডাইস। ভবনটির সুদৃশ্য ঝলমলে চেহারার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে গেছে নামকরণটা। গোলাপি রঙের বাড়ির মধ্যে ঢুকে হাসারি থতমত হয়ে গেল। কলকাতার এক সর্বাধুনিক এবং ব্যয়বহুল

ক্লিনিকের আউট হাউসের মধ্যে এই প্রাইভেট রক্তগ্রহণ কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে। রীতিমত জমকাল প.রিবেশ এবং আরামপ্রদ বসার জায়গা। সাধারণত ধনী মান্‌ষরাই তাদের পরিবারের লোকদের চিকিৎসার জন্যে এখানে আসে। সাদা ঝকঝকে পোশাক পরা ফর্সা ফর্সা য়্‌বতীরা নার্সের কাজ করে। যে মেয়েটি ব্লাড ব্যাঙ্কের কাজ দেখা-শোনা করে সেও য়্‌বতী। কিন্তু হাসারির মর্মান্তিক কর্‌ণ এবং হতভাগ্য চেহারা দেখে মেয়েটা আড়ালে ম্‌খ সিটকাল। তাড়াতাড়ি হাসারিকে পিছন দিকে হেলানো একটা চেয়ারে বসতে বললো। কিন্তু আগের দিনের মত সরাসরি হাসারির হাত থেকে রক্ত টেনে নিল না। বরং অবাক হয়ে হাসারি দেখলো যে মেয়েটি তার বাঁ হাতের তর্জনীর ডগা থেকে এক ফোঁটা রক্ত একটা কাঁচের প্লেটের গায়ে লাগিয়ে ভেতরে চলে গেল। যে লোকটা হাসারিকে সঙ্গে করে এনেছিল সে ততক্ষণে ব্যাপারটা ব্‌ঝে ফেলেছে। আপন মনে গজরাতে লাগলো লোকটা, 'মাগিটা আমার ক্ষেতি করে দিল দেখছি!' লোকটার অন্‌মান নির্ভ্‌ল। মিনিট দ্‌য়েকের মধ্যেই নার্স মেয়েটি ফিরে এসে ভদ্রভাবে বললো যে হাসারির শরীরের রক্ত দিয়ে তাদের কাজ হবে না। আসল কারণটা যে রক্তে হেমোগ্লোবিনের স্বল্পতা তা বলার দরকার হয় না। কলকাতার বেশিরভাগ গরিব রক্তদাতাই এই কারনের জন্যে যোগ্য রক্ত-দাতা হতে পারে না। কিন্তু কে তার খোঁজ রাখে!

অবশ্য হাসারির কাছে ধাক্কাটা বড় মর্মন্তুদ হয়ে উঠলো। মান্‌ষটা যেন একে-বারে থম মেরে গেছে ততক্ষণে। রাস্তায় নেমে হাসারি প্রায় কেঁদে ফেললো। লোক-টার দিকে চেয়ে বললো, 'আমার যে এট্টা কানাকড়িও লাই। কলা কিনার পয়সাও লাই। আর কুথাও লয়ে চলো না ভাই!' কিন্তু কোথায় তাকে কে-ই বা নিয়ে যাবে? লোকটা তখন হাসারির কাঁধের ওপর নিজের হাতটা রেখে বন্ধ্‌র মত বললো, 'অমন বোকামি করতে নেই বাপ! তোমার শিরা দিয়ে এখন যা বইচে তা রক্ত নয়, সেরেফ জল। রক্ত জল হয়ে গেচে। এখন থেকে সাবধান হও বাপ! নইলে শীগগির তোমার পরিবার আর ছেলেমেয়েরা গঙ্গায় তোমার ছাই ভাসতে দেখবে।'

হয়ত দারিদ্র্যের ছোবল খাওয়া এই অনিবার্য পরিণতিটাই হাসারির জীবনে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু কি করবে সে এখন? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রায় ককিয়ে উঠলো মান্‌ষটা। 'আমরা সবাই যে মরি যাব গো! কেউ বেঁচে থাকবেক লাই।' হাসারির এমনি ভেঙে পড়া অবস্থা দেখে কঠিন হৃদয় লোকটার বোধহয় দয়া হলো। বললো, 'কেঁদো না ভাই। এস আমার সঙ্গে। তোমায় একটা জিনিস দি।' এই বলে হাসারিকে টানতে টানতে একটা ওষ্‌ধের দোকানে নিয়ে এল। তারপর এক শিশি ফেরাস সালফেট ট্যাবলেট কিনলো। স্‌ইজারল্যান্ডের যে রাসায়-নিক পরীক্ষাগারে এই ট্যাবলেট তৈরি হয়, তারা বোধহয় অন্‌মান করতেও পারবে না তৃতীয় বিশ্বের হতাশ মরিয়া মান্‌ষ এই ট্যাবলেটগ্‌লো কিভাবে ব্যবহার করছে।

ফেরাস সালফেট ট্যাবলেটের শিশিটা হাসারির হাতে দিয়ে লোকটা বললো, রোজ তিনটে করে বড়ি খেও বাপ! এক হপ্তা খাবে, তারপর এখানে এস। মনে রেখ ঠিক সাতদিন পরে এখানে আসবে।' কথাটা বলে লোকটা আবার শক্ত চোখে হাসারির দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা আবার নরম করে নিল সে। তারপর চতুর একট্‌ হেসে বললো, 'ত্যাখন তোমায় এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে তোমার গায়ের সব রক্ত তারা আদর করে শ্‌ষে নেবে। ব্‌ঝলে বাপ?'

হাসারি হাঁ করে তাকিয়েছিল লোকটার দিকে। কি সে ব্‌ঝলো সে-ই জানে!

আনন্দ নগরে এসে প্রথম দিনের রাত্রিবাসের পর স্তেফানের জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো খুবই তুচ্ছ। তবে যেখানে সত্তর হাজার মানুষ এলোমেলো ভাবে এক জায়গায় গুঁতোগুঁতি করে বাস করছে, এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধিও মানা হয় না, সেখানে সাধারণ দরকারগুলোও সমস্যা হয়ে ওঠে। এমনি একটা সমস্যা বোধহয় শরীরের স্বাভাবিক চাহিদা মেটানো। অর্থাৎ প্রাত্যহিক কৃত্যকর্মজনিত সমস্যাগুলি মেটানো, কারণ স্থায়ী টয়লেট বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু আনন্দনগরে নেই। উপস্থিত এই সমস্যাটাই স্তেফান কোভালস্কীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। প্যারিশ চার্চের ফাদার অ্যালবের্তো সেই য়্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবকটিকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে যে স্তেফান যেন হিন্দু শৌচাগারটি ব্যবহার করে। বস্তির অন্য খ্রীশ্চানরাও এই শৌচাগার ব্যবহার করে।

হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য সমাপনের ব্যাপারটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মতন। এর একটি কর্মবিধি আছে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে একজন হিন্দু এই বিধি মেনে চলে। তাদের শৌচাগারের অবস্থান এমন জায়গায় হবে যার কাছাকাছি মন্দির থাকবে না, বটগাছ থাকবে না, নদী বা পুকুরের পাড় হবে না। তার মাটির রঙ ফিকে হবে এবং তা চাষ করা জমি হবে না। জমিটি সমতল হওয়া চাই এবং লোকালয় থেকে যেন বেশ দূরে থাকে। কৃত্যকর্মের সময় ব্রাহ্মণ, দেবতার মূর্তি, আকাশের চাঁদ সূর্য বা তারাদের দিকে তাকানো বারণ। সে কথা বলবে না। এদিক ওদিক তাকাবে না। তার পায়ে জুতো থাকবে না এবং অসমাপ্ত অবস্থায় সে উঠে দাঁড়াবে না। পরিশেষে শৌচকর্মের নিয়মগুলি নিষ্ঠা ভরে মেনে চলবে এবং জল ও মাটি দিয়ে জলশৌচ করবে।

এইসব নিয়মবিধি যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা ভাবতেও পারেননি যে লক্ষ লক্ষ মানুষ একদিন ইঁট কাঠ কংক্রিটের জংগলে বাস করবে। সেখানে না থাকবে ফাঁকা মাঠ, না থাকবে খোলামেলা জায়গা। ফলে আনন্দ নগরের হিন্দুদের প্রাত্যহিক কৃত্যকর্ম সারতে হয় খোলা নর্দমার ধারে কিংবা হয়ত কোনো জনতা শৌচাগার ব্যবহার করার একটা সুযোগ পেয়ে। অতি সম্প্রতি স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ এমনি অস্থায়ী কয়েকটা শৌচাগার তৈরি করেছে এবং যথোচিত মর্যাদায় অভিষেক অনুষ্ঠানের পর জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সেগুলি খুলে দিয়েছে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে জনতা পায়খানা।

স্তেফান কোভালস্কীর কাছে ব্যাপারটা প্রায় দুঃসাহসিক এক অভিযানের মতন। ঠিক ভোর চারটের সময় উঠেও পায়খানায় ঢুকতে পারলো না সে। ইতিমধ্যেই কয়েক ডজন লোকের লাইন পড়ে গেছে সেখানে। মনে হয় সারির প্রথম লোকটি ঘন্টা দুই আগেই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। জীন্সের প্যান্ট পরে বাস্কেটবল জুতো পরা সাহেব স্তেফানকে লাইনে দাঁড়াতে দেখে হাসাহাসি পড়ে গেল অন্য মানুষদের মধ্যে। তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে কৌতুক এবং কৌতূহল দুই-ই। সাহেব স্তেফানের একটা অপরাধ ইতিমধ্যে তাদের নজরে পড়ে গেছে। অজ্ঞতাহেতু মানুষটা কয়েকখানা টয়লেট পেপার সঙ্গে এনেছে। এটা ত' ভাবাই যায় না যে,

টয়লেট পেপার ব্যবহার করে সেগুলি যত্রতত্র ফেলে যাবে লোকটা। একজন যুবক তখন তার নিজের হাতের জল ভর্তি টিনের মগটা ইঙ্গিতে দেখাল। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল এর কার্যকারিতা। জলশৌচ করে নিজেকে শুদ্ধ করার মত ডাবাটিও পরিষ্কার করার দায়িত্ব ব্যবহারকারীর। সুতরাং স্তেফান যেন সেইভাবেই নিজেকে তৈরি করে। অসহায় স্তেফান চারদিকে চেয়ে দেখলো সবারই হাতে ধরা আছে একটা কিছু পাত্র। আবার অনেকের সামনেও রাখা আছে একটা করে জলপাত্র। লাইনে দাঁড়ানো মানুষ যেমন এগোচ্ছে তেমনি পা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেই সব জলপাত্র। স্তেফান পরে জেনেছিল যে যারা অনুপস্থিত তারাও দাবিটি এইভাবে সাব্যস্ত করে।

শেষ পর্যন্ত একজন ফোকলা বুড়ো লোক তার নিজের মগটা স্তেফানকে ব্যবহার করতে দিল। বিনয়ের সঙ্গে তার হাত থেকে মগটা নেবার সময় স্তেফান আর একটি দুষ্কর্ম করে ফেললো। ঘটনার বিবরণটি তার মুখেই শোনা যাক। 'বৃদ্ধকে একটু কৃতজ্ঞতার হাসি উপহার দিয়ে আমি বাঁ হাতে মগটা ধরলাম। এটাই আমার দ্বিতীয় অপরাধ। যার দরুন আবার সকলের ঠাট্টার পাত্র হয়ে উঠলাম। কারণ হিন্দুরা বাঁ হাতটা অশুচি কাজের জন্য নির্দিষ্ট রাখে। জনতা শৌচাগারে পৌঁছবার আগে আমায় একটা ময়লা ফেলা ডোবা পেরোতে হলো। পাঁচমাস ধরে ধাঙর ধর্মঘট চলেছে। তাই ডোবাও ভরে উঠেছে আবর্জনায়। বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে এর পচা দুর্গন্ধে। ডোবাটা পেরোতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল কোনটা বেশি অসহ্য! পচা ডোবার দৃশ্যটা না তার দুর্গন্ধ। এমন এক অসহ্য পরিবেশে মানুষ কি করে স্বাভাবিক মেজাজ বজায় রেখেছে সেটাই আমার কাছে যেন এক পরম বিস্ময়। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষগুলো হাসিঠাট্টা করছে। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ স্ফূর্তি যেন পচা ডোবাতেও প্রাণ এনেছে। কিন্তু আমি পারলাম না। প্রথম রাউন্ডেই নক্‌আউট হয়ে হেরে যাওয়া একজন বক্সারের মতন ফিরে এলাম টলমলে পায়ে।'

ফেরার সময় স্তেফান দেখলো বেশ কিছু যুবকের রাগী চোখ তার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে। ব্যাপারটা সত্যিই অবাক হবার মতন। গুজব ছড়িয়েছে যে সাহেব একজন ক্যাথলিক পাদরী। মুসলমান পাড়ার মধ্যে বাস করার একটা ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে সে নাকি এসেছে। কিন্তু যে মানেই করা হোক স্তেফান প্রথম থেকেই জানে সেই প্রথম দিনটিতে সে কত একা ছিল। 'একজন মানুষও ছিল না যার সঙ্গে কথা বলি বা তার ভাষা বুঝি। সে এক অভূতপূর্ব অবস্থা। প্রায় বোবা-কালা বনে গিয়েছিলাম সে দিনটা। সঙ্গে এক ফোঁটা মদও ছিল না যা দিয়ে খ্রীষ্টের নৈশভোজের উৎসব পালন করতে পারি। শুধু একটাই সান্ত্বনা ছিল। প্রার্থনা করার অবকাশ ছিল।'

হ্যাঁ, প্রার্থনা! কোভালস্কীর জীবনে প্রতিদিন প্রার্থনার জন্যে একটা ঘণ্টা নির্দিষ্ট আছে। রোজ এই এক ঘণ্টা তার নিবিড় ধ্যানের সময়, যখন ঈশ্বরের সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ হয়। যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, ট্রেনে, প্লেনে বা একঘর লোকের সংগে, নির্দিষ্ট সময়ে স্তেফান ঠিক মনকে ভারমুক্ত করে প্রস্তুত হয় ঈশ্বরের নির্দেশের জন্যে। আপন মনে বলে, 'হে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, আমায় ভেঙে ভেঙে তোমার মত গড়ে নাও, তোমার কাজের যোগ্য করে নাও।' কখনও বা সুসমাচারের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ে যায় খ্রীষ্টের কোন বাণী।

তখন বারংবার সেটি পড়ে, মনে মনে আবৃত্তি করে। তার ধারণা, এ একধরনের আধ্যাত্মিক অনুশীলন যা মনকে কোলাহলমুক্ত করে। ঈশ্বরের মনে ঠাঁই করে দেয়। স্তেফান বিশ্বাস করে, 'যদি আমার কথা শোনার অবকাশ ঈশ্বরের হয়, তবে আমায় ভালবাসার সময়ও তাঁর হবে।'

কিন্তু সেদিন যেন এতদিনের অভ্যাসের ব্যতিক্রম হলো। স্তেফান নিজেকে যথার্থ ভারমুক্ত করতে পারলো না। পারলো না সেই নৈঃশব্দ আনতে যা মনকে ঈশ্বরমুখী করে। আগের দিন সন্ধ্যের পর অনেকগুলো সংস্কারের চাপে মন তার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কিছুতেই একাগ্রচিত্তে প্রার্থনায় বসতে পারছিল না। 'তবুও আমি ধ্যানে বসলাম।' স্তেফান এইভাবেই সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল। 'ধ্যানে বসে চেঁচিয়ে "ওম" মন্ত্র জপ করতে লাগলাম।......যীশুর নামের সঙ্গে যুক্ত করলাম "ওম্" মন্ত্র। জপ করলাম, "ওম্ যীশু।" বস্তির অনেক মানুষের ধ্যানের মন্ত্র আমারও মন্ত্র হয়ে গেছে তখন। আমার মনে হচ্ছিল বস্তির মানুষরাই ঈশ্বরের যথার্থ আপনজন। তাই আমার প্রিয় ঈশ্বর, যিনি আমার সত্য, তাঁর কাছে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করার মন্ত্রটি খুঁজে পেয়ে আমি যেন অভিভূত হয়েছিলাম। আমার মনে হলো আমি আবার ঈশ্বরের সমীপস্থ হতে পেরেছি। হৃদয়ের কথাটি বলার সময় আমার এসেছে।'

আমি বললাম, 'হে ঈশ্বর! আমি তোমার কাছে এলাম। তুমি আমায় কৃতার্থ করো। তুমি জানো যে আমার ধন নেই, সম্বল নেই। তুমি আমায় ধন্য করো। আমি নিজের জন্য অনুগ্রহ চাইতে আসি নি। অপরের জন্যও আমি কিছু ভিক্ষা চাই না। আমি চাই তোমার নিবিড় প্রেম, তোমার অখন্ড ভালবাসা, যাতে কোনো সর্ত নেই। হে প্রিয় সখা যীশু! তুমি আমার পরিত্রাতা! আমি এসেছি নিঃস্ব হয়ে। সেই সম্বলও আমার নেই যা উৎসর্গ করে তোমার নৈশভোজনোৎসব পালন করি। কিন্তু এই মানুষগুলো প্রতিদিন যাতনা সইছে। নিরপরাধী হয়েও দন্ড ভোগ করছে। আনত মুখে ওরা শুধু নির্যাতন পায় এবং প্রতিদিন সেই যাতনা আর নির্যাতন নৈবেদ্যস্বরূপ তোমায় নিবেদন করে। এই আত্মোৎসর্গ কি গ্রহণ করবে না হে কৃপাপরবশ যীশু? আনন্দ নগরের হে পরম প্রেমময় যীশু, তুমি এদের কৃপা করো!'

'হে অনন্ত দন্ডভোগকারী আনন্দ নগরের যীশু, তুমি মূককে মুখর করো! লাঞ্ছিতো সঙ্গে লাঞ্ছনা ভোগ করো! তুমি তাপিতের শান্তি, দীনের বন্ধু। তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার যেমন ভাগ নাও, তেমনি তেমনি তাদের হাসি আনন্দ অশ্রু-ধারার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠো তুমি। হে আনন্দ নগরের যীশু তোমার জন্যেই আমি এখানে এসেছি, যাতে সবাইকে নিয়ে তোমার প্রেমধন্য হতে পারি। তুমি এবং পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি সর্বংসহা, যিনি অনন্ত কৃপাপরবশ—তোমরা আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হও। তুমিই জগতের আলো, তুমি মুক্তিপথের দিশারী। তাই আঁধার কাটিয়ে আমাদের আলোর রাজ্যে উত্তরণ করাও। হে শাশ্বত জ্যোতি-র্ময়স্বরূপ, তোমাকে আমাদের বড় দরকার কারণ তোমা বই আমাদের গতি নেই।'

'হে আনন্দঘন যীশু! তুমি আমাদের আনন্দধন্য করো, সার্থক হ'ক এর আনন্দ-নগর নাম।'

'হায় হায়! আহাম্মকটার সাতটা দিনও তর সইলো না!' হাসারিকে দ্রুতপায়ে তার দিকে আসতে দেখে সোনার দাঁত বাঁধানো লোকটা যেন মনে মনে গর্জে উঠলো। গতকালের নিষ্ফল সেই ঘটনার পর তখনও পুরো চব্বিশ ঘণ্টা পেরোয় নি। অথচ খুশীতে নাচতে নাচতে আসছে দেখ মানুষটা! ঠিক তাই; হাসারিই প্রথম লোকটাকে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'এই যে ভাই!'

হাসারির এই আচমকা উল্লাস দেখে লোকটা সত্যিই অবাক হলো। বললোও তাই। 'কি বাপ! মনে হচ্ছে লটারিতে ফাস্টো প্রাইজ পেয়েচ?'

'না ভাই। বোধহয় এট্টা চাকরি পেয়ে যাব। তাই রক্ত বানাবার ওষুধগুলান ফেরত দিতে আলাম। রেখে দ্যান। আর কাউর কাজে লাগবে 'খন!'

হ্যাঁ। ভাগ্যদেবী অবশেষে সদয় হয়েছেন তার প্রতি। তাই এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। বড়বাজার এলাকার বাইরে অনেকগুলো ছোটখাট কারখানা আছে এইরকমই একটা কারখানার সামনে দাঁড়িয়েছিল হাসারি। এরা রেলগাড়ির নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করে। কিছুদিন আগে ঠিক এই জায়গাতেই একজন কুলির বদলির কাজ করে সে পাঁচটা টাকা রোজগার করেছিল। সেদিন দুজন মজুর একটা ঠেলা-গাড়ির ওপর ভারি ভারি স্প্রিং বোঝাই করছিল। হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে একজনের হাত ফসকে একটা স্প্রিং তারই পায়ের ওপর পড়লো। লোকটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো। ভারি যন্ত্রটা তার পায়ের পাতাটা প্রায় থেঁতলে দিয়েছে। হাসারির চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছিল। তাই একটুও ইতস্তত না করে হাসারি ছুটে গেল লোকটার কাছে। তারপর ফড়ফড় করে পরনের ধুতি থেকে একটা ফালি ছিঁড়ে রক্ত পড়া জায়গাটা বেঁধে দিল। কলকাতা শহরে এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে এবং আহত লোকের শুশ্রূষার জন্যে পুলিস বা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলো না। ফলে কারখানার মালিক নামক স্থূলবপু মানুষটিই স্বাভাবিকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং একটা রিক্সা ডাকিয়ে চোট খাওয়া কুলিটাকে রিক্সায় তুলতে বললো। আপদ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততই ভাল। লোকটা তাড়াতাড়ি তার পিরানের পকেট থেকে একতাড়া পাঁচ টাকার নোট বার করে একটা দিল কুলিটার হাতে, একটা দিল রিক্সাওলাকে। হাসারি তখন চোটখাওয়া কুলিটাকে রিক্সার ওপর তুলছিল। মালিক কি ভেবে হাসারির হাতেও দুটো পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললো, 'একটা তোর আর একটা হাসপাতালের বাবুর হাতে গুঁজে দিবি। নইলে ঢুকতে দেবে না। বুঝলি?' হাসারি হাত পেতে পাঁচ টাকার নোট দুখানা নিল। মালিক ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। রিক্সাওলাকে ধমক দিয়ে বললো, 'হাঁ করে দেখছিস কি? বিদেয় কর্ এটাকে। যত সব অকম্মার ধাড়ি এখানেই এসে জোটে!'

মালিকবাবু হাত ঝেড়ে ফেলতে চাইলেও হাসারির পা দুটো যেন সংশয় কাটাতে পারছিল না। রিক্সার ওপর উঠে বসতে হাসারির ইতস্তত ভাবটা রিক্সাওলাকে সন্দিগ্ধ করে তুললো। হাসারির দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আগে বুঝি কখনো রিক্সায় চড়ো নি?' হাসারি ভয়ে ভয়ে স্বীকার করলো। বললো, 'না'।

তারপর কোনরকমে সিঁটিয়ে বসলো চোটলাগা কুলিটার পাশে।

মানুষ নামক ঘোড়া ততক্ষণে জোয়ালে যুতে গেছে। দুই শকটদণ্ডের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে লোকটা এবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা তুললো। হাসারি দেখলো লোকটার মাথার চুলে পাক ধরেছে। কাঁধের চামড়া কোঁচকান। বোঝা যায় যে, লোকটার যৌবন ঝরে গেছে। কিন্তু ভাঙাচোরা স্বাস্থ্য দেখে একজন রিক্সাওলার বয়স বোঝা যায় না। রিক্সাওলারা একটু তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়।

খানিকটা চলার পর রিক্সাওলা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমায় দেখে মনে হয় না যে তুমি শহরের মানুষ।'

'ঠিক কতা। আমি বাঁকুলি থিকে এয়েচি।'

'বাঁকুলি?' লোকটা বারদুই বিড়বিড় করে গ্রামের নামটা বললো। তারপর হঠাৎ বললো, 'তাইত! বাঁকুলি তো আমার গেরাম থেকে মোটে বিশ মাইল দূরে! আমার গেরামের নাম...........'

কিন্তু বাস আর মোটরগাড়ির হর্ণের আর্তনাদের মধ্যে চাপা পড়ে গেল রিক্সা-ওলার বলা গ্রামের নামটা। তবুও হাসারির মনে হলো লাফিয়ে নেমে পড়ে আর জড়িয়ে ধরে রিক্সাওলাকে। বলতে গেলে এই অমানুষ আর নিষ্ঠুর শহরটায় সে একজন নিজের লোক খুঁজে পেল এই প্রথম। তবে মনের এই খুশী ভাবটা সে চাপবার চেষ্টা কর-ছিল। পাশে বসা মানুষটা মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। রিক্সাওলার তার অক্ষম টলমলে পা দুটো নিয়ে মরিয়ার মতন হাসপাতালের দিকে ছুটছে। কিন্তু প্রায়ই বাস বা লরির আচমকা আগমন তার ছোটার গতি থামিয়ে দিচ্ছিল।

কলকাতার সাধারণ হাসপাতাল একটা ছোটখাট শহর বিশেষ। অসংখ্য মানুষ আর রোগীর ভিড়ে ছয়লাপ। গোটাকতক ভাঙাচোরা অট্টালিকা নিয়ে হাসপাতালের চত্বর? অসংখ্য টানা বারান্দা দিয়ে সেগুলো জোড়া। ভবনগুলির সামনের মাঠে রোগীর আত্মীয়স্বজনরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে অপেক্ষায়। প্রধান প্রবেশপথের পাশে একটা পাথরের ফলক আছে। তার গায়ে লেখা আছে, '১৮৭৮ সালে এই প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে সত্তর গজ দক্ষিণ-পূব কোণের গবেষণাগারের মধ্যে বসে সার্জন রোনাল্ড রস্‌ কিভাবে মশার সাহায্যে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় তা আবিষ্কার করেন।' রিক্সাওলা সোজা ইমার্জেন্সীর সামনে এনে তার রিক্সা দাঁড় করাল। লোকটার সব জানা। আগেও বহুবার সে এমনিভাবে রুগী এনে য়্যাম্বুলেন্সের কাজ করেছে।

ইমার্জেন্সী ব্লকের দোরগোড়াতেই অনেক মানুষ চেঁচামেচি করে কথা বলছে। ওরা কথা বলছে না ঝগড়া করছে কে জানে। মেয়েদের কোলে পাখির ছানার মত বাচ্চাগুলো ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। চেঁচিয়ে কাঁদবার সামর্থও তাদের নেই। প্রায়ই দু-চারজন লোক খাটিয়ার ওপর, মড়া শুইয়ে বাইরে নিয়ে আসছে। মড়ার গায়ের ওপর ফুল ছড়ানো। খাটিয়ার পিছু পিছু আত্মীয়স্বজন আসছে হরি বোল ধ্বনি দিতে দিতে। ইতিমধ্যে ওদের ডাক এসে গেল। হাসারি তাড়াতাড়ি দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল। তাতেই কাজ হলো। লোকটা তখন রুগী নিয়ে সামনের বড় ঘরে ওদের অপেক্ষা করতে বললো।

খানিক পরেই দুজন মানুষ একটা স্ট্রেচারে করে অসুস্থ কুলিকে নিয়ে গেল। স্ট্রেচারে তখনো শুকনো রক্তের দাগ লেগে আছে। ঘরের বাতাস ওষুধের কটু গন্ধে ভারি হয়ে আছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলের পোস্টারগুলো। কতরকম রাজনৈতিক মতামত লেখা আছে ওই পোস্টারগুলোতে। দেখে মনে হচ্ছে সবাই যেন প্রলাপ বকার মতন নিজের কথা বলতে চাইছে। কোথাও বিপ্লবী দলের লাল পতাকা, কোথাও কাস্তে হাতুড়ির ছবি, কোথাও বা ইন্দিরা গান্ধীর ফটো। যুৎসই নানারকম স্লোগান লেখা আছে ছবির তলায়। সেদিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল হাসারি। ওর সেই হাঁ করা ভাবটা দেখে রিক্সাওলার মুখে একটা হাসির ঝিলিক উঠলো। হাসারির দিকে চেয়ে বললো, 'কি দেখছো অমন হা করে? ওরা সবাই তোমার ভোট চাইচে। তবে সুবিধে পেলেই গলায় কোপ দিতে ওরা ছাড়বে না।'

হাসারির ঠিক মনে পড়ে না কতক্ষণ ওদের বন্ধু কুলিকে অপারেশনের ঘরে ওরা আটকে রেখেছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এতক্ষণ ওকে নিয়ে এরা কি করছে? হঠাৎ তার মনে হলো মেরে ফেলে নি তো মানুষটাকে? হয়ত সত্যিই মেরে ফেলেছে এবং পাছে কেউ কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে তাই মড়া নিয়ে বেরিয়ে আসছে না। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? সর্বক্ষণই পাশের ঘরটা থেকে চাদর ঢাকা মানুষদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হচ্ছে। এদের মধ্যে ক'জন জ্যান্ত আর ক'জন মড়া বলা মুস্কিল। দেখে মনে হয় সবাই ঘুমোচ্ছে। যাই হ'ক হাসারি ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে যে, অমানুষ এই শহরের গরিব মানুষদের কারও কাছে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার নেই। নচেৎ বাস লরির রক্তশোষক ড্রাইভারদের গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিতে পারতো রিক্সাওলারা। অবশেষে স্ট্রেচারের ওপর দলা পাকানো মানুষের একটা চেহারা নিয়ে কয়েকজন বাইরে এল। সঙ্গে একজন নার্সও ছিল। তার হাতে ধরা ছিল একটা বোতল। বোতলের মধ্যে একটা টিউব। টিউবের অন্য মুখটা রোগীর হাতে জড়ানো। গভীর ঘুমে মানুষটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে দেখলো হাসারি। হ্যাঁ, সে-ই বটে। পায়ের তলার দিকে মোটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাসারি তখন বুঝতে পারলো কি হয়েছে! বেজন্মারা ওর পায়ের চেটোটা বাদ দিয়ে দিয়েছে। নার্স ওদের দিকে চেয়ে বললো, 'তোমরা আর থেকে কি করবে? ও তো এখন ঘুমোবে। দিন দুই পরে এসে ওকে নিয়ে যেও।'

রিক্সাটাকে উদ্ধার করে ওরা চুপচাপ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাঁটার পর হাসারির দিকে আড়চোখে চেয়ে রিক্সাওলাটা বললো, 'কি! তোমার মনে খুব লেগেচে, তাই না? লাগতেই পারে। মনটা এখানো কাঁচা তো! তবে এত শীগগির দমে গেলে চলবে কি করে? আরও অনেক দেখার বাকি আচে তোমার।'

হাসারি সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে ঘটনার আকস্মিকতায়। তাই মাথা নেড়ে বললো, 'আর দ্যাখতে চাই না। ঢের হয়েচে।'

হো হো করে হেসে উঠলো রিক্সওলাটা। হাতলের গায়ে ঘন্টাটা বাজিয়ে ঠুংঠুং আওয়াজ করলো। তারপর বললো, 'ঢের হয়েছে, কি গো! সবে ত' সন্দে! এই ভাগাড়ে অন্তত আরও দশটা বছর কাটাও আমার মতন। তবে তো দেখা সম্পন্ন হবে! ত্যাখন বলো ঢের হয়েচে।'

কথা বলতে বলতে ওরা রাস্তার মোড়ে এসে পড়লো। একজন পুলিস হাত দেখিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে। পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে পুলিসটার হাতে গুঁজে দিল রিক্সাওলা। তারপর দাঁত বের করে হেসে বললো, 'এটাই নিয়ম। এতে সুবিধেও ঢের। আর কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না তোমায়।

লাইসিন্স্ রইলো কি রইলো না কেউ দেখতে আসবে না।' লোকটা এবার হাতের চেটোটা হাতলের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, কি, এমনি একটা গাড়ি চালাবে?' চমকে উঠলো হাসারি। বলে কি মানুষটা? তার মতন একজন আনাড়ি কলকাতার বুকে রিক্সা চালাবে? লোকটা কি ঠাট্টা করছে তার সংগে? এ যেন তাকে উড়ো জাহাজ চালাতে বলা। কিন্তু মানুষটার আগ্রহ দেখে সে বললো, 'তা যে কাজ দিবা তাই করবো। আমার কোনো বাছবিচার নাই।'

'তাহলে এট্টু চেস্টা করো না কেন? হাতল দুটোর ভিতর গিয়ে দাঁড়াও। তারপর হ্যাঁচকা টান দাও। নইলে চাকা নড়বে না।'

রিক্সাওলা যেমনটি বললো তাই করলো হাসারি। 'কিন্তু ভাঙাচোরা গাড়িখানা চালানো সহজ হলেও, সংগে সংগে আর একটা ঝঞ্ঝাট আপনা থিকেই এসে যায়। গাড়ি চললেই তার গায়ে ত্যাখন মোষের বল হয়। একবার চললে থামানো যায় না। গড়গড় করে আপন মনে চলতেই থাকে। যেন পেরাণের আবেগেই ছুটচে সে। ত্যাখন মনে হয় গাড়িরও পেরাণ আচে। তাকে থামাতে গেলে পেথক ক্ষ্যামতার দরকার। সওয়ারি শুদ্ধ গাড়ির ওজন কম করেও তিন মণ।' বলাবাহুল্য এসব ভাবনাগুলো অনেক পরের; তখন হাসারি পুরোপুরি রিক্সা চালক হয়ে গেছে। সেদিন রিক্সাওলা যত্ন করে তাকে আরও কিছু শেখাল। হাতলের গায়ে রঙচটা কয়েকটা বিশেষ জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'আসল কথা হলো সওয়ারি শুদ্ধু গাড়ির ভারটা ঠিক রাখা। সেটি ঠিক না থাকলে গাড়ি উল্টে যাবে। তোমাকে এমন জায়গায় হাতল দুটো ধরতে হবে, যেখানে ধরলে ভার সমান থাকে, গাড়ি সিধে থাকে। এটি তোমায় শিখতে হবে।'

হাসারির মনে হচ্ছিল অমানুষ শহরটা কি সত্যিই নিষ্ঠুর? না কি এটা তার ছদ্মবেশ? নইলে এত যত্ন করে অচেনা মানুষটা তাকে শেখাবে কেন? রিক্সাটা এবার নামিয়ে রাখলো হাসারি। তারপর লুঙ্গির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল। এইটুকুতেই বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছে সে।

রিক্সাওলাও দারুণ খুশী। হাসারির দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে বললো, 'বাঃ! তা চলো আজ এট্টু আমোদ করি। তোমার জেবনের একটা বিশেষ দিন আজ। একটু বাঙলা খেয়ে আসি। শেয়ালদা ইস্টিশনের পেছনে একটা ঠেক্ আছে। দামেও সস্তা।'

কিন্তু হাসারির যেন গা নেই। তাই রিক্সাওলা অবাক হলো। হাসারি তখন কারখানার মালিকের দেওয়া পাঁচ টাকার নোটখানা দেখিয়ে বললো, 'বউ ছেলেমেয়েদের জন্যি কিছু খাবার নিয়ে যাব ভাবচি। কাল থেকে ঘরে কিছু নাই।' রিক্সাওলা তখন হাসারির কাঁধে চাপড় মেরে বললো, 'তোমায় কিছু ভাবতি হবে না। সব ভাবনা আমার।'

এই বলে হাসারিকে নিয়ে লোকটা ডানদিকের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে গেল। গলির দুধারে ছোট ছোট চালাঘর। জানলায় জানলায় মুখ। রাস্তাতেও থিকথিকে ভিড়। লাউড্স্পিকার থেকে গানের গর্জন ভেসে আসছে। ছাতের আলসে থেকে ভিজে কাপড়চোপড় শুকোচ্ছে। বাঁশের মাথায় উড়ছে সবুজ নিশান। প্রথমে একটা ছোট মসজিদ পেরোল। তারপর একটা মাদ্রাসা। একজন মোল্লা ছোট ছোট মেয়েদের পাঠ নিচ্ছেন। মেয়েদের পরণে ঘাগরা, মাথায় ওড়না। এই মুসলমান পাড়াটা পেরিয়ে ওরা যেখানে ঢুকলো সেটা বেশ্যাপাড়া। রঙচঙে চটকদার খাটো জামা পরে

মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কথা বলছে। হাসছে। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। ওদের রঙ করা মুখ আর খাটো জামার আড়াল থেকে শরীর দেখানোর কৌশলটা মানুষকে লোভী করে তোলে। হাসারি হাঁ করে তাকিয়েছিল ওদের দিকে। সত্যিই সে অবাক হয়ে গেছে। বাস্তবিক, মেয়েদের এমন সাজপোষাকে আগে সে কখনো দেখে নি। গ্রামে সে যে সব মেয়েদের দেখেছে তারা সবাই শাড়ি পরে। অনেকেই হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল। এদের মধ্যে একজনকেই মনে ধরে গেল তার। সত্যিই মুগ্ধ হবার মতন চেহারা মেয়েটার। এক গা গয়না পরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটার অনেক টাকা। হাসারির বেশ লাগছিল ওকে। কিন্তু সংগী রিক্সাওলা ওখানে দাঁড়ালো না। হন্ হন্ করে পেরিয়ে গেল জায়গাটা। খুবই গম্ভীর মানুষ সে।

রাস্তার মোড়ে অনেকগুলো রিক্সা জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যারা আমোদ করতে এসেছে তাদের জন্যেই রিক্সাগুলো ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। গরিব মুটে-মজুর, ভবঘুরে, বেকার এরা সবাই রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে বসে।

হঠাৎ একটি মেয়ে খপ্ করে হাসারির একটা হাত ধরে টানলো। 'কি নাগর! আমার সংগে আসবে?' মেয়েটার চোখে যেন জাদু আছে। কী টান মেয়েটার চোখে! হাসারি চোখ নামিয়ে নিল। মেয়েটা ফের বললো, 'এসো না গো! তোমায় খুশী করে দেব! মাত্তর চার টাকা।' হাসারির মাথা থেকে পা অবধি যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। প্রায় খুঁটির মতন প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল হাসারি মেয়েটার সামনে। তাড়াতাড়ি রিক্সাওলা মেয়েটার কাছে গিয়ে হাত ছাড়াতে গেল। ধমক দিয়ে বললো, ছেড়ে দে ওকে! নইলে......' এই বলে রিক্সার একটা হাতল সোজাসুজি বেউশ্যে মেয়েটার পেটের কাছে ধরলো। মেয়েটা তখন এক পা পিছিয়ে এসে হাসারির হাতটা ছেড়ে দিল আর রিক্সাওলাকে কুৎসিত গালাগালি করতে লাগলো। মেয়েটার খনখনে গলার আওয়াজে লোকজন ভিড় করে ফেললো তাকে। দুই বন্ধুও প্রাণ খুলে হেসে উঠলো। এক ফাঁকে হাসারিকে হাত ধরে টানতে টানতে সরিয়ে আনলো রিক্সাওলা। খানিকক্ষণ হাঁটার পর হাসারির কাঁধে একটা হাত রেখে রিক্সাওলা বললো, 'একটা কতা বলে রাখি। যদি এদের মতন মেয়েছেলে সোয়ারি পাও, তবে আগাম ভাড়াটি চেয়ে নেবে। নইলে তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাঁকাল মাছের পিছলে যাবে এরা।'

নিষিদ্ধ পল্লী পেরিয়েই একটা পার্ক। পার্ক ছাড়িয়ে কিছুটা গেলেই খানিক ঘেরা জায়গা। চারপাশে পুরনো নোনাধরা বড় বড় অট্টালিকা। এককালে জমজমাট ছিল এই সব ঘরবাড়িগুলো। বাড়ির সম্মুখভাগের তোরণ ভেঙেচুরে গেছে। বারান্দা থেকে রঙবেরঙের কাচা জামাকাপড় ঝুলছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। তাদের সংগে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরু, মোষ, শুয়র, মুরগী। আকাশের দিকে চেয়ে হাসারি অবাক হয়ে গেছে তখন। নানারঙের ঘুড়ি উড়ছে আকাশের বুকে। বর্ণময় হয়ে উঠেছে আকাশ ; তাই এমন শোভা আকাশের। কলকাতার ছেলেদের ঘুড়ির খুব শখ। ওদের মনের অবরুদ্ধ কল্পনা যেন একটুকরো ঘুড়ির মধ্যে দিয়ে নিরুদ্দেশ হতে চাইছে। ওরা মুক্তি পেতে চাইছে ধোঁয়া, ধুলো, কাদা-নোংরা আর দুঃখ-কষ্টের বন্দীদশা থেকে।

এক কোণে টালির ছাতের ঘর। সামনে বাঁশের খোঁটার ওপর তক্তা পেতে বসার জায়গা করা আছে। নোংরা ফতুয়া পরা একটা লোক ঘরের মধ্যে বসে আছে। এই

শুঁড়িখানার মালিক সে। হাসারিকে ইঙ্গিতে একটা টেবিলের সামনে বসতে বললো রিক্সাওলা। চোলাইয়ের গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব ঘরের মধ্যে। ওদের দেখে মালিক তালি বাজালো। সংগে সংগে কালোকুলো লোমশ একটা ছেলে দুটো গেলাস আর একটা বোতল এনে টেবিলের ওপর রাখলো। বোতলের গায়ে কোনো লেবেল নেই। মুখে ছিপিও নেই। মুখ খোলা বোতলের মধ্যে পাঁশুটে রঙের তরল পদার্থ, তার মধ্যে সাদা আঁশের মতন কিছু যেন ভাসছে। রিক্সাওলা সন্তর্পণে গেঁজ থেকে চোদ্দখানা একটাকার নোট বার করলো, তারপর একটা একটা করে গুণে মালিকের হাতে দিল। এবার সে হাসারির গেলাসে পানীয় ঢেলে দিল। কটু গন্ধে হাসারির গা গুলিয়ে আসছিল যেন। কিন্তু রিক্সাওলার যেন খুশীর শেষ নেই। আহ্লাদে সে প্রায় ঝাপটে ধরেছে গেলাসটা। এরপর কোন কথা না বলে ওরা গেলাস দুটো ছোঁয়ালো, তারপর নিজের নিজের গেলাসে চুমুক দিল।

পেটে এক চুমুক পড়তেই রিক্সাওলা রামচন্দ্র শুরু করলো তার জীবনের গল্প।

'আমারও একটা দ্যাশ ছিল। কিন্তু বাপ মরতেই সে দ্যাশ আমায় ছাড়তে হলো। সারা জেবনেও আমার বাপ দেনা শুধতে পারে নাই। তার বাপ, বাপের বাপ, তার বাপ—দেনা বাড়তে বাড়তে নেমে এসেচে আমার ঘাড় পর্যন্ত। সুদের ট্যাকা মিটোতে আমাদের জমিটা বন্ধক দিয়েছিল বাপ। কিন্তু কটাই বা টাকা! তারপর হঠাৎ মরে গেল বাপটা। ত্যাখন ছেরাদ্দশান্তি করতেই আমার দুহাজার ট্যাকা খরচা হয়ে গেল। আয়োজনের এতটুকু কম হলি চলবে না। ধুতি চাই, কাপড় চাই, চাল ঘি ময়দা, আনাজপাতি, তেল, মসলা চাই—সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার। তার ওপর আচে যজ্ঞের কাঠ আর বামুন ঠাকুরের বকশিস। আমি ভেবে দেখলুম দ্যাশে পড়ে থাকলে এ ট্যাকা শুধতে পারবো নি। এ দেনা বেড়েই যাবে। কোনদিনও মিটবেক না। কারণ জমির ধান বন্ধক দিয়ে এই ট্যাকা কর্জ করেছিলুম। বুঝছো তো?' হাসারি ঘাড় নাড়লো। আর এক চুমুক মুখে পুরে রাম ফের শুরু করলো তার জীবনের গল্প।

'ত্যাখন গেরামে দুগ্গা পুজো হচ্ছে। খবর পেলুম আমার বন্ধু কলকেতা থেকে গেরামে এয়েচে। ওকে আমার দুঃখের কতা বললুম। ও আমার পিঠ চাপড়ে বললো, "আরে! এ কি কোনো সমিস্যে! আমি তোমার জন্যি একটা রিক্সা করে দেব। তুমি হেসে খেলে দিনে দশ বারো ট্যাকা কামাই করতে পারবে।" আমি ঠিক করলুম ওর সংগেই গেরাম ছেড়ে চলে যাব।' হঠাৎ চুপ করলো রাম। তারপর ধরা গলায় বলে উঠলো, 'এখনও চোখের ওপর ছবিটা ভাসচে গো! দোরগোড়ায় ছেলের হাত ধরে আমার বউ দাঁড়িয়ে আচে আমার জন্যি হাতে একটা ঝোলা নিয়ে। তার ভেতরে আমার লুঙ্গি গামছা, একটা জামা আর খানকতক রুটি। এই দিশ্যটা জীবনে ভুলবো না। যেদিন মরবো সেদিনও দেখবো ওই ছবিটা। আসল কতাটা কি জানো? ওদের কতা মনে করেই আমি লড়াই করতে পারি। নইলে ঠিক চার মাসের মধ্যেই রিক্সাটানার কাজটা পেতুম না।'

রাম মাঝে মাঝে চুপ করছে। আবার শুরু করছে তার গল্প। বেশ নেশা হয়েছে তখন তার। হঠাৎ একসময় সে রাগে ফেটে পড়লো। 'শালা! এটা এক হত-ভাগা শহর। বছরের পর বছর অপিক্ষে করে মরে যাবে তবুও একটা চাকরি জুটবে

না তোমার। জানাচেনা মনিষ্যি না থাকলে এ নরকে তোমার ঠাঁই হবে না। যেমন চেনাজানা লুক চাই তেমনি ট্যাকাও চাই। তবেই চাকরির আশা করতি পার এই শালার শহরে। শহর ত' লয় এটা এক মানুষখেকো বাঘিনী। পিশাচ শহর এটা। এখানকার মানুষগুলো সুবিধে পেলেই তোমার সব লুঠ করে নেবে। গেরাম থেকে য্যাখন এলুম ত্যাখন ন্যাকাবোকা মানুষ ছিলুম। ভেবেছিলুম আমার বন্ধু লুক সোজা মালিকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সে লুকটা বিহারী। তার অনেক ট্যাকা। তিনশ' রিক্সা খাটছে তার কথায়। এর মধ্যে দু'শ গাড়ি লাইসেন্স ছাড়াই চলচে। মানুষটা ঘুঘু। পুলিসের সংগে মাসিক বন্দোবস্ত করে লিয়েচে। তাই কোনো ঝঞ্ঝাট হয় না। কিন্তু মানুষটা থাকে আড়ালে। তাকে চেনে না কেউ। কেউ জানেও না সে কোথায় থাকে। কিন্তু সে-ই আসল মালিক। রোজ সন্ধ্যেতে তার বখরা পেলেই হলো। কে রিক্সা চালাচ্ছে, তুমি না প্রধান মন্ত্রী তা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। তার একজন নিজের লোক আচে। শালা সেই চামচাটাই পাওনা আদায় করে আবার রিক্সা চালাবার লুকও ঠিক করে।' রাম আবার চুপ করলো। একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সে ফের বলতে শুরু করলো তার কথা।

'মনে ভেব না তাকেও সবসময় পাওয়া যাবে। সবাই তার দেখা পায় না। মালিকের মতন তার চামচাও খাতিরের মানুষ। তাই খাতিরের মানুষ না হলে তার দেখা পাবে না। তখন তোমার নিজের লুকের হয়ে উমেদারী করলে সে শুনবে। দেশ জাত গেরামের কথা জানতে চাইবে। তারপর মানুষটাকে দেখে যদি পছন্দ হয় তবে একটা গাড়ি টানতে দেবে। সে হলো সর্দার। তাকে পুজো করতি হয়। তার পাওনা বকশিস মিটিয়ে দিতে হয়। তবেই সে খুশী হবে। এটা ন্যায্য পাওনা। তুমি হলে রাস্তার ফালতু লুক। কে তোমায় চেনে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি যা রোজগার করবে তা শুধু তোমার পরিবারের জন্যে লয়। তোমায় পুলিসের পাওনা দিতে হবে। তবেই শহরের রাস্তায় তুমি সওয়ারি নিয়ে গাড়ি চালাতে পারবে। মাল তুলতে পারবে। মালিকের বখরা দিতে হবে। নইলে গাড়ি থাকবে কুথায়? কুথায় তুমি শোবে? এর ওপর আছে আগের রিক্সাওলার পাওনা যে তোমায় তার ভাঙা গাড়িটা ভাড়া খাটাতে দিয়েচে। তোমায় তক্কে তক্কে থাকতে হবে। নইলে গাড়িখানা ভোগে চলে যাবে। হয় থানায় জমা হয়ে যাবে, নয়ত চামচার খপ্পরে যাবে, যদি ন্যায্য পাওনা না দিতি পারো।'

হাসারি এতক্ষণ যেন হাঁ করে লোকটার কথাগুলো গিলছিল। বাস্তবিক. বেজায় এক ধন্দের মধ্যে পড়ে গেছে সে। কোনটা করনীয় বুঝে উঠতে পারছিল না। একটু দম নিয়ে রাম আবার বলতে শুরু করলো।

'ঠাকুর আমায় গাড়ি দিলেন চার মাস পরে। অথচ এই চার মাস রোজ সকালে ঠাকুরের পায়ে পুজো দিয়েচি। গণেশ ঠাকুরের মন্দিরটা, যেখানে থাকতুম, তার কাছেই ছিল। পার্ক সার্কাসে একটা বড় ভাঙাচোরা বাড়ির একটা ছোট ঘরে আমি তখন থাকতুম। আমার সংগী ছিল আরও তিনজন রিক্সাওলা। একজন বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রিও আমাদের সংগে থাকতো। সেই আমাদের রান্না করতো।

'আমার গেরামের বন্ধু এখানেই আমার আস্তানা করে দেয়। দুটো বাঁশের আড়ার ওপর তক্তা পেতে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেয়ালের কুলুংগিতে আমার নিজের একটা গণেশ ঠাকুর ছিল। গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। তাই রোজ তাঁর পুজো করতুম আর ভাবতুম ঠাকুর আমায় কৃপা করবেন। তা ঠাকুর আমায়

কৃপা করলেন। একদিন সকালে মন্দির থেকে ফেরার সময় মালিকের লোককে সাইকেল চেপে আসতে দেখলুম। ওকে আমি অনেকবার আমাদের আস্তানায় দেখেচি। ছোটখাট মানুষ। কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ন। যখন তাকায় মনে হয় আমার ভেতরটা দেখে ফেলেচে। সাইকেল থেকে যেই নামলো ওমনি আমি মাটিতে শুয়ে তাকে গড় করলুম। "সর্দারজী! নমস্কার! আপনার কি চাই বলুন! সর্দারজী ভারি খুশী। আমার দিকে চেয়ে বললো, "রিক্সা চালাবি?" আমি তখুনি রাজি। সর্দারজী বললো, 'ঠিক আচে। তবে এখুনি আমায় পঁচিশটা টাকা দে। আর যার গাড়ি তোকে দিচ্ছি তার পা ভেঙেছে বলে তাকে রোজ দিবি দুটাকা করে। তাছাড়া গাড়ির ভাড়া রোজ ছ'টাকা দিবি।" খানিক চুপ করে সর্দারজী এবার আমায় সাবধান করে দিল। বললো, "এ গাড়ির লাইসিন্স নেই। রাস্তায় পুলিস ধরলে সব দায় তোর। রাজি থাকিস তো বল্!" বলা বাহুল্য আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। সর্দারজীও খুশী হলো। আমি ফের তাকে গড় করলুম। বললুম, 'আপনি আমার বড় ভাই হলেন। যা বলবেন তাই করবো।"

'আমার স্বপ্ন সত্যি হলো। যে বাসনা নিয়ে গেরাম ছেড়েছিলুম তা সাথক হলো। এখন রিক্সা চালিয়ে যা পাই তা দিয়ে আমার সংসার চলে যায় বেশ।'

চোদ্দ

আনন্দ নগরের সত্তর হাজার মানুষের জলের যোগান হতো মাত্র দশটা নলকূপ থেকে। একটা ছিল স্তেফানের ঘরের কাছাকাছি মোষ খাটালের পাশে। স্তেফান যখন সেখানে গিয়ে পেঁছিত, তখন আনন্দ নগরের সদ্য ঘুম ভাঙছে। শুরু হতে চলেছে অভ্যস্ত জীবনযাপনের কলরব। এই জীবনযাপনের চেহারা রোজই একরকম। ইঁদুর, আরসোলা আর পোকামাকড়ের সঙ্গে দশ-বারোজন একঘরে রাত কাটিয়ে সবাই যখন জেগে ওঠে, তখন মনে হয় পৃথিবীর সবে ঘুম ভেঙেছে। এরপর শুরু হবে শুদ্ধিকরণের প্রস্তুতি পর্ব। গলির ধারে জমানো শুকনো পাঁক আর রোগ-জীবাণুবাহী খোলা নালার পরিবেশের মধ্যে রাত্রিবাস করে আনন্দ নগরের মানুষ এখন প্রাতঃকৃত্যের নিপুণ উপকার দিয়ে সারারাতের দূষিত জড়তা কাটাবে। এটা নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান। এর শেষ পর্যায়ে আছে গাত্রস্নান। বলাবাহুল্য, মেয়েদের বেলায় স্নানের এই ঘটা দেখবার মত। মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত সারা শরীর তারা মার্জনা করে। অথচ পরনের শাড়ি ভেজে না বা পুরুষের চোখের সামনে শ্রীঅঙ্গের অংশবিশেষ উন্মুক্তও হয় না। স্নান সমাপন হবে অথচ চুল ভিজবে না, শাড়ি ভিজবে না ইত্যাদি। স্নানের পর আরম্ভ হবে প্রসাধন। লম্বা কেশদাম সযত্নে বেণীবন্ধিত হবার পর, বেণীর মাথায় শোভা পাবে ঠাকুরের পায়ের ফুল। এইভাবে রোজ সকালে প্রতি কলতলাতেই শুরু হয়ে যায় স্নানপর্বের হুড়োহুড়ি। পুরুষরা খালি গায়ে হুড়হুড় করে জল ঢালে। ছেলেরা নিমের কাঠি দিয়ে দাঁত মাজে। বুড়োরা পাকানো সলতে দিয়ে জিভ ছোলে। আর শীতের সকালেও বাচ্চাদের গা আদুল করে মায়েরা তেল সাবান দিয়ে চান করায়।

কলতলায় যাবার সময় স্তেফান কোভালস্কী এই ছবিগুলোই দেখতে দেখতে চলেছে। হঠাৎ এক সুশ্রী যুবতী মায়ের দিকে তার চোখ পড়লো। মেয়েটির পরনে

লালপাড় একটা শাড়ি। শিরদাঁড়া খাড়া করে মেয়েটি গলির মুখে বসে আছে। তার ছড়ানো কোলের মধ্যে শুয়ে আছে একটা কচি বাচ্চা। আদুল বাচ্চার কোমরে সরু একটা ঘুনসি বাঁধা। এ ছাড়া গায়ে এক ফালি কানিও জড়ানো নেই। মোটাসোটা চুলবুলে বাচ্চাটার দিকে ঠায় চেয়ে আছে মা। বাচ্চাটাও দেখছে মাকে। যেন চোখে চোখে কথা হচ্ছে তাদের। স্তেফান মুগ্ধ হয়ে গেল ছবিটা দেখে। হাতের বালতি মাটিতে নামিয়ে রেখে যেন খোঁটার মত গাঁথা হয়ে গেল সেখানে। তারপর দেখতে লাগলো মা ও ছেলের চোখে চোখে খেলা। হাতের চেটোয় তখন কয়েক ফোঁটা সরষের তেল নিয়েছে যুবতী মেয়েটি আর কোলের মধ্যে পড়ে থাকা বাচ্চার গায়ে ধীরে ধীরে মালিশ করছে। স্তেফান অবাক হয়ে দেখছিল কত সতর্ক মনোযোগ আর নিপুণতার সঙ্গে মায়ের হাত শিশুর গায়ের ওপর আলতো ভাবে ওঠানামা করছে। যেন ছন্দের হিল্লোল খেলে যাচ্ছে তার চাঁপারকলির মত আঙুলগুলোয়। শরীরের এক পাশ থেকে উঠে বক্ষঃস্থল পেরিয়ে অন্য দিকের কাঁধ পর্যন্ত যাচ্ছে আবার গড়িয়ে নামছে ঢেউয়ের মত। এইভাবে গায়ের মালিশ শেষ করে বাচ্চার দুটো হাত ছড়িয়ে দিল মেয়েটি। তারপর বাচ্চার চোখের দিকে চেয়ে গান গাইতে গাইতে হাত দুটোয় তেল মালিশ করতে লাগলো। মালিশ শেষ হলে ছোটো ছোটো দুটো হাত বুড়ো আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রগড়াতে লাগলো। এর দরুন শিশুর হাতের রক্তচলাচল স্বাভাবিক হবে। এমনি করে বাচ্চার শরীরের সব জায়গায় মেয়েটির হাতের আঙুল যেন নৃত্য করতে লাগলো। পায়ের গোড়ালি, পায়ের পাতা, হাতের চেটো, আঙুল থেকে শুরু করে শিশুর গ্রীবা, ঘাড়ের পিছন দিক, কোমর, পিঠ, পাছা সর্বত্রই মায়ের হাত শিশুর গায়ের ওপর খেলা করতে লাগলো। এর পর শিশুপুত্রকে দু-একটা ছোটখাট ব্যায়াম করাল মেয়েটি। শিশুর কচি কচি দুটো হাত আড়াআড়ি করে বুকের ওপর বারংবার ফেলতে লাগলো। এর ফলে শিশুর পিঠ ও পাঁজরের জড়তা কাটবে এবং শিশু সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে। সবশেষে বাচ্চার পেটের কাছে পা দুটো মুড়ে খুলে দিতে লাগলো। পায়ের এই ব্যায়ামটি যে কোনো শিশুর পক্ষে খুব উপকারী, কারণ এর ফলে মূত্রাশয়ের জড়তা কেটে যায়। যতবার এইভাবে শিশুর পায়ের ব্যায়াম করাচ্ছিল তার যুবতী মা, ততবারই আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠছিল শিশুটি। স্তেফানও স্তব্ধ বিস্ময়ে এই অনির্বচনীয় দৃশ্যটি প্রাণভরে দেখছিল।

পরবর্তীকালে স্তেফান মনে মনে বলেছে, 'সেদিন দাঁড়িয়ে যা দেখেছিলাম তা আমার কাছে স্নেহ-প্রীতিতে মোড়া মায়েদের একটি মধুর কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।' মাতৃস্নেহের এমন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত তার চোখে আগে পড়েনি। যেখানে অস্বাস্থ্য আর দূষণ প্রতি মুহূর্তেই শিশুর জীবনীশক্তি নষ্ট করতে চায় সেখানে শিশুর গা মালিশ করে তাকে পরিবেশের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা সব মায়েরেই অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হওয়া উচিত। বস্তুত এই কদর্য কুৎসিত পরিবেশে এমন নির্মল শুভ্র দৃশ্যটি স্তেফানকে যেন এক ঝলক আলো দেখাল। কল থেকে ক্ষীণ ধারায় জল পড়ছে। লাইনে বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক ডজন মেয়ে-পুরুষ। তাদের সঙ্গে স্তেফানও আছে। হয়ত সকলের বালতিগুলো জলভর্তি করতে একটা যুগ কেটে যাবে। কিন্তু তাতে কি? আনন্দ নগরে সময়ের হিসেব কেউ রাখে না। ও নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। তাছাড়া কলতলা হলো স্তেফানের মত মানুষদের কাছে সব থেকে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। কারণ সব রকম গুজব

আর খবর জমা হয় এখানে। স্তেফান চুপচাপ লাইনে দাঁড়িয়ে এই সবই দেখছিল। এইসময় ছোট্ট একটা মেয়ের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। মেয়েটা একগাল হেসে স্তেফানের থালাটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কব্জিতে বাঁধা হাতঘড়িটার ওপর আঙুল দিয়ে মেয়েটা ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বললো, 'দাদা! নিশ্চয়ই তোমার খুব তাড়া আছে?

কেন বলো তো?'

তোমার হাতে যে ঘড়ি আছে!'

কলতলা থেকে ফিরে স্তেফান দেখলো তার ঘরের সামনে অনেক মানুষের ভিড়। একবার দেখেই স্তেফান তাদের চিনতে পারলো। ওরা এখানকার খ্রীশ্চান পল্লীর লোকজন। প্রথম দিন সন্ধ্যেবেলায় এদের কাছেই রেক্টরের দূত তাকে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন যে মেয়েটি স্তেফানকে তার কোলের বাচ্চাকে আশীর্বাদ করতে বলেছিল, সে-ই এগিয়ে এল। তারপর কয়েকটা সেঁকা রুটি আর ছোট একটা মদের বোতল দিল স্তেফানকে। স্তেফান অবাক। সপ্রতিভ মেয়েটি বিনীতভাবে বললো, 'নমস্কার ফাদার! আমার নাম মার্গারেটা। আমরা সবাই ভাবলাম নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের ভোজনোৎসব পালন করার মত যথেষ্ট খাবারদাবার আপনার সঙ্গে নেই। তাই এই ক'টা রুটি আর এক বোতল মদ নিয়ে এলাম আপনার জন্যে।' শুধু অবাক হওয়া নয়, স্তেফান রীতিমত অভিভূত। এদেরই খাবার সংস্থান নেই, এত গরিব এরা। তবুও খ্রীষ্টকে স্মরণ করে এই সব খাবারদাবার এনেছে। স্তেফানের মনে পড়ে গেল রোমের মাটির তলার সমাধিভূমি এবং সেই প্রথম খ্রীশ্চানদের কথা।

আবেগ গোপন করে স্তেফান মেয়েটির দিকে চেয়ে বললো, 'ধন্যবাদ!' সপ্রতিভ মেয়েটি বললো, 'আমরা একটা টেবিলও পেতে রেখেছি।' মেয়েটির মুখে দুষ্টুমির সলজ্জ হাসি।

'তাই নাকি! চল যাওয়া যাক।' স্তেফানও আর খুশী গোপন করলো না।

আনন্দ নগরের সত্তর হাজার হিন্দু-মুসলমান বাসিন্দাদের সঙ্গে এই কয়েক ঘর খ্রীশ্চানও একটা ছোট্ট ঘনিষ্ঠ বৃত্ত রচনা করে বাস করে। এরাও গরিব তবে অন্যদের মত একেবারে ভিখিরী হয়ে যায় নি। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো যে এরা সংখ্যায় অল্প এবং সেইহেতু ভাগ্যবান। আপাত অসঙ্গত মনে হলেও কথাটা ঠিক। কারণ সংখ্যায় অল্প হলে সাহায্যের আয়তনটি বড় হয় এবং ঠিকমত পৌঁছায়। অন্যদিকে এই অঞ্চলের হিন্দু বা মুসলমান গরিব মানুষের সংখ্যা তিরিশ লাখেরও বেশী। সুতরাং কোনো ধর্মীয় সংস্থার পক্ষেই এত মানুষের কাছে সাহায্যের উদার হাতটি ঠিকমত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় কারণ হলো যে সংখ্যাল্পতার দরুন এরা নিজেদের আলাদাভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করার সুযোগটা এরা স্থানীয় চার্চ থেকে নিয়মিত পায় বলেই আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। ইংরিজিতে কথা বলা কিংবা লেখাপড়ার সুযোগটি পাবার দরুন আপিস কাছারিতে চাকরি পাবার সুযোগ এদের আছে। ফলে নেহাত শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের মত খাওয়া-পরা জোটাতে হয় না। সবশেষ কারণটি ধর্মীয়। দরিদ্র হলেও একজন খ্রীশ্চানকে হতাশা পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে না। ওরই মধ্যে ভালভাবে থাকার একটা চেষ্টা সে করে যা একজন হিন্দু পারে না। তফাতটা দৃষ্টিভঙ্গির। একজন

হিন্দুর কাছে পূর্বজন্মের কর্মফলই সব। তাই দুর্ভাগ্য মেনে নিতে তার কষ্ট হয় না। সে বিশ্বাস করে যে এ-জন্মের সুকৃতি পরজন্মে তাকে নিশ্চয়ই সুফল দেবে। একজন খ্রীশ্চানের কাছে সংস্কারের এই নিষেধটি মোটেই মান্য নয়। তাই টানাটানি করে সে তার দুরবস্থার গ্রন্থিগুলো মোচন করার চেষ্টা করে এবং সফলও হয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান। বলাবাহুল্য এই প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা খ্রীশ্চান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশী। আনন্দ নগরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

বস্তিবাসী এই খ্রীশ্চানেরা প্রধানত বিহারের বেতিয়া অঞ্চল থেকে এসেছে। বেতিয়া মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং ১৯৪০ সাল পর্যন্ত উত্তর ভারতের খ্রীশ্চান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল এটি। এদের আদি মানুষরা সবাই ছিল ধর্মান্তরিত। আঠারো শতকের প্রথমদিকে পঁয়ত্রিশজন ধর্মান্তরিত নেপালী তৎকালীন অত্যাচারী রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা সইতে না পেরে ভিটে-মাটি ছেড়ে ভারত-বর্ষে আসে এবং বেতিয়ায় পুনর্বাসন করে। এরাই বেতিয়ার আদি খ্রীশ্চান। ধর্মীয় কারণে এই দেশান্তর গমণ পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিশেষ ঘটনারূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। পঁয়ত্রিশজন ধর্মান্তরিত নেপালীর দলনেতা ছিল একজন ইতালীয় খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষে এসে এক দেশীয় রাজার রাজ্যে এরা প্রথম আশ্রয় পায়। রাজমহিষীর এক দুরারোগ্য ব্যাধি অলৌকিকভাবে সারিয়ে দেয় এই খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী। তখন অনুগৃহীত রাজা এই পঁয়ত্রিশজন খ্রীশ্চানকে পুনর্বাসনের জমি দেন তাঁর নিজের রাজ্যে। এইভাবে খ্রীশ্চানরা কালে কালে এখানে এসেছে এবং পুন-র্বাসনের জমি পেয়ে বসবাস শুরু করেছে। তারপর ধীরে ধীরে এখানে খ্রীশ্চানদের একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। এক শতাব্দী পরে এদের সংখ্যা হয় দুহাজার। বেতিয়ার এই খ্রীশ্চানরা খুবই রুচিসম্পন্ন জীবনযাপন করতো। সরু সরু রাস্তার ধারে চুনকাম করা ছিমছাম ঘরবাড়িতে তারা থাকতো। বাড়ির সংগে লাগোয়া থাকতো একটুকরো বাগান। রাস্তার মোড়ে সুদৃশ্য পার্কে অজস্র ফুল ফুটতো এবং গির্জায় গির্জায় উপাসনাদিতে তারা নিয়মিত যোগ দিত। পুরুষের মাথায় পরতো চওড়া কানাওলা টুপি। মেয়েরা ঘাগরা পরতো এবং মাথায় দিত ওড়না। বেতিয়ার এই খ্রীশ্চান পল্লীর পরিচ্ছন্ন পরিবেশটি দেখে মনে হতো এটি যেন ভূমধ্যসাগরের তীরে কোন এক খ্রীশ্চান গ্রাম। এরা মূলতঃ ছিল কৃষিজীবী। কিন্তু এই কৃষিজীবীদের ভাগ্যে সুখ চিরস্থায়ী হলো না। একদিন দুর্ভাগ্যের ঝড় এসে এদের স্তম্ভিত করে দিল। ইংরেজরা বলতো নীলসোনা আর স্থানীয় কৃষকরা বলতো নীলগাছ। ইংরেজদের শাসনে জোর করে শুরু হলো একফসলী নীলচাষ। ক্রমে এর চাষ হয়ে উঠলো বাধ্যতামূলক এবং গান্ধীজী ১৯২০ সনে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললেন। বস্তুত এই বেতিয়া অঞ্চল থেকেই গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরে ১৯৪২ সাল নাগাদ নীলচাষ বন্ধ করে দেওয়া হয় কারণ ততদিনে এক পরিবর্ত রাসায়নিক পদার্থ নীলসোনার বিকল্প হিসেবে আবিষ্কার হয়ে গেছে। তবে নীলচাষ বন্ধ হলেও যাবার আগে সে যথোচিত প্রতিশোধ নিয়ে গেল। যে মাটিতে একফসলী নীলচাষ হতো সে মাটিতে অন্য কিছুই চাষ হলো না। মাটি হলো বন্ধ্যা এবং কয়েক হাজার কৃষক ভূমিহীন অবস্থায় দেশ গাঁ ছাড়া হলো।

আনন্দ নগরের খ্রীষ্টীয় 'ম্যাস' উৎসবের উপাসনায় সেদিন যারা স্তেফানের সংগে

হয়েছিল আর সবাই ছিল বাস্তুভূমি থেকে উৎখাত হওয়া পরিবারের মানুষ। এদের সংখ্যা কুড়ি জনের মত। প্রধানত নারী, শিশু এবং দু-একজন বৃদ্ধ ছাড়া এই দলে সেদিন আর কোনো পুরুষ ছিল না। পুরুষরা ছিল না কারণ তারা কাজে গেছে এবং তাদের এই অনুপস্থিতিই এই সম্প্রদায়ের পুরুষদের বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তির ইঙ্গিত দিচ্ছিল কারণ অন্য সম্প্রদায়ের প্রায় সব পরিবারের পুরুষরাই বেকার জীবন যাপন করতো। এই মেয়ে এবং শিশুর দলে এমন একজন ছিল যে চট করে নজর কাড়ে। হতভাগা চেহারার এই মানুষটার গায়ে শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়। কিন্তু চোখে-মুখে এমন এক উজ্জ্বল আভা যা অনেকের মধ্যে আলাদা করে তাকে চিনিয়ে দেয়। ছেলেটি বোবা কিন্তু ভারি সরল। কি করে কোত্থেকে যে সে এই আনন্দ নগরে এসে হাজির হয়েছে তা কেউ জানে না। একদিন ঘোর বর্ষায় সময় যখন মাঠঘাট, রাস্তা, গলি সব জলে থৈ থৈ, তখন প্রায় ডুবতে বসেছিল এই বোবা ছেলেটা। বিধবা মার্গারেটাই তাকে কোনরকমে বাঁচায়, আর ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু ক'টা দিন বাদেই একদিন ভোরবেলা মার্গারেটা উঠে দেখলো যে বোবা নেই। দুবছর ছেলেটার কোন পাত্তা ছিল না। আবার সে ফিরে এসেছে এখানে। একেবারে ছন্নছাড়া বেপরোয়া মানুষ। যেখানে সেখানে ছেঁড়া কাঁথার ওপর শুয়ে রাত কাটায়। যা পায় খায়। মাস-খানেক আগে দেখা গেল রাস্তায় শুয়ে ধুঁকছে। শরীরে প্রাণটুকু শুধু ধুকপুক করছে। খবর পেয়েই মার্গারেটা ছুটলো। দেখেই বুঝলো যে বোবার কলেরা হয়েছে। তাড়াতাড়ি একটা রিক্সায় চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে এল তারপর ডিউটি নার্সের হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে ভর্তি করিয়ে দিল। ফেরার পথে চার্চে গিয়ে মার্গারেটা বোবার নামে একটা বাতি জ্বালাল। তিন দিন পরেই বোবা ফিরে এল ওদের মধ্যে। সেদিন স্তেফান কোভালস্কীকে দেখেই বোবা ছুটে গিয়েছিল তার কাছে। তারপর নিচু হয়ে সযত্নে তার জুতার ধুলো ঝেড়ে দিল এবং স্তেফানের একটা হাত তার নিজের মাথায় ছোঁয়াল।

খ্রীশ্চান পল্লীতে গিয়ে এবং ওদের ব্যবস্থাদি দেখে স্তেফান স্তম্ভিত। তার মনে হলো এই ঘটনার স্মৃতি তার মনে চিরকাল অমলিন থাকবে। দুধারে দুটো শূন্য কাঠের পেটির ওপর তক্তা পেতে টেবিল তৈরি হয়েছে। টেবিলের ওপর ধপধপে সাদা চাদর পাতা। টেবিলের দুকোণে দুটো মোমবাতি রাখা হয়েছে। আর রয়েছে একটা কাঁচের প্লেট আর গোল পাত্র। কাঠের তৈরি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটা মূর্তিও রয়েছে একপাশে। অলংকরণের জন্যে হলুদ গাঁদার মালাও রয়েছে। এইভাবেই কল-তলার পাশে খ্রীশ্চানপাড়ার চত্বরে উঁচু বেদিকার ওপর উপাসনার আয়োজন করে রেখেছিল ওরা।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সমস্ত আয়োজনটি মন দিয়ে দেখলো স্তেফান। এই পরিবেশে যে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটতে চলেছে তারই কথা গভীরভাবে ভাবছিল সে। উনানের কটু-ধোঁয়া, শতচ্ছিন্ন জামা প্যান্ট পরা ছোট ছোট ছেলেদের ছুটোছুটি চেঁচামেচি, গান, চীৎকার করে কলহ।—সব মিলিয়ে সাধারণ জীবন যেন ছন্দহীন। ঘরের ছাত থেকে ঝুলছে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, খোলা নালা থেকে বেরোচ্ছে পাঁকের পচা গন্ধ, এরই মধ্যে স্তেফান মনটা সুস্থির করার চেষ্টা করছিল। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল। তার হাতে রয়েছে শুকনো রুটিখানা। যীশু খ্রীষ্টও যেমন তাঁর শেষ ভোজনোৎসবের দিনটিতে এইরকম একখানা শুকনো রুটি নিজে ছিঁড়েছিলেন, তেমনি স্তেফানও যেন রুটি ছিঁড়ে মহান সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করতে চলেছে। তার হাতের রুটির

টুকরোটা যেন স্বয়ং ঈশ্বর, কারণ সৃষ্টির সব কিছুরই আদিতে বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বিরাজ করেন। স্তেফান কোভালস্কীর মনে হলো যে মানুষকে এইভাবেই বদলে আনতে হবে কারণ সব থেকে বিস্ময়কর বিপ্লবটি এইভাবেই ঘটে চলেছে নিরন্তর।

গরিব মানুষের বস্তিতে কিংবা কোনো ফ্যাক্টরীর কোণার ঘরে তাদের সঙ্গে 'ম্যাস্' উৎসব সে আগেও বহুবার পালন করেছে। কিন্তু আজ যেন ভাঙা মনের পীড়িত মানুষগুলোর মধ্যে এসে তার মনে হলো সে ধন্য। সবাই মিলে রুটিখানা ভাগ করে নেওয়ায় এদের যথার্থ সেবা করতে পারলো স্তেফান।

সে ভেবেছে, 'পীড়িত অবহেলিত মানুষদের মধ্যে গিয়ে ঈশ্বর যখন তাদের সেবা করেন, তাদের দুঃখের ভাগ নেন, তখন আমার কাছে তা এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়। যেন মানবদেহ ধারণ করার জন্যে মহিমা ত্যাগ করে এই নীচে নেমে আসাটাই বড় নয়। তিনি নীচে নেমে আসেন যাতে দীন নিঃস্ব, বঞ্চিত হেয় মানুষ-দের আরও কাছাকাছি থাকতে পারেন। ঈশ্বর যে পরম করুণাময়, তিনি যে স্বয়ং অখণ্ড ভালবাসা তাঁর এই স্মরণদিনে এই উপলব্ধিটাই আমার কাছে যেন অন্তহীন আনন্দের কারণ হয়ে থাকলো।'

যখন মঠের নৈঃশব্দ এনে কোভালস্কী 'ম্যাস' উৎসব উদযাপন করার চেষ্টা করছে, তখন তিনটে নেড়ি কুকুর প্রায় তাদের মাপের একটা ধেড়ে ইঁদুরকে তাড়া করছিল। এমন ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটছে। সুতরাং কেউই নজর দিল না। তবে কোভালস্কী যখন সুসমাচার থেকে খ্রীষ্টের উপদেশগুলি পাঠ করছে তখন একজন বেলুনওলা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। শ্রোতাদের কেউ কেউ এক নজর দেখে নিল তাকে। বাঁশের আগায় ঝলমল করছে রঙবেরঙের অজস্র বেলুন। ধুসর রঙের আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করছে এক ঝাঁক তারার ফুল। দেখতে দেখতে উড়ে যাওয়া বেলুনগুলো যখন দূরে আকাশের গায়ে হারিয়ে যাচ্ছে, তখন কোভালস্কীর গলার স্বর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উদার আকাশে ছড়িয়ে পড়লো যেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে শীর্ণ কাহিল মুখের মানুষগুলোর দিকে নিবিড় প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে কোভালস্কী। খ্রীষ্টের যে উপদেশটি সে পাঠ করছে, সেটি যেন বহন করে এনেছে এদের প্রতি তাঁর নিবিড় ভালবাসা আর শুভেচ্ছা। সে আবৃত্তি করলোঃ

> তারাই সুখী যারা নিঃস্ব, দুর্বল,
> কারণ তাদের জন্যেই স্বর্গের দ্বার অবারিত।
> তারাই ভাগ্যবান যারা শোকাতাপা,
> কারণ ঈশ্বর তাদের শান্তি দেন।
> তারাই আনন্দ পায় যারা ধর্মানুগত, ন্যায়নিষ্ঠ,
> কারণ তাদের আকাংক্ষা অপূর্ণ থাকে না।

বাণীটি আবৃত্তি করতে করতে স্তেফান কোভালস্কী মনে মনে অস্থির হয়ে উঠছিল। এই উপদেশ তিনি কাদের শোনাচ্ছেন? 'এই শুকনো কথাগুলো আর অধিক কি দেবে এদের।' তার মনে হলো, 'ক্লেশ দুঃখ অপমান স'য়ে এরা নিজেরাই ত' খ্রীষ্ট হয়েছে? খ্রীষ্টের দেখিয়ে দেওয়া সেই দুর্বল ভীরু মানুষ ত' এরাই? এদের কথাই জিহোবো বলেছেন এবং এদের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন খ্রীষ্ট।'

অল্পক্ষণ নীরব থেকে স্তেফান কোভালস্কী তার দুহাত বাড়িয়ে দিল। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে চাইলো দুঃখী নির্যাতীত ক'টা মানুষকে। সে চাইল খ্রীষ্টের বাণীটি ওদের অনুপ্রাণিত করুক। তাই গভীর প্রেমে সে দেখতে লাগলো তার সদ

পাওয়া ভাইবোনদের ভাঙাচোরা ম্লান মুখগুলো। তারপর যেন স্বয়ং খ্রীষ্ট তাঁর মুখ দিয়ে সান্ত্বনার অভয়বাণী শোনালেন। 'তোমরা শান্তি পাও, কারণ তোমরাই জগতের আলো!'

পনেরো

বস্তির কলতলায় স্তেফান কোভালস্কীর প্রথম স্নানায়োজন শুরু হলো আর একটি অপরাধ দিয়ে। মাত্র ইজেরটুকু ছাড়া স্তেফানের সারা ঊর্ধাংগে আর কোন বসন ছিল না। সেই অবস্থায় হাতে বালতি নিয়ে গলিপথ মাড়িয়ে সে কলতলায় এসে পৌঁছলো। তারপর খাঁটি ভারতীয় কায়দায় আসনপীঁড় হয়ে বসে সে পায়ের গোড়ায় জল ঢালতে লাগলো। ঠিক এই অবস্থায় পশ্চিম দেশের কোন মানুষ বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। কিন্তু স্তেফান পারছে কারণ অত্যুৎসাহে সে ভারতীয় হবার চেষ্টা করছে মনেপ্রাণে। ইতিমধ্যে ঘটনাটা আশপাশের লোকের নজরে পড়ে গেছে। স্তেফান যখন পায়ের ওপর জল ঢেলে গোড়ালি ধুচ্ছে তখন রীতিমত হুলস্থুল পড়ে গেল সেই দৃশ্য দেখে। চায়ের দোকানের হিন্দু মালিক চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'সায়েব! ওটা কি হচ্ছে? ওভাবে কি চান করে কেউ? আগে মাথায় জল ঢালুন, গা রগড়ান, তারপর পা ধোবেন।' স্তেফান হয়ত একটা ওজর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন গত রাত্রির সেই খাবার আনা বালিকাটা কৌতুকভরা চোখে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সামনে একজন আধা ল্যাংটা সাহেবকে অপ্রস্তুত মুখে গায়ে জল ছিটোতে দেখে, সে আর থাকতে পারলো না। খিলখিল করে হেসে উঠলো। 'কি সায়েব দাদা! চান করচো? কিন্তু তোমার চানের দরকার কি? তুমি ত এমনিতেই সাদা!'

এরপর চার নম্বর অপরাধটা সে চানের পর করে বসলো। শোবার চাটাইখানা উল্টোভাবে মুড়ে রাখছিল সে। তখন একজন প্রতিবেশিনী তাকে বুঝিয়ে দিল যে এর ফলে তাকে মাথার দিকে পা আর পায়ের দিকে মাথা রেখে রাত্রে শুতে হবে। স্তেফান বুঝতে পেরেছে যে এইসব খুঁটিনাটিগুলো শুধরে নিতে সময় লাগবে। তখন বস্তির লোকজনও তার কাজকর্ম দেখে আর চমকাবে না। এখানকার মানুষরা খুব চাপা। চট করে কাউকে কাছে টেনে নিতে পারে না। চান করে ফেরার সময় স্তেফান দেখলো বউরা তাকে দেখে একমুখ ঘোমটা টেনে দিল। বাচ্চারা গুলি খেলছিল। তাকে দেখেই খরগোসের মত ছুটে পালালো। স্তেফান জানে এদের সমাজের বাইরের মানুষ সে। তাই সমাজের খোলের মধ্যে চট করে ঢোকবার সুযোগ তার নেই। তবে এখানকার পোকামাকড়ের জগৎ তাকে সমাজচ্যুত করে নি। তাকে দিব্যি নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে। রাত্রে যেমন ইঁদুর, কেন্নো, বিছা আর মশা আছে, দিনে তেমনি মাছি। রেতে মশা দিনে মাছি। দিনের বেলায় মাছিদের নৃত্য দেখছিল স্তেফান কোভালস্কী। এক সময় সে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো পরমানন্দে তাকে ঘিরে নাচ-গানের আসর বসিয়েছে মাছির দল। বড় ছোট, সবুজ, ধূসর কত রকমের মাছি। উড়ন্ত জীবগুলো এক সংগে পুরো বাহিনী নিয়ে ঘুরছে এবং শরীরের সামান্যতম অনাবৃত অংশে আক্রমণ করছে। কখনও গায়ে বসছে, নাকে, কানে ঢুকছে, চোখের পাতায় বসছে। কোন সংকোচ নেই, ধৃষ্টতা বা লজ্জাসরমের বালাই নেই। তাড়া করলেও অনুগ্রহ করে উড়ে পালায় না। শুধু সরে বসে। স্তেফান বুঝলো যে সে তখন পুরোপুরি

ওদের দখলে। শেষ পর্যন্ত উন্ধরের আশা ছেড়ে সে পুরনো মধুর স্মৃতি মনে করবার চেষ্টা করলো। তার মা তার জন্যে শেষ পাতের খাবার বানাচ্ছেন কিংবা খনি থেকে ফেরার সময় তার বাবার কয়লার মত কালো মুখখানা।

সেই প্রথম দিনের সকালবেলায় তাকে শেষমেশ খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হতে হলো। দেওয়ালে পিন দিয়ে আটা যীশুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট অথচ করুণাময় মুখখানার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ওম্ মন্ত্র প্রার্থনা করতে লাগলো। খানিক পরে মন্ত্রের আলাদা অস্তিত্ব থাকলো না। তার হৃদস্পন্দনের সংগে এক করে ফেললো মন্ত্রটাকে। সে দেখেছে, এইভাবে শরীরের ছন্দটি যদি ঠিকমত ঈশ্বরমুখী করতে পারে তবে বাইরের উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলো না। আগের মত মাছির দল ঠিকই উৎপাত করলেও স্তেফানের যেন কোনরকম সাড় ছিল না।

ঠিক তখনই দরজার ফাঁক দিয়ে ফাদার কার্দিয়েরোর পাঠানো সেই এ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছোকরার হাসি মুখ দেখতে পেল স্তেফান। সে খোঁজ নিতে এসেছে বিদেশী স্তেফান সময়টা কিভাবে কাটালেন। স্তেফান তাকে সবিস্তারে বারোয়ারি পায়খানা আর মাছি, ইঁদুরের উৎপাতের কথা যখন বলছিল, তখন যেন কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো মানুষটা। বললো, 'ফাদার কার্দিয়েরো বলে দিলেন প্রেসবিটারীতে (Presbytery) একটা ভাল ঘর আছে। আপনি সেখানে চলুন। সেখান, থেকেই যাতায়াত করবেন। এখানে কোনো খ্রীশ্চান পাদরী থাকতে পারে না।' স্তেফান উত্তর দিল না তার কথায়। ছোকরা দুঃখে মাথা নাড়ালো তারপর চামড়ার ঝোলা থেকে দুখানা বই বার করলো। একটা বাংলা ব্যাকরণেই বই, অন্যটা হিন্দিতে অনুবাদ করা বাইবেল। ভারি খুশী হয়ে বই দুখানা হাত পেতে নিল স্তেফান। তার মনে হলো এবার বোধহয় সে নৈঃশব্দের দেওয়ালটা ভাঙতে পারবে। তখন আর সে নিঃসংগ বোধ করবে না।

নিজেকে ঠিকমত বোঝাতে পারে নি বলে স্তেফানের অবশ্য মনোকষ্ট হচ্ছিল না মোটেই। কারণ সে জানতো নিচুর কাছে নিচু হতে হয়, নইলে তার হৃদয়ে ঠাঁই পাওয়া যায় না। তাই নিজেকে সে বুঝিয়েছিল, 'আমিই ত' এদের কাছে এসেছি। ওরা কেন আমার কাছে আসবে?' এটাই আসল বিবেচনাবোধ। এই মৌল বোধটুকু না থাকলে ভাল অবস্থার মানুষ কখনও সাধারণ মানুষের সংগে একাত্ম হতে পারে না। এদের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধে পেয়ে সে মানুষ হয়েছে। সবচেয়ে বড় সুযোগ সে বিদেশী। ফুটবল খেলোয়াড়ের মত তার স্বাস্থ্য মজবুত। শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছে সে। তার সংসার নেই। সুতরাং তার মুখ চেয়ে বসে থাকার মানুষও নেই। সবচেয়ে বড় সুবিধে হলো যে ইচ্ছে করলেই সে পালিয়ে বাঁচতে পারে। ওর তুলনায় এই বস্তির মানুষগুলো কত অসহায়। এদের স্বাস্থ্য নেই, দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান নেই, মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই। তাই প্রথম অবস্থায় ভাষার এই বাধাটা তাকে এদের অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে। অন্তত তারা বুঝতে পেরেছে স্তেফান নামক এই বিদেশী 'সায়েব পাদরী' তাদের চেয়ে কোনো ভাবেই উত্তম নয়। জল যে 'পানি' কিংবা হিন্দিতে যে 'চায়' বলে তাও সে বোঝে না এমনিই বোকাহাঁদা মানুষ স্তেফান। তাই বারবার ভুল উচ্চারণ করে স্তেফান যেমন এদের কৌতুক বাড়িয়ে তুলছিল, তেমনি কখন অজান্তে যে এদের মনের কোণে তার একটা স্থায়ী আস্তানা করে নিয়েছিল, মানুষগুলো নিজে-

রাই তা জানতে পারে নি। ভালবাসার এই টাইটুকু পেয়ে স্তেফান কোভালস্কীও কৃতার্থ হয়েছে। মানুষটা যে সুখের পায়রা হয়ে এখানে আসেনি, আনন্দ নগরের মানুষ তা বুঝে গিয়েছিল বলেই ভালবেসে তাকে ডাকে 'স্তেফানদাদা।'

আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা হলো হিন্দি। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষের কথ্যভাষা এটি। আনন্দ নগরেরও অধিকাংশ মানুষ এই ভাষা বোঝে। হিন্দি ছাড়াও আনন্দ নগরে আরও প্রায় বিশ তিরিশটা ভাষাভাষি মানুষ আছে। তারা বাংলা, উর্দু, তামিল, মালয়ালাম বা পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে। কোভালস্কী তাই ঠিক করলো যে আগে হিন্দি ভাষাটাই রপ্ত করবে। কিন্তু শেখাবে কে? অগত্যা নিজেই নিজের শিক্ষক হবে স্থির করলো। রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক প্রার্থনার পর সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আসনপীঁড়ি হয়ে বসতো। তার কোলের একদিকে থাকতো ফরাসী ভাষার বাইবেলখানা অন্যদিকে থাকতো তার হিন্দি অনুবাদটা। নিপুণ এবং উৎকর্ষময় হিন্দি লিপির বাইবেলখানির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্তেফানের মনে পড়ে যেত প্রাচীন মিশরীয় সাংকেতিক লিপির কথা। (hieroglyphic হাইয়ারগ্লিফিক)। তারপর বিখ্যাত ফরাশী লিপিপণ্ডিত সাঁপোইওঁ (Champollion) যে পদ্ধতিতে মিশরীয় চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন, সেই পদ্ধতিটি সেও অনুসরণ করবে স্থির করলো। তবে তার জন্যে এমন এক লিপি খুঁজে পাওয়া দরকার যেটিকে সূত্রসন্ধানী হিসেবে সে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং শুরু হলো খোঁজার পালা। হিন্দি বাইবেলের অনুচ্ছেদগুলো যত্ন করে লক্ষ্য করতে লাগলো সে। তার মনে হলো অন্তত একটা দেশ বা মানুষের নাম সে ঠিক খুঁজে পাবে যেটিকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয় নি। এইভাবে বেশ কিছু দিন খোঁজার পর সে হঠাৎ পেয়ে গেল একটা সন্ধানসূত্র। সে দেখলো ন'টি অক্ষর সম্বলিত বাক্যটা হিন্দির বদলে রোমান লিপিতে ছাপা হয়েছে। তখনই ফরাসী বাইবেলখানা খুলে সেই বিশেষ পরিচ্ছেদটি পড়ে ফেললো। তারপর হিন্দি বাইবেলখানা বার করে সেই পরিচ্ছেদের প্রতিটি বাক্যের পাশে পাশে ফরাসী বাক্যগুলো লিখে রাখতো লাগলো। এরপর প্রতিটি হিন্দি অক্ষরের গঠনরীতি মন দিয়ে পাঠ করলো স্তেফান। সে আবিষ্কার করলো যে প্রতীকী বাক্যটা একটা পবিত্র শহরের নাম। সে জানে একদা এই শহরের দরিদ্র অধিবাসীরা ঈশ্বরানুগ্রহ পেতে এখানে জড়ো হয়েছিল। তার মনে হলো আনন্দ নগরের বস্তিবাসী মানুষ এবং বাইবেল বর্ণিত সেই দরিদ্র শহরের মানুষের মধ্যে দুর্বোধ্য একটা সম্পর্ক আছে। এটাও তার কাছে যেন একটা সংকেত। বলাবাহুল্য সেই ম্যাজিক শহরটার নাম কেপারনম্।

ষোল

ঔপনিবেশিক জগতের সব পুরনো শহর থেকেই মানুষটানা যাত্রীগাড়ি প্রায় পুরোপুরি নির্বাসিত হয়ে গেছে। কারণ, স্বার্থসিদ্ধির দরকারে মানুষের হাতে মানুষের এমন চরম অবমাননা আর নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত আর হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো কলকাতা। এই শহরে আজও কয়েক লক্ষ মানুষ নামক ঘোড়া রিক্সার দুই দণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিচ্ছে। প্রতিদিন তারা যতটা পথ দৌড়য়, ততখানি পথ তিরিশটা বোয়িং এবং এয়ারবাস নামক ব্যোমযানও পাড়ি

দিতে পারে না। এই মানুষটানা রিক্সাগুলো প্রতিদিন দশ লক্ষাধিক মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গুটিকতক আদর্শবান নগর-রূপকার ছাড়া আর কেউ এমন কাল অতিক্রমকারী যানটিকে ঐতিহাসিক সংগ্রহ-শালায় পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবে নি। এর কারণ, বোধহয় এটাই একমাত্র শহর, যেখানে মানুষের ঘাম ঝরানো শ্রমের দাম সবচেয়ে সস্তা।

বড় বড় দুই চাকা, কাঠের স্পোক, হাল্কা ফঙ্গবেনে শরীর আর সোজা সরল দুটো শকটদণ্ড—এই নিয়ে রিক্সা গাড়ির অঙ্গসজ্জা। চেহারাটা দেখতে একেবারে সাবেক আমলের, ঠাকুমা দিদিমার সময়ের গাড়ির মতন। জাপানই প্রথম দেশ যেখানে এই অদ্ভুত চেহারার গাড়ির জন্ম হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে একজন ইউরোপীয়ান মিশনারীই এর প্রথম রূপকার। জাপানী ভাষায় এর নাম জী রিকি শ (ji riki shaw)—অর্থাৎ মানুষ টানা গাড়ি। ১৮৮০ সাল নাগাদ ভারতবর্ষের সিমলা শহরেই এই গাড়ি প্রথম চালু হয়। সিমলা শহর তখন ছিল ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শহর। এর প্রায় বিশ বছর পরে অর্থাৎ এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় খানকতক গাড়ি কলকাতা শহরে আমদানি হয়। কলকাতার রাস্তায় কিছু চৈনিক ব্যাপারী মালবহনের কাজে এই গাড়ি ব্যবহার করতো। এই চৈনিক ব্যাপারীদের উৎসাহে এবং আবেদন-নিবেদনে ১৯১৪ সাল নাগাদ কলকাতার রাস্তায় যাত্রীগাড়ি হিসেবে রিক্সার চল হয়। সাবেক কালের পাল্কি বা ডুলির চেয়ে ক্ষিপ্রগামী অথচ ঘোড়ায় টানা ঘোড়ারগাড়ির চেয়ে আরামদায়ক হওয়ার দরুন, এশিয়া মহাদেশের এই অগ্রগামী বন্দর শহর কলকাতায় সেদিন এই রিক্সাগাড়ির খুব সমাদর হয়। কলকাতা থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলো রাজধানী শহরেও এই গাড়ির ফ্যাশন পৌঁছে যায়। তখন, বিশেষ করে স্বাধীনতার ঠিক পরেই গাঁ-গঞ্জ থেকে কয়েক হাজার মানুষ চাষ-আবাদ ছেড়ে কলকাতায় এসে রিক্সা গাড়ির দুটো হাতল ধরে জীবনধারণের উপায় খুঁজে নিয়েছিল। ব্যাপারটা তাদের কাছে অনেকটা দৈবানুগ্রহ লাভের মত। ঠিক জানা যায় না কতগুলো রিক্সা কলকাতার রাজপথ বা গলিপথ দিয়ে এখন যাতায়াত করে। ১৯৩৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এদের সংখ্যা ছ' হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। যেহেতু ১৯৪৯ সালের পর অতিরিক্ত আর একটিও লাইসেন্স সরকারীভাবে জারি হয় নি, তাই আশা করা যে, সরকারী হিসাব মতে এদের বর্তমান সংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশী। তবে বেসরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী রিক্সা গাড়ির বর্তমান সংখ্যা এর পাঁচগুণ বেশী। অর্থাৎ হিসাবমত প্রতি পাঁচটির মধ্যে চারটি রিক্সা জাল নম্বর ঝুলিয়ে বেআইনিভাবে কলকাতার রাস্তায় চলাচল করে। এই পঞ্চাশ হাজার রিক্সার প্রতিটির জন্যে বরাদ্দ আছে দুজন চালক। অর্থাৎ প্রতিটি রিক্সা থেকে দুজন চালক জীবনধারণ করে। এরা পর্যায়ক্রমে এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যোদয় পর্যন্ত একটি রিক্সা চালাতে পারে। এই হিসাব মতে মোট এক লক্ষ মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের সংসার চালায়। অর্থাৎ মোট দশ লক্ষ মানুষের রোজ এক মুঠো অন্নের সংস্থান করে এই মানুষটানা গাড়ি। অর্থনীতিবিদরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক খতিয়ান দিয়ে বলেছেন যে প্যারিস শহরের পরিবহন খাতে পৌর বরাদ্দের মোট এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ মোট তিরিশ লক্ষ পাউণ্ডের মতন লেনদেন এই বৃত্তি থেকে হয়। তাঁদের হিসাব মতে এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত মানুষ বছরে প্রায় পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ডের সমান সংখ্যক মুদ্রা পুলিস অথবা অন্য কর্তৃপক্ষকে ঘুষ

দের হাতে ঘন বসতিপূর্ণ কলকাতা শহরে গাড়ি চালাবার অবাধ অনুমতি মেলে। অবশ্য ঘন লোকবসতির জন্যে কলকাতার অনেক রাস্তাই এই সব মন্থরগতিসম্পন্ন যানগুলোর ক্ষেত্রে ক্রমশ নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'বাংলার মত জিনিস নাই। এক গেলাস প্যাটে পড়লেই প্যাটের বাঘ লাফিয়ে উঠবে।' কি বলো বন্ধু!' হাতে এক গেলাস পানীয় নিয়ে রাম তখন সারা দেয়াল জুড়ে বিজ্ঞাপনের লেখাগুলো মন দিয়ে পড়ছিল। এই বিজ্ঞাপনটা শহরের অনেক জায়গাতেই সে দেখেছে। হাসারি তার নতুন পাওয়া বন্ধু। সেও স্বীকার করলো। বললো, 'কতাটা ঠিক। এক থাল ভাত আর মাছের ঝোল হজম করার মতন।' কথাটা বলে মুখটা বিকৃত করে পেটে হাত বুলোতে লাগলো সে। খানিক পরে ফের বললো, 'এর সব ভাল। তবে প্যাটে ঢুকলেই সব্বক্ষণ হুড়হুড় করে।' ব্যাপারটা সেইরকমই। চড়া এই পানীয়টি গলায় ঢালার সঙ্গে সঙ্গে শরীর আনচান করে। মনে হয় যেন এলোমেলো হয়ে গেল শরীরের ভিতরটা। তেমন হওয়াটা বিচিত্র নয়। কারণ যে পানীয়টি দুই বন্ধুর পেটে পড়েছে তার মারাত্মক ক্রিয়ায় যে কোনো মানুষই অসুস্থ হতে পারে। সাধারণত অনুমোদিত কোনো ব্রুয়ারীতে (মদ তৈরির কারখানা) এই পানীয় তৈরি হয় না। এর স্থানীয় নাম চোলাই। কলকাতার আশপাশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে এই চোলাই আমদানি হয়। সেখানে সারা বছর ধরেই লুকিয়ে চুরিয়ে এই চোলাই তৈরি হয়। মরা জন্তুজানোয়ারের নাড়িভুঁড়ির সঙ্গে আরও কত কি আবর্জনা মিশিয়ে আখের রসের সংগে জ্বালানো হয়। তারপর বড় বড় মাটির গামলার মধ্যে পুরে, গামলার মুখ এঁটে পচা পুকুরের তলায় মাসাধিককাল ফেলে রাখা হয়। রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতায় এই বিষাক্ত মদ্যপানের প্রতিক্রিয়ার খবর থাকে। এ দেশে প্রতি বছর যত লোক ম্যালেরিয়া রোগে মরে ঠিক তত লোক 'চোলাই' খেয়েও মরে। এর একটাই সুবিধে। আবগারি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোলাই তৈরি হয় বলে এক বোতলের দাম মাত্র সাত টাকা। অথচ সরকার অনুমোদিত খুবই সাধারণ মানের এক বোতল 'রাম' এর দাম এর পাঁচগুণ বেশী।

চোলাইয়ের ঠেক্ থেকে বেরিয়ে দুই বন্ধু হালকা মেজাজে চলতে লাগলো। দ্রব্যগুণ আর কিছু না করুক মেজাজটা রঙিন করে দেয়। একটু হাঁটতেই একজন স্থূলবপু মহিলা যাত্রী পেয়ে গেল রাম। মহিলা বিধবা। পরনে সাদা থান। রাম যত্ন করে বয়স্কা বিধবাকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলো। তারপর তরতর করে হাসারির চোখের সামনে দিয়ে ছুটে গেল গাড়ি নিয়ে রিক্সাটাকে যতদূর দেখা যায় দেখলো হাসারি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তার মনে হচ্ছিল রাম কত সুখী। সে কাজ করে খায়। সেটাই তার পরিচয়। অন্তত 'মানুষের' চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার এই মর্যাদা নেই। সে হলো রাস্তার ঘেয়ো কুকুর। এই-ই তার পরিচয়।

আলাদা হবার সময়েই ওরা কথা বলে নিয়েছিল যে পরের দিন পার্ক সার্কাস ময়দানের ট্রামলাইন জংশনের কাছে ওরা দেখা করবে। রাম বলেছে যে মালিকের লোকের সঙ্গে হাসারির আলাপ করিয়ে দেবে। রামের ধারণা লোকটার হাতে গোটা-কয়েক টাকা গুঁজে দিতে পারলেই হাসারির কপাল ফিরবে। অন্তত একটা পুরনো গাড়ি সে পেতে পারে। হাসারি জানে তার পোড়া কপালে এত সুখ বিধাতা লেখেন নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে চোলাইয়ের কৃপায় হাসারির মনটা যেন ডানা মেলা পাখির

মতন হালকা হয়ে আকাশে উড়ে যেতে চাইছিল। ওরা আরও ঠিক করেছে হাস-পাতালে গিয়ে সেই চোট পাওয়া মানুষটাকেও একবার সময় করে দেখে আসবে।

সেদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর হাসারি তার বউ আর ছেলেমেয়েদের দেখতে পেয়েছিল। সারা ফুটপাত জুড়ে তখন দোকান বসে গেছে। ফুটপাত গড়িয়ে রাজ-পথেও নেমে পড়েছে এই দোকানদারি। হাসারির মনে হচ্ছিল শহরের অর্ধেক মানুষই বোধহয় হকার, আর বাকি অর্ধেক ক্রেতা। থিকথিক করছে মানুষ। যেন মেলা বসেছে। আর কত জিনিস যে সওদা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। আনাজকোটা যন্ত্র, স্টীলের বাসন-কোশন, ফলের রস নিংড়ানোর যন্ত্র, সার্ট-প্যান্ট, বেল্ট, চটিজুতা, চামড়ার ব্যাগ, চিরুনি, চশমা, কলম আরও টুকিটাকি কত কি। মানুষ এবং সওদার ভিড়ে পথ চলাই দায়। রাস্তার মোড়ে চাকাগাড়ি করে ফেরিওলা গরম গরম আলুর 'টিকিয়া' বেচছে। হাসারির দারুণ লোভ হলো। বেশ ক'টা আলুর টিকিয়া কিনে ফেললো সে। সে জানে ছেলেরা খুব ভালবাসে টিকিয়া খেতে। কিন্তু পাঁচ টাকায় ক'টাই বা হয়! তার চেয়ে কয়েক ঠোঙা মুড়ি কিনতে পারতো সে। সংসারের সবাই খেতে পেতো। কিন্তু তরল দ্রব্যগুণের প্রভাবে মন তার উড়ু উড়ু। তখন কোনো দায়ই যেন দায় নয় তার কাছে।

অনেক ঘুরে হাসারি যখন তার ফুটপাতের ঘরকন্না খুঁজে পেল তখন বেশ রাত। কাছাকাছি আসতেই একটা হল্লার আওয়াজ তার কানে গেল। অনেক মানুষের জটলাও চোখে পড়লো তার। হল্লার শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের কান্নাও তার কানে গেছে তখন। হাসারির আশঙ্কা হলো হয়ত তার বউ ছেলেমেয়েদের কিছু বিপদ হয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল অকুস্থলের দিকে। গিয়ে দেখলো প্রতিবেশিনী বউটি ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। সারা মুখে রক্তের দাগ। হাত এবং কাঁধেও আঘাতের চিহ্ন। দেখলেই বোঝা যায় কেউ তাকে নির্দয়ভাবে মেরেছে। হাসারি শুনলো যে বউটির স্বামী সেদিনও মদ খেয়ে ফিরে হল্লা করছিল। তারপর বউয়ের সঙ্গে কথা কাটা-কাটি হয়। শেষমেশ উত্তেজিত লোকটা একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বউটাকে মারে: তখন আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ওদের আলাদা করে দেয়। নইলে লোকটা হয়ত খুন করে ফেলতো বউকে। লোকটা তার বাচ্চাদুটোকেও পিটিয়েছে। তারপর জামা-কাপড় কাঁধে ফেলে বউ ছেলেমেয়েদের নিষ্ঠুর ভাগ্যের দয়ার ওপর ফেলে পালিয়ে গেছে। একা যুবতী বউ অবুঝ ক'টা ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন অকূল পাথারে পড়েছে। তাই ডাক ছেড়ে সে কাঁদতে বসেছে। বড় ছেলেটা চোর। সে জেলে পচছে। মেয়েটা হয়েছে বেশ্যা। না জানি আরও কি আছে ভাগ্যে। বউটা তাই কাঁদছিল। হাসারির মনটাও হু হু করে উঠলো বউটার অবস্থা দেখে। তার মনে হচ্ছিল. 'এইজন্যেই কম্ম-ফলের অভিশাপ মানিত হয় আমাদের।'

বড় ভাগ্যি যে হাসারির বড় দুই ছেলে বড়বাজার থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ক'টা কুমড়োর ফালি আর শালগম এনেছে সেই রাত্রে। গর্ব করে ওরা সেই কথা-টাই বলাবলি করছিল ওদের মা'র কাছে। কত লোকই ত' রোজ জঞ্জাল ঘাঁটছে, কিন্তু ভাল-মন্দ জিনিস ক'জনের ভাগ্যে জোটে। অলকা তাড়াতাড়ি পাশের বউটির কাছ থেকে তোলা উনুন এনে রান্না চড়িয়ে দিল। দুই ভাগ্যবিড়ম্বিত পরিবার ভাগ করে খেল অলকার রান্না করা তরকারি আর হাসারির নিয়ে আসা আলুর টিকিয়া। তৃপ্তি-কর খাবার জুটলে মনের দুঃখভার লাঘব হয় না, আরও তীব্র হয়। বেড়ে যায় ভবি-ষ্যতের অনিশ্চয়তা জনিত ভয়। অন্তত সেই মানুষগুলোর ক্ষেত্রে যারা ফুটপাতে

পড়ে থাকে আশ্রয়হীন হয়ে। রাত্রিবাসের উপযুক্ত আচ্ছাদন যাদের মাথায় জোটে না। তবে এই ভয় আর অনিশ্চয়তা সেই রাত্রে ভাগ্যহত দুটো পরিবারকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। অন্তত তারা বুঝতে পারলো যে বাঁচার লড়াইতে গরিবের দরকার হয় গরিবকে।

সতেরো

রোজ রাত এগারোটা নাগাদ ব্যাপারটা শুরু হয়। প্রথমে প্রায় নিঃশব্দে কান্না। তখন শুধু চোখের জল গড়ায়। ক্রমে গুনগুন কান্নার আওয়াজটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং মাঝের দেয়াল ফুঁড়ে স্তেফানের ঘরেও গড়িয়ে আসে অবিচ্ছিন্ন কান্নার শব্দ। ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। স্তেফানের ঠিক পাশের ঘরেই বছর দশেকের মুসলমান ছেলেটা হাড়ের যক্ষ্মায় ভুগছে। রোগের জ্বালায় অস্থির হয়ে ছেলেটা কাঁদে। অথচ কোনো প্রতিকার হয় না। ছেলেটার নাম সাবিয়া।

কিন্তু স্তেফান কোভালস্কীর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ প্রতিবাদী মানুষটা মনে মনে গর্জে ওঠে যেন। 'কেন কেন এই নিরীহ ছেলেটা এমন কষ্ট পাচ্ছে? কি তার অপরাধ?' প্রথম প্রথম খুব ভয় করতো স্তেফানের। কান্নার শব্দটা যাতে শুনতে না হয় তাই দু'কানে তুলো গুঁজে রাখতো। 'সেই সময়টায় প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলাম আমি। কুঁপি জেবলে বাইবেলের পাতা উল্টে খোঁজবার চেষ্টা করতাম আমার মনের জবাব। কিন্তু খোঁজাখুঁজিই সার হতো। ঈশ্বর কেন সরল ছেলেটিকে এত কষ্ট দিচ্ছেন তার যথার্থ উত্তর বাইবেলের কোথাও পাই নি। মনে হতো চোখের সামনে রোগের জ্বালায় কষ্ট পাওয়া ছেলেটিকে দেখে কে বলবে, 'সে-ই সুখী যে নিঃস্ব, কারণ স্বর্গের দ্বার তার জন্যেই খোলা/সে-ই সুখী যে শোকাতাপা, কারণ ঈশ্বর তাকে শান্তি দেন/সে-ই সুখী যে ন্যায়নিষ্ঠ, কারণ তার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না?" মহাপুরুষ ঈষা তাঁর (খ্রীষ্ট) বাণী প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে আমাদের মুক্তির জন্যেই পৃথিবীতে সাবিয়ারা কষ্ট পায়। কথাটা শুনতে ভাল যে একজন মানুষ যন্ত্রণা সহ্য করে পৃথিবীর সব মানুষের মুক্তি এনে দেয়। কিন্তু আমার ছোট্ট প্রতিবেশী কিশোর-বালকের এই আত্মাহুতি সংসারের সব মানুষের মুক্তির পথ খুলে দিচ্ছে এ কথা কেমন করে মেনে নিতে পারি? তাই সমস্ত সত্তা দিয়ে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।'

সাবিয়ার কান্নার শব্দটা মেনে নিতে বেশ ক'টা বিনিদ্ররাত সময় লাগলো স্তেফানের। আরো সময় লাগলো ছেলেটার মর্মান্তিক কষ্ট হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে। যখন বুকের মধ্যে কাঁটার মত ছেলেটার কান্না বিঁধে হতো, তখন তার সমস্ত ধর্মবিশ্বাস ফালা ফালা হয়ে যেত যেন। একদিকে ধর্মবিশ্বাস আর একদিকে মানবিকবোধ। তার মনে হতো ঈশ্বরের গুণগান করার অধিকার কি তার আছে, যখন ঘরের পাশেই একটি সরল বালক দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হচ্ছে? যখনই ছেলেটার রোগযন্ত্রণার শব্দটা কানে যেত, তখনই মনকে মুক্ত করে সে ধ্যানে বসতো। ক্রমে এই অভ্যাসটা তাকে প্রার্থিত ফল দিতে লাগলো। সে আর কান্নার শব্দ শুনতে পেত না, কোনো কোলাহলও কানে ঢুকতো না। এমনকি অন্ধকারে ইঁদুরগুলোর নিরুপদ্রব আনাগোনাও সে বুঝতে পারতো না। খোলা নালার পাঁকের গন্ধও সে নাকে পেত

না। সে সময় মন যেন যথার্থই ভারমুক্ত অবস্থায় বিরাজ করতো।

'প্রথম প্রথম উপাসনার সময় আমি শুধু সাবিয়ার কষ্ট পাওয়া মুখখানির কথাই ভাবতাম। ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে চাইতাম তার কষ্টের লাঘব হ'ক। যদি সত্যিই মানুষের পাপস্খালনের জন্যে ছেলেটির এই আত্মবলিদান প্রার্থিত হয়, তবে হে পিতঃ, যেমন তোমার সন্তানকে তুমি উৎসর্গ করেছিলে, তেমনি আমাকেও উৎসর্গ করো। ছেলেটিকে রোগমুক্ত করো এবং ওর বদলে আমায় যাতনা দাও।' এইভাবে রাতের পর রাত খ্রীষ্টের ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্তেফান নিবিড়ভাবে প্রার্থনা করতো যতক্ষণ না ছেলেটার গোঙানি থেমে যেত। স্তেফানের কোনো ক্লান্তি ছিল না। নিরলসভাবে সে প্রার্থনা করতো আর বলতো, 'হে ঈশ্বর! মানবমুক্তির জন্যে তোমার ক্রুশবিদ্ধ দেহ কেমন অপার দেহযাতনা সয়েছে তা আমায় বলে দাও। আমায় শেখাও কেমন করে স্থূল দেহযাতনা পেরিয়ে মনকে আনন্দে রাখা যায়। আমাকে শেখাও কেমন করে অন্যায় দ্বেষ ঘৃণা আর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হয়।'

কিন্তু দিনের পর দিন ছেলেটার কষ্ট বাড়তেই থাকলো। বাড়তে থাকলো তার কাতরানি। একদিন সকালে স্তেফান তাই সোজা গিয়ে পৌঁছলো কাছাকাছি হাসপাতালে। তারপর হাসপাতালের ওষুধ বিভাগের কর্মীর হাতে তিরিশটা টাকা দিয়ে একটা সিরিঞ্জ আর এক ডোজ্ মর্ফিয়া কিনলো। পরে তার মনে হয়েছে এমন হটকারী সিদ্ধান্ত সে কেন নিল? তবে কি তার প্রার্থনা নিষ্ফল হয়েছে? তাই কি সে ভেবেছিল সাবিয়া অন্তত মরে বাঁচুক? সাবিয়ার মাকে সে চেনে। তিনটে মেয়ে নিয়ে সে পুরনো খবরের কাগজের ঠোঙা বানায় রাস্তার ওপর বসে। বিধবার এটাই একমাত্র রোজগার। আর এই রোজগার দিয়েই সকলেব খাওযা পরা চালায সে। সারাদিনে তাকে অন্তত একশ'বাব উঠে দাঁড়িয়ে সাইকেল ভ্যান বা ঠেলাগাড়ি যাবাব জায়গা করে দিতে হয়। তবুও মুখে তার হাসিটি লেগেই আছে।

সাবিয়াদের বস্তি ঘরের দোরগোড়ায় স্তেফানকে দেখেই কয়েকজন আড়চোখে তাকালো তার দিকে। কি চায় ওই সাদা চামড়ার বিধর্মী লোকটা? কেন আসে ও এখানে? সাবিয়াকে খিরিস্তান করবে? নাকি বলবে যে আল্লাহ্ আসল ঈশ্বর নয়? এই বস্তির অনেকেই একদম বিশ্বাস করে না লোকটাকে। এই সব মিশনারীদের সম্বন্ধে অনেক কথা তারা শুনেছে। এরা যাদু করতে জানে। মনভুলনো কথায় মিষ্টি মিষ্টি হেসে এরা কার্যোদ্ধার করে। এদের বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়। নইলে লোকটা পাদরীদেব আলখাল্লা পরে না কেন? দিব্যি প্যান্ট, সার্ট, বুটজুতো পরে লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে চোরের মত এ দোর ও দোর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু লোকগুলো যা-ই ভাবুক সাবিয়ার মা মিষ্টি হেসে স্তেফানকে অভ্যর্থনা করলো। শুধু তাই নয়, তাড়াতাড়ি বড় মেয়েকে পাঠিয়ে দিল এক পেয়ালা চা আনতে। ঘরের ভেতর থেকে চামড়া পচা গন্ধ ভক্ করে স্তেফানের নাকে লাগলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িযে একটু ইতস্তত করলো সে। তারপর আলো-আঁধারে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে।

ছোট্ট সাবিয়া ছেঁড়া কাঁথার ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। হাতদুটো আড়াআড়ি করে বুকের ওপর ফেলা। গায়ের চামড়ায় দগাদগে ঘা। হাঁটু দুটো আধমোড়া অবস্থায় শুকনো শরীরের ওপর রাখা। স্তেফান কোভালস্কী একটু ঝুঁকে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। সাবিয়া চোখ খুললো। সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্পাপ চোখ দুটোর ঝিকমিক করে উঠলো খুশী। স্তেফান স্তম্ভিত। ছেঁড়া কাঁথার সঙ্গে মিশে

যাওয়া শরীরটা থেকে নিবিড় প্রশান্তি যেন উপচে পড়ছে। এতখানি প্রশান্তি সে কোথা থেকে পেল? নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না স্তেফান। মরফিয়ার শিশিটা হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরেছিল সে।

'সালাম সাবিয়া!' একটু হেসে ফিসফিস করে বললো স্তেফান।

'সালাম দাদা!' খুশীতে চকচক করে উঠলো সাবিয়ার চোখ। 'তোমার হাতে ওটা কি? মিষ্টি? আমার জন্যে এনেছো?'

স্তেফানের অন্তরাত্মা যেন কেঁদে উঠলো। হাতের মুঠোয় ধরা মরফিয়ার শিশিটা সে ফেলে দিল। শিশিটা মেঝের পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সাবিয়ার মরফিয়ার দরকার নেই। ওর সমস্ত সত্তা দিয়ে ও শান্তিকামী, তাই কত সহজে ছেলেটা আমায় অস্ত্রহীন করে দিল। ও মার খেয়েছে। ভেঙেচুরে থেঁতলে গেছে ওর শরীর। ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে ও। তবুও হার মানে নি ছেলেটা। এখনই আমায় সবচেয়ে দামী একটা উপহার দিল ছেলেটা। যেন বললো "নিরাশ হয়ো না স্তেফান দাদা" আমার আঁধার ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিল ছেলেটা।'

দুঃখকষ্ট ভরা এই বস্তিতে সাবিয়ার মত আরো কতজন আলোর শিশু স্তেফান দেখেছে।? কয়েক শ', হাজারও হতে পারে। প্রতিদিন সকালে যীশুর ভজনার পর সে এই শিশুদের কাছে তার সামান্য সঞ্চয় নিয়ে যায়। বাঁচিয়ে রাখা দু-এক টুকরো রুটি কিংবা সামান্য ক'টা ওষুধ ; অনেক সময় তাও থাকে না। তখন তার উপস্থিতিই যেন আনন্দের হাট বসায়।

তবে একজন খ্রীশ্চান কুষ্ঠরোগিণীকে দেখেই স্তেফানের মন সবচেয়ে পীড়িত হয়েছিল। মেয়েটি অন্ধ। রেল লাইনের পাশে একটা ঝুপড়িতে থাকে। মেয়েটার শরীরের অবস্থা যেমন কাহিল তেমনি ভগ্ন। না দেখলে বোঝা যায় না। অথচ গভীর প্রশান্তির দীপ্তিতে ঝলমল করছে যেন তার মুখচোখ। সারাদিন নিজের ঘরে গুটি-সুটি বসে থাকে আর ঈশ্বরকে ডাকে। তার ঘরে আলো নেই। দরজাটি ছাড়া কোনো ফুটোফাটাও নেই। ঘরের পিছনের মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটা ছবি টাঙানো আছে। দরজার মাথার তাকে রাখা আছে কালিঝুলি মাখা মাতা মেরীর একটা মূর্তি। মেয়েটার গায়ে একটুকুও মাংস নেই। পাতলা কোঁচকান চাম-ড়ার তলায় জিরজির করছে হাড় ক'খানা। চামড়ার তলা থেকে হাড়ের কোণা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কত বয়স হবে মেয়েটার? যতটা বুড়ি দেখায় নিশ্চয়ই ততটা বুড়ি সে নয়। বড় জোর চল্লিশ। শুধু অন্ধ নয়, কুষ্ঠব্যাধির দাপটে ছোট হয়ে গেছে তার হাতদুটো। মুখের অর্ধেকটা ক্ষয়ে গিয়ে বীভৎস চেহারা হয়েছে। এখান-কার মিউনিসিপ্যালিটিতে সামান্য বেতনের কাজ করতো তার বর। লোকটা মরে গেছে বিশ বছর হবে। সেই থেকে বস্তিতেই থাকে বিধবা মেয়েটা নাতিনাতনিদের নিয়ে। মেয়েটা যে কোত্থেকে কুষ্ঠরোগটা নিয়ে এসেছে কেউ জানে না। কিন্তু রোগের দাপটে এত তাড়াতাড়ি তার শরীরটা ক্ষয়ে গেল যে কোনো চিকিৎসাই হলো না। এই ঘরে বুড়িকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল স্তেফান। আরও স্তম্ভিত হলো যখন দেখলো ঘরের কোণে একটা ছেঁড়াখোঁড়া চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ঘুমচ্ছে বুড়ির চারটে নাতিনাতনি।

এই খ্রীশ্চান মহিলাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক প্রীতি এবং সহৃদয়তার এমন এক পরিবেশ যা আনন্দ নগরকে করে তুলেছে মহান যীশু উল্লিখিত সেই পবিত্র স্থানটির মত, যেখানে যীশু তাঁর ভক্তশিষ্যদের জড়ো হয়ে শেষ বিচারের রায়

এবং তাঁর পুনরুত্থানের জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। স্তেফান আরও অভিভূত হয়েছে কারণ প্রীতি কথুতার এই হার্দ্য পারবেশ যারা রচনা করেছে, সেই প্রাতবেশী মানুষরা সবাই হিন্দু। সাধারণ কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে হিন্দুদের বাছবিচার অনেক। শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি নয়, কুষ্ঠে রোগীর ছায়াও মাড়ায় না তারা। এমন কি চোখে দেখাও তাদের বারণ পাছে রোগটা সংক্রমিত হয়। তবুও রোজ দুবেলা বুড়ির জন্যে এরা ভাত তরকারি নিয়ে আসে। তার মুখহাত ধুইয়ে দেয়, বাচ্চাগুলোর পরিচর্চা করে। আনন্দ নগরের মানুষকে যত নির্দয় মনে হ'ক না কেন এই কুষ্ঠ রোগিণীকে তারা যেমন শুশ্রূষা করতো তেমন আন্তরিক শুশ্রূষা হাসপাতালেও পাওয়া যায় না। ভাগ্যটা ভাঙাচোরা যেমনই হ'ক, মানুষের যথার্থ ভালবাসা থেকে বুড়ি কখনও বঞ্চিত হয় নি।

বুড়ি ঠিক বুঝতে পারতো কখন কোভালস্কী আসবে। বোধহয় তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়েই বুঝতো। তাই তাঁর আসার একটু আগেই নিজেকে গুছিয়ে নিত। যতটুকু হাত আছে তাই দিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিত। পুরুষের চোখে মনোরম হবার একটা সহজজাত সৌন্দর্যবোধ কাজ করতো তার মনে। চরম হীনতার মধ্যেও তার নারীত্ব মরে যায় নি। যতটুকু সম্ভব ততটুকু জায়গা হাত দিয়ে পরিষ্কার করতো। শতাছিন্ন একটা আসন পেতে রাখতো অতিথির জন্যে। তারপর জপ করতে করতে অধীর আগ্রহ নিয়ে চেয়ে থাকতো দরজার দিকে, কখন সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির ছায়া পড়বে সেখানে। যে সকালে স্তেফান আসতো সেই সকালটিতে তার মনে আনন্দে ভরে উঠতো।

সেদিনও দোর গড়ায় পায়ের আওয়াজ হতেই বুড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো, 'গুড মর্নিং ফাদার!'

'গুড মর্নিং গ্র্যান্ডমা।' দোর গোড়ায় জুতো খুলতে খুলতে স্তেফান ফের বললো, 'মনে হচ্ছে আজ আপনি বেশ ভাল আছেন।'

স্তেফান কোভালস্কীর কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের যা তা হলো বুড়িমার সদা-প্রসন্ন মনটি। নিষ্কলুষ সেই আয়নায় কোথাও যেন অভিযোগ বা নালিশের কালো দাগ নেই। শারীরিক অক্ষমতার দরুন কারও সহানুভূতিও সে কখনও চায় নি। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হলো না। বুড়ি-মার যাতনা-ক্লিষ্ট মুখখানি জুড়ে নির্মল হাসির ছটা দেখে স্তেফান সেদিনও অবাক হয়ে গেল। বুড়ি-মা তাকে পাশে বসতে ইসারা করলো। সে বসলে বুড়ি-মা তার খঞ্জ দুটি হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে স্তেফানের মুখখানা পরম স্নেহে বুলিয়ে দিতে লাগলো। সেই গোড়াকাটা হাত দু-খানির স্নেহস্পর্শে কি যাদু ছিল সে জানে। রোমাঞ্চিত হয়ে গেল স্তেফান কোভালস্কীর সারা অঙ্গ। 'যা সে আমার মধ্যে খুঁজছে যেন সেটাই দিল আমায় সে-দিন। সেই গলা-পচা হাতের নরম ছোঁয়ায় ভালবাসার যে উষ্ণ উত্তাপ সেদিন পেয়েছি, সেই উষ্ণতা বোধহয় পৃথিবীর কোনো সুন্দরী নারীর আলিঙ্গনস্পর্শে পাব না।'

একটু পরে বুড়ি-মা বললো, 'বাবা! কত ক'রে ঈশ্বরকে বলছি এবার আ-তুলে নাও। তা তাঁর সময় হচ্ছে না। তুমি একবার বল না তাঁকে?'

'বুড়ি-মা! তিনি যদি আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখেন তার মানে আপনাকে তাঁর আরও কিছুদিন দরকার।'

বুড়ি-মা বোধহয় নিঃশ্বাস চাপলো। তারপর বললো, 'ভাল, তাই হ'ক। যদি তাঁর দরকার হয় আমি আরও কষ্ট সইতে পারি। তাঁকে তুমি বলো যে আমি সধবার জন্যে

প্রার্থনা করবো যাতে তারা কষ্ট সইতে পারে। বাবা! এখন তুমি তাদের কথা বলো যারা কষ্ট পাচ্ছে।

স্তেফান কোভালস্কী তখন বুড়ি-মাকে ছোট্ট সাবিয়ার কথা বললো। বুড়ি-মা তার অন্ধ দুটি চোখ স্তেফানের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে সব শুনলো। তারপর বললো, 'ছেলেটিকে বলো যে আমি তার হয়ে ঈশ্বরকে বলবো।'

স্তেফান তখন তার কাঁধের ঝোলা থেকে পরিষ্কার রুমালে বাঁধা এক টুকরো রুটি বার করলো। সকালের 'ম্যাস' উদ্‌যাপনের সময় এই রুটিটা ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল। স্তেফানের নীরবতা বুড়ি-মাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কি করছো বাবা?'

স্তেফান বললো, 'বুড়ি-মা! আপনার জন্যে আমি যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। এটা নিন। যীশুর ছোঁয়া আছে এর মধ্যে।'

বুড়ি-মা ঠোঁট দুটো ফাঁক করলো। কোভালস্কী তখন তাওয়ায় সেঁকা রুটির টুকরো তার মুখের মধ্যে ফেলে দিল। একটু পরে অনুচ্চ স্বরে বুড়ি-মা বললো, 'আমেন!' তখন অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বুড়ি-মার আধখানা ক্ষয় হয়ে যাওয়া মুখ। তারপর অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলো দুজনে। তখন মাছির গুনগুনানি ছাড়া আর যেন কোনো শব্দ ছিল না কোথাও। একটু পরে কারা যেন বাইরে কি নিয়ে তর্কাতর্কি করলো। নৈঃশব্দ ভেঙে গেল। বাচ্চারা তখনও তেমনি ঘুমোচ্ছিল।

স্তেফান কোভালস্কী উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার তাকে ফিরতে হবে। অন্ধ বুড়ি-মা ঠিক বুঝতে পেরেছে। তাড়াতাড়ি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতটা তুলে বললো, 'এস বাবা।' একটু থেমে ফের বললো, 'সবাইকে বলো যে ওদের সকলের জন্যে আমি ঈশ্বরকে বলবো যেন ওদের কষ্ট কমে যায়। সবাইকে বলতে ভুলো না!'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে স্তেফান ডায়রিতে লিখলো, 'বুড়ি-মা জানলো যে তাঁর কষ্ট পাওয়া বিফল নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর কষ্ট পাওয়া অন্যদের দেখাবেন যাতে তারা কষ্ট সইতে পারে।' কয়েকটা লাইন পরে স্তেফান উপসংহারে লিখলো, 'তাই বুড়ি-মার জন্যে আমার প্রার্থনায় কোনো দুঃখবোধ নেই। বুড়ি-মা'র কষ্টভোগ খ্রীষ্টের কষ্টভোগের মত। এ যেন আমাদের নতুন করে গড়তে প্রেরণা দেয়। আমাদের মনে মুক্তির আশ্বাস এনে দেয়। এনে দেয় পরিপূর্ণ আশা-ভরসা। রোজ যখন বুড়ি-মা'র চালা থেকে ফিরি তখন আমার মধ্যে জন্ম নেয় এক নতুন প্রত্যাশা। আমি নতুন করে বাঁচি। কে বলে আনন্দ নগরে শুধুই হতাশা? এখানেই ত' আনন্দের হাট বসেছে! এটাই ত আসল আনন্দ নগর!'

আঠারো

দালাল যেমন তার অধীন বেশ্যাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করে লোকটাও তেমনি চোখে চোখে রাখতো তার রিক্সাগাড়িগুলো। অথচ লোকটাকে কেউ চোখে দেখে নি। এমনকি তার চেহারার ধাঁচটাও লোকে জানতো না। তবুও পুলিস থেকে শুরু করে সাধারণ রিক্সাওলা পর্যন্ত সবাই এই অদৃশ্য মানুষটার ক্ষমতা মনে মনে স্বীকার

করে নিয়েছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে। লোকটার নাম বিপিন নরেন্দ্র। বিপিন যে ঠিক কতগুলো রিক্সার মালিক তা কেউ জানে না। বাজারে গুজব যে বিপিন চারশ' রিক্সার মালিক। তার মধ্যে অন্তত দুশ'র বেশী রিক্সা কলকাতার রাস্তায় বেআইনি চলে। অর্থাৎ রিক্সার গায়ে জাল নম্বর লেখা থাকে। তাহলেও কালীঘাটে মায়ের মন্দির-চত্বরে হঠাৎ দেখলে যে কেউ তাকে ভিখিরী ভেবে বসবে। ঢলঢলে প্যান্টলুন, ছেঁড়া চপ্পল আর দাগধরা তালিমারা ঢোলা সার্ট পরা লোকটাই যে বিপিন নরেন্দ্র তার আভাসটিও লোকে আঁচ করতে পারবে না। একটা পা ছোট বলে লোকটা ক্রাচ নিয়ে টেনে টেনে হাঁটে। তখন তাকে দেখে কে বলবে যে লোকটা স্রেফ রাস্তার ভিখিরী নয়, একটা কারবারের মালিক সে। শুধু তার মাথাজোড়া টাকের ওপর সাদা টুপিটা থাকে বলেই তাকে নেহাত দারিদ্র্যপীড়িত দেখায় না। কিঞ্চিৎ শোভন দেখায়। বিপিনের বয়স কত কেউ জানে না। অনেকে বলে নব্বুইয়ের কাছা-কাছি। সে নিজেও বোধহয় সঠিক জানে না তার বয়সটা। লোকটা নাকি জীবনে এক ফোঁটা মদ বা একটা বিড়িও ছোঁয় নি। অবশ্য জীবনে সে রিক্সাগাড়ির হাতল দুটোও ছোঁয় নি। তাই তার ধারণাও নেই হাতল দুটো ধরে রিক্সাগাড়ি টানতে কত ঘাম ঝরাতে হয় বা কত শত মানুষ এইভাবে চলতে চলতে রক্তবমি করে রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিপিন বোধহয় এও জানে না যে কত মানুষের তিলতিল রক্ত দিয়ে তৈরি হয়েছে তার গজদন্ত মিনার।

স্মৃতিসমুদ্র হাতড়ে বিপিন শুধু বলতে পারে যে কবে নাগাত বিহারের এক অজ্ঞাত গ্রাম থেকে সে জীবিকার সন্ধানে এই শহরে আসে। সে অনেককাল আগে-কার কথা। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। শহরটার চেহারাও অন্যরকম ছিল। রোজ চাঁদপাল ঘাটে নোঙর করা জাহাজে শ'য়ে শ'য়ে সৈন্য চড়তো। সে সময় ময়দানে রোজ গোরা সৈন্যের কুচকাওয়াজ হতো। ব্যান্ডে যুদ্ধের বাজনা বাজতো। কলকাতা শহরের জীবনযাত্রা ভারি উপাদেয় ছিল। গ্রামের একঘেয়ে জীবনের সংগে তার কোনো মিলই ছিল না। বিপিনের বাপ-ভাইরা ছিল ক্ষেতমজুর। জমিদারের ক্ষেতে তারা জনমজুরের কাজ করতো এবং সামান্য কিছু উপার্জন করতো। এই উপার্জনও আবার সারা বছর ছিল না। মোটকথা গ্রামের জীবনে না ছিল বৈচিত্র্য না ছিল আনন্দ।

শহরে এসে বিপিন প্রথম যে কাজটা পায় তা হলো এক বাস ড্রাইভারের সহ-কারীর কাজ। বাসের মালিক ছিল একজন বিহারী। বিপিনের কাজ ছিল প্রত্যেক স্টপে বাসের দরজা খুলে যাত্রীদের ওঠানো এবং নামানো। বাসের মধ্যে অন্য লোকটি যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে টিকিট কাটতো। ঘণ্টি বাজিয়ে সে বাসও ছাড়তো। লোকটার ওপর বিপিনের খুব হিংসা হতো, কারণ বিপিনের চেয়ে তার আয় বেশি ছিল। টিকিটের দামের ওপর একটা কমিশন পেত লোকটা এবং উপরি এই পয়সাটা সে ড্রাইভারের সংগে ভাগ করে নিত। ফলে বাসগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে রাস্তায় চলতো যাতে অধিক যাত্রী পায়। বিপিন শুনেছে আজও সেই পদ্ধতিতেই বাসওলারা যাত্রী সংগ্রহ করে।

বছর তিনেক পরেই মালিক আর একখানা বাস কিনলো। নতুন গাড়ির কন্ডাকটর হলো বিপিন। এখন সে বলতে পারে না গাড়ি নিয়ে কত হাজার মাইল পথ সে চলেছে। তখন শহরটার চেহারা অন্যরকম ছিল। এত মানুষও ছিল না শহরে। রাস্তাঘাট ঝক-ঝক তকতক করতো। ইংরেজের আইন খুব কঠোর ছিল এবং কঠোরভাবেই তার

প্রয়োগ হতো। তখন সৎভাবে রোজগার করার প্রবণতা ছিল। ফাঁকির রোজগার ছিল না বিশেষ।

রিক্সার ব্যবসাটা এই শহরে দারুণ সফল ব্যবসা হয়ে উঠেছিল প্রথম থেকেই। বিপিনের মনে পড়ে সেই সব দিনগুলোর কথা যখন রিক্সাগাড়ি চালু হয় শহরে। অনেক সস্তায় যাতায়াত করা যেত ব'লে কলকাতার বাবুরা ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়ির বদলে এই গাড়ি পছন্দ করতো। বোধহয় ১৯৩০ সাল হবে সেই বছরটা। বিপিন দুটো পুরনো গাড়ির সন্ধান পেল। তখন নতুন গাড়ির দাম ছিল দুশো টাকা করে। কিন্তু পুরনো হওয়ার দরুন মাত্র পঞ্চাশ টাকায় গাড়ি দুখানা কিনে ফেললো বিপিন। আর পরদিনই তার দেশ থেকে সহায়সম্বলহীন হয়ে আসা দুজনকে গাড়ি দুখানা চালাতে দিল। সেই বছরেই মালিকের কাছ থেকে ধার করে সে আটখানা ঝকঝকে নতুন জাপানী গাড়ি কিনে ফেললো। সেই থেকে শুরু হলো ভাগ্য বদল হতে এবং আজ পর্যন্ত এর একটানা গতিতে ছেদ পড়ে নি। বছর কয়েকের মধ্যেই তিরিশটা গাড়ির মালিক হয়ে গেল 'সেই বিহারীটা'। প্রতিদিন ভাড়ার টাকা যা পেত তাই জমিয়ে দু-এক বছরের মধ্যেই বালিগঞ্জে খানিকটা জমি কিনলো এবং একটা বাড়িও বানিয়ে নিল। তখন বালিগঞ্জ ছিল গরিব মানুষের জায়গা। গরিব হিন্দু-মুসলমান জনমজুর এবং কারিগররা এখানে থাকতো। জমির দাম ছিল ঢের সস্তা। তখন তার বিয়ে হয়েছে। প্রায়ই যখন তার বউ অন্তঃসত্ত্বা হতো, সে একখানা করে ঘর বাড়াতো। আজ বিপিন মস্ত চারতলা বাড়ির মালিক। ন'টি ছেলেমেয়ের বাপ সে। তিন ছেলে আর ছয় মেয়ে নিয়ে দিব্যি এক বড় সংসার তার।

বিপিন কিন্তু খুব খাটিয়ে মানুষ। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কি শীত কি বর্ষায়, ভোর পাঁচটায় উঠে সাইকেল চড়ে সে রিক্সার আড্ডায় গিয়ে ভাড়া আদায় করেছে। লেখাপড়া সে জানতো না বটে, কিন্তু কখনও পাই-পয়সার হিসেবে এদিক ওদিক হয় নি। নিজের পাওনা-গণ্ডা ঠিক বুঝে নিয়েছে। ছেলেরা যেমন বড় হয়েছে বিভিন্ন কাজে তাদের লাগিয়ে দিয়েছে। বড়টাকে রেখেছে নিজের ব্যবসায়। তিনশোর বেশি গাড়ি তখন তার দখলে। তদারকির কাজে যাতে ঢিলে না পড়ে তাই নিজের ছেলেকে বসিযেছে। মেজটাকে একটা কারখানা করে দিয়েছে। সেখানে হুড়কো, ছিটকিনি তৈরি হয়। নিয়মিত রেলের অর্ডার পায় সে। ছোটটার নামে একটা বাসের পারমিট বার করেছে ঘুষ দিয়ে। তার বাস চলে ডালহাউসি থেকে গড়িয়া পর্যন্ত। মেয়েদেরও বিয়ে দিয়েছে ভাল ঘর-বর দেখে। বড় জামাই একজন লেফটানেন্ট-কর্নেল। পরেরটার বিয়ে হযেছে নৌ-বিভাগের একজন কমান্ডারের সঙ্গে। পরের দুই জামাই কলকাতায় ব্যবসা করে। তার পরেরটির বিয়ে হয়েছে বিহারের এক জমিদারের সঙ্গে। সব ছোট জামাইটি একজন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। সব মিলিয়ে এমন সার্থক সাধপুরণের দৃষ্টান্ত সচরাচর কোনো অশিক্ষিত মানুষের ভাগ্যে ঘটতে দেখা যায় না।

তবুও জীবন-সায়াহ্নে এসে এই তথাকথিত 'বিহারী' তার পুরনো উদ্যমের অনেকটাই যেন খুইয়ে বসেছে। এখন সে প্রায় অকর্মণ্য এক বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে তাই খেদ করে মানুষটা। বলে, 'ব্যওসার সেই পুরনো চায়রা চরিত্তির আর নেই। এখন ধান্দাবাজির রোজগার, কেউ কষ্ট করে ভাগ্য ফেরায় না। সব গরমেন্টের একটাই ধান্দা। বড়লোকদের টাকা নিয়ে গরিবদের দাও। তাই বড়লোক গরিব হচ্ছে আর গরিব বড়লোক হচ্ছে। এই বাঙালদেশে ত' কমুনিস্টরাই সরকার বানিয়েছে। এই গবমেন্ট আইন করে ব্যক্তিগত মালিকানা বন্ধ করে দিয়েচে। এরা আইন পাশ

করিয়েচে যে দশখানার বেশি গাড়ি একজন মালিকের থাকবে না। আপনিই বলুন, মাত্র দশখানা গাড়ির ভাড়া থেকে এতবড় সংসার চালানো যায়? অন্য খরচও ত' মালিকের! গাড়ির মেরামতি, তাদের চালু রাখা, ধাক্কা লাগলে পুলিসকে ঘুষ দেওয়া—সবই ত মালিকের দায়! তা, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। জমিদারি আইন পাশ হবার পর জোতদার যেমন করে নিজের জমি দখলে রেখেছিল, আমিও তেমনি রিক্সার দখল রেখেচি। মালিকানা স্বত্ব সব ভাগ করে দিয়েচি ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, ভাইপো-ভাইজিদের নামে। তাই এখন আমার তিনশ' ছেচল্লিশটা গাড়ির মালিক আমি একা নই, পঁয়ত্রিশজন আলাদা আলাদা মানুষ।'

খুব অল্প রিক্সাওলাই তার মুখ চেনে। ইদানিং তাকে দেখাও যায় না বিশেষ। এখন তার একমাত্র পরিচয় সে 'বুড়ো'। শেষ পরোয়ানাটি কবে পাবে তারই অপেক্ষায় দিন গুনছে। এখন সে বলে বেড়ায় তার কোনো ক্ষোভ নেই, কারণ বিবেক শুদ্ধ রেখে সে কাজ করেছে। বলে, 'আমার বিবেক সাফ্ আচে। রিক্সাওলাদের ঠকাই নি। তাদের বিপদে আপদে হাত খুলে সাহায্য করেচি। কেউ ভাড়ার টাকা এক-আধ দিন না দিতে পারলে মাপ করে দিয়েচি। কিন্তু পরে সুদ লিয়েচি একশ' টাকায় পঁচিশ টাকা হিসেবে। কারও বুখার বা অ্যাকসিডেন্ট হলে হাসপাতালে পাঠিয়েচি। ডাক্তার, দুধ-পথ্যির খরচ দিয়েচি। তবে সে টাকাও উসুল করেচি ভাড়ার রেট্ বাড়িয়ে। এখন আমি নিজে এসব দেখি না। আমার মাইনে করা লোক দেখে। কিন্তু রিক্সাওলারা আর আগের মত ভালমানুষ নেই। তাদের নজর উঁচুর দিকে। এখন তারা গাড়ির মালিক হতে চায়। তারা ইউনিয়ন বানিয়েচে। স্ট্রাইক করার হুমকি দিচ্ছে। দিনকাল বদলে গেচে। তাই আমরা মালিকরাও ইউনিয়ন তৈরি করেচি। এটা মালিকদের ইউনিয়ন। আমরাও বাঁচতে চাই তাই ইউনিয়ন করেচি। এ ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। গর্মেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নাচিয়ে দিচ্ছে। এটাই গর্মেন্টের নীতি। ওরা বলচে শ্রেণী সংগ্রাম। তাছাড়া অনেক বড় বড় মানুষ আচে যারা রিক্সা বন্ধ করতে চাইচে। তাদের ধারণা মানুষের অপমান করা হচ্ছে ঘোড়ার মতন ব্যবহার করে। এ সব একদম বাজে কথা। মুখের কথা স্রেফ। এই ভালবাসার কোনো দাম নেই। কলকাতা শহরে দশলক্ষ হতভাগা মানুষ বেকার। কোন কামকাজ তাদের নেই। এর ওপর যদি একলাখ রিক্সাওলা বেকার হয়ে যায়, তাহলে আটন' লাখ মানুষের মুখের ভাত ঘুচে যাবে। এটা খুব সাধারণ জ্ঞানের কথা। সবাই তা বোঝে। কিন্তু রাজনীতি অন্য জিনিস। সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির মিল হয় না।'

এইভাবেই চলছে বিপিনদের সংসার। যতক্ষণ পাওনা-গণ্ডার হিসেবটি তারা ঠিকমত বুঝে পাচ্ছে ততক্ষণ বিপিনরা জানতেও পারে না পৃথিবীর কোথাও কোনো মৌল বদল ঘটছে কি না। তাই রোজ সন্ধ্যায় তার মাইনে করা লোকটির ঝোলা সার্টের পকেটটা আদায় করা টাকায় ফুলে আছে দেখলেই, জীবন-সায়াহ্নে এসে দাঁড়ানো লাঠিধরা বৃদ্ধ বিপিনের মন অনির্বচনীয় সুখে ভরে যায়। এ দেশের ঋষি এবং মহাপুরুষরা নির্বাণ বা মোক্ষকে বলেছেন সেই চরম অনাশক্তি যেখানে পেঁছলে মানুষের সব কামনা-বাসনার অবসান হয়। মানুষ স্থিতধী হয়। নব্বুই বছরের বিপিনের যথার্থ নির্বাণ হলো রোজ সন্ধ্যায় তিন শ' ছেচল্লিশটি রিক্সা থেকে আদায় করা টাকাগুলো একটি একটি করে গোনা।

ঊনিশ

একটা নিঃসঙ্গ মুহূর্তে স্তেফান কোভালস্কী তার ছেলেবেলার কথা ভাবছিল। মনে পড়ছিল অনেক ঘটনা। 'যখন খুব ছোট ছিলাম তখন গ্রামের পথে যেতে যেতে গাছের সরু ডাল দিয়ে ফুলগাছের মাথাটা কেটে দিতাম। ভারি মজা হতো। তারপর একটু বড় হয়ে যখন ইস্কুলে যাচ্ছি, গাছের ফুল ছিঁড়ে আমার পড়ার টেবিলে রাখতাম। নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি কাজটা কি ঠিক? ভেবেছি গাছে থাকে বলেই ফুল সুন্দর। সেটাই তার স্বাভাবিক স্থান। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। সেই থেকে ফুল ছেঁড়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মেয়েরাও ঠিক ফুলের মত। তাই শুধু আমার জন্যে কোনো একটি নারীকে তার সহজাত পরিবেশ থেকে ছিঁড়ে আনতে চাই নি। আমি চেয়েছি সবাই আপন পরিবেশেই বিকশিত হ'ক। ঈশ্বরকেও সেই কথা বলেছি আমার প্রার্থনায়।

'সেন্ট জন্ একদা লিখেছিলেন, "আমার স্বর্গ, আমার যীশু, আমার মেরী। সব কিছুই আমার।" কিন্তু তাই কি? যখনই তুমি বিশেষ একটি কিছুতে তোমার অধিকার নিতে চাইবে, তখন অনেক কিছু সরে যাবে তোমার দৃষ্টিপথ থেকে। অথচ তোমার জন্যে রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। বিশেষ কিছুর জন্যে আসক্ত না হয়েও তাদের সবাইকে তুমি পেতে পার তোমার আনন্দের জন্যে। স্বেচ্ছাকৃত কৌমারব্রত পালনের এটাই চাবিকাঠি, নইলে চরিত্র শুদ্ধ রাখা যায় না। এই বাছবিচারই প্রেম। কিন্তু বিয়ে অন্য ব্যাপার। বিবাহের পর একজনকে দেহমন দিতেই হয়। সেটাই ধর্ম। ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে দেহদান বড় কিছু নয়। কিন্তু যে হৃদয়খানি আমি তাঁর পায়ে সঁপেছি সেটিকে আর কাউকে ভাগ করে দেওয়া যায় না। এমনকি গর্ভধারিণী মাকেও নয়। কারণ যথার্থ গর্ব যে তাঁকেই ঘিরে রয়েছে সর্বক্ষণ। যীশু বলেছেন, 'আমার জন্যে যে সব কিছু ত্যাগ করেছে, স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, সে শতগুণে আবার সব ফিরে পাবে।" তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমার বোন ছিল না কোনদিন। কিন্তু এই আনন্দ নগরে আমি কত বোন পেয়েছি। ভালবাসা দিয়ে তারা ভরিয়ে দিয়েছে আমায়। নিজেকে আজ নিবিড়ভাবে সকলের আপনজন মনে করতে পারছি। আজ বুঝেছি ভালবাসার এই বাঁধনটি সকলেরই দরকার। নইলে এই বস্তিজীবন নিষ্ঠুর মনে হতো।

'কিন্তু আড়ম্বর করে এত কথা বলার পরেও কেমন করে আমি মানুষের প্রেম উপেক্ষা করতে পারি? দুঃখের এই ঘনঘটার মধ্যেও কেমন করে ভুলে যেতে পারি আমার ভালবাসা নারীদের যাঁরা আমার জীবনে মনোহারিণী রূপে দেখা দিয়েছে? বস্তির এই কুরূপা জীবনে এরাই আমার রূপসায়র! সুন্দর ফুলের মত এরাই আমার জীবন রঙিন করেছে। কিন্তু আমি স্থির করেছি কোন একজনের চোখের তারায় সর্বক্ষণের রতিনায়ক হয়ে থাকবো না। তাই যে প্রেম ক্ষণিক তার হাতছানিতে সাড়া দেবার অধিকার আমার নেই। আমার ঘর নেই, সংসার নেই। আমি পারি না আলাদা ঘর বাঁধতে, কারণ এ তাঁরই আজ্ঞা। তিনিই আমার প্রণয়াস্পদ। তিনিই বলে দেবেন কোথায় আমার ঘর।

'আমি এদের কাছে এত বাঞ্ছিত হলাম কেন? আমার মধ্যে কি কামনাপূরণের

আশ্বাস পায় এরা? সেই রকমই একটা পরিচয় হয়ে গেছে আমার। যেন আমি সান্টা ক্লস। তাই মেয়েরা আমার কাছে আসতো। তাই ঠারেঠোরে আমায় দেখতো। হয়ত হঠাৎ ছুঁয়ে ফেললো আমার গা, অগোছালো শাড়িখানা গুছিয়ে নিল কিংবা বিলোল চাউনিতে আমায় দেখলো। এদের নিপুণ ছলাকলা বিভ্রম সৃষ্টি করতো আমার মনে। মনে হতো এরা কি বিশেষ কিছু চায় আমায় ঘিরে? কিন্তু বোধহয় আমার এই ধারণা ভুল। ভারতবর্ষের নারী-পুরুষের সম্পর্ক বাঙ্ময়। নারী রহস্য-ময়ী তাই বিদেশীর চোখ প্রায়ই ভুল করে ছলনা দেখে তার ভ্রূভঙ্গে। এ দেশের বৃহত্তর নারীসমাজ যারা নারীমুক্তি আন্দোলনের উত্তাপটি এখনও পায় নি, পুরুষের চোখে তারা এই ছলাকলাটি ধরে রাখতে চায়। আনন্দ নগরের নারীরাও ব্যতিক্রম নয়, তাই পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তারাও নিপুণ ছলাকলার আশ্রয় নিত।

'আমার ধারণা ছিল নিজেকে বাঁচাতে পারবো ; অন্তত আমার ক্ষেত্রে এই মনো-বিকার ঘটবে না, কারণ আমার ভিত্তিভূমি দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয় আমায় ছলনা করেছিল। এই উপলব্ধি আমায় আড়াল করতে পারে নি প্রলোভন থেকে। এ দেশের পুরাণকথার কাব্যে এমন শত শত দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নারীর মদির দৃষ্টির শাসনে টলে উঠেছে গুরুর আসন। মন্দিরের গায়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কামজ নরনারীর খোদাই করা মূর্তিগুলো থেকে যা প্রকট হয় তা কি ইন্দ্রিয়-সুখবিলাসিতা নয়? আমি লক্ষ্য করতাম যে নিঃসঙ্গ অলস মুহূর্তগুলোতেই এই ইন্দ্রিয়চিন্তা আমার মন স্খলিত করতো। যখন ঈশ্বরচিন্তা থেকে মন অবসৃত হতো তখনই যেন আমি প্রতারিত হতাম। আমার মনে হত যখন ঈশ্বরচিন্তা থেকে আনন্দ পাই না, তখনই মন ঘুরে ঘুরে অন্য বস্তু থেকে সুখ খুঁজে বেড়ায়।

'মার্গারেটা নামে সেই বিধবা খ্রীশ্চান মহিলার সঙ্গে সম্পর্কটাই আমার সব-চেয়ে বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই মেয়েটিই প্রথম দিনটিতে 'ম্যাস' উপসনার জন্যে মদ আর শুকনো রুটি এনে দেয়। এমন নয় যে সে বিভ্রম-নিপুণা এবং ছলাকলা পটিয়সী। তবে একখন্ড পাতলা শাড়িতে জড়ানো তার যৌবনোদ্ধত যুবতী শরীরটা আমার মধ্যে এক প্রবল তাড়না সৃষ্টি করতো। তার যুবতী শরীর থেকে একটা গন্ধের ঘ্রাণ পেতাম আমি। তখন এমন দুর্নিবার এক টান বোধ করতাম যা ঠেকাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। এমন আকর্ষণ অন্য নারীরা আমায় দিতে পারে নি। যখন গভীরভাবে তাকাত তখন মনে হতো তার প্রেমের জোয়ারে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কি যেন একটা ছিল তার চোখের চাউনিতে। নিজেকে মেলে দেবার একটা আকুলতা দেখতে পেতাম ওর চোখের তারায়, ওর মধুর হাসি, মিষ্টি কণ্ঠস্বর আর সহজ ব্যবহারে। তখন মনে হতো এ ফুলটি যেন আমার জন্যেই ফুটেছে। হয়ত এ আমার ভুল। আমার সন্দেহ যে পরিবেশই বোধহয় আমায় ছলনা করতো।'

সেদিন খুব গরম পড়েছে। তাপদগ্ধ সারা দিনের পরেও মানুষের ক্লান্তি যেন এতটুকু কমে নি। ঘামে ভিজে জবজব করছে কোভালস্কীর গায়ের শার্ট। সেই অবসাদমন্থর মুহূর্তে কুপি জেলে খ্রীষ্টের মূর্তির দিকে চেয়ে বসেছিল কোভালস্কী। ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। আলোর শিখাটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। দেওয়ালে ছায়া পড়েছে তার শরীরের। খ্রীষ্টের মুখ আর তার ছায়াটা তিরতির করে কাঁপছে। কোভালস্কীর মনে হলো যেন ভূতের নাচ হচ্ছে সেখানে। কোভালস্কীর

খুব অসহায় লাগছিল নিজেকে। যেন একটা জলযানে চড়ে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই প্রার্থনায় মনঃসংযোগ করতে পারছিল না সে। কেবলই মনে হচ্ছে খ্রীস্ট তাকে ছেড়ে গেছেন। ঠিক তখনই তার মনে হলো সে এসেছে। তার আসার শব্দ পায় নি স্তেফান। কিন্তু চেনা একটা সুগন্ধ পেয়েছে যা মার্গারেটার উপস্থিতির সংগে জড়িয়ে আছে। স্তেফান ভান করলো না দেখার। চেঁচিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলো সে। অচিরেই তার মনে হলো কথাগুলো থেকে শব্দই ঝরে পড়ছে। অথচ মার্গারেটার উপস্থিতি, তার শরীরের গন্ধ, অন্ধকার ঘরে তার চাপা নিশ্বাস, তার যুবতী দেহের উত্তাপ সব মিলিয়ে একটা মোহ সৃষ্টি করেছে তার মনে, মধুর অথচ ভয়ঙ্কর একটা মোহ। তখন যথার্থই ঈশ্বর যেন তাকে ত্যাগ করেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঘরের দেওয়াল চিরে একটা গোঙানির শব্দ কানে এল স্তেফানের। প্রথমে চাপা যন্ত্রণা, তারপর অবিচ্ছিন্ন কাতরানি। শুরু হলো ছোট্ট সাবিয়ার অবিশ্রান্ত গোঙানি।

সাবিয়ার কাতর যন্ত্রণা কানে যেতেই কোভালস্কী তাকাল মার্গারেটার দিকে। মার্গারেটাও তাকাল। তাদের বিধ্বস্ত চেহারা দুটি দেখে মনে হচ্ছিল ভাঙা জাহাজটিতে দুটি প্রাণী জলে ডোবার আগে কোনরকমে ভাসিয়ে রেখেছে নিজেদের। একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ যখন প্রায় ভাসিয়ে দিচ্ছিল স্তেফানকে, তখনই দরজায় একটা টোকার শব্দ শুনতে পেল তারা। অসহনীয় একটা মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে স্তেফান। হঠাৎই মনের সমস্ত শক্তি জড়ো ক'রে সে উঠে দাঁড়াল। ঘোর কেটে গেল তার। সাবিয়ার মা তখন ঘরে ঢুকেছে। কেমন আলুথালু তার মুখচোখ।'

'শিগগির আসুন দাদা! সাবিয়া আপনাকে দেখতে চাইছে।'

কুড়ি

পার্ক সার্কাসের মোড়ে হাসারি ঠিক সময়ে গিয়ে পেঁছিলো। কিন্তু তার রিক্সাওলা বন্ধু রামের তখনও দেখা নেই। হাসারি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যে রাত হলেও সে অপেক্ষা করবে। তার একটা ধারণা হয়েছে যে বন্ধুবান্ধবহীন শহরে ওই লোকটাই তার একমাত্র ভরসা। অন্তত তার জন্যেই সে ভাবতে পারছে যে এই নরক শহরটায় একটা আশার দীপ তার জন্যেও জ্বলছে। মনে মনে তাই হাসারি বললো, 'সন্দ্যে ত বটেই, দরকার হলে আজ সারা রাত কাল সারা দিনও অপেক্ষা করবো।'

রাম অবশ্য এসে পড়লো বিকেলের আগেই। তাকে খুব হতাশ, আনমনা দেখাচ্ছিল। সংগে রিক্সাটাও নেই। হাসারি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই ক্ষ্যাপা কুকুরের মত যেন লাফিয়ে উঠলো রাম। 'শালা বেজম্মাগুলো আমার গাড়িটা কেড়ে নিয়ে থানায় জমা করে দিয়েচে। কাল রাত্তিরে একটা বুড়িকে নামিয়ে যেমনি বড় রাস্তায় এয়েচি অমনি এক শালা পুলিস ধরলো। বললো, "বাতি কাঁহা?" আমি ত্যাখন হাতে পায়ে ধরে বললুম বাতি আনকে ভুলে গেচি পুলিস সায়েব। এবারটা মাপ করে দাও। তা শুনলে না ব্যাটা। বন্দোবস্তের কতা তুললো।'

হাসারি অবাক। বললো, 'কিসের বন্দোবস্ত?'

রাম বললো, 'বন্দোবস্ত একটা আচে। সেটাই চাইলে। পনেরোটা টাকা। নইলে

থানায় ভরে দেবে বললো।'

'তুমি দিলে?'

রাম মনঃক্ষুন্ন হয়ে বললো, 'অতগুলো ট্যাকা পাব কোথায়? অনেক বললুম লোকটাকে। কানেই নিল না শালা হারামি। উল্টে লাঠির বাড়ি দিয়ে গাড়িটা পিটতে পিটতে থানায় ধরে নিয়ে গেল। সেখানে গাড়িটা আটকে রেখেচে। একটা কেস্ হয়েচে আমার নামে। থানা বাবু বললে, "কাল আদালতে হাজ্‌রি দিবি।" বোধহয় তিরিশ ট্যাকা জরিমানা আমার হবে।'

রামের ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরা ছিল। কথাটা বলে সে একটা লম্বা টান দিল সিগারেটে। তারপর হাসারির কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বললো, 'আগে চলো কিছু খেয়ে নি। তারপর ভাবা যাবে। পেট ভরা থাকলে বিপদ-কে বিপদ মনে হয় না।'

হাসারিকে নিয়ে রাম যেখানে গেল সেটা সস্তা একটা ভাতের হোটেল। দেখে-শুনে হাসারির মনে হলো রাম প্রায়ই এখানে আসে। ছোট্ট মাথা নিচু একটা ঘরের একধারে মার্বেল পাথর বসানো পাঁচটা টেবিল, অন্যধারে দোকানের মালিকের বসার জায়গা। লোকটা মুসলমান। বেশ মোটাসোটা চেহারা লোকটার। উনোনের ধারে আদুল গায়ে বসে রান্নার তদারকি করছে। তার পিছন দিকের দেওয়ালে পবিত্র কাবা তীর্থস্থানের একটা বিবর্ণ ছবি ঝুলছে। মক্কার এই কালো পাথরটি সব মুসলমানের কাছেই বড় পবিত্র। সব টেবিলেই একটা পাত্র রাখা আছে। তাতে আছে নুন আর কাঁচালঙ্কা। ঘরের চাল থেকে ঝুলছে মান্ধাতার আমলের একটা সিলিং পাখা। পাখাটা টেনে টেনে ঘুরছে আর শব্দ হচ্ছে ক্যাঁচ কোঁচ। ওরা বসতেই একটা বাচ্চাছেলে দু-জনের জন্যে দুথালা ভাত আর দুবাটি ডাল বসিয়ে দিয়ে গেল। দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল। সামনে ভাতের থালা বেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নিঃশব্দে খেতে শুরু করে দিল। খাওয়া শেষ হলে রামের মনে অনেকটা স্বস্তি ফিরে এল যেন। হাসারিও খুব তৃপ্তি পেয়েছে। কলকাতায় এসে এমন পেটভরা আহার এই প্রথম জুটলো তার। রামের মনেও আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে তখন। রাম বললো, 'এই শহরটায় ট্যাকা ওড়ে। এখানে যত ট্যাকা আচে তাতে সব্বার পেট ভরানো যায়।' হাসারির যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটায়। গোঁফে হাত বুলিয়ে সে একটু অবাক হয়ে তাকালো রামের দিকে। রাম ফের বললো, 'মাইরি বলচি। একটুও মিথ্যে লয় কত্তাটা। তুমি মাইরি এখনও গেরামের মানুষ হয়ে আচো। আরও কিছু দিন থাকো। কলকেতাওলা হয়ে যাও। ধান্দাগুলো সব শিখে লাও। ত্যাখন বুঝবে আমার কতাটা।'

বেরিয়ে যাবার সময় টেবিলের ওপর তিনটে টাকা রেখে ওরা দুজনে রাস্তায় নামলো। তারপর চওড়া ট্রাম রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছাল। স্টেশনের চত্বরে বসে ফল বেচছে ফলওলা। কয়েকটা কলা আর কমলালেবু কিনে ওরা হাসপাতালে এল সেই চোট পাওয়া কুলিকে দেখতে।

হাসপাতালে পেঁছে হাসারির মনে হলো আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশী মানুষের ভিড় সেখানে। সবাই ভেতরে ঢুকতে চাইছে। তাই এত চেঁচামেচি, ঠেলা-ঠেলি। রেড ক্রশ আঁকা একটা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ঝড়ের গতিতে এসে দাঁড়ালো এমা-র্জেন্সি গেটের সামনে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল গেটের সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলো। আগের দিন এই গেট দিয়েই ও'দর বন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসারির মনে হলো ক্রুদ্ধ মানুষগুলো এ্যাম্বুলেন্স গাড়ির ড্রাইভারকে বোধহয় টুকরো টুকরো

করে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু ড্রাইভারটা মানুষগুলোকে বুঝিয়ে শান্ত করে গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে দিল। হাসারি উঁকি দিয়ে দেখলো রক্তমাখা অনেকগুলো মানুষের লাশ গাড়ির মধ্যে শোয়ানো। মনে হলো এরা সবাই অগ্নিদগ্ধ। পা থেকে ফালির মত পোড়া চামড়া ঝুলছে। দৃশ্যটা মোটেই মনোরম নয়। কিন্তু এটা হাসপাতাল। এই সব দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যাবে এখানে। হাসপাতাল চত্বরে এক কোণে অনেক-গুলো মরচে ধরা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। স্তূপ হয়ে আছে ভাঙা শার্সি আর চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া টায়ার। গাড়িগুলোর গায়ে আঁকা রেড্ ক্রশ চিহ্নটি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এই পরিত্যক্ত লোহালক্কড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন কুষ্ঠ রোগী দিব্যি ঘর বেঁধে বাস করছে।

বন্ধুর খোঁজে ওরা অনেকক্ষণ সারা হাসপাতালটা খুঁজলো। কিন্তু কোথায়? শেষ পর্যন্ত একজন নার্স একটা ঘর দেখিয়ে দিল ওদের। নার্স মেয়েটা নিশ্চয়ই কেউকেটা হবে। ওর কোমরে চওড়া বেল্ট পরা। তাতে ঝুলছে বিরাট এক চাবির থোকা। তা ছাড়া মেয়েটা সবাইকে ধমকাচ্ছিল। ওরা যেখান দিয়ে যাচ্ছে তার দু-পাশেই বড় বড় ঘর। কর্মচারীরা সেখানে বসে কাজকর্ম করছে। কেউ কেউ গল্পও করছে। তাদের ঘিরে আছে পাহাড়ের মত উঁচু কাগজ আর ফাইল। সরু সুতো দিয়ে সেগুলো একত্র করে বাঁধা। ঘরময় ছড়িয়ে আছে কাটা টুকরো কাগজ। দেখ-লেই বোঝা যায় ইঁদুর-কাটা কাগজ সেগুলো। হাসারি অবাক হয়ে দেখলো ঘরময় স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইঁদুরের পাল। নিঃসঙ্কোচে তারা আসছে যাচ্ছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না। দিব্যি আরামে, বিনা বাধায় এমন স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণের মজা তারা আর কোথায় পাবে? রাম বললো প্রশ্রয় পাওয়া ইঁদুরগুলো মাঝে মাঝে রুগীদেরও হয়তো আক্রমণ করেছে। সে শুনেছে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তা বৃদ্ধার হাত-পায়ের আঙুল চিবিয়ে কেটে দিয়েছিল ইঁদুরগুলো। হাসারি স্তম্ভিত হয়ে গেল রামের কথা শুনে।

যে ঘরের সামনে এসে ওরা দাঁড়ালো সেখানে অপারেশন করা রুগীরা থাকে। এর নাম সার্জিক্যাল ওয়ার্ড। গেটের সামনে একজন পুরুষ নার্স দাঁড়িয়েছিল। রাম তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল। ঘরটা বিশাল। অনেকগুলো জানলা আছে হলঘরটায়। ছাত থেকে ঝুলছে সিলিং ফ্যান। পঞ্চাশের বেশী বেড আছে ঘরটার মধ্যে। ঠাসাঠাসি করে বেডগুলো সাজান হয়েছে। বেশীরভাগ বেডের মাথার দিকে একটা বোতল ঝোলানো আছে। সেখান থেকে একটা নল চলে গেছে রুগীর কাছে। বোতলের মধ্যে রয়েছে জলের মত সাদা তরল পদার্থ। কোনটার রঙ লাল। লাল রঙের তরল বস্তু দেখেই হাসারির বুক ধক করে উঠলো। সে বুঝতে পারলো হয়ত তারই মত হতভাগা কোনো মানুষের রক্ত পোরা আছে ওই বোতলে। বন্ধুর খোঁজে সারা হলঘরটা ওরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। কিন্তু এমনভাবে হাত পা কাটা বা পুড়ে যাওয়া রুগী দেখে বেড়াতে ভাল লাগলো না ওদের। এক-জন বুড়ো রুগী দেখে প্রায় শিউরে উঠলো হাসারি। লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর প্লাসটার করা। ঠেলাগাড়িতে তুলো ব্যান্ডেজ আর যন্ত্রপাতি নিয়ে নার্সরা এক বেড থেকে আর এক বেড-এ যাচ্ছে। হাসারি ভাবলো এই মনোভাব-টির জন্যেই নার্সরা এইভাবে কাজ করতে পারে। তাদের দেখেই কয়েকজন রুগী গালাগালি দিয়ে উঠলো। কেউ বা ভাল কথাও বলছিল।

শেষ পর্যন্ত চেনা মানুষটিকে খুঁজে পেল তারা। একটা চারপায়া দিয়েছে

ওকে। ওদের দেখে ভারি খুশী হলো মানুষটা। বললো যে পায়ের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছে সে। বলতে বলতে কেঁদে ফেললো। হয়ত জানতে পেরেছে যে তার পায়ের চেটো কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাম তার হাতে ফলের ঠোঙাটা দিল। একটু হেসে ঠোঙা থেকে একটা কমলালেবু বার করে হাসারির হাতে দিল লোকটা। তারপর পাশের বেড-এ শুয়ে থাকা ছেলেটাকে হাত দিয়ে দেখাল। ছেলেটার হাত পা মাথা ব্যাণ্ডেজ করা। শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। স্টোভ ফেটে সারা শরীরটা ঝলসে গেছে ছেলেটার। লেবুর খোসা ছাড়িয়ে একটা করে কোয়া ছেলেটার মুখে পুরে দিতে লাগলো হাসারি। খুব কষ্ট হচ্ছিল কোয়াটা গিলতে। ছেলেটার অবস্থা দেখে হাসারিও কষ্ট পাচ্ছিল মনে মনে। সে ভাবলো ঠিক তার শম্ভুর বয়সী হবে ছেলেটা।

মানুষটাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে এক মুখ। তাতে আরও রুগ্ন মনে হচ্ছিল তাকে। চোখ দুটো বসে গেছে কোটরে। সারা মুখখানায় হতাশা। ওরা যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিল তাকে। অভয় দিয়ে বললো যে বিপদে একলা ফেলে পালিয়ে যাবে না তারা। এই শহরে লোকটার কোন আত্মীয় নেই। কিন্তু হাসারির মত এমন হতভাগা একজন মানুষকে আপনার জন মনে করেই বা তার কতটুকু লাভ হবে?

ওরা দুজন অনেকক্ষণ বসে ছিল মানুষটার কাছে। ওর হয়ত তখন জ্বর বেড়েছে। কারণ, কপালটা খুব ঘামছিল তার। খানিক পরে একজন পুরুষ নার্স এসে ওদের চলে যেতে বললো। অসহায় মানুষটা তখনো দুজনের দুটো হাত চেপে ধরে আছে। কিন্তু যেতেই হবে ওদের। তাই জোর করে হাতদুটি ছাড়িয়ে নিল হাসারিরা: আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিল, তারপর পিছন ফিরে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো। যেতে যেতে হাসারি আর একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। দেখলো করুণ চোখে চেয়ে আছে মানুষটা আর ক্লান্ত হাতখানা নাড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার শান্ত হাওয়ায় বেতস পাতা যেমন তিরতির করে কাঁপে তেমনি কাঁপছে মানুষটার শীর্ণ হাতখানা।

একুশ

স্তেফান কোভালস্কীর ঘরের কাছেই এক মুসলমান পরিবার থাকে। পরিবারের লোকসংখ্যা সাত জন। তিন জন বড় মানুষ আর চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের কর্তা হলো মেহবুব। মেহবুবের বয়স তিরিশের কোঠায়। মানুষটা ছোটখাট কিন্তু চেহারা বেশ শক্তপোক্ত। মুখচোখে বেশ প্রাণখোলা ভাব আছে। তবে রোকও আছে মুখের চেহারায়। ছোট ছোট দুটি চোখ, ভুরুদুটি লোমশ আর এক মাথা ঘন কোঁকড়ান চুল কপালের আধখানা পর্যন্ত নেমে এসেছে। মেহবুবের বিবির নাম সেলিমা। তার নাকে একটা ছোট্ট পাথর বসানো আছে। বেশ কয়েক মাসের পোয়াতি হলেও শীর্ণ সেলিমার কাজকর্মের কামাই নেই। সারাদিনই সে কিছু না কিছু কাজ করছে। হয় বাসন ধুচ্ছে, কাপড় কাচছে, নয়ত রাঁধছে। পরিবারের তৃতীয় বড় মানুষ হলো মেহবুবের বুড়ো আম্মা। ছোট ছোট করে ছাঁটা সাদা চুলের এই থুন-থুনে বুড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলির মুখে বসে থাকে আর বিড়বিড় করে কোরান

থেকে এটাওটা বলে। চোখে ভাল দেখেও না বুড়ি। মেহবুবের বড় ছেলে নাসিরের বয়স দশ। একটা ছোট কারখানায় সে কাজ করে। তার ছোট ছোট দুটি বোন মাদ্রাসায় পড়ে আর কোলের ছোট ভাইটা গলির মুখে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়ায়। পরিবারটি মোটামুটি স্বচ্ছল। মেহবুব ডক ইয়ার্ডের একজন কর্মী। জাহাজের প্রপেলার তৈরি হয় তাদের কারখানায়। সেখানেই সে দিনমজুরী করে। মাসে তার আয় তিনশ' টাকা। রোজগারটা বেশ লোভনীয় কারণ এখানকার হাজার হাজার মানুষের দৈনিক রোজগার এক টাকাও নয়।

প্রথম দিকে বেশ কয়েক সপ্তাহ পড়শীদের সংগে স্তেফানের কোন যোগাযোগ ছিল না। একে সাহেব তায় পুরোহিত ; তাই পাড়ায় কেউ চাইত না বেড়া ভেংগে সে অন্তরংগ হয়ে উঠুক। পড়শীরা সবাই চাইত, মাখামাখিটা যেন বেশী না গড়ায়। তবে সর্বত্রই যা হয় এখানেও তাই হলো। বাচ্চাদের উৎসাহতেই বেড়া ভেঙে গেল, গলে গেল বরফ। স্তেফান হলো তাদের খেলার সাথী।

এটা ঘটলো নাটকীয়ভাবে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একদিন সন্ধ্যেবেলা মেহবুব কাজ থেকে ফিরলো একেবারে ভাঙা মন নিয়ে। ডক বোর্ড অস্থায়ীভাবে ছাঁটাই করেছে সব দৈনিক বেতনের কর্মীদের। এই ছাঁটাইয়ের দলে মেহবুবও পড়েছে। একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সব কর্মীকে মাসিক বেতন-কাঠামোর আওতায় মধ্যে আসায় একটা বাধ্যতামূলক সরকারী আইন আছে। কিন্তু আইনের নির্দেশ কেউ মানে না। না কর্তৃপক্ষ, না ইউনিয়ন। এবং গুজব যে সরকারও চায় না তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে সবাই মেনে চলুক। শুধু হতভাগ্য সেই সব শ্রমিক, যাদের হিত-অহিত জড়িয়ে আছে এর সংগে, তারাই চাইতো আইনটি কঠোরভাবে বলবৎ হ'ক। সরকারের অস্বস্তির কারণ হলো যে, মাসিক বেতন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলে ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে ইউনিয়নও চায় না যে তাদের সভ্য সংখ্যা অপরিমিত হ'ক। কারণ সভ্য সংখ্যা বাড়লেই প্রাপ্ত সুযোগের পরিমান কমবে। কর্তৃপক্ষ চিরকালই সব দেশে শ্রমিককে তাদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে চায়। তাই অনিশ্চয়তার মধ্যেই শ্রমিককে রাখতে চাইত কর্তৃপক্ষ। এই বাস্তব কারণগুলো ছাড়াও অন্য কারণ আছে, বিশেষ ভারতবর্ষের মত ঐতিহ্য-সচেতন দেশে। কারণগুলো অতীত থেকে আহরণ করা এবং কিছুটা মনগড়া। যেমন, সব কর্মীকে মাসিক বেতন-কাঠামোর অন্তর্গত করলে কর্মীদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাধ্যতামূলক চাকরি পাবার সম্ভাবনাটা সংকুচিত হয়ে যাবে। সুতরাং সবাই একত্র হয়ে সরকারী আইনটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো। কর্মীর হাতে পাকা নিয়োগপত্র তুলে দেবার বদলে, কর্তৃপক্ষ তাদের সাময়িক ছাঁটাই করতো আবার বহাল করতো কিছুদিন পর। এইভাবে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মীর ভাগ্য অনিশ্চিত আশংকায় ঝুলে থাকতো। পুনর্বহালের সুযোগ কে পাবে আর কে পাবে না, তা ছিল সম্পূর্ণ কৃপা-নির্ভর। তারপর বারো-তেরো বছর কাজ করার পর যখন কর্তৃপক্ষের পক্ষে নিয়োগপত্রটি ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না, তখনই একজন শ্রমিকের ঘাড়ে ছাঁটাই নামক খাঁড়াটি পাকাপাকিভাবে নেমে আসতো। স্তেফান কোভালস্কীর পড়শী মেহবুবের ঘাড়েও সেদিন এই খড়্গাঘাতটি হলো।

দেখতে দেখতে শক্ত-সমর্থ পরিশ্রমী মানুষটা কোভালস্কীর চোখের সামনেই ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলো এবং হপ্তা কয়েকের মধ্যেই তার চেহারাটা হয়ে গেল শুকনো ফলের মত কোঁকড়ান। ক্ষিদের জ্বালায় পেটটা ঢুকে গেছে, সারা মুখে ফুটে উঠেছে

দুশ্চিন্তার ছাপ। রোজ মাইলের পর মাইল হেঁটে কারখানার দোরে দোরে ধরনা দিয়ে বেড়াত সে। সন্ধ্যের সময় যখন ফিরে আসতো তখন একেবারে অন্য লোক। ভাঙাচোরা, হতাশ মানুষটা প্রায় চোরের মত এসে কোভালস্কীর ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যীশুর ছবির দিকে ঠায় চেয়ে থাকতো। তার সেই আত্মমগ্ন স্থির চেহারাটার দিকে তাকিয়ে কোভালস্কীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। মনে মনে বলতো, 'মেহবুব, তুমি যখন যীশুর ছবির দিকে চেয়ে ঠায় তাকিয়ে থাক, তখন আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি কেন তোমার এই শাস্তি? ঈশ্বরের দেওয়া সাবিয়ার কষ্টটা যেমন মেনে নিতে পারি না, তেমনি সইতে পারি না তোমার ওপর এই অকারণ অবিচার।'

সাতজন মানুষের এই পরিবারটির তখন একমাত্র ভরসা ছিল নাসিরের রোজগার করে আনা কুড়িটা টাকা। রোজ বারো ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়ে সে এই টাকাটা মাসে আয় করতো, আর এটাই সম্বল করে সংসারটা চলতো। তাহলেও পরিশ্রমী ছেলেটার শরীর স্বাস্থ্য মজবুত ছিল। সাধারণত যা হয় এ সংসারেও তাই হ'ত। রোজগেরে মানুষটার আলাদা যত্নআত্তি হতো। অন্যের কপালে টুকরো-টাকরা যাই জুটুক, নাসিরের বরাদ্দ খাবারে কেউ ভাগ বসাত না। নাসিরের অন্য একটা আয়ের পথ ছিল। রোজ সকালে কোভালস্কীর জন্যে সে জলের টিন-হাতে লাইন দিত এবং তার পালা এলে ছুটে এসে কোভালস্কীকে খবরটা দিত। এর জন্যে স্তেফান কোভালস্কী তাকে মাসে দশটাকা দিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যীশুর ছবির সামনে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর মেহবুব সসঙ্কোচে কোভালস্কীকে তাদের ঘরে ডেকে আনলো। ছোট্ট ঘর। ছ'ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া ঘরখানা তিনভাগ জুড়ে আছে একটা কাঠের তক্তপোশ। দিনের বেলায় ওটাকে চৌকির মত ব্যবহার করে ওরা। আর রাত্রে ছেঁড়া-খোঁড়া খানকয়েক কাঁথা পেতে সেলিমা তার কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে শাশুড়ীর সংগে শোয়। চৌকির তলায় শোয় নাসির আর তার বোনদুটো। মেহবুব শোয় দোরের বাইরে একটা মাদুর পেতে। ঘরে আর একটিই আসবাব আছে। সেটা একটা টিনের ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের মধ্যে সিনেমার বিজ্ঞাপনের কাগজ দিয়ে মোড়া কয়েকটা শৌখীন কাপড়জামা রাখা আছে। এগুলো ওদের পরবের জামাকাপড়। তাই এত যত্ন করে এগুলো রাখা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মতন সেলিমা এখানেই রান্না করে। ঘুঁটে আর চুরি করা ঘেঁষ দিয়ে উনুন ধরায় সে। ঘরের মধ্যে কোন জানলা, আলো নেই, জলের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ওদের ঘরের মাটির মেঝে তকতকে নিকানো। ঠিক মার্বেল পাথরের মতন পরিচ্ছন্ন মসৃণ মেঝেতে জুতো পায়ে ঘরে ঢুকতে সংকোচ হয়। তাই দোরগোড়ায় জুতো জোড়া খুলে ঘরে ঢোকে সবাই।

দারিদ্র্য যেখানে যত প্রকট আপ্যায়নের বহরও সেখানে তত বেশী এবং উষ্ণ। তাই ঘরে ঢোকার সংগে সঙ্গেই স্তেফান কোভালস্কীকে চা করে জিলিপি খেতে দিল ওরা। বোধহয় সেই মুহূর্তেই বেশ কয়েক দিনের সঞ্চয়টি স্তেফানের সম্মানে তারা খুইয়ে ফেললো।

সেদিন ওদের ঘরে ঢুকেই স্তেফানের মনে হলো এদের জন্যে কিছু করতে পারলে তার মন ভরতো। কিন্তু কী সে করতে পারে? ওরাই বা বিদেশী মানুষের সাহায্যটি হাত পেতে নেবে কেন? স্তেফান নিজেও চায় না সান্টা ক্লস হতে। কিন্তু ঈশ্বরই সহায় হলেন। একটা ছোট্ট ঘটনাই তাকে সুযোগ করে দিল। একদিন সকালে

স্টোভে ভাত রান্না করতে গিয়ে হাতটা পুড়িয়ে ফেললো স্তেফান। এটাই হলো তার ওজর। তার আনাড়িপনার কথা বলার সময় স্তেফান প্রস্তাব করলো রোজ সকালে সেলিমা যদি তার জন্যে একটু ভাত ফুটিয়ে দেয় তবে সে বেঁচে যায়। ওরা রাজী হলো। ঠিক হলো মজুরী বাবদ স্তেফান তাদের রোজ তিন টাকা দেবে। এই সামান্য সাহায্যটুকুই তাদের কাছে পরম বাঞ্ছিত একটা প্রতিশ্রুতি বয়ে আনলো যেন কারণ বস্তির অর্থনীতিতে এর দাম অনেকখানি। সত্যিই সংবাদটা কৃতার্থ হলো স্তেফানের প্রস্তাব। স্তেফানও খুশী হলো কারণ যা সে চেয়েছিল তা করতে পারলো। তবে কড়ার হলো সেলিমা তার জন্যে পৃথক কোন ব্যবস্থা করবে না। ওদের সংসারের জন্যে যা রাঁধবে, স্তেফানকেও তাই পরিবেশন করবে।

'কি করে আনন্দ নগরের এই অসহায় মানুষগুলোর প্রতিদিন বেঁচে থাকার সংগ্রামের যথার্থ দোসর হতে পারি, যদি না তাদের জীবনযন্ত্রণার উপলব্ধি আমার আয়ত্ব হয়?' এ প্রশ্নটা বারে বারেই স্তেফানকে পীড়িত করেছে। তার মনে হয়েছে এই মানুষগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত গ্রাস করে রেখেছে একটি মাত্র আবশ্যক দিয়ে। সেটি হলো ক্ষুধা। তার মনে হয়েছে 'খিদে' ছাড়া আর সবকিছুই এদের জীবনে অনাবশ্যক বাহুল্য। পুরুষ পরম্পরায় এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যার পীড়নে ক্ষয় হচ্ছে, যার দরুন ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানটা নেমে এসেছে উদরে সেই অপরিহার্য বোধটি হলো 'ক্ষুধা।' এরই প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে তিনটি আলাদা সত্তা; শ্রেণীভাগ করে যাদের বলা যায় একবেলা, দুবেলা এবং তিনবেলা আহারী। আর একটি শ্রেণী আছে যাদের কোনো বেলাই কিছু জোটে না, যাদের সবটাই অনিশ্চিত। স্তেফান ভাগ্যবান কারণ তিন বেলাই তার খোরাক জোটে, এই বস্তি জীবনে যা সত্যিই দুর্লভ।

প্রস্তাব শুনে সেলিমা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো স্তেফানের দিকে। বলে কি মানুষটা? তারপর সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না, কিছুতেই না। আপনারা কত বড় মনিষ্যি। কত দূর দ্যাশ থিকে এয়েচ। আপনারা খাবে আমাদের অন্নব্যঞ্জন? তাই কখনো হয়? না স্তেফানদাদা। আপনার মাতাটা ঠিক খারাপ হয়ে গেচে গো!'

স্তেফান মনে মনে বললো, 'ছোট্ট প্রিয় বোনটি! আমায় মার্জনা করো। কি করে তোমায় বোঝাই আমার মনের ভাবটি! সমাজের আবর্জনার মধ্যে বেড়ে উঠেছে তোমাদের এই বঞ্চনার জীবন। কখনো চোখ মেলে চেয়ে দেখনি উড়ে যাওয়া পাখির দিকে; দেখনি গাছের মরা ডালে কখন এসেছে নতুন পাতা। হয়ত এমন দিনও গেছে যখন একটুকরো ভাতের কণাও ছেলেমেয়েদের মুখে তুলে দিতে পার নি। যেটা আসছে আগামী দিনের সেই বাচ্চাটার জন্যেই বা কি রেখেছ? তোমার বুকের মরা স্তন শুষেও ত এক ফোঁটা দুধ পাবে না সেটা! কেমন করে তোমায় বোঝাই স্বর্গের মহান "কর্মের" বদলে মানুষটা কেন ফিরে ফিরে বস্তির এই নরক-জীবনের স্বাদ নিতে চায়?'

কিন্তু মুখে বললো অন্য কথা। একটু হেসে সেলিমার অবাক হওয়া মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বললো, 'না বোনটি। মাথা আমার ঠিকই আছে। কাল থেকে তুমিই আমায় খাওয়াবে। এই উপকারটুকু তোমায় করতেই হবে লক্ষ্মী বোনটি আমার!'

পরের দিনদুপুরে এক মেয়ের হাত দিয়ে স্তেফানের খাবার পাঠিয়ে দিল সেলিমা। এক হাতা ভাত, বাঁধাকপি ও শালগম দিয়ে তৈরি একটা তরকারি আর খানিকটা

মসুর ডাল। বস্তির একবেলা আহারীদের কাছে রীতিমত লোভনীয় খাদ্য-তালিকা, কারণ এ দেশের গরিব মানুষদের শরীরে মসুর ডালই প্রোটিন যোগায়। ইওরোপীয় খাদ্যরুচিতে অভ্যস্ত স্তেফানের কাছে খাদ্যের পৌষ্টিক মানটাই বিচারযোগ্য। তাই সে স্থির করলো ভোজ্যবস্তু দু-গ্রাসে নিঃশেষ করবে। কিন্তু তার আশঙ্কা হলো সেলিমা যদি সার্বেক এবং ঐতিহ্যময় ভারতীয় রন্ধনরীতিটি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে, তাহলে রান্নায় যে পরিমাণ মসলা এবং জ্বালাকর ঝাল মিশ্রিত থাকবে, তাকে অত দ্রুত উদরস্থ করা যাবে না। এক গ্রাস মুখে তুলেই স্তেফান বুঝতে পারলো যে, এ দেশের ঐতিহ্যটি সেলিমা ভুলে যায় নি। ফলে ধীরেসুস্থে খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না স্তেফানের। একবার এদেশী এক ডাক্তারের সামনে এই সনাতন পাকরীতির খুব নিন্দে করেছিল স্তেফান। ডাক্তারবাবু প্রতিবাদ করতে পারে নি কারণ সে জানতো এর দরুন খাদ্যের স্বাদ চলে যায়। কিন্তু এর আসল কারণটি স্তেফান পরে আবিষ্কার করতে পেরেছে। জ্বালাকর ঝালক্রিয়ার একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আছে। এর ফলে শরীরে ঘাম হয়, রক্তসঞ্চালন দ্রুত হয় আর তাড়াতাড়ি হজম হয়। লঙ্কামরিচের একটা বিশেষ কাজ হলো ক্ষিদে মারা। তাই লক্ষ লক্ষ আধপেটা খাওয়া মানুষ রান্নায় ঝালের ব্যবহার পছন্দ করে। আর একটা কাজ করে লঙ্কামরিচের ঝাল। পচাগলা, সপক্ক, অর্ধপক্ক যেমনই হ'ক, সেটি নির্বিচারে উদরস্থ করিয়ে দেয়।

তেমন খাটুনির কাজ না করায় দিন দুই অসুবিধে হলো না স্তেফানের। যখনই খিদে পেত হিন্দু চা-ওলার দোকান থেকে এক ভাঁড় চা খেয়ে নিত। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হতে শুরু করলো। প্রচন্ড যন্ত্রণা শুরু হলো পেটের মধ্যে। সেই সঙ্গে শুরু হলো মাথা ঘোরা আর বরফের মত ঠান্ডা ঘাম হওয়া। একবেলা খাওয়ার পরেই শুরু হয়ে যেত যন্ত্রণা। তখন চাটাই পেতে শুয়ে পড়তো। ধ্যান করার মনও থাকতো না। খিদের তান্ডব থেকে মুক্তি পাবার কোন অবকাশই ছিল না। এত খিদে পেত যে লজ্জা করতো। অথচ আধপেটা খেয়ে এ দেশের মানুষ দিব্যি চালিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন। সেলিমা তার জন্যে যে পদ রেঁধে দেয় তেমন খাদ্যবস্তু ক'জন ভাগ্যবানের একবেলা জোটে? কিছু কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়াও হতে লাগলো ইতিমধ্যে। নাড়ির গতি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। বেড়ে গেছে হৃদস্পন্দনও। নিশ্বাসও ঘন ঘন পড়ছে। 'শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবো তো?' এই ভাবনাতেই বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো স্তেফান। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে সে তখন। হয়েছে কমজোরি। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়, হাঁপ ধরে। বস্তির সংগী মানুষগুলোর দিকে চেয়ে তার লজ্জা করতো। অনেক কম ক্যালরির খাবার খেয়েও ওরা কেমন মাল বইছে, ঠেলাগাড়ি চালাচ্ছে ভারবাহী জন্তুর মত অনায়াসে। কিছুদিন পরেই ওর সেই লজ্জাজনক ক্ষুধাতুর ভাবটা কমে গেল যেন ম্যাজিকের মতন। অবস্থাটা মানিয়ে নিয়েছে মহাশয় শরীর। খিদের জ্বালায় আর তেমন অস্থির লাগতো না। এমনকি নিজেকে বেশ স্বচ্ছন্দ লাগতো। ততদিনে স্তেফানের পেট সত্যিই মরে গেছে।

সেই সময় একটা মারাত্মক ভুল করে বসলো স্তেফান। ফ্রান্স থেকে তার দেশের একজন লোক এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে এনেছে তার দেশের লোকদের দেওয়া টিনের খাবার স্তেফানের জন্যে। এক টিন শুকনো চিকেন আর এক টিন চীজ। স্তেফান ঠিক করেছে এই উপাদেয় খাদ্যবস্তু পড়শীদের ভাগ করে দেবে।

মেহবুবে রাজী হলো বটে তবে একটা শর্তে। স্তেফানকেও এক সঙ্গে বসে ভাগ করে খেতে হবে। ফল হলো উল্টো। স্তেফান কোভালস্কীর মরা পেট যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। লোভ বেড়ে গেল। অদম্য হলো ভোজন স্পৃহা। সঙ্গে শুরু হলো অন্য উপসর্গ। বমি বমি ভাব, পেটের পেশীতে টান, মাথা ঘোরা ইত্যাদি। কোভালস্কী তখন দিনে দিনে কাহিল হচ্ছে। শরীরের জোর কমছে। হাত-পা উরুর সেই ভরাট তেজী ভাবটা আর যেন নেই। বেশ কয়েক পাউণ্ড ওজন কমে গেল শরীরের। টিউবওয়েল থেকে এক বালতি জল বয়ে আনাতেও রীতিমত পরিশ্রম লাগতো। পিঠ সোজা করে আধ ঘণ্টাও বসে থাকতে পারতো না। রাত্রে ঘুম হ'ত না। নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতো। ইদানিং স্বপ্ন দেখতো যেন বুভুক্ষু মানুষের বিরাট মিছিল তার দিকে ধেয়ে আসছে। তখন ইঁদুরের উৎপাতে ঘুম ভাঙলে সে যেন স্বস্তি পেত। আসলে দেহেমনে সে তখন খিদের দারুণ জ্বালা সবে পেতে শুরু করেছে। আনন্দ নগরের অধিকাংশ ক্ষুধার্ত মানুষের দলে সেও একজন মনে করতে লাগল। সে যা চেয়েছিল তা-ই পেল।

কিন্তু স্তেফান কোভালস্কী নির্বোধ নয়। সে জানতো কতটা তার দৌড়। মনে মনে সে বলতো, 'এ আমার শখের গরিবানা। কারণ, আমি জানি আমার দায় নেবার লোক আছে। ঠিক সময়েই তারা আমায় এই গহ্বর থেকে টেনে তুলবে। সত্যিকার গরিবানা অনেক নিষ্ঠুর। খিদের জ্বালায় অস্থির হলে খাবার নিয়ে কেউ ছুটে আসে না তাদের কাছে। হতাশাই তাদের সম্বল। সত্যিকার গরিব মানুষদের জীবনে 'সেটাই ট্র্যাজেডি।'

মেহবুবরা যেন সমাজের সত্যিকার এঁটো। তাই সমাজ তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের খালি পেটের কান্নার সঙ্গে জুড়ে আছে এই হতাশাটা। কারণ, এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেবার মানুষ নেই। তবুও এদের দারিদ্র্য-গৌরবটার প্রশংসা না করে উপায় নেই। কাঁটার এই মুকুটটি নিয়েই তাদের সব অহঙ্কার। মেহবুবও এদের একজন। মুখ ফুটে কোন নালিশ সে কখনও জানায় নি। শুধু কোলের বাচ্চাটা যখন খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে, তখনই যেন তার ভাবান্তর হয়। মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। তখন বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আদর করে, গল্প বলে, সান্ত্বনা দেয়। অবুঝ বাচ্চাটাও কলকলিয়ে হেসে ওঠে। খিদে ভুলে বাপের কোল থেকে নেমে খেলা করতে চায়। কিন্তু এই প্রহসনটা সবদিন খাটে না। এক একটা দিন বাচ্চাটার অবুঝপনা থামতেই চায় না। খিদের জ্বালা সে যেন সইতে পারে না। সেই অসতর্ক মুহূর্তগুলোয় মেহবুবরা নিশ্চয় তাদের গৌরববোধটা ভুলে যায়। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ছুটে যায় পড়শীর দোরগোড়ায় একখানা রুটি ধার করতে। পড়শীরা কেউ মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেয় না। এটাই এখানকার অলিখিত নিয়ম।

বাইশ

ধূসর রঙের উঁচু কলারওলা শার্ট, লিনেনের প্যান্ট আর চামড়ার স্যাণ্ডেল পরা মুসাফির প্রসাদের চেহারা বা ব্যবহার ঠিক আর পাঁচটা রিক্সাওয়ালার মত নয়। একদিন অবশ্য সেও রিক্সা টানতো। বিশ বছর ধরে টানা রিক্সার হাতল ধরে সে

জন্তুর মত রিক্সা টেনেছে। কিন্তু ইদানিং সে রোজগারের নতুন পথ খুঁজে পেয়ে দুটো পয়সার মুখ দেখছে। আটচল্লিশ বছরের মুসাফির প্রসাদ এখন সংগী রিক্সা-ওলাদের ওপরওয়ালা। সেই 'বিহারী' রিক্সা মালিক বিপিন নরেন্দ্রর সবচেয়ে অনুগত এবং কাছের লোক। বিপিনের তেলচকচকে কালো কোঁকড়ান চুলের মাথাটি যেন যন্ত্রগণক। দুটো খাড়া কান এবং ধারালো চিবুকের এই মানুষটা তিনশ' ছে-চল্লিশখানা রিক্সা আর সাত শতাধিক এই মানুষ নামক ঘোড়া সমেত এই ফলাও কারবারটি চালায় শুধু বুদ্ধি-কৌশলের সাহায্যে। একশ-দশ ডিগ্রি তাপমাণের ভর দুপুরই হোক বা বর্ষার অবিশ্রাম ধারাবর্ষণই হ'ক, বিপিন নরেন্দ্র কখনও কর্তব্য-ভ্রষ্ট হয় নি। ঝরঝরে একটা সাইকেল চড়ে মাইলের পর মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বেড়ায় ক্লান্তহীনভাবে। ঈষৎ বাঁকা পা দুটো টেনে টেনে হেলেদুলে হাঁটে সে, অনেকটা হাঁসের মত। রিক্সাওয়ালারা দুষ্টুমি করে ডাকে 'হাঁসবাবু'। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব রিক্সাওয়ালাই বিপিনকে ভালবাসে।

তাই যেদিন এই বুড়ো মানুষটা মুসাফিরকে ডেকে সব বুঝে নিতে বললো সেদিন তার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। বিশ বছর ধরে মানুষটার সংগে কাজ করছে মুসাফির। এতদিন তাকে যে সব দায়িত্ব দিয়েছে তা নেহাতই খেলো মাপের। হয় রিক্সা সারাই নয়ত বা পুলিশকে হাতে রাখার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কিন্তু আদায় নামক পবিত্র কাজটি বিপিন নিজেই পরম নিষ্ঠার সংগে পালন করতো। এ ব্যাপারে একটা দিনও কামাই হয় নি তার। রাস্তায় হাঁটুভর জল হলেও সে যথা-সময়ে যথাস্থানে পেঁৗচেছে। আদায়-উসুলের খুঁটিনাটি শুধু সে-ই জানতো। বেশীর ভাগ রিক্সাওয়ালাই রোজ সন্ধ্যেবেলায় ভাড়া মেটায়। কেউ মেটায় হপ্তা শেষে বা মাস শেষে। এদের সঙ্গে সেইরকমই বন্দোবস্ত করা আছে। কারও ভাড়ার রেট কম কারণ সারাই-বাঁধাইয়ের দায়িত্ব তার নিজের। আবার যে গাড়িগুলো লাইসেন্স ছাড়াই চলে তাদের ভাড়ার রেট আলাদা। মোটকথা, দায়-দায়িত্বের এই বিপুল বহরটি বিপিন একাই এতকাল বয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝছিল যে, বয়সের ভার রীতিমত চেপে বসছে তার শরীরে। একদিন সে তাই মুসাফিরকে ডেকে পাঠালো। বয়স নামক দুর্লঙ্ঘ বাধাটি যে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তা সে বুঝে-ছিল। মুসাফির এলে বিপিন বললো, 'শুন্ মুসাফির! হামার বয়স হচ্ছে। তুই বহুত দিন হামার সঙ্গে আছিস, কাম-কাজ করছিস। হামিও তোকে জানি। আমরা দুজনাই বিহারী আছি। এখোন থেকে তুই হামার চেলা বনে যা। হামার হয়ে আদায়-উসুল কর। রোজ সন্ধ্যেবেলা পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিবি। হামি তোকে টাকায় পাঁচ পয়সা কমিশন দেবো। রাজী আছিস তো?'

মুসাফির জানে বেশী কথার মানুষ বিপিন নয়। সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয় না করে সে সটান উপুড় হয়ে বিপিনের পায়ের ধুলো নিল। তারপর গদগদ স্বরে বললো 'তুমি আমার গুরু। চিরকাল তোমার গোলাম হয়ে থাকবো গুরু!'

পরদিন থেকে শুরু হলো মুসাফির প্রসাদের নতুন জীবনযাত্রা। প্রথম দিনের কর্মসূচীটি এইরকম। ভোর চারটেতে উঠে পড়লো সে। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে রাস্তার খোলা জলের কলে চান করলো। তার অন্য সঙ্গীরা বেলায় ওঠে। তারাও বিপিনের কর্মচারী। কেউ বাস চালায়, কেউ রিক্সা চালায়। একজন মেকানিকও আছে ওই দলে। এরাও বিহারের গ্রামগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসেছে রুজিরোজগার করতে।

প্রথম দিন ভোর সাড়ে চারটের সময় সে সাইকেল চড়ে জগুবাবুর বাজারের পেছনে মা লক্ষ্মীর মন্দিরে গেল পুজো চড়াতে। তখনও দিন ফোটে নি। পথঘাট ঘোর অন্ধকার। ঠাকুরমশাই ঘুমোচ্ছিলেন। গ্রীল গেটের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মুসাফির মন্দিরের ঘন্টা বাজালো। ধড়মড় করে উঠে বসলেন ঠাকুরমশাই। তাঁর হাতে দশটা টাকা, এক ঠোঙা আতপ চাল আর দুটো কলা দিল মুসাফির। থালায় সাজিয়ে মা লক্ষ্মীর পায়ের কাছে রেখে তার নামে পুজো দিলেন তিনি। পুজো সাঙ্গ হলে মুসাফিরকে প্রসাদ দিলেন ঠাকুরমশাই। তার মনটি তখন আনন্দে ভরে উঠেছে। মাথায় প্রসাদ ঠেকিয়ে সে একটুকরো কলা মুখে পুরে দিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এখন থেকে অনেক টাকা উপার্জন করবে সে। মনে মনে তাঁকে স্মরণ করলো মুসাফির। প্রতিজ্ঞা করলো অর্থাগম যেমন অধিক হবে, তেমনি মা লক্ষ্মীর পুজোর বহরও বাড়িয়ে দেবে সে।

প্রসাদ খেয়ে সাইকেল চড়ে সে প্রথমে গেল লাউডন স্ট্রীটের গাড়ির আড্ডায়। বেলভিউ ক্লিনিকের কাছে বিপিনের দু'খানা রিক্সা আছে। তখনও ভাল করে ভোর হয় নি। রিক্সার অপরিসর সীটের মধ্যে শরীরটা দুমড়ে শুয়ে আছে রিক্সাওয়ালারা। পা-দুটো শূন্যে শিথিলভাবে ঝুলছে। রিক্সাই এদের ঘর আশ্রয় সব। কিন্তু এক-খানা রিক্সার দুজন চালক হলে এই আশ্রয়ের অধিকার নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হয়। মুসাফিরই তখন মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দেয় এই বিবাদ, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তার এই মীমাংসা মনোমত হয় না একতরফের কাছে।

এরপর সে চললো থিয়েটার রোডের দিকে। এখানকার আড্ডাটা অপেক্ষাকৃত বড়। প্রায় এক ডজন রিক্সা থাকে এখানে। সেখান থেকে গেল হ্যারিংটন স্ট্রীট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনোরম অঞ্চল। বড় বড় সুদৃশ্য প্রাসাদোপম বাড়ি আছে এই রাস্তার ওপর। মনোরম এই সব প্রাসাদ-ভবনে দেশী-বিদেশী লাখপতি কোটি-পতিরা বাস করে। ঠিক এমনি এক সুদৃশ্য ভবনের মাথায় মার্কিন জাতীয় পতাকা উড়ছে। এখানে প্রায় তিরিশখানা রিক্সা আছে বিপিনের। বড়লোকের পাড়া। তাই কিছু জটিল সমস্যাও আছে। কোন না কোন ছল-ছুতোয় পুলিস প্রায়ই হেনস্থা করে রিক্সাওয়ালাদের। গাড়ি জমা করে দেয় থানায়। তখন অনেক বেশি বকশিশ দিয়ে গাড়ি ছাড়িয়ে আনতে হয়, কারণ পাড়াটা বড়লোকের। সেন্ট জেভীয়ার্স কলেজের উল্টোদিকে পার্ক স্ট্রীট থানার সামনে গেলেই জমা করা গাড়ির পাহাড় দেখা যায়। চেন বাঁধা অবস্থায় গাড়িগুলো পড়ে আছে। সেই প্রথম দিনেই ষাট টাকা ঘুষ দিয়ে কয়েকটা জমা করা গাড়ি ছাড়িয়ে আনলো মুসাফির। সে জানে যে হিসেবের বাই-রের খরচ এগুলি। সুতরাং এর আদায়টিও নিয়মবহির্ভূত প্রথায় করতে হবে।

হ্যারিংটন স্ট্রীটের কাজ মিটিয়ে দ্রুত সে ছুটলো মল্লিক বাজারের দিকে। পার্ক স্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে এখানকার রিক্সা স্ট্যান্ডটাও বেশ বড়। তিরিশ-চল্লিশটা গাড়ি থাকে এখানে। এদের মধ্যে বিশখানা গাড়ির মালিক বিপিন। কিন্তু এখান থেকে অন্যত্র যাবার আগে মুসাফির ভাবলো ফুটপাতের ওপর পাঞ্জাব দেশের মোটা আশুর চায়ের দোকান থেকে এক কাপ চা খেয়ে নেবে সে। এ অঞ্চলে আশুর চায়ের খুব নামডাক। পর্যাপ্ত চিনি এবং দুধ মেশানো আশুর চা শুধু উপাদেয় নয়, এ যেন তার অর্ঘ্য। সেই মনোভাব নিয়েই খরিদ্দার তার ফুটপাতের দোকানে চা খেতে আসে। আশুকে দেখে তাই ঈর্ষা হয় মুসাফিরের। দিব্যি বাসন-কোশনের মধ্যে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে রাজার মত আর খাতির

সম্মান জুড়োচ্ছে।
মুসাফিরের পরবর্তী গন্তব্যস্থান হলো পার্ক সার্কাস বাজার। মাছ, আনাজের বাজারের পাশের স্ট্যান্ডে প্রায় খান পঞ্চাশ রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। এমনি করে এক স্ট্যাণ্ড থেকে আর এক স্ট্যাণ্ডে যত যাচ্ছে, ততই নোটের পাঁজায় ফুলে উঠছিল তার শার্টের পকেট। টাকার ছোঁয়া পাচ্ছিল সে শরীরে এবং থেকে থেকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল তার শরীর। তার মনে হলো কলকাতা শহরের রাস্তায় পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যেন অনাস্বাদিত এক শিহরন আছে। তখন অনেক রিক্সাওয়ালাই বেরিয়ে পড়েছে গাড়ি নিয়ে এবং ঘণ্টি বাজিয়ে যাত্রী ডাকতে ডাকতে চলেছে। শহরের প্রায় অর্ধেকটা তার চষা হয়ে গেছে এর মধ্যে। বেলা বারটা নাগাদ মুসাফির পেঁাছে গেল এদিকের স্কুল এলাকায়। দিনে দুবার বেশ কয়েকশ রিক্সা এখানে জড়ো হয় এবং স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আসে, নিয়ে যায়। মাসকাবারি এই ব্যবস্থার সুযোগ অনেকেই নিতে চায়। কারণ একটা স্থায়ী মাসিক আয়ের প্রতিশ্রুতি আছে এই ব্যবস্থায়। দিনে এইরকম দুটি কি তিনটি মাসকাবারি চুক্তি থাকলে, যে কোনো রিক্সাওয়ালার কাছেই পরম প্রাপ্তি বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এমন ভাগ্যবান ক'জনই বা হয়?

মুসাফির জানে যে, ঠিকমত কর্তব্য পালন করতে হলে মালিকের মত মনটিকে পাষাণ করতে হবে, নইলে যে গাড়ির চাকা নড়ে নি, সেই গাড়ির চালকের কাছ থেকে দৈনিক বরাদ্দ পাঁচ কি ছ'টাকা আদায় করতে পারবে না সে। সে জানে যে এমন দিন হয় যখন পেটে একটা দানা পড়ে না, কিন্তু বরাদ্দ টাকার সবটুকুই ত মালিকের হাতে তুলে দিতে হয়। তখন শূন্য পেটে মালপত্রসমেত সওয়ারি বয়ে বেড়ানোর ক্ষমতা কি সইতে পারবে তারা? কিন্তু বড় কঠিন এই সংসার। তার ষোল আনা দায় মিটিয়ে দিলে তবে মুক্তি। তাই জ্যৈষ্ঠীর পিচগলা দুপুরে সওয়ারি নিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে রিক্সাওয়ালা। আর ওঠে না। তবুও চলা থেমে যায় না। একজন মরে আর একজন তার বদলি হয়ে গাড়ি টানে। এই-ভাবেই চলছে রিক্সার চাকা। ভগবানের অসীম কৃপা, তাই অভুক্ত মানুষের অভাব হয় না সংসারে। তবে লোক বাছাইয়ের ব্যাপারে মালিকের বেশ খুঁটিনাটি নজর আছে। কারণও আছে। তার কারবারে রাজনীতি ঢুকতে দেয় নি মালিক। কে খাঁটি আর কে মেকী, এক নজরেই সে বুঝতে পারতো। যারা কেবল চায় কিংবা ধর্ম-ঘটের হুমকি দেখায়, তাদের এড়িয়ে যেত বিপিন। মুসাফির প্রসাদকে সে বলতো, 'হামার আমদুতের মধ্যে যেন কীরা না ঢোকে।' সে কথা এখনও প্রায়ই বলে বিপিন; কারণ রিক্সাওয়ালারা নিজেদের ইউনিয়ন করেছে। রাজনীতির লোকেরা ভুয়া রিক্সা-ওয়ালা ঢুকিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে। তারা দাবি করছে শ্রমের বদলে মালিকানা দিতে হবে। অবশ্য এমন অঘটন এখনও ঘটে নি। হয়ত মুসাফিরের মত কেউ কেউ মালিকের লোক হয়েছে : কিংবা রিক্সার হাতল ছেড়ে মোটর গাড়ির ড্রাইভার হয়েছে। কিন্তু রিক্সা কিনে কেউ মালিক হতে পারে নি।

মা লক্ষ্মী বধির নন। মুসাফিরের প্রার্থনা শুনে মুখ তুলে চাইলেন। প্রথম হপ্তার শেষাশেষি একশ' পঞ্চাশ টাকার একটা বাণ্ডিল নিয়ে সে পার্ক স্ট্রীট ডাক-ঘরে গেল। ডাকঘরের বাইরে ফুটপাতের ওপর মুন্সীজী বসেন। তিনিই টাকাটা দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন। মুসাফির জানে টাকা ক'টা পেয়ে ওদের খুব আহ্লাদ হবে। দেশ থেকে দুদিন আগে শেষ পোস্টকার্ডখানা এসেছে। কিছু টাকা

চেয়ে পাঠিয়েছিল তখন। ওদের সব চিঠির ভাষাই একরকম। হয় আরও টাকা চায়, নয়ত জানায় যে টাকা পৌঁচেছে। মুসাফিরের বাবা, মা, বউ, ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূরা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই গ্রামে থাকে। খাবার মুখ কুড়ি। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেটুকু জমি আছে তাও খুব কম। তাই টাকা না পাঠাতে পারলে 'ভুখা' মরে যাবে সবাই। মহামারীর কোপে মাটির দেয়াল ধসে যাবে। যে ঘরখানায় আটচল্লিশটা বছর আগে সে মায়ের কোল আলো করে পৃথিবীতে এসেছিল, তার চিহ্ন মাত্রও থাকবে না।

মুসাফির প্রসাদের জানাশোনা কেরানির নাম ডি সুজা। লোকটা খ্রীশ্চান। গোয়ায় তার বাড়ি। মুসাফিরের সংগে লোকটার সম্পর্ক খুব ভাল। হেসে হেসে কথা বলে ডি সুজা। মুসাফির কৃতার্থ হয়। ওর জন্যে আরও কেস নিয়ে আসে। খুব খুশী হয় সে। মুসাফিরের পরিচিত অনেক রিক্সাওয়ালাই এখন ডি সুজাকে দিয়ে মানি অর্ডার লেখায়। সে যা পায় তার কিছু ভাগ মুসাফিরকেও দেয়। মুসাফির বুঝেছে যে টাকা-পয়সার বাঁধনটাই আসল বাঁধন। লেনদেনের সুতা পলকা হলে 'রিস্তা' কখনও টেকে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে চলছিল মুসাফির প্রসাদ। হঠাৎ রামচন্দ্রের সংগে দেখা হয়ে গেল তার। মালিকের কারবারে সেও একজন বাঙালী রিক্সাওয়ালা। রামের হাতে দুখানা দশ টাকার নোট। মুসাফির জানে যে ওর রিক্সাটা থানায় জমা করেছে পুলিস। গাড়িতে নাকি আলো ছিল না। কিন্তু মুসাফির জানে এসব ওদের বাহানা। কলকাতার রাস্তায় আলো ছাড়াই কত গাড়ি চলে। রাম কি সেই জন্যে টাকাটা দিতে চাইছে : যাতে মুসাফির থানায় গিয়ে গাড়িটা ছাড়িয়ে আনে? কিন্তু তা নয়। সংগের লোকটার জন্যে সে অনুগ্রহ চাইতে এসেছে। মুসাফিরের হাতে দশ টাকার নোট দুখানা গুঁজে দিয়ে রাম মিনতি করে বললো, 'মা কালীর অনেক দয়া আপনার ওপর গো! দয়া করে এই মানুষটাকে দলে ঢুকিয়ে নেন সর্দার। আমার দ্যাশের মানুষ অ। বড় সৎ, ঠান্ডা মানুষ। সাহসও খুব। আর গতরখানাও কেমন তা তো দ্যাখছেন। ওকে একটা রিক্সা টানতে দ্যান।'

রামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হাসারি। কেমন যেন আড়ষ্ট, সংকোচভাব তার শরীরে। মুসাফিরের নজর এড়াল না এই ত্রুটিটা। সে বুঝতে পারলো যে মানুষটার সাহসের কিছু অভাব আছে। তবে রোগা হলেও কাঁধ আর হাত দুটো বেশ পুরুষ্ট। চেয়ে থাকতে থাকতে হাসারিকে সে লুঙ্গি তুলতে বললো। একটু ইতস্ততঃ করে হাঁটু অব্দি লুঙ্গি তুললো হাসারি। ওর পা আর উরুর গড়নটাও দেখা দরকার। এসব সে শিখেছে মালিকের কাছে। কাউকে দলে নেবার আগে বাজিয়ে নিত বিপিন, যাতে গাড়ির দায়িত্ব অযোগ্য মানুষের হাতে না পড়ে। ওরা দুজনেই অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল মুসাফিরের দিকে। আড়চোখে ওদের একবার দেখলো সে, তারপর হাসারির দিকে ফিরে বললো, 'তুর ভাগ্যটা ভাল আছে রে! কাল রাতেই জগুবাবুর বাজারের কাছে একটা রিক্সাওয়ালা মরেছে!'

তেইশ

আনন্দ নগরের মুসলমান পল্লীতে সেদিন যেন উৎসবের হাট বসেছে। সবাই

খুশীতে ফেটে পড়েছে। দুদিন ধরেই সাজসাজ ভাব চলছিল। মেয়েরা বাক্সপেটরা খুলে পরবের জামাকাপড় বার করেছে। ছেলেরা কাগজের মালা আর রঙিন ফুল দিয়ে গলি সাজিয়েছে। লাউডস্পিকার বসানো হয়েছে জায়গায় জায়গায়। বাড়ির দেওয়ালে ঝুলেছে টুনি বাল্ব। গলির মোড়ে মিঠাইওয়ালা স্তূপ করে সাজিয়েছে নানারকম মিষ্টান্ন। দুঃখ কষ্ট সব ভুলে গেছে এতগুলো লোক। প্রায় পঞ্চাশ হাজার গরিব মুসলমান তৈরি হয়েছে পয়গম্বর মহম্মদের জন্মোৎসব পালনের জন্য।

পবিত্র কোরাণপাঠের গম্ভীর সুর আর মানুষের হাসি, গান মিলিয়ে পরিবেশটা হয়ে উঠেছে যেন মেলাপ্রাঙ্গণ। সেই দুঃখ দুঃখ ভাবটা আর নেই। মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে এবং পবিত্র 'কাবার' দিকে মুখ করে হাজার হাজার ভক্ত সারারাত ধরে নামাজ পড়েছে ছ'টা মসজিদে।

সবাই ব্যস্ত হয়ে ঘুরেছে। দরজি, গয়না আর চুলকাটার দোকানগুলোয় থিকথিক করছে মানুষ। সবাই যথাসাধ্য নিজেকে সাজাতে চাইছে। হিন্দু বাড়ির মেয়ে-বউরা রান্নায় হাত লাগিয়েছে। কেউ বা চুলের জটা ছাড়িয়ে প্রিয় সখীর বিনোদবেণী বেঁধে দিচ্ছে। কেউ বা সস্তার পাউডার আর চন্দনবাটা মাখিয়ে দিচ্ছে মুখে হাতে। বাচ্চা মেয়েদের সাজের ঘটা খুব। চোখে সুর্মা লাগিয়েছে। রোগা অপুষ্ট শরীরে জড়িয়েছে ফিনফিনে ওড়না আর পরেছে সিল্কের ঘাগরা। পায়ে দিয়েছে মখমলের চটি। হাসি হাসি মুখের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে যেন আরব্য রজনীর বইয়ের ছবি থেকে উঠে এসেছে ওরা।

তবে এত আনন্দ কোলাহলের মধ্যেও একটা গোঙানির শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসছিল। অন্তত কোভালস্কী তা শুনতে পেয়েছে। তবে ইদানিং সাবিয়ার এই প্রায় নীরব কান্না তাকে তেমন বিচলিত করতে পারে না। এখন তার মনে হয় মাটির দেওয়ালের ওপাশে শুয়ে থাকা সাবিয়া যেন স্বয়ং যীশু। এ যাতনা যেন তাঁরই। তাই সাবিয়ার কান্না মনে হয় যেন প্রার্থনা। তবে একটাই প্রশ্ন প্রায়ই তাকে পীড়া দেয়। সে বুঝতে পারে না এই কিশোরের এতখানি আত্মত্যাগ কি অনিবার্য ছিল?

আল্লাহ্ আকবর! হে আল্লা তুমিই মহান!
পয়গম্বর মহম্মদ শান্তির দূত! তিনিই শান্তি!
সব পয়গম্বরই শান্তি,
নোয়া, আব্রাহাম, মোজেস, জেকেরিয়া এবং যীশু খ্রীষ্ট!

কোরানের বাণী সমবেতভাবে মাইক্রোফোনের সাহায্যে প্রচার করা হচ্ছে। জুম্মা মসজিদের প্রধান মোল্লাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরানের বাণী পাঠ করছে সবাই। আনন্দ নগরের প্রধান মসজিদ হলো জুম্মা মসজিদ। মসজিদের তোরণদ্বার জাফরি কাটা। মাথায় চার গম্বুজ। গম্বুজের শীর্ষদেশ মোমবাতির মত সরু। বস্তির মধ্যে এই মসজিদ-ভবনটিই সবচেয়ে উঁচু এবং পরিচ্ছন্ন। চারপাশে অনেকটা খোলা জায়গা। মসজিদের চত্বরের মধ্যে একটা পুকুর আছে। বস্তির মানুষ সেখানেই চান করে। ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করে পুকুরের জলে। মসজিদের চত্বরে অনেক ভক্ত এসেছে। সবাই খুশী। তাদের মাথার ওপর উড়ছে অর্ধচন্দ্র আঁকা ছোট ছোট নিশান। বাঁশের মাথায় সবুজ নিশানগুলির গায়ে কোরানের বাণী লেখা আছে। লেখা আছে মক্কা মদীনার পবিত্র মসজিদের গোলাকার গম্বুজের গায়ে খোদাই করা বাণীগুলো। আল্লাহ্ তাঁর এই বাণী পরম ঘনিষ্ঠদের জন্য প্রদান করেছেন, যাতে জ্যোতির পথটি খুঁজে পায় তারা। এই ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশের তাপী মানুষদের

জন্যেও আল্লাহ্ তাঁর আশ্বাসবাণী প্রদান করেছেন যাতে অন্ধকার থেকে তাদের উত্তরণ হয় এবং তারা উদ্ভাসিত হয়।

মিছিলের আগে আগে চলেছেন মাথায় সাদা সিল্কের কাপড় জড়ানো প্রধান মোল্লা। তাঁকে পথ দেখিয়ে চলেছেন দুজন পথপ্রদর্শক। মিছিলের সংগে আছে লাউডস্পিকার লাগানো সাইকেল রিক্সা। সমবেত প্রার্থনার সাহায্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগোল। প্রতি দুমিনিট অন্তর প্রধান মোল্লা দাঁড়াচ্ছেন। তারপর মাইকের সাহায্যে আল্লাহ্‌র মহান বাণী প্রচার করছেন। সমবেত ভক্ত-জনতা শিহরিত হচ্ছে তা শুনে। দেখতে দেখতে এই বর্ণময় শোভাযাত্রা ছড়িয়ে পড়লো বস্তির অলিগলিতে এবং তাঁর প্রতি অবিচল ধর্মবিশ্বাসে অনুরণিত হলো বস্তির আকাশ বাতাস। আনন্দমুখর এই দিনটিতে ঈশ্বরের বাণী যেন উদ্দীপ্ত করছিল বস্তির মানুষদের।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে কোভালস্কী এই বর্ণাঢ্য মিছিল দেখছে। দেখতে দেখতে তার মনে হলো এই কদাকার পরিবেশে কোথায় লুকিয়ে ছিল এত সৌন্দর্য? সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। রঙবেরঙের শালোয়ার আর ঘাগরা পরে কচি কচি মেয়েগুলো প্রজাপতির মত নাচতে নাচতে চলেছে। তাদের চোখের দৃষ্টিতে মাখামাখি হয়ে আছে বিস্ময় আর মুগ্ধতা। ছেলেরা পরেছে জরিদার কুর্তা। মাথায় পরেছে কাজ করা টুপি। বর্ণের এই সমাহার দৃষ্টিকে সম্মোহিত করছিল। মিছিলের সংগে সংগে মেহবুবও চলেছে। কোভালস্কী চিনতে পারলো তাকে। তার হাতে উঁচু একটা ধ্বজদন্ড। দন্ডটি লাল এবং সবুজ কাপড়ে মোড়া। মাথা উঁচু করে চলেছে মেহবুব। এই উৎসব তাকে অন্য মানুষ করে দিয়েছে যেন। খেতে না পাওয়া মানুষটা আর যেন নিজেকে বিড়ম্বিত মনে করছে না। সে হয়ে উঠেছে বীর এক সৈনিক। মিছিলের সংগে তার বড় ছেলে নাসীরও আছে। আছে নাসীরের ছোট বোনদুটি। সাবিয়ার বোনেদের সংগে তারা নাচতে নাচতে চলেছে। আনন্দে উচ্ছ্বাস আর রোদের তাপে ওদের কচি মুখগুলো লাল হয়ে উঠেছে। সবাই পরেছে ঝলমলে কাঁচের চুড়ি, চুমকি বসানো চটি আর পাতলা ফিনফিনে ওড়না। ওরা চলেছে গা ভাসিয়ে, যেন ডানা মেলে ভেসে যাচ্ছে খুশীর হাওয়ায়। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো কোভালস্কীর হৃদয়। অন্তর্যামীর কাছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে সে বলে উঠলো, 'হে করুণাময়! এ তোমার কী লীলা! এমন সর্বহারা শুকনো বুকের খাঁচায় এত প্রেম কি করে বেঁচে থাকে? তোমার ভালবাসার এই শক্তি কোথা থেকে এরা সংগ্রহ করলো?' তখন আল্লাহ্‌র নামে সমবেত জয়ধ্বনিতে ভরে উঠেছে আনন্দ নগরের আকাশ।

ঠিক এই আত্মবিস্মৃত মুহূর্তটিতে কোভালস্কীর মনে হলো কেউ যেন তাকে ডাকছে। চেয়ে দেখলো সাবিয়ার মা। কোভালস্কী তাকাতেই কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। 'স্তেফানদাদা! একটিবার সাবিয়াকে দেখে যান। আপনাকে বড় ভালবাসতো সে। আল্লাহ্ আপনার ভাল করবেন।' স্তব্ধ স্তেফান শুনলো যে সাবিয়া আর ইহলোকে নেই। আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দিয়েছেন। মিছিলটা যখন ওদের দরজার কাছ দিয়ে যাচ্ছে, তখনই ছোট্ট সাবিয়াকে কোলে তুলে নিলেন আল্লাহ্। তার সব যাতনার অবসান হলো।

সাবিয়ার মার কথা ভাবছিল কোভালস্কী। কি অসাধারণ এই মহিলার সংযম! দেখে শেখবার মত। এত দীর্ঘ দিনের পরীক্ষার কালটি কেমন হাসিমুখে পার করে

দিয়ে গেল সে। দুশ্চিন্তার এতটুকু কালো ছাপ মহিলার মুখে দেখে নি সে কোন-দিন। অথচ সবই করেছে। সংসার সামলেছে, রাস্তার বসে ঠোঙা বানিয়েছে, বর্ষায় জলকাদা মাড়িয়ে বালতি বালতি জল বয়ে এনেছে। আবার রুগীর পাশে বসে আল্লাহ্‌র নাম 'তসবী' করেছে। কিন্তু কখনও মুখের হাসিটি ম্লান হয় নি। দেখে মনে হয়েছে যেন মন্দিরে অধিষ্ঠিতা পাথরের দেবী মূর্তি। কোভালস্কী মনে মনে বলে উঠলো, 'যখনই মহিলাকে দেখেছি, তখনই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি কারণ এমন পরিবেশে তিনি এই আশার আলোটি সর্বক্ষণের জন্য জ্বালিয়ে রেখেছেন।' কখনও হাল ছেড়ে দেয় নি মহিলা। সিংহীর তেজ আর সাহস দিয়ে এতকাল সে লড়াই করে এসেছে। দিনের পর দিন নিজেকে বঞ্চিত করেছে। রোগীর ওষুধ আর পথ্য যোগাড় করেছে গয়না বন্ধক রেখে। রোগের দাপটে সাবিয়া যখন কাতর হয়ে কেঁদেছে, তখন অবিচলিত মনে আল্লাহ্‌র নাম জপ করেছে। পাশের ঘরে জেগে থাকা কোভালস্কী শুনেছে সেই প্রার্থনা। যেমন ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয় নি, তেমনি আল্লাহ্‌র কাছে দুর্ভাগ্যের কথা বলে নালিশও করে নি। কোভালস্কীর মনে হলো যেন প্রেম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের মন্ত্রটি সে যথার্থ শিখতে পেরেছে এই নিরক্ষর, দরিদ্র মহিলাটির কাছে।

সাবিয়াদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথাগুলোই ভাবছিল কোভালস্কী। ওকে দেখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা ভিতরে যাবার রাস্তা করে দিল। কিশোর সাবিয়া শুয়ে আছে শয্যার ওপর। শরীরটা সাদা চাদরে ঢাকা। বুকের ওপর পড়ে আছে হলুদ গাঁদার মালা। তার চোখ দুটি বোজা। মুখের কোথাও যন্ত্রণার প্রকাশ নেই। কোভালস্কী তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সাবিয়ার কপালে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিল, তারপর ফিসফিস করে বললো, 'বিদায়, আমার মহান ছোট্ট ভাইটি!' খানিক পরেই ওরা কাঁধে করে সাবিয়ার মৃতদেহটা নিয়ে চললো কবরখানার দিকে। এই শেষযাত্রায় স্তেফানও সঙ্গী হলো। চারপাশে সবাই তখন আমোদ উৎসবে মেতে আছে। তাই বেশী লোক হলো না তার এই শেষযাত্রার সময়। মোটকথা, আনন্দ নগরের দৈনন্দিন জীবনে জন্মমৃত্যুর মত স্বাভাবিক ঘটনা-গুলো আলাদা কোন মাত্রা যোগ করে না বলেই হয়ত সাবিয়ার মৃত্যুটা তেমন বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নি কারও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ নামক ঘোড়া
আগুন রথে জোড়া

চাব্বশ

হাসারি চুপ করে রিক্সাটার দিকে চেয়ে ছিল। তার মনে হলো সে যেন গজমুখ গণেশের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যিনি সিদ্ধিদাতা এবং গরিবের অভয়দাতা। যিনি বিঘ্ন নাশ করেন এবং ভক্তদের যিনি বাঞ্ছিত বস্তু দান করেন সেই গজানন যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। রিক্সার দণ্ডদুটির বদলে সে দেখলো গণেশের শুঁড়, চাকার বদলে তার মনে হলো সে দেখছে গণেশের লম্বকর্ণ। সুতরাং গণেশরূপী রিক্সার দিকে ভক্তি ভরে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল। তারপর হাতের আংটিটা শকটদণ্ড এবং চাকার গায়ে ছুঁইয়ে সে নিজের কপালে এবং বুকে ঠেকাল।

ফুটপাতের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা রিক্সাটা তার কাছে যেন ভগবানের আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। এটাই যেন তার লাঙল। এই শহুরে লাঙল চালিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে ছেলেমেয়েদের মুখে দুটি অন্ন তুলে দেবে। তবে বাহনটি নেহাৎই প্রাচীন এবং ঝরঝরে। এমনকি শহরের রাস্তায় চলবার লাইসেন্সও নেই। গাড়ির রঙ চটে গেছে অনেককাল। সীটের থেকে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। চাল টাঙাবার ফ্রেম থেকে লোহার আংটাগুলো ভেঙে পড়েছে। চাকার টায়ারে এত ফুটো যে তার ভিতর দিয়ে কাঠ দেখা যায়। যাত্রীর সীটের তলায় তালাবন্ধ একটা বাক্স থাকে। রিক্সাওলা তার যাবতীয় টুকিটাকি জিনিস সেখানে ভরসা করে রাখে। জিনিসগুলো দরকারি : যেমন গ্রীজের বোতল, চাকার বল্টু টাইট করার রেঞ্চ, একটা তেলের কুপি এবং বর্ষার সময় বৃষ্টির ছাট থেকে যাত্রীদের বাঁচাতে বা পর্দানশীন মুসলমান মহিলাদের আব্রু রক্ষা করতে কাপড়ের একটা পর্দা।

এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর হদিস সে আগেই জানতো। যেদিন তারা চোটখাওয়া লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেদিনই রাম তাকে এসব দেখিয়েছিল। কিন্তু হাসারির ডালা শূন্য। হয়ত এর আগের চালক যেদিন রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, সেদিনই ডালা খুলে এগুলো কেউ সরিয়ে নিয়েছে। সব শুনে রাম তাকে সাবধান করে দিয়েছে। শহরবাজার জায়গা। এখানে নিশ্বাসটাও চুরি হয়ে যায় এবং তেমন মানুষও নাকি শহরময় ছড়িয়ে আছে। সুতরাং সাবধান।

গাড়ির পিছনে একটা নম্বর লেখা আছে। নম্বরটা মনে মনে বারকয়েক আওড়ে সে প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছে। এটাই তার রক্ষাকবচ। এক নতুন কর্মোদ্যোগের দিগন্ত খুলে দিয়েছে তার সামনে। একের পাশে তিনটে নয় অর্থাৎ ১৯৯৯ হলো তার গাড়ির নম্বর। অদ্ভুত সংখ্যার নম্বরটা দেখে তার এত আনন্দ হলো যে মনেই হয় নি লাইসেন্সবিহীন গাড়ির মতন এটাও জাল। বরং সংখ্যাটা শুভ দেখে মনে মনে দারুণ খুশী হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত রিক্সাটার ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেল তার। রীতিমত ভক্তি-ভরে শকটদণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িটা তুললো সে। যেখানটা সে ধরে আছে, মাত্র একটা দিন আগেই সেই রঙচটা জায়গাটা ধরে রাস্তায় পথ চলতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল আগের রিক্সাওলা। নিশ্চয়ই ১৯৯৯ সংখ্যাটা সেই লোকটার জীবনে কোন সৌভাগ্য এনে দিতে পারেনি। তবে হাসারি জানে যে, সংখ্যাটি তার অদৃষ্টে অশুভ হবে না। সবে কয়েক পা গেছে অমনি শুরু হলো চাকার ক্যাঁচ-

কোঁচ শব্দ। আওয়াজটা তাকে যেন নতুন করে পুরনো জীবনের কথা মনে করিয়ে দিল। তার মনে হলো শব্দটা ঠিক যেন যাঁতার ধানভানার শব্দের মতন। তাই চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ কানে যেতেই হাসারির মন উধাও হয়ে গিয়েছিল যেন। তার পাখি-ছুট্ মন চলে গিয়েছিল গ্রামের সেই মধুর দিনগুলির মধ্যে। ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তা কি সে ভুলতে পারে? তাছাড়া দিনটা শুক্রবার। হপ্তার সেরা দিন এবং মাসেরও প্রথম। আয়পত্তর ভাল হয় এসব দিনে। হাসারি তাই মনে মনে খুব খুশী। মাসের পনেরো তারিখ থেকে বাবুদের পয়সার টানাটানি চলে। তখন মানুষ আর শৌখীন থাকে না। রিক্সাওলাদেরও পাওনা-গন্ডা কমে যায়। তখন সকলেরই শিবের ত্রিশূলের মত সঙ্গিন অবস্থা হয়। এই ব্যবসার অনেক ফন্দি-ফিকির তাকে শিখিয়ে দিয়েছে রাম। শুধু ব্যবসার ফিকির নয়। মানুষও চিনিয়ে দিয়েছে তাকে। কথায় কথায় রাম একদিন বললো, 'শুন্! শহরে দুইরকম মানুষ আচে। যেমন ভাল মানুষ আচে, তেমনি পাজি লচ্ছার মানুষও আচে। যারা পাজি তারা বুলবে ছুটো। দৌড় করাবে তোকে। তারা ঝগড়া করবে। ভাড়া নিয়ে মন্দ কত্তা বুলবে। কিন্তু যারা ভালমানুষ তারা তোমায় তাড়া দেবে না। যাবার সময় তারা দুটো বেশী পয়সা দিয়ে যাবে। তবে বিদেশী সওয়ারি পেলে বেশী ভাড়া চাইতে পারবি। তারা খুশী হয়ে সেটা দেবে।' রাম তাকে গুন্ডা-মাস্তানদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছে। ওরা রিক্সায় উঠে ভাড়া দেয় না। বেশ্যাদের মতন গুন্ডারাও হাতে লেখা চিরকুট দিয়ে বাড়ি পেঁৗছে দিতে বলে। আর বলেছে যেন রোজ রাত্রে সরষের তেল দিয়ে গা হাত পা মালিশ করে। প্রথম কয়েকটা দিন হাত পা উরুর ব্যথায় ছটফট করতে হবে তাকে। তখন মনে হবে পুলিসের হাতে বুঝি চোরের মার খেয়েছে সে।

এই অজানা অচেনা শহরে নিজেকে বড় একা মনে হলো তার। অদ্ভুত আকৃতির গাড়িটা নিয়ে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সে হাঁটছে। একথাটা মনে হতেই তার যেন ভয়ভয় করতে লাগলো। এত মানুষের ভিড় আর রাস্তার গোলকধাঁধার মধ্যে সে তার গন্তব্য কি করে খুঁজে পাবে? তার চারপাশে চলছে ট্রাম বাস মোটরের মিছিল। তাদের সমবেত গর্জন যেন প্লাবনের মতন আছড়ে পড়ছে তার ওপর। এরই মধ্যে পথ করে তাকে যেতে হবে। পারবে তো? হাসারি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

রামের কথা মতন প্রথম সওয়ারির জন্যে পার্ক সার্কাসের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল হাসারি। জায়গাটা খুব ব্যস্ত। যত লোকজন, তত গাড়িঘোড়া। কাছেই আনাজ তরকারির একটা বড় বাজার আছে। বড়লোকের বউ বিটিয়ারা সেখানে বাজার করতে যায়। তাছাড়া ইস্কুল আছে, ছোট ছোট কারখানা আছে। সারি দিয়ে রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকে এখানে। তাকে দেখে গাড়ির পা-দানিতে হাঁ করে বসে থাকা মানুষগুলো কেউ খুব খুশী হলো না। এই শহরে ভাতের এত অভাব, যে এক কণাও কেউ ছাড়তে চায় না। খাবার নতুন মুখ জুটলেই বিরক্ত হয় সবাই। এই মোড়ের রিক্সা-ওলারা প্রায় সবাই বিহারী। অনেকেরই বয়স কম। তবে যে ক'জন বেশি বয়সের মানুষ আছে, তাদের চোখের দৃষ্টি প্রায় নিভে গেছে। ফাটা ফতুয়ার তলা দিয়ে তাদের হাড় জিরজিরে বুকের পাঁজর গোনা যায়।

সেদিন খুব তাড়াতাড়ি লাইন ছোট হচ্ছিল। অর্থাৎ অপেক্ষার পালা তাড়াতাড়ি শেষ হবে। কিন্তু সময় যত এগোচ্ছে ততই যেন তার বুকের ধড়ফড়ানি বাড়ছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই পুরনো ঝরঝরে গাড়িখানা টেনে নিয়ে সে যেতে

পারবে তো? গাড়িঘোড়ার উন্মত্ত স্রোতের মধ্যে ডুবে যাবার আশঙ্কার কথা ভেবে শরীর হিম হয়ে গেছে তখন। কাহিল শরীরটাকে তাজা করতে পঁচিশ পয়সা দিয়ে সে এক গেলাস আখের রস কিনলো। আখমাড়াই এই যন্ত্রটা কিনে লোকটা দিব্যি ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছে। ওকে ঘিরে ভিড় লেগেই আছে। এক গেলাস আখের রস যেন ধন্বন্তরির মতন কাজ করে তাদের শরীরে। যারা খুব গরিব তারা দশ পয়সায় আখ কিনে চিবোয়। তাতে খিদেটা মরে। কিন্তু পুরো এক গেলাস সুধারস পান করার অর্থ হলো এক ট্যাঙ্ক পেট্রল ভরে নেওয়া। সুধারস পেটে পড়তেই যেন গরম একটা তেজী ভাব সড়সড় করে উরু বেয়ে নেবে গেল। তখন হাসারির মনে হচ্ছিল যেন ভাঙা গাড়িটা নিয়ে সে হিমালয় পাহাড়ের মাথায় চড়তে পারবে। খানিকক্ষণের জন্যে আনমনা হয়ে পড়েছিল হাসারি। মনে পড়ে যাচ্ছিল ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা যখন ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে মোষের পাল নিয়ে সে হেলেদুলে চলতো। এই স্বপ্ন দেখার মধ্যেই সে যেন একটা ডাক শুনতে পেল। 'রিক্সাওলা!' স্বপ্ন ভেঙে গেল হাসারির। তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো আহ্বানকারিণী একটি ষোল সতেরো বছরের মেয়ে। মাথার দুপাশে লম্বা বেণী দুলিয়ে তাকে ডাকছে। মেয়েটার পরনে সাদা জামা আর নেভি ব্লু স্কার্ট। নিশ্চয় কাছাকাছি কোন ইস্কুলের ছাত্রী। তার সামনে রিক্সাটা নিয়ে যেতেই মেয়েটা হুড়মুড় করে রিক্সায় উঠে বসলো, তারপর বললো, 'বাড়ি নিয়ে চলো!' কিন্তু কোথায় যেতে হবে? কোন রাস্তায় তার বাড়ি? হাসারির মুখচোখের অসহায় অবস্থাটা মেয়েটা যেন বুঝতে পেরেছে তখন। তাই রিক্সায় উঠে সে নিজেই রাস্তা দেখিয়ে তাকে নিয়ে চললো। হঠাৎ যাত্রী সমেত বড় রাস্তার অসংখ্য যানবাহনের মধ্যে পড়ে হাসারি যেন দিশা-হারা হয়ে গেছে তখন। তার মনে হলো সবাই বোধহয় ক্ষেপে গেছে। তার নিজের অবস্থা ডাঙায় বাঘ জলে কুমিরের মত। এদের এই ক্ষ্যাপামির নেতা হলো বাস লরির ড্রাইভারগুলো। অসহায় রিক্সাওলাদের ভয় দেখিয়ে যেন নিষ্ঠুর আনন্দ পেতেই ওরা অমনি ব্যাভার করছে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত সিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে তার দিকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গোঁয়ার হলো মিনিবাস আর ট্যাক্সিগাড়ির ড্রাই-ভারগুলো। 'আমার ত্যাখন এত ভয় ভয় করছিল যে পায়ে পায়ে হাঁটছিলাম। শুধু চেষ্টা করছিলাম যেন গাড়ি বেহাল না হয়, উল্টে না যায়। টক্কর খাওয়া রাস্তায় সমানভাবে ভারটা বজায় রাখা বড় শক্ত। এখানে ওখানে গর্ত, খানাখন্দ, খোলা ড্রেন, টেরাম গাড়ির লাইন—সব নিয়েই চলতি হবে তোমায়। কিন্তু গণেশঠাকুরের শুঁড় সব বিপত্তি কাটিয়ে আমায় নিয়ে গেল ঠিক জায়গায়। মেয়েটাকে নির্বিঘ্নে তার ঘরে পেঁছে দিয়ে মনে মনে খুব আনন্দ হলো সেদিন।'

'গাড়ি থেকে নেবে মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় কত দিতে হবে রিক্সা-ওলা?" কিন্তু আমার কোন ধারণাই নেই। তাই বললুম, "এজ্ঞে যা খুশী হয় দ্যান।" মেয়েটা হাতব্যাগ খুঁজে বললো, "তিনটে টাকা আছে। তাই নাও। যা ভাড়া তার চেয়ে বেশি দিলাম। তোমার দিনটা আজ ভাল যাবে।"

'ট্যাকা কটা হাতে নিয়ে মেয়েটারে পেরাণখুলে আশীর্বাদ করলুম। তারপর বুকের কাছের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলুম। হাত দিয়া খানিকক্ষণ ছুঁয়ে রইলুম সেখানে। বুকের কাছটিতে রেখেচি। কারণ এ আমার পেরাণের ধন। আমার গব্ব হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি এখুনে কলকেতার রিক্সাওলা। এই আমার পেরথম উপাজ্জন। ট্যাকা ক'টা ছুঁয়ে আমার মনের দুকূল ছাপিয়ে আশার ঢেউ উঠলো।

আমার পেত্যয় হলো অনেক খাটতে পারবো। অনেক রোজগার করতে পারবো। পক্ষীমাতা যেমন ছানাদের মুখে মুখে দানা ঢেলে দেয়, তেমনি আমিও ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন তুলে দেবো।'

'কিন্তু ত্যাখন আমার মনে অন্য ভাবনা। আমি ভাবলুম বউ ছেলেমেয়েদের জন্যি কিছু লয়ে যাই। আমার পেরথম উপাজ্জনের ট্যাকাটা আমার বউয়ের হাতে দিই। তাই গরম খাবার কিনে গাড়ি লয়ে ছুটলুম ফুটপাতের সংসারের দিকে। আমায় দেখে সবার কি আনন্দ! ততক্ষণে বাজির শব্দের মত ফুটপাতের সবাই জেনে গেচে। ফুটপাতের মানুষ আস্ত রিক্সাওলা হয়েছে তা দেখে সবাই খুশী। মেয়েরা এমনভাবে চেয়ে আচে, যেন আমি অর্জুনের মত মস্ত বীর। তাদের চোখে আমি যেন আদর্শ মনিষ্যি। যেন আমি প্রমাণ করেচি যে জীবনে হতাশ হতে নেই।'

সমাদরটা সত্যিই উদ্দীপ্ত করেছে হাসারিকে। তাই রিক্সা নিয়ে তখুনি বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। কিন্তু খানিকটা যেতেই দুজন মোটাসোটা গিন্নীবান্নী মহিলা তাকে হিন্দ্ সিনেমা নিয়ে যেতে বললো। তাদের গাড়িতে তুলেই হাসারির মনে হলো তার জরাজীর্ণ গাড়িখানা এই দুজনের ভারে খসে পড়বে। কোনরকমে চাকা দুটো একবার নড়াতে পারলো সে। কিন্তু একবার ঘোরার পরেই চাকার 'নাই' থেকে যেন কান্না বেরিয়ে এল। তার মনে হলো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে চাকা দুটো। ঝড়ের ঝাপটায় কচি ডাঁটা যেমন থরথর করে কাঁপে, তেমনি কেঁপে উঠলো তার রিক্সার হাতলদুটো। তখন কিছুতেই রিক্সার ভার বজায় রাখতে পারছিল না সে। তার মুখ-চোখের ভাব দেখে মহিলারা বোধহয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলো। তাড়াতাড়ি রিক্সা থামাতে বললো। তারপর আর একটা রিক্সায় গিয়ে বসলো। সওয়ারি নিয়ে সে লোকটা তখন টাট্টু ঘোড়ার মত কদম ফেলে ছুটে গেল তার সামনে দিয়ে। তাকে দেখে মনে হল যেন দুর্গা প্রতিমা নিয়ে সে গঙ্গার দিকে চলেছে। লোকটার এই তাচ্ছিল্য আর অপমান যেন কাঁটার মত তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেল। তার কেবলই মনে হতে লাগলো কিছু একটা করা দরকার। নইলে এ জ্বালা থেকে মুক্তি হবে না তার। কিন্তু কি করতে পারে সে? হঠাৎ তার মনে হলো এমন কি বিনা ভাড়ায় কাউকে তার রিক্সায় তুলে নেবে। সে যে অক্ষম নয় অন্তত সেটুকু বোঝাতে পারবে কলকাতা শহরটাকে।

সুযোগটা জুটে গেল পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে। কেক পেসট্রির দোকান থেকে বেরিয়ে দুটি ছেলেমেয়ে হাসারিকে হাত নেড়ে ডাকলো। দুজনের হাতেই আইস-ক্রিম। কাছে আসতেই কোন কথা না বলে ওরা রিক্সায় উঠে বসলো। তারপর সামনের পর্দাটা ফেলে দিতে বললো ছেলেটা। হাসারির পর্দা নেই। তাই ছাড়া-কাপড়টা পর্দার মত ব্যবহার করলো সে। রিক্সায় উঠে ওরা গন্তব্যস্থান বলে দেয় নি। ফলে এ গলি ও গলি ঘুরে উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিকটা চলার পর হাসারি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলো। ঠিক তখনই একটা ঝাঁকানি খেয়ে গাড়ির মুখ ঘুরে গেল। তখন কোনক্রমে গাড়ির টাল সামলে হাসারি অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়েছে। ব্যাপারটা তখনই স্পষ্ট হল তার কাছে। তার এই ভাঙা গাড়িখানা যে এমনভাবে প্রেমিকার রতি-মন্দিরে পরিণত হবে কে জানতো।

কলকাতা শহরটাকে আর যেন অসহ্য মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে না শহরটা অভি-শপ্ত। মনে মনে হাসারি তাই কৃতার্থ। কারণ এই ঘরছাড়া মানুষটাকে প্রথম দিনেই সতেরো টাকা উপার্জন করিয়েছে কলকাতা। তার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছে

কলকাতা। গণেশ ঠাকুরকেও মনে মনে গড় করলো হাসারি। পায়ে পায়ে বিপদের ফাঁদ পাতা আছে এই শহরে। তিনিই রক্ষা করেছেন তার গাড়িখানা। যাহক, তার প্রথম দিনের রোজগার থেকে খানিকটা জমিয়ে এবার সে দরকার জিনসগুলো কিনবে। সব বৃত্তির মানুষেরই কর্মযন্ত্র লাগে। চাষার যেমন কাস্তে আর লাঙল আছে, তেমনি রিক্সাওলার দরকার হয় ঘণ্টির। সে স্থির করেছে যে এটাই সে আগে কিনবে।

রিক্সাওলার জীবনে এই ঘণ্টির আবশ্যকতা অনিবার্য। ডানহাতের তর্জনীতে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে ঘণ্টিটা। সেটা দিয়ে শকটদণ্ডে আঘাত করলে যে মধুর শব্দ হয়, তাতেই আকৃষ্ট হয় কলকাতার সওয়ারিরা। বস্তুত; ঘণ্টির টুংটাং মিষ্টি শব্দ না শুনলে কেউ ফিরেও তাকায় না রিক্সার দিকে। ঘণ্টির ঢপ ভিন্ন ভিন্ন। তাদের দামেও তাই তারতম্য আছে। যেগুলো পেটা লোহা দিয়ে তৈরি তার দাম কম। আবার যেসব ঘণ্টি তামার তৈরি তার দাম বেশী। একটু মাজলে ঘষলে বৃহস্পতি নক্ষত্রের মত ঝকঝক করে। কোন ঘণ্টির শব্দ পাখির ডাকের মত। পুকুরের ধারে বসা শিকারী বকের ডাকের মত। কোন শব্দ কর্কশ। তাড়া করা মাছরাঙার ডাকের মত তীক্ষ্ন। পার্ক সার্কাসের একজন রিক্সাওলার কাছে অনেক রকম ঘণ্টি পাওয়া যায়। তার কাছ থেকেই হাসারি প্রথম যে ঘণ্টিটা কিনলো তার দাম দুটাকা। ঘণ্টির সঙ্গে চামড়ার একটা সরু ফালি আছে। তর্জনীতে চামড়ার ফালিটা বাঁধার পর তার মনে নব উদ্যমের উদয় হলো যেন। তার মনে হলো এটাই তার আরব্ধ কর্ম। কর্মের এই মাহাত্ম্য সে কেমন করে অস্বীকার করতে পারে?

কিন্তু মোহ ভাঙতে বেশি দেরি হলো না। পরদিন সকালে উঠেই সে টের পেয়ে গেল এর মাহাত্ম্যটি কোথায়। ঘুম ভাঙার পর হাসারির মনে হচ্ছিল যেন হাত, পা, কোমর, হাঁটু, ঘাড়, গর্দান সব জড় হয়ে গেছে। দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারছে না সে। তার মনে হলো যেন সারা রাত সে চোরের মার খেয়েছে। রাম আগেই তাকে বলে দিয়েছিল। আগেভাগে সাবধান করে বলেছিল, 'মনে ভাবিস না যে একদিনেই তুই ঘোড়া হয়ে যাবি। অনেক তপিস্যে করলে তবেই মানুষ সাত্থক ঘোড়া হয়। দিনের পর দিন গাড়ি টানতে হবে, ঝাঁকুনি খেতে হবে, বাজিওলারা যেমন দড়ির খেলা দেখায়, তেমনি লাফালাফি করে গাড়িখানা সামলাতে হবে। তবে শরীল শক্ত হবে। আধপেটা খেয়ে কখনো না খেয়ে পাকিয়ে যাবে শরীল, তবে বুঝবি তোর ঘোড়া জন্ম সাত্থক হলো। শুধু চাষীর খাটুনিই সব লয় রে!'

তবে বৃথাই সে রামের উপদেশ শুনলো। সকালে উঠেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত সে সরষের তেল মালিশ করলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে বোধহয় হাওড়া ব্রিজের কুস্তির আখড়ায় লড়াই করতে যাচ্ছে। কিন্তু হা কপাল! রিক্সার ডাণ্ডা-দুটিও টেনে তোলার ক্ষমতা তার নেই। হাসারির তখন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে। সেই অবস্থায় গাড়িখানা বউয়ের জিম্মায় রেখে কোনরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে সে পাক সার্কাসের স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল। হাসারির মনে হচ্ছিল ধার কর্জ করে এবার তাকে ভাড়ার পাঁচটা টাকা সংগ্রহ করতে হবে। হয়ত কিছুই তার পেটে পড়বে না আজ। হয়ত মহাজনের কাছে হাতের আংটিটা বন্ধক রাখতে হবে। আরও কত কি সে ভাবছিল। অথচ এটা তার কাছে বাঁচা-মরার লড়াই। হাজার হাজার বেকার মানুষ ওত পেতে বসে আছে। একবার হার মানলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গাড়িখানা গ্রাস করে নেবে।

পার্ক সার্কাস স্ট্যান্ডে পেঁাছেই সে রামের দেখা পেল। রাম তখন পুলিসের ফাঁদ্ থেকে তার গাড়িখানা উদ্ধার করে এনেছে। হাসারিকে অমন কুঁজো হয়ে পা টেনে টেনে বুড়ো মানুষের মত হাঁটতে দেখে সে ঠাট্টা করে উঠলো। 'সবে তো কলির সন্দে। এখন আরও কত কি হবে। তিনটে মাস কাটবে না। তার মধ্যেই তোর থুথুর রঙ লাল হয়ে যাবে।' হাসারি স্তম্ভিত। সেদিনই সে প্রথম জানতে পারলো অমন হাসিখুশী প্রাণখোলা মানুষটা বুকের খাঁচায় এক কালব্যাধি পুষে রেখেছে। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে জেনেও হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

'ওষুধ খাও না?' হাসারি জিজ্ঞেস করলো।

রাম খানিক অবাক হয়ে চেয়ে রইলো হাসারির দিকে। তারপর বললো, 'ওষুধ? ঠাট্টা করচিস? ডাক্তারখানায় সকাল থেকে সন্দে পর্যন্ত কেমন রুগীর লাইন হয় দেখিস নি? তার চেয়ে নিজের ওষুধ নিজেই তোয়ের করে নিয়েচি।' হাসারি হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে রাম বললো, 'বুঝলি না? একখিলি পান।'

'পান?'

'হাঁ গো। পান খেয়ে লোক ঠকাই। নিজেও ঠকি। কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে না পানের পিক পড়ে বুঝি না। ত্যাখন মনটাও ঠান্ডা হয়।'

হাসারি হাঁ করে কথাটা শুনলো। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে অবাক হয়ে থাকতে দিল না রাম। ওরা তখন ঠিক করেছে যে হাসপাতালে পড়ে থাকা কুলিটাকে একবার দেখে আসবে। দিন দুই যেতে পারে নি। এর মধ্যে না জানি আরও কত কি ঘটে গেছে। কিন্তু হাসারি ত' এতটা পথ হাঁটতে পারবে না? তখন স্থির হলো সওয়ারি হয়ে হাসারি বসবে আর রাম তাকে টানবে। সে বড় মজাদার দৃশ্য। সবাই হেসে কুটিকুটি। যেন দারুণ উপভোগ্য একটা দৃশ্য দেখছে তারা।

হাসারির কাছেও অভিজ্ঞতাটা বিচিত্র লাগছে। এমনভাবে সওয়ারি হয়ে সে কখনো রিক্সায় ওঠে নি। যাত্রীর আসনে বসে থাকাটা আরও ভীতিকর। সবসময় মনে হচ্ছে বাস লরিগুলো যেন গাঁক গাঁক করে ছুটতে ছুটতে তার মুখখানা ঘষে নিয়ে যাবে। অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় বসে অনেক কিছু দেখতে পেল সে। তার মনে হলো ক্ষ্যাপা হাতীর মত ওরা যেন রাম আর তার গাড়িখানা পায়ের তলায় পিষে মারতে চাইছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে আঙুলের চাপে শরীরটাকে ঘুরিয়ে কোনরকমে নিজেকে বাঁচাচ্ছে রাম। এরই মধ্যে ডানদিকের গলি থেকে মালভর্তি একটা ঠেলা গাড়ি বুনো মোষের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো রিক্সার সামনে। গতির ঝোঁকটা থামাবার কোনরকম ব্যবস্থাই নেই। অথচ কি বিস্ময়কর তৎপরতার সঙ্গে হাত বদল করে শকট দণ্ডদুটো চেপে ধরলো রাম। গাড়ির সব ভার চলে গেল চাকার ওপর। রামকে তখন সার্থক নৃত্য শিল্পী বলে মনে হচ্ছিল হাসারির।

হাসপাতালে পেঁাছবার দীর্ঘ রাস্তাটা মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ। পথরোধ করে হাজার হাজার মানুষ চলেছে চিৎকার করে দাবি জানাতে জানাতে। মিছিল যেন শহরের অলঙ্কার। হাসারিও এরমধ্যে অনেক মিছিল দেখেছে। গ্রামে এমন মিছিল হয় না। বোধহয় নালিশ শোনার লোক নেই তাই। কার কাছেই বা নালিশ করবে তারা? সময়ে বর্ষা না হলে সে দায় ত' আকাশের! শহরে সরকার আছে, কর্তৃপক্ষ আছে, তাই মানুষের অসন্তোষের কথাও তাদের শুনতে হয়।

হাসপাতালে ঢোকার আগে বাজার থেকে ফল কিনলো হাসারি। একটা আনারসও কিনলো সে। ফলওলাকে দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে চেরা চেরা ক'রে কাটিয়ে নিল

আনারসটা। হাসারি ভাবলো সবাই মিলে আনারসটা খাবে।

সেদিনও হাসপাতালে থরে থরে মানুষ। রাম প্রথমে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে তার রিক্সাটা চেন দিয়ে বাঁধলো। তারপর রিক্সার ডালার ভেতর থেকে জিনিসপত্র-গুলো বার করে নিল। এবার ওরা ওয়ার্ডে গেল। দরজার মুখে আগের দিনের লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে ওরা নির্বিঘ্নে ভেতরে ঢুকে গেল। সেই কটু গন্ধটা আজও আছে। গলা বুজে আসে গন্ধটা নাকে গেলে। দুসারি বেড। মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ চলে গেছে জানলা পর্যন্ত। রাম আগে আগে চলেছে। পিছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে হাসারি। একেবারে শেষ প্রান্তে ওদের বন্ধুর বেড। তার পাশের বেডটায় সেই পুড়ে যাওয়া ছেলেটা আছে। এই ছেলে-টিকেই কমলালেবু খাইয়েছিল ওরা। কিন্তু সেই মানুষটা কোথায়? অনেকটা এগিয়ে ছিল রাম। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো, 'মানুষটা তো নেই গো!'

সত্যিই তাই। মানুষটা নেই। কিন্তু বেড শূন্য পড়ে নেই। আপাদমস্তক ব্যান্ডেজ বাঁধা আর একজন রুগী শুয়ে আছে সেই বেডে। তার চিবুকের ওপর ছাগ দাড়ি দেখে বোঝা গেল যে লোকটা মুসলমান। সে কিছুতেই বলতে পারলো না তাদের বন্ধুর কথা। কেউ-ই বলতে পারলো না। হয়ত তাকে ছেড়ে দিয়েছে বা অন্য ওয়ার্ডে বদলি করেছে। মানুষটাকে অনেক খুঁজলো ওরা। অপারেশন থিয়েটারের লাগোয়া ঘরেও উঁকিঝুঁকি দিল। কিন্তু কোন পাত্তাই পেল না তার।

কিছুটা নিরাশ হয়ে যখন ফিরছে তখন হঠাৎ দেখলো দুজন নার্স একটা স্ট্রে-চারে তাদের বন্ধুকে নিয়ে আসছে। মানুষটার চোখ দুটো ঘোলা। শুকনো পাণ্ডুর গাল ঢুকে গেছে কোথায়। ঠোঁটটা ফাঁক করা। মনে হলো কিছু বোধহয় বলতে চাইছে তাদের। কিন্তু বলা না বলার অনেক ওপরে চলে গেছে সে এখন। হাসারির মনে হলো পরের জন্মেও কি ঠেলাগাড়ি জুটবে তার কপালে, নাকি সর্দারজীর মত ট্যাক্সি চালক হবে?

রাম জানতে চাইল কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা তাকে। যে লোকটির বয়স বেশী সে বললো, 'গরিব মানুষ। কেউ কোথাও নেই ওর। তাই গঙ্গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

পঁচিশ

ছোট্ট সাবিয়া চলে যাবার পর থেকেই কোভালস্কী সম্বন্ধে সবার মনোভাব যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। সেই ছাড়াছাড়া ভাবখানা নেই। এমনকি যারা সবথেকে বেশী সন্দেহ করতো, তারাও ইদানিং তাকে ডেকে ডেকে সেলাম জানাচ্ছে। ছেলেদের মধ্যেই তাকে নিয়ে মাতামাতিটা যেন বেশী। কে তার বালতিটা কলতলা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত ওদের মধ্যে।

যেটুকু ফাঁক ছিল তাও জোড়া লাগলো একটা ঘটনায়। বছর পনেরো বয়সের কিশোরী বান্নুরা থাকে কয়েকটা ঘর পরে। একটা বিষাক্ত সংক্রমণে মেয়েটার দুটো চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। চোখ দুটোয় ঘা হয়ে পুঁজ জমেছে এবং সর্বক্ষণই যন্ত্রণা হয়। মেয়েটাও সবাইকে গালাগালি করে। অন্ধ হলেও মেয়েটা দেখতে সুশ্রী। তার লম্বাচুলের বেণী দেখলে মোঘল আমলের রাজকুমারীর ছবিটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। একদিন বান্নুর মা হাতজোড় করে এসে সামনে দাঁড়ালো। তারপর

অনুনয় করে বললো, 'ডাক্তারবাবু আমার মেয়েটার চোখদুটো সারিয়ে দাও বাবা!'
বেজায় মুশকিলে পড়লো স্তেফান। তার সঙ্গে কটাই বা ওষুধ থাকে। হঠাৎ গুরুতর কিছু ঘটলে যাতে প্রাথমিক চিকিৎসাটা করা যায়। তাছাড়া সে ডাক্তারও নয়। তাই পুরনো রোগের চিকিৎসা সে কি করে করবে? তার কাছে আছে গোটা-কয়েক এ্যাসপিরিনের বড়ি, কয়েকটা ব্যথানিবারক বড়ি আর ঘায়ে লাগাবার একটা মলমের টিউব। বান্নুর মার অনুরোধ এড়ানো গেল না। স্তেফান তখন মেয়েটার চোখের ঘায়ে একটু মলম লাগিয়ে দিল। অলৌকিক ব্যাপার। তিনদিনের মাথায় সংক্রমণ থেমে গেল এবং ঘা শুকোতে লাগলো। দিনসাতেক পর থেকেই বান্নু আগের মতই দেখতে লাগলো। খবরটা ছড়িয়ে পড়লো দাবানলের মত। রাতা-রাতি বিখ্যাত হয়ে গেল 'সায়েব ডাক্তার'।
এই ঘটনাটাই আনন্দ নগরের মানুষের বুকের কাছে এনে দিল স্তেফানকে। সে হয়ে উঠলো ওদের কাছের মানুষ। তবে শুধু পরিচিতি বা স্বীকৃতি নয়, সেই সঙ্গে খ্যাতিও পেল সে। বাজারে তার দুর্নাম রটে গেল যাদু ডাক্তার। যা না পেলেও তার চলতো। ফলে ৪৯ নম্বর নিজামুদ্দিন লেনের ঘরটার সামনে এখন রোজই রুগ্ন মানুষের ভিড় হচ্ছে। রোগের জ্বালায় অস্থির হয়ে সবাই আসছে যাদু ডাক্তারবাবুর কাছে। স্তেফানকে তাই বাধ্য হয়ে অন্য কিছু ওষুধও রাখতে হচ্ছে। ঘরটা হয়ে উঠেছে রুগী মানুষের ভরসার জায়গা। একদিন সকালে দুজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে একজন দাড়িওলা লোক এল। একমাথা চুল ছাইয়ের মত সাদা। একটা চেয়ারে বসিয়ে এনেছে তাকে। লোকটার পা নেই। হাতের আঙুলগুলো ক্ষয়ে গেছে। স্তেফান দেখেই বুঝলো যে লোকটার কুষ্ঠ হয়েছে। তবুও লোকটার মুখ যেন একটুও রোগপাণ্ডুর হয় নি। বরং তার মুখচোখ ঝলমল করছে দীপ্তিতে।
সে তাকাল স্তেফানের দিকে। তারপর বললো, 'স্তেফান দাদা! আমার নাম আনোয়ার। আমার খুব অসুখ। আমায় ভাল করে দিন।' বলতে বলতেই আনো-য়ারের চোখে পড়লো দেওয়ালে টাঙানো যীশুর ছবিখানার দিকে।
'উনি কে?' আনোয়ারের চোখে বিস্ময়।
'উনি যীশুখ্রীষ্ট।'
আনোয়ারের যেন বিশ্বাস হলো না স্তেফানের কথা। বললো, 'হতেই পারে না। আমি যীশুর ছবি দেখেছি। ওঁর চোখ বোজা কেন? উনি অমন দুঃখী কেন?'
স্তেফান জানে এ দেশের বইতে যীশুর যে অজস্র রঙিন ছবি ছাপা হয় সেখানে যীশুর চেহারাটা ঠিক যেন হিন্দু দেবদেবীর মত ঝলমলে আর দৃষ্টিনন্দন। তার চোখদুটি নীল। মুখখানি ঢলঢলে। আনোয়ারের দিকে চেয়ে স্তেফান বললো, 'উনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন তাই মুখখানা দুঃখী দুঃখী।' তখন বিদেশী স্তেফানের মনে হলো আনোয়ারকে আরও কিছু বলা দরকার, নইলে ওর মনের সংশয় কাটবে না। স্তেফান তখন গভীরভাবে আনোয়ারের দিকে চেয়ে বললো, 'উনি চোখ বুজেই আমাদের আরও ভাল করে দেখতে পান। আমরাও নির্ভয়ে ওঁর দিকে তাকাতে পারি। ওঁর চোখ খোলা থাকলে আমাদের তাকাতে ভয় করতো। আমাদের চোখে যে পাপ আছে! আমাদের মনও নিষ্পাপ নয়। তাই আমাদের সুবিধের জন্যে উনি চোখ বুজে আছেন যাতে আমরা সবাই নির্ভয়ে প্রাণভরে তাঁকে দেখি। ওঁর বোজা চোখ দেখে আমরাও তখন নয়ন মুদে অন্তরের দিকে তাকাই। মনের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজি। তখন সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বিশেষ তাদের যারা কষ্ট পায়,

যাতনা সয় তাঁর মত। তোমাকেও আমি ভালবাসি আনোয়ার, কারণ তুমিও যে তাঁর মত কষ্ট পাচ্ছ।'

ছেঁড়া জামা গায়ে দেওয়া একটা ছোট্ট মেয়ে লুকিয়েছিল আনোয়ারের চেয়ারের পেছনে। সে ছুটে এসে ছবির গায়ে একটা চুমু খেল। তারপর তার ছোট ছোট হাতটি ছবির গায়ে বুলিয়ে বললো, 'কি কষ্ট ওঁর! আহা!' আনোয়ারও তখন যেন অভিভূত। কালো চোখ দুটো চকচক করছিল তার।

স্তেফান কোভালস্কী আরও বললো, 'হ্যাঁ, খুব কষ্ট তাঁর। কিন্তু তিনি চান না আমরা তাঁর জন্যে কাঁদি। বরং আমরা যেন তাদের জন্যে কাঁদি যারা এখনও কষ্ট পাচ্ছে। প্রতিদিন কষ্ট পাচ্ছে। কারণ তিনিও তাদের মতই কষ্ট পাচ্ছেন, যাতনা সইছেন প্রতিদিন। সংসারে যারা একা, যাদের সবাই ছেড়ে গেছে, যাদের সবাই ঘৃণা করে, যারা রোগযাতনায় ক্লিষ্ট, তাদের সকলের মধ্যেই তিনি আছেন এবং সকলের কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন।' খানিক থেমে কোভালস্কী বললো, 'তাই আমি এই ছবিটা ভালবাসি। যখনই ছবির দিকে তাকাই এইসব কথাগুলো আমার মনে পড়ে যায়।'

আনোয়ার গভীরভাবে স্তেফানের কথা শুনছিল। এখন ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো, 'ঠিক বলেছ স্তেফান দাদা। যে ছবিগুলো দেখি তার চেয়েও যীশুর এই ছবিটা সুন্দর।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ডায়েরির পাতা খুলে স্তেফান লিখলো, 'আনন্দ নগরের যীশু, তুমি সত্যিই মহান সুন্দর! যেমন সুন্দর ওই বিকলাঙ্গ, খঞ্জ আনোয়ার। ওর সারা গায়ে ঘা কিন্তু মুখের হাসিটা কি নির্মল সুন্দর। ওর মধ্যেই আমি তোমায় নতুন করে খুঁজে পেলাম, কারণ সংসারের সব মানুষের কষ্ট আর যাতনা তুমি নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে। তুমি জীবন দিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। তোমার গা দিয়ে শোনিত ঝরেছে। তুমি জানো শয়তানের প্রলোভনের হাত-ছানি পেলে মানুষ কত তুচ্ছ হয়ে যায়। ঈশ্বর তখন তাকে ত্যাগ করেন তখন সংসারে সে একা, সঙ্গীহীন। সে ক্ষুধার্ত হলেও অন্ন পায় না, তৃষ্ণার্ত হলেও কেউ তার তৃষ্ণা মেটায় না।

'হে আনন্দ নগরের যীশু, তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই কুষ্ঠরোগীর সেবার ভার আমি নেব। আমি প্রতিদিন দুঃস্থের সেবার ভার নিই। চেষ্টা করি তাদের কষ্টের ভাগ নিতে। যারা নিয়ত পিষ্ট হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, তাদের কাছে নিচু হয়ে থাকি। তাদের সমব্যথী হই। তবে আমিও নিষ্পাপ সাধু নই। আমিও সামান্য তুচ্ছ মানুষ। ভালমন্দ নিয়েই আমি একজন। তাই বস্তিবাসী গরিব মানুষদের মত আমিও কষ্ট পাই, পীড়িত হই। কিন্তু যে ধ্রুবইচ্ছা আমায় সর্বক্ষণ আড়াল করে রাখে, তা তোমার প্রেম। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস, করুণা করো। আমি এও স্থির জানি যে আমার অন্তর্লোকের আনন্দময় সত্তাটি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, কারণ এই নোংরা বস্তির জীবনযাপনের মধ্যেও তুমি চিরসত্য হয়ে বিরাজ করছো।'

যে লোকটা সেদিন সকালে হাসারির রিক্সায় উঠলো তাকে দেখেই মনটা বিগড়ে গেল হাসারির। লোকটার বেঁটে মোটা আঙুলে অনেকগুলো আংটি, গন্ধ-তেল মাখা একমাথা চকচকে চুল আর থলথলে ভুঁড়ির ওপর আঁটসাঁট জামা। তার স্বভাবটাও চড়া। অত্যন্ত বদমেজাজি সে। তবে মুখের ওপর 'না' বলা গেল না, কারণ তখন তার খুবই টানাটানি চলছে। হাসারি দেখেই বুঝেছে যে লোকটা পয়সাওলা মারোয়াড়ী। সাধারণত ট্যাক্সি চড়েই এরা শহরময় গাড়িয়ে বেড়ায়। তাই রিক্সায় উঠেই ক্রমাগত তাড়া দিতে লাগলো। 'জলদি চালা!' শুধু তাই নয়। ছুঁচলো চপ্পল দিয়ে সে অনবরত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল হাসারির পাঁজরে।

লোকটা একবারও বলে নি কোথায় যাবে। শুধু গাড়িতে উঠেই বললো, 'সিধা চালা! জলদি!' হাসারি যেন তার কেনা গোলাম বা পোষা ঘোড়া, তাই কখনো ডাইনে বাঁয়ে, কখনো সিধে, এইভাবে ধমক দিয়ে হাসারিকে চালাতে লাগলো সে। আর তার ধমক খেয়ে হাসারিও যেন পাকা সার্কাস খেলোয়াড়ের মত, বাস লরির জটলার ভেতর দিয়ে তার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। বারবারই তাকে থামতে বলছে লোকটা; আবার তখনই হয়ত চলতে বলছে। এই টানাপোড়েনের কসরত যথেষ্ট কষ্টকর। হঠাৎ থামতে বললে পা এবং কোমরে ঝাঁকানি লাগে। লাগাম টানার মতন উল্টো দিকের টানে, সওয়ারি সমেত গাড়ির সমস্ত ভারটি বইতে হয় চালককে। অনুশীলনটা খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং ভয়াবহ রকমের যন্ত্রণাদায়ক। জানুর পেশী টানটান করে ভারটি নিতে হয়। হঠাৎ চলার অনুশীলনও সমান ভয়াবহ। তখন চাপ পড়ে কাঁধ ও হাতের ওপর। জরাজীর্ণ গাড়ি। জং ধরা লোহার খোপের মধ্যে কোনরকমে আটকে আছে যন্ত্রাংশগুলো। থামা বা চলার পুনরাবৃত্তি তেমন সইতে পারছে না বেচারা। কেঁপে উঠছে গাড়ির হাড়গোড়, সেই সঙ্গে চালকেরও। দুদিন ধরে শহরটা যেন গরমের আঁচে তেতে পুড়ে আছে। হয়ত সেই জন্যেই সকাল থেকেই বাস লরির ড্রাইভারদের মেজাজ চড়া। একটা বড় রাস্তার মোড়ে এক সর্দারজী ড্রাইভার তার ট্যাক্সির জানলা দিয়ে হাত বের করে খপ্ করে হাসারির রিক্সার হাতল ধরে এমন টান দিল যে, প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল হাসারি। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলো গাড়ির আরোহী আর পুলিসের হাতের লাঠি সপাং করে তার পিঠে পড়লো। তবুও তার রেহাই নেই। ট্রাম গাড়ির দরজার মুখে জট পাকিয়ে ঝুলছিল কয়েকটা উঠতি তরুণ। পাশ দিয়ে যাবার সময় চলন্ত ট্রাম থেকে কৌতুক করে তারা পটাপট চাঁটা মারলো হাসারির মাথায়। তাদের কাছে যা নিছক আমোদ সেটাই যেন নিষ্ঠুর অপমান হাসারির কাছে। হাসারির অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো এই অপমানে। অথচ প্রতিদানের কোন উপায় নেই। মুখ বুজে তাকে হজম করতে হলো এই অপমান।

সব দুঃখেরই শেষ আছে। সুতরাং হাসারিও একসময় মুক্তি পেল এই যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা থেকে। পার্ক স্ট্রীটের এক বিলাসী রেস্তোরাঁর সামনে হাসারিকে থামতে বললো লোকটা। সওয়ারি নামিয়ে হাসারি মরিয়া হয়ে পাঁচ টাকা ভাড়া চেয়ে বসলো। লোকটা ঠিক এমন একটা অবস্থার জন্যে তৈরি ছিল না। হাঁ করে এমন

ভাবে তাকিয়ে রইল যেন পেটে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে হাসারি তার টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু লোকটার এই ভাবান্তর এক মুহূর্তের। পরক্ষণেই রেগে চেঁচিয়ে উঠলো মোটাসোটা ধনী বাবু, 'কি বললি? ল্যাংড়া ঘোড়ার ভাড়া পাঁচ টাকা?' হাসারিও গোঁ ধরে বললো, 'হ্যাঁ বাবু, তাই।'

লোকটার হম্বিতম্বিতে ইতিমধ্যেই লোকজন জড়ো হয়েছে। আশপাশ থেকে প্রায় ডজনখানেক রিক্সাওলা ঘিরে ধরলো লোকটাকে। বেগতিক দেখে মোটা লোকটা আর অনর্থক গোলমাল করলো না। পকেট থেকে ব্যাগ বের করে সবুজ রঙের মচমচে তাজা পাঁচটাকার একটা নোট হাসারির হাতে দিল। হাসারির মনে পড়লো বাংলা প্রবাদের কথা, 'কুকুর চেঁচালে বাঘের থাবাও গুটিয়ে যায়।'

তা শহরটা যেন সত্যিই জঙ্গল। মানুষের জঙ্গল। এই জঙ্গলে নখ, দাঁত বের করে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরখাদক হিংস্র জানোয়ার। আছে বুনো হাতী, নরখাদক বাঘ, চিতা, হিংস্র সাপ আরও কত জন্তু। এই শহুরে জানোয়ারদের চিনতে হয়। নইলে এদের খপ্পরে পড়ে যাবে নিরীহ মানুষ। হাসারি একদিন পার্ক স্ট্রীটের এক নাইট ক্লাবের সামনে গাড়ি রেখে বসেছিল। এক শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে সরে যেতে বললো, কারণ সে তার গাড়িটা সেখানে রাখতে চায়। হাসারি প্রথমে না শোনার ভান করেছিল। লোকটা তখন রেগে এমন জোরে হর্ন বাজালো যে মনে হলো গাড়িখানা এখুনি তার ঘাড়ের ওপর তুলে দেবে লোকটা। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেল হাসারি। হাসারির ভুল। জঙ্গলের একটা আইন সে মানে নি। যে আইনে ট্যাক্সির জন্যে রিক্সাকে জায়গা ছেড়ে দিতে বলা আছে সেই আইনটা সে মানে নি।

রিক্সা টানার শারীরিক পরিশ্রমটাই হাসারির কাছে প্রধান নয়। গ্রামেও সে পরিশ্রমের কাজ করতো। স্থূলবপু সওয়ারি নিয়ে পার্ক স্ট্রীট থেকে বড়বাজার পর্যন্ত ছোটার সমান খাটুনি সে গ্রামেও খেটেছে। তবে সেখানে অবসর ছিল। দিবারাত্র তাকে মানুষ ঘোড়া হয়ে কদম ফেলে ছুটতে হতো না। এমন সময়ও ছিল যখন সে শুয়ে বসে কাটাতে পারতো। শহরের রিক্সাওলার জীবন হলো ক্রীতদাসের জীবন। সপ্তাহের প্রতিটি দিন এবং বছরের প্রতিটি সপ্তাহেই সে চিরদাস হয়ে এক চাকাতেই বাঁধা হয়ে গেছে।

কখনো কখনো গঙ্গার ওপারে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সে যাত্রী নিয়ে গেছে। ওদিকে মানুষটানা রিক্সার চল নেই। ওরা সাইকেল রিক্সা চালায়। হাসারির ধারণা ওই রিক্সা চালাতে মেহনৎ কম। রামকে সে কথা একবার বলেছিল হাসারি। ফুৎকারে তার কথা উড়িয়ে দিল রাম। বললো, 'তুর কোনো ধারণা নাই, তাই অমুন কতা বলচিস্। সাইকেলের উপর রোজ দশ-বারো ঘণ্টা বসে প্যাডেল করা যে কী কষ্ট, সেটি তুই জানিস না। গোড়ার দিকে তোর পাছাটি ভরে যাবে ঘায়ে। তারপর পায়ের ডিম এমন আটকে যাবে যে আর নাবানো যাবে না।'

পরে হাসারির মনে হয়েছিল রাম সত্যিই বিচক্ষণ মানুষ। সংসারে এমন মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। যারা কিছুতেই তৃপ্তি পায় না, অহরহ নালিশ করে, তাদের সে ঠিক বুঝিয়ে দেয় যে সংসারে তার চেয়েও মন্দভাগ্যের মানুষ আছে।

'মিলিয়ে নেবেন আমার কথাটা। আপনার হাড়মাংস কুরে কুরে খাবে এরা। আনন্দ নগরের কবরখানায় একজন সাদা চামড়ার মানুষ এসেছে থাকতে! যা কেউ শোনে নি. তাই হলো। এবার দেখবেন ওদের চাওয়ার বহর।'

কথাগুলো বলেছিল ফাদার কার্দিয়েরো। বাচ্চা কোলে নিয়ে এসেছে এক গরিব মা। বাচ্চাটার নাকি মেনিনজাইটিস হয়েছে। কোভালস্কীকে ওষুধ দিতে হবে। নিরুপায় কোভালস্কী ক'টা এ্যাসপিরিনের বড়ি মা'র হাতে দিল। তখনই তার মনে পড়লো ফাদার কার্দিয়েরোর কথাগুলো। সেই অন্ধ মেয়েটা সেরে ওঠার পর থেকেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে। সবাই জেনে গেছে যে সে শুধু পাদরী ডাক্তার নয় একজন দয়ালু মানুষও। ৪৯ নম্বর নিজামুদ্দিন লেনের 'ফাদার' যেন সান্টা ক্লজ। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চাহিদামতই যেন সে নিজেকে গড়ে নিয়েছে। সে যেন কল্পতরু। সকলের প্রতিই কৃপাপরবশ। সকলের কথা শোনে. সবাইকে আশ্বাস দেয়। কেউ ব্যর্থ বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায় না তার কাছ থেকে।

হঠাৎই যেন আনন্দ নগরের সমাজপটে একটা মর্যাদার আসন পেয়ে গেছে স্তেফান কোভালস্কী। শুধু খাতির সম্মান নয় আরও অনেক কিছু জুটতে লাগলো তার কপালে। যেখানে যেটি ভাল কাজ হয় তারই কৃতিত্ব পেতে লাগলো সে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আরও দশটা নলকূপ বসিয়ে গেল কিংবা শুরুতে শীতের কামড়টা সেবার নিষ্ঠুর হলো না এও যেন তারই কৃতিত্ব। ভারতীয় চরিত্রের একটা বিশেষত্ব হলো যে কারো না কারো কাছে ক্রমান্বয়ে অভাবের কথা বলে চলা। বলাবাহুল্য এ দেশের সমাজ কাঠামোর এটি এক প্রসাদগুণ। জাতিভেদ প্রথার দরুন সব গোষ্ঠীর মধ্যেই একজন বিশেষ মানুষ থাকে। সে হয় শিরোমণি এবং সকলের অবলম্বন। এই খোঁটাটি যদি ধরতে না পারা যায়. তাহলে কিছুই জুটবে না। কোন ইচ্ছাই পূরণ হবে না। হাসপাতাল, পুলিস. সরকারি অপিস- কেউ পাত্তা দেবে না তাকে। কিছুই সে জোটাতে পারবে না। আনন্দ নগরের হাজার হাজার বঞ্চিত মানুষের এই ভরসার জায়গাটি হলো স্তেফান কোভালস্কী নামের এই শ্বেতকায় বিদেশী। সাদা চামড়ার প্রসাদগুণে এদের সকলের 'একজন' হয়ে উঠেছে সে। যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন ঝোলানো মানুষটি যেন অসাধ্যসাধন করতে পারে। তার ঝোলার মধ্যে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ যে কোটিপতি ধনী ঘনশ্যামদাস বিড়লার চেয়েও বেশি তাতে কোন সন্দেহই থাকলো না বস্তির দরিদ্র মানুষগুলোর।

তবে মিথ্যে খাতিরের বোঝায় মাঝে মাঝে সে ক্লান্ত হয়ে উঠতো। সান্টা ক্লজ বা কল্পতরু সে হতে চায় নি। সে চেয়েছিল নিচুর সঙ্গে নিচুর মতন থাকতে। 'আমি চাইতাম অসহায় মানুষগুলো যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। যাতে তারা নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে না করে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা জয় করার মনোবল পায়।'

সেবার পুজোর কিছু আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা দলবল নিয়ে মার্গারেটা এসে হাজির। ওর সঙ্গে একজন হিন্দু স্বামী-স্ত্রী, একটি মুসলমান শ্রমিক আর একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খ্রীশ্চান। তবে দলের মধ্যে যে সবচেয়ে বিশিষ্ট, তার নাম বন্দনা।

বিশ-বাইশ বছরের একটি অসমীয়া তরুণী। প্রায় কপর্দকহীন ছ'টি মানুষ আত্ম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে কিছু একটা করতে চাইছে। উত্তম প্রস্তাব। হিন্দু দম্পতির পদবি ঘোষ। দুজনেই দেখতে সুন্দর। ব্যক্তিত্বও আছে চেহারায়। বউটির পরনে আটপৌরে লালপাড় সুতির শাড়ি। মাথায় ঘোমটা দেওয়া ঢলঢলে মুখখানি লাবণ্যময়। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কোভালস্কী মুগ্ধ। তার মনে হলো রেনেশাঁ আমলে আঁকা ম্যাডোনার ছবি দেখছে সে। তার নিবিড় চাহনির মধ্যে দীপ্তি আছে। তাতেই তেজী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। মেয়েটার নাম শান্তা। বাসন্তী গ্রামের এক গরিব চাষীর ঘরের মেয়ে। সেই-ই বড়। আরও সাত-আটটি ভাইবোন আছে তার। নিঃসম্বল বাপের অবস্থা প্রায় ভিখিরীর মত। ফলে অপোগণ্ডদের দুটো ভাতের সংস্থান করতে সে প্রায়ই জেলে নৌকায় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যেত। একবার সেইভাবে গেল আর ফিরলো না। সবাই বললো মানুষখেকোর পেটে গেছে শান্তার বাপ। প্রতি বছরেই এইভাবে তিনশ'র বেশি মধু সংগ্রহকারী বাঘের পেটে যায়। শান্তার সঙ্গে তার বরের দেখা হয় গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বরের নাম আশিস। ছাব্বিশ বছরের এই স্বাস্থ্যবান যুবকটিও বাসন্তীর এক ভূমিহীন চাষীর ছেলে।

স্তেফান শুনলো ওদের ভালবাসার বিয়ের গল্প। দেশাচার আর সংস্কার ভেঙে বিয়ে করেছে বলে গ্রামের সমাজ থেকে বিতাড়িত ওরা কলকাতায় এসেছে। টানা একটা বছর তাদের কেটেছে অনাহার ও অর্ধাহারে। তবে দুঃসময়টা বোধহয় প্রায় কাটিয়ে এনেছে তারা। প্রতিবন্ধীদের জন্যে মাদার টেরেসার তৈরি একটা ট্রেনিং স্কুলে সম্প্রতি কাজ পেয়েছে আশিস। শান্তাও ইতিমধ্যে হাওড়ার একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে গেছে। এখন ওদের মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থা। ওদের একটা বাচ্চাও হয়েছে এখন। আনন্দ নগরের হিন্দু পাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া করে ওরা আছে। স্বপ্নের এল্-ডোরাডোর দেশে যেন পৌঁছে গেছে ওরা। দুজনের নিয়মিত আয়ে ওদের সংসার চলে। এইভাবেই ভাগ্য গড়ে নিয়েছে এই ঘোষ দম্পতি। গড়েছে সুখের নীড়। এখন ওরা সমাজের বিশেষ অধিকারভোগী। তবুও যে কেন আর্ত অসহায়দের সেবা করতে চাইছে এটাই অবাক লাগলো স্তেফানের কাছে।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত একটা উৎকট বাড়াবাড়ি আছে ওই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নামে। ওর নাম অ্যারিস্টটল্ জন। ছোটখাট মানুষ। মুখখানায় সর্বক্ষণই দুঃখী দুঃখী ভাব। আজকের ভারতবর্ষের মূল স্রোত থেকে আলাদা হয়ে গেছে এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ। বিষণ্ণ ভাবটা সেইজন্যেই। দলের মুসলমানটির নাম সালাউদ্দীন। বয়স হয়েছে লোকটার। বাহান্ন বছরের চেহারায় লক্ষণীয় হলো গোঁফটি। মাথায় সে সর্বদাই টুপি পরে থাকে। এই বস্তির সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা সে। দেশভাগের তাণ্ডব থেকে কোনরকমে প্রাণটা বাঁচিয়ে এখানে এসেছে। সেই থেকে এখানেই থেকে গেছে।

সবাই মিলে কিছু একটা করতে চায় তারা। তা করার কাজ ত অনেক আছে। যেখানে সত্তর হাজার মানুষ শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে উদয়াস্ত জন্তুর মত খাটছে, যেখানে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরছে, সেখানে অনেক কিছুই করার আছে। অন্তত মানুষের গড় আয়ুটাকে চল্লিশ থেকে বাড়ানো যায়। একটা দাতব্য হাসপাতাল করা যায়, কুষ্ঠ বা রিকেট হওয়া ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার জন্যে একটা 'হোম' তৈরি করা যায়। অন্তঃসত্ত্বা মা আর বাচ্চাদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা করা যায়। আরও ক'টা নলকূপ আর জনতা পায়খানা বানানো দরকার। মোটকথা জরুরি

কাজের সংখ্যা অসংখ্য। তাই সব শোনার পর কোভালস্কী বললো, 'তাহলে এক কাজ করা যাক। সবাই মিলে আলাদা আলাদা ভাবে সমীক্ষা করুন এবং রিপোর্ট দিন। তখন বোঝা যাবে কোন কাজটা আমরা আগে ধরবো।'

তিনদিনের মধ্যেই ফলাফল এসে গেল। দেখা গেল যে, আনন্দ নগরের এতগুলো মানুষ মনেপ্রাণে যা চাইছে তা হাসপাতাল বা ওষুধ নয়। বাচ্চাদের রোগ অপুষ্ট শরীরও তাদের তেমন ভাবায় না। তাদের যা ভাবাচ্ছে তা হলো বাচ্চাদের অপুষ্ট মন। তাই সবাই চাইছে একটা পাঠশালা হ'ক। অন্তত কলকারখানা আর চায়ের দোকানে কাজ করা তাদের বাচ্চারা সেখানে গিয়ে একটু লিখতে পড়তে শিখুক।

মার্গারেটার ওপর ঘর খোঁজার ভার দিল কোভালস্কী। দুজন শিক্ষকের বেতনের ভার সে নিজে নিল। বস্তির মানুষের এই উদ্যোগ দেখে সে দারুণ খুশী। 'আমি পেরেছি লক্ষ্যে পৌঁছতে। আনন্দ নগরের ভাইদের আত্মপ্রতিষ্ঠার উৎসাহ দেখে আমার মনে হচ্ছে, এখন থেকে এরাই পারবে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে।' প্রথম পর্যায়ে আনন্দ নগরের মানুষদের মধ্যে এক নিবিড় সংযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা হলো যাতে সবাই সবার সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে পারে। একটা স্বেচ্ছাসেবকদল তৈরি করা হলো। এদের কাজ হলো রুগ্ন অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং চিকিৎসা করানো। কারণ হাসপাতাল নামক সরাইখানায় যেচে যাবার দুঃস্বপ্ন কেউ দেখে না।

মিটিং হতো ৪৯ নম্বর নিজামুদ্দিন লেনের ঘরে। সবারই অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল মিটিংয়ে। দিন-কয়েকের মধ্যেই একটা গুজব ছড়িলো পড়লো আনন্দ নগরে। সবাই তখন বলাবলি করছে গরিবের দুঃখকষ্ট শোনার লোক হয়েছে এতদিনে। ভাবনাটা এত বৈপ্লবিক যে সমিতির নামকরণ করে ফেললো স্তেফান। সেই সংগে আরও একটা সত্য প্রকাশিত হল যেন। অনেকেই উপলব্ধি করলো যে সমাজে তাদের চেয়েও বিপন্ন মানুষ আছে। কোভালস্কী নিয়ম করে দিল যে, প্রতিদিন সভা বসার আগে খ্রীস্টের উপদেশাবলীর কিছুটা পাঠ করতে হবে। বস্তির হতভাগ্য ছন্নছাড়া মানুষদের সংগে বাস করে স্তেফান কোভালস্কীর মনে হয়েছে যে খ্রীষ্ট ছাড়া আর কোন যুগাবতারের বাণী এদের মনের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান সব ধর্মবিশ্বাসী সৎ মানুষ তার ক্লেশময় জীবনের সংগে খ্রীস্টের বাণীগুলি মিলিয়ে নিতে পারে। উভয়ের মধ্যে এমন ঐক্যবন্ধন হয় যেন মনে হয় যে প্রেমময় যীশু দুহাত বাড়িয়ে তাদের বেদনার ভার লঘু করে দেবেন।

ঐক্যের এই বাণীটি সেই অসমীয়া মেয়েটি যত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিল তেমনটি বোধহয় আর কেউ পারে নি। প্রথম দেখার দিনেই কোভালস্কী মুগ্ধ হয়ে যায় মেয়েটিকে দেখে। লম্বা বেণী, চেরা চোখ আর গোলাপি দুটি গাল—ঠিক যেন চীনের পুতুলের মত দেখতে তাকে। নামটিও যেন এক পবিত্র মন্ত্র। বন্দনা। ধর্মে বৌদ্ধ হলেও খ্রীস্টের বাণী আর উপদেশগুলো যেন তার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। প্রেমই যে মুক্তির উপায় এবং ঈশ্বরলাভের পথ, সেই গভীর উপলব্ধিটি তার হয়েছে। তাই যখনই কেউ এসে তার দুঃখকষ্টের কথা বলে, তখনই যেন বন্দনার মুখখানা বেদনায় ম্লান হয়ে যায়। কোভালস্কী বুঝতে পারে মেয়েটা যেন সকলের বেদনার ভার নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিচ্ছে। তাই তার মুখখানি অমন বিষণ্ণ ম্লান।

তবে অন্যের ব্যাপারে যে মানুষটা এত অনুভূতিসম্পন্ন, সে কিন্তু তার নিজের সম্বন্ধে আশ্চর্যরকমের উদাস। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বিনয়ের সংগে এড়িয়ে

যায়। মুখখানা শাড়ির আঁচলে ঢেকে চোখদুটি লজ্জায় নামিয়ে নেয়। এর দরুন কোভালস্কীর কৌতূহল বেড়ে যেত। একদিন তার পীড়াপীড়িতে বন্দনা ছোট্ট করে বললো, 'কেন আপনি এত কথা জানতে চাইছেন? যীশুই ত' বলেছেন আমরা সবাই ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে এসেছি। তাহলে একজনের পরিচয় জানতে আপনার এই কৌতূহল কেন?'

তবুও কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যেটুকু খবর কোভালস্কী জেনেছে তা থেকে বুঝতে পারলো পাহাড়দেশের এই মেয়েটি, কেমন করে পাহাড় শৃঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে কলকাতার এক নোংরা বস্তির মলিন জীবনতরঙ্গে নিমজ্জিত হলো। কালিম্পং অঞ্চলে বন্দনার বাবা হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটুকরো জমি চাষ করতো। পাহাড়ের রুক্ষ গা থেকে চাষের এই জমিটুকু সে কোনক্রমে উদ্ধার করেছিল। কোনরকমে খেয়ে পরে ওদের সংসারটা চলতো এর আয় থেকে। কিন্তু এ সুখটুকুও বেশীদিন সইল না। কলকাতা থেকে বনের গাছ কাটতে এল লোভী কারবারীরা। তারা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যায় গাছ কাটতো। চা-পাতা চাষের জন্যে অনেক আগে থেকেই অঞ্চলটা জঙ্গল-শূন্য ছিল। এরা আসায়, যে ক'টি গাছ অবশিষ্ট ছিল, তাও রইল না। গাছগাছালির সংখ্যা কমতে লাগলো দ্রুত হারে। নতুন জমির খোঁজে চাষীরা অন্যত্র যেতে বাধ্য হল। তখন রীতিমত দুর্লভ হয়ে গেছে বনের গাছ। বনে প্রায়ই আগুন লাগতো এবং নতুন বনসম্পদ তৈরি না হওয়ার দরুন বর্ষার ধারাপ্রপাতে ভূমিক্ষয় হতে লাগলো। ভূমিক্ষয়ের এই অনিবার্যতা ঠেকাবার মত মহীরুহের আশ্রয় তখন মাটির নেই। গরু মোষ চরার জায়গারও অভাব দেখা দিয়েছে। অভাব দেখা দিয়েছে কৃষি জমির। জমির সার দ্রুত কমছে। জ্বালানির কাজে মানুষ তখন গোময় ব্যবহার করছে। কম হতে লাগলো জমির উৎপাদনের হার। এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো তখন। অবাধ নির্বনীকরণের দরুন বর্ষার জল ভূমির নিম্নস্তরে সঞ্চিত হতো না। মাটি শুকিয়ে যেতে লাগলো। নদী ঝরনা মজে গেল। আসাম অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এমনিতেই বেশী। তাই বর্ষার প্রবল ধারাপ্রবাহে ধুয়ে গেল কৃষি জমি এবং উদ্ভিদ সার। চাষোপযোগী মাটি ধুয়ে যাওয়ায় পড়ে থাকতো শুধু পাথর। ফলে বছর কয়েকের মধ্যেই সমস্ত অঞ্চলটা হয়ে উঠলো রুক্ষ শুষ্ক মরুময়। দলে দলে মানুষ বাস্তুচ্যুত হলো। সবাই তখন শহরে যেতে চাইল কারণ শহরের আগ্রাসী লোভই তাদের বাস্তুচ্যুত করেছে। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না তাদের।

বন্দনার বাবা সংসার পাতলো কলকাতায় এসে। বন্দনার তখন চার বছর বয়স। ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়র সুবাদে আনন্দ নগরে একখানা ঘরও পেল তারা। এর বছর পাঁচেক পরে যক্ষ্মারোগে মারা যায় বন্দনার বাবা। তার মা ছিল খুব নির্ভীক স্বভাবের মেয়ে। স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু তাকে একটুও বিহ্বল করতে পারে নি। বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক সহজিয়া সাধকের একখানা পুরনো কালো হয়ে যাওয়া ছবি সে তার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল। নিয়মিত ধূপধুনো দিত ছবিটায়। এর বছরখানেক পরে সে আবার বিয়ে করে। কিন্তু সে স্বামীর সঙ্গেও বেশীদিন ঘর করতে পারল না। স্বামীটা অন্যত্র চলে গেলে বন্দনার মা আবার ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতো। তখন খুব দুঃস্থ অবস্থা তার। রোজ দুবেলা জঞ্জাল ঘেঁটে ফেলে দেওয়া লোহা তামার জিনিসপত্র যোগাড় করতো এবং সেগুলো বেচে যা পেত তাই দিয়েই ছেলেমেয়ের ভাতের যোগাড় করতো।

বারো বছর বয়স থেকেই বন্দনা রোজগার করতে শুরু করে। কিছুদিন একটা

কার্ডবোর্ড কারখানায় কাজ করার পর সে স্পেয়ার পার্টস্ তৈরির কারখানায় কাজ পেল। তখন সেই-ই ছিল সংসারের অবলম্বন কারণ বন্দনার মায়েরও তখন যক্ষ্মা-রোগ হয়েছে। ভোর পাঁচটায় উঠে সংসারের কাজকর্ম সেরে সে কাজে যেত আর ফিরতো রাত করে। খানিকটা পায়ে হেঁটে খানিকটা বাসে চড়ে ঘরে ফিরতে রাত দশটা বেজে যেত। কখনো আবার সে ফিরতেও পারতো না। লোড শেডিং হলে মেশিনঘরে ঘুমিয়ে পড়তো। আলো জ্বলার পর মেশিন চালু হলে বাতিল হয়ে যাওয়া শ্রমঘণ্টা অতিরিক্ত খেটে তাকে পুষিয়ে দিতে হতো। কলকাতায় হাজারে হাজার শ্রমিক এইভাবে যন্ত্রের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে দিন কাটায়। অতিরিক্ত শ্রম দিয়ে বাতিল হওয়া সময় তাদের পুষিয়ে দিতে হয় আবশ্যিকভাবে। তখন তার মজুরীর হার দিন চারটাকা। এই সামান্য মজুরীর টাকা দিয়েই সে ঘরভাড়া দিত এবং সকলের দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতো। ছুটির দিনগুলোয় শুয়ে-বসে না কাটিয়ে বস্তির দুঃস্থ মানুষদের সেবা করার চেষ্টা করতো। বড় হয়েও অভ্যাসটা সে বদলায় নি। আর এইভাবেই একদিন সন্ধ্যেবেলায় মার্গারেটার সঙ্গে সে স্তেফান কোভালস্কীর ঘরে এসে পড়ে।

ইতিমধ্যে ইওরোপের অনেক সংস্থা থেকে কোভালস্কীর সমিতির জন্যে আর্থিক অনুদান আসতে শুরু করেছে। তাই কারখানার কাজ ছাড়িয়ে সমিতির কাজে বন্দনাকে পুরোপুরি লাগিয়ে দিল কোভালস্কী। বস্তির মানুষের সুখ-দুঃখ বা বিশ্বাস-অবিশ্বাস বন্দনার চেয়ে আর কে ভাল বুঝবে! শুধু সেই-ই যথার্থ বুঝতো তাদের ব্যথা-বেদনার কথা। মৃত্যুপথযাত্রীর স্বীকারোক্তি কি ভাবে শুনতে হয় তা যেমন সে জানতো, তেমনি জানতো মৃতের আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে বসে ঈশ্বরকে ডাকতে। কি ভাবে মৃতদেহ ধুয়েমুছে সাফ করতে হয়, কি করে শ্মশান যাত্রায় মৃতের শেষ সংগী হতে হয়, তাও সে জানতো। এসব কেউ তাকে শেখায় নি। তবুও সে জানতো তার সহজাত জ্ঞানবুদ্ধি আর মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়ে। মানুষের হৃদয়ের কথা বোঝবার এক অসাধারণ ক্ষমতা তার ছিল। তাই সব ঘরেই তার ঠাঁই হতো। সব মতের মানুষের সঙ্গে বসে সে আলাপ করতে পারতো। তার কোন ধর্মসংস্কার নেই, জাত-বেজাত বোধ নেই। এটা আরও লক্ষণীয় কারণ বন্দনা কুমারী। সাধারণত কুমারী মেয়ের পক্ষে এমনভাবে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানো এ দেশের সমাজ চিন্তায় অশোভন আচরণ। এতে সমাজে নিন্দে হয়। সধবা মেয়েরাও অনেক ক্ষেত্রে কুমারীদের পুরো-পুরি নির্ভর করতে পারে না। বিয়ের আগে মেয়েদের সাংসারিক অভিজ্ঞতা থাকা একটা নিন্দনীয় অপরাধ। বিয়ের সময় মেয়েদের সরল হৃদয় হতে হয়। নইলে কলঙ্ক রটে।

হপ্তায় অন্তত দু-তিনবার মুমূর্ষু রুগীদের নিয়ে বন্দনাকে হাসপাতালে যেতে হতো। রাস্তার গাড়িঘোড়ার উপদ্রব সামলে তাদের নিরাপদে হাসপাতাল চত্বরে পেঁছে দেওয়া যেন প্রায় অভিযানের সামিল। এর ওপর আছে হাসপাতালের নিজস্ব আইন-কানুনের বাধা। এ সব বাধা অতিক্রম করে কোন গরিব দুঃস্থ রুগীর পক্ষে পরীক্ষার জন্যে ডাক্তারের কাছে পেঁছনো মোটেই সহজ নয়। অবশ্য পেঁছলেও ডাক্তারকে তারা রোগবালাই বুঝিয়ে বলতে পারে না। ডাক্তারের নির্দেশও ঠিকমত বুঝতে পারে না। কারণ, ডাক্তারের অতি আধুনিক নাগরিক ভাষা এবং তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যোগাযোগ এত কম যে একজনের মনের ভাব আর একজনের হৃদয়দুয়ারে ঘা দেয় না। বন্দনাকে এ সব সামলাতে হয়। দোর ঠেলে ঘরে

ঢ়ুকে দাবি জানিয়ে কখনও বা ডাক্তারের সংগে মুখোমুখি কথা বলে, কখনও ঝগড়া করে সে তার আশ্রিত মানুষদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তাই কয়েক হপ্তার মধ্যেই বন্দনা হয়ে উঠলো সমিতির প্রধান অবলম্বন। সকলের দুঃখের কথাই সে মনে রাখতে পারতো। সবাই তাই লক্ষ্মীময়ী মেয়েটাকে কাছে পেতে চাইত। আনন্দ নগরে তার একটা ভালবাসার নাম হয়ে গেল। সকলের কাছে সে হয়ে উঠলো 'আনন্দ-নগর কা স্বরগদূত'।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় প্রায় তীরের মত স্তেফানের ঘরে ঢুকলো বন্দনা। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো যে বস্তির এক পোয়াতি মেয়ের গায়ে মারাত্মক এক চর্মরোগ চোখে পড়েছে হাসপাতালের ডাক্তারের। এর চিকিৎসার জন্যে যে সেরাম দরকার তা তৈরি হয় ইংল্যান্ডে। স্তেফানদাদা যেন খুব তাড়াতাড়ি ওষুধটা আনাবার ব্যবস্থা করে। অন্যথায় মেয়েটা হয়ত মরেই যাবে।

পরের দিন হাওড়া পোস্ট আপিস থেকে ফ্র্যাটারনিটি প্রধানের নামে একটা তার-বার্তা পাঠাল কোভালস্কী। তাতে লিখলো যেন তাঁরা লন্ডনে যোগাযোগ করে ওষুধটা পাঠান। স্তেফান কোভালস্কীর হাতযশ আর মেয়েটার ভাগ্য! অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল যেন। সাতদিনের মধ্যেই যন্ত্রণাহর ওষুধটি পেঁাছে গেল কলকাতায়। কাস্টমস আপিস থেকে স্তেফান নির্দেশ পেল যেন ওষুধের পারসেলটি সে আপিস থেকে সংগ্রহ করে নেয়। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের এমন তৎপর কাজের প্রমাণ পেয়ে কোভালস্কীও চমৎকৃত। শুরু হলো যেন এক মহাকাব্যের কাহিনী যা সে কখনও ভুলতে পারবে না।

আঠাশ

'মানুষটা রাস্তাতেই মরবে না কি?' ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিল হাসারি। চোখের সামনে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানছে রাম। ফুলে ফুলে উঠছে বুক। বুকের হাড়পাঁজরগুলো তখন যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখখানা পান্ডুর। জলে ডোবা প্রাণীর মতন খাবি খাচ্ছে সে। মাঝে একটা কাশির ধমক এল আর সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। তখন শরীরের ভেতর থেকে কি একটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। মনে হলো মুখ দিয়ে সেটা বেরিয়ে পড়বে। এক দলা লাল রঙের থুথু ফেললো রাম। একমুখ পান চিবোচ্ছে। তাই রক্ত না পানের পিক তা বুঝলো না হাসারি। ধীরে ধীরে এবার সে রামকে রিক্সায় বসিয়ে দিল। তাকে বাড়ি পেঁাছে দেবার কথায় রাম তাকে হাত নেড়ে বারণ করলো। বললো, 'এ্যাত কেনে ভাবচিস! শালা শীতের জন্যি এমনটি হয়েচে। শীত গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। বাংলাদেশের শীতের কামড়টা এবার খুব তীক্ষ্ণ। সর্বক্ষণ হু হু করে উত্তুরে বাতাস বইছে। তাপমাত্রা নেমে গেছে চোদ্দ ডিগ্রিতে। যে দেশের মানুষ বছরের আট মাস গরম তাওয়ায় সেঁকা হয়, তাদের কাছে এই শীতটা রীতি-মত মারাত্মক। প্রায় জমে যাবার অবস্থা হলো তাদের। শীতের সবচেয়ে নিষ্ঠুর শিকার হলো এইসব মানুষ নামক ঘোড়ারা। এতদিন তারা সারা শরীর ঘামে ভিজিয়ে শহরময় ছুটে বেড়াত। এখন তারা ঠান্ডায় চুপচাপ বসে লম্বা অপেক্ষার

প্রহর গোনে। অনভ্যাস্তরের এই ধাক্কা তাদের অপুষ্ট রুগ্ন শরীর সইতে পারে না। অনেকে মরেও যায়।

এই জঙ্গলের রাজত্বে রামই ছিল তার একমাত্র বন্ধুভাই। আর সবাই কারো না কারো শিকার। হাসারির কতদিন মনে পড়ে গেছে সেইসব দিনগুলোর কথা যখন এই নিষ্ঠুর শহরে সে একা। তখন রামই তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। সে তাকে বুক দিয়ে আড়াল করে রেখেছে। তার কৃপাতেই আজ সে শহরের রিক্সাচালক। তাই যেখানেই এই সাদা চুলের মানুষটাকে সে দেখেছে, সেখানেই তার পাশটিতে রিক্সা নামিয়ে বসেছে। পাশাপাশি বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও পার্ক সার্কাসের কোণে, কখনও ওয়েলেসলী স্ট্রীটের ওপর। গরমকালের দুপুরে লোয়ার সার্কুলার রোডের এয়ার কন্ডিশন্‌ড্‌ মার্কেটের কাছে তারা রিক্সা নিয়ে বসতো। যখনই দরজা ঠেলে লোকজন ঢুকতো বা বেরোত, তখনই ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে শরীরটা যেন জুড়িয়ে যেত। হাসারি জানতো যে হিমালয় পাহাড়ের মাথায় না উঠলে এই শীতল বাতাস পাওয়া যায় না। রাম অনেক সুখস্বপ্ন দেখতো। বলতো হাসারির কাছে বসে সব স্বপ্নের কথা। এবার সে গ্রামে ফিরে যাবে। ছোট্ট একটা মুদির দোকান খুলবে সেখানে। সারাদিন দোকানেই থাকবে, কোথাও যাবে না। পাগলের মতন ছুটে বেড়াবে না। সারাদিন বসে বসে কল্পনার স্বর্গের কথা বলতো। বলতো তার দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা। দোকান ভর্তি থাকবে চাল, ডাল, মসলা, আনাজে। তাকের ওপর থরে থরে সাজানো থাকবে সাবান, ধূপকাঠির প্যাকেট, বিস্কুটের টিন। আসলে সে ভবিষ্যতের একটা সুখের ছবি দেখতে চাইত, তখন সে-ই হবে সংসারের কর্তা। সংসারের যা কিছু হবে সব তাকে ঘিরে। সে হবে সংসারের পাকা মধ্যমণি।

তবে স্বপ্নকে সত্য করতে হলে মহাজনের কাছে দেওয়া অঙ্গীকারটি তাকে মানতে হবে। অন্তত তার বাপের শ্রাদ্ধের সময় যে টাকাটা সে কর্জ করেছিল, সেটুকু সুদেমূলে তাকে শুধে দিতে হবে। নইলে পৈত্রিক জমিটা চিরকালের মতন হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। টাকাটা সে অন্য এক মহাজনের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে। এদেশের গরিব চাষীরা এইভাবেই মহাজনের ঋণ শোধ করে এবং জমিরও হাতবদল হয়। শেষমেশ ঋণের টাকা সুদেমূলে বেড়ে যখন গলায় চেপে বসে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং জমিও হাতছাড়া হয়ে যায়। এবারের পুজোর আগেই মহাজনের সঙ্গে রামের চুক্তির পাঁচবছর শেষ হচ্ছে। তাই শরীর ভেঙে গেলেও উদয়াস্ত খেটে চলেছে রাম। মহাজনের দেনা শুধতেই হবে, নইলে পৈত্রিক জমি ওই সুদখোরের গর্ভে চলে যাবে। একদিন সকালে পার্ক স্ট্রীট ডাকঘরের সামনে রামকে দেখে চমকে উঠেছিল হাসারি। এ কি চেহারা হয়েছে তার? আগের সেই শক্ত বলিষ্ঠ মানুষটা নেই। এ যেন সেই মানুষটার ছায়া। ডাকঘরের ফুটপাতে বাবুকে দিয়ে মনিঅর্ডার লেখাচ্ছে রাম। তার হাতে একতাড়া নোট। এতটাকা সে কাকে পাঠাচ্ছে? হাসারি ঠাট্টা করে বলেছিল, 'রামদাদা! মনে হচ্চে তুমি ব্যাঙ্ক লুট করেচ। এত ট্যাকা কুথায় পাটাবে গো? হাসিখুশী রাম ঠাট্টাটা গায়ে মাখলো না। স্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঠাট্টা লয় রে! না খেয়ে না পরে ট্যাকাটা জমিয়েচি। এই মাসেই সব ট্যাকা শুধতে হবে। নইলে জমিটা গিলে নেবে মহাজন।' কথাটা ঠিক। নিজেকে বঞ্চিত করে মাসের সব রোজগারটাই সে জমিয়েছে। দুটো কি তিনটে সেঁকা রুটি আর এক কাপ চা বা এক ভাঁড় আখের রস, এই-ই ছিল তার দিনের খোরাক।

পড়শীদের ছোট ছেলেটাকে দৌড়ে আসতে দেখেই ব্যাপারটা যেন আন্দাজ করতে পারলো হাসারি। ততক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে গেছে সব রিক্সা স্ট্যান্ডে। দেখতে দেখতে জনা-তিরিশ লোক জড়ো হলো চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পিছনের চালাঘরে। এই টিনের চালাঘরেই রাম থাকতো। একটা তক্তার ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে রাম। দেখে মনে হয় ঘুমোচ্ছে। একমাথা শক্ত ঘন চুল যেন মাথায় জ্যোতির্মণ্ডলরূপে শোভা পাচ্ছে। চোখ দুটো আধখোলা। ঠোঁটের সেই চেনা দুষ্টুমির হাসিটা তেমনি অবিকল। মনে হয় এইমাত্র মজার কথাটা বলেছে। রামের সঙ্গে যে ছুতোর মিস্ত্রি থাকতো সে বললো যে ঘুমের মধ্যেই রামের মৃত্যু হয়েছে। তাই মুখের চেহারা অমন প্রশান্ত। আগের দিন রাত্রে বেশ কয়েকবার কাশির ধমক হয়েছিল। কাশতে কাশতে খানিকটা রক্তবমিও করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙে নি।

এবার মৃতদেহ সৎকার করতে হবে। শবদাহাদি চরম সংস্কার পালন করতে হবে। আলোচনান্তে স্থির হলো তিনচাকার টেম্পো ভাড়া করে নীমতলাঘাট মহাশ্মশানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হবে। কলকাতায় তিনচাকার টেম্পো ঘণ্টা পিছু তিরিশ টাকায় পাওয়া যায়। কেউ পাঁচ-দশ টাকা, কেউ বা বিশ-তিরিশ টাকা দিল। রামের কোমর খুঁজে আরও পঁচিশ টাকা বার করলো হাসারি। পড়শীরা সবাই তাকে ভালবাসতো। ওরাও কিছু কিছু দিল। অনেকগুলো বাচ্চা এসেছে রামকে দেখতে। রাম ওদের মজার মজার গল্প বলতো। তাই রামকে কেউ ভুলতে পারছে না যেন। রামের মৃতদেহটার দিকে চেয়ে ছিল হাসারি। মুখখানায় ছড়িয়ে আছে পরম একটা শান্তি। মৃত্যু যেন একটুও ম্লান করতে পারে নি তাকে। হয়ত ঠোঁট-চাপা ওই হাসিটাই এর কারণ! ইতিমধ্যে এক ভাঁড় করে চা খেয়ে নিয়েছে ওরা। সবাই খুব স্বাভাবিক। কোথাও বেদনার ছায়া নেই। সবাই কথা বলছে, হাসছে, যেন রাম জীবিত। তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে হাসারি বাজারে গেল। প্রথমে একটা টেম্পো ভাড়া করলো, তারপর মৃতসৎকারের জন্যে দরকারি জিনিসগুলো কিনলো। এক শিশি ঘি, একটা আতর, ধূপকাঠির প্যাকেট, খানিকটা সাদা থান, কয়েকগজ দড়ি, দুটো মালা, মাটির ঘট ইত্যাদি।

রামের কোন আত্মীয় এ শহরে নেই। ওরাই তার আত্মজন। সুতরাং শেষ-কৃত্যটুকু ওরাই সম্পন্ন করবে। রামের মৃতদেহটা পরিষ্কার করে পরনের জামাকাপড় খুলে থান কাপড়ে ঢেকে দিল মৃতদেহ। তারপর হরিবোল ধ্বনি দিয়ে রামের মর-দেহটা টেম্পোর ওপর তুললো। হাল্কা ফঙ্গবেনে শরীর। ভুগে এবং না খেয়ে শরীর ক্ষয় হয়ে গেছে। আসলে সব রিক্সাওলার শরীরই এমনি হাল্কা। তবে রাম যেন হাল্কা হওয়ার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এবার শীতের গোড়াতেই রোগে পড়েছিল রাম। শরীরের ওজন নেমে দাঁড়িয়েছিল তিরিশ সের। ইদানিং কাহিলে শরীরটা আর যেন বইতে পারতো না। মোটাসোটা ভারি দেহের সওয়ারি তুলতে চাইত না রিক্সায়। আর যাই হ'ক, ছাগলকে হাতী টানতে বলা যায় না! গাড়িতে তুলে সাদা ফুল দিয়ে ওরা মৃতদেহ সাজালো। খাটিয়ার চার কোণে চারটে ধূপকাঠি গুঁজে দিল। তারপর সবাই একে একে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। হরিবোল ধ্বনি দিল সবাই। এবার শুরু হবে রামের শেষ যাত্রা।

যাত্রা শুরুর আগে হাসারি একবার চালাঘরটায় ঢুকেছিল। রামের ব্যবহার করা জিনিস আর পোশাকগুলো জড়ো করে টেম্পোর ওপর তুলবে। খুবই সাধারণ জিনিস। একখানা ছাড়া লুঙ্গি, ধোয়া একটা ধুতি আর সার্ট, খানকতক কলাইয়ের থালা-

বাটি, একখানা পুরনো ছাতা ইত্যাদি। সম্পত্তি বলতে এই-কটাই। সেগুলো গুছিয়ে গাড়িতে তুলে নিল হাসারি। টেম্পোয় উঠলো ওরা ছ'জন। বাদবাকিরা কেউ বাস বা ট্রামে যাবে। সকলেরই তখন পুজোর ভাসানের দিনের কথা মনে পড়ছে। তখনও সবাই দলবেঁধে গংগার ঘাটে যায় মাটির প্রতিমা বিসর্জন দিতে। এখন ওরা বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে চলেছে। এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগলো শ্মশানঘাটে যেতে। সারাটা রাস্তা ওরা হরিধ্বনি দিল, ভক্তিসংগীত গাইল। আর খানিক পরেই রক্তমাংসের দেহটা পুড়ে ছাই হবে। কিন্তু আত্মা সনাতন, অবিনশ্বর। আত্মার ক্ষয় নেই। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়/নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ইত্যাদি।

শ্মশানঘাটে সবাই পেঁছোল একে একে। শ্মশানচিতা কখনও নেভে না। একের পর এক মৃতসৎকার হচ্ছে। অনেক মড়া পর পর অপেক্ষা করছে লাইনে। হাসারি একজন ডোমের সংগে কথা বললো। ওরাই দাহকাজ সম্পন্ন করবে। শ্মশানের পাশেই ওরা ঘর-সংসার করে। দাহকাজে অনেক কাঠ লাগে। কাঠের অনেক দাম। মোট একশ' পঞ্চাশ টাকা চাইল লোকটা। যারা গরিব তাদের দাহকাজ করা হয় না। মড়াটা গংগায় ফেলে দেওয়া হয়। একসময় রামের পালা এল। মাটির ঘট ভর্তি করে গংগার জল নিয়ে এল হাসারি। রামের মুখে এক ফোঁটা করে জল দিল সবাই। শ্মশান-পুরোহিত মড়ার কপালে ঘি ঢেলে দেবার পর চিতার ওপর মৃতদেহটা শোয়ানো হলো। তারপর কাঠ সাজিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দেওয়া হলো। পুরোহিত আরও ঘি ঢাললো। তখন শুধু মড়ার গায়ের সাদা চাদরের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে।

সময় যত এগিয়ে আসছে ততই যেন শোকে আকুল হচ্ছিল হাসারি। কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে। চোখ দুটি ভরে উঠেছে জলে। যত কঠিন মন হ'ক না কেন, ভায়ের মড়া চিতায় তুলে কেউ নির্বিকার থাকতে পারে না। একধরনের শ্মশান-বৈরাগ্য হয়। মনে ভেসে ওঠে পুরনো দিনের স্মৃতি। হাসারির মনও তোলপাড় করলো কত পুরনো ঘটনার স্মৃতিতে। সেই প্রথম দেখা দিনটির কথাই সবার আগে মনে পড়লো। রামের রিক্সায় সওয়ার হয়ে হাসারি সেদিন সেই চোট খাওয়া কুলিকে নিয়ে বড়বাজার থেকে হাসপাতাল যাচ্ছিল। সেই থেকেই শুরু হলো একসংগে যাত্রাপথ। তারপর কত ঘটনাই একসংগে ঘটেছে। একসংগে বসে 'বাঙলা', খেয়েছে। কতদিন হাসারি গেছে ওর পার্ক সার্কাস ময়দানের আড্ডায়। একসংগে বসে ওরা তাস খেলেছে। তারপর রাম যেদিন তার জন্যে রিক্সা ঠিক করে দিল, সেদিনই যেন তার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল এই অমানুষ শহরে। বাপের মতনই রাম তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে এতকাল। হঠাৎ চলে গেল সে। হাসারি এখন অনাথ, পিতৃ-হীন। এক পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিল হাসারি। কে একজন এসে তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল তাকে। 'কাঁদিস না! সবাইকেই একদিন এইভাবেই যেতে হবে।' হয়ত তাই। কিন্তু শ্মশানে দাঁড়িয়ে এই কথায় সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। তবে হাসারির সেই আলুথালু বিহ্বল ভাবটা একটু যেন প্রশমিত হলো এই কথায়। একটু আঁট হলো অগোছাল মনটা। ধীরে ধীরে হাসারি চিতার সামনে এসে দাঁড়াল।

শহরে রামের কোন আত্মীয় নেই। তাই হাসারিকেই মুখাগ্নি করতে বললো পুরোহিত। চিতার চারপাশ পাঁচবার প্রদক্ষিণ করলো সে। তারপর মুখের কাছে চিতার কাঠে আগুন ধরাল হাসারি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা। ফটফট শব্দে ফাটতে লাগলো শুকনো কাঠ। আগুনের আঁচ গায়ে লাগছে। সবাই সরে এল চিতার ধার থেকে। এতক্ষণে রামের শরীরেও আগুন ধরেছে। রাম পুড়ছে। দেহ-

খোল ছেড়ে আত্মা অনেকক্ষণ চলে গেছে। এবার খোলটা পুড়ে ছাই হবে। মনে মনে হাসারি বিদায় জানাল রামকে। তার মনে হচ্ছিল সৎকর্মের সুফল নিয়ে হাসারি যেন ভাল ঘরে জন্মায়। জমিদার বা রিক্সামালিক হয়ে সে আবার ফিরে আসুক পৃথিবীতে।

দাহপর্ব শেষ হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগলো। রামের দেহটা ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গঙ্গা থেকে জল এনে চিতার ওপর ঢেলে দিল ওরা। খানিকটা চিতাভস্ম মাটির ঘটে ভরে ওরা ফের গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল। এরপর ডুব দিয়ে ওরা সবাই স্নান করলো এবং শুদ্ধ হলো। রামের চিতাভস্ম জলে ভাসতে ভাসতে হয়ত কোন একদিন সমুদ্রে মিশে যাবে এবং হারিয়ে যাবে অনন্তের মধ্যে।

সব শেষ। মুছে গেল রাম। কিন্তু স্মৃতিতে তখনও দগদগে ঘা হয়ে আছে। খুঁজে খুঁজে ওরা একটা দিশি পানশালায় ঢুকলো। আকণ্ঠ মদ খেল। তারপর একটা হোটেলে ঢুকে নানারকম সুখাদ্যের ব্যবস্থা করলো। আজ ওরা পেটভরে ভাল-মন্দ খাবে। গরিব মৃত রামের সম্মানে ভাত, ডাল, দই, মিষ্টি দিয়ে আজ ওরা ভূরিভোজ করবে।

উনত্রিশ

পুরনো জরাজীর্ণ বাড়িটার সিঁড়িতে পা দিলেই কটু প্রস্রাবের গন্ধ ভক্ করে নাকে লাগে। সিঁড়ির ওপর ধুতিপরা বাবুদের চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছে। জোট বেঁধে তারা ঘুরছে। কলকাতা কাস্টমস-এর এই বাড়িটা যেন আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার এক ক্লাসিক আধার। এরই মধ্যে রক্ষা কবচের মত পারসেল ছাড়াবার নোটিশটা হাতে নিয়ে বধ্যভূমিতে ঢুকে পড়লো স্তেফান। তবে যে উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে সে আপিসে ঢুকেছিল, কয়েক পা গিয়েই তা আর রইল না। সেখানে কে কার কড়ি ধারে! তুমুল বিশৃঙ্খলা চলছে সেখানে। দেখে শুনে প্রায় গজালের মত মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল সে। ঘরের মধ্যে যেন এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। এখানে কিছু টেবিল, ওখানে কয়েকটা র‍্যাক, সবকিছুই যেন এলোমেলো হয়ে আছে। টেবি-লের মাথায় শোভা পাচ্ছে কানা ভাঙা ফাইলের স্তূপ। সরু সুতোর বাঁধন উপেক্ষা করে ফাইলের ভেতর থেকে হলুদ বিবর্ণ কাগজগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একপাশে পড়ে আছে পুরনো লেজারবইগুলো। ইঁদুর আর উইপোকার দৌরাত্ম্যে এর একখানা পাতাও বোধহয় আস্ত নেই। কয়েকটা লেজারবইয়ের দিকে চোখ পড়লেই মনে হবে সেগুলো যেন আদ্যিকালের। সিমেন্টের মেঝেতে লম্বা লম্বা জুতোর দাগ। সারা মেঝেখানা ছেঁড়া, আস্ত, লেখা, না-লেখা কাগজে ভর্তি। বাবুদের টেবিলের টানার ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রকমারি ছাপানো ফর্ম। স্তেফান কোভালস্কীর নজরে পড়লো ওপাশের দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারখানার ওপর। পুরনো ক্যালেণ্ডার। অসুর বিনাশিনী মা দুর্গার ছবিখানার ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় ডজনখানেক বাবু একজায়গায় গোল হয়ে বসে আছে। তাদের মাথার ওপর বনবন করে ঘুরছে সিলিং পাখাগুলো। জোলো স্যাঁতসেঁতে হাওয়ার ঝাপটায় কাগজপত্তর উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। ফড়িং ধরার মতন বাবুরা মাঝে মাঝে লাফালাফি করে উড়ন্ত কাগজপত্র ধরবার চেষ্টা করছে। একপাশে রাখা আছে কয়েকটা অতি প্রাচীন টাইপরাইটার মেশিন। কেউ কেউ অসীম ধৈর্য নিয়ে

সঠিক চাবি খুঁজে কিছু একটা ছাপবার চেষ্টা করছে। অনেকের মুখের কাছে টেলিফোন। অনর্গল কথা বলে চলেছে ওপাশের কোন অনুপস্থিত বক্তার সঙ্গে। অনেকেই এমন কিছু কাজে ব্যস্ত যা সঠিক বিচারে কর্তব্যকর্ম নয়। হয় মুখের সামনে খবরের কাগজটা খুলে বসে আছে, নয়ত আয়েস করে চা খাচ্ছে। কেউ বা ফাইলের স্তূপের মধ্যে মাথা গুঁজে গভীর নিদ্রামগ্ন। তাদের নিশ্চল দেহটা দেখতে লাগছে মিশরের মমীর মত। কেউ বা চেয়ারে এমনভাবে অধিষ্ঠিত যেন কোন মহাযোগী, নির্বাণমুক্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে অপেক্ষা করছেন।

আপিসঘরে ঢোকার মুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের এক ত্রিমূর্তি ভাস্কর মূর্তি রাখা আছে। অতি সূক্ষ্ম লতাতন্তুদ্বারা মূর্তি তিনটি বেষ্টিত। প্রবেশ-পথের মুখে বসে তিনি যেন পরম কৌতুকভরে আপিসের কর্মকাণ্ড দেখছেন। এক দিকের দেওয়ালে আশ্রিত গান্ধীজীর একটি ধূলিমলিন ছবি। তিনি যেন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন এদের কাণ্ডকারখানা দেখে। উল্টো দিকের দেওয়ালে সাঁটা আছে হলুদ হয়ে যাওয়া একটা রাজনৈতিক পোস্টার। যূথবদ্ধ শক্তির মহিমা প্রচার করছে পোস্টারটি।

পরিবেশটা এতই উন্মত্ত যে বিদেশী একজন আগন্তুকের হঠাৎ আগমনও যেন কারও মনে এতটুকু কৌতূহল উদ্রেক করলো না। সৌভাগ্যক্রমে ঘরে ঢুকেই ছোট-খাট চেহারার একটা লোক দেখতে পেল কোভালস্কী। লোকটার খালি পা এবং হাতে চায়ের পাত্র। তাকে জিজ্ঞেস করতে থুতনি উঁচু করে একজন বাবুকে দেখিয়ে দিল সে। বাবুটি এক আঙুল দিয়ে কিছু একটা টাইপ করছিল। কিন্তু তার কাছে পৌঁছানো প্রায় দুঃসাধ্য। রাশিকৃত ফাইল, লেজারবই এবং কাগজপত্র পেরিয়ে যেতে হবে। সুতরাং শুচিবায়ুগ্রস্তা বৃদ্ধার মত সন্তর্পণে পা বাড়িয়ে লোকটার কাছে পৌঁছতে পারলো কোভালস্কী। তারপর তার হাতে ডাকে পাওয়া নোটিসটা ধরিয়ে দিল। চশমাপরা বাবুটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে উল্টোপাল্টে নোটিসখানা পড়লো: তারপর বিদেশী কোভালস্কীর চেহারাখানা আপদমস্তক দেখে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'কি, চা খাবেন? দুধ না দুধ ছাড়া?' আচমকা এমন প্রশ্নে থতমত খেয়ে কোভালস্কী বললো, 'দুধ দিয়ে।'

বাবুটি অনেকবার ঘন্টি বাজালো। কোন সাড়াশব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর ফাইলের পিরামিডের মধ্যে একটি ছায়ামূর্তি যেন ভেসে উঠলো। তাকে চায়ের অর্ডার দিয়ে নেহাৎ উদাসীনভাবে নোটিসের কাগজখানা ফের মন দিয়ে পড়তে লাগলো বাবুটি। অনেকক্ষণ দেখার পর হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো সে। 'মিস্টার কোভালস্কী! এখন প্রায় লাঞ্চের সময়। লাঞ্চের পর আপনার ফাইল খুঁজে বার করতে প্রায় বেলা উতরে যাবে। প্লিজ, কাল সকালের দিকে আসুন।'

'কিন্তু এটা একটা অত্যন্ত জরুরী ওষুধের প্যাকেট। এমন একজনের ওষুধ এতে আছে যে এর অভাবে মারাও যেতে পারে।' খানিকটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কথাটা বললো খ্রীষ্টান পুরোহিত।

বাবুটি সত্যিই যেন করুণার অবতার এমনি একটা ভাব নিয়ে কোভালস্কীর কথাটা মন দিয়ে শুনলো। তারপর পাহাড়প্রমাণ ফাইলের গাদার দিকে আঙুল উঁচিয়ে শান্ত স্বরে বললো, 'চা খেয়ে নিন। তারপর আপনার পারসেলটা যত তাড়াতাড়ি পারি খুঁজে বার করবো।' যথাসম্ভব মন্ত্র মিষ্টি করে কথাটা বলে বাবুটি

এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং চকিতে ফাইলের গাদার আড়ালে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় এসে পেঁছিল কোভালস্কী। ভারতবর্ষের সরকারি প্রশাসন বিভাগের কাজকর্ম শুরু হয় এই সময়। কিন্তু কোভালস্কী এসে দেখলো তার আগে অন্তত তিরিশজন লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন কোভালস্কীর পালা এল তার কয়েকমিনিট আগেই সেই চশমা পরা বাবুটি উঠে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ লাঞ্চ টাইম। কোভালস্কী প্রায় দৌড়ে বাবুটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আজও তেমনি বিনয়ের অবতার লোকটি। একবার শুধু নিজের হাত-ঘড়ির দিকে কোভালস্কীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে। তবুও কোভালস্কী তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো। তর্ক করলো। কিন্তু লোকটা যেন পাকা বাঁশ। কিছুতেই নোয়ানো গেল না তাকে। কোভালস্কী তখন স্থির করলো যে, সেখানেই অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না বাবুটি ফিরে আসে। কিন্তু সেদিন আর ফিরলো না বাবুটি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পরের দিনটা ছিল শনিবার। অর্থাৎ ছুটির দিন। সুতরাং কোভা-লস্কীকে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। সেদিন পানের ছোপ লাগা দুর্গন্ধময় সিঁড়িতে ঠায় তিনঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর কোভালস্কী আবার সেই অমায়িক বাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই একগাল হেসে অভিনন্দন জানিয়ে বাবুটি বললো, 'গুড্‌মর্নিং ফাদার! কি চা খাবেন, দুধ না দুধ ছাড়া?'

বাবুটির দিকে চেয়ে কোভালস্কীর আজ খুব ভরসা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিজের হাতে বানিয়ে এক খিলি পান মুখের মধ্যে চালান করে দিল বাবুটি। পরমানন্দে খানিকক্ষণ তাম্বুল চর্বণের পর, ধীরে সুস্থে ফাইলভর্তি ক্যাবিনেটের দিকে এগোল সে। হাতল ধরে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ক্যাবিনেট খুললো বটে, কিন্তু টানাটানির ঝোঁকে ভেতরের ফাইলপত্র, লেজারবই, নোটবই এবং দলিল ও কাগজের বান্ডিলসমেত সমস্ত জঞ্জালটি অকস্মাৎ স্খলিত হয়ে বিপুল বেগে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবুটির ওপর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। সে এক অভিনব বিচিত্র দৃশ্য। কাগজপত্রের চাপে সমাধিস্থ একজন মানুষ প্রাণের দায়ে হাত-পা ছুঁড়ছে দেখেও হাসি চেপে থাকতে হলো কোভালস্কীকে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সেই জঞ্জালের সমুদ্রের প্রায় তলদেশ থেকে টেনে তুললো ধরাশায়ী বাবুকে। তখনই যেন ওষুধের পারসেলটি সংগ্রহ করার সব আশা সে জলাঞ্জলি দিয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের ষড়যন্ত্রী চাতুর্যের সঙ্গে বিদেশী কোভালস্কীর যে মোটেই পরিচয় নেই, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। ধরাশায়ী বাবুটিকে প্রায় মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে উদ্ধার করে সবে উঠে দাঁড়াতেই হোঁচট খেল গড়ানো ডাবের খোলার সঙ্গে। আর এক তৃষ্ণার্ত বাবু তৃষ্ণা নিবারণ করে শূন্য খোলাটি মেঝের ওপর গড়িয়ে দিয়েছিল। তাতেই হোঁচট খেয়েছে কোভালস্কী। তবে তার সৌভাগ্য যে অনিবার্য পতন থেকে এবার তাকে রক্ষা করলো মেঝের ওপর পড়ে থাকা ফাইল আর লেজারের স্তূপ। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

ঘটনাটা যেমনই হ'ক, এর একটা বাস্তব ফল পেল কোভালস্কী। তখন ক্যাবিনেট থেকে হুড়কে বেরিয়ে আসা লেজারগুলোর পাতা ওল্টাতে শুরু করেছে চশমাপরা বাবুটি। দৃশ্যটা দেখতে ভারি উপাদেয় লাগছে কোভালস্কীর। মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে মোটামোটা অজস্র লেজারবই। লোকটার আঙুলগুলো পাতায় পাতায় নেচে

বেড়াচ্ছে যেন ক্ষ্যাপা খুঁজে বেড়াচ্ছে অমূল্য রতন। কিন্তু প্রায় দুষ্পাঠ্য এবং আঁকাবাঁকা হিজিবিজি লেখাগুলোর মধ্যে সে কি খুঁজছে: কোনো মন্ত্র? হঠাৎ কোভালস্কী দেখলো বাবুটির আঙুল একটা পাতায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কোভালস্কী নিচু হয়ে লেজারের পাতায় চোখ বোলাল। সত্যিই অবিশ্বাস্য। অজস্র সরকারি কাগজ আর নথিপত্রের জঞ্জালের মধ্যে ঝলমল করছে সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত সত্যের মত একটা উল্লেখ, তার নামে। কোভালস্কীর মনে হলো অকর্মণ্য প্রশাসন নিয়ে এ-দেশের লোকজন যতটা নিন্দেমন্দ করে, ততটা নিন্দের কাজকর্ম এদের নয়।

বস্তুত, এই আবিষ্কারটি যেন উদ্দীপ্ত করলো চশমাপরা বাবুটিকে। চকিতে আর এক কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিল সে এবং পরম দক্ষতার সংগে যে অরূপরতনটি কাগজ-সমুদ্রের তলদেশে থেকে ছেঁচে তুলে আনলো, তা হলো হলুদরঙের একটা ফাইল। কোভালস্কী সবিস্ময়ে দ্বিতীয়বার তার নামটা প্রত্যক্ষ করলো ফাইলের গায়ে। ওহো! এ কি বিস্ময়! এ যেন মহান এক বিজয় গৌরব! আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা মাত্র। তারপরই বাঞ্ছিত বস্তুটি তার হস্তগত হবে। বন্দনার আশ্রিত সেই রুগীটি জীবনদায়িনী প্রথম ইঞ্জেকশনটি পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে। এদিকে একনাগাড়ে খোঁজার পরিশ্রমে অবসন্ন হয়ে চশমাপরা বাবু এবার শরীরটাকে টানটান করে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতঘড়ির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ফাদার! লাঞ্চের পর আমরা আবার শুরু করবো খুঁজতে।'

কিন্তু লাঞ্চের পর বাবুর অন্য মূর্তি দেখলো কোভালস্কী। কিঞ্চিৎ বিরাগ ফুটে উঠেছে তার মুখেচোখে। বার-কয়েক ফাইল এবং হাতে ধরা নোটিসখানা দেখে সে বললো, 'দেখুন সাহেব! লেজারের এনট্রি আর আপনার কাছে পাঠানো নোটিসের বিবরণের মধ্যে বিস্তর গরমিল দেখতে পাচ্ছি। বলতে গেলে কিছুই প্রায় মিলছে না। সুতরাং অন্য লেজার থেকে এটা মিলিয়ে নিতে হবে।' বলাবাহুল্য বাবুটির অনুতপ্ত মুখচোখ দেখে কোনরকমে নিজেকে সংযত করলো কোভালস্কী। যদিও রাগে তার সর্বশরীর তখন জ্বলে যাচ্ছিল।

এদিকে ছ-সাতদিন পরমানন্দে কেটে গেল। কিন্তু আসল লেজারখানা তখনও দুষ্প্রাপ্য। আটদিনের মাথায় লোক লাগিয়ে রেফারেন্স খোঁজার পারিশ্রমিক বাবদ চল্লিশ টাকা জমা দিতে হলো কোভালস্কীকে। আরও একটা সপ্তাহ কেটে গেল। ঘুণ ধরা প্রশাসনের সর্বনাশা অবস্থাটি তখন ধীরে ধীরে প্রকট হচ্ছে। মানুষের সব সদিচ্ছাগুলো আত্মসাৎ করে নিচ্ছে এই পোকায় কাটা প্রশাসন। তখন স্তেফান কোভালস্কীও সব আশা ছেড়েছুড়ে দিয়েছে। এইভাবে আরও এক হপ্তা কেটে যাবার পর একদিন ডাকে আর একটা চিঠি পেল কোভালস্কী। অবিলম্বে পারসেল্ ছাড়াবার নির্দেশ এসেছে কাস্টম্স্ আপিস থেকে। অলৌকিকভাবে বন্দনার আশ্রিত সেই রুগীটি তখনও বেঁচে ছিল পৃথিবীতে।

বাবুটি এবার যেন পুরনো বন্ধুর মতন ব্যবহার করলো। স্তেফান কোভালস্কীকে দেখে সত্যিই সে খুশি হয়েছে। রেভেনিউ স্ট্যাম্পের দাম বাবদ তিরিশ টাকা চেয়ে নিল সে। তারপর গঁদের শিশি আর ক্ষয়ে যাওয়া বুরুস নিয়ে স্ট্যাম্প সাঁটতে লেগে গেল। বুরুস দিয়ে স্ট্যাম্প সাঁটার জায়গাটা যখন সে ঘষছে, তখন সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় স্ট্যাম্প উড়ে গেল। আরও তিরিশ টাকা দিতে হল কোভালস্কীকে। আর এক প্রস্থ স্ট্যাম্প কেনা হলো সেই টাকা দিয়ে। এরপর অনেক-

গুলো ফর্মে দস্তখত করতে হলো কোভালস্কীকে। শুল্কবাবদ প্রদেয় টাকার হিসাব করতে প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেল। হিসাব শেষ হলে দেখা গেল পণ্য-শুল্কবাবদ সরকারের পাওনা টাকার পরিমাণ অসংগত রকমের অধিক। মোট তিনশ' পঁয়ষট্টি টাকা। অর্থাৎ ওষুধের ঘোষিত দামের তিনচারগুণ বেশি। হায়! ওষুধের এত দাম! কিন্তু মানুষের প্রাণের দাম এক কানাকড়িও নয়।

'তবুও আমার তখনই নিস্তার হলো না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কথা ভাবছিল কোভালস্কী। 'শুনলাম কাস্টম্‌স্‌ আপিসে সরকারি এই টাকা সরাসরি জমা দেওয়া যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নামক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাউন্টারে জমা দিয়ে চালান করিয়ে নিতে হয়। অতএব আরও একটা দিন নষ্ট হলো আমার। বহু চেষ্টায় সেই প্রকাণ্ড সংস্থার কাউন্টার থেকে কাউন্টারে ঘুরে কাজটি অতঃপর শেষ করলাম।'

কাজ শেষ হলো। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল্যবান চালানটা যখনই হস্তগত হলো তখনই সেটা বুকের কাছে ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে সে কাস্টম্‌স আপিসের দোরগোড়ায় পৌঁছল।

এই ক'দিন ঘোরাঘুরির দরুন কোভালস্কী বেশ চেনা হয়ে গেছে সকলের কাছে। সবাই ওকে গুড মর্নিং বললো। কিন্তু চশমাপরা বাবুটির মুখ আজ যেন একটু বেশি গম্ভীর। কোভালস্কীর আনা চালানখানা একবার চোখ বুলিয়েও দেখলো না। তাকে নিয়ে বাবুটি এবার দুতলা নেমে স্টোররুমে এসে পৌঁছাল। থরে থরে পড়ে আছে পারসেল আর পেটি। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এগুলো এসেছে। ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসারকে পারসেলটা আনতে বললো বাবুটি। তখুনি স্তেফান কোভালস্কীর নাম লেখা পারসেলটা নিয়ে এল লোকটা। ছোট্ট বাক্স। দুপ্যাকেট সিগারেট বাক্সর চেয়ে আকারে কিছু বড়। অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম দিয়ে এটা সে পেতে চলেছে। তাই তার কাছে এর অনেক দাম। এর আগমন মরীচিকার মত। যেন প্রাণের ছবি, আশার ছবি নিয়ে এসেছে বাক্সটা। যেন অলৌকিক কিছু ঘটবে, তারই আগাম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার ফসল ঘরে তুলবে সে। এতদিন শুধু নিষ্ফল কাজ করে গেছে। এবার তারই ফল পেতে চলেছে সে। একটা মুমূর্ষু জীবনকে প্রাণদানের আশা দেবে এই বাক্সটা।

সুতরাং পারসেলটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল কোভালস্কী। কিন্তু পোশাক পরা কর্মচারীটি বিনীত ভাবে তাকে বাধা দিল। 'আমি দুঃখিত ফাদার। এটা আমি আপনাকে দিতে পারি না।'

কেন?'

লোকটা তখন পিছনের দরজার মাথায় টাঙানো বোর্ডটা দেখাল। বোর্ডের গায়ে লেখা, 'গুডস ইনসিনারেটর।' অর্থাৎ বিনষ্ট করার জন্য রক্ষিত মাল। লোকটা এবার বুঝিয়ে বললো, 'ওষুধগুলোর এক্সপাইরি ডেট তিনদিন আগে পেরিয়ে গেছে। আন্ত-র্জাতিক নিয়মমত ওগুলো এখন নষ্ট করে ফেলতে হবে।' চশমাপরা বাবুটি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। একটাও কথা বলে নি। ইউনিফর্ম পরা লোকটা চলে যাবার চেষ্টা করতেই সে তার সার্টের খুঁট টেনে ধরলো। তারপর বললো, 'ইনি একজন সাধু, খ্রীশ্চান পাদরী। ইনি গরিব মানুষদের চিকিৎসার জন্যে ওষুধগুলো নিতে এসেছেন। ওষুধটা পেলে একজন ভারতীয় মহিলা হয়ত প্রাণে বাঁচবেন। ডেট পেরিয়ে গেলেও এঁকে ওষুধগুলো দিন।'

ইউনিফর্মপরা লোকটা এবার কোভালস্কীর তালি দেওয়া সার্টের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি গরিব মানুষদের সেবা করেন?' কোভালস্কী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। লোকটা এবার পেটির গায়ে লেখা 'পেরিসড' কথাটা কেটে দিল। তারপর কোভালস্কীর দিকে চেয়ে বললো, 'কাউকে কিছু জানাবেন না। ভগবান আপনার মংগল করুন।'

কিন্তু ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও বন্দনার আশ্রিত রুগীকে বাঁচানো গেল না। মাসখানেক পরেই মেয়েটি মরে বাঁচলো। মেয়েটির বয়স আটাশ বছর। এই বয়সেই বিধবা হয়েছে। চারটে ছেলেমেয়েও আছে। মা মরে যাওয়ায় ছেলেমেয়েগুলো অনাথ হয়ে গেল। তবে ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থা এমনিই যে, পিতৃমাতৃহীন হলেও কেউ অনাথ হয় না। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কেউ না কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়। বুকে তুলে নেয় অপোগণ্ডদের। সুতরাং এই মেয়েটির ছেলেমেয়েরাও অনাথ হলো না। বস্তির লোকেরাই তাদের বুকে তুলে নিল।

তবে এই মেয়েটার মরে যাওয়াটা কেউ মনে রাখলো না। অচিরেই ভুলে গেল তাকে। এটাও এক বিশেষত্ব এখানকার। যে ঘটনাই ঘটুক জীবনধারা এখানে থেমে থাকে না। তার প্রবাহে কোন ছেদ পড়ে না, কারণ নিত্যই সেই প্রবাহে নতুন প্রাণের সংযোগ হচ্ছে।

তিরিশ

বস্তির আকাশের বুক চিরে সাপের মত এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়ছিল হাউই বাজির স্ফুলিঙ্গ। আজ দীপাবলী, দেওয়ালি। হিন্দুর আলোকোৎসব। দেওয়ালির এই আলোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে। আগামী শীত মরশুমের আগমনও ঘোষণা করে এই উৎসব। যে দেশের সব কিছুই কল্পনা এবং প্রতীকী, সেখানে উৎসবটিও প্রতীকমণ্ডিত। আলোকখড়্গ দ্বারা আঁধাররূপী মহিষটি দ্বিখণ্ডিত করা হয় এই উৎসবরাত্রে এবং উড়িয়ে দেওয়া হয় আলোকের বিজয়-নিশান। রামায়ণ মহাকাব্যের এক স্মরণীয় কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই আলোক উৎসবের রাত। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার পুনরাগমনের অভিষেক হয়েছিল এই-দিন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভার্যারূপে সীতাকে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে এই উৎসবের অন্য এক তাৎপর্য আছে। কথিত আছে যে এই আলোকোজ্জ্বল রাত্রে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা তাঁদের মহাযাত্রা শুরু করেন। তাই তাঁদের যাত্রাপথটি আলোকিত করে ইহলোকবাসী মানুষ। এই তিথিতে মা লক্ষ্মীরও পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মা লক্ষ্মী অন্ধকার ঘরে পা দেন না। তাই ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। শ্রী, সম্পদ, বৈভব নিয়ে দেবী লক্ষ্মী আলোকসজ্জিত গৃহে অধিষ্ঠিতা হন। ধন, মান এবং যশের কাঙাল মানুষ ভক্তিভরে তাঁর পুজো করে যাতে সুখ সম্পদে ভরে ওঠে ঘর। কিন্তু বাঙালীদের কাছে দীপাবলীর রাত অন্য কারণে মাহাত্ম্যপূর্ণ। বাঙালীরা এই দিনটিতে শক্তিরূপিণী দেবী কালিকার আরাধনা করে। কালীর আঁধারকালো রূপ যেন ভক্তের অন্ধকার পরীক্ষার কাল। ভক্তকে এই অন্ধকার পরীক্ষার কালটি উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই সে আলোর নাগাল পাবে। আনন্দ নগরের মানুষের কাছেও দেওয়ালির রাত

বয়ে আনে আশা আনন্দের প্রতিশ্রুতি।

অনেক হিন্দুই এই রাতটিতে দ্যূতক্রীড়া করে। বস্তির মানুষও রীতি অনুযায়ী জুয়া খেলতে বসে। দ্যূতক্রীড়া এক প্রাচীন রীতি এবং পুরাণের এক উপাখ্যান থেকে এর জন্ম। কথিত আছে যে একদা শিব ও পার্বতী পাশকক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। পার্বতীর ছলনায় শিব সর্বস্বান্ত হন। পরে বিষ্ণুর দৌত্যে হৃতভাগ্য ফিরে পান শিব। স্বয়ং বিষ্ণুই পাশার ঘুটির মধ্যে আত্মগোপন করে শিবকে জয়যুক্ত করেন। সুতরাং দেওয়ালির রাত জুয়া খেলার রাত হিসেবে পালিত হয়। রাতভর জুয়ার আড্ডা চলে। কেউ তাসের জুয়া খেলে, কেউ বা পাশার জুয়া। দশ-পাঁচ টাকার জুয়ার-বোর্ড যেমন আছে তেমনি দশ-পাঁচ পয়সারও জুয়া খেলা হয়। যাদের সেটুকু সঙ্গিতও নেই, তারা কলা-মুলো দিয়ে জুয়া খেলে। যেখানে খেলাটাই মুখ্য, সেখানে বাহ্য উপকরণগুলো নেহাতই মূল্যহীন। তাই হিন্দুর আড্ডায় মুসলমানও জুয়া খেলায় অংশ নেয়। এমনকি বিদেশী কোভালস্কীও এই সংস্কার থেকে মুক্তি পেল না। চায়ের দোকানের হিন্দু মালিকের নেমন্তন্ন পেয়ে কোভালস্কীও সারারাত জুয়া খেললো। তারপর রাতভর খেলে ঘরে ফেরার সময়ই সে দুঃসংবাদটা প্রথম শুনতে পেল। গত রাত থেকে নাকি মেহবুবের সাতমাস পোয়াতি বিবি সেলীমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আনন্দ নগর থেকে সে নাকি হারিয়ে গেছে।

দিন-তিনেক আগে কলতলার কাছে যুবতী সেলীমার সঙ্গে স্থূলাঙ্গী মমতাজ বিবিকে গোপনে আলাপ করতে দেখা গিয়েছিল। আনন্দ নগরে মমতাজ বিবির হাব-ভাব চালচলনে রহস্যময়তা আছে। যে সমাজে মানুষের সহজ-সরল জীবনযাপনে এতটুকু ঢাকাঢুকি নেই, সেখানে এই স্থূলবপু জাঁকাল স্বভাবের মহিলা যেন কিছুটা অন্যরকম। মুখে বসন্তের দাগধরা মমতাজ বিবিকে এই সরল সমাজে যেন মানায় না। মমতাজ বিবির স্বামী সাধারণ কারখানার সাধারণ শ্রমিক হলেও তার চেহারায় বেশ চাকচিক্য আছে। থাকেও আড়ম্বর করে। বস্তির একমাত্র ইঁটের ঘরখানা তাদের। ঘরে বিজলি বাতির একটা বাল্বও জ্বলে যা এদের কাছে এক বিরল বিস্ময়ের মত। শোনা যায়, আনন্দ নগর বস্তির আশপাশে আরও ক'টা ঘরের মালিক সে। কিন্তু কোথা থেকে সে টাকা পায় কেউ সঠিক জানে না। নানা জনে নানা কথা বলে। কেউ বলে বস্তির বাইরে ও সিন্ধাই শক্তি দেখায়। স্থানীয় মাস্তান নেতার আনাগোনা আছে ওর ঘরে। লুকিয়ে চুরিয়ে ওরা নাকি ভাঙ্ (দিশী মারিজুয়ানা) এবং চোলাই মদ চালান করে। দিল্লী, বোম্বাইয়ের মত বড় বড় শহরের গণিকা পল্লীতে গোপনে মেয়ে পাচারও ওরা করে। তবে এ সবই গুজব। এখনও পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি কেউ দিতে পারে নি।

মোট কথা বিতর্কিত চরিত্রের এই মমতাজ বিবিই দিন-তিনেক আগে সেলীমাকে তার ঘরে যেতে বলে। কলতলায় গা ধুতে যাচ্ছিল সেলীমা। তখনই মমতাজ বিবি তাকে ধরে।

'শোন! ফেরার পথে একবার আমার ঘরে যাস। কিছু কথা আছে। তোর ভালই হবে তাতে।'

অবাক হলেও সেলীমা গেল। আগের সেই দুরন্ত চেহারা নেই। এখন তার ছায়া মাত্র হয়ে আছে মেয়েটা। বরের চাকরি যেদিন গেল সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে এই দৈন্যাবস্থা। সুন্দর মিষ্টি মুখখানা উৎকট রকমের শ্রীহীন। অমন দুটি সুন্দর চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। নাকের ছোট্ট পাথরটা বেচে খেয়েছে অনেকদিন। পরনের

ছেঁড়া শাড়িতেও যাকে রাজরাজেশ্বরীর মত দেখাত, সেই মানুষটাই মমতাজ বিবির ঘরে ঢুকলো বৃদ্ধার মত নুয়ে পড়ে। শুধু পেটের চেহারাটা আরও ভরাট হয়েছে. আরও টানটান হয়েছে। এখন এটাই তার একমাত্র গর্ব, তাই এই ধনটিই সযত্নে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সে। আর দুমাস পরে যেটা আসবে, পেটের মধ্যে তার নড়াচড়া বুঝতে পারে এই ভরা পোয়াতি মেয়েটা। এটি হবে তার পঞ্চম সন্তান। সেলীমাকে খুব আদর করে অভ্যর্থনা করলো মমতাজ বিবি। ঘরে ঢুকতেই এক থালা টুকিটাকি খাবার বাড়িয়ে দিল সেলীমার দিকে। তারপর দুকাপ চা বানিয়ে দুজনে নিচু জলচৌকির ওপর বসলো।

মমতাজ বিবি সরাসরিই কথাটা পাড়লো। সেলীমার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কি বাচ্চাটাকে রাখতে পারবি? যদি না পারিস তবে আমায় বেচে দে। ভাল দাম দেব তোকে।'

সেলীমা স্তম্ভিত। জড়িয়ে গেল কথা। সসংকোচে বললো, 'বাচ্চা বেচবো?'

'না। না। বাচ্চা নয়। যেটা তোর পেটে এয়েছে, সেইটে।' শুধরে দিল মমতাজ বিবি। আরও বললো, 'ভাল দাম পাবি। দুহাজার টাকা।'

নিজামুদ্দিন লেনের এই মোটাসোটা ভারিক্কি মহিলা ইদানিং ভ্রূণ বেচার গোপন কারবার করে। কলকাতার এটা সর্বশেষ গোপন অবৈধ কারবার। প্রথম অবস্থা থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ পর্যন্ত কেনাবেচার এক আন্তর্জাতিক বাজার আছে। এই আন্তর্জাতিক পাপচক্রের যারা প্রধান যন্ত্রী তারা প্রধানত বিদেশী। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে প্রায় ঝাঁটিয়ে ভ্রূণ কেনা হয়। বিদেশী ক্রেতারা ভ্রূণ কেনে গবেষণাগারের তরফ থেকে। জেনেটিক গবেষণার কাজেই বিভিন্ন অবস্থার ভ্রূণের দরকার হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াও ইওরোপ ও আমেরিকার ধনী এবং সুবিধাভোগী সমাজের দরকারেও ভ্রূণ কেনা হয়। পুনর্যৌবনপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ওই সব সমাজে ভ্রূণের খুব সমাদর।

মোটকথা এই বিরল বস্তুটির উত্তরোত্তর চাহিদা থেকেই গড়ে উঠেছে লাভজনক এই আন্তর্জাতিক কারবার। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম শহর কলকাতাও এই গোপন কারবারের এক অংশীদার। কলকাতার স্বীকৃত যোগানদারের নাম সুশীল ভোরা। সে আগে ওষুধের কারবার করতো। শহরের যে ক্লিনিকগুলিতে অকাল প্রসব করানো হয়, তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ করে সুশীল ভোরা। দাম দিয়ে ভ্রূণ কেনে এবং এরোফ্লোটের নিয়মিত ফ্লাইটে মস্কো মারফত ইওরোপ ও আমেরিকার বাজারে চালান করে।

পূর্ণ বয়সের ভ্রূণের চাহিদাই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তেমন পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। অনেক মূল্যমূল্যের বদলে তেমন একটি ভ্রূণ সংগ্রহ করা যায়। তাই সেলীমাকে অনেক টাকার লোভ দেখানো হয়েছে। দুহাজার টাকা। অথচ অপরিণত একটি দুমাসের ভ্রূণ দুশ টাকাতেও কেনা যায়। ছ-সাত মাসের অন্তঃস্বত্বা মায়ের পেটের বাচ্চার জন্যে যে অনুরাগ গড়ে ওঠে তা যথার্থ নাড়ির টান। অত্যন্ত গরিব সংসারেও শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে নবজাতককে স্বাগত করে। তাকে ঘিরে মরা সংসারেও সুখের বান ডাকে। যাদের কোন ধনসম্বল নেই শিশুই তাদের জীবনের অমূল্য ধন। এই ধনেই তারা ধনী।

শেষ পর্যন্ত মায়ের ভূমিকা নিতে হলো মমতাজকে। মাতৃস্নেহ দিয়ে সে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। 'তুই আমার মেয়ের মত সেলীমা। যা বলি মন দিয়ে শোন।

জীবনটা কঠিন বাস্তব। আল্লা তোকে চারটে ছেলেমেয়ে দিয়েছেন। তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোর। অথচ তোর টাকা নেই। তোর স্বামীর চাকরি নেই। আমি জানি ওদের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাতও দিতে পারিস না তুই। সংসারে আর একটা মুখ বাড়াবার সময় এটা নয়। অথচ দুহাজার টাকা পেলে যারা আছে তাদের থালা ভর্তি ভাত বেড়ে দিতে পারবি।'

সেলীমাও তা জানে। ছেলেমেয়েদের মুখে খিদের ভাত তুলে দিতে পারে না বলে তার মনে নিত্য কষ্ট। কিন্তু এতগুলো টাকা? স্বামী যদি সন্দেহ করে? বললোও সেকথা মমতাজকে। দুষ্টু একটু হেসে মমতাজ বললো, 'সেটাও ভেবেছি। একসঙ্গে তোকে অতগুলো টাকা দেব না। খেপে খেপে দেব। কেউ সন্দেহ করবে না, অথচ রোজ তোর ভাতেরও অভাব হবে না।'

এই পর্যন্ত কথাবার্তার পর সেলীমা উঠে দাঁড়াল। মমতাজ সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'ভয়ের কিছু নেই। পেট খালাস করতে সময় লাগবে কয়েকটা মিনিট। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। বড় জোর ঘণ্টা-তিনেক সময় তোকে বাইরে থাকতে হবে।'

আশ্চর্যের কথা যে এই ধরনের অপারেশনের সঙ্গে জড়িত বিপদের কথাটা সেলীমার মনেও এল না। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ বস্তির মানুষের জীবনযাত্রায় মৃত্যুটা কোনও বিশেষ তাৎপর্য বয়ে আনে না।

সারা দিনরাত মেয়েটা যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাটালো। যখনই মমতাজ বিবির কথা মনে পড়ছে তখনই যেন কি একটা ভর করছে তার মনে। মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে যেটাকে তিলতিল করে ধারণ করেছে এতদিন, সে যেন তাদের বীভৎস আলাপের প্রতিবাদ করতে চায়। বলতে চায় এটা খুন, হত্যা। তাই দুহাজার টাকার বদলে সেলীমা তা করবে না। কিন্তু তখনই যেন মনের অভ্যন্তর থেকে ভেসে এল আরও একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ। 'মা দুটি খেতে দাও!' সেলীমা জানে এটা ক্ষুধার কান্না। খিদের তাড়নায় যখন পেট মুচড়ে ওঠে তখনই এ কান্না শুনতে পায় সে। এ কান্নার শব্দ তার কাছে অচেনা নয়। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেলীমা মন স্থির করে ফেললো। মমতাজ বিবির প্রস্তাবে সে রাজী।

খবরটা শুনেই ভ্রূণ ব্যবসায়ী ভোরা এক গামলা এ্যান্টিসেপটিক জলীয় ওষুধ বানিয়ে ফেললো। আকৃতি গঠনে সাত মাসের ভ্রূণ প্রায় সদ্যোজাত বাচ্চার মত। যে ক্লিনিকে অপারেশন হবে সেখানে নিয়ে এল সেই জলীয় এ্যান্টিসেপটিকের গামলা। দেওয়ালি উৎসব হিন্দুর উৎসব। তাই হিন্দু শল্যচিকিৎসক পাওয়া গেল না। কিন্তু সুশীল ভোরা কিছুতেই যেন হার মানবে না। নির্ভীকভাবে সে একজন মুসলমান ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

সেলীমাকে যেখানে প্রসব করানো হবে তাকে ক্লিনিক বললে বাড়িয়ে বলা হয়। একটা ছোটখাট ডিসপেনসারির অধিক সেটা নয়। একটি মাত্র ঘর। পর্দা ফেলে দুভাগ করা হয়েছে তাকে। অস্ত্রচিকিৎসার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও নেই। যা আছে তা খুবই সাদামাটা। একটা স্টিলের টেবিল, একটা টিউব বাতি, এক বোতল এ্যালকোহল এবং এক বোতল ইথার। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা যেমন নেই তেমনি নেই রুগীর শরীরে রক্ত দেবার ব্যবস্থা। এমনকি অক্সিজেনের একটা সিলিণ্ডারও ক্লিনিকে নেই। ক্লিনিকের মধ্যে কোনরকম যন্ত্রপাতি নেই। অস্ত্রোপচারের উপযোগী যন্ত্রপাতি সার্জেনকে বয়ে আনতে হয়।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইথারের তীব্র গন্ধে সেলীমা নেতিয়ে বসে পড়ল একটা

ট্রলের ওপর। আসবাব বলতে একখানি মাত্র টুল আছে ঘরে। ক্রমশঃই তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়াবহ এবং পৈশাচিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেলীমা মন স্থির করে ফেলেছে। এক ধরনের বিচিত্র উদাসীনতায় সে তখন আচ্ছন্ন। তার মনে হচ্ছিল অন্ততঃ আজকের রাতটাতে সে তার স্বামী ছেলেমেয়েদের মুখে দুটি অন্ন তুলে দিতে পারবে। ব্লাউজের নিচে শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে দশটাকার তিনখানা নোট। এই টাকাটা সে এখনি উপার্জন করলো। তার মনে হচ্ছিল এক বেলার মত চাল কেনার টাকা তার কাছে মজুত আছে।

যে লোকটা অস্ত্রোপচার করবে তার বয়স বছর পঞ্চাশ। চুল পাতলা হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। লোকটার কানেও বড় বড় চুল। সেলীমাকে টেবিলে শুইয়ে সে একবার পরীক্ষা করলো। লোকটা বোধহয় ইতস্ততঃ করছিল সেলীমার শরীরের অবস্থা দেখে। সুশীল ভোরা অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আর চারঘণ্টা পরেই এরোফ্লোটের প্লেন বিমানবন্দর ছেড়ে যাবে। ভ্রূণসমেত গামলাটা দমদম বিমানবন্দর পর্যন্ত নিয়ে যাবার সময়টুকু কোনক্রমে পাবে সে। নিউ ইয়র্কের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা হয়ে গেছে। তারাও অপেক্ষা করছে। মোটকথা যোগাযোগ সম্পন্ন হলেই সে পেয়ে যাবে মোট ৭৫০ পাউন্ড। অধৈর্য ভোরা জানিয়েও ফেললো তার অসহিষ্ণুতা, 'আপনি কার অপেক্ষা করছেন ডাক্তার?'

হয়ত ভোরার তাড়া খেয়েই ডাক্তার সচেতন হলো। ব্যাগ থেকে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি বার করলো। গাউন পরলো। বেসিনে হাত ধুলো সাবান দিয়ে। তারপর বড় একখণ্ড তুলো ইথারে ডুবিয়ে সেলীমার নাকে এবং মুখে চেপে দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সেলীমা পুরোপুরি অজ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ যেন লোকটার অস্থিরতা কমছিল না। সেলীমা স্থির হবার পর লোকটা এবার তার দো-ফলা ছুরি বার করলো। মিনিট কুড়ি বাদে জরায়ু থেকে নিঃসারিত রক্ত মুছে সে পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণটা গর্ভফুল সমেত ভোরার হাতে দিল।

বিপদ শুরু হলো নাড়ি কাটার পর। অচেতন সেলীমার গর্ভকোষ থেকে লোহিত-বর্ণের একটা বুদ্বুদ নির্গত হচ্ছিল। হঠাৎ শুরু হলো রক্তস্রাব বন্যার মত সজোরে নিঃসৃত হলো রক্ত। এক লহমায় ঘরের মেঝে ভেসে গেল রক্তের বন্যায়। সার্জন তখন সেলীমার তলপেটটা শক্ত করে বেঁধে দিল। তবুও রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। হুড় হুড় শব্দে লাল রক্তস্রোত বেরোতে লাগল জরায়ু থেকে। লোকটা তাড়াতাড়ি তলপেটের ব্যান্ডেজ খুলে দিয়ে পেটের বৃহৎ রক্তবাহিকা শিরার অবস্থানটি অনুভব করার চেষ্টা করছিল। রক্তপ্রবাহ থামাবার জন্যে এবার সে সর্বশক্তি দিয়ে রক্তনালীর ওপর চাপ দিল। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল হলো। কোঅ্যাগুলেন্ট ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায় না। তাই রক্তক্ষরণও বন্ধ হ'ল না। লোকটা এবার সেলীমার নাড়ির গতি পরীক্ষা করলো। নাড়ির গতি অনিয়মিত এবং ক্ষীণ। হঠাৎ শুনলো পেছনের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকিয়ে দেখলো গামলাসহ ভোরা ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। মমতাজ বিবিও যেন অপেক্ষা করে ছিল এই সুযোগটির। ক্ষিপ্রহাতে সেলীমার ব্লাউজের তলা থেকে তিরিশটা টাকা উদ্ধার করে সে-ও ভোরার মত অদৃশ্য হয়ে গেল সেখান থেকে। সার্জন লোকটারও আর কিছু করার নেই। সুতরাং মুমূর্ষু সেলীমার শরীরের ওপর তারই ছেড়ে রাখা পুরনো শাড়িখানা প্রথমে ঢাকা দিল। তারপর নিজের পরনের রক্তমাখা গাউনটা খুলে সযত্নে পাট করলো। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগে পুরলো এবং নিঃ-

শব্দে বেরিয়ে গেল।

সেলীমা একা। ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে টেবিলের ওপর। ক্লিনিকের একজন কর্মচারী তখনও টিকে ছিল ঘরের মধ্যে। সিলিং ফ্যানের কর্কশ আওয়াজ ছাপিয়ে বাইরের মানুষের কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে। লোকটার চেহারা বেঁটে-খাট এবং শক্ত। তার ভুরুদুটো লোমশ। নাকখানা খড়্গের মত বাঁকানো। তার মনে হচ্ছিল সেলীমার এই রক্তশূন্য দেহটার যা দাম তা জুয়ায় জেতা টাকার চেয়েও বেশি। একটা ঠিকানাও সে জানে। ওরা বেওয়ারিশ মড়ার ছালচামড়া ছাড়িয়ে কাঠামোটা বিদেশে রপ্তানি করে। অতএব মা ভৈঃ!

একত্রিশ

পঞ্চাশ হাজার রিক্সাওলার প্রত্যেকের মাথায় একটা করে বোমাবর্ষণ হলে যে গর্জন উঠতো তার চেয়েও বেশী ক্রোধের সঞ্চার করলো রিক্সা মালিকদের সাম্প্রতিক ঘোষণাটা। মালিকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে অধিক হারে ভাড়া দিতে হবে রিক্সাওলা-দের। পাঁচ থেকে বেড়ে সাত টাকা হলো রিক্সা পিছু ভাড়ার রেট এবং এই বর্ধিত রেট কার্যকর হবে পরদিন থেকেই।

ধাক্কাটা খুবই কঠোর ও আকস্মিক। সকলেরই মনে হচ্ছিল যে, ১৯৪৮ সালে রিক্সামালিকদের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ের পর এতবড় আঘাত তাদের জীবনে আর আসে নি। রিক্সামালিকরা তখন দাবি করে যে প্রতিটি গাড়ির জন্যে দুদফা ভাড়া দিতে হবে পৃথক ভাবে। এক দফা দিনে, এক দফা রাত্রে। এর প্রতিবাদে রিক্সাওলারা কলকাতা শহরে প্রথম ধর্মঘটের ডাক দেয়। মোট আঠারো দিন এই ধর্মঘট চালু ছিল। এই লড়াইয়ে সেবার রিক্সাওলারাই জিতেছিল। এর ফলে তাদের আর একটা জিত হয়। ওরা একটা ইউনিয়ন সংগঠন করে ফেলে। ওদের এই জয়ের পেছনে সে-দিন যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল তার নাম গোলাম রসুল। রসুল জাতে বিহারী এবং মাথাভর্তি সাদা ঘন চুল। তার এখনকার বয়স চুয়ান্ন। যেখানে প্রত্যাশিত গড় আয়ু তিরিশ সেখানে চুয়ান্ন বছর বেঁচে থাকাটা অবশ্যই একটা রেকর্ড। রসুল সে রেকর্ড স্থাপন করেছে এবং সে এখনও বেশ সমর্থ এবং কার্যক্ষম। ইতিমধ্যেই সে তিরিশ হাজার দিন রিক্সাগাড়ি টেনেছে এবং যত মাইল পথ সে গাড়ি চালিয়েছে সেই দূরত্বটা পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চেয়েও চারগুণ বেশী। দীর্ঘ-দিন নানারকম প্রতিকূল ও অবমাননাকর ঘটনার সংস্পর্শে এসে সে একটাই শিক্ষা পেয়েছে। তার মনে হয়েছে যে হতভাগ্য রিক্সাওলাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। তাদের একটা শক্তিশালী সংগঠন থাকা দরকার যেখানে তারা তাদের অভাবের কথা নির্ভয়ে বলতে পারে। এই ভূমিকা নিতে পারে কেবলমাত্র ইউনিয়ন। তবে মানুষ-গুলোকে একত্র করার একটা প্রাথমিক অসুবিধে ছিল। কলকারখানার শ্রমিকদের মতন সঙ্ঘবদ্ধ এদের চরিত্র নয়। এরা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে রোজগার করে। এদের আশা আকাঙ্ক্ষাও সংকীর্ণ। তাই সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের জন্যে এদের জড়ো করা খুবই কঠিন।

লেখাপড়া শিখে রসুল নানা তথ্য সংগ্রহ করলো। যোগাযোগ করলো কমিউনিস্ট পার্টির বিধানসভা সভ্য আবদুল রহমানের সঙ্গে। রহমান তাকে বললো, 'লড়াই

করতে হবে। সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে হবে যাতে কলকাতার রিক্সাওলাদের সঙ্গে কেউ জানোয়ারের মতন ব্যবহার না করে।'

এইভাবে সেদিন গড়ে উঠলো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। পৃথিবীর এক বিরল সংগঠন, যে সংগঠন গড়ে উঠেছে মানুষ নামক ঘোড়াদের নিয়ে। এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে তাদের দাবিয়ে রাখা মাথা উচুতে তুলতে এবং অধিকার অর্জন করতে। এরপর সংস্থাটিকে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত করা হলো। সমিতির প্রথম সভাপতি হলো আবদুল রহমান এবং প্রথম সম্পাদক মনোনীত হলো গোলাম রসুল। চারতলায় দুখানা ঘর নিয়ে ইউনিয়নের আপিস ঘর তৈরি হলো ট্রেড ইউনিয়নের ভাঙাচোরা হেডকোয়াটার্স ভবনে। রোজ সকাল ছটার সময় শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে রিক্সার দন্ডদুটি ধরার আগে রসুল তার কমরেড রিক্সাওলাদের অভিযোগের কথা শোনে এবং সবরকম সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। রিক্সা মালিক বা পুলিসের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বের কারণ থাকলে সাহায্য সমর্থনের আশ্বাস দিতে হয় তাকে। প্রথম প্রথম ইউনিয়নের ডাকা মিটিংয়ে অল্প সংখ্যক রিক্সাওলা যোগ দিত। কিন্তু ক্রমেই শহরের সব অঞ্চল থেকে তারা বেশী সংখ্যায় আসতে শুরু করলো। দুপুরের পরে রসুলের হাতে থাকতো অন্য একটা বস্তু। তখন যে বস্তুটি তার হাতে থাকতো সেটি রিক্সাওলার ব্যবহারের যন্ত্রপাতি নয়। সেটি একটা কলম। বলপয়েন্ট কলম। এই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রসুল রোজ যায় পৌর ভবনের ভাড়াটে গাড়ির বিভাগে। সাধারণভাবে এই বিভাগের নাম 'হ্যাকনিস্ এ্যান্ড ক্যারেজেস্ ডিপার্টমেন্ট।' ধুলোয় ঢাকা লেজার বইগুলোর আড়ালে বসে সে লাইসেন্স নবীকরণের কাজকর্ম দেখাশোনা করে। ওদের সাহায্য করে। স্বল্পায়ু সিলিং পাখার হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে দোল খাচ্ছে ঘরময় ছড়িয়ে থাকা মাকড়সার জাল। আর তারই তলায় বসে মহোৎসাহে নবীকরণ অনুষ্ঠানের কাজকর্ম চলছে। কাগজপত্রে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ বাবদ ব্যয় হয় বারো পয়সা (১৯১১ সাল থেকে এই হিসেবের কোন হেরফের হয়নি)। কিন্তু কার্যত এর মুদ্রামূল্য অনেক বেশী। শোনা যায় যে একজন রিক্সাওলাকে উৎকোচগ্রাহী পুলিসের হাতে তিরিশ টাকা ঘুষ দিয়ে এই মূল্যবান দলিলটি হস্তগত করতে হয়। পরিত্রাতা রসুল যখন উপস্থিত থাকে না তখন ঘুষের পরিমাণ নাকি তিনগুণ বেড়ে যায়।

রসুলকে পরিত্রাতা বলাই ভাল। যথার্থই সে যেন এদের রক্ষাকর্তা। আশ্রয়পদ। তিরিশ বছর ধরে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করছে সে। কখনো প্রতিবাদ সভা, কখনো অনশন ধর্মঘট। মানুষ নামক ঘোড়াদের যেমন সংহত করেছে তেমনি প্রেরণা দিয়েছে আত্মম্ভরি লোভী মালিক আর অত্যাচারী পুলিসের একতরফা জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। পৌর কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও তাকে লড়াই করতে হয়, যখন যানজটের ওজর দেখিয়ে নতুন তৈরি হওয়া রাস্তায় তারা রিক্সাওলাদের ঢুকতে দেয় না। কলকাতার এই যানজট শহরের রিক্সাওলাদের কাছে এক মারাত্মক দুর্বিপাক। প্রায়ই এর ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে তাদের আকণ্ঠ ডুবে যেতে হয়। তাই ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে প্রায়ই তাদের অনাবশ্যক ঘুরপথ পাড়ি দিতে হয়।

মালিকদের এই অসঙ্গত দাবি হতভাগ্য রিক্সাওলাদের যেন আর একটা আঘাত দিল। আহত মানুষগুলো আর্তনাদ করে উঠলো এই আঘাত পেয়ে। রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে পার্কে, গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে চৌরঙ্গীর উঁচু উঁচু বাড়ি, হাওড়ার বস্তি থেকে উড্‌স্ট্রীটের সুরম্য বাসভবন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এই

আর্তনাদ। ঠক্ ঠক্ ঠক্—রিক্সার দুই শকটদণ্ডের গায়ে বর্তুলাকার ঘন্টির আওয়াজ থেকে উত্থিত হলো তীব্র রাগের সমবেত গর্জন।

হাসারি পাল মনে করতে পারে সেই অবস্থাটা। 'আপনুকে বাঁচাতে কেউ ছুরি নেয়। কেউ বন্দুক ব্যাভার করে। কিন্তুক আমাদের হাতে অস্তর নাই। আছে শুধু শুপারির মাপের একখানি ঘন্টি। তবে ইহার আওয়াজটি বড় চড়া। ছুরি বন্দুকের চেয়েও ইহার তেজ অধিক। কলকেতার সকল রিক্সাওলার আঁতের কথা ফুটে উঠলো ঘন্টির শব্দে। মিথ্যে লয় কথাটা। সেদিন সকালে যথার্থই সোরগোল তুললো ঘন্টির ঠন্ঠন্ শব্দ। মালিকের লোক এল। কথাটা বুঝাইতে চাইল কেনে ভাড়ার রেট বাড়াইচে অরা। সাধারণত, এ দায় মালিক নেয় না। আমরা ভৃত্য, দাস। অনুগত চাকরবাকরের কাছে কেউ কৈফিয়ত দেয় না। কিন্তু সিদিনের সোরগোল অদের আঁতে পোঁচে গেছিল। অরা বুঝলো গতিক ভাল লয়। মোরা চিড়িয়াখানার ছাগল নই যে বিনা প্রিতিবাদে সব মেনে লিব। অদের দাবিটা অন্যায্য। অনেক অধিক চাইছে অরা। মুসাফির মালিকের পোষা লুক। আমার দিকে ফিরে সে বুললো, "তুই ত' জানিস কত টাকা আজকাল গাড়ি চালু রাখতে ব্যয় হয়? চাকা বদলাতে, মাথার নতুন ঢাকা কিনতে, পুলিসকে ঘুষ দিতে কত ব্যয় হয় জানিস না তুই?"

'এরা মাতব্বর মনিষ্যি। ঘরে বস্যে খরচের হিসেব করে এখানে এয়েচে। আমরা এত সব বুঝি না। চাকার কত দাম, কত ট্যাকা ঘুষ দিতে হয়, এসব তত্ত্ব লয়ে আমাদের কি কাম? মালিকের অসুবিধের কথা চিন্তা করে আমরা পিঠ বেঁকিয়ে খেটে মরি? আমরা খাটি আমাদের বালবাচ্চা পরিবারের জন্যি। অরা ট্যাকার পাহাড় বানায়।

'ত্যাখন খুব হৈচৈ চলছে। সবাই কথা বুলতে চাইছে। কেউ শুনছে না। এমন সময় রসুল এল। অ আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি। অর কথার খুব দাম। অকে দেখেই সবাই চুপচাপ। রসুলভাই ছোটখাট রোগা মানুষটি। তবে অর রোক খুব। যেন জাল কেটে বেইরে আসা পক্ষী। এমনি উয়ার তেজ। মালিকের পোষা লুকদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে রসুল সাফ কথা বুললো। "তোমাদের মালিককে গিয়ে বলো অন্যায্য হুকুম তুলে না নিলে শহরের রাস্তায় একটা রিক্সাও চলবে না।" মালিকের লোকগুলিন আস্তে আস্তে সরে পড়লো সেখান থিক্যে।

'রসুল এবার ধর্মঘটের ছাপানো কাগজ বিলি করতে লাগলো। লিখতে পড়তে না জানলেও সবাই বুঝলুম অতে ধর্মঘটের কথা লিখা আছে। দূর দূর জায়গা থেকে দলে দলে রিক্সাওলারা ত্যাখন এয়েছে। পার্ক সার্কাস ময়দান ভরে গেল আমাদের লুকের ভিড়ে। রিক্সা, লরি, বাস, টেরাম—সে এক জটাপটি ব্যাপার। পুলিসের গাড়ি আইল। এক গাড়ি পুলিস নাবলো জট্যাপটি ছাড়াতে। ত্যাখন সেখানে মনিষ্যির সমুন্দুর। যেন উথলে উঠেছে জল। পুলিসে ত্যাখন লাঠি পেটাইতে লেগেছে। এরই মধ্যি একজন কাস্তে হাতুড়ি ছবি আঁকা লাল শালু টাঙায়ে দিল দুটি বাঁশের আগায়। সব মনিষ্যির মাথার উপরে তিরতির করে কাঁপছে সেই লাল শালু। ই দ্যাখ ক্যানে কেমন আমাদের জয় হইছে!

'আরও রিক্সা আইছে। ঘন্টির আওয়াজে কর্ণ বধির হয়্যে গেল আমাদের। মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ পক্ষী ডানা ঝাপটাইছে। মালিকদের কর্ণেও সে শব্দগুলিন পেঁছবে বটে যদি না অরা কানে তুলো দেয়। মালিকদের পোষা লুকেরা আবার ফিরে আইল। অদের মুখগুলিন বিষণ্ণ। মুখের কিরণ মুছে গ্যাছে। মালিকরা নাকি

ভাড়ার রেট কম করাতি চায় না। অদের কথা শুন্যে সবাই ত্যাখন ঠেলাগাড়ির উপর তুলে দিল রসুলকে। হাঁক পাড়লো রসুল, "ভাইসব!" উ'য়ার ছোট্ট বুকের ত্যাজ দ্যাখ কেনে। গমগম করছে জায়গাটা। রসুল বুললো, "মালিকরা আরও লাভ চাইছে। ওদের লোভের শেষ নাই। কাল ওরা দু দফায় ভাড়া চেয়েছিল। আজ ওরা ভাড়ার রেট্ দেড়া করতে চাইছে। আল্লা জানেন, আগামী কাল ওরা আরও কি চাইবে।"

'রসুল অন্যেক কথা বুললো। উয়ার মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু কথাগুলিন আঁতে ধরলো সবার। বালাবাচ্চা লয়্যে সবাইকে উপোষী থাকতি হবেক। যদি মালিকদের অন্যায্য দাবিগুলিন প্রিতিবাদ না করি। আমাদের জমি-জিরেত লাই। এখুন যদি রিক্সাটানা বন্ধ হয়্যে যায়, তবে মিত্যু অনিবায্য। তাই আমাদের শক্ত হতে হব্যেক, সমবেত হতে হব্যেক, যাতে আমাদের দাবিগুলিন উয়ারা মানতি বাধ্য হয়। তার জন্যি দরকার পড়লি, আমরণ লড়াই করাতি হব্যেক আমা-দের। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! ত্যাখন সবাই বললুম ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ!'

'রামের কথাটা মনে পড়ছিল আমার। অর কপালে নাই তাই এ সুখ সে দ্যাখতি পেল না। সবাই আমরা একত্র হয়্যাছি, কাঁধে কাঁধ মিলাইছি, এক মুঠ ভাতের জন্যি লড়াই করতে নামছি ; এ কি কম ভাগ্য! এতদিন সে একা লড়াই করছ্যে। কেউ তাকে সঙ্গ দেয় নাই। বাদলের আগে আগে যেমন পুবে বাতাস বয়, তেমনি আমরাও চলেছি লড়াইয়ের আগে আগে। এবার ঝমঝম শব্দে শুরু হব্যে লড়াই। ত্যাখন সবাই একত্র হয়্যা কণ্ঠ মিল্যায়ে বুললো, "বিপ্লব জিন্দাবাদ!" তা বিপ্লব কী বটে? রাত পুয়ালেই শুরু হব্যে লড়াই। তা কিসের লড়াই বটে? আমার কামনা সামান্যই বটে। দ্যাশের জন্যি আরও কিছু ট্যাকা আর ইয়ার বন্ধু লয়্যা এক বুতল বাঙ্‌লা—ইতেই আমার সুখ!

'রসুল বুললো যারা ধর্মঘট চাও তারা হাত তোল। আমাদের মনটা ছটফট কর্যা উঠলো। এ অর মুখের পানে তাকালুম। এক দিনের রোজগার বন্ধ হলি অন্ন জুটব্যাক নাই। ত্যাখন? যে ডালে বসেছি সিটি কাটবো কেনে? মালিকদের অভাব নাই। তাদের ঘরের বাতায় চাল ডাল আছে। উ'য়াদের উদরে যে দিন এক দানা ভাত পড়ব্যাক নাই, তার ঢের আগেই আমরা কংকালসার হয়ে যাব। তবুও বাছবিচার করার উপায় নাই।

'আমার পাশের লুকটি হাত তোলা করলো। একে আমি চিনি গো বটি। পুলিসের লাঠির ঘা খেয়ে এর থুতনি ফেটেছে। রামের মতন এরও শ্বাসরোগ হ'য়েছে। কাশতে গেলি লালপনা রক্ত ঝরে মুখ থিক্যা। ইটি রক্তই। পানের রস লয়। কারণ মানুষটি পান খায় না। মানুষটির কাছে এখন ধর্মঘট হওয়া না হওয়া দুই-ই সমান।

'অর দেখাদেখি আরও অনেকে হাত তোলা করলো। আরও আরও। ক্রমে ক্রেমে সবাই। সি এক অদ্ভুত দিশ্য। আকাশপানে হাত উঁচু কর্যা আছে সবাই। তবে সি হাতগুলিন শক্তমুঠের হাত লয়। বিদ্বেষ আক্রোশ লয়। ই যেন আত্মসমর্পণ। লড়াইয়ের হাতিয়ার লয় ইটি। লয় শ্রমিকের লড়াই। ই লড়াইয়ে যোগ দিলে খোরা-কির ট্যাকা পাওয়া যায় না।'

হাসারির চোখের সামনে তখন ভেসে উঠলো আর একটা উত্তপ্ত দৃশ্য। হাতে

মাইক্রোফোন নিয়ে রসুল উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করছে যে ধর্মঘট হবেই। সবাই একমত হয়েছে যে এ সিম্ধান্ত নির্ভুল এবং অনিবার্য। সমবেত রিক্সাওলাদের উদ্দেশে সে বলে উঠলো, 'ভাইসব! আজ বিকেল তিনটের সময় ময়দানের সমাবেশে ভাষণ দেবেন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আবদুল রহমান সাহেব। আপনারা সবাই সে সভায় যোগ দিন। সেখানেই আমাদের বিক্ষোভের কথা আমরা জানাবো।' তখন গলায় গলা মিলিয়ে সবাই আবার ধ্বনি দিল, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' হাসারির মনে হচ্ছিল মানুষগুলো যেন নেশা করেছে এবং সেই ঘোরেই তারা চীৎকার করে দাবি জানাচ্ছে। হয়ত এমনি করেই গরিব মানুষরা নিজেদের ঘনিষ্ঠ করে। একটা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার ভাব যেন মিছিলকারীদের গ্রাস করেছে। সবাই ভাবছিল এই শহরটা যেন তাদেরই। তারাই এর মালিক যারা মানুষ হয়েও পশুর মতন ভার বয়, যাদের হেয়জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করে বাস, লরি বা ট্যাক্সির ড্রাইভাররা, কথায় কথায় যাদের লাঠিপেটা করে পুলিস, যাত্রীরা সুযোগ পেলেই যাদের ঠকায়, তাদেরই শহর এটা। তখন ঘাম ঝরানো আর গোলামি করা মানুষগুলো সত্যি সত্যি বদলে গেছে। তাদের মনে হচ্ছিল যে তারাই প্রভু। শহরের এই জনবহুল রাস্তায় সেদিন কোনো গাড়ি চললো না। হাজার হাজার রিক্সা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তুফান ডেকেছে এই জনসমুদ্রে। হাসারি বুঝতে পারছিল না ঠিক কতগুলো রিক্সা মিছিলের সঙ্গে চলেছে। পঞ্চাশ হাজার না তারও বেশী! সাগরে মেলবার আগে গংগা যেমন শতবাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে সাগরকে, তেমনি শত শত মিছিলের প্রবাহ চলেছে ধর্মতলার ময়দানের দিকে। চৌরঙ্গীর এই চওড়া শরণিটায় গত তিনমাস ধরে শ্লথগতি রিক্সার প্রবেশাধিকার ছিল না। আজ আর সে নিষেধ নেই। সাদা হেলমেট পরা পুলিসের নাকের ওপর দিয়েই হাজার হাজার শ্লথগতি রিক্সাগাড়ি চলেছে এই প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে। অবাঞ্ছিত যানজট সৃষ্টির অভিযোগের ওজর নিয়ে কেউ তাদের লাঠির গুঁতো দিচ্ছে না। রক্তচোখের শাসনটি নিবে গেছে। হাতে লাঠি আর পালিশ করা বেল্টের সঙ্গে লাগানো মারণাস্ত্রটি কোমরে গুঁজে ওরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইউনিয়নের মাতব্বররা সারা রাস্তাটাই লাল পোস্টারগুলো বিলি করেছে। সারাটা রাস্তাই স্লোগান দিয়েছে যে রিক্সাওলারা বর্ধিত হারে ভাড়া দেবে না। এটা তাদের সমবেত প্রতিবাদ। বলেছে, পুলিসের নির্যাতন আর তারা সহ্য করবে না। রাজপথের দুপাশে দাঁড়িয়ে অসংখ্য পথচারী অবাক হয়ে দেখছিল এই প্রতিবাদ মিছিল। একসঙ্গে এত রিক্সাগাড়ির মিছিল তারা আগে দেখে নি। তারা রেল-কর্মচারী বা ট্রাম কণ্ডাকটরদের ধর্মঘটী মিছিল দেখেছে। অর্থাৎ বেতনভুকদের অনেক মিছিল তারা দেখেছে এর আগে। কিন্তু এমন মিছিল দেখে নি যার সামিল হয়েছে ঠিকা মজুর। পিঠ নুইয়ে যারা জন্তুর মতন ভার বয়ে বেড়ায়, সেই নুব্জ-পিঠ, কুব্জদেহ চালচুলাহীন মানুষের এই স্পর্ধা যেন অবাক করে দিল তাদের।

প্রতিবার স্লোগান শেষে ওরা তিনবার ঘণ্টি বাজাচ্ছিল। সমবেত এই ঘণ্টিধ্বনি এমন আবহ সৃষ্টি করছিল যা রীতিমত মর্মস্পর্শী। অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এই সমবেত ধ্বনি। লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে একজন ডাবওলার কাছে ব্যাপারটা এত হৃদয়গ্রাহী হলো যে ডাবের মুখ কেটে সে ওদের মধ্যে ডাব বিলি করতে লাগলো। মিছিলের সঙ্গে চলতে চলতে হাসারির মনে হলো যে ছুটে গিয়ে লোকটাকে তার খালি রিক্সায় তুলে নেয়। এই শুকনো শহরে এমনভাবে প্রতিদিন

কেউ তাদের তৃষ্ণা মেটাবে না। আর একটু এগিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের গাড়ি বারান্দা। বিদেশী ট্যুরিস্টরা থমকে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতের ওপর। কেউ কেউ ছবি তুলছে এই উপভোগ্য দৃশ্যের। অনেকে আবার মিছিলের মধ্যে ঢুকে ছবি তুললো। কলকাতার গরিব রিক্সাওলাদের এই রাগী চেহারাটা ওদের কৌতূহল যেন উসকে দিয়েছে। যে কৌতূহল নিয়ে মানুষ আলিপুর চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখতে যায়, অনেকটা তেমনি। হাসারি জানে না পৃথিবীর আর কোন দেশে রিক্সাওলারা ধর্মঘট করে কি না। তবে কলকাতার এই মিছিল দেখে নিশ্চয়ই ওরা অবাক হয়েছে। তাই দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে ছবি দেখিয়ে ওরা ওদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জাঁক করে বলতে পারবে। অবশেষে চৌরংগীর শেষ প্রান্তে গিয়ে পেঁাছল ওদের মিছিল। আরও মিছিল আসছে এদিক ওদিক থেকে এবং এই মিছিলটার সংগে যুক্ত হচ্ছে। দেখতে দেখতে শীর্ণকায়া মিছিলটি তরঙ্গভঙ্গ জাহ্নবীর চেয়ে স্থূলাঙ্গী হয়ে উঠলো। ওদের পেঁাছতে হবে শহীদ মিনারের পাদদেশে। মেঘের বুক চিরে ঠেলে ওঠা আকাশচুম্বি মিনারটার দিকে তাকাল হাসারি। প্রায় মিনারশীর্ষের বারান্দায় কয়েকজন পুলিস দেখতে পেল হাসারি। হাজার হাজার রিক্সার এই বিস্ময়কর সমাবেশ দেখে নিশ্চয়ই ওদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে। মিনারের তলায় লাল শালু দিয়ে মোড়া বক্তৃতামঞ্চ তৈরি হয়েছে। পতপত করে উড়ছে লাল পতাকা। পরিবেশটি দারুণ জমকাল দেখাচ্ছে। মঞ্চের সামনে পেঁাছে সবাই গাড়িগুলো মাঠের ওপর রাখলো, তারপর বসে পড়লো ঘাসের ওপর। হাসারির দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কেমন করে জড়ো করা গাড়ির স্তূপ থেকে তার নিজের গাড়িটা সে খুঁজে বার করবে।

গোলাম রসুল তখন মঞ্চে উঠেছে। আজ তার পরনে ধোয়া ধুতি ও সার্ট। নতুন কাচা ধুতিসার্টেও তাকে তেমনি ছোটখাট দেখাচ্ছে। মঞ্চের ওপর আরও অনেক লোকজন, এদের কাউকেই হাসারি চেনে না। এরপর মাইক হাতে নিয়ে রসুল হিন্দিতে কি যেন বললো। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে বললো, 'আবদুল রহমান জিন্দাবাদ!' এরপর বাংলায় বললো রসুল। হাসারি বুঝতে পারলো যে ওদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট এসে পেঁাচেছেন। লোকটাকে দেখতে পেল হাসারি। মোটা-সোটা মানুষ। চেহারাটা বেশ সুখী সুখী। বাবু চেহারার মানুষটাকে দেখলেই মনে হবে সে মোটেই রিক্সাচালক নয়। প্রায় ডজনখানেক লোক ঘিরে আছে লোকটাকে। ওরা সবাই মঞ্চে ওঠার পথ করে দিল। লোকগুলোর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে পায়ের ধুলো ঝেড়ে দেওয়া ছাড়া ওরা আর সবই করতে প্রস্তুত। লোকগুলোর পথ করা জায়গা দিয়ে যেতে যেতে আবদুল রহমান হাত নেড়ে সবাইকে যেন কৃতার্থ করলো। হাসারি অবাক হয়ে দেখলো লোকটার হাতের আঙুলে আংটির দামী পাথরগুলো সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। একটাও কমদামী পাথর নয়। লোকটা ততক্ষণে স্তাবকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে সভাপতির আসনে বসে পড়েছে।

রসুল এরপর অন্য ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সংগে সমবেত জনতার আলাপ করিয়ে দিল। এরা সবাই এসেছে নিজ নিজ ইউনিয়নের সমর্থন আর আশ্বাস নিয়ে। কেউ এসেছে জুট মিল থেকে, কেউ হিন্দুস্তান মোটর বা ডক ইউনিয়ন থেকে। প্রতিবারই উচ্ছ্বসিত আবেগে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিল ওরা। ওদের এই হার্দ্য উক্ত সমর্থনের আশ্বাস যেন ভরে দিয়েছে বুভুক্ষিত রিক্সাওলাদের শুকনো বুক। ওরা সত্যিই কৃতার্থ। রসুল আর একবার প্রেসিডেন্টের নামে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি

দিল। একটা শিহরন সঞ্চারিত হলো সভার মধ্যে। তখন অসংখ্য করতালির মধ্যে সেই আংটি-পরা-বাবুটি বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়িয়েছে। মানুষটাকে দেখেই মনে হচ্ছিল যে এই ধরনের সভায় বক্তৃতা করতে সে অভ্যস্ত। তার প্রতিটি চালচলন মাপা এবং হিসেব করা। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড নীরব হয়ে রইলো সে। সেই নিঃশব্দ মুহূর্তগুলোয় সে চেয়ে দেখছিল সভার লোকদের। মাঝে মাঝে আলতো ভাবে মাথা দোলাচ্ছিল। মুখে তৃপ্তির আলগা হাসি। মাঠ জোড়া ধানের শিষ দেখে চাষীর মুখে যেমন তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে, এ হাসি ঠিক তেমনি। লোকটা বোধহয় ঠিক করে নিয়েছে যে বাংলা হিন্দি মেশানো ভাষায় বক্তৃতা করবে। তার অনেক কথাই হাসারি তাই বুঝলো না, কারণ প্রধানতঃ হিন্দি-তেই সে বক্তৃতা দিল। লোকটার বক্তৃতায় তেজ আছে। বলবার ধরনটিও ভালো। সবাই তারিফ করছিল তার বক্তৃতার। মন দিয়ে শোনার পর হাসারিও বুঝতে পারলো তার বক্তৃতা। রাজনীতির এই বাবু মানুষটি বললো যে মালিকরা তাদের ঘাম এবং রক্ত ঝরানো শ্রমের পুরো ফায়দা লুঠ করছে এবং নিজেদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। এটাই নাকি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এইভাবেই ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং যতদিন না সরকার এই গাড়িগুলোর মালিকানা স্বত্ব কেড়ে নিচ্ছে, ততদিন রিক্সাওলাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। সুতরাং যে আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে তা হলো মালিকানা হাত বদলের আন্দোলন। আবদুল সাহেবের দেওয়া সূত্রটি সবারই মনে ধরলো। সবাই হৈ হৈ করে তাকে সমর্থন করলো। কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলতে লাগলো যেন এই মুহূর্তেই মালিকানা স্বত্বটি কেড়ে নেওয়া হয়। তাহলে অন্তত মালিকপক্ষ ভাড়ার রেট্ বাড়াতে পারবে না।

তখন ধীরে ধীরে আবদুল সাহেবের বক্তৃতার সুর বিন্যস্ত হয়েছে। আরও দ্রুত, স্পষ্ট ও জোরালো হয়েছে তার বক্তব্য। হাসারির মনে হচ্ছিল যেন রামায়ণের কথকতা শোনাচ্ছে লোকটা, কারণ কথার মধ্যে দিয়েই রাগ বিদ্বেষ প্রভৃতি বিচিত্র ভাবগুলো সে প্রকাশ করছিল। কল্পনায় মালিকদের চেহারাগুলো চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে সে যখন আঙুল তুলে তাদের কথা বলছে, তখন মনে হচ্ছিল যেন এক তীক্ষ্নফলা ছুরিকা দিয়ে সে তাদের দেহগুলো গেঁথে দিচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে হাততালি দিচ্ছে, কেউ বা অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। যারা চা ফিরি করছিল বা চাঁদা তুলছিল তারাও তাদের কাজ থামিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে জনতার সংগে চীৎকার করতে লাগলো। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। হাসারির ভয় ভয় করছে। তার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল মালিকরা বোধহয় তাদের মুখচোখের এই ক্রুদ্ধ ভাবটা দেখে ফেলবে। তার মনে হলো, এই মুহূর্তে আবদুল যদি নির্দেশ দেয় তবে মালিকদের ঘরে তারা আগুন লাগিয়ে দেবে। একটুও দ্বিধা করবে না। জনতার মনের এই ক্রুদ্ধভাবটা লোকটা তখন নিজের আয়ত্বে এনে ফেলেছে। মন্থনদন্ড দ্বারা আলো-ড়িত করে দিয়েছে এদের মনের ক্ষোভ। মানুষগুলো তখন আকণ্ঠ গিলছে আবদুলের নির্জলা বিদ্বেষ। যেন এ সবই গুরুবাক্য। গজমুখ গণেশের শুন্ডটি আশ্রয় করে নিঃসৃত হচ্ছে এই গুরুবাক্য। তাই প্রশাসন আর পুলিসের চন্ড প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার বিষোদ্গারটি সকলেরই মনে ধরলো। সমারোহ করে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। 'চলো রাইটার্স বিল্ডিং!' রাজনীতির মানুষেরা এইভাবেই লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে এবং সফল হয়। রাইটার্স বিল্ডিং নামক অতিকায় ভবনটি

স্থানীয় সরকারের প্রশাসনভবন। সরকারী দপ্তরগুলো এই ভবনেই অধিষ্ঠিত। লোকগুলো সেখানেই যেতে চাইছে। আবদুল রহমান হাত তুলে ওদের শান্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু রাগে ক্ষোভে উদ্বেল হয়ে উঠেছে জনতা। যেন গর্জন করে তুফান আসবে সমুদ্রে, তারই সংকেত নিয়ে এল ঘূর্ণিঝড়।

এইসময় হঠাৎ এমন এক ঘটনা ঘটলো যার জন্যে কেউ তৈরি ছিল না। জনসমুদ্র থেকে যেন উথলে উঠলো একটা রিক্সাওলা। তারপর ভিড় ঠেলে সোজা পেঁছিল মঞ্চের ওপর। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘটে গেছে ব্যাপারটা। লোকটার হাতের মুঠোয় তখন মাইক। আবদুলের ইঙ্গিতে দু-একজন মাইকটা কেড়ে নিতে গেল, কিন্তু তার আগেই লোকটা বলতে শুরু করেছে। 'ভাইসব! এই বাবুটি আমাদের ঘুম পাড়াতি চায়, যাতে আমাদের রাগ জল হয়্যে যায়। যাতি আমরা ছাগল হয়্যে থাকি আর বিনা প্রিতিবাদে মালিকরা আমাদের হজম কর্যে লিতে পারে।' লোকটার কথা শুনে বিমূঢ় হয়ে গেছে মানুষগুলো। সবাই তখন কিসের ঘোরে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাসারি চিনতে পারলো লোকটাকে। এরই থুতনি ফেটে গেছে পুলিসের লাঠিতে। ওরা আর একবার মাইকটা কেড়ে নিতে গেল। লোকটার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। হাসারি জানে ওর বুকের অসুখ আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে আবার বললো, 'ভাইসব! আমাদের রাগটি জিইয়ে রাখতি হব্যে। আপিস কাছারি লয়, আমাদের যেতি হবে যেখানে মালিক থাকা করে। রাগটি দেখাতি হবে সেইখানে, তবে কাজের কাজ হব্যে। একজন মালিকের ঠিকানা আমার জানা আছে। উয়ার নাম বিপিন নরেন্দর্। অর বাড়ি বালিগঞ্জ। চলো এখুনি উয়ার বাড়ি যাই আমরা।'

লোকটা দম নিতে একটু থেমেছিল, সেই ফাঁকে খাঁকি পোশাক পরা বেশ কয়েকজন লোক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো থুতনি কাটা লোকটার ওপর। একজন হাত থেকে মাইকটা কেড়ে নিল। অন্যরা হিড় হিড় করে টানতে টানতে লোকটাকে নিচে নামাল। আবদুলের হাতে তখন মাইক। উত্তেজিত হয়ে আবদুল তখন চেঁচাচ্ছে। ও লোকটা বিশ্বাসঘাতক। ওর কথা বিশ্বাস করো না তোমরা। এসব ষড়যন্ত্র। লোকটা তোমাদের শত্রু।

জনতার মধ্যে তখন খানিকক্ষণের জন্যে আলোড়ন উঠলো। একটু আগের সেই সম্মোহিত ভাবটা আর নেই। কেউ কেউ ছুটে গেল সেদিকে যেখানে লোকটাকে ওরা পীড়ন করছে। কিন্তু ব্যূহ ভেদ করে কেউ সেখানে পেঁছতে পারলো না। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাদের।

প্রথমে আবদুল রহমান পরে ইউনিয়নের লোকগুলো নানারকম ভাবে জনতাকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু মোহখোলসটি ছিঁড়ে ফেলেছে শ্রোতারা। ওই নিষ্ঠুর ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করে সবাই কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। নেতাদের কথায় কেউ আর উদ্দীপ্ত হলো না। সবার মনেই তখন একটা ভাবনা। সেদিনের রোজগারটি বন্ধ হলো। হয়ত পরের দিনটাও এমন নিষ্ফল যাবে। ঠিকা মজুরীর মানুষ ওরা। এমনভাবে কতদিন ধর্মঘট টিকিয়ে রাখতে পারবে তারা? নেতাদের বক্তব্য একে একে শেষ হলো। এরপর শুরু হলো সমবেত কণ্ঠে গান। গলায় গলা মিলিয়ে সবাই গেয়ে উঠলো আন্তর্জাতিক বিপ্লবসংগীত। পৃথিবীর সব দেশের শ্রমিকরা নাকি এই গানটি গায়। হাসারি কোনদিন এ-গান শোনে নি। গানের কথাও সে জানে না। তবুও হাজার হাজার মানুষের গলায় এই গানটি শুনে তার শরীরে যেন রোমাঞ্চ হলো। এই আন্তর্জাতিক বিপ্লব সংগীতটার নাম, 'দ্য ইন্তারন্যাশনেল্।'

বারো

জমির পুনর্বণ্টন নামক সামান্য ঘটনা থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। তখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভূমিহীন চাষীদের ডাক দিয়ে বলা হলো যে, তারা যেন জমিদারদের অধিকৃত জমিগুলোর দখল নেয় এবং সমবায় প্রথায় চাষ শুরু করে। সেদিন সামান্য কয়েকজন জোতদার এর প্রতিবাদ করলেও দু-একটা খুন বা হত্যা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল এই মালিকানা বদল। কিন্তু নক্সালবাড়ি অঞ্চলের কয়েকটা ঘটনা ব্যাপারটাকে আর তেমন নিরীহ করে রাখলো না। জমিদার এবং চাষীর মধ্যে ব্যক্তিগত লড়াইতে সীমাবদ্ধ না থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লড়াইয়ের চেহারা নিল ব্যাপারটা এবং এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হলো যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই সঙ্কটাপন্ন হতে চলেছে।

নক্সালবাড়ি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গে অবস্থিত একখণ্ড সরু ফালি ভূমিখণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় নক্সালবাড়ির অবস্থান। একপাশে নেপাল অন্যপাশে বাঙলাদেশের সীমানা এবং তিব্বত ও চীন সীমান্ত থেকে নক্সালবাড়ির দূরত্ব একশ' মাইলের মধ্যে। নক্সালবাড়ির সারা ভূমিখণ্ডে ছড়িয়ে আছে চা-বাগান এবং ঘন বন। ফলে লুকিয়ে ওত পেতে লড়াই করার একটা আদর্শ জায়গা হয়ে দাঁড়ায় এটা। নক্সালবাড়ি অঞ্চলে একটাও শহর নেই। যে ক'টা গ্রাম আছে সেখানে অস্থায়ী বাসস্থান বানিয়ে উপজাতি কৃষকরা বাস করে এবং চাষ আবাদ করে কোনরকমে জীবনধারণ করে। যে সব জমি চাষ করে তারা জীবনধারণের দরকার মেটায়, সেগুলো এত নিকৃষ্ট যে চা-বাগানের মালিকরাও তা কাজে লাগাতে চায় নি।

বিপ্লবী কার্যকলাপের একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে নক্সালবাড়ির মানুষের। অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করেছে। সুতরাং জমির পুনর্বণ্টন নীতির সরকারী নির্দেশটি খুব নির্বেদ দৃষ্টিতে তারা দেখলো না। সরকারী নির্দেশ কার্যকর করতে রীতিমত বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিল স্থানীয় মানুষ। কিছু মাওপন্থী জংগী ছাত্র (সম্ভবত পিকিং-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত) এল কলকাতা থেকে। এদেরই উসকানিতে বেশ কয়েকটা খুন হলো এবং তথাকথিত বিপ্লবীরা নিরাপত্তা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে লড়াই করলো। অচিরেই দেখা গেল যে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিধানে বলশেভিক এবং রেডগার্ডের মতন নক্সালাইট শব্দটাও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। মাও সে তুং-এর বিপ্লবী শিক্ষাধারার প্রেরণা এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ, এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এরা এক ত্রাসের রাজনীতি শুরু করলো। গ্রামের মধ্যে উৎসাহী মানুষদের ডেকে জমিদার বা মহাজনদের দাঁড় করাতো। তাদের বিচার হতো। দলিল ইত্যাদি সমারোহ করে পুড়িয়ে দেওয়া হতো এবং তারপর জমিদার বা মহাজনদের শিরশ্ছেদ করা হতো নৃশংস উল্লাসধ্বনির মধ্যে।

বলাবাহুল্য, নক্সালবাড়ির এই বিপ্লবধারার অনিষ্টকর প্রভাবটি তখন কলকাতাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে সেখানে মানুষ খুন, বোমাবাজি, বলপ্রয়োগ ত'

হচ্ছেই। এর সংগে শুরু হলো নতুন এক নির্যাতন। রাজনৈতিক নেতা এবং কলকারখানার মালিকদের আলাদা করে ঘেরাও করে রাখতে লাগলো এরা। শহরের সর্বত্র এসব ঘটনা তখন নিয়মিত ঘটছে। কলকাতার বস্তিগুলোও এর প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারলো না। আনন্দ নগর বস্তির রাস্তায় একদিন হাতবোমা পড়লো। মলোটভ ককটেল। রীতিমত মারাত্মক হাতবোমা। কিছু মানুষ আহত হলো। পার্কস্ট্রীটের মোড়ের গান্ধীজীর স্ট্যাচুর গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে কলুষময় করতেও সংকোচ বোধ করলো না নক্সালপন্থীরা। সরকার তখন সম্পূর্ণ বিমূঢ়। প্রতিঘাতের প্রশ্নে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টরা বাম দক্ষিণ দু-তরফকেই অভিযুক্ত করলো। পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে যেমন বেজিংএর নীতির নিন্দা করলো, তেমনি সি আই এ নামক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে অভিযুক্ত করলো বাংলায় রক্ষণশীল সরকার ফিরিয়ে আনার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার দরুন।

সি আই এ বা সিয়া নামক সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপের এই চেষ্টা এদেশের একটা পুরনো ঐতিহ্য, কিছুটা কিংবদন্তীমূলক বলা যেতে পারে। ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে যখনই নিরাপত্তার প্রশ্নে বিদেশীদের যোগসাজসের অভিযোগ উঠেছে তখনই সরকারী কর্তৃপক্ষ সুযোগ সুবিধে মত কিছু কিছু মার্কিন সংস্থাকে দায়বদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সাধারণভাবে এ জাতীয় নগ্ন আক্রমণ তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয় না, যদি না তার পেছনে গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি লুকিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, সেই অভিসন্ধি হলো গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ। বলতে দ্বিধা নেই, মার্কিন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগটাই বারবার করে এনেছে এদেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ। ফলে এদেশে বসবাসকারী বেশ কিছু বিদেশী প্রায়ই অকারণ পুলিস জুলুমের লক্ষ্য হয়েছে। বেচারী স্তেফান কোভালস্কীও অতঃপর এই ফাঁদের শিকার হলো শুধু বিদেশী এই অপবাদের দরুন।

স্তেফান কোভালস্কী নামক এই বিদেশী যুবকের ব্যক্তিগত পরিচয়টা এদেশের মানুষের কাছে যথেষ্ট ধোঁয়াটে। তার আসল পরিচয় সে একজন খ্রীশ্চান যাজক এবং পোলিশ। তবে একটা মন্দ দিকও জড়িয়ে আছে এই পরিচয়ের সংগে। এদেশে তার বসবাসের সরকারী স্বীকৃতি নেই। তার ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল আগে এবং সরকারী লাল ফিতার ফাঁস থেকে রেসিডেণ্ট ভিসা নামক ছাড়পত্রটি তখনও মুক্তি পায় নি। যেহেতু প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির রেওয়াজ এদেশে নেই, তাই তার তরফের সব প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। তবুও স্তেফান কোভালস্কী নিরাশ হয় নি। কারণ, সে জানে যে, তার আবেদন সরকারীভাবে নাকচ না হওয়া পর্যন্ত সে বিতাড়িত হবে না। তবে তার বিরুদ্ধে সব থেকে কঠিন অভিযোগ হলো তার বর্তমান বাসস্থান। ঘটা করে মানবসেবা এবং গরিবের দুঃখকষ্ট ভাগ করে নেবার এই লোকদেখানো আয়োজনটা কর্তৃপক্ষের কাছে দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কোন ইউরোপবাসীর পক্ষে, গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, এমনভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। অন্তত এদেশের সরকারী কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসটা এইরকম। সুতরাং আনন্দ নগরের আস্তাকুঁড়েতে স্তেফান কোভালস্কী নামক বিদেশী যুবকের এই জীবনযাপনও আত্যন্তিকভাবে দুরভিসন্ধিমূলক মনে হয়েছে। অতএব একদিন সকাল আটটা নাগাদ সাহেবী পোশাক পরা চারজন ইন্স্পেক্টর হানা দিল স্তেফানের বন্ধ দরজার সামনে। এরা সবাই

পুলিসের ইনটেলিজেন্স বিভাগের অফিসার। হঠাৎ চারজন পুলিসের আগমনে নিজামুদ্দিন লেনে যেন সাড়া পড়ে গেল। বস্তির দশ-বারোজন মানুষ উত্তেজনার আশঙ্কায় লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজির হলো স্তেফান কোভালস্কীর বন্ধ দোরের সামনে। 'ফাদার' তাদের অতিথি। সুতরাং তাঁর নিরাপত্তার জন্যে এই প্রস্তুতিটুকু তারা করলো। তাকে কেন্দ্র করে জনমানসে এই আলোড়নের আভাসটুকু খ্রীশ্চান পাদরী স্তেফান জানতে পারেনি। জানলে নিশ্চয়ই অবাক হতো। তখন তার উপাসনার সময়। ঈশ্বরের সঙ্গে নিভৃত হবার মুহূর্ত। তখন বাইরের সব কোলাহল আর উত্তেজনা যেন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সে তখন অন্তর্লোকের নিবিড়ে ঈশ্বরানুভূতির সান্নিধ্য পেতে আকুল। তখন পদ্মাসনা হয়ে, শিরদাঁড়া ঋজু করে কোভালস্কী নিবিড় ধ্যানমগ্ন। তার চোখদুটি বোজা। মৃদু মৃদু নিশ্বাস বইছে। খ্রীস্টের ছবির সামনে বসে সে যেন তখন চুপি চুপি কথা বলছিল তাঁর সঙ্গে। তাই বন্ধ দরজায় পুলিসের করাঘাত শুনতে পেল না কোভালস্কী। কেমন করেই বা শুনবে? অন্য দিনের মতন সেদিন সকালেও তার কানে বাইরের কলরব পৌঁছয় নি। ঈশ্বরকে একলা এবং আপন করে পাবার জন্যেই যেন সে তখন বধির হয়ে গিয়েছিল। আর কোনো শব্দ নয়, শুধু আনন্দ নগরের অন্তর্যামীর কণ্ঠস্বর সে নিজের মধ্যে শুনছিল।

এদেশের রীতি অনুযায়ী বাইরে জুতো খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলো পুলিস অফিসারটি। বেঁটে মোটা চেহারার মানুষটার দাঁতগুলো পানের ছোপ লেগে লাল হয়ে গেছে। তার সার্টের বুক পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে গোটা তিনেক বলপেন। ধ্যানে বসা স্তেফান এবং ঘরের অবস্থাটা এক নজর দেখে লোকটা একটু উদ্ধত স্বরে বললো,

'আপনি এই ঘরেই থাকেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তখন দেওয়ালে টাঙানো যীশুর ছবিটার দিকে তার চোখ পড়েছে। একটু কাছে এগিয়ে এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ছবিটার আপাদমস্তক দেখে জিজ্ঞেস করলো।

'এটা কার ছবি?

'আমার রাজার।'

'অর্থাৎ আপনার মালিক?

'যা বলেন।' মৃদু হেসে বললো স্তেফান।

লোকটার বোধহয় এসব হাসি-ঠাট্টা পছন্দ হলো না। ছবিটার আরও ঘনিষ্ঠ হলো সে, তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন জুতসই একটা প্রমাণ সে পেয়েছে। একটু পরে আর একজন অফিসারকে ডেকে ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিতে বললো। তারপর স্তেফানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার আর সব জিনিসপত্র কোথায়?'

ঘরের কোণে পড়ে আছে টিনের একটা তোরঙ্গ। এখানকারই একটি গরিব খ্রীশ্চান পরিবার তাকে দিয়েছিল যাতে সে সাবধান বাইবেল আর ওষুধ কটা রাখতে পারে।

লোকটাকে ইঙ্গিতে তোরঙ্গটা দেখিয়ে দিল স্তেফান। পুলিস অফিসারটি তখন প্রতিটি জিনিস তন্নতন্ন করে দেখলো। পেঁটরা থেকে অনেকগুলো গুবরে পোকা বেরিয়ে এদিক ওদিক দিয়ে ছুটে পালালু। লোকটা তখন সত্যিই হতাশ হয়ে

গেছে। একটু আশ্চর্য হয়ে বললো,

'এই-ই সব?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই-ই সব।'

লোকটার চোখ-মুখের অবিশ্বাস দেখে তখন করুণা হচ্ছিল কোভালস্কীর। হায় হায়! পর্বতের মূষিক প্রসব! সত্যিই তার আরও কিছু থাকা উচিত ছিল। হঠাৎ লোকটা বললো, 'আপনার রেডিও নেই?'

'না।'

লোকটা তখন বস্তিঘরের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা দারুণ মনোযোগ দিয়ে দেখলো। ঘরে একটা ইলেকট্রিকের বাল্বও নেই। এবার পকেট থেকে একটা নোটবই বার করে অদক্ষ হাতে ঘরের একটা নক্সা আঁকবার চেষ্টা করলো। বেশ সময় নিল নক্সাটা আঁকতে, কারণ পকেটের একটা কলমও কাজ করছিল না।

এইসময় এমন অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার হলো যার দরুন ঘটনার মোড় যেন অন্য দিকে ঘুরে গেল। বাইরের লোকের সতর্কতা না মেনে হুড়মুড় করে তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে বন্দনা। রাগে জ্বলছে তার দুটো চোখ। ঘরে ঢুকেই পুলিস অফিসারের হাতটা ধরে তাকে দরজার দিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সে। লোকটা স্তম্ভিত। কোভালস্কীও অপ্রস্তুত। বন্দনার কোন খেয়াল নেই। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বললো,

'বেরিয়ে যান এঘর থেকে! জানেন উনি কে? উনি ঈশ্বরের দূত। ওঁকে অপদস্থ করছেন? আপনাদের ভগবানের ভয় নেই?'

পুলিস অফিসারটি তখন এত বিব্রত যে একটুও বাধা দেবার চেষ্টা করলো না সে। বাইরে তখন অনেক মানুষের ভিড়। সাহস পেয়ে তারাও চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের স্তেফানদাদাকে ছেড়ে দিন।'

লোকটা এত বিমূঢ় হয়ে গেছে যে কথা বলতে পারলো না। তাড়াতাড়ি কোভালস্কীর কাছে গিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলো, তারপর বিনীতভাবে বললো,

অনুগ্রহ করে যদি আমাদের হেডকোয়ার্টার্সে আসেন তবে কৃতার্থ হই। আমার ওপরওলার কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই, যাতে আপনার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তার সুযোগ উনি পান। এই বলে লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর বন্দনা আর অপেক্ষমান জনতার দিকে চেয়ে বললো,

'আপনারা অনুমতি দিন। কিছুক্ষণের জন্যে এঁকে আমাদের অফিসে নিয়ে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, দুপুরের আগেই এঁকে এখানে ফেরত দিয়ে যাব।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করলো কোভালস্কী। তারপর পুলিসের গাড়িতে উঠলো। মিনিট-দশেক পরে একটা পুরনো ভাঙাচোরাবাড়ির সামনে ওরা গাড়ি থেকে নামলো। এখান থেকে হাওড়া হাসপাতাল বেশী দূরে নয়। ভাঙা বাড়ির অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে লোকটা নিয়ে চললো তাকে। সিঁড়িময় পানের পিকের দাগ। ওরা যে ঘরটায় ঢুকলো সেটা বেশ বড়সড়। ঘরময় এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে উইলাগা তাক। তাকের ওপর থরে থরে জড়ো করা আছে সরকারি ফাইলের স্তূপ। পুরনো জংধরা পাত দিয়ে সেগুলো ঢাকা আছে বলে সিলিংফ্যানের হাওয়ায় তার পাতা উড়ে যাচ্ছে না। ঘরে ঢুকেই মনে হলো তখন চা পানের সময়। হাতে হাতে চায়ের পেয়ালা। সবাই কথা বলছে আর চায়ে

চমক দিচ্ছে। দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফাইলগুলো তাদের সামনে চিত করে খোলা। হঠাৎ একজন বাস্কেটবল জুতো পরা সাহেবকে দেখে ওরা সবাই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলো। যে লোকটা তাকে সঙ্গে এনেছে সে একজনকে বললো, 'আনন্দ নগরে যে পোলিশ পাদরী থাকে ইনি সেই লোক।'

লোকটা এমন গর্বভরে কথাটা বললো যেন মনে হচ্ছিল মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীকে সে ধরে এনেছে।

যার কাছে স্তেফান কোভালস্কী দাঁড়িয়ে আছে সে লোকটার বয়স হয়েছে। মাথায় অনেক চুল পাকা। দেখে মনে হচ্ছে সে এখানকার বড়বাবু। ধপধপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটা তাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললো। এক কাপ চা এল কোভালস্কীর জন্যে। এবার লোকটা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'কেমন লাগছে জায়গাটা?'

'খুব ভাল।'

উত্তর শুনে বড়বাবুকে যেন চিন্তিত মনে হলো তার। তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে সিগারেটটা ধরা আছে এবং বুড়ো আঙুল ও বাঁকানো তর্জমার মধ্যে যে ফাঁক টুকু সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে মুখ লাগিয়ে পানীয় পান করার মত ধোঁয়া টানছে লোকটা! ধূমপানের এমন বিচিত্র ভঙ্গি কোভালস্কী আগে দেখে নি। এইভাবে বার-দুয়েক টান দিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না যে বস্তি ছাড়া আরও অনেক সুন্দর জিনিস বিদেশী টুরিস্টদের দেখবার আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা নির্ভর করে কে কি চায় তার ওপর।'

লোকটা আর একবার সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'বস্তিতে আপনি কি খুঁজছেন বলুন তো?'

কোভালস্কী বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ধারণা হলো সে শুধু নিজেই শুনছে। যারা জেরা করছে তারা এতটুকুও বুঝছে না। ফলে শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেড়ে উঠছে, বোঝানো যাচ্ছে না। কিন্তু কোভালস্কী ভুল বুঝেছে এই দেশটাকে। মানুষের প্রতি দয়া দেখানোটা এ দেশের মানুষ খুব শ্রদ্ধা করে। এই মানবিক গুণের জন্যেই পুলিস অফিসারটির কাছে কোভালস্কীর বিশেষ সমাদর হলো।

হঠাৎ গোঁফওলা একজন ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

'বিয়ে করেছি।'

'বিয়ে করেছেন?' লোকগুলোর মুখ-চোখ দারুণ সংশয় ফুটে উঠেছে তখন।

ওদের সংশয় দূর করতে বেশ দৃঢ়ভাবে কোভালস্কী বললো, 'আমার বিয়ে হয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে।'

যে লোকটা কোভালস্কীর ঘর সার্চ করতে গিয়েছিল সে তাড়াতাড়ি যীশুর ছবির ভাঁজ খুলে বড়বাবুর টেবিলের ওপর রাখলো।

'স্যার! ও'র ঘর সার্চ করে এই ছবিটা পেয়েছি। উনি বলছেন এটা ও'র মালিকের ছবি।'

বড়বাবু অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখলো। তারপর স্তেফান কোভালস্কীর দিকে তাকাল। স্তেফান গভীর স্বরে বললো, 'যীশুর ছবি। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করার ঠিক পরের মুহূর্তের ছবি।'

লোকটা শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালো। তারপর বললো, 'এ'রই সংগে আপনার বিয়ে হয়েছে?'

'আমি ওঁর চরণাশ্রিত দাস।'

সহজ করেই বললো কোভালস্কী যাতে জটিল না হয়ে পড়ে আলোচনা। ভারতবর্ষ ভগবদ্‌ভক্তির দেশ। যা পবিত্র যা পুণ্যে সেটাই যেন মানুষের মনকে নাড়া দেয়। সেই ভক্তির ভাবটি তখন ফুটে উঠেছে কোভালস্কীকে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মুখে। তার দৃঢ় ধারণা হলো এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওদের মনের সংশয়টি মুক্ত করতে পেরেছে সে।

কিন্তু বড়বাবুর মুখটা তখনো শক্ত। চেয়ারে বসে সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো। 'সি. আই. এ-র সংগে আপনার কেমন সম্পর্ক?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল কোভালস্কী। কিছুক্ষণ কথা হারিয়ে চুপ করে বসে রইল। তারপর বললো, 'কোনো সম্পর্ক নেই।'

কিন্তু কোভালস্কীর কণ্ঠস্বরে কোনরকম আত্মপ্রত্যয় যেন ছিল না। তাই পুলিস অফিসারটি আবার চাপ দিল, 'সি. আই. এ-র কারো সংগেই আপনার যোগাযোগ নেই?'

এবার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লো কোভালস্কী।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ফর্সা চেহারার এক ছোকরা। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'অথচ বেশীরভাগ বিদেশী যারা সমাজকর্মী বলে পরিচয় দেয়, তারা কোন না কোনভাবে সি. আই. এ-র এজেন্ট। তাহলে আপনি কেন ব্যতিক্রম?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলো কোভালস্কী। তারপর দৃঢ়স্বরে বললো, 'আমি জানি না বেশীরভাগ সমাজকর্মী সি. আই. এ-র এজেন্ট কি না। তবে ছেলেবেলায় অনেক গোয়েন্দা গল্প পড়েছি। সেই জ্ঞান সম্বল করে বলতে পারি যে চব্বিশ ঘণ্টা বস্তির চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে কেউ সি. আই এ-র উপযুক্ত এজেন্ট হতে পারে না। তাছাড়া আপনাদের নজরবন্দী থেকে বাইরের মানুষের সংগে যোগাযোগ রাখাও মুশকিল। আপনারা ভাল করেই জানেন যে, বস্তির লোকজন ছাড়া আর কেউ আমার সংগে দেখা করে না। সুতরাং দয়া করে আজগুবি প্রসংগ তুলে অযথা আমার বা আপনাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

সিনিয়র পুলিস অফিসারটি স্থির হয়ে কোভালস্কীর কথা শুনছে। তাকে এবং কোভালস্কীকে ঘিরে তখন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সহকর্মীরা। হঠাৎ ক্ষমা চাওয়ার ভংগিতে সিনিয়র অফিসারটি বলে উঠলো, 'আমায় মার্জনা করুন শ্রী কোভালস্কী। কিন্তু এটা আমার ডিউটি। তাই নানা অপ্রিয় কাজ করতে হয়। এবার বলুন নক্সালদের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

'নক্সাল?' আর একবার হতবাক হলো বেচারা কোভালস্কী।

'হ্যাঁ তাই। যতটা ভান করছেন প্রশ্নটা কি ততখানি অসঙ্গত মনে হচ্ছে আপনার?' সিনিয়র অফিসারটি এবার নড়েচড়ে বসলো, তারপর শক্ত করে বললো, 'আপনাদের যীশু খ্রীষ্ট আর নক্সালদের আদর্শে যে অনেক মিল আছে তা কি মনে হয় না আপনার?'

কোভালস্কীর অবাক মুখের দিকে চেয়ে বড়বাবু এবার শান্ত স্বরে বললো, 'উভয়েরই আদর্শ কি বিদ্রোহ নয়? গরিব আর অসহায়দের প্রতি অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো?'

'ঠিকই বলেছেন। তবে ইতর বিশেষ আছে বৈ কি এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ সেই তফাত।'

'যেমন?'

'যীশু খ্রীষ্ট বিপ্লব করেন প্রেম ভালবাসা দিয়ে, নক্সালরা বিপ্লব করে হত্যা আর খুন দিয়ে।'

পাশের সেই ফর্সা চকচকে চেহারার ছোকরাটি এবারও মাঝে পড়ে কথা বলে উঠলো. 'তার মানে নক্সালদের কাজকর্মের প্রতিবাদ করছেন আপনি?'

'হ্যাঁ করছি। দৃঢ়ভাবে করছি। যদিও প্রথম দিকে এদেরও সংকল্প যথার্থ ছিল।'

কোভালস্কীর কথাটা শেষ হবার মুখেই সিনিয়র অফিসারটি বলে উঠলো, 'তবে কি ধরে নেব যে আপনি মাও-পন্থীদের কাজকর্মেরও প্রতিবাদ করেন?'

অপরের শিরচ্ছেদন করে যদি কেউ আনন্দ পেতে চায়, আমি তার প্রতিবাদ করি। যে কেউ এমন কাজ করুক না কেন সে আমার ঘৃণা পাবে।'

আলোচনার পরিবেশ তখন রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেছে। অবস্থাটা লঘু করতে তখনকার মত জেরা করা বন্ধ হলো। চিফ ইন্সপেক্টর আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে ইতিমধ্যে। শূন্য চায়ের কাপগুলো দ্বিতীয়বার পূর্ণ হলো। চা খাওয়া শেষ করে কয়েকজন এক এক খিলি পান মুখে পুরেছে। কথা বলার সময় তাম্বুল চর্চিত সহাস্য বদনের মধ্যে দাঁত ও মাড়ির রক্তিম চেহারাটা দূরপনেয় কলঙ্কের মত শোভা বর্ধন করছে। মধ্যবর্তী বিরামের পর ফের শুরু হলো জেরা। সিগারেটে টান দিয়ে চিফ ইন্সপেক্টর অর্থাৎ বড়বাবু জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বলছেন আপনি সি আই এ-র এজেন্ট নন। নক্সাল বা মাও-পন্থী আন্দোলনকারীদের সংগেও আপনার যোগাযোগ নেই। তবে কি ধরে নেব যে আপনি একজন জেসুইট? ধর্ম প্রচারক?

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল কোভালস্কী। অভিযোগটা এত নগ্ন যে প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছে হলো না। একবার মনে হলো রাগে ফেটে পড়বে সে। পরক্ষণেই যেন মনে মনে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠলো সে। দ্বন্দ্বদীর্ণ মনটা সংযত করতেই এই সময়টুকু নিয়েছে সে। একটু পরে মন স্থির করে শান্তভাবে বললো, 'আপনারা কি আমায় মিশনারী প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন? তাহলে বলি যে আপনারা আবার সময় নষ্ট করছেন। আমি যেমন মিশনারী নই তেমনি সি আই এ-র এজেন্টও নই।'

বড়বাবু তখনো জিদ করে চলেছে। বললো, 'কিন্তু আপনি তো জানেন নাগাল্যাণ্ডে মিশনারীরা কি করেছিল?'

'না. জানি না।'

'তাই বলুন। আপনি জানেন না। তাহলে জেনে রাখুন সেখানে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকেছে। স্থানীয় লোকদের ক্ষেপিয়েছে এবং তাদের দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলিয়েছে।'

বড়বাবুর অভিযোগটা সরাসরি মেনে নিল না কোভালস্কী। তীব্রভাবে জবাব দিল। বললো, 'জেসুইট বা যাই বলুন, এদেশে অসংখ্য মিশনারীদের বেশীরভাগই মানুষের কল্যাণের জন্যেই কাজ করে। কোনরকম অন্যায় কাজের প্রশ্রয় তারা দেয় না।'

কিঞ্চিত অবজ্ঞার সংগে কোভালস্কী ফের বললো, 'আপনারা যাকে মিশনারী স্পিরিট বলেন. নিশ্চয়ই তার প্রকৃত মর্মটি বুঝে তা বলেন। মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা ও তাদের ভালবাসার মধ্যে দিয়েই সেই স্পিরিটটি তারা প্রকাশ করে। এটা তাদের ব্রত। ভারতবর্ষের ভাইবোনদের ভালবাসা দিয়েই এই ব্রতটি পালন করে এরা।'

কোভালস্কী চুপ করলো। সবাই নিঃশব্দ। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চিফ ইন্সপেক্টর। তারপর সাগ্রহে হাতখানা বাড়িয়ে দিল কোভালস্কীর দিকে। একে একে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে কোভালস্কীর সংগে করমর্দন করলো। একটা সুন্দর বোঝা-বুঝির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন।

কোভালস্কীও উঠে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। এবার তার ফেরার পালা। যীশুর ছবিখানা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। সেখানা দেখিয়ে একটা অদ্ভুত অনুরোধ করলো প্রধান পুলিস অফিসার। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে বললো, 'একটা অনুরোধ ছিল শ্রী কোভালস্কী।'

'বলুন।'

'আমি হিন্দু। কিন্তু যীশুর এই ছবিখানা আমাদের পরিচয়ের স্মরণিকা হিসেবে নিজের কাছে রাখতে চাই।'

নিজের কানে শুনেও যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না কোভালস্কীর। পুলিসের বড়বাবু হিন্দু হয়েও যীশুর ছবিখানা নিজের কাছে রাখতে চাইছে! সত্যিই তখন সে অভিভূত। একটু চুপ করে সে বললো, 'ছবিখানা আমায় একজন দিয়েছেন। তাই এর ওপর আমার একটু আসক্তি আছে। তবে কথা দিচ্ছি এর একটা ছবি করিয়ে আপনাকে আমি দেব।'

আন্তরিক খুশী হলো প্রধান পুলিস অফিসার। এরপর টেবিলের টানা থেকে মোহর লাঞ্ছিত একখানা ছাপানো কাগজ বার করে টেবিলের ওপর রাখলো। কোভালস্কী চেয়ে আছে অফিসারটির দিকে। মৃদু হেসে সে বললো, 'পরিবর্তে আপনাকেও একটা জিনিস দিতে চাই যা পেলে আপনি খুশী হবেন।'

কোভালস্কীর সাগ্রহ দৃষ্টির সংগে দৃষ্টি মিলিয়ে অফিসার ফের বললো, 'এটা আপনার রেসিডেন্ট পারমিট। নিন ধরুন।'

অল্পক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে অফিসার আরও বললো, 'আমার দেশের তরফ থেকে আপনাদের মত যথার্থ সাধু ধার্মিক মানুষকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।'

তেত্রিশ

আদ্যাশক্তি মহামায়া সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী অভয়া এবং অজেয়া; তিনি অসুর বিনাশিনী শিবপ্রিয়া এবং কৈবল্যদাতা মহাদেবের শক্তি। হিমালয়ের দুহিতা এবং সর্বগুণালঙ্কৃতা। দেবতাকুলের শক্তিরূপিণী এবং স্বপ্রকাশস্বরূপিণী। ইনি মোহিনী, ইনি ভয়ঙ্করী এবং নিষ্ঠুরা। পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রে এই দেবী সম্বন্ধে শতশত শ্লোকগাথা রচিত আছে। মহাভাব স্বরূপিণী এই দেবীর নানা পরিচয় এবং নানা ভূষণাদি দ্বারা তিনি ভূষিতা। ইনি সর্বগুণসম্পন্না।

কল্যাণীরূপে ইনি উমা; নিত্য কল্যাণময়ী এবং জ্যোতিঃ উদ্ভাসিতা। গৌরবর্ণা, তাই দেবী গৌরী। গিরিরাজ-কন্যা এবং পর্বতরাজ্ঞী, তাই পার্বতী। ইনি জগন্মাতা। সমগ্র বিশ্বচরাচরের দয়াময়ী জননীস্বরূপা। আবার যখন ত্রিভুবনের পাপনাশিনী, তখন ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা দেবী কালী, ভীষণা ভয়ঙ্করী ভৈরবী, অতিকোপনা চণ্ডী এবং জগত্তারিণী দেবী দুর্গা। এই জগত্তারিণী

দুর্গারূপেই বাংলার ঘরে ঘরে তিনি পূজিতা। এই দেশের প্রতিটি শিশুই এই কল্পকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে এক মহাপরাক্রান্ত দুর্দান্ত অসুর ধরাধাম বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হয়। তার অত্যাচারে পৃথিবীর ঋতুচক্র বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। দুষ্ট স্বভাবের এই অসুর যেমন জ্ঞানহীন তেমনি তামস তার প্রকৃতি। দেবতারাও এই দুষ্ট দানবের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পায় না। তখন প্রতিকার প্রার্থনা করে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেল। ব্রহ্মা বললেন যে একমাত্র শিবতেজ থেকে উৎপন্ন পুত্রই এই অত্যাচারী তারকাসুরকে বধ করতে পারবে। কিন্তু সতীর দেহত্যাগের পর সতী-হীন শিব পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক। তিনি তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে জীবনধারণ করেন। যে যা ভিক্ষা দেয় তাতেই তুষ্ট থাকেন আশুতোষ। তাঁর দেহ ভস্মাবৃত, তিনি জটাজুটধারী। আশুতোষ শিবের মতন শতশত সন্ন্যাসী এমনি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবনধারণ করছে তাঁরই পথ অনুসরণ করে।

এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে পৃথিবীর মানুষ উৎপীড়িত হয়ে উঠেছে। দেবতাগণও ভীত সন্ত্রস্ত। সতীর শোকে শিবকে উন্মাদপ্রায় দেখে তাঁরা বিলাপ করছেন। তাঁরা খেদ করছেন কারণ শিব পুনর্বিবাহে সম্মত হচ্ছেন না। তখন দেবতারা মদনদেবের শরণাপন্ন হলেন। মদন হলেন কামদেব। তিনি প্রেমের দেবতা। রতি তাঁর স্ত্রী। তিনি মদালসা, বিলাসিনী এবং কামনাময়ী। মদনদেবের সখা বসন্তঋতু। শিব তখন হিমালয়ে তপস্যারত ছিলেন। মন্মথর ফুলশরে শিব যাতে জর্জরিত হন তাই দেবতারা মদনদেবের শরণাপন্ন হয়েছেন। মদনদেবের ফুলশরে মথিত হলেন শিব এবং মদনাহত শিবের দর্প চূর্ণ হলো। সেই থেকে উমার কথা ভাবতে শুরু করলেন শিব। উমা তখন গিরিরাজের কন্যা। শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যায় বসলেন তিনি। বহু বৎসর তপস্যার পর শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন হলো। তাঁর তখন অন্য নাম। তিনি গিরিরাজকন্যা পার্বতী। শিব-পার্বতীর মিলন দেখে দেবতারা হৃষ্ট হলেন।

কিন্তু পতিপত্নীরূপে সুদীর্ঘকাল সম্ভোগের পরেও শিবের বীর্জসম্ভূত পুত্রের জন্ম হলো না। এদিকে অসুরের অত্যাচারের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ দেবতা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তখন দেবতারা একত্র হলেন এবং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু জানালেন যে সমস্ত দেবতাদের তেজ হতে যদি কোনো পরমাসুন্দরী নারীর জন্ম হয়, তবেই তিনি অসুরকে বধ করতে পারবেন। এই শুনে দেবতাগণ নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং প্রার্থনা করলেন যেন সমবেতভাবে উৎপন্ন তেজ হতে এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। অতঃপর এই দেবীমূর্তি দুর্গারূপে আবির্ভূতা হলেন। তিনি দশভুজা এবং সর্বশক্তিসম্পন্না। দেবতাগণ তাঁকে আপন আপন আয়ুধসমূহ দান করলেন। গিরিরাজ হিমালয় দিলেন বাহনরূপী সিংহ। শশাঙ্কদেব দিলেন মন্ডলাকার বদন এবং মৃত্যু তাঁকে দান করলেন কালো কেশদাম। দেবী দুর্গার বর্ণ হলো জ্যোতি-র্বসনা ঊষার মতন।

অসুর তখন মহিষরূপ ধারণ করে অগণিত অনুগামী-সহ দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে। ভীষণ যুদ্ধ হলো দেবী ও দানবে। সেই যুদ্ধে নানারকম আগ্নেয়বাণ এবং বজ্র ত্রিশূল, ভল্ল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতন দেবী দুর্গা ঝাঁপিয়ে পড়েন অসুর সৈন্যের উপর এবং তাদের অস্ত্রহীন করে

দেন। অসুরসৈন্য বিশৃংখল হয়ে পড়ে। তখন মহিষরূপী অসুরের গাঁ গাঁ রবে ত্রিলোক প্রকম্পিত হতে থাকে। মহিষরূপী অসুর তার সুকঠিন শৃংগাঘাতে ধরিত্রীবক্ষ থেকে পর্বতসমূহ উৎপাটিত করে এবং দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু মহাশক্তিসম্পন্না দশভুজা দুর্গা শরাঘাতে সেগুলি চূর্ণ করে দিলেন। এমনি ভাবে তিনদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চললো। কখনো মনে হচ্ছিল বুঝি দেবী দুর্গা পরাভূতা হবেন। অবশেষে তিনদিনের মাথায় কিছুক্ষণের জন্যে যুদ্ধ থামালেন দেবী দুর্গা এবং দেবতাদের আনা অমৃতরস পান করলেন। অতঃপর ভীমবিক্রমে হস্তধৃত ত্রিশূলটি দিয়ে অসুরের বক্ষভেদ করলেন। মহিষরূপী অসুর তখনই আহত মহিষের দেহখোল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। তার মুখগহ্বর থেকে নির্গত হলো বাঁকানো অসি হাতে এক বীর। তখনই দনুজদলনী দেবী দুর্গা খড়্গাঘাতে তার শিরশ্ছেদন করলেন। অতঃপর আদ্যাশক্তি দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলেন। ইনি কালী। ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। ইনি কালনিরবধি এবং সর্কাল হরণ করেন ইনি। তখন দ্যুলোক-ভূলোক জুড়ে মহিষাসুরমর্দিনীর জয়বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

শরৎকালে এই দেবীদুর্গার পূজা খুব ধুমধামের সংগে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। বছরে একবাব কলকাতা শহরের আশি লক্ষ হিন্দু চারদিন ধরে দেবীব বিজয়োৎসব পালন করে নিষ্ঠা এবং সমারোহের সংগে। এই আড়ম্বর এবং জাঁক-জমকের পরিধি শহরময় ছড়িয়ে যায় এবং আনন্দোল্লাসে ভরপুর হয় মানুষের মন। আলোর মালায় সেজে ওঠে শহরটি। বোধহয় পৃথিবীর কোথাও কোনো উৎসবে এমন সমারোহ ও জাঁকজমক হয় না। বেশ ক'টি মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় এই উৎসবের প্রস্তুতি। শহরের উত্তর দিকেই পটুয়া পাড়া অবস্থিত। পটো পাড়াব মৃৎশিল্পীবা একবছর আগে থেকে দেব-দেবীর পটের কাঠামো তৈরি করা শুরু করে। দেবী দুর্গার কাঠামোটি হয় যেমন বিশাল তেমনি জমকাল। বাঁশ ও খড়ের তৈরি কাঠামোর গায়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে দেবীপট তৈরি হয এবং সবশেষে পরানো হয় দেবীসাজ ও অন্য অলংকরণ। আগাম ফরমাইস নিয়ে শিল্পীবা প্রতিমা বানায় এবং চাহিদা মতন বিভিন্ন জায়গায় চালান করা হয়। উৎসবের প্রথম দিনটিতে দেবী দুর্গার অভিষেক হয় বিভিন্ন বারোয়ারি পূজামন্ডপে। এমন অসংখ্য বারোয়াবি পূজামন্ডপ শহরের আনাচে-কানাচে দেখা যায়। বিশাল সামিয়ানাব তলায় বাহাবি ঝাড়বাতি টাঙানো হয়। প্রতি মন্ডপের সাজসজ্জা ও অলংকরণ আলাদা এবং উৎসব দিন-গুলিতে এটিই যেন পারস্পারিক প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে ওঠে।

পূজা শুরুর দিন কয়েক আগে স্তেফানের সংগে দুজন মানুষ দেখা করতে এল। কাছেই থাকে। এরা আনন্দ নগরের বারোয়ারি পূজা কমিটির তরফ থেকে এসেছে। কথাবার্তায় লোকদুটো খুব মার্জিত। বস্তির মানুষের বেশভূষার চেয়ে অনেক শৌখীন জামাকাপড় তারা পরেছে। কোভালস্কীকে ওরা চাঁদার একটা খাতা দেখাল। অনেকের নাম আছে সে খাতায়। কোভালস্কীর নামে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা ধরেছে লোকদুটো। বস্তির দরজায় দরজায় ঘুরে একদিনেই তারা হাজার টাকা চাঁদা তুলেছে। মুসলমান বা খ্রীশ্চান রেহাই পায় নি কেউ।

এই দৌরাত্ম্যটা মেনে নিতে পারছিল না কোভালস্কীর যুক্তিবাদী মন। যেখানে দারিদ্র্য পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে, সেখানে চারদিনের উৎসবের এই অপচয় দেখে তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এদেশের আনন্দ উৎসবের মূল সুরটি কোভালস্কী যেন

তার পশ্চিমী যুক্তিবাদী মন দিয়ে বুঝতে পারে নি। তাই যুক্তির শানিত তরবারির আঘাতে বিশ্বাসটি ভাঙতে চাইছিল। এদেশের মানুষ যেন তার আরাধ্য দেব-দেবীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা। এই দৈবনির্ভরতার প্রভাবটি ছড়িয়ে আছে তার প্রতিদিনের জীবনযাপনে। তার ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, তার রোগ-শোক ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই যেন বরাত দেওয়া আছে ঠাকুরের পায়ে। তাই এদেশের সেরা উৎসবগুলো ধর্মভিত্তিক। এমনকি স্বাধীনতা দিবসের মতন ঐতিহাসিক দিনটিও এদেশের মানুষের কাছে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, যেমনটি দেখা যায় কোন ধর্মীয় উৎসবে। কলকাতার মানুষের এই ঐশী প্রেম আরও দুর্নিবার। বোধহয় পৃথিবীর এটাই একমাত্র শহর যেখানকার মানুষ তার আরাধ্য ঈশ্বর বা অবতারের পায়ে ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্যটি এমন আপ্লুত হয়ে নিবেদন করে। এত পুজা পেয়েও হায়, স্বর্গলোকবাসী মহান দেবতারা ভাগ্য-বিড়ম্বিত শহরটিকে বঞ্চিত করেছেন, কণামাত্র কৃপাদৃষ্টিও নিক্ষেপ করেন নি। অথচ প্রতিদিন প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো ধর্মোৎসবে মেতে ওঠে এই শহরের মানুষজন। সৃষ্টি-কর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে এক অজ্ঞেয় মেলবন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়, এবং নিত্যই আমোদোৎসবে উন্মত্ত হয়ে শহরের পথে পথে তাঁর মহিমাকীর্তন করে বেড়ায়।

আগের হপ্তায় চিৎপুর রোডের মোড়ে এক ব্যান্ড পার্টির সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিল কোভালস্কী। রাস্তা জুড়ে মিছিল বেরিয়েছে। যানবাহন থমকে গেছে। শরীরটা দুমড়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে নাচছে ধর্মোৎসাহী কয়েকজন যুবক। এরা সবাই মিছিলের অংশগ্রহণকারী। নাচতে নাচতে তারা চলছে আর চীৎকার করে পয়গম্বর হুশেনকে স্মরণ করছে। মাথাব উপরে বন্‌বন্‌ শব্দে ঘোরাচ্ছে খোলা অসি। রোদের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছে তাদের শানিত ফলা। আজ মহরম। মুসলমানদের অতি পবিত্র ধর্মোৎসব। এই দিন থেকেই ইসলাম বৎসর শুরু হয়। শহরের সর্বত্র এমনকি আনন্দ নগর বস্তিতেও সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ভক্তের দল নতুন জামা-কাপড় পরে পরবে যোগ দিয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই আজ ছুটির দিন। ধর্মোৎসব উপলক্ষে যে চোদ্দ-পনেরোটি ছুটির দিন ধার্য আছে, তার মধ্যে একটি হলো মহরম। এদেশের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের এক বিচিত্র নক্সার যথার্থ চিত্ররূপ ফুটে ওঠে ধর্মোৎসবেব দিনগুলির মধ্যে।

দিন দুই আগে ৪৯ নম্বর নিজামুদ্দিন লেনের বাসিন্দা স্তেফান কোভালস্কীব ঘুম ভেঙে গেল কর্ণ বধির করা পটকার দারুণ শব্দে। ধড়মড় করে উঠে বসলো বিদেশী যাজক। কি ব্যাপার! খোঁজখবর নিয়ে জানলো যে বস্তির শিখ বাসিন্দারা গুরু নানকের জন্মদিন পালন করছে। খোলা কৃপাণ হাতে অসংখ্য উষ্ণীশধারী শিখ ব্যান্ডের দিগ্বিজয়ী বাদ্যের সঙ্গে চলেছে মিছিল করে। তারা যাবে স্থানীয় গুরুদ্বারে। আশপাশ থেকে আরও মিছিল শোভাযাত্রা আসছে গুরুদ্বারের দিকে। ঠেলাগাড়ি আর লরির উপর চড়ে শিখভক্তেরা আসছে হাতে ফুলের মালা নিয়ে। গুরু-দ্বারের ভেতরে অষ্টপ্রহর গ্রন্থসাহিব পাঠ হচ্ছে। নীল এবং সাদা রঙের মস্ত সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে গুরুদ্বারের সামনের মাঠে। সেখানে ভাণ্ডারা বসেছে। বড় বড় হাণ্ডায় ভাত, তরকারি তৈরি হচ্ছে। আনন্দ নগর বস্তির শিখেদের পান্ডার নাম গোবিন্‌ সিং। মাথায় রক্তবর্ণ পাগড়ি পরা বিশাল চেহারার লোকটা ট্যাক্সি চালায়। এই লোকটাই কোভালস্কীকে নেমতন্ন করে গেছে। সামিয়ানার নিচে কলাপাতা পেতে সারি সারি বসেছে ভক্তের দল। একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে

পুরুষেরা। এ যেন এক আনন্দমেলা। সবাই হাসছে, কথা বলছে। মেয়েরা পরেছে হাল্কা রঙিন জামা আর ওড়না। ছেলেদের মাথায় ছুঁচালো পাগড়ি। পরিবেশন-কারীরা বড় বড় গামলা থেকে হাতায় করে গরম ভাত, তরকারি ঢেলে দিচ্ছে কলা-পাতার ওপর। কাজলপরা চোখে ছোটছোট মেয়েরা কেটলিতে চা আর মাটির ভাড় নিয়ে চা পরিবেশন করছে ঘুরে ঘুরে। সারা দিন ধরে কয়েকশ' লাউডস্পিকার থেকে ওদের হাসিখুশির আওয়াজ ভেসে আসছিল গঙ্গার এক পার থেকে আর এক পারে।

দিন কয়েক আগেও এমনি আর এক আনন্দোচ্ছ্বাসের দৃশ্য কোভালস্কী দেখেছে। এটি জৈনদের উৎসব। জৈনধর্মের উৎপত্তি ভগবান বুদ্ধের সময় নাগাদ। হিন্দুধর্মেরই আর এক পরিবর্তিত রূপ এই জৈনধর্ম। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে জৈনরা নাস্তিক। কারণ তারা বেদবিরোধী। এদের দুই সম্প্রদায়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। সেদিন বড়বাজার অঞ্চলে কোভালস্কী যে মিছিলটি দেখলো, তা দিগম্বর জৈনদের উৎসব-মিছিল। উৎসব-মিছিলের পুরোভাগে রয়েছে কাঠের তৈরি দুটি তেজী সাদা ঘোড়া। ঘোড়া দুটো একটা মাথা খোলা জীপ গাড়ির সঙ্গে লাগানো। লরি, ঠেলা, রিক্সা এবং পথচারীদের জটলার মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছে মিছিল। মিছিলের মধ্যখানে ফুল দিয়ে সাজানো সিংহাসনে বসে আছেন গুরুদেব। যে ঊর্ধ্বাসনে তিনি বসেছেন সেটি টেনে নিয়ে চলেছে জমকাল পোশাক পরা একদল ভাড়া করা মানুষ। এদের পোশাকের রঙচঙ এবং গড়নপেটন সব যেন এলিজাবেথের যুগের চাকর খানসামার মতন। গুরুদেব বসেছেন সোনার কাজ করা সিংহাসনে। পরনের অত্যল্প পোশাকে তাঁকে অর্ধউলঙ্গ মনে হচ্ছে। সিংহাসনে বসে তিনি পথের দুপাশে দাঁড়ানো ভক্তদের উদ্দেশে হাত নেড়ে কৃপা-করুণা বিতরণ করছেন।

তবে সব ধর্মোৎসবের মধ্যে সেরা হলো হিন্দুদের দুর্গাপূজা উৎসব। যত নিষ্ঠা এবং ভক্তিশ্বারা ভগবানের পূজা অনুষ্ঠিত হয় তেমনটি আর কোনো ধর্মীয় উৎসবে দেখা যায় না। মনে হয় যেন আবাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হয়েছেন। পৃথিবীতে অবশ্য আজকাল পূজাবিধিতে তেমন নিষ্ঠা দেখা যায় না। বাণিজ্যমেলার চেহারা নিয়েছে এখনকার দুর্গোৎসব। তাহলেও হিন্দুর দুর্গোৎসব কলকাতা শহরকে যথার্থ ধর্মবিশ্বাসী করেছে। অবশ্য সাধাবণ গরিব শ্রেণীদের মধ্যে এই ধর্মবোধ যতটা প্রগাঢ়, তেমন আর কোথাও নয়। বস্তির সাধারণ দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ যেন হৃদয় দিয়ে এর তাৎপর্যটি উপলব্ধি করে। চরম অভাব অনটন আর দৈন্যাবস্থার মধ্যেও এইসব সাধারণ মানুষ সনাতন ঐতিহ্যগুলি আঁকড়ে ধরে রাখে এবং উৎসবানন্দে তা মূর্ত হয়।

মানুষগুলোর রক্তের সংগে মিশে আছে দুর্গোৎসবের এই আনন্দ। উৎসবের কটা দিন যেন উন্মত্তের মতন তারা সঁপে দেয় নিজেদের। ভুলে যাবার চেষ্টা করে তাদের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সংযম ভুলে যায়। বেহিসেবী ধারকর্জ করে। নতুন জামা-কাপড় কেনে। এসব করে উৎসবের নামে। তাদের কাছে উৎসবের এই আনন্দময়তাই যেন প্রকৃত ধর্মাচরণ। মাইকের গান ছেলে-মেয়েদের আনন্দ-কোলাহল, স্তোত্রপাঠ সব মিলিয়ে যে পরিবেশটি গড়ে ওঠে তা যেন ভরিয়ে দেয় তাদের শুকনো বুক।

সুতরাং আমোদের নামে যারা গরিবের ঘাম ঝরানো মজুরী থেকে জোর করে

চাঁদার টাকা আদায় করে তারা হয়ত জোচ্চর বা ঠগ নয়। তাই আনন্দ নগরের সংগ্রাহকরা যখন রিক্সাওলা বা ঠেলাগাড়িওলাদের কাছ থেকে জুলুম করে চাঁদার টাকা আদায় করে তখন তারা কোনরকম বিবেকদংশন বোধ করে না। আসলে লোকগুলো যেন কৃতার্থ হয় মায়ের পূজোর চাঁদা দিয়ে। এই নিষ্ঠুর লোভী থাবা থেকে কেউ নিস্তার পায় না। একপাশে পড়ে থাকা কুষ্ঠ কলোনির হতভাগ্য মানুষগুলোও এদের লোভের শিকার হয়। পুঁজির কতটা টাকা সরাসরি সংগ্রাহকদের পকেটে ঢোকে তার সঠিক হিসেব না থাকলেও, যেটুকু পড়ে থাকে উৎসবকে মোহিনী করতে সেটাই যেন যথেষ্ট।

দিন যত এগোচ্ছে ততই স্পন্দিত হচ্ছে বস্তির আপাত নিস্তরঙ্গ জীবন। লম্বা বাঁশ দিয়ে উঁচু উঁচু তোরণ বানানো হচ্ছে রোমের বিজয়োৎসবের তোরণের ধাঁচে। রঙিন কাপড়ে মুড়ে তাতে নানারকম অলঙ্করণ করছে শিল্পীরা। স্তম্ভের মাথায় চিত্রবিচিত্র নক্সা এঁকে সেগুলিকে দৃষ্টিনন্দন করা হচ্ছে। চোখজুড়ানো সাজে সজ্জিত করা হচ্ছে দেবীর বিশাল মূর্তিটি। সুগন্ধী ফুলের সাজে তাঁকে সাজানো হয়েছে। ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছে। তবে সবথেকে আকর্ষণীয় হলো দেবীর যুদ্ধসাজ। নানা অস্ত্র দ্বারা দেবী বিভূষিতা। ভল্ল, বর্ম, খড়্গ, তরবারি—নানা আয়ুধে সজ্জিতা হয়ে যেন মহিমাদৃপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। আলোর রোশনাইতে ঝলমল করছে পূজামণ্ডপগুলি। বাহারি ঝাড়বাতি এবং অসংখ্য রঙিন বাল্বের রশ্মিতে ঝকঝক করছে দেবীমঞ্চ। খিলানের অভ্যন্তর থেকে আলোকবৃত্তের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেবীপ্রতিমার মাথার চতুর্দিকে এক অলৌকিক জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করেছে। লাউডস্পিকার থেকে ভীমরবে ছড়িয়ে পড়ছে গানের সুরের তরঙ্গ। এই কোলাহল যেন উৎসবাদির এক অত্যাজ্য অঙ্গ তাই সারা দেশ জুড়েই চলছে এর নিঃশঙ্ক প্রচার। যেন এই উচ্চরব সুরলহরি ক'টা দিনের জন্যে বয়ে আনে মুক্তির সংকেত।

উৎসবের দিন কয়েক আগে থেকেই সাজসাজ রব পড়ে যায়। গেরস্থরা ঘর-দোর আঙিনায় কলি ফেরায়। দরজা-জানলার ধুলো ময়লা সাফ করে। দোকানঘর পরিষ্কার করে। কোভালস্কীর ঘরের সামনের চা-দোকানের বুড়ো মালিক নিজের দোকানঘর ছাড়াও কোভালস্কীর ঘরের সামনেটা চুনকাম করিয়েছে। আজকাল তাই প্রবেশপথটা দিনের আলোয় ঝলমল করে। কলি ফেরানো হয়েছে সাধারণের ব্যবহার করা পায়খানাটি। বছরের এই সময়টাই ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সবাই নতুন জামাকাপড় পরে। পুরনো ছেঁড়া ময়লা পরিচ্ছদ ছেড়ে সযত্নে তুলে রাখা নতুন পোশাক পরে। যাদের সে অবস্থা নেই তারা ধারকর্জ করে নতুন জামাকাপড় কেনে। শহরের দোকানীরা তাই এইসময় নাগাদ বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করে। চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মতন দেবী প্রতিমারও অঙ্গসাজ পর্বে পর্বে রচনা করা হয়। শহরের দক্ষ শিল্পী এবং নামী রূপকার নতুন আধুনিক পরিধান আর রত্নাভরণে সাজিয়ে দেয় দেবীর শ্রীঅংগ। অতঃপর তাঁর আরাধ্যা রূপটি লক্ষ লক্ষ ভক্তের ব্যাকুল ব্যগ্র দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়। চারদিনের এই উৎসবের প্রথম দিনে দেবীমূর্তির আবরণমোচন হয় বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা।

এই বিশেষ সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ঢাকের বাদ্যি আর শঙ্খধ্বনি দিয়ে। হাজার ঢাকি একসঙ্গে বাজাচ্ছে ট্যাংটা ট্যাটাং ট্যাংটা ট্যাটাং। পূজোর চারটে দিন যেন নেশার মতন কাটে কলকাতার বাবুদের। আমোদ শুরু হয় ভোর থেকে চলে

মাঝরাত পর্যন্ত। আনন্দ নগরেও এর অন্যথা হয় না। সারা রাত ধরে মানুষ আলোকিত রাজপথ মাড়িয়ে এক মন্ডপ থেকে আর এক মন্ডপে ঘুরে বেড়ায়। সব মানুষ যেন একটা গোষ্ঠীভুক্ত। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীশ্চান সবাই যেন এক। নারী-পুরুষে মিলে মিশে একাকার। সবাই নতুন সাজে সেজেগুজে উৎসবে মেতেছে। মেহবুবের ছেলে নাসীর যেমন নতুন পোশাক পরেছে, তেমনি পরেছে হিন্দু চা-ওলা। কোলো কাঁখে ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে নাসীরদের বোনও চলেছে এই পদযাত্রায়। অথচ ক'টা দিন আগেই ওদের মা হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। গোটা সংসারটাই সেই থেকে যেন ধুঁকছে। তবুও ওদের মনে কোন বিকার নেই। হিন্দু চ-ওলা শিবভক্ত। তার কপালে আঁকা আছে চন্দনের তিলক। মা দুর্গার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে মানুষটা। তার আনন্দময় মুখখানি দেখে স্তব্ধ হলো কোভালস্কী। ঢাকির বাদ্যি, মানুষের কোলাহল, লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসা গান, কিছুই যেন স্পর্শ করছে না তাকে। মানুষটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে খ্রীষ্টের বাণী মনে মনে স্বগতোক্তি করলো কোভালস্কী। 'যাহারা দীন-দরিদ্র এবং অনাথ, তাহাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কানে পেঁছিয়, তিনি সাড়া দেন।'

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় দেবী প্রতিমার বিসর্জন হবে। শেষ হবে চারদিনের উৎসব। সবাই বিষন্ন মনে ঠেলাগাড়ি বা লরির উপর প্রতিমা তুলেছে। লরির মাথায় ঝলমল করছে আলোর মালা। এবার শোভাযাত্রা করে প্রতিমাগুলি গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হবে। লোকে লোকারণ্য হয়েছে গঙ্গার ঘাট। মেলাই ভক্তমানুষ চলেছে প্রতিমার মিছিলের সঙ্গে। হাসারিও চলেছে উনিশশো নিরানব্বুই নম্বরের রিক্সাখানা নিয়ে। তার গাড়ির সীটের উপব মা দুর্গার একখানি সুন্দর প্রতিমা। চলতে চলতে বার বার সে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়ের দুতসুন্দর মুখখানি দেখছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। দশভুজা মায়ের মুখখানি করুণায় মাখামাখি হয়ে আছে। মাথায় এক ঢাল কালো চুল, চোখ দুটি মহিমামণ্ডিত। কপালের উপর শোভা পাচ্ছে একখানা ঝলমলে স্বর্ণময় মুকুট। দেখতে দেখতে মনে হলো যেন ভাঙাচোরা তার এই রিক্সাখানা আজ ধন্য হয়েছে। দেবীমাতৃকার পুণ্য বেদিকায় পরিণত হয়েছে এই নিষ্প্রাণ জড় রিক্সাখানি।

গঙ্গাতীবে সেদিন সত্যই কয়েক লক্ষ ভক্ত নবনারীর সমাবেশ হয়েছে। হাসারির অনেক সময লাগলো তীর পর্যন্ত পেঁছিতে। তীরের কাছে দাঁড়িয়ে বাড়িব মেয়েরা স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করলো। সিঁদুর পরালো, মুখে সন্দেশ ছোঁয়াল, দীপাবর্তন করে বরণ করলো। তারপর পরম ভক্তিভরে মা দুর্গার মাটির প্রতিমাটি গঙ্গার জলে নিমজ্জিত করলো। মুগ্ধ হয়ে গেছে হাসারি। জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে মায়ের মুখখানির দিকে। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সঙ্গে সেও মনে মনে বললো, 'মা! আবার এসো!' তার সামনে দিয়ে তখন তিরতির করে বয়ে চলেছে মা গঙ্গা। সেই অবিরাম স্রোতে বাহিত হয়ে সাগরাভিমুখে চলেছে মা দুর্গার প্রতিমা এবং কলকাতার লক্ষ লক্ষ ভক্ত মানুষের আনন্দবেদনা।

চৌত্রিশ

ভাষাশেখা কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। মিলিয়ে মিলিয়ে দুই ভাষায় বাইবেল, খানা পড়ে অনেক কষ্টে কোভালস্কী হিন্দি ও উর্দু অক্ষর চিনেছিল। এবার সে সংকল্প করেছে এই ভাষাজনিত একাকীত্ব দূর করবেই। বাংলাভাষা শিখবেই। কিন্তু সম্বল শুধু একখানা ব্যাকরণ বই। এই হাতিয়ার নিয়েই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোভালস্কী। সকাল বিকাল মন দিয়ে ব্যাকরণ পড়তে শুরু করলো। পাঠের গোড়াতেই সৌভাগ্যক্রমে বাংলা থেকে ইংরিজিতে তর্জমা করা কয়েকটা বাক্য তার চোখে পড়লো। সে ধরে নিল যে ব্যক্তিবিশেষ বা জায়গাবিশেষের নাম অর্থাৎ যা বিশেষ্য পদবাচ্য, সেগুলো দুই ভাষাতেই একই ভাবে লেখা আছে। তখন অনুরূপ কথাগুলো সে আলাদা করে বেছে নিল এবং নিজের বোঝার মতন একটা হরফ তৈরি করে ফেললো। এরপর সে উচ্চারণের অধ্যায় পড়া শুরু করলো। এই অধ্যায়ে ছবি এঁকে জিভের সংগে তালু, ঠোঁট ও দাঁতের সম্বন্ধ বুঝিয়ে দেওয়া আছে। যেমন 'ও' উচ্চারণের ক্ষেত্রে ওষ্ঠদ্বয় কিছুটা উন্মুক্ত থাকলেও মুখবিবর বোজা থাকে। আবার 'ইউ' উচ্চারণের সময় দাঁতের উপরের পাটির সংগে জিভের সম্পর্ক থাকে। ব্যাপারটা এত জটিল যে হাওড়া বাজার থেকে একটা ছোট হাত-আয়না কিনে আনলো সে। হাতে আয়না দেখে আনন্দ নগরের মানুষের বেশ মজা লেগেছিল সেদিন। যা হক, এইভাবে রীতিমত ধস্তাধস্তি করে দীর্ঘ-উচ্চারিত বর্ণগুলো উচ্চারণের কায়দা শিখে নিল কোভালস্কী। তারপর হঠাৎই একদিন বাংলায় কথা বলে বস্তির মানুষদের এমন চমকে দিল যে সত্যিই তাদের বাকরোধ হয়ে গেল। আয়নার সামনে ক্রমাগত অনুশীলন করতে করতে কোভালস্কী তখন আর একটা সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে যেন হঠাৎ বুঝতে পারলো অনেক বুড়ো হয়ে গেছে সে। মাথার সামনের চুল পিছু হঠেছে। শুকনো দুই গালে গভীর গহ্বর। বস্তির ছোঁয়া লেগেছে শরীরে। বলাবাহুল্য, আবিষ্কারটা মোটেই সুখবর কিছু নয়।

ইদানীং কোভালস্কী খুব মনমরা থাকে। অবস্থাটা যেন তার ভারতীয় হবার পথে একটা সুলক্ষণ। বোঝাই যায় এই রাস্তায় সে অনেকটা এগিয়েছে। অতঃপর প্রতিবেশীরা একদিন অবাক হয়ে দেখলো যে কোভালস্কী পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটলো একটা বিয়ের আসরে। বর-কনে দুজনেই তার স্নেহধন্যা। এক চেনাজানা বন্ধুস্থানীয় পরিবারের মেয়ে হলো কনে। বর হলো এক প্রতিবেশীর পুত্র। বর এবং কনে দুজনেই তার ভাইবোনের মতন। হঠাৎ কোভালস্কী একটা কাণ্ড করে বসলো। কনের বাবা-মা'র সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাদের পায়ের ধুলো মাথায় ছোঁয়াল। এমন অভিনব ঘটনা আগে কেউ দেখে নি। কোন সাহেব মানুষ এমন কাণ্ড করবে ভাবা যায় না। করেও নি কেউ আগে। কোভালস্কীর মনে হয়েছে বর-কনে যখন তার ভাইবোনের মতন, তখন ওদের বাপ-মা তারও বাপ-মা। সে যেন ওদেরই পরিবারের একজন।

বদলের যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু ঘটলো সন্ধ্যেবেলায়। বস্তির স্যাকরার দোকানে গেল কোভালস্কী। তারপর গলা থেকে ক্রুশচিহ্ন আঁকা রুপোর পদকটি খুলে স্যাকরার হাতে দিল। দুটি তারিখ লেখা আছে পদকের গায়ে। একটা তার জন্ম তারিখ, অন্যটা যাজকপদে ব্রতী হবার তারিখ। তারিখ দুটোর নিচে সে

'প্রেমানন্দ' কথাটা খোদাই করতে বললো। প্রেমানন্দ তার ভারতীয় নামকরণ। এই নামটাই সে বেছেচে কারণ ঈশ্বরপ্রেমে সে হৃষ্ট, তাঁর প্রেম লাভ করে সে ধন্য। স্যাকরাকে আরও বললো যেন খোদাই করা নামের নিচে খানিকটা জায়গা যেন সে ছেড়ে রাখে। কোভালস্কী তার জীবনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য তারিখটা সেখানে লিখবে উপযুক্ত সময়ে। সেই দিনটিতে একটা অসাধারণ পদক্ষেপ নিল কোভালস্কী। এমন একটা পদক্ষেপ যা ভারতীয়রা সাধারণত ভাবতেই পারে না। এই রূপান্তর যেন তাদের ধারণা বহির্ভূত, কারণ ভারতীয়রা গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে মৃত্যু বা নবজন্মলাভ ছাড়া, মানুষ তার জন্মলব্ধ অবস্থা বদলাতে পারে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের আপিসে গেল কোভালস্কী এবং ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন পেশ করলো। এখন থেকে ভারত সরকার যেন তাকে আনন্দ নগরের দরিদ্র বস্তিবাসীদের একজন মনে করেন।

একদিন সন্ধ্যে নাগাদ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন নিঃশব্দ উচ্চারণচর্চা চলছে তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকলো আশিস ও শান্তা।

'ফাদার! আমরা একটা সুখবর দিতে এসেছি আপনাকে। সুখবরটা আপনাকেই প্রথম দিচ্ছি।'

'বসো, বসো!'

কোভালস্কী ব্যস্ত হয়ে বললো।

ওরা বসলো। আশিস যেন কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। ইতস্তত করে বললো, 'ফাদার! আমরা দেশে ফিরে যাব ঠিক করেছি।' কথাটা এক নিশ্বাসে বলে চুপ করলো আশিস। ঘোমটার আড়াল থেকে কোভালস্কীর মুখের ভাবটি লক্ষ্য করছিল শান্তা।

কোভালস্কী খুব খুশী। মনে মনে বললো, 'হা ঈশ্বর! এর চেয়ে আনন্দের খবর আর কি হতে পারে! এরা সবাই যদি শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলিতে ফিরে যায়, তাহলেই ত' আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়!' সুতরাং মনের হৃষ্ট ভাবটি সে গোপন করতে চাইল না। বললো, 'কি করে পারলে?'

কোভালস্কীর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে শান্তা বললো, 'তিন বছর ধরে একটা একটা করে পয়সা জমিয়ে জমিটুকু কিনেছি ফাদার।'

খানিক চুপ করে শান্তা ফের বললো, 'একজন তাঁর মেয়ের বিয়ের খরচ তুলতে জমিটা বেচে দিলেন।'

শান্তার বর আশিসের উৎসাহ খুব। সে বললে, 'জমির মধ্যিখানে আমরা একটু পুকুর বানাবো। তাতে মাছ চাষ করবো।'

কোভালস্কীর মুখখানি আরও হৃষ্ট হলো।

শান্তাও তার স্বপ্নের কথা শোনাল : 'গরমের সময় পুকুরের জলে জমির সেচ হবে যাতে ভালো ফসল হয়।'

কোভালস্কীর মনে হলো যেন সে স্বপ্ন দেখছে। হয়ত অবাস্তব অলৌকিক কিন্তু মধুর। কলকাতার হাজার হাজার উপোসী ফুটপাতবাসী যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে চোখ বোজে। কোভালস্কীর চোখে সত্যিই যেন সেই স্বপ্নের ঘোর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আশিস বললো, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে শান্তা আগে যাবে। ধানের প্রথম ফসলটা ও তুলবে। আমি পরে যাব। আরও কিছু রোজগার করে তবে যাব। তবে প্রথম ফসলটা ভাল হলে দেরি করবো না।'

কোভালস্কী স্মিত মুখে কল্যাসম শান্তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটার কালো দুই চোখের তারায় ঝিকমিক করছে স্বপ্নে দেখা ছবিটা। সেখানে সত্যিই যেন খেলা করছে অনেক নিশ্চিন্তের আলোছায়া।

ঝকঝকে চোখে ফাদারের দিকে চেয়ে শান্তা বললো, 'আমরা শুধু হাতে যাচ্ছি না ফাদার। আমরা এমন কিছু নিয়ে যাব, যা দিয়ে তারা নতুন করে বাঁচার উৎসাহ পায়।'

কোভালস্কী হাসি হাসি মুখে তাকাল। যেন জানতে চাইছিল গোপনতাটা।

আশিস বললো, 'যাতে সবাই তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে চাই আমরা। ফাদার! আমাদের দেশের সব জমি থেকেই বছরে তিনটে ফলন হতে পারে যদি ভূমিতে ঠিকমতন জলসেচ করা যায়। আমরা সেটাই করবো সমবায়ের মাধ্যমে।'

'বাঃ! আর তুমি?' শান্তার উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে কোভালস্কী বললো।

'আমি?' একটু থেমে শান্তা বললো, 'গ্রামের মেয়েদের জন্যে আমি একটা হস্ত-শিল্পের কারখানা খুলবো। সেখানে ওরা হাতের কাজ শিখবে।'

ওদের স্বপ্ন দেখা চোখগুলোর দিকে চেয়ে আছে কোভালস্কী। আধবোজা চোখ, কোলের ওপর পড়ে আছে আয়নাখানা। অবাক হয়ে ওদের কথা শুনতে শুনতে সে বললো, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হ'ন। বস্তির অন্ধকার থেকে উঠে আসুক আশার আলো।'

পঁয়ত্রিশ

ফরাসী কনস্যুলেটের রিসেপশনিস্ট মেয়েটি দরজায় টোকা না দিয়েই ঝড়ের বেগে কনসালের ঘরে ঢুকে বললো, 'ম'সিয়ে! বাইরে একজন ভারতীয় মহিলা জেদ করছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। উনি বলছেন ও'দের বস্তির মধ্যে একজন পোলীশ মিশনারী কলেরায় মরতে বসেছেন। অবস্থা খুব সঙ্গিন। মিশনারীর পাসপোর্ট ফরাসী সরকারের দেওয়া। তাই মহিলাটি আমাদের কনস্যুলেটে এসেছেন। মিশনারীকে কিছুতেই কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। উনি সাধারণ মানুষের মতন চিকিৎসা পেতে চান। তাই ওঁর জন্যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা......,

কলকাতার ফরাসী কনসালের নাম আন্তোনী দ্যুমা। ফরাসী সরকারের এই প্রতিনিধির বয়স বাষট্টি। পোশাক পরিচ্ছদে নিখুঁত ফরাসী। গলায় বো টাই এবং বুকে কৃত্রিম গোলাপ ফুল। হাঁ করে রিসেপশনিস্ট মহিলার কথা শুনছেন তাঁর বড়সড় অফিসঘরে বসে। পঞ্চদশ লুইয়ের সেই বোম্বেটে অভিযানের আমল থেকেই ফরাসীরা এ দেশে ব্রিটিশ প্রভাবটি ক্ষুণ্ণ করতে নানাভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সুযোগ পেলেই সুড়সুড়ি দিয়েছে, উৎপাত করেছে। সেই তখন থেকেই পার্ক স্ট্রীটের পুরনো অঞ্চলে ফরাসী সরকারের কনস্যুলেট অবস্থিত।

মেয়েটির কথা শুনে রাজকর্মচারী বাইরের বারান্দায় এল একটু অস্থিরচিত্ত অবস্থায়। কূটনৈতিক কাজে এশিয়ার নানা জায়গায় চাকরি করেছে দ্যুমা। দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতায় অনেক বিরক্তিকর ঘটনার সামনাসামনি হতে হয়েছে তাকে। স্বদেশবাসী কিংবা ফরাসী পাশপোর্টধারী বিদেশীরা নানারকম সমস্যা এনেছে।

সমস্যা যেমন বিচিত্র মানুষও তেমনি। হিপি, মাদকসেবী নেশাখোর, পলাতক নাবিক, সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া ট্যুরিস্ট। এদের সবাইকেই কোনক্রমে পুনর্বাসন করিয়েছে দাদা। কিন্তু এই প্রথম সে এমন একজন মানুষের কথা শুনলো, যার সম্বন্ধে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ধর্মজগতের এই মানুষটি নাকি স্বেচ্ছামৃত্যু চাইছে। এক ভারতীয় বস্তির মধ্যে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মরতে চাইছে। কী ভয়ঙ্কর! শুনলেও হৃৎকম্প হয়।

ব্যাপারটা সত্যিই ভয়াবহ। আগের রাতেই শান্তা আর মার্গারেটা ঘটনাটা প্রথম জানতে পারে। ফাদারের বস্তি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলো, বমি-পায়খানার মধ্যে মুমূর্ষু মানুষটা পড়ে আছে। প্রায় মৃতাবস্থা। চেহারাটা হয়ে উঠেছে খোলাসার। পেশীগুলো নিস্তেজ। গায়ের চামড়া কুঁচকে হাড়ের গায়ে লেগে আছে। শুকনো কাগজের মতন দেখাচ্ছে মানুষটাকে। জ্ঞান আছে কিন্তু কথা বলার শক্তি নেই। টিমটিম করে জ্বলছে জীবনপ্রদীপ। মনে হচ্ছে এই বুঝি নিবে যাবে।

একবার দেখেই ওরা বুঝেছে মারাত্মক কলেরা ধরেছে ফাদারকে। শুধু তাই নয়, বেছে বেছে স্বাস্থ্যবান মানুষটিকেই ঘায়েল করেছে এই কালব্যাধি।

আগের রাত্রেই কোভালস্কী প্রথম রোগের লক্ষণ বুঝতে পারে। প্রথমে শুরু হয় অসহ্য পেটের কামড়। বারকয়েক পায়খানায় গিয়েও স্বস্তি পেল না। ঘরের মধ্যে গুমোট গরম। কিন্তু অত গরমেও শরীরে রীতিমত কাঁপুনি ধরেছে। হাতে-পায়ে খিল ধরছে, শিরশির করছে আঙুলগুলো। এরপর মাংসপেশীতে টান ধরা শুরু হলো। ততক্ষণে হাত-পায়ের রঙ নীলচে হচ্ছে ক্রমশ। ধীরে ধীরে হাতের চামড়া শুকনো খসখসে হচ্ছে। ঘামে জবজবে ভিজে গেলেও শরীরটা ক্রমেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল মুখের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে। গাল, নাক, কপাল এমন কি মাথার তালুও কুঁচকে যাচ্ছে যেন। এরপর সারা শরীরে শুরু হলো দারুণ খিঁচুনি। সঙ্গে বমি। তখন নিশ্বাস নিতে বা চোখ বুজতেও কষ্ট হতে লাগলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু জল খাবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কয়েক ফোঁটা জল খেয়েও গলা ভিজলো না। সারা রাত এমনি ধস্তাধস্তির পর ভোর চারটে নাগাদ কোভালস্কীর মনে হলো তার নাড়ী নেই। যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাও যেন চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে অসাড় অচেতন হয়ে যাচ্ছে শরীরটা।

এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিল কে জানে। জ্ঞান ফিরলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো কোভালস্কী। একবার পায়খানা যাওয়া দরকার। কিন্তু সে শক্তি নেই। তখন হাঁটু গাড়া অবস্থায় যাবার চেষ্টা করলো। তাও সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই ফিরে এল সে। মানুষটার তখন ধাতছাড়া অবস্থা। তার মনে হচ্ছিল এবার সে নিশ্চিত মরে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, একটুও মৃত্যুভয় হলো না তার। বরং দুর্বলতার দরুন এক ধরনের প্রীতিসুখকর অধ্যাত্ম অনুভবে মন ভরপুর হয়ে গেল।

মেয়ে দুটি যখন ঘরে ঢুকেছে তখন প্রায় মোক্ষলাভের অবস্থা কোভালস্কীর। 'মুক্তির মধুর একটা উপলব্ধির দোরগোড়ায় এসে পেঁৗচেছে এবং তার হাতছানি পাচ্ছে।' মরণে রে তুঁহু মম শ্যাম সমান অবস্থা যেন। শান্তা বা মার্গারেটা, দুজনের কেউই কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজী নয়। অত অনায়াসে ওরা ফাদারকে মরতেও দেবে না। ইতিমধ্যেই কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে মার্গারেটা। প্রথমে গামলা থেকে জল নিয়ে আস্তে আস্তে রুগীর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল। এতে

শুকনো ভাবটা একটু ভিজলো। ওরা বুঝতে পারছিল যে ফাদারের শরীর জল-শূন্য হয়ে গেছে। এখুনি ওঁর শরীরে প্লাজমা দেওয়া দরকার। সুতরাং অবিলম্বে তাঁকে ইন্‌টেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া উচিত।

শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে যত্ন করে কোভালস্কীর মুখখানা মুছিয়ে মার্গারেটা মিষ্টি স্বরে বললো, 'স্তেফানদাদা! চোখ খুলুন। দেখুন কে এসেছে। আপনাকে এখুনি আমরা 'বেলভিউ'তে নিয়ে যাব।'

কলকাতার বড়লোক গরিবলোক সবাই এই বেসরকারী বিলাসবহুল বেলভিউ ক্লিনিকের নাম শুনেছে। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে পাম গাছ ঘেরা এই ক্লিনিকের সঙ্গে কলকাতার অনেক নাম করা ডাক্তারবাবুরা জড়িত। শহরের ধনী ব্যবসায়ী, সরকারী বা বেসরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে বিদেশী দূতাবাসের কর্মচারী পর্যন্ত, সবাই এখানে চিকিৎসার জন্যে আসে। এখানকার স্বাস্থ্যবিধি ও রুগীর আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা একেবারে আদর্শস্থানীয় এবং পাশ্চাত্যদেশের যে কোনো ক্লিনিকের সঙ্গে তুলনীয়। মার্গারেটার দৃঢ় বিশ্বাস যে ফাদারকে ওরা কখনই ফিরিয়ে দেবে না। কারণ ফাদার একজন 'সাহেব'।

কিন্তু বেলভিউ ক্লিনিকের নাম শুনেই মুখ সিঁটকে উঠলো কোভালস্কীর। কথা বলার ক্ষমতা নেই মানুষটার। তবে মনে হলো কিছু বলতে চাইছে সে। মার্গারেটা তার মুখের ওপর ঝুঁকে কান পাতলো। অনুভবে বুঝলো যে বিশেষ সুবিধাভোগীর ঘটা করা চিকিৎসা সে পেতে চায় না। বস্তির আর পাঁচটা সাধারণ রুগীর মতন ঘরেই থাকতে চাইছে। আনন্দ নগরের অনেক মানুষের আগেও কলেরা হয়েছে। ঘরে থেকেই তাদের চিকিৎসা হয়েছে। যার জীবনীশক্তি আছে সে বেঁচেছে, বাকিরা মরেছে। সাধারণত বর্ষার সময়েই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন জায়গার অভাবে সবাইকে হাসপাতালে ভর্তি করাও যায় না। সুতরাং তার নিজের জন্যেই বা আলাদা ব্যবস্থা কেন হবে?

এমন একটা বাধা প্রত্যাশিত ছিল না। সুতরাং মেয়ে দুটো বিমূঢ় হয়ে গেল। এখন তারা কি করবে? তাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলো। সবাই পরামর্শ দিল যে স্থানীয় গির্জার প্রধান পুরোহিত ফাদার কার্দিয়েরোকে ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার। শুধু তিনিই পারেন রুগীকে বেলভিউ ক্লিনিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু কার্দিয়েরো এই দায়িত্ব নিতে চাইল না। কোভালস্কীর সঙ্গে সরাসরি কোনো কথাই বলতে সে রাজী হলো না। তবে সমাধানের একটা ইঙ্গিত সে দিল। কার্দিয়েরো বললো, 'একটা সমাধান আছে। আপনারা পোল্ অথবা ফ্রেঞ্চ কনস্যুলেটে গিয়ে ব্যাপারটা জানান। ফ্রেঞ্চ কনস্যুলেটে যাওয়াই ভাল কারণ ফাদার কোভালস্কীর পাশপোর্ট ফ্রেঞ্চ সরকারের দেওয়া। আপনারা কনসালকে খুলে বলুন ঘটনাটা। বিদেশীদের ব্যাপারে কনসালের দায়িত্বই বেশি। তিনিই ঠিক করবেন কোথায় কোভালস্কীর চিকিৎসা হবে। অন্তত একগুঁয়ে কোভাল-স্কীকে বোঝাতে পারবেন।'

শেষমেশ কার্দিয়েরোর পরামর্শই সাব্যস্ত হলো। ঠিক হলো কনসালের সঙ্গে মার্গারেটা দেখা করবে এবং তাঁর সাহায্য চাইবে। সেটাই করেছে মার্গারেটা। এত নিপুণভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে যে সেদিন বিকেলেই ফরাসী দূতাবাসের ধূসর রঙের পেল্লায় বিদেশী গাড়িখানা আনন্দ নগর বস্তির গলির মুখে এসে দাঁড়ালো। ছোট তেরঙ্গা পতাকা আঁটা বিদেশী দূতাবাসের ঝকঝকে গাড়িটা দেখে বস্তির

মানুষেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে গাড়িটা ঘিরে। দেখতে দেখতে এত ভিড় হলো যে দূতাবাসের প্রধান মঁসিয়ে দ্যুমার পক্ষে ভিড় ঠেলে পথ চলাই দায় হয়ে উঠলো। যা হক, কোনক্রমে জনতাকে সংগে নিয়ে প্যান্টের পা তুলে কাদা বাঁচিয়ে চলেছে সাদা চামড়ার খাঁটি সাহেব। আগে আগে চলেছে মার্গারেটা। কাদা বাঁচিয়ে চলতে চলতে মাঝে মাঝে টাল খাচ্ছে কনসাল সাহেব। খোলা ড্রেনের পাঁকের পচা গন্ধ এড়াতে ঘন ঘন মুখ মুছছে। এমন জঘন্য নোংরা পরিবেশে আগে সে কখনও ঢোকে নি। পায়ে পায়ে নোংরা জল-কাদা জমে আছে। সেগুলো টপকে চলতে চলতে মঁসিয়ে দ্যুমা ভাবছিল এই বিদেশী ফাদারটি আস্ত পাগল। নইলে এমন পরিবেশে বাস করতে পারতো না। অতঃপর কোভালস্কীর ঘরের দরজায় পা দিয়েই একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যগ্রতা দেখা গেল মঁসিয়ে কনসালের মধ্যে। উঁকি দিয়ে দেখলো ঘরের মেঝেতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে শুয়ে আছে লম্বা একটা মানুষের চেহারা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মঁসিয়ে দ্যুমা বললো, 'গুড্ ডে রেভারেন্ড! আমি কলকাতার ফরাসী দূতাবাস থেকে এসেছি। আমি এখানকার রাষ্ট্রদূত। আপনাকে আমার সরকারের সশ্রদ্ধ অভিভাদন জানাচ্ছি।'

অনেক কষ্টে বোজা চোখ দুটি খুলে তাকাল কোভালস্কী। সামনে দাঁড়িয়ে মঁসিয়ে কনসাল। ক্ষীণস্বরে কোভালস্কী বললো, 'কেন এই অহেতুক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন?'

'অহেতুক নয় রেভারেন্ড। আপনি তো জানেন যে একজন রাষ্ট্রদূতের প্রথম দায়িত্ব হলো স্বদেশবাসীর ভালমন্দ দেখা।'

'আমি কৃতজ্ঞ মঁসিয়ে। কিন্তু আমার জন্যে আপনার এত উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। এখানে আমার অনেক বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী আছেন।'

'ওঁরাই কিন্তু আমায় আপনার অসুস্থতার খবর দিয়েছেন। বর্তমানে আপনার শরীরের যা অবস্থা তাতে.. ..'

মাঝপথে রাষ্ট্রদূতের কথা থামিয়ে কোভালস্কী সবিনয়ে বললো, 'তাতে কি? দেশে ফিরে যাওয়া উচিত, এই তো?' একটু থেমে কোভালস্কী ফের বললো, 'কিন্তু আমার জন্য এত উৎপাত আপনারা সইবেন কেন মঁসিয়ে? আপনার অনুগ্রহের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু অযথা খরচ করবেন কেন? যারা বস্তিতে থাকে তাদের 'রিপ্যাট্রিয়েশন' হয় না। তারা দেশে ফিরে যাবার অধিকারী নয়।'

কোভালস্কীর মৃদু উত্তেজনা হলো কথা ক'টা বলতে। যে জোরটুকু সে সঞ্চয় করেছিল তা ফুরিয়ে গেল। মাথাটা হেলে পড়লো। চোখ দুটো বুজে এল ক্লান্তিতে। অসুস্থ হলেও কোভালস্কীর কথায় তীক্ষ্নতা ছিল। মঁসিয়ে কনসালের কান এড়ায় নি। তার ফের মনে হচ্ছিল যে, শুধু পাগল নয় লোকটা রীতিমত শক্ত ধাঁচের। তবুও একটা কিছু বলা দরকার। কিন্তু কি বলবে? খেই হারিয়ে ফেলেছে। ঢোক গিলে কনসাল বললো, 'অন্তত একটা ভাল ক্লিনিকে যাতে চিকিৎসা করানো যায় তার সুযোগ দিন।' কথাটা বলেই চুপ করে গেল ঝানু ডিপ্লোম্যাট। মনের মধ্যে উপযুক্ত যুক্তির কথা হাতড়াতে লাগলো যার ফলে স্তেফান কোভালস্কী নামক শক্ত ধাঁচের মানুষটিকে সে ঠিকমতন মনের কথা বোঝাতে পারে। অবশেষে বললো, 'ধরুন আপনি বেঁচে থাকলে এরা যে সাহায্যটুকু পাবে, আপনি না থাকলে সেটুকু ত' পাবে না!'

কোভালস্কী চিত হয়ে শুয়েছিল। সেইভাবেই ওপর দিকে চোখ তুলে ধীরে ধীরে বললো, 'তোমার আপন হাতের দোলে, দোলাও আমার হৃদয়।' উজ্জ্বল একটু হেসে

কোভালস্কী ফের বললো, 'মঁসিয়ে কনসাল! আমার জীবন ঈশ্বরের হাতে। তিনিই স্থির করবেন আমার কি করা উচিত।'

'আমি তাঁরই নির্দেশে আপনার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এখানে এসেছি।' কূটনীতিবিদের এই সুকৌশলী যুক্তির কথাটা কোভালস্কীকে যেন গভীরভাবে স্পর্শ করলো। তার মনে হলো ঈশ্বরের অনুজ্ঞা ছাড়া এই মানুষটা কিছুতেই এখানে আসতে পারতো না। তাই শান্তভবে বললো, 'হয়ত তাই।'

এই উত্তরটাই যেন মনে মনে চাইছিল মঁসিয়ে দ্যুমা। তাই একটা মুহূর্তও না ভেবে বলে উঠলো, 'তাহলে এদের বলছি যেন আপনাকে এরা...'

'আমি সাধারণ হাসপাতালে যেতে চাই মঁসিয়ে। ধনীদের কোনো ক্লিনিকে নয়। এদের তাই বলে যান।'

দ্যুমার মনে হলো সে বোধহয় অর্ধেক সফল হয়েছে। একটু ধৈর্য ধরলেই বাকি পথটুকু সে ঠিক পেরিয়ে যাবে। সুতরাং সেইভাবে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে বললো, 'খুব ভাল কথা রেভারেণ্ড। কিন্তু চিকিৎসা যত ভাল হবে তত তাড়াতাড়ি সেরে উঠে আপনার কাজকর্ম করতে পারবেন আপনি।'

'আমার আলাদা কোন কাজকর্ম নেই মঁসিয়ে কনসাল। আমি চাই নিঃসঙ্কোচে আমার চারপাশের মানুষের ভালমন্দ দেখতে। সেটাই আমার কাজ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে তো বটেই।' রাজকর্মচারীসুলভ জেদ নিয়ে লোকটা ফের বললো, 'তবে আপনার স্বস্তির জন্যে বলছি। আপনার চিকিৎসা বাবদ একটা পয়সাও এদের কাছ থেকে নেয়া হবে না। খরচের সব দায় নেবে কনস্যুলেট।'

কোভালস্কী দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এতক্ষণ কথাবার্তা বলে সত্যিই সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এবার সে দাঁড়ি টানতে চায়। থেমে থেমে সে বললো, 'ধন্যবাদ মঁসিয়ে। কিন্তু খরচের প্রশ্ন কেন উঠছে? আমার এটা দায়। খোলা মনে এতদিন যে দায় নিয়েছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে সেটা পালন করতে চাই। আমার এই রোগব্যাধি সবই ঈশ্বরের বিধান। সুতরাং এ নিয়ে আর আলোচনা নয়। প্লিজ!'

কথা ক'টা বলতে বলতেই কোভালস্কীর শরীর কাঁপিয়ে একটা খিঁচুনি উঠলো। তারপরেই নির্জীব হয়ে গেল দেহটা। সে দিকে চেয়ে মঁসিয়ে দ্যুমার সন্দেহ হলো মানুষটা বেঁচে আছে তো? উদগ্রীব হয়ে নজর করতেই তার ভুল ভাঙলো। খুব ধীরে ধীরে অনিয়মিত মৃদু নিশ্বাস পড়ছে কোভালস্কীর।

বাইরেও সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। আশিস, শান্তা, মার্গারেটা, বন্দনা, সালাউদ্দিন, অ্যারিস্টটল্ জন, মেহবুব সবাই। দ্যুমা বেরোতেই ওরা সবাই তাকে ঘিরে ধরলো।

'কিছু হলো?' মার্গারেটাই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো।

মঁসিয়ে কনসাল টাইয়ের গিট শক্ত করতে করতে বললো, 'বলতে পার, আধখানা সফল হয়েছি।' একটু থেমে সে আরও বললো, 'ক্লিনিকে নিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে হাসপাতালে যেতে রাজী হয়েছেন। তোমরা সেই ব্যবস্থাই করো। ওঁর ইচ্ছের মূল্য দেওয়া আমাদের কর্তব্য। জনসাধারণের হাসপাতালে ওঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।'

কূটনীতিবিদ চলে যেতেই ফাদারকে একটা রিক্সায় তুলে শহরের প্রধান হাসপাতালে নিয়ে এল মার্গারেটা। কেয়ারি করা লন্, পুকুর, কৃত্রিম ফোয়ারা এবং

বাগানভিলা ফুলবীথি শোভিত পরিবেশটি ভারি রম্য। লাল চিহ্ন এঁকে একটা বিশাল ভবন নির্দেশ করা আছে। এটাই ইমারজেন্সী বিভাগ। ভবনটি মস্ত। কিন্তু প্রায় সব ক'টা জানলা দরজা ভাঙ্গা। সেদিকে চেয়েই মার্গারেটা ভাবলো ফিরে যাবে। বস্তিতেও অনেক অগোছালো, নোংরা দৃশ্য সে দেখেছে। কিন্তু হাস-পাতালে সে যা দেখলো তার প্রথম ধাক্কাটা মর্মান্তিক। বারান্দাময় ছড়িয়ে আছে রক্তমাখা ড্রেসিংয়ের ন্যাকড়া, রোগীদের বেডগুলো এত ভাঙাচোরা যে সেগুলো প্রায় আবর্জনার সামিল হয়ে উঠেছে। ছেঁড়াখোঁড়া তোশকগুলো শয্যাকীটে ভ যেখানেই যাও পা পড়বে নোংরা ময়লার ওপর। সবথেকে শোচনীয় অবস্থা হৃত-ভাগ্য রুগীদের। বিপজ্জনক রোগব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষগুলো সম্পূর্ণ অসহায়। কত রকমের অসুখ: কারও জ্বরবিকার, ভেদবমি; কেউ ভুগছে বুকের ব্যাধিতে। কারও ঘা বিষিয়ে গেছে, কেউ মারাত্মক ধনুষ্টঙ্কারে কুঁকড়ে গেছে। কারও হাত পা ভেঙেছে, জ্বলেপুড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে কেউ কাতরাচ্ছে। এরা সবাই রুগী। হাসপাতালে এসেছে নিরাময় হতে। অথচ এখানে ওখানে পড়ে আছে বিনা সেবা পরিচর্যায়। কেউ কেউ স্রেফ মাটিতে।

অনেক চেষ্টার পর বাঁশের তৈরি একটা স্ট্রেচার যোগাড় করলো মার্গারেটা। তারপর অচেতন কোভালস্কীকে তার ওপর শোয়ালো। রোগীকে কেউ পরীক্ষা করল না দেখে একজন পুরুষ এ্যাডেন্ডেন্টের হাতে পাঁচটাকার একটা নোট গুঁজে এক বোতল সেরাম আর একটা সিরিঞ্জ সংগ্রহ করলো। তারপর নিজেই কোভাল-স্কীর শরীরে ইঞ্জেকশন দিল। এরপর ওষুধের জন্যে খানিক ছুটোছুটি করলো। কিন্তু যথারীতি এই হাসপাতালটিও ওষুধশূন্য। কারণ, রহস্যজনক ভাবে পাঁচিল টপকে সেগুলো আশপাশের অজস্র ওষুধের দোকানে পাচার হয়ে গেছে সকলের নাকের ডগা দিয়ে। ছুটোছুটির মধ্যেই কোভালস্কীর গোঙানি শুনতে পেয়েছে মার্গারেটা। তাড়াতাড়ি রুগীর মুখের কাছে ঝুঁকে শুনতে পেল ক্ষীণ গোঙানি।

'তেষ্টা! একটু জল খাব!'

কোভালস্কী চোখ খুলেছে ততক্ষণে। জনসাধারণের হাসপাতালের এই দুঃস্বপ্নভরা জগতে মানুষটার প্রথম চৈতন্যোদয় হলো। কিন্তু কোথায় তৃষ্ণাবারি? না আছে জল, না জলের জাগ। মাঝে মাঝে একটা বাচ্চা ছেলে বড় জাগে করে জল ভরে আনছে। এক গেলাস জলের দাম পঞ্চাশ পয়সা। বারান্দার শেষ প্রান্তে মল-মূত্রাগার। মলমূত্র ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরময়। পায়খানার দরজাটা কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছে। সারা জায়গাটায় ভনভন করছে মাছি।

রোজ শুয়ে শুয়ে রুগ্ন মানুষ এইভাবে হাসপাতালের দরজায় দরজায় হামড়ে বেড়াচ্ছে একটু চিকিৎসার আশায়। যা হক একটা আশ্রয় চায় তারা। বেড না পেলে মেঝেয় পড়ে থাকতেও তারা রাজী। তবুও দু-চারদিন খাওয়া জুটবে। দুটো-চারটে ওষুধও মিলে যেতে পারে। সর্বত্রই রোগীর চাপ। প্রসূতি বিভাগের কোথাও কোথাও একই বিছানায় তিনজন মায়ের সঙ্গে তাদের সদ্যোজাতদের শুয়ে থাকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাই সদ্যোজাতরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে যায়। হাসপাতালগুলোর এই অমনোযোগ, অবহেলা কিংবা দুর্নীতি নিয়ে খবরের কাগজে নিয়মিত লেখালেখিও হয়। কিন্তু প্রতিকার হয় না।

এই হাসপাতালের সংগ্রহে অত্যন্ত দামী একটা 'কোবল্ট বম্ব' ভগ্নাবস্থায় অলস

হয়ে বহুদিন পড়ে আছে। এই রেডিওএ্যাকটিভ কোবল্ট আধারটি মেরামতের দরুন খরচ হবে দু'হাজার আটশ' টাকা। অথচ এই সামান্য টাকার দায় নেবার লোক নেই। অন্যত্র এক হাসপাতালে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ না থাকায় সেখানকার কার্ডিয়াক বিভাগটি দীর্ঘদিন বন্ধ পড়ে আছে। আর এক হাসপাতালে বারোটির মধ্যে দশটি ই. সি. জি. মেসিন ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে বেশ ক'দিন। অনেক হাসপাতালেই অক্সিজেন এবং গ্যাস সিলিন্ডারের অভাবের দরুন ঠিকমতন স্টেরিলাইজেশন হয় না। অক্ষমের তালিকায় একটি মাত্র কর্মক্ষম যন্ত্র আছে। মানসিক রোগীদের বৈদ্যুতিক শক্ দেবার যন্ত্র সেটি। বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকলে গোবরা মানসিক হাসপাতালে শুধু এই যন্ত্রটা নাকি চালু থাকে। একটা বড় হাসপাতালে নতুন সার্জিক্যাল বিভাগটি খোলাই গেল না, কারণ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে লিফ্‌ট্‌-ম্যানের চাকরির অনুমোদন এসে পৌঁছয় নি। যোগ্য টেক্‌নিশিয়ানের অভাবে এবং এক্সরে প্লেটের অনিয়মিত সরবরাহের জন্যে যে কোনো হাসপাতালে রুগীদের মাসাধিককাল অপেক্ষ করতে হয়। শিয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি একটা হাসপাতালের চত্বরে প্রায় ডজনখানেক য়্যাম্বুলেন্সের গাড়িগুলো ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে দিনের পর দিন। কোনোটার ছাত ভাঙা, কারও ইঞ্জিন চুরি হয়ে গেছে, কোনটার হয়ত চাকা খোলা। কোনো কোনো হাসপাতালের অপারেশন ইউনিটে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সন্না, ধারালো ছুরি, ক্লিপ বা ক্ষতস্থান সেলাইকরার ক্যাটগাটের বাক্স শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে মাসাধিককাল। কিংবা যা পাওয়া যায়, সেটি ব্যবহারোপযোগী নয় বলেই খোয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতস্থান সেলাইয়ের ক্যাটগাট অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ার দরুন, সেলাই ছিঁড়ে যায়। কোনো কোনো হাসপাতালে রক্ত সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকমূল্যে এই অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান ফ্লুইডটি বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অকর্মণ্যতার সুযোগই এইসব পরপুষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ধনাঢ্য হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তির লোভ দেখিয়ে এইসব প্রতিষ্ঠানের লোকজন সরল গেঁয়ো রুগী পাকড়াও করে। তারপর আগাম টাকা নিয়ে সরে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই ডাক্তারের ছদ্মবেশ নিয়ে নকল নার্সদের দিয়ে রোগীদের পরীক্ষা করায়। তারপর মেয়েদের গয়নাগাঁটি যা পায় তাই নিয়ে উধাও হয়।

কোনো কোনো হাসপাতালে রোগীদের খাদ্যবস্তু চুরির ব্যাপার এত ব্যাপক হয়ে ওঠে যে কুলুপ আঁটা গাড়িতে ভোজ্যবস্তু সরবরাহ করার প্রথা চালু হয়। তবুও চোরাপথে কাঁচা আনাজ, মাছ এবং দুধ হাসপাতালের বাইরে পাচার হয়ে যায়। ফুটপাতে গড়ে ওঠা চায়ের স্টল এবং ভাতের হোটেলগুলো হাসপাতাল থেকে পাচার হওয়া ডিম, রুটি, চিনি, দুধের নিয়মিত যোগান পেয়ে দিব্যি ফলাও ব্যবসা করে চলেছে। শুধু ভোজ্যবস্তুই নয়, দরজা-জানালা এবং ইলেকট্রিক বাল্বগুলিও এই পদ্ধতিতে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কখনো এমন অবস্থাও হয় যখন বাল্বের অভাবে মোমবাতির আলোয় রুগীদের পরীক্ষা করেন ডাক্তারবাবুরা।

তবে সবটাই নিছক মন্দ নয়। মন্দের সংগে ভালোও মিশে আছে পাশাপাশি। এটাই এ দেশের বৈশিষ্ট্য। সব হাসপাতালেই এমন কিছু কর্মী আছে যারা রোগীর পরিচর্যা করে, তাদের সংগ সাহচর্য দেয়, যাতে তারা নিজেদের নিঃসংগ না ভাবে এবং আতঙ্কটি কাটিয়ে উঠতে পারে। কোভালস্কীর বেড থেকে কিছু দূরে মেঝের

পড়ে আছে দুর্ঘটনায় জখম হওয়া একজন রোগী। রোগীদের দেহে যে অস্ত্রোপচার সংঘটিত হয়েছে, আধুনিক শল্যবিদ্যায় সেটি অত্যন্ত কঠিন এবং নির্ভীক। শিরদাঁড়াজনিত ক্ষতের নিরাময়ের জন্যেই এই কঠিন অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এই নামগোত্রহীন রোগীর দেহে। দিনের পর দিন কোভালস্কী এই মানুষটার শারীরিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। শুধু সে নয় ডাক্তার এবং নার্সরাও লোকটার দিকে নজর রেখেছে। রোজ সকালে রুগীকে যত্ন করে তারা হাঁটায় এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যের খোঁজ নেয়। কিছু দূরে দোলনা খাটে শুয়ে থাকা বাচ্চার পাশে জড়সড় হয়ে শুয়ে থাকে বাচ্চার মা। কুণ্ঠিত মায়ের কলাইকরা থালার ওপর হাসপাতালের লোকেরা রোজ দুবেলা গরম ভাত আর ডাল ঢেলে দিয়ে যায়। গরিব মেয়েটি যেন কৃতার্থ হয় এদের সৌজন্যে।

এদের সকলের কাছে 'সাহেব' স্তেফান সত্যিই এক বিস্ময়ের মানুষ। তাদের কষ্টের দিনগুলিতে এমন একজন সাহেবের সাহচর্য পেয়ে তারা যেন ধন্য। অনেকেই কুণ্ঠিত চরণে এই মানুষটার কাছে হেঁটে আসে এবং আলাপ করে। টুকরো কাগজের গায়ে ডাক্তারবাবুদের হিজিবিজি অক্ষরের ব্যবস্থাপত্র পড়িয়ে নেয়। এগুলি পড়েই কোভালস্কী হতবাক হয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এইসব নামগোত্রহীন অজানা রোগীদের চিকিৎসাবিধিতে ডাক্তারবাবুদের শৈথিল্য নেই। পদমর্যদার বিচার নয়, মানুষের পরিচয়েই এই হতভাগ্য মানুষগুলোও এখানে চিকিৎসিত হচ্ছে। দেখে শুনে তার মনে হয়েছে যে অমানুষ শহরটার সবকিছুই অনুভূতিহীন নিষ্ঠুর নয়। সবটাই এখনও পচে গলে যায় নি।

মার্গারেটা যেটুকু করেছে কোভালস্কী তা যদি ঘুণাক্ষরে জানতো তবে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হতো। কারণ মার্গারেটা ইতিমধ্যেই অনেক অবাঞ্ছিত কাজ করেছে। কুড়ি টাকা ঘুষ দিয়ে তার স্তেফানদাদার জন্যে সিলিং ফ্যানের তলায় একটা বেডের ব্যবস্থা করেছে। তবে শয্যাবদলের এমন ঘটনা হাসপাতালে বিরল নয়। উচিত বখশিশের পরিবর্তে এমন বঞ্চনার ঘটনা নিত্যই ঘটে চলেছে সেখানে।

অবশ্য একথা ঠিক যে অসাধু উপায়ে সংগ্রহ করা সেরাম, ওষুধ বা পথ্যাদির নিয়মিত যোগান ছাড়া ধর্মযাজক কোভালস্কীকে বাঁচানো যেত না। মেয়েটা কি না করেছে! বস্তির মানুষের ছোট ছোট দান একত্র করে একটা 'ফান্ড' গড়েছে। যার যেমন পুঁজি সে তাই দিয়েছে। মেহবুবের ছেলেমেয়েরা রেললাইন থেকে ঘুঁষ কুড়িয়ে এনেছে, হিন্দু চ-ওলা মিষ্টান্ন দিয়েছে, পুত্রশোক ভুলে সাবিয়ার মা হাতে সেলাই করা একটা কামিজ বানিয়ে দিয়েছে স্তেফানদাদার ব্যবহারের জন্যে। এমনকি কুষ্ঠকলোনির ভিখিরীরাও তাদের ভিক্ষের টাকা দান করেছে মার্গারেটার ঝুলিতে। তাদের স্তেফানদাদাকে বাঁচিয়ে তুলতে এরা সবাই সফল হয়েছে। কিন্তু স্তেফান কোভালস্কী যা চেয়েছিল তা হতে পারলো না। এমন দুর্দশার মধ্যে সে যেন রাজার রাজা হয়ে বেঁচে রইলো। বস্তিঘরের গরিব হবার সাধ তার পূর্ণ হলো না।

ছত্রিশ

এমন দৃশ্য কলকাতা আগে কখনও দেখে নি। শহরের সর্বত্র পরিত্যক্ত, বিকল হয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার মানুষটানা রিক্সা। মানুষ নামক ঘোড়াদের এমন ধর্মঘট বোধহয় এই শহরেই প্রথম ঘটলো। শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সস্তার পরিবহন হঠাৎ থেমে যাওয়ায়, সারা শহরটাই যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মঘট হলো বড়-মানুষের হাতিয়ার। দিন আনা দিন খাওয়া কুলি শ্রমিকের হাতে এ অস্ত্র ঠিক মানায় না। তাই রিক্সাওয়ালাদের হাতেও এই অস্ত্রটা তেমন শানিত হয়ে উঠলো না। ক্ষিদের তাড়নায় যখন পেট মুচড়ে ওঠে, সাপের ছেড়ে ফেলা খোলসের মতন হালকা এবং অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায় মাথাটা ; তখন হাতের শানিত অস্ত্রটাও ভোঁতা হয়ে যায়। শয়তান মালিকপক্ষ এটা জানতো। তারা বুঝেছিল এই সংগঠন চিড় খেয়ে যাবে। ভেঙে যাবে একতা। ধর্মঘট হবে একদিনের শৌখীন বাহাদুরি। ঠিক তেমনটি ঘটলো। দিন দুই পর থেকেই দুহাতে রিক্সাদণ্ড নিয়ে সংগ্রামী কর্মীরা এক একজন করে রাস্তায় নেমে পড়লো। আবার শুরু হয়ে গেল ভাতের জন্যে মরণপণ লড়াই। যাত্রীদের পিছন পিছন দৌড়নো কিংবা তাদের নিষ্ঠুর দরাদরির কাছে হার মানা। শুধু তাই নয়। মালিকদের পাওনা দ্বিগুণ ভাড়ার টাকা গুনে গুনে মিটিয়ে দেওয়া শুরু হয়ে গেল সংগে সংগে। ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ। ইহকাল ত গেলই, পরকালও নাই। তাই কেঁদে কি লাভ! তবে কালো মেঘেই বিদ্যুৎ চমক হয়। এই শহরেও মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটে যখন ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষও কান্না থামিয়ে সেটা দেখতে বসে। হাসারির কপালেও তেমনটি ঘটলো।

ঘটনাটা এইরকম। রাসেল স্ট্রীটের মোড়ে যাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছে হাসারি। হঠাৎ অতুলকে দেখতে পেল সে। দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ। বার-দুই চোখ কচলাল। কিন্তু না। একটুও ভুল দেখছে না সে। একবার মনে হলো হিন্দি ছবি দেখছে। তা অতুলকে তেমনটিই দেখাচ্ছে। হিন্দি ছবির নায়কের মতন। চেহারাটা তার বরাবরই সুন্দর। নাকের নিচে সরু এক চিলতে গোঁফ। সুন্দর করে আঁচড়ান চুল। দিব্যি দিগ্বিজয়ী চেহারা মানুষটার। অতুলের পরনে প্যান্টসার্ট। পায়ে মোজা এবং বুট জুতো। একেবারে সাহেব সাহেব চেহারা। সবচেয়ে অবাক লাগলো অতুলের বাঁ হাতের কব্জির দিকে চেয়ে। সোনার ঘড়ি পরেছে রিক্সাওয়ালা অতুল? শুধু অবাক হওয়া নয়, হাসারি তখন সত্যি সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেছে যেন।

হাসারি হিন্দি ছবি দেখেছে। ছবিতে নায়করা রিক্সাওলা সাজে। সেটা তাদের ছদ্মবেশ। তখন স্বপ্নলোকের মানুষ হয়ে যায় রিক্সাওয়ালারা। তা অতুল এখন আসল রিক্সাওলা, কিন্তু অবিকল নায়কের মতন দেখতে সে। কোথায় সে থাকে কেউ জানে না। অবশ্য কলকাতার মতন শহরে ক'জন মানুষই বা তার পাশের মানুষটির সঠিক নামধাম জানে! যে হৃদ্যতা গ্রামে দেখা যায়, সেটি শহরে মেলে না। তবে একটা কথা ঠিক। অতুলের জ্ঞানগম্যি ঢের। সে অনেক পড়াজানা মানুষ। অন্তত রামায়ণ মহাকাব্যখানা তার আদ্যন্ত পড়া আছে। বীর রামচন্দ্র, চিরদুঃখিনী সীতা বা অসুর

রাবণের চরিত্রগুলো তার রামায়ণ পাঠের সময় যেন জীবন্ত হয়ে চোখের উপর ভেসে ওঠে। তাই অতুলের রামায়ণ পাঠ শুনতে, ক্ষিদেতেষ্টা ভুলে জড়ো হয় রিক্সাওলারা। ঘন্টার পর ঘন্টা উৎকর্ণ হয়ে সেই অমর মহাকাব্যের কাহিনী শোনে। সমুদ্র পেরিয়ে, এক লোক থেকে অন্য লোকে ডানা মেলে উড়ে যায় মন। তখন রিক্সার ভারটুকুও আর অসহনীয় মনে হয় না। তাই আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রিক্সওলাদের কাছে প্রাণাধিক প্রিয়তম হয়ে উঠেছিল অতুল। সবাই অচিরেই তার অনুগত ভক্ত হয়ে উঠেছিল। হাসারিও ব্যতিক্রম হয় নি। তবে একটা ব্যাপারই তার কাছে রহস্যময় ঠেকতো। মানুষটা এত জানেশোনে, তবুও তার মতন গরিব রিক্সওলা কেন হলো সে? উত্তরটা পায় নি হাসারি। সেটা তার মনে রহস্যই থেকে গেছে।

অনেকে অনেক কথা বলেছে তার সম্বন্ধে। কেউ বলেছে ফেরেববাজ, কেউ বলেছে মালিকের চর। কারও ধারণা সে গোপনে রাজনীতি করে। লোকজনদের উসকে দিয়ে সরে পড়ে। অতুল থাকে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের এক মেসবাড়িতে। সেখানে নাকি অনেক রকম মানুষের আনাগোনা। গলায় হার, হাতে বালা পরা বিদেশিনীরাও খালি পায়ে সে বাড়িতে যাতায়াত করে। ওরা নাকি নানারকম নেশার বড়ি খায়। নেশার ইঞ্জেকশন নেয়। কেউ কেউ বিড়ির মধ্যে ভাঙ্ পুরে এমন টানে যাতে সোজা নির্বাণলাভ হয়। তবে অতুলের এসব বাড়াবাড়ি নেই। তাকে খালি পায়ে হাঁটতে দেখে নি কেউ। বিড়ি বা সিগারেট কোনটাই টানতে দেখে নি হাসারি! বরং সকলের মতন সেও অমানুষিক খাটে। রোজ ভোরে পার্ক সার্কাস স্ট্যাণ্ডে সে সবার আগে পৌঁছয়। সেই থেকে রাত পর্যন্ত চলে টাট্টু ঘোড়ার মতন কদম ফেলে ছোটা। তবে হয়ত তাকে অন্য রিক্সাওলাদের মতন বছরের পর বছর খালি পেটের বোঝা টানতে হয় নি। তার শরীর নামক ইঞ্জিনটি চমৎকার চালু আছে। তবে অতুলের গাড়িটাও লাইসেন্স ছাড়াই শহরের বুকে দিব্যি চলছে। উচিত উৎকোচমূল্য দিলে এ শহরে সব কিছুই মেলে। স্বর্গের চাবিকাঠিটিও অপ্রাপ্য হয় না।

তবে লাইসেন্স থাক আর না থাক, অতুলের দিনগুলো বড় মধুর কাটে। যুবতী মেয়েদের ভারি লোভ তার রিক্সার ওপর। সবাই উঠতে চায়। বোধহয় তারা ভাবে রিক্সাওলা স্বয়ং মনোজকুমার। তবে রিক্সাওলার চেহারাটা রিক্সওলার মতন হওয়াই ভাল। হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর চেহারার রিক্সাওলারা ভিড় থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা যত অন্যরকম হয়, মানুষ ততই তাদের আলাদা করে দেয়।

একদিন এমনি এক ঘটনায় জনতা থেকে আলাদা হয়ে গেল অতুল এবং যথোচিত মূল্য দিতে হলো তাকে। দুজন যুবতী সওয়ারি নিয়ে হ্যারিংটন স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে এর সত্যতা বুঝতে পারলো সে। একটা ময়লা ফেলা গাড়ি ভেঙেচুরে রাস্তা আটকে পড়ে আছে দেখে সওয়ারি সমেত অতুল তার রিক্সাটা ফুটপাতের ওপর তুলে দিল। কাছেই দাঁড়িয়েছিল একজন ট্র্যাফিক পুলিস। লোকটা তেড়ে এল অতুলের দিকে। তারপর ধমক ধামক। হুমকি, কথা কাটাকাটি। হঠাৎ পুলিসটা হাতের লাঠি দিয়ে বারকয়েক পিটিয়ে দিল অতুলকে। মার খেয়ে ধপ্ করে রিক্সাটা মাটিতে নামিয়ে অতুল ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিসটার উপর। শুরু হলো দুজনে তুমুল ধস্তাধস্তি এবং মাটিতে গড়াগড়ি। এই অবস্থায় এক ফাঁকে একটু আলগা পেতেই পুলিসটা ছুটলো ফাঁড়িতে খবর দিতে। নিমেষে ক'জন পুলিস ছুটে এসে পাকড়াও করলো রিক্সাসমেত অতুলকে। তারপর থানায় নিয়ে তাকে লক্আপে পুরে দিল।

পরের দিন দুপুর নাগাদ অতুল যখন ছাড়া পেল, তখন সে আর মানুষ নেই। থানার লোকগুলো অমানুষিক প্রহার করে তাকে রক্তমাংসের পিণ্ড বানিয়ে দিয়েছে যেন। শুধু যে পিটিয়েছে তা নয়। নানাভাবে উৎপীড়ন করেছে। সিগারেটের আগুনে বুকে ছেঁকা দিয়েছে। ঘরের ছাতের হুক থেকে হাত পা বেঁধে ঝুলিয়ে চাবুক-পেটা করেছে। এটা যে শুধু পুলিস ঠেঙানোর শাস্তি তা নয়। আসলে প্যান্ট এবং বুট জুতো পরা এবং সোনার হাতঘড়ি বাঁধা সাহেব রিক্সাওলাকে ওরা সইতে পারে নি। রিক্সাওলারা এ কালের ক্রীতদাস। তারা ভারবাহী পশু। সুতরাং আর সব ভার-বাহী পশুদের থেকে আলাদা হবার অধিকার তাদের নেই।

ফাঁড়ির মধ্যে উত্তমমধ্যম ধোলাই দিয়েও পুলিসগুলো রেহাই দিল না অতুলকে। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তার নামে পুলিস ঠেঙানোর একটা মিথ্যে মামলাও লাগিয়ে দিল সেই সঙ্গে। মামলা যেমনই হ'ক, অতুলকে রাজামহারাজার মতন খাতির সম্মান দিয়ে আদালতে নিয়ে এল রিক্সাওলারা। হাত-পা-মুখে ব্যান্ডেজ জড়ানো অবস্থায় প্রায় ঠাকুরের মতন হাসারির রিক্সায় সওয়ার হয়ে এল অতুল। মার খেয়ে চোখমুখে কালসিটে পড়ে গেছে। রিক্সার ওপরে ঠাকুরের মতন স্থির হয়ে বসে আছে মানুষটা। দেখেশুনে এই উপমার কথাটাই মনে হচ্ছিল হাসারির।

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ভবনটি সাবেক কালের ইঁট দিয়ে তৈরি। এটাই কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কোর্ট। আদালত চত্বরে একটা বিশাল বট গাছ আছে। সেই বৃদ্ধ বটের ছায়ায় বিরাজ করছে একটি ছোট্ট মন্দির। মন্দিরের মধ্যে মা কালীর দেবীমূর্তির পাশে রয়েছেন শিবঠাকুর এবং হনুমানজী। অতুলকে দেবীদর্শন করাবার জন্যে মন্দিরের সামনে হাসারি তার রিক্সা নামল। হাসারির হাত ধরে সাবধানে নেমে মন্দিরের ঘণ্টাটি বাজালো অতুল। তারপর ভক্তিভরে দেবীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সঙ্গে করে আনা ফুলের মালাটি শিবঠাকুরের ত্রিশূলের গায়ে পরিয়ে দিল।

ফুটপাতের লোহার রেলিংএর গায়ে যেন হাট-বাজার বসেছে। কতরকম জিনিসের কেনাবেচা চলছে সেখানে। দু সারিতে বসেছে ফেরিওলারা। কলকাতার অর্ধেক মানুষই বোধহয় ফেরিওলা। ফুটপাতের ওপরেই নানারকম খাদ্যবস্তু তৈরি হচ্ছে। ভাজা তেলের কটু গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। একটু দূরে কোর্টে ঢোকার প্রবেশপথ। বেশ ক'জন টাইপবাবু বসে আছে সেখানে। তাদের ঘিরে অনেক মক্কেলের ভিড়। আদালত চত্বরের মধ্যে ডাবের পাহাড় নিয়ে ডাবওলা বসেছে। পাশাপাশি বিক্রি হচ্ছে চা আর সোডা লেমনেড। মক্কেলদের বসবার ঘরের সিঁড়ির ধাপে বেশ কিছু ভিখিরী বসে আছে। হাসারি অবাক হয়ে দেখছে মানুষের অবিরাম আসা-যাওয়া। এর যেন বিরাম নেই। প্রত্যেক মুহূর্তেই বেশ কিছু মানুষ ঢুকছে, বেরুচ্ছে কিংবা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একসময় হাতকড়া লাগানো কয়েদিদের নিয়ে পুলিসের একটা ছোট্ট দল ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কালো কোট আর ডোরা-কাটা প্যান্ট পরা উকিলবাবুরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সলা করছে। কেউ বা মক্কেলের লোকজন-দের সঙ্গে কথা বলছে।

অতুলকে নিয়ে ওরা একটা ঢাকা বারান্দায় ঢুকলো। ভক্ করে নাকে লাগলো একটা ভ্যাপসা গন্ধ। বেঞ্চিতে বসে মায়েরা নিঃসংকোচে বুকের কাপড় সরিয়ে বাচ্চা-দের দুধ খাওয়াচ্ছে। ছায়ায় বসে অনেকে খাওয়া-দাওয়া করছে। কেউ কেউ মেঝেয় চাদর পেতে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

লম্বা বারান্দার শেষে বার লাইব্রেরি। উকিলবাবুরা এখানে বসে আলাপসালাপ করে। অতুলকে সেখানেই নিয়ে এল ওরা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের যোগ্য জবাব দেবার জন্যে তারও একজন উকিল দরকার। উকিলবাবুদের ভিড়ে ঘরখানা ভর্তি হয়ে আছে। সামনে ছোট ছোট টেবিল নিয়ে পাথার তলায় বসে তারা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। অতুল একজন মাঝবয়সী উকিল পছন্দ করলো। লোকটাকে দেখে বেশ নির্ভরযোগ্য মনে হয়। লোকটার পোশাক-আশাক বেশ ঝকঝকে, ছিমছাম। এরপর অতুলকে নিয়ে লোকটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। হাসারিও চললো ওদের পিছনে পিছনে। সে অবাক হয়ে দেখলো যে জজসাহেবরা মুখে মুখে কি সব বলছেন আর টাইপবাবুরা একটা আঙুল দিয়ে সেগুলো মেশিনে ছেপে চলেছে।

অবশেষে ছোট্ট দলটাকে নিয়ে উকিলবাবু একটা মস্ত হলঘরে ঢুকলো। বিশাল ঘর। একদিকের দেওয়ালের গায়ে ঝাপসা হয়ে যাওয়া গান্ধীজীর একখানা ছবি ঝুলছে। ঘরের পিছনে স্তূপ হয়ে এলোমেলো পড়ে আছে অনেকগুলো স্টীলের ট্রাঙ্ক। হাজার হাজার মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ আর ছুরি পিস্তল ইত্যাদি নানা চোরাই মাল দিয়ে ট্রাংকগুলো ভর্তি। হলঘরের মাঝামাঝি লম্বা বেঞ্চি পাতা আছে। বেঞ্চির সামনে ঈষৎ উঁচু মঞ্চ। মঞ্চের উপরে পাশাপাশি দুটো টেবিল পাতা আছে। টেবিলের সংগে লাগোয়া একটা খাঁচা। লোহার রেলিং ঘেরা খাঁচাটার সংগে ওপাশের ঘরখানার যোগ আছে। খাঁচার ঢোকার রাস্তাটা দেখে সার্কাসের বাঘসিংগির খাঁচার কথা মনে পড়লো হাসারির। সার্কাসের পোষা বাঘসিংগিদের ওই রাস্তা দিয়ে খাঁচার মধ্যে আনে। মামলার সময় জেলের কয়েদিদের এই পথে এনে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পাশে পাহারা দেয় পুলিস। অবশ্য অতুলকে ওরা খাঁচায় পুরলো না কারণ অতুল কয়েদি নয়।

আদালত তখনও বসে নি। ঘরখানায় থিকথিক করছে রিক্সাওলাদের ভিড়। হাতে চায়ের ভাঁড় আর মুখে বিড়ি নিয়ে তারা খোশগল্প করছে। সকলের গুঞ্জনে গমগম করছে ঘরখানা। অতুলকে নিয়ে উকিলবাবুটি বসেছে পাশাপাশি। এমন সময় আধময়লা ধুতি পরা দুজন বাবু দুহাত ভরে কয়েক বস্তা কাগজপত্তর এবং ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এরা আদালতের কেরানী, মুহুরি। ঘরে ঢুকেই একজন হাতে তালি দিল। এটা নির্দেশ। একজন আর্দালি ছুটে এসে সুইচ টিপে সিলিং থেকে ঝুলে থাকা মান্ধাতার আমলের দুখানা সিলিং ফ্যান চালু করে দিল। পুরনো জংধরা পাখা দুটি তখনই বিদ্যুতাহত হলো না। একটু সময় নিল ঘুরতে। সদ্য শবভক্ষণ শেষ করে গৃধ্রকুল যেমন ডানা গুটিয়ে ঝিমোয়, তখুনি আকাশে উড়তে পারে না, পাখা দুটির অবস্থাও তেমনি।

অতঃপর পিছন দিকের দরজা খুলে জজসাহেব ঘরে ঢুকলো এবং তার নিজের আসনে এসে বসলো। শুকনো রোগা চেহারার মানুষটার মুখখানা করুণ। চোখে চশমা এবং পরনে কালো ঢোলা পশমী গাউন। মানুষটার তুলনায় তার পোশাকখানা রীতিমত জমকাল। জজসাহেব ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন সবাই বসলো। জজসাহেবও বসলেন শৌখীন এবং বাহার করা চেয়ারে। টেবিলের ওপর স্তূপাকার ফাইল এবং আইনের বই। সেই পাহাড় টপকে অতুল এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের দৃষ্টি জজসাহেবের মুখটা খুঁজে পাচ্ছিল না। হাঁ করে হাসারি দেখলো এক-আধটা নয়, ঘরের পিছনের ট্রাঙ্ক এবং ফাইলের

জঞ্জালের মধ্যে অসংখ্য পায়রা দিব্যি আনন্দে ঘর-সংসার করছে।

ইতিমধ্যে ছোটখাট আর একজন মানুষ কালো গাউন পরে ঘরে ঢুকেছে। লোকটা বক্রচক্ষু। কোন দিকে তাকাচ্ছে চট করে ঠাহর হয় না। ইনি পাবলিক প্রসিকিউটর। অর্থাৎ ফৌজদারি মোকদ্দমার সরকারি উকিল। মঞ্চের নিচে বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিস অফিসার। হাসারির মনে হলো দৃশ্যপট সম্পূর্ণ হলো। এবার শুরু হবে রামায়ণ নাটকাভিনয়।

ঠিক তাই। ধুতি পরা মুহুরিবাবুটি ততক্ষণে অতুলের বিরুদ্ধে আনীত অভি-যোগের লম্বা ফিরিস্তি শোনাতে শুরু করেছে। হ্যারিংটন স্ট্রীটের ওপর একজন পুলিসকে ঠেঙানোর লম্বা বিবরণ। শুনতে শুনতে জজসাহেব চশমা খুলে ফেললেন, তারপর চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তখন তাঁর চকচকে টাকের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছুই বই এবং ফাইলের আড়াল থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। মুহুরিবাবুটির অভিযোগের পর জজসাহেব ক্লান্ত স্বরে প্রতিবাদী পক্ষের কৌঁসুলিকে বক্তব্য পেশ করতে বললেন। কিন্তু হাসারি দেখলো অতুল নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ আত্মপক্ষ সমর্থনের কাজটি সে নিজেই করতে চায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আদালত কক্ষের পরিবেশ যেন বদলে গেল। পুলিসের হাতে নিগৃহীত হবার ঘটনাটির এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবচিত্র সে পরিবেশন করলো, যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই। সেই নির্দয় আচরণের ছবিটি যেন চোখের ওপর ভেসে উঠেছে সবার। একটু পরেই হলঘরের এপাশ ওপাশ থেকে অশ্রুমোচনের শব্দ ভেসে এল। ফাইলের ওপাশ থেকে জজসাহেবের নাকঝাড়ার শব্দও শুনতে পেল সবাই। সরকার পক্ষের উকিলবাবু প্রতিবাদের ক্ষীণ চেষ্টা করলো। কিন্তু কে শোনে তার কথা! জজসাহেব নিজেই যেখানে অভিভূত সেখানে কোনো প্রতিবাদই চলে না। সরকারি উকিলবাবুর কিছুই বলা হলো না। অভিভূত জজসাহেব নড়েচড়ে বসলেন। তারপর সবাইকে চমকিত করে অতুলের বিরুদ্ধে আনীত পুলিসের অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ অভিযুক্ত অতুলকে তিনি বেকসুর খালাস করছেন। শুধু তাই নয়, পুলিসকে নির্দেশ দিলেন যেন আটক করা রিক্সাটা অতুলকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দশ মিনিটেই মামলা শেষ। সারা আদালত কক্ষ তখন মুহুর্মুহু হাততালির শব্দে মুখরিত হচ্ছে। হাসারি এবং তার দলবল ভাবছিল অতুল তাদের সকলের গর্বের ধন।

অতুলের বেকসুর খালাস পাবার কথাটা তখন শহরের রিক্সাওলারা জেনে গেছে। দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। গোলাম রসুল এবং ইউনিয়নের অন্য পাণ্ডারা স্থির করলো এই উপলক্ষে তারা বিজয় মিছিল বার করবে। রিক্সাওলা এবং ঠেলাগাড়িওলাদের নিয়ে বিশাল মিছিলটি রাইটার্স বিল্ডিং ভবনে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পুলিসের নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাবে। কারণ, এই দুই শ্রেণীর অসহায় জীবিকাধারীরাই সাধারণত পুলিসের নির্যাতনের বলি হয়।

দুপুরের পর পার্ক সার্কাস ময়দান থেকে মিছিল বেরোল। বামপন্থী কর্মসংঘ থেকে সংগ্রামী লাল পতাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। পতাকা এবং ব্যানারগুলি আকাশে উড়ছে। মনে হচ্ছে আকাশে ফুটে আছে অসংখ্য রক্তবর্ণ গাঁদাফুল। মিছিলের সামনে চলেছে উনিশশো নিরানব্বুই নম্বরের গাড়িখানা। হাসারি এর চালক। গদির ওপরে বসে আছে মাল্যভূষিত অতুল। জীর্ণদশাপ্রাপ্ত জনযানটি চালাতে চালাতে হাসারি কত কথা ভাবছিল। চার বছর সে কলকাতার রাস্তায় রিক্সা চালাচ্ছে। কত

ঘাম ঝরেছে, কত পীড়ন সে সয়েছে এই ক'টা বছরে। তবুও সুদিনের আশা সে ছাড়েনি। বুকের মধ্যে আশাটি নিভৃতে লালন করে সময়ের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে চলেছে সে।

মিছিল যত এগোচ্ছে ততই যেন তার কলেবর স্ফীত হচ্ছিল। রাস্তার দুপাশ থেকে দলে দলে ঠেলাগাড়িওলারা যোগ দিল ওদের সমাবেশে। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে অন্য যানবাহন। এই জটিল যানজট ছড়িয়ে পড়েছে শহরের অন্য রাস্তাতেও। আকাশ-জুড়ে লাল পতাকাগুলো পতপত করে উড়ছে। সহস্র কণ্ঠের স্লোগানের শব্দে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। প্রায় তিনঘণ্টা সময় লাগলো বিবাদি বাগ পৌঁছতে। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিং ভবনটি তখন ঘিরে রেখেছে পুলিস। সেই অবরোধের মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল মিছিল। মাথায় চ্যাপটা টুপি পরা একজন পুলিস অফিসার এগিয়ে এল ওদের দিকে। লোকটা জানতে চাইল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা কোনো আবেদন পাঠাতে চায় কি না। অতুল এবং তার দলবলের সবাই জানালো যে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ চায়। লোকটা ফিরে গেল। অল্পক্ষণ পরে এসে জানালো যে মুখ্যমন্ত্রী তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। মিছিলকারীরা উল্লাসে চীৎকার করে স্লোগান দিল, 'বিপ্লব জিন্দাবাদ!'

চারজনের একটা ছোট্ট প্রতিনিধিদল গেল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। অতুল, গোলাম রসুল এবং আরও দুজনকে নিয়ে প্রতিনিধিদল ফিরে এল আধঘণ্টা পরে। মুখ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিস প্রধানও ছিলেন সাক্ষাৎকারের সময়। ওরা দুজনেই কথা দিয়েছেন ভবিষ্যতে পুলিসের হাতে রিক্সা বা ঠেলাগাড়িওলারা অকারণে লাঞ্ছিত হবে না। তাছাড়া যে মানুষটার হাতে অতুল লাঞ্ছিত হয়েছে তাকেও সাজা দেওয়া হবে। লাউডস্পিকার মারফত ওদের সাফল্যের কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিল গোলাম রসুল। জনতার সমর্থনের উল্লাসে মুখরিত হলো আকাশবাতাস। প্রতিনিধিদলের সকলের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল জনতা। হাসারির মনে হলো, তাদের এই জয়টি নিছক মূল্যহীন নয়। হয়ত আগামীকাল থেকেই শুরু হবে এক নতুন জীবন। তাদের সুখ এবং আনন্দের দিন।

মিছিল ভেঙে গেছে। কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি। মনের সেই ক্ষুব্ধভাবটা আর নেই। সবাই ফিরে যাচ্ছে যে যার ঘরে। হাসারির গাড়ির উপর উঠে বসলো অতুল। এবার ক'জন বন্ধু মিলে ওরা খানিক স্ফূর্তি করবে। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীটের এক সস্তা পানশালার দিকে হাসারি তার রিক্সাটা টেনে নিয়ে চললো।

সাঁইত্রিশ

আনন্দ নগর বস্তির শেষ প্রান্তে এই ছোট্ট কলোনিটা নিজের থেকেই গড়ে উঠেছে। কলোনির চারপাশে রেলের লাইন। বাইরে থেকে দেখলে অন্য কলোনির মত আলাদা মনে হয় না। সেইরকমই ঘরের সামনে চৌকো চত্বর, খোলা নালা এবং ঘরের চালে ভিজে কাপড়জামা শুকোচ্ছে। তাহলেও এটা আলাদা, মূল আনন্দ নগর থেকে বিচ্ছিন্ন। পৃথক এক শ্রেণীর মানুষ এখানে বাস করে যাদের ছায়া ছুঁলেও শরীর হিম হয়ে যায় ভয়ে। আনন্দ নগর থেকে চট করে কেউ এই কলোনির হাতায় ঢুকতে

সাহস পায় না। যে দু'শো রুগী এখানে ঘর বেঁধে আছে তারা অন্ত্যজ, কারণ তারা কুঠে। একখানা ঘরে দশ-বারোজন মাথা গুঁজে থাকার বেশি দাবি নিয়ে তারা সংসারে আসেনি।

ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ লাখ। ওদের নুলো হাত কিংবা পুঁজ, রক্ত এবং পোকাপড়া ঘায়ের বীভৎস চেহারা দেখে আনন্দ নগর বস্তির লোকজনও ওদের একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আনন্দ নগরের গলিতে ঘুরে বেড়ালেও চট করে লোকের ঘরসংসারের মধ্যে ঢোকবার অধিকার ওদের নেই। অকথিত একটা যে নিষেধাজ্ঞা আছে তাকে লঙ্ঘন করার সাহস কুঠেদের নেই। সেদিন কোভালস্কীর ঘরে ঢুকে নুলো আনোয়ার সে বিধি ভেঙেছিল। এর দরুন তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই অপরাধে ইতিমধ্যেই অনেকের কপালে লাঞ্ছনা জুটেছে। তবে রোগ ছড়ানোর অপরাধের চেয়ে দুষ্টু চোখের শাসনের মাত্রাটা অনেক বেশি। ভিক্ষে দিয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা গেলেও মাথায় তুলে নাচা যায় না ওদের। মনে রাখা দরকার যে ভগবানের অভিযোগ ছাড়া সহজে এই রোগ হয় না। যারা কুঠে তারা ভগবানের অভিশপ্ত তাই এমন কালরোগে তারা ভুগছে।

এই কুষ্ঠ কলোনির ঠিক মধ্যিখানে বাঁশ আর কাদা লেপা একটা ছোট্ট ঘর আছে। ঘরের মধ্যে গাদাগাদি আছে ক'টা ছেঁড়া তোশক। কলকাতার ফুটপাত থেকে অনেক কুষ্ঠরোগী এখানে এসে বাস করছে। আনোয়ারও আছে এদের সঙ্গে।

বস্তির রাস্তায় আনোয়ারের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায় কোভালস্কীর। দেখা হলেই একমুখ হাসিতে ঝলমল করে আনোয়ার। কোভালস্কীর খুব অবাক লাগে তখন। এত যার কষ্ট সে এমন নির্মল সুন্দর হাসে কি করে? রোগ জানুক আর দেহ জানুক, মন তুমি আনন্দে থেকো। তাই মানুষটার মুখ থেকেও কোনো নালিশ শোনেনি কেউ। বরং দেখা হলেই ঝরঝর করে হেসে জিজ্ঞেস করেছে, 'স্তেফানদাদা ভাল আছ?'

তখন জবাব দিতে কোভালস্কীর সঙ্কোচ হতো। কি জবাব সে দেবে? ধুলো-কাদামাখা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে টলতে টলতে উঠে আসা সবহারানো মানুষটাকে কি আশার কথা সে শোনাবে? ইদানীং দেখা হলেই কোভালস্কী তাই তার লম্বা শরীরটা নুইয়ে আনোয়ারের সমান করে নিত। তারপর তার নুলো হাতখানা ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে তার কুশলসংবাদ চাইত। আনোয়ার খুব অবাক হয়েছিল যেদিন কোভালস্কী তার সঙ্গে প্রথম করমর্দন করলো। তার মুখেচোখে ফুটে উঠেছিল যুদ্ধজয়ের গৌরব। আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের যেন চীৎকার করে বলতে চাইছিল, 'দ্যাখো তোমরা। আমার স্তেফানদাদা আমার সঙ্গে করমর্দন করেছেন। এখন আমি ঠিক তোমাদের মতন হয়ে গেছি।'

কোভালস্কী জানে যে আনোয়ারের অসুখটা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই কারণ স্নায়ু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এই কালব্যাধি। এখন শুধু কষ্ট পাওয়া যন্ত্রণায় শরীরটা কুঁকড়ে গেলে মরফিন্ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। ইদানীং কোভালস্কীর কাছেই মরফিন্ থাকে। হাওড়া হাসপাতাল থেকে এটা সে সংগ্রহ করেছে। হতাশ রোগীদের জন্যেই এটা সে ব্যবহার করে।

সেবার মরফিন্ দেবার পরের দিনেই বস্তির রাস্তায় আনোয়ারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। ছেলেটাকে খুব মনমরা দেখাচ্ছে, যা সচরাচর তাকে দেখায় না।

'কি ব্যাপার আনোয়ার?

'কই! কিছু ত' না!'

'কেমন আছ?'

'আমি খুব ভাল আছি স্তেফানদাদা। তবে...'

'তবে?'

'আপনি সৈয়দকে চেনেন? আমার পড়শী। সে একটুও ভাল নেই। খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না। তাকে একবারটি দেখতে যাবেন?'

সেদিন আনোয়ার নিজের কথা একটিবারও বললো না। তার সব দুশ্চিন্তা যেন সৈয়দের জন্যে। 'দুঃখকে ডরাই না যখন সবাই মিলে দুঃখকে ভাগ করে নিই',—এই সনাতন ভাবটিই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল আনোয়ারের মধ্যে। তাকে আশ্বস্ত করতে কোভালস্কী বললো, 'আমি যাব।'

এ যাত্রা সত্যিই বিভীষিকাময়। কোভালস্কী যা দেখলো তা কোনো কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত কঙ্কালসার মানুষের কলোনি নয়। আসলে হতভাগ্য জীবগুলোকে মানুষ বলাই যায় না। শরীর থেকে গলে গলে পড়ছে মাংস। চোখ দুটো বুজে গেছে সাদা ঘায়ে। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে গায়ের চামড়া। ফাটা চামড়া চুঁইয়ে পড়ছে হলুদ রস। এদের কি করে মানুষ বলবে সে? তবুও দৃশ্যটা চোখে সওয়া যায়। কিন্তু কলোনির মধ্যে ঢুকতেই ভক্ করে যে গন্ধটা পেল, তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কোভালস্কীর মনে পড়ে সেই জঘন্য গন্ধটা। 'অমন কুৎসিত গন্ধ আমি আগে কখনও পাইনি। পচা, গলা ঘায়ের গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে য়্যালকোহল আর ধূপের গন্ধ। বুকের গভীরে বেঁচে থাকার এক তীব্র আশা নোঙর করা না থাকলে এমন প্রাণহীন গন্ধ সওয়া যায় না।' অথচ এরই মধ্যে বাচ্চারা গুলি খেলছে, খলখল করে হাসছে কেমন নির্ভয়ে। সৈয়দকে চিনতে কোভালস্কীর খুব অসুবিধে হলো না। বছর চল্লিশের মধ্যে বয়েস। হাত. পা-দুটোর একটাও নেই। নাকের অনেকটা গলে গেছে। চোখের ভুরু দুটোও খেয়ে নিয়েছে মারাত্মক কুষ্ঠ। আনোয়ারই পরিচয় করিয়ে দিল। অন্ধ মুখখানা ঘুরিয়ে খুব শীর্ণ একটু হাসলো সৈয়দ।

'আপনি ত' স্তেফানদাদা!'

কোভালস্কী উত্তর দিল না। সৈয়দ ফের বললো. 'আমি খুব ভাল আছি স্তেফানদাদা। কেন কষ্ট করে এলেন আমার জন্যে?'

'মিথ্যে কথা। তুমি একটুও ভাল নেই। আমি জানি তোমার অনেক কষ্ট।' প্রায় কেশহীন মাথাটা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করলো আনোয়ার।

কোভালস্কী তখন ওর নুলো হাতটা নিজের হাতে ধরেছে। কনুই থেকে খেয়ে গেছে হাত। ক্ষতটা দগদগ করছে। হাড়ের গায়ে কিলবিল করছে পোকা। দেখতে দেখতে শরীর শিউরে উঠলো কোভালস্কীর। এত অমানুষিক কষ্ট সে সইছে কি করে? কোভালস্কী বুঝতে পারছিল আর কোনো আশা নেই। কিছুক্ষণের জন্যে কষ্টের হাত থেকে রেহাই দেওয়া যায় সৈয়দকে। সিরিঞ্জে মরফিন্ ভরে গায়ের শক্ত চামড়ার তলায় একটা শিরা খুঁজে পাবার চেষ্টা করলো কোভালস্কী। তাও পাওয়া গেল না। বিষণ্ণ কোভালস্কীর মনে হলো সে আর কিছুই করতে পারবে না। কোন উপকারই করতে পারবে না সৈয়দের।

পাশেই শক্ত বিছানায় শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পাশে তার চুলবুলে বাচ্চাটা।

মেয়েটার মুখচোখ দারুন ফোলা। সারা মুখে ফুস্কুড়ি। কোভালস্কী বুঝেছে এটা ওষুধের প্রতিক্রিয়া। কুষ্ঠরোগীদের ক্ষেত্রে এমনটি প্রায়ই ঘটে। ওষুধ বা ইঞ্জেকশনে প্রায়ই রিঅ্যাকশন হয়। ওরা তাই চট করে চিকিৎসা করাতে চায় না। কোভালস্কী নিচু হয়ে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল। ছটফটে বাচ্চাটা জোরে চেপে ধরেছে কোভালস্কীর হাতের ক'টা আঙুল। বাচ্চাটার জীবনীশক্তি দেখে তার খুব অবাক লাগছিল। বাচ্চার মায়ের দিকে চেয়ে কোভালস্কী মিষ্টি হেসে বললো, 'মা! ছেলে তোমার খুব বড়সড় হবে।'

কান্না চাপতেই যেন মুখখানা ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি। কোভালস্কী বুঝতে পারলো মায়ের অভিমানে লেগেছে তার কথাটা।

কোভালস্কী ফের বললো, 'নাও মা! ছেলে নাও। কখনও কাছছাড়া করো না।'

মেয়েটি চুপ। একটা মুহূর্ত নয়, যেন অনন্তকাল। নিঃশব্দে কাঁদছে ছেলেটার মা। কী বলবে কোভালস্কী? খানিক পরে গায়ের চাদরটা সরিয়ে মেয়েটা দুহাত বাড়িয়ে দিল ছেলের দিকে। স্তম্ভিত কোভালস্কী দেখলো মেয়েটার দুহাতে একটাও আঙুল নেই। যত্ন করে বাচ্চাটাকে মায়ের পাশে শুইয়ে দিল কোভালস্কী। তারপর হাতজোড় করে নমস্কার করে বেরিয়ে এল কুঁড়ে থেকে।

বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কানা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ অনেক মানুষ। ওরা ছুটে এসেছে স্তেফানদাদাকে দেখতে। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ওদের এই পশুর গুহায়। সবল, সুস্থ মানুষের মতন দিব্যি হাসছে সবাই। নির্মল স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। দেখে অবাক হয়ে গেল কোভালস্কী। সবাই খুশীতে লাফালাফি করছে। নুলো হাতে তালি দিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি করছে কোভালস্কীর কাছে পৌঁছবার জন্যে, তার গা ছোঁবার জন্যে।

এবার আনোয়ার তাকে নিয়ে এল একটা ঘরের চাতালে। চাতালে মাদুর পেতে বসে দিব্যি তাস খেলছে চারজনে। কোভালস্কীকে দেখে ওরা একবার খেলা থামিয়েছিল। কিন্তু কোভালস্কী ওদের খেলা চালিয়ে যেতে বললো। ওদের খোঁড়া হাতে তাস ভাঁজার কৌশলটি দেখতে ভারি অবাক লাগছে কোভালস্কীর। কত নিপুণতার সঙ্গে রপ্ত করেছে কৌশলটা। একটুও এলোমেলো হচ্ছে না কোথাও। যেন নাচের ছন্দে হাতে হাতে ঘুরছে, কখনও মাটিতে পাতা হচ্ছে তাসক'টা। খেলার সময় পাকা খেলুড়ের মতন ওদের হাসিঠাট্টার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিগুলোও অভিভূত করলো কোভালস্কীকে।

পাশের মাঠে কোভালস্কীর অভ্যর্থনার জন্যে কনসার্ট বাজাচ্ছে ভিখিরী বাজনদারেরা। কোভালস্কী কিছুক্ষণ ওদের বাজনা শুনলো। যেখানে সে যাচ্ছে সেখানেই তাকে দেখতে ছুটে আসছে এরা। কোভালস্কীকে ঘিরে আজ যেন ওদের উৎসব। একটা বস্তিঘরের দরজায় বসে আছে একজন বুড়ো মানুষ। প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে রোগের দাপটে। কোলে তার তিনবছরের একটা বাচ্চা। কোভালস্কীর পায়ের শব্দ শুনে তার দিকে ফিরে বাচ্চাটাকে এগিয়ে দিল। আনোয়ার বললো, হাওড়া স্টেশনের কাছে ভিক্ষে করার সময় নিঃসঙ্গ মানুষটা ছেলেটাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। সেই থেকেই বাচ্চাটা রয়ে গেছে তার কাছে। খুব অবাক লাগলো কোভালস্কীর। যার নিজের দুবেলা খাবার জোটে না। বিনাচিকিৎসায় যে মানুষটা ভুগে ভুগে মরবে অথচ নিরাময় হবে না, সেও যেন বাঁচার আয়াস নিয়েই সংসার করতে চায়, তাই ডানার আড়ালে আশ্রয় দিয়েছে একটা অবোধ শিশুকে। খানিক এগোতে আর

একটা মিষ্টি ছবি দেখতে পেল কোভালস্কী। ছোট্ট দিদির কোলের মধ্যে মোটা-সোটা ভাইটি শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে আর শাসন করতে করতে দিদি তেল মাখাচ্ছে। কিশোরীকে দেখেই কোভালস্কী বুঝতে পারলো সেও ব্যাধিগ্রস্ত। তবে হাতের আঙুলকটা এখনও অক্ষত আছে। চাকাগাড়ি চালিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে আনোয়ার। আজ তার বড় সুখের দিন। বুকখানা ভরে উঠেছে গর্বে, কারণ স্তেফানদাদার গাইড হবার সৌভাগ্য তার হয়েছে।

অবশেষে আনোয়ার তাকে যেখানে নিয়ে এল সেখানে অনেকেই জড়ো হয়েছে তখন। একটা বড়সড় আসনের ওপর তাকে বসতে বললো আনোয়ার।

'এখানে বসুন স্তেফানদাদা!'

চটের থলি জুড়ে একটা মস্ত আসন বানিয়েছে ওরা। একটা মেয়ে সেটা পেতে দিল কোভালস্কীর জন্যে। কোভালস্কীর সঙ্গে অন্যরাও বসলো। ওরা সবাই কোভালস্কীর শরীর ঘেঁষে বসতে চাইছে। কোভালস্কী বুঝলো দ্বিপ্রাহরিক ভোজে সকলের সঙ্গে তাকেও খেতে বসতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠলো। প্রতিবাদে মাথা ঝাঁকিয়ে মনে মনে বললো, 'না। কখনই না। ওদের সব অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে আমি মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু ভাঙাচোরা মানুষগুলোর সঙ্গে বসে খেতে পারবো না। কখনই না।'

কিন্তু মনে মনে কথাটা বলেই সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে গেল কোভালস্কী। 'ছি! ছি! এই আমার ভালবাসার নমুনা! কিন্তু এ ত প্রেমহীনতা! এ আমার হেরে যাওয়া। হায়! হায়! আরও কত পথ আমায় পেরোতে হবে!'

মনের এই দ্বিধা সঙ্কোচটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো কোভালস্কী। তারপর ওদের সকলের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিল সে। ততক্ষণে কলাই করা গামলা হাঁড়ি নিয়ে মেয়েরা এসে পড়েছে। ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত আর গরম তরকারি ওরা ঢেলে দিল প্রত্যেকের পাতে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো আঙুলহীন হাতে শুরু করে দিল ওদের দ্বিপ্রাহরিক ভোজ।

স্তম্ভিত কোভালস্কী প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যেন আঙুলহীন হাতের ওই সুকৌশল নড়াচড়া তাকে দেখতে না হয়। কেমন অবলীলায় ওরা ভাতের নাড়ু পাকাচ্ছে এবং মুখের মধ্যে চালান করছে। ওদের আজ দারুণ আনন্দের দিন। বিদেশী সাহেবের সঙ্গে ওরা খেতে বসেছে। সত্যিই যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে ওরা। কিন্তু কোভালস্কী? 'হাঁসফাঁস করছে পেট। তবুও আমি ওদের সঙ্গে বসে খেলাম। যেন বলতে চাইলাম ওদের আমি ভালবাসি। যেমন ভালবাসেন ঈশ্বর এবং তিনি ভালবাসেন বলেই আমিও ভালবাসি কারণ তিনিই আমায় জীবনদান করেছেন। আমার তখন মনে হচ্ছিল বাঁচার জন্যে ওদের আরও অনেক ভালবাসা চাই, কারণ ওরা অধমেরও অধম, নিচুর চেয়েও নিচু।'

কিন্তু প্রেমে ভরা মনেও অনেক ক্ষোভ লুকিয়ে আছে কোভালস্কীর। কেন ওরা এত নিষ্ঠুর উদাসীন? তার ক্ষুব্ধ মন যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না অবস্থাটা। কেন ওদের এই শারীরিক বৈকল্য? কে দায়ী? সে নিজেও ত সমান দায়ী? অথচ সে জানে কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। সময়মত চিকিৎসা করালে এই ব্যাধি থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। খঞ্জ বিকলাঙ্গ মানুষগুলো দেখতে দেখতে সে তখনই তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো। আনন্দ নগরে বিকলাঙ্গ খঞ্জ মানুষগুলোর জন্যে সে একটা আরোগ্যনিকেতন তৈরি করবে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের

দিয়ে এদের চৌকিদারা করাবে।

পরদিন ভোরেই দক্ষিণ কলকাতাগামী একটা বাসে চড়ে বসলো কোভালস্কী। সে তার মন স্থির করে ফেলেছে। তাকে যেতে হবে সেই মানুষটির কাছে যাঁর কাছে সে তার মনের কথাটি খুলে বলতে পারে। সারা শহরে তেমন মানুষ একজনই আছেন।

আটত্রিশ

ঘরবাড়ি, বাজার, রাস্তার এলোমেলো জটলার মধ্যে থেকে কলকাতার মা জননী কালী মায়ের মন্দিরের চূড়াটি মিষ্টি পাঁউরুটির মাথার মতন উঁচু হয়ে আকাশের বুকে ঠেলে উঠেছে—ঠিক যেন সূর্যের পানে জোর করে তাকিয়ে থাকা একটা ফুল। হিন্দুদের এই ধর্মস্থানটি ভারি পবিত্র। এটি পীঠস্থান। প্রায় পাশ দিয়েই বয়ে গেছে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার শাখা। গংগার তীরে পবিত্র শ্মশানভূমি। এই শ্মশান-ভূমিতেই হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়। মন্দিরচত্বর এবং আশপাশটি সর্বক্ষণই ভক্তসমাগমের ভিড়ে গমগম করে। মায়ের দর্শন পেতে ভক্তেরা আসে পুজোর ডালা নিয়ে। ধনী নির্ধন গৃহী ভক্ত যেমন আসে, তেমনি আসে জটাজুট-ধারী যোগী ও সন্ন্যাসীরা। আসে দুষ্কর্মের জন্যে পরিতাপকারীরা। সংগে আনে মায়ের বলির জন্যে ছাগশিশু। মন্দিরের অলিগলিতে এই আলোছায়ার পাশাপাশি সহবাস। আসে গায়েনের দল। তাদের বিষণ্ন গানের সুরের নিবেদনে ভক্তের মন আপ্লুত হয়। আসে আরও কত বৃত্তিধারী ভক্ত। এদের সকলের সমাগমে মায়ের মন্দিরটি সর্বক্ষণই যেন উৎসবমুখর হয়ে থাকে।

শহরের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হলো মায়ের মন্দির এবং তার আশপাশ। মন্দিরটি ঘিরে আছে কয়েক শ' দোকানঘর। কি না পাওয়া যায় সেখানে! ফুল, ফল, মিষ্টান্ন থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় সামগ্রী। বাসনকোশন, শয্যাদ্রব্য, প্রসাধন, খেলনা, গিল্টি করা গয়না থেকে শুরু করে তাজা মাছ, কাঁচা আনাজ, খাঁচার চিড়িয়া—কিছুরই যেন অভাব নেই এখানে। ওপাশে শ্মশানচুল্লী থেকে অহরহ উদ্গত হচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। শবপোড়ার গন্ধের সংগে ধূপের গন্ধ মিশে এক বিচিত্র আবহ সৃষ্টি হয়েছে যেন। প্রায় সর্বক্ষণই মিছিল করে শববাহীরা আসছে। রাস্তার গরু, মোষ, কুকুর এবং পুণ্যার্থীর ভিড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে পথ করে এবং উল্লসিত হরিধ্বনি দিতে দিতে অসংখ্য শবমিছিল চলেছে কাঁধে মৃত্যু বহন করে। মা জননীর মন্দিরে পাশাপাশি দুটি ধারা, জীবন ও মৃত্যু। যেন আলো ও অন্ধকার, দুই যমজ।

পবিত্র এই দেবস্থানটির কোনাকুনি বেষ্টন করে আছে নিচু মাথার সারি সারি কয়েকটা ঘর। ঘরের জানলার সামনে সিমেন্টের জাফরি বসানো। ভবনে ঢোকবার কোনো প্রবেশদ্বার নেই। যে কেউ যখন তখন ঢুকতে বেরোতে পারে। কাঠের একটা বোর্ড টাঙানো আছে বাড়ির মাথায়। তার ওপর ইংরিজি এবং বাংলায় লেখা, 'নির্মল হৃদয়'—কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি। অর্থাৎ নির্মল হৃদয়ের মানুষদের দেবালয় এটি, যারা মৃতপ্রায় অনাথ আতুর, তাদের আবাসস্থান।

স্তেফান কোভালস্কীর তখন মনে হচ্ছিল, অবশেষে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, এখানেই সে আসতে চেয়েছিল। বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ সে স্থির

হয়ে দাঁড়ালো, তারপর ক'টা সিঁড়ি ভেঙে ভেতরে ঢুকলো। একটা অনির্বচনীয় মৃদু সুবাস ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময় যা আচ্ছন্ন করে ইন্দ্রিয়। কোভালস্কী উপলব্ধি করতে পারলো যে নিছক জীবাণুনাশক ঝাঁঝালো গন্ধ এটা নয়। তাকে ছাপিয়ে উঠেছে এই মৃদু সুবাস। বাড়ির ভেতরটায় এক অনুজ্জ্বল আলোর আভাস। চট করে সবকিছু স্পষ্টভাবে দৃশ্য হয় না। চোখটা সয়ে যাবার পর কোভালস্কী দেখলো তিনটি সারিতে কয়েকটা শয্যা পাতা। শয্যাগুলো সবুজ রঙের পাতলা চাদরে মোড়া। শয্যাগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে পরপর পাতা আছে। প্রতিটি শয্যার গায়ে এক দুই নম্বর লেখা। ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হচ্ছে দৃষ্টি। কোভালস্কী দেখলো শয্যার ওপর ক্ষীণ কঙ্কালসার ক'টা ছায়াশরীর। দ্বিতীয় ঘরেও অবিকল একই ব্যবস্থা। এ ঘরের রোগীরা সবাই মহিলা।

কোভালস্কীকে যা বিস্মিত করেছে তা এখানকার শান্ত পরিবেশ। যেন অপার শান্তি বিরাজ করছে সর্বত্র। কোথাও ভয় নেই, ত্রাস নেই। ভয়ত্রাস লাঞ্ছিত অসহায় বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে। এ যেন যথার্থই প্রেম ও শান্তির আগার।

মোট এক শ' দশজন অনাথ আতুরের শান্তিদায়িনী এই মানুষটি একজন মহিলা। ছোট্ট এবং দৃঢ় মনোভাবের এই মানুষটিই এদের একমাত্র অবলম্বন। দীনহীনদের তিনিই মা জননী। খানিক পরেই কোভালস্কী তাঁকে দেখতে পেল। এক মরণাপন্ন রোগীর পাশটিতে তার বুকের ওপর ঝুঁকে বসে আছেন। মহিলার পরনে হাল্কা নীলপাড়ের সাদা সুতির শাড়ি। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ মা জননী। ঠিক তাই। সেবার কাজে ইতিমধ্যেই ঝড় এনেছেন সংসারে। শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীর মানুষ এই সেবিকার নিঃস্বার্থ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এক ডাকে তাঁকে চেনে অনাথ আতুরের মা জননীরূপে। পথেঘাটে পড়ে থাকা অসহায় মুমূর্ষু থেকে শুরু করে বাপ-মা হারা অপোগণ্ড শিশু—সবাইকেই পরম যত্নে লালন করলেন তাঁর 'নির্মল হৃদয়' আবাসে। খবরের কাগজে নিত্যই ছাপা হচ্ছে এসব খবর। তাই তাঁর কাজের বহরটি ছড়িয়ে গেছে দেশের বাইরেও। শ্রেষ্ঠ সম্মানে তাঁকে ভূষিত করছে তারা। ইনিই বিশ্ববন্দিতা মাদার টেরেসা। এ'রই সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছে স্তেফান কোভালস্কী। মাত্র চুয়ান্ন বছরেই শরীরটা যেন জরাবিহ্বল। তাঁর গভীর বলিরেখা-বহুল মুখ এবং নোয়ানো চেহারাটি দেখলেই বোঝা যায় যে, অনেক আত্মত্যাগ এবং বিনিদ্ররজনী যাপনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন ইতিমধ্যে।

যুগোশ্লাভিয়ার স্কোজে (Skopje) শহরের এক বিত্তশালী বণিক পরিবারে এ্যাগ্‌নেস্ ওজ্যাক্সিউ (Agnes Bojaxhiu) নামে একটি মেয়ে জন্মায়। মেয়েটির বাপ-মা দুজনেই ছিলেন আলবেনীয়ার অধিবাসী। কিন্তু এত বিত্তের মধ্যে বড় হলেও ছেলেবেলা থেকেই তার মনে কোনো মোহ ছিল না। ভারতবর্ষে খ্রীশ্চান মিশনারীদের কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনা হয় তখন থেকেই। ক্রমে সুযোগ এল। মাত্র আঠারো বছর বয়সে খ্রীশ্চান সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নিল এ্যাগ্‌নেস্। তখন তার সন্ন্যাসিনী নাম হলো টেরেসা। অতঃপর লরেটো সিস্টার্স নামে মিশনারী ধর্ম সম্প্রদায়ের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হলেন টেরেসা এবং ১৯৩১ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে জাহাজঘাট থেকে কলকাতাগামী জাহাজে চড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলেন। ইওরোপ মহাদেশে কলকাতার খুব নামডাক তখন। পদমর্যাদায় তার স্থান

লণ্ডনের পরেই। কলকাতায় এসে শহরের সব থেকে নামী কনভেন্ট স্কুলে ভূগোল পড়াবার দায়িত্ব পেলেন টেরেসা। এই কাজে তিনি বৃত ছিলেন দীর্ঘ ষোলো বছর। ১৯৪৬ সালের একটা ঘটনায় তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে যায়। একবার ট্রেনে চড়ে শৈলশহর দার্জিলিং যাচ্ছিলেন টেরেসা। হঠাৎ অন্তর্যামীর আদেশ শুনলেন তিনি। যেন অতঃপর অবিমৃষ্য সুখের জীবন ছেড়ে অনাথ আতুরের সেবার ভার নেন এবং তাদের সংগে থাকেন। পোপের আদেশ নিয়ে সেবাব্রতীর জীবন শুরু করলেন টেরেসা। তখন থেকে তাঁর পরিধান হলো সাদাসিদে সুতির শাড়ি এবং ব্রত হলো অনাথ আতুরের সেবা। টেরেসা হলেন জননী টেরেসা। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো এক নতুন সেবাসঙ্ঘ। নামকরণ হলো, অর্ডার অব দ্য মিশনারীস্ অব চ্যারিটি। তারপর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর মাদার টেরেসা এই সঙ্ঘটিকে তিলতিল করে বড় করেছেন। বর্তমানে এই অর্ডারের অধীনে দুশ পঁচাশিটি বাড়ি আছে এবং গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার দাতব্য প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে আছে এই দাতব্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো। এমনকি লৌহ যবনিকার আড়ালের দেশ রাশিয়াতেও এর শাখা আছে। যে আশ্রমটিতে পা দিয়ে কোভালস্কী কৃতার্থ হয়েছে, মুমূর্ষুদের এই আবাসটি গড়ে ওঠার কাহিনীটি ভারি মর্মস্পর্শী। মাদার টেরেসার জীবনের এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার ঘটনা সেটি।

সময়টা ১৯৫২ সালের জুন মাস। কলকাতা যথারীতি বর্ষাবিধ্বস্ত। নিষ্ঠুর প্রপাতের মতন বৃষ্টিধারা আছড়ে পড়ছে শহরের বুকে। শব্দের তাণ্ডব শুনে মনে হয় বুঝি রসাতলে যাবে পৃথিবী। কিন্তু অনিবার্য প্রলয়ের সেই সংকেত উপেক্ষা করে একজন শ্বেতকায় বিদেশিনী চলেছেন মেডিকেল কলেজের দেয়াল ঘেঁষে। হঠাৎ পায়ের তলায় নরম কি যেন ঠেকলো। কিসে যেন পা বেধে গেছে বিদেশিনীর। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। ঝরা বকুল, আমের মুকুল নয়। বিদেশিনী পড়ে গেছেন একজন বৃদ্ধার গায়ের ওপর। এক হাঁটু জলের মধ্যে বৃদ্ধা তখন শেষ সময়টির জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে বুকে তুলে নিলেন মাদার টেরেসা। স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে বৃদ্ধার পায়ের আঙুলগুলো খাওয়া। মাদার টেরেসা বুঝতে পারলেন যে আঙুলগুলো খেয়ে নিয়েছে রাস্তার ইঁদুর। বৃদ্ধাকে কোলে নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে। তারপর সামনে পড়ে থাকা একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে দিলেন তাকে। ততক্ষণে হাসপাতালের একজন কর্মচারী এসে পড়েছে। এসেই লোকটা হম্বিতম্বি শুরু করলো।

'এখুনি এই বুড়িটাকে নিয়ে যান। আর কিছু করতে পারবো না আমরা।'

নিরুপায় টেরেসা আবার কোলে তুলে নিলেন বৃদ্ধাকে। কাছাকাছি আর একটা হাসপাতাল আছে। সেখানে নিয়ে যাবেন বৃদ্ধাকে। কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়। তিনি নিষ্কৃতি দিলেন বৃদ্ধাকে। গলা ঘড়ঘড় শব্দ শুনেছেন টেরেসা। বোধহয় আর কিছু করার নেই। তাড়াতাড়ি একটা উঁচু জায়গা দেখে বৃদ্ধাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর পরীক্ষা করে বুঝলেন, সব শেষ হয়ে গেছে। বৃদ্ধার খোলা চোখের পাতা দুটো ঢেকে তার বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিলেন। তারপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যেই বৃদ্ধার নামে প্রার্থনা করলেন। ফিরে আসার সময় তাঁর মনে হচ্ছিল এই নিষ্ঠুর শহরটায় মানুষের দাম রাস্তার কুকুর-বেড়ালটার চেয়েও কম। তারাও এর চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়।

পরের দিন সকালেই মাদার টেরেসা ছুটলেন কর্পোরেশন ভবনের উদ্দেশে।

সকাল থেকে ধর্না দিয়ে আছেন শাড়ি পরা বিদেশিনী। জেদ করে বসে আছেন দেখা করবেনই। সবাই অবাক। নিরুপায় হয়ে ডেপুটি মেয়র সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন তাঁকে। কিন্তু কি চান বিদেশিনী?

'এই শহরের লজ্জা ঢাকতে চাই।'

'মানে?'

'রাস্তাঘাটে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরছে এটা কি শহরের লজ্জা নয়? আমায় একটা বাড়ি দিন যেখানে মরণাপন্নদের আশ্রয় দিতে পারি। অন্তত মরবার আগে একটু সেবা এবং শ্রদ্ধা পাবার অধিকার তাদের পেতে দিন, যাতে ঈশ্বরের সামনে লজ্জা নিয়ে দাঁড়াতে না হয় তাদের।'

এই ঘটনার ঠিক এক হপ্তা পরেই কালী মন্দিরের পাশে একটা বাড়ির অধিকার পেলেন মাদার টেরেসা। বাড়িটা আগে ধর্মশালা ছিল। পুণ্যার্থী ভক্তেরা এখানে এসে থাকতো। মায়ের মন্দিরের পাশে এমন একটা আশ্রয়স্থান পেয়ে মাদার টেরেসা অভিভূত। তাঁর মনে হলো, ঈশ্বরই করিয়েছেন এটা। মায়ের কোলের কাছটিতে এসেই মৃতপ্রায়রা মরতে চায়, যাতে তাঁর মন্দিরের পাশের শ্মশানভূমিতে তাদের শেষ কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথম প্রথম বিদেশিনী এই মহিলার কাজকর্ম পাড়ার লোকের কৌতূহল উদ্রেক করেছিল। সবাই ভাবতো শাড়ি পরা এবং বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকা এই বিদেশিনী মায়ের থানের ওপর কি করতে চাইছে? ক্রমশ গোঁড়া হিন্দুরা ব্যাপারটা নিয়ে শোরগোল তুললো। রটে গেল যে খ্রীশ্চান সন্ন্যাসিনী মুমূর্ষুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করাচ্ছে। নানারকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে লাগলো। একদিন রোগীদের বয়ে আনা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির ওপর ইঁট-পাটকেল পড়লো। পাড়ার উগ্র স্বভাবের কিছু মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হতে লাগলো অন্য সিস্টাররা। একদিন মাদার টেরেসা হাঁটু গেড়ে ওদের সামনে বসে চীৎকার করে বললেন, 'আমায় মারুন। দেখুন, আমি তাহলে স্বর্গে চলে যাব।' কথাটা বলার সময় তাঁর হাতদুটো ক্রুশচিহ্নের মতন সামনে ছড়ানো ছিল।

কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে ওরা তখনকার মতন চলে গেল। কিন্তু হয়রানি কমলো না। স্থানীয় মানুষের এক প্রতিনিধিদল পুলিসের কাছে দাবি করলো যেন বিদেশিনী এই মহিলাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। পুলিসের বড়কর্তা ওদের দাবির কথা শুনলেন। তারপর কথা দিলেন যে খোঁজখবর নিয়ে যা ন্যায্য তা করবেন। একদিন নিজেই এলেন তদন্ত করতে। যা দেখলেন সেটি কোনো সাধারণ দৃশ্য নয়। রাস্তা থেকে সদ্য কুড়িয়ে আনা হয়েছে যে মানুষটাকে তার দুটো পায়ে ঘা। পুঁজ রক্ত জমে ফুলে উঠেছে পাদুটো। মাদার টেরেসা হাঁটু-মুড়ে তার পাশটিতে বসে ক্ষতস্থানটি ড্রেসিং করছেন। পুলিসসাহেব হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এই অসাধারণ মহিলার দিকে। মাদার টেরেসার মুখখানি তখন ঝকমক করছিল পবিত্রতায়। পুলিসসাহেব নিজেও অভিভূত।

লোকটির শুশ্রূষার পর পুলিসসাহেবের কাছে এসে মাদার টেরেসা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যদি চান তবে আশ্রমটি ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।'

অভিভূত পুলিসসাহেব বললেন, 'না মা। তার দরকার হবে না।'

বাইরে এসে দেখলেন সবাই অপেক্ষা করছে তাঁর উত্তরটা শুনতে। ওদের দিকে চেয়ে পুলিসসাহেব বললেন, 'আমি কথা দিয়েছিলাম যে সন্ন্যাসিনীকে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেব। তবে আজই আমার কথা রাখতে পারছি না। আপনাদের

মা-বোনেরা এসে দেখে যান'। তাঁরা যখন বলবেন তখনই তাড়িয়ে দেব।'

লোকগুলো হতাশ হয়ে চলে গেল বটে কিন্তু উৎপাত থামলো না। প্রায়ই তারা সেবাশ্রমের দিকে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তো। একদিন সকালবেলা মাদার টেরেসা দেখলেন মন্দিরের সামনে কিছু মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলেন টেরেসা। উঁকি দিয়ে দেখলেন ভিড়ের মধ্যিখানে রক্তে মাখামাখি হয়ে অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে একজন মধ্যবয়সী মানুষ। লোকটার চোখ দুটো ওল্টানো। গলায় পৈতাগাছটি দেখে টেরেসা অনুমান করলেন যে সে মন্দিরের পুরোহিত। কলেরা হয়েছে বলে কেউ ছুঁতে সাহস পাচ্ছে না।

মাদার তাড়াতাড়ি মুমূর্ষু লোকটিকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এলেন। দিনরাত ক্রমাগত সেবা এবং চিকিৎসার গুণে লোকটি অবশেষে নিরাময় হলো। সেরে উঠে মানুষটার কি আক্ষেপ! সবাইকে ডেকে ডেকে বলছে, 'তিরিশ বছর ধরে পাথরের কালীমা'র পুজো করেছি। কিন্তু ইনি জ্যান্ত কালী। রক্তমাংসের মা জননী।' সেই থেকে ইঁট ছোঁড়াও বন্ধ হয়ে গেল।

কলকাতার মানুষ জেনে গেল ঘটনাটা। তখন থেকে রোজ পুলিস এবং য়্যাম্বুলেন্সের গাড়িতে মুমূর্ষুদের 'নির্মল হৃদয়ে' নিয়ে আসা হতো। 'নির্মল হৃদয়' হয়ে উঠলো কলকাতার রত্নবিশেষ। দলে দলে সাংবাদিকরা আসতে শুরু করলো। স্বয়ং মেয়র এসে কাজকর্ম দেখে গেলেন। আসতে লাগলো শহরের গণ্য-মান্যরা। সমাজের উঁচুতলার মহিলারাও সিস্টারদের সঙ্গে সেবাশুশ্রূষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলো। পরবর্তীকালে এদেরই একজন মাদারের পরম অনু-রাগিণী হয়ে ওঠে।

মহিলার নাম অমৃতা রায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের এই সুন্দরী এবং ধনবতী মহিলার কাকার নাম ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাই স্বাভাবিকভাবেই অমৃতার অনেক প্রভাব ছিল প্রশাসনের ওপর। তখন থেকেই এই অঙ্গরাজ্যটির অনেক সমস্যা। খরা, বন্যা, পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যার চাপ এসবের সঙ্গে ছিল প্রশাসনিক লালফিতের বাধা। অমৃতার সাহচর্যে লালফিতার বাধাগুলো দ্রুত কেটে যেতে লাগলো। কোভালস্কীর মতন তাঁকেও কাস্টম্‌স্ আপিসের দোরে দিনের পর দিন ধর্না দিতে হতো বিদেশ থেকে পাঠানো ওষুধ এবং গুঁড়ো দুধের বাক্সগুলি ছাড়াতে।

মুমূর্ষুদের সেবাপরিচর্যার কাজটা ছিল মাদারের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু যারা জীবিত তাদেরও সেবা দরকার। এদের মধ্যে সবচেয়ে অনাদৃত হলো সদ্যোজাত শিশুরা। জঞ্জালের স্তূপ কিংবা গির্জার দোরগোড়ায় কাপড়জড়ানো অবস্থায় কত শিশু পড়ে থাকে। কেউ চেয়েও দেখে না। মাদার টেরেসা যেন তাদের নিয়েও নানা স্বপ্ন দেখতেন।

এমনি এক ঘোরের মধ্যে একদিন তাঁর মনে হলো ঈশ্বর যেন হাত দেখিয়ে একটা কিছু নির্দেশ করছেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন কাছেই একটা খালি বাড়ি পড়ে আছে। রাস্তার ধারে এই বাড়িটাতেই ১৯৫৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'শিশুভবন' প্রতিষ্ঠা হলো। 'শিশুভবনে'র প্রথম অতিথি হয়ে এল ফুটপাত থেকে তুলে আনা একটি বাচ্চা। খবরের কাগজ মুড়ে কারা ফেলে গিয়েছিল এই পাখির ছানাটা। হাল্কা ফনফনে শরীরের বাচ্চাটার ওজন তিন পাউন্ডেরও কম। মাদার টেরেসা নিজেই বুকে করে তুলে এনেছেন তাকে। চিঁচিঁ করছে বাচ্চাটা। বোতল

থেকে দুধ টানার ক্ষমতাও নেই। কোলের মধ্যে শুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে দুধ খাওয়ালেন তাকে। ধীরে ধীরে বল পেয়ে বাচ্চাটি বেঁচে উঠলো। প্রেম ও করুণার আশ্রয়ে এটাই হলো তাঁর প্রথম জয়। এরপর থেকেই আরও বাচ্চা আসতে শুরু করলো শহরের নানা জায়গা থেকে। রোজ পাঁচ-ছ'টি করে বাচ্চা আসতো। আশ্রমের সবার তখন নতুন দুর্ভাবনা শুরু হলো। এতগুলি বাচ্চার ভরণপোষণের ভার কে নেবে? বয়স্ক এবং বাচ্চা মিলিয়ে ভরণীয়বর্গের সংখ্যা কয়েক শ' ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু মাদার পরম নিশ্চিন্ত। উজ্জ্বল মুখে সবাইকে বললেন, 'যিনি ভার নেবার তিনিই নেবেন।'

তাই-ই হলো। তিনিই ভার নিলেন। দানসামগ্রী আসতে লাগলো ভারে ভারে। শহরের ধনীরা চাল, আনাজ, মাছ পাঠাতে লাগলো গাড়ি ভর্তি করে। একদিন মাদার টেরেসার সঙ্গে একজন পুরনো বন্ধুর দেখা হলো। এরই বাড়ির একখানা ঘর পেয়েছিলেন তিনি। মাদার টেরেসা আহ্লাদ করে বললেন, 'আপনাকে একটা সুখবর দিই। এখুনি জানতে পারলাম যে সরকার থেকে আমাদের আশ্রমের একশ'জন বাচ্চার জন্যে মাসিক তেত্রিশ টাকা অনুদান দেবে।'

লোকটা বললো, 'সরকারী অনুদান? আপনার জন্যে দুঃখ হচ্ছে মাদার।'

'কেন?'

'কারণ, সরকারী গ্রাণ্টের চেহারা চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণাই নেই। এরপর দেখবেন সরকারী প্রশাসনের লালফিতের ধাঁধায় আপনি জড়িয়ে গেছেন।'

লোকটার অনুমানে কোন ভুল নেই। ছ'টি মাসও গেল না। আমলাদের একটা মিটিংএ হিসেবের বইখাতা নিয়ে মাদার টেরেসাকে উপস্থিত হতে হলো। প্রায় ডজনখানেক আমলা হুমড়ি খেয়ে পড়লো হিসেব বইগুলোর ওপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো কোথায় কারচুপি হয়েছে। নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো তারা। নানারকম নির্লজ্জ নগ্ন ইঙ্গিত, অশোভন শ্লেষ। তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন মাদার টেরেসা। উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, 'আপনারা কি ইঙ্গিত করছেন তা বুঝেছি। আপনাদের ধারণা সরকারের গ্রাণ্টের টাকা নির্দেশ মতন খরচ হচ্ছে না। অর্থাৎ আপনাদের সরকারী ছাপমারা বাচ্চাদের জন্য তেত্রিশটাকা খরচ করতে বলেছেন। কিন্তু আমার শিশুভবনে অন্য বাচ্চাও আছে। তাদের জন্যে আমি সতেরো টাকার বেশি খরচ করতে পারি না। কিন্তু এটা কি সম্ভব? একদল বাচ্চার জন্যে সতোরো টাকা আর একদল বাচ্চার জন্যে তেত্রিশ টাকা—এই বৈষম্য কি করা উচিত? আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমায় রেহাই দিন। সরকারী গ্রাণ্ট ছাড়াই আমি 'শিশুভবন' চালাতে পারবো।' এই বলে চলে এলেন মাদার টেরেসা।

কিন্তু মাদার টেরেসা থেমে থাকলেন না। শুরু করলেন নতুন এক অভিযান। গর্ভপাত এক অতি নিষ্ঠুর অমানবিকতা। কিন্তু জন্মহার যেখানে বেশি সেখানে সব জেনে শুনেও সমাজ চোখ বুজে থাকে। টেরেসা কিন্তু চোখ বুজে থাকলেন না। অকাল গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শহরের সর্বত্র পোস্টার ছড়িয়ে জানিয়ে দিলেন যে প্রতিটি শিশুকেই তিনি আশ্রয় দেবেন। মর্যাদা দিয়ে বড় করবেন, মানুষ করবেন। এই ঘোষণার পর থেকেই আসতে লাগলো অসহায় মায়েরা। রাত্রির আড়ালে লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতো অন্তঃসত্ত্বা যুবতী মেয়েরা। গর্ভের কুঁড়িটি যেন ঝরে না যায়, একটু আশ্রয় পায়, সেই আশ্বাসটুকু পেতে আসতো তারা। মাদার

টেরেসা গভীর মমতায় সে আশ্বাসটি তাদের দিতেন। তারাও ফিরে যেত নিবিড় আশ্বাসটি বুকের মধ্যে চেপে।

কিন্তু সমাজে আরও দীনহীন মানুষ আছে। তাদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যতও অনিশ্চিত। সমাজের মাথায় ওঠার সোপানটি এরা খুঁজে পায়নি, কারণ নীচের নীচ, অধমের অধম এই মানুষগুলোর দায় সমাজ নিতে চায় না। এরা অতি ঘৃণ্য অতি নিন্দিত কুষ্ঠরোগী। এদের দিকে কেউ চেয়েও দেখে না।

মাদার টেরেসাই একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি তাকালেন এদের দিকে পরম মমতায়। টিটাগড়ের শিল্পাঞ্চল জুড়েই বিশাল মজুর কলোনি। এই কলোনির মধ্যেই তিনি কুষ্ঠাশ্রম তৈরি করলেন। এবড়ো খেবড়ো ইঁটের দেওয়াল আর করোগেট টিনের চালা দিয়ে তৈরি হলো কুষ্ঠাশ্রম। রেল কোম্পানির দান করা জমির ওপর গড়ে উঠলো এই আশ্রম। যে রোগীদের অবস্থা মন্দ তাদেরই এখানে নিয়ে আসা হলো। কলকাতা থেকে ওষুধ এবং ড্রেসিংএর সরঞ্জাম বয়ে আনলেন। রুক্ষ শুকনো মরুভূমিতে প্রেমের ফুল ফুটে উঠলো। দেখতে দেখতে অসংখ্য রোগী আসতে লাগলো আশ্রমের দোরগোড়ায়।

টিটাগড় দিয়ে যে জয়যাত্রা শুরু হলো তা সেখানেই থেমে থাকলো না। তখন শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর কাজের বহর। একদল এদেশী সিস্টার পাঠিয়ে বস্তিতে বস্তিতে আরও সাতটি চিকিৎসালয় তৈরি করলেন। সেবাকর্মের ধারাটি যেখান থেকে প্রথম শুরু করেছিলেন, সেই বস্তিতেও এমন একটা চিকিৎসালয় তৈরি হলো। রুগীরাও আসতে লাগলো দলে দলে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত বাধা এল একজন বস্তি-বাসীর কাছ থেকেই। লোকটা টাউন হলের কর্মচারী। সে অভিযোগ করলো আশ্রমে নোংরা রোগীদের ভিড় হচ্ছে। বস্তির পরিবেশ সংক্রমিত হচ্ছে। সুতরাং আরোগ্য-শালাটি তুলে দেওয়া হ'ক। মাদার টেরেসা বাধ্য হলেন আশ্রমটি তুলে দিতে। কিন্তু হার মানলেন না। শুরু হয়ে গেল নতুন পদ্ধতির চিকিৎসা। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তারখানা।

কলকাতার মানুষ একদিন অবাক হয়ে দেখলো অনেকগুলো সাদা রঙের গাড়ি মিশনারীস অব চ্যারিটিস শিরোনাম নিয়ে পথে পথে ওষুধ বিলি করছে। কল-কাতার মানুষের কাছে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

এমনি এক ভ্রাম্যমাণ ডাক্তারখানা আনন্দ নগরের জন্যেই চাই। আরও ভাল হয় যদি সঙ্গে দু-তিনজন ভারতীয় সিস্টার পাওয়া যায়। পুরনো মাদ্রাসার কাছে মোষ খাটালের পাশে এই কুষ্ঠাশ্রমটি করতে চায় স্তেফান কোভালস্কী এবং সেই-জন্যেই মাদার টেরেসার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে।

দুসারে রোগীদের বিছানা। তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে কোভালস্কী পৌঁছাল মাদার টেরেসার কাছে। জানু মুড়ে তিনি তখন একজনের ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছিলেন। যুবক হলেও এত শীর্ণ চেহারার মানুষ কোভালস্কী আগে কখনও দেখেনি। যেন নাৎসীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে খুঁটে তুলে আনা একজন যুদ্ধবন্দী। সেইরকমই অন্তঃসারশূন্য ছিবড়ে চেহারা তার। গা থেকে মাংস গলে গলে পড়েছে। শুকনো চামড়াটা কোনরকমে লেগে আছে হাড়ের গায়ে। পরম মমতায় মাদার তখন তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলেন।

মানুষটাকে দেখতে দেখতে কোভালস্কীর মনে হলো মানুষের মুখের এমন বিচিত্র ভাবটি সে আগে কখনও দেখেনি। শরীরের কষ্ট বা যন্ত্রণা নেই। সেখানে

মাখামাখি হয়ে আছে বিস্ময় আর শান্তি। বঞ্চিত মানুষ যখন স্নেহভালবাসা পায় তখন বোধহয় তার মুখখানিও অমন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

কোভালস্কীর পায়ের শব্দ পেয়েছিলেন মাদার টেরেসা। হাতের কাজটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। তখনই নজর পড়লো তার বুকের ক্রশচিহ্নটার ওপর। কিছুটা মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'ও! ফাদার আপনি! বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

কোভালস্কীর সঙ্কোচ হচ্ছে। ওদের কথার মাঝখানে এমনভাবে এসে পড়ার দরুন খুব অস্বস্তি লাগছিল তার। কিন্তু এরই মধ্যে ওর চোখদুটো যেন ভারি মধুর একটা ছবি দেখতে পেল। মুমূর্ষু ছেলেটি যেন মাদার টেরোসাকে কিছু বলতে চাইছে। তাই মিনতি মাখানো চোখে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। একটা মুহূর্তের জন্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল কোভালস্কী। একটু পরে আত্মসম্বরণ করে সে তার নিজের পরিচয় দিল।

মাদার টেরেসা মিষ্টি একটু হাসলেন। বললেন, 'মনে হচ্ছে লোকের মুখে আমি আপনার কথা শুনেছি।'

কোভালস্কী ধন্য। কৃতার্থস্বরে বললো, 'মা!' আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

'আমার সাহায্য? না, না। বলুন ঈশ্বরের সাহায্য। আমি কিছুই নই।' আকাশের দিকে হাতখানা তুলে মাদার বললেন।

ঠিক তখনই জীন্‌স্‌ পরা একজন মার্কিন যুবক ঘরে ঢুকেছে। তার হাতে একটা পাত্র। মাদার তাকে ডাকলেন, তারপর মুমূর্ষু ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমার মনপ্রাণ দিয়ে ওকে ভালবাস। ওর সেবা করো। এই নাও।'

এই বলে হাতের সন্না আর কাপড়খানা মার্কিন যুবকের হাতে দিলেন। তারপর স্তেফান কোভালস্কীকে সঙ্গে করে একটা খালি ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল আর বেঞ্চি পাতা। দেওয়ালের মাথায় একটা বোর্ড টাঙানো। বোর্ডের গায়ে একটা ছোট্ট দোঁহা লেখা আছে।

> যদি তোমার দুটুকরো রুটি থাকে
> একটি দেবে ক্ষুধিতকে
> অন্যটি বেচে
> শাকান্ন যা পাবে
> তাই দিয়ে মন ভরাবে

আনন্দ নগরে একটি কুষ্ঠাশ্রম তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলো কোভালস্কী। মাদার টেরেসা খুব খুশী। শ্লাভ এবং বাংলা মেশানো মিষ্টি উচ্চারণে বললেন, 'খুব ভাল ফাদার। খুব ভাল কাজ। আপনি সত্যিই ঈশ্বরের কাজ করছেন ঠিক আছে। কুষ্ঠরোগীর সেবা করেছে এমন তিনজন সিস্টার আমি পাঠিয়ে দেব।

মাদার টেরেসা তখন তাকিয়েছেন শয্যায় পড়ে থাকা রোগীদের দিকে। সেই-ভাবেই গভীর অনুভূতির সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এরা আমাদের সেবা করার সুযোগ দিচ্ছে। এ দান অনেক। এর কিছুই আমরা এদের দিতে পারি না। তাই না ফাদার?'

মাদার টেরেসা চুপ করলেন। একজন সিস্টার এসে চুপি চুপি কিছু যেন বললো। তিনি চঞ্চল হলেন। কোভালস্কী বুঝলো এবার তাঁকে অন্যত্র যেতে হবে। মাদার টেরেসা বিদায় চাইলেন। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে বললেন, 'গুডবাই ফাদার!'

'গুডবাই।'

'একদিন সকালে এসে আমাদের জন্যে একটা সমবেত প্রার্থনা করুন।'
কৃতার্থ কোভালস্কী সম্মত হয়ে ঘাড় নাড়লো। তার মনে হচ্ছিল চেঁচিয়ে বলে, 'কলকাতা তুমি ধন্য! এত অশুচিতার মধ্যেও পুণ্যাত্মা সাধুসজ্জনদের তুমি কোল দাও। তাদের লালন করো। যথার্থই তুমি সর্বংসহা মা জননী!'

ঊনচাল্লিশ

কলকাতার অবস্থা যেন দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ভীতিকর যানজট আজকাল প্রায় রোজই হয়। কখনো মনে হয় যেন এক পা এগোনোও এক কঠিন এবং প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। বিদ্যুতের সংযোগ নেই। অতএব সারি সারি ট্রাম দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায়। এখানে ওখানে ব্রেক ডাউন হয়ে পড়ে আছে লরি। দোতলা বাসগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। হয় এ্যাক্সেল ভেঙে শুয়ে পড়েছে, না হয় রাস্তার আধখানা জুড়ে কাত হয়ে গেছে। হলুদরঙের ট্যাক্সিগুলো হর্নের আওয়াজ করছে এগোবার জন্যে। মালবোঝাই হয়ে ঠেলাগাড়ি গরুরগাড়ি ক্ষীণস্বরে গোঙাচ্ছে। পাহাড়ের মতন মালের বোঝা মাথায় নিয়ে কুলিগুলো উথলে পড়া জনস্রোতের মধ্যে টলতে টলতে রাস্তা পেরোবার চেষ্টা করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। রিক্সাওলাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জলের পাইপভাঙা রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে তারা হাঁটছে। মোট কথা একটা করে দিন যাচ্ছে আর সবকিছু একটু একটু করে অচল হচ্ছে।

সমান্তরালভাবে চলেছে আর এক ধরনের উৎপাত। রিক্সায় উঠে মাতাল ভাড়া দেবে না। গুণ্ডা চোখ রাঙাবে। ভাড়া না দিয়েই বেশ্যা মিলিয়ে যাবে ভিড়ে। দামী জামাকাপড় পরা অভিজাত ঘরের মেয়েরা ভাড়ার ন্যায্য পয়সা দেবে না। এই নিয়েই দিন চলছে হাসারির। একদিন ডাকঘরে গিয়ে বাপের নামে মানি অর্ডার পাঠাবার সময় ছোট্ট একটা কুশলবার্তা লেখাল সে। 'আমরা ভাল আছি। এখন রিক্সা চালাচ্ছি আমি।' এটুকু করতে পারছে ভেবে বুকখানা দশহাত হয়ে উঠলো। হঠাৎ মনে হলো অলকাকে একটা জরুরি খবর দেওয়া দরকার। কথাটা মনে হতেই সে ছুটলো তার ফুটপাতের সংসারের দিকে। অলকা তখন হেঁট হয়ে বসে বাসন মাজছে। হাসারি ডাকলো, 'বউ!'

অলকা তাকালো।

হাসারি বললো, 'বস্তিতে একখানা ঘর পেয়্যাছি গো!'

'বস্তিঘর?' মনে মনে আঁতকে উঠলো অলকা। এত কষ্টের এই পরিণাম? শেষ পর্যন্ত বস্তিঘরে থাকতে হবে তাকে? অলকার মাথায় সত্যিই যেন বাজ ভেঙে পড়লো। একথা ঠিক যে, কলকাতা শহরে কোঠাঘরে থাকার স্বপ্ন সে দেখেনি। কিন্তু গ্রামের সেই স্মৃতি তখনও মলিন হয়ে যায়নি। সেই খোলামেলা জীবন পুকুরে নিত্য স্নান, পরিষ্কার ছিমছাম ঘরদোর, টাটকা সবুজ আনাজ তরকারি—এসব কেমন করে সে ভুলবে? এখন সে কোথায় এসে পড়লো? এজমালি কল-পায়খানা, কোথাও তাও নেই। জলের ব্যবস্থা নেই, খোলা নালায় জঞ্জালের স্তূপ—আহ্লাদ পাবার মতন কতটুকুই বা! তবুও ফুটপাতের সংসারের চেয়ে বোধহয় ভাল হবে সেটা। অন্তত চারখানা খুঁটি পুঁতে মাথায় টিনের চালা দেওয়া একটা ঘেরাটোপ ত' হবে! ঘর

নয় তবে ঘরের মতন একটা কিছু। তবে বিপজ্জনক এই আশ্রয়টুকু অবলম্বন করে সামনের বাঁধভাঙা বর্ষা আর শীতের তাণ্ডবটি ঠেকাতে পারবে কি না কে জানে।

তিরিশ বর্গফুটের ছোট্ট পরিসরের যে ঘরখানা হাসারি যোগাড় করতে পেরেছে, সেটা একেবারে শহরের বুকের ওপর। ময়দান পার্ক ঘিরে এই বস্তিগুলো গড়ে উঠেছিল সেই চীনভারত হাঙ্গামার সময়। তখন উত্তরবংগ থেকে কিছু উদ্বাস্তু এসে পড়ে শহরে। ঘর গেরস্থালীর যাবতীয় সরঞ্জাম একটা পুঁটুলির মধ্যে পুরে তারা এসেছে। খুবই শোচনীয় অবস্থা মানুষগুলোর। একদিন তারা খোলা জমির ওপর খোঁটা পুঁতে মাথায় কাপড় বিছিয়ে বাস করতে লাগলো। ক্রমে আরও ক'টা পরিবার এসে জুটলো ওদের সংগে। দেখতে দেখতে একটা ছোটখাট বস্তিপল্লী হয়ে উঠলো সেটা। চারপাশে বড় মানুষের বসতবাটী আর তারই মধ্যে মূর্তিমান ছন্দপতনের মতন দগদগে হয়ে আছে বস্তিপল্লীটা। শহরটার সুশ্রী মুখে গুটি-রোগের দাগ ধরা এমন হতশ্রী পল্লী প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। এটাও তার সংগে যুক্ত হলো। সবচেয়ে মজার কথা, পুলিস, পৌরপ্রতিষ্ঠান, জমির মালিক কেউ কোনো আপত্তি করলো না এবং দিনে দিনে তার শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। এইসব হতশ্রী বস্তিতে চরম দুরবস্থার মধ্যে মাথাগুঁজে পড়ে আছে অসংখ্য উদ্বাস্তু। খাবার জলের একটা কল পর্যন্ত কাছেপিঠে নেই। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন এই বস্তিগুলো এক পুরুষ দুপুরুষ ধরে বেঁচে আছে। কেউ খোঁজখবরও করে না। তবে সবাই যে উদাসীন তা নয়। যখনই কোনো নবাগত মাথা গুঁজতে আসে, তখনই তার ওপর একশ্রেণীর মানুষের নজর পড়ে। জোর করে আদায়-উসুলের জন্যে একটা মাস্তানচক্র, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, কাজ করতে শুরু করে। এরাও একশ্রেণীর মাফিয়া। তবে এদের কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ দিশি। মার্কিন-ইতালীয় ধাঁচের আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সংগে এই দিশি মাস্তানচক্রের কোনো যোগ নেই।

বস্তিতে ঢোকার আগে হাসারির কাছেও মাস্তান চক্রের একজন লোক এল। লোকটাকে দেখেই চেনা যায় যে, আলো-আঁধারি জগতের লোক সে। লোকটা পরিচয় দিল যে বস্তির মালিকের লোক সে। বলাবাহুল্য, এই মালিক হলো এখানকার মাস্তান চক্রের প্রধান। লোকটার হাতে পৌরকর্তৃপক্ষের সই করা ঘরভাঙার নোটিশের কাগজ। যখনই উদ্বাস্তুরা কোথাও এসে ঘর বাঁধে, তখনই তাদের হাতে ঘরভাঙার সই করা নোটিশ ধরিয়ে দেয় মাস্তানচক্রের লোক। তখন বাঁচার একটাই রাস্তা। হয় দাম দিয়ে জমি কেনো, নয়ত নিয়মিত ভাড়া গুনে যাও। মাথা গোঁজার এই খোপটুকুর জন্যে হাসারির বরাদ্দ হয়েছে মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়া, যা আগাম দেয় এবং পঞ্চাশ টাকা দালালি। তবে ভাড়ার টাকা আদায়-উসুল ছাড়াও এরা এদের কর্তৃত্বটি বস্তিজীবনের সব দিকেই ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকায় এরাই হয়ে উঠেছে বস্তির পরিত্রাতা। প্রত্যক্ষ এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ঘর-গেরস্থালীর মধ্যেও ঢুকে গেছে এরা। ফলে শুধু পারিবারিক ঝগড়া মেটানো ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপারে এদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সরকারী ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানো, রেশনকার্ড বের করা, ভোটের আগে কিছু সুবিধে আদায় করা, জলের লাইন থেকে জল চুরি করা, মন্দির তৈরি করা, সব-কিছুই হয় মাস্তানদাদার সৌজন্যে। এককথায় বস্তিপল্লীর অভিভাবক হলো মাস্তানদাদারা।

এর বৈধতা নিয়ে কথা বললে কপালে দুঃখ আছে। হয় কোনো অজ্ঞাত কারণে পল্লীতে আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সারা বস্তি। কিংবা হয়ত ছুরির-ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত কোনো প্রতিবাদকারীর মৃতদেহ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে বস্তির মানুষ। এই নিরঙ্কুশ আধিপত্যের প্রকাশ এক এক জায়গায় এক এক রকম। কোথাও সরাসরি। যেমন হাসারির বস্তিতে। মাস্তানরা দলবল নিয়ে অনেকেই এখানে থাকে। আবার যেখানে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে কিংবা চোলাই ঠেক্ আছে এমন এলাকার পাশে গড়ে ওঠা বস্তির লোকজনদের সংগে যোগাযোগ হয় মধ্যবর্তী দালাল মারফত। এক মুঠো চালের জন্যে বস্তির মানুষ এইসব দালালদের হাতের লোক হয়ে যায়। কোথাও মাস্তানচক্রের অলিখিত আইনবিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মারফত বলবৎ হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র ধর্মীয় বা যেমনই হ'ক, মাস্তানচক্রের হাতে বস্তির মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনযাত্রার খবরাটি তুলে দেওয়াই তাদের প্রধান কাজ। ফলে মাস্তানচক্র সোজা সরল ভাড়া আদায়কারী দল নয়। বস্তির মানুষের ঘর-গেরস্থালীর মধ্যে ঢুকেও এরা নির্বিবাদে রাজত্ব করছে। ফলে বস্তির লোকের ধর্মকর্ম, বিয়ে শ্রাদ্ধ, মামলা মোকদ্দমা এককথায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি আচারবিচারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে জড়িয়ে আছে এরা। এদের অঙ্গুলিহেলনেই বস্তি ঝোপড়ির সংসার চলছে। হিন্দু-মোছলমানের মড়াটারও গতি হবে না এদের নির্দেশ ব্যতিরেকে।

রাতের কালো আঁধারের আড়ালে রিক্সার ওপর তার ফুটপাতের সংসার তুলে হাসারি যাত্রা করলো আর এক গন্তব্যের দিকে। পিছনে চলেছে বউ ছেলেমেয়ে। বড় রাস্তার বাঁকে রিক্সাটা আড়াল হতেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল ক'টা ছায়া-শরীর এবং হাসারির ছেড়ে যাওয়া ফুটপাতের আশ্রয়টা তারা অধিকার করলো।

চল্লিশ

ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়েই যেন এক নাটকীয় পরিস্থিতির সামনে পড়লো স্তেফান কোভালস্কী। রে রে শব্দে তার দিকে তেড়ে আসছে ছেলেবুড়ো মিলিয়ে বেশ কিছু রাগী লোক, হাতে ইঁট পাটকেল ছুরি সড়কি নিয়ে। কি ব্যাপার? একটু পরেই বৃষ্টির ধারার মতন ইঁট পাটকেল পড়া শুরু হয়ে গেল ছোট্ট গলিটার মধ্যে। বিভ্রান্ত কোভালস্কী লাফিয়ে পিছনে সরে যেতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হলো। ওদের লক্ষ্য সে নয়, একটা পাগলী কুঠে ভিখিরী। গায়ে ছেঁড়া নেকড়া, মাথা ভর্তি জটপাকানো চুল, মুখখানা রক্ত আর নোংরা ময়লায় মাখামাখি—সে এক বীভৎস চেহারা তার। ঘেন্না বিদ্বেষে ধকধক করছে চোখ দুটো। কষ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। জন্তুর মতন গাঁ গাঁ করতে করতে পাগলীটা তার শুকনো শীর্ণ হাতদুটো দিয়ে মুখটা আড়াল করার চেষ্টা করছিল। সে যত গাল দিচ্ছে ততই লোকগুলো তার দিকে ইঁট ছুঁড়ছে। ইঁটের ঘায়ে মুখখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। যেন বস্তির সুপ্ত রোষ হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে। কোভালস্কী ছুটে গেল পাগলীটার দিকে। হতভাগ্য মেয়েটাকে বাঁচানো দরকার। কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল। লোকগুলোর রোষ দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি মেরেই ফেলবে মেয়েটাকে। ছুরি বের করেছে কেউ কেউ। কোভালস্কী সভয়ে তাকিয়ে রইলো মারমুখী লোকগুলোর দিকে। একি বীভৎস

মুখো সে দেখছে?

হঠাৎ সে দেখলো সাদাচুলের একজন বুড়ো মানুষ হাতে একখানা লাঠি নিয়ে ছুটে আসছে। লোকটাকে চিনেছে কোভালস্কী। ওর ঘরের সামনে লোকটার চায়ের দোকান আছে। হাতের লাঠিটা বনবন করে ঘুরিয়ে সে তখন আড়াল করে দাঁড়িয়েছে মেয়েটাকে। তারপর ক্রুদ্ধ লোকগুলোর দিকে চেয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'এ কি করছিস তোরা? সরে যা, সরে যা বলছি! তোদের কি ভগবানের ভয় নেই রে?'

জনতা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একেবারে স্থির হয়ে মাটির সংগে যেন গেঁথে গেছে তারা। সবারই চোখ ওই রোগা বুড়ো মানুষটার দিকে। ক'টা নীরব মুহূর্ত যেন অনন্তকাল মনে হচ্ছে কোভালস্কীর কাছে। কি ঘটে তা দেখবে বলে সবাই উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে। এমন সময় একজন আক্রমণকারী ছুরিটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বুড়োর দিকে। তারপর তার পায়ের কাছে ছুরিটা রেখে বুড়োর পায়ের ধুলো নিল। লোকটার দেখাদেখি অন্যরাও গেল। তারপর হাতের লাঠি, ছুরি ফেলে দিয়ে বুড়োর পায়ের ধুলো নিল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। ব্যাপারটাও যেন হঠাৎ মিটে গেল।

ওরা চলে যাবার পর বুড়ো এগিয়ে গেল পাগলীর কাছে। মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়া আহত জন্তুর মতন তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে। বুড়ো তখন সার্টের কোণা দিয়ে পাগলীর মুখের রক্ত যত্ন করে মুছিয়ে দিল। মেয়েটার চোখের সেই বন্য ভাব আর নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে। আস্তে আস্তে তাকে ধরে তুললো বুড়ো, তারপর নিজের শরীরের ওপর মেয়েটার ভার রেখে তাকে নিয়ে চললো চায়ের দোকানের দিকে।

দিন কয়েক আগেই এই নির্ভীক ন্যায়পরায়ণ মানুষটার পূর্বপরিচয় জানতে পেরেছে কোভালস্কী। সূর্যই নিজের মুখে সে সব কথা তাকে বলেছে। কোভালস্কীর এখন মনে হয় মানুষটার সূর্য নামকরণ সার্থক, কারণ সূর্যের মতনই আলোঝলমল তার মন। এখন তার যে হাতটা চায়ের কেটলি নাড়াচাড়া করে সেটাই তিনবছর আগে কুমোরের চাকতি ঘুরিয়ে নানা ছাঁদের মাটির মূর্তি, গেরস্থর দরকারী হাঁড়ি, কলসি, আর ঘরসাজানো মনোহারী জিনিস বানাতো। একবার ছ'ফুট উঁচু একটা বাহারি ফুলদানি * ৎ করে তৈরি করেছিল সে। বিয়ের আসরে তার এই শিল্পকর্মটি দেখে সবাই প্রশংসা করতো। কলকাতা থেকে একশ' বিশ মাইল উত্তরে একটা বড়-সড় গ্রামে সে কুমোরের কাজ করতো। তার পূর্বপুরুষরাও সেই কোন্ অতীতকাল থেকে কুম্ভকারের কাজ করে এসেছে। তখন সমাজের গড়নটা এমন আলগা ছিল না। সমাজে বামুন বা সুদখোর মহাজনের মতন কুমোরেরও একটা নির্দিষ্ট ঠাঁই ছিল। হিন্দুদের যে কোনো ক্রিয়াকর্মে মাটির ঘট ব্যবহারের একটা লোকাচার চালু আছে। এটি মাঙ্গল্য লক্ষণ। সংসারে সদ্যোজাত ভূমিষ্ঠ হবার সময় যেমন, তেমনি কেউ মৃত্যুপ্রাপ্ত হলেও তার ব্যবহার করা মাটির বাসনকোশন ভেঙে ফেলা হয়। বিয়ের সময় বর-কনে দু সংসারেই এই আচারটি নিষ্ঠার সংগে মানা হয়। বিয়ের পর বাপের পর হয়ে যায় মেয়ে। তখন শ্বশুরবাড়িই হয় নিজের ঘর। এক সংসারে বিসর্জন অন্য সংসারে আবাহন। মাঙ্গল্যঘট ব্যবহারের রীতি তাই দু সংসারেই। তাছাড়া হিন্দুদের সব ধর্মীয় উৎসবেই ঘট ভাঙার অনুষ্ঠান আছে। পুরাতনকে বিদায় এবং

নতুনকে স্বাগত জানানোর এক মাঙ্গলিক বিধি এটি। মোটকথা সমাজ জীবনে কুমোরের স্থানটি সুনির্দিষ্ট ছিল বলেই তার কর্মহীন হয়ে যাবার আশঙ্কা তখন ছিল না।

সূর্যর দু ছেলেও বাপের সঙ্গে কুমোরের কাজ করতো গ্রামে। ওরা ছাড়াও অন্য বৃত্তির আরও সাতঘর কারিগর গ্রামে বাস করতো। ছিল কামার, তাঁতি, ছুতোর, সেকরা ইত্যাদি। ওদের গ্রামের সেকরা একটা বিশেষ ধরনের গয়না তৈরি করতো। অনেক ভেবেচিন্তে সে তার নাম দিয়েছিল সঞ্চয় হার। সূর্যর বেশ মনে পড়ে সে সব কথা। যখনই কারো হাতে দুটো পয়সা আসতো সে তখন রুপোর আংটা জুড়ে দিত হারের সঙ্গে। একজন মুচি ছিল আর একজন নাপিত ছিল। তবে নরসুন্দরের জীবিকা যেমনই হ'ক, তার প্রধান পেশা ছিল ঘটকালি করা। ভাবী বর-কনের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়ে দিয়ে সে আনন্দ পেত। সূর্যর কুমোরশালার এক পাশে ছিল মুদিখানা, অন্যপাশে ময়রার দোকান। ময়রার তৈরি সন্দেশের স্বাদ এখনও লেগে আছে সূর্যর মুখে। বিয়ে, উপনয়ন, পুজোপার্বণ, কোথাও কোনো উৎসব হলেই ময়রার ডাক পড়তো। তার তৈরি করা সন্দেশ ছাড়া উৎসবের মাঙ্গল্য সূচিত হতো না।

সেবার বর্ষার পরেই গ্রামে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলো। অতি সাধারণ এবং তুচ্ছ ঘটনা। তাই অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেল তা। সূর্যর বড় ছেলে কলকাতায় কাজ করে। সে তার বউয়ের জন্যে প্লাস্টিক নামক হাল্কা এবং নমনীয় পদার্থের তৈরি টুকটুকে লাল রঙের একটা বালতি কিনে এনেছে। এমন চকচকে লোভনীয় দ্রব্য গ্রামের মানুষ আগে দেখেনি। সবাই এর রূপেগুণে মুগ্ধ। সকলের হাতে হাতে ঘুরছে সেটা। সবাই ঈর্ষাতুর। সবাই ভাবছিল এমন লোভনীয় দ্রব্যটি তার ঘরেও থাকুক। মুদিখানার মালিকই গ্রামের একমাত্র লোক যে এর উপকারিতা প্রথম বুঝতে পারলো। তার মনে হলো গ্রামে এই দ্রব্যটির ভাল বাজার হবে। তিন মাসও কাটলো না। গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখলো তাদের গ্রামেও এসে গেছে নানা রঙের প্লাস্টিকের বালতি, ঘটি, বাটি, গেলাস ইত্যাদি। মুদিখানাটি ভরে আছে প্লাস্টিকের তৈরি পণ্যে। গ্রামের অর্থনীতিতে প্লাস্টিক-পণ্য সমারোহ করে ঢুকে পড়লো এবং সুপ্রাচীন এক কারিগরি বৃত্তিকে সরিয়ে পাকাপাকি জায়গা করে নিল সেখানে।

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সূর্য দেখতো কেমন করে দিনে দিনে মাটির হাঁড়িকলসের চাহিদা কমছে। দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে পুরনো এই শিল্পের খদ্দের। এক বছরের মধ্যেই সংসারে নেমে এল দারুণ দারিদ্র্য। দুই ছেলে সংসার গুটিয়ে চললো কলকাতার দিকে। সূর্য তাদের আটকাতে পারলো না। এ গ্রামে সূর্যর কাজ নেই। কুমোরের চাকা ঘোরে না। কিন্তু সে গ্রামে না থাকলেও আরও ভেতরের গ্রামে তখনও মাটির হাঁড়িকলস তৈরি হতো। এমনি এক গ্রামে মাইল তিরিশ ভিতরে কুমোরের কাজ পেল সূর্য। প্লাস্টিকজ্বরের প্রকোপ সে গ্রাম পর্যন্ত তখনও পৌঁছয় নি। কিন্তু বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং অচিরেই এই বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লো কাছাকাছি গ্রামগুলিতে।

প্লাস্টিক পণ্যের তখন সরগরম বাজার। এখানে ওখানে কারখানা বসছে। সরকারী অর্থানুকূল্যে ওদের গ্রামেও এমনি এক কারখানা বসলো। এক বছরের মধ্যেই ওই অঞ্চলের প্রতিটি কুমোর কর্মহীন হয়ে পড়লো। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল একটা গ্রামীণ শিল্প। সূর্যর কাছে তখন কলকাতাই একমাত্র বাঁচার পথ।

সুতরাং ঘরণীর হাত ধরে সেও পা বাড়াল কলকাতার দিকে। কিন্তু বেশিদিন বাঁচতে হলো না সূর্যর ঘরণীকে। শ্বাসের কষ্ট আগেই ছিল। শহরের ধুলো ময়লাভরা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে সে কষ্ট বেড়ে গেল। মাস কয়েকের মধ্যেই সে মরে বাঁচলো। তার মৃতদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে হা হা করে উঠলো সূর্যর শূন্য বুকখানা।

সূর্য একা, নিঃসঙ্গ। শ্মশানকৃত্য শেষ হয়েছে। কিছুক্ষণ গঙ্গার ঘাটে পাগলের মতন ঘুরলো। কোথায় যাবে? কি করবে? নির্বান্ধব কলকাতা তার কাছে শত্রু-পুরীরও অধম। হঠাৎ সে দেখলো হাওড়া ব্রিজের ওপাশে ঘাটের ধারে বসে একজন গঙ্গামাটি তুলছে। সূর্য তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গেল। কথা বলে জানতে পারলো যে আনন্দ নগর বস্তির কাছে একটা কুমোরপাড়া আছে। লোকটা সেখানে কাজ করে আর মাটির ভাঁড় খুরি বানায়। চায়ের কাপ হিসেবে মাটির ভাঁড়ের খুব চল এখানে। আশপাশের অসংখ্য চা-দোকানের চাহিদা মেটায় এখানকার কুমোররা। সূর্যর সঙ্গে লোকটার দেখা হওয়াটা তার জীবনের এক অলৌকিক ঘটনা। পরের দিন থেকেই কুমোরপাড়ায় কাজ করতে শুরু করলো সূর্য।

ইদানীং সূর্যর বয়স হয়েছে। কুমোরের কাজে আর তেমন জোর পায় না। নিজামুদ্দিন লেনের একটা ঘটনা সূর্যর জীবনে এক নতুন পথের নির্দেশ দিল। সূর্য শুনলো চায়ের দোকানের মুসলমান কারিগর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। একদিন সূর্য গেল চায়ের দোকানের মালিকের কাছে। সেই থেকে সূর্য এই দোকান চালাচ্ছে। ভোরে উঠেই একদন্ত, লম্বোদর, গজাননের প্রণামমন্ত্র জপ করে সে দোকান খোলে, তারপর উনানে কেটলি বসিয়ে দুধ চা মিশিয়ে চা তৈরি শুরু করে। দিনের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমানে উনান জ্বলে। ধোঁয়ায় ভরে যায় নিজামুদ্দিন লেন। কিন্তু মানুষটা সজ্জন, তাই অন্য বাসিন্দারা মেনে নিয়েছে এই অসুবিধেটুকু।

নিজামুদ্দিন লেনে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই স্তেফান কোভালস্কীর ঘরে একদিন সূর্য এল। দুটি হাত জড়ো করে বুকের কাছে রাখা। দন্তহীন ফোকলা মুখখানা নির্মল হাসিতে ঝলমল করছে। কোভালস্কী তাকে বসতে বললো। তারপর দুজনেই চেয়ে রইলো দুজনের দিকে। নিস্পন্দ চোখে দুজনে দুজনকে দেখছে। চেয়ে থাকতে থাকতে কোভালস্কীর মনে হচ্ছিল তার নিজের দেশের মানুষের কথা। পাশ্চাত্যের মানুষ কদাচিৎ এমন পরিপূর্ণ চোখে তাকায়। তাই চোখে চোখে কথা হয় না। কোভালস্কী এমন পরিপূর্ণ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হলো এই প্রথম। মানুষটার চোখ দুটো যেন মনের সবটুকু মেলে ধরেছে তার কাছে। পাপড়ি খোলা একখানি পরিপূর্ণ নির্মল হৃদয় সে দেখলো সেদিন। মিনিট দশেক এমন ভাবে তাকিয়ে রইল সূর্য তারপর নিঃশব্দে চলে গেল। পরের দিনও একই ঘটনা ঘটলো। তৃতীয় দিনে কোভালস্কী তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না। কেন এই নীরবতা? নৈঃশব্দের কোমল মধুর রহস্যটি কেটে যাবে জেনেও সে জানতে চাইল এর কারণ। নির্মল হেসে সূর্য বললো, 'স্তেফানদাদা! আপনি এত বড় যে আপনাকে দেখে আমার কথা হারিয়ে যায়। আপনার সামনে এসে তাই কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।'

সেই থেকেই ওরা দুজনে বন্ধু হয়ে গেছে। আনন্দ নগরের মুসলমান পল্লীর মানুষের সঙ্গে পোলীশ কোভালস্কীর সংযোগ ঘটিয়েছে সূর্য। তাই যখনই সে স্খলিত হয়, সূর্যই হয় তার নিরাপদ অধ্যাত্ম আশ্রয়। কোভালস্কী জেনেছে যে

ধর্মভীরু হিন্দুদের সঙ্গে নিবিড় আত্মবন্ধনটি গড়ে তোলা অনেক সহজ। তাদের কাছে ভগবান সবেতেই আছেন। তিনিই সব হয়েছেন। তিনি প্রাণে আছেন, অপ্রাণে আছেন। তিনি আছেন লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণে। তিনি আছেন অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তিতে। হিন্দুর এই সর্বদেবতামণ্ডলীর উপলব্ধির মধ্যে যেমন বুদ্ধ, মহাবীর এবং মহম্মদ আছেন তেমনি আছেন যীশুও। সূর্যও তা বিশ্বাস করে। সে জানে যে এ'রা সবাই মানবাকারে ঈশ্বর। এ'রা অবতার এবং সেই সর্বত্রব্যাপী পরমব্রহ্মের অংশ। তাই হিন্দুর ঠাকুরঘরে যীশু। মহম্মদও ঠাঁই পেয়েছেন।

একচল্লিশ

কলকাতা থেকে মিয়ামি, ফ্লোরিডার দূরত্ব প্রায় আট হাজার মাইল। এটা ভৌগোলিক দূরত্ব। কিন্তু দুটি শহরের মানসিকতায় যে দুস্তর পার্থক্য তা বোধহয় আলোকবর্ষ দিয়েই মাপা চলে। কলকাতার মতন মিয়ামি শহরেও বস্তি আছে, ধাওড়া আছে। সেখানেও বস্তিতে গরিব মানুষ থাকে। মিয়ামির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কিউবা এবং হাইতি থেকে এসে পড়া উদ্বাস্তুদের কলোনি আছে। এদের চলতি নাম ব্ল্যাক ঘেটো। এইসব বস্তির অবস্থা রীতিমত মর্মান্তিক। সত্তরের দশকে এই বস্তি অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধগুলো ব্যাপকহারে এবং অনায়াসে ঘটতো। ভয়াবহ দারিদ্র্য, মাদকসেবনের অত্যধিক প্রবণতা, চরম হতাশা ইত্যাদি কারণের জন্যেই অপরাধগুলি ঘটতো। তবে এত বেশি মাত্রায় অপরাধ ঘটতো যে, উৎকট ভয়ঙ্কর কিছু না ঘটলে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে উঠতো না। অবশ্য খবরের কাগজে ছাপা না হলেও এর আতঙ্ক সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে অনেকেই অন্য পাড়ায় উঠে যায়। অনেকে আবার শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

কলকাতার বস্তিতেও দারিদ্র্য আছে, অপরাধ আছে। কিন্তু কলকাতার মানুষ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ঘর ছাড়া, দেশ ছাড়া হয়নি। নক্সাল হাঙ্গামার ক'টা মাস ছাড়া, জীবন বা সম্পত্তি নিয়ে তেমন ভয়ভীতিও কখনও তাদের হয়নি। কলকাতার মতন জনবহুল শহরের তুলনায় এখানকার অপরাধের সংখ্যা অনেক কম। বছরে এক-আধটা বীভৎস খুন বা ভয়াবহ অপরাধ যে হয় না তা নয়, তবে মিয়ামি শহরের ডাউনটাউন অঞ্চলে যত বীভৎস অপরাধ নিত্য ঘটছে, তাদের মাত্রা অনেক বেশি। কিন্তু মজার কথা, কলকাতার রাস্তাঘাট অনেক নিরাপদ। মাঝরাত্তিরেও কলকাতার যুবতী মেয়েরা নির্বিবাদে চৌরঙ্গী দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। বয়স্কা গিন্নীরা যে কোনো রাস্তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে থলে ভর্তি জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। কাউকে ভাগ দিতে হয় না।

তবে বস্তি নিয়ে ঘর করলেও মিয়ামি ধনী শহর। ধনগৌরবের সঙ্গে এর অন্য একটা লুকানো গর্ব আছে। আমেরিকার দক্ষিণ অংশে ঢোকবার সদর দরজা হলো মিয়ামি। কুবেরের শহর মিয়ামির বিপুল ধনসম্পদ, আরাম, বিলাস বা স্বাচ্ছন্দ্যের আঁচটুকুও কলকাতার বড়লোকবাবুরা বোধ করতে পারবে না। বস্তি নামক নোংরা পাড়ায় যাদের পায়ের ধুলো কখনও পড়েনি, কলকাতার সেই বড়লোকবাবুরাও তাদের উদ্দাম কল্পনা দিয়ে প্রাচুর্যের চেহারা মাপতে পারবে না। আরাম বিলাস-

তার স্বর্গ হলো মিয়ামির ধনীপাড়াগুলো। এমনি একটা পাড়ার নাম কিং এস্টেট। সমুদ্রের প্রায় বুক ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই মস্ত এস্টেট। পামতরুর ছায়ায় শোভিত হয়ে ঘুমোচ্ছে সরণিগুলি। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে সুগন্ধী গাছের ঝোপ। তাদেরই আড়ালে কোটিপতি ধনীদের বিলাসোপকরণে সজ্জিত জমকালো ভিলাগুলি জুড়োচ্ছে। বেশির ভাগ প্রাসাদভবনের মধ্যেই নিজস্ব সাঁতার কাটার পুকুর আছে। আছে নিজস্ব পোতাশ্রয়। পোতাশ্রয়ের কাছে নোঙর করা আছে ছোট ছোট কেবিন ক্রুজার এবং পালতোলা ইয়াট। ঝলমলে নীল সমুদ্রের বুকের ওপর কোটিপতিরা তাদের প্রমোদতরণী নিয়ে প্রমোদভ্রমণ বা অভিযানে বেরোয়। অনেক কোটিপতির নিজস্ব হেলিপোর্ট আছে। অনেকের আছে পোলো খেলার মাঠ এবং নিজস্ব আস্তাবল। কিং এস্টেট যেন এক ছোটখাট অঙ্গরাজ্য। উঁচু লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা এদের চৌকিব্যবস্থাও নিজস্ব। রাতদিন পাহারাদারেরা ভ্যান গাড়ি চড়ে চৌকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। চৌকি গাড়ির মধ্যে জোরালো সার্চলাইট এবং সাইরেন বাজানোর ব্যবস্থাদি আছে। প্রহরী বেষ্টিত এই অঙ্গরাজ্যে একজনও বাইরের লোক ঢুকতে পারে না। প্রবেশপত্রের সাঙ্কেতিক কোড সপ্তাহে সপ্তাহে বদল হয় এবং ব্যক্তিগত জেরার পর তারা প্রবেশানুমতি পায়।

ধনীদের এই জেলখানায় অন্যতম একজন ধনী হলো আর্থার লোয়েব। প্রচুর বিত্তের অধিকারী আর্থার লোয়েব জাতিতে একজন ইহুদি এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সার্জন। তার প্রাসাদভবনের আলোকোজ্জ্বল সাদা দেওয়াল, ভবন সংলগ্ন খোলা চত্বর, বাগানের কৃত্রিম ফোয়ারা এবং কেয়ারি করা গাছের সারি, কিং এস্টেটের এক দর্শনীয় বস্তু। বিশাল চেহারার লোয়েবের মাথার চুলগুলো পিঙ্গলবর্ণ। মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দু-একটি সাদা চুলের গুচ্ছ মিশে মাথাটি বর্ণশোভিত করেছে। লোয়েবের প্রিয়তম শখ চারটি : রহস্যোপন্যাস পড়া, গভীর সমুদ্রে মাছধরা, পক্ষিতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করা এবং একশ' চল্লিশ শয্যা বিশিষ্ট বিলাসবহুল বেল এয়ার ক্লিনিকটি পরিচালনা করা। হৃদরোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করে লোয়েব এই ক্লিনিকে হৃদরোগের চিকিৎসা করে।

লোয়েবের বিয়ে হয়েছে ঊনত্রিশ বছর। ওর স্ত্রীর নাম গ্লোরিয়া লাজার। সুশ্রী এবং শান্ত স্বভাবের মেয়ে গ্লোরিয়ার বাবা ছিলেন সবাক চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম পথিকৃৎ। লোয়েবের দুই ছেলেমেয়ে। মেয়ের নাম গ্যাবি। বিশ বছরের গ্যাবির গায়ের রঙ বাদামি। যৌবনবতী এই মেয়েটির চেহারা দারুণ আকর্ষণীয়। মিয়ামির ফাইন আর্ট কলেজে স্থাপত্যশিল্প নিয়ে সে পড়াশুনো করে। ছেলে ম্যাক্সের বয়স পঁচিশ। বাপের মতনই বিপুলকায় চেহারা ম্যাক্সের। মাথার চুলগুলোও বাপের চুলের মতন পিঙ্গল। ম্যাক্সের সারা মুখখানায় ফুটফুট ছুলির দাগ। নিউ অর্লিয়েন্সের মেডিক্যাল স্কুল থেকে এই বছরেই সে ডিপ্লোমা পাবে। তারপর দুবছর ইনটার্নশিপ করার পর তার ইচ্ছে হৃদসার্জারিতে বিশেষজ্ঞ হয়। বাপের কাছে ছেলের এই ইচ্ছেটার দাম অনেক। অনেক সুখ আর গর্ববোধ এনে দিয়েছে বাপের মনে। শুধু ডাক্তার হওয়া নয়, হৃদরোগের সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ হলে বেল এয়ার ক্লিনিকের দায়িত্বভার সে নিতে পারবে। আর্থার লোয়েব তাই পরম নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সেদিন বাপ ছেলের কথোপকথনে যেন অন্য সুর ধ্বনিত হলো। সব শুনে ম্যাক্স বললো, 'কিন্তু প্রফেসর! আমি যে কিছুদিনের জন্যে দেশের বাইরে যাচ্ছি!'

ইদানীং ছেলেমেয়েরা বাপকে প্রফেসর বলে। এটা মোটেই ব্যঙ্গাত্মক নয়। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন লোয়েবকে সাম্মানিক প্রফেসর অব মেডিসিন উপাধি দিয়েছে, সেদিন থেকেই ছেলেমেয়েরা বাপকে আদর করে প্রফেসর বলে।

লোয়েব ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাচ্ছিল। ছেলের কথায় ঘুরে তাকাল।

'দেশ ছেড়ে যাচ্ছ মানে?'

'আমি এক বছরের জন্যে ভারতে যাচ্ছি।'

'আর তোমার ইন্‌টার্নশিপ? সেটার কি হবে?'

'ওটা কিছুদিন আটকে রাখতে বলেছি।' বললো ম্যাক্স।

'আটকে রাখতে বলেছ?'

আর্থার লোয়েব রীতিমত অবাক। ম্যাক্সও যেন এত জেরা পছন্দ করছিল না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে। বললো, 'হুঁ!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আর্থার লোয়েব তখন লাগাম খুলে দিয়েছে। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল সে। ধীরে ধীরে ঘোড়াটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছেলের মুখের দিকে সরাসরি তাকাল লোয়েব। বললো, 'এমন কি ঘটলো যে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিলে?'

ম্যাক্স বুঝতে পারছিল যে, বাপের মনে উত্তেজনা হয়েছে। হয়ত বা চাপা রাগ। কিন্তু সেটা গায়ে মাখলো না ম্যাক্স। শান্ত ভাবে বললো, 'তেমন কিছু না কিছু-দিনের জন্যে পরিবেশ বদল...মানে আমি কারও উপকারে লাগতে চাই।'

'উপকারে লাগতে চাও, মানে?'

'ওই আর কি!' ম্যাক্স চুপ। বাপের মুখের দিকে চেয়েই সে বুঝতে পারছিল যে, এই উতোর চাপান বেশিক্ষণ টিকবে না। সুতরাং বলেই ফেললো কথাটা। 'একটা ছোট হাসপাতালে একজনের বদলে একটা কাজ পেয়েছি।'

'কোথায়? ভারত ত এতটুকুন দেশ নয়?'

'কলকাতায়।'

'কলকাতা?' আর্থার লোয়েব স্তম্ভিত। 'এত জায়গা থাকতে কলকাতা?'

মাথা নাড়তে নাড়তে বেশ কয়েকবার কথাটা বললো লোয়েব।

বেশিরভাগ আমেরিকানদের মতন আর্থার লোয়েব নিজেও ভারত নামক দেশটাকে খুব প্রীতির চোখে দেখে না। এই অপ্রীতির ব্যাপারটা আবার সরাসরি ঘেন্নায় পরিণত হয় যখন কলকাতার কথা ওঠে। লোয়েব জানে যে কলকাতা মানেই মূর্তিমান দারিদ্র্য। তার এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে অজস্র টিভি প্রোগ্রাম দেখে আর সচিত্র নিবন্ধ পড়ে। দুর্ভিক্ষ, জনস্ফীতি আর দারিদ্র্য—এই তিন নিয়ে কলকাতা। তাই পথে ঘাটে মরে পড়ে থাকা মানুষ নিয়ে সেখানে কারও মাথাব্যথা নেই। আশ্চর্য! এই ভিখিরী শহরটার হাতছানি পেল কি করে ম্যাক্স?

আর শুধু দারিদ্র বা বুভুক্ষাই নয়, পৃথিবীর এই বৃহৎ গণতন্ত্রী দেশটা সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণার আসল কারণ একজন দীর্ঘদেহী ভারতীয়। মনের মধ্যে এই মানুষটার হুবহু ছবি আজও স্পষ্ট হয়ে আছে। মানুষটার নাম কৃষ্ণ মেনন। ইউনাইটেড নেশনস্-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে লোকটা যখন বিকৃত মুখে ঘেন্নাবিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছিল তখনই যেন লোয়েবের মনে ভারতবিদ্বেষের জন্ম হয়। ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে কৃষ্ণ মেনন যেন ধর্মান্ধ পুরোহিতের মতন ঈর্ষাবিষে জরজর হয়ে পাশ্চাত্য দেশের মানুষদের নীতিজ্ঞান শেখাতে এসেছে, এমনি এক

দাম্ভিক ভাব। যেন সে বলতে চাইছিল যে তৃতীয় বিশ্বের মূল্যবোধগুলো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গলা টিপে মারছে সাদা চামড়ার মানুষরা। কাণ্ডজ্ঞানহীন সে কি রাগ তার!

ম্যাক্সের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বভাবতই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে গেল লোয়েবের। কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে লোয়েব বললো, 'তুমি কি মনে করো যে তোমার প্রতিভা বিকাশের পক্ষে কলকাতাই সবচেয়ে আদর্শ শহর?'

ম্যাক্স চুপ।

লোয়েব ফের বললো, 'আর একটা কথা। তোমার বন্ধুরা কি সত্যিই জায়গা রাখতে পারবে? একবছর বাদে তুমি যখন ফিরবে; তখন সবাই পাশ করে বেরিয়ে যাবে। নতুন গ্রুপের ছেলেরা কি তোমায় এতখানি অনুগ্রহ দেখাতে রাজী হবে? আমার ধারণা, তা হবে না।'

এবারও ম্যাক্স কোনো কথা বললো না। কি-ই বা বলবে সে?

'তোমার মা জানেন?'

'জানেন।'

'তিনি মত দিয়েছেন?'

'মত ঠিক দেননি। তবে আমার কথাটা উনি বুঝেছেন শেষ পর্যন্ত।'

'আর সিলভিয়া?'

সুন্দরী এবং যুবতী সিলভিয়া পেইন্ ম্যাক্সের অনুরাগিণী এবং বাগদত্তা প্রেমিকা। লম্বা, ফর্সা চেহারার তন্বী সিলভিয়াকে ভাল লাগে ম্যাক্সের। কিং এস্টেটে লোয়েবদের পাশেই পেইন্‌দের বিশাল ভূসম্পত্তি। সিলভিয়ার বাবা মিয়ামির ট্রিবিউন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। ছেলেবেলা থেকেই সিলভিয়া এবং ম্যাক্স পরস্পরকে চেনে। ওদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া আছে। সবাই জানে যে, জুন মাসে ম্যাক্সের পরীক্ষার পরেই ওদের বিয়ে হবে।

বাপের প্রশ্নের উত্তরে ম্যাক্স বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানে।'

'জানে? তা তোমার এই অদ্ভুত খেয়াল শুনে কিছু বলে নি সে?'

একটু ইতস্তত করলো ম্যাক্স। তারপর সরাসরি বাপের মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'ওর ইচ্ছে আমার সঙ্গে সেও ইন্ডিয়ায় যায়।'

পিতাপুত্রের উপরোক্ত কথোপকথনের ঠিক ছ'হপ্তা পরেই কলকাতার দিকে যাত্রা করলো ম্যাক্স লোয়েব। শেষপর্যন্ত লোয়েব পরিবার তাদের পারিবারিক বনেদি মেজাজটি বিসর্জন দিয়ে ঘটনাটা মেনে নিয়েছিল। ম্যাক্সের যাবার আগে একটা পার্টিরও আয়োজন করলো আর্থার লোয়েব। কিং এস্টেটের কোটিপতিরা সবাই এল সেই পার্টিতে। নেমন্তন্নের কার্ডে ছাপা হলো যে ম্যাক্স এশিয়ায় যাচ্ছে পড়াশুনো এবং গবেষণার জন্যে। এশিয়া বিশাল মহাদেশ এবং ম্যাক্স রাজী হলো যে আসল গন্তব্যস্থানটি কিং এস্টেটের ছোট সমাজের কাউকে জানানো হবে না। যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যেটা প্রেয়সীর সঙ্গে কাটালো ম্যাক্স। সব চাইতে শৌখীন ফরাসী রেস্তোরাঁ ভার্সাইতে নিয়ে গেল সিলভিয়াকে। সবচেয়ে শখের পানীয় এক বোতল বোলিঞ্জার শ্যাম্পেন কিনলো ম্যাক্স। সিলভিয়া কামনা করলো যেন ম্যাক্সের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং কাজ শেষ করে সে যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। আজ সিলভিয়াকে সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ে পরেছে গোলাপী রংয়ের বুকখোলা খাটো জামা। সুধাধবল

কণ্ঠদেশে শোভা পাচ্ছে সাধারণ মুক্তোর একছড়া হার। মেঘভারের মতন কবরীবন্ধ কেশদাম উঁচু করে বাঁধা। তাতে গ্রথিত হয়েছে সুন্দর একটা কঙ্কতিকা। সিলভিয়ার সুউন্নত গ্রীবাদেশের সঙ্গে তার মাথার গড়নটি বিস্ময়কর রকমের মনোহর ভঙ্গিমায় অবস্থান করছে। প্রিয়তমার এই মনোহারিণী রূপরাশি দুচোখ ভরে পান করলো ম্যাক্স। কিছুতেই যেন চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না।

সিলভিয়ার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ম্যাক্স বললো, 'তুমি কি দারুণ সুন্দর! তোমায় ছাড়া থাকবো কি করে?'

অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করে সিলভিয়া বললো, 'আক্ষেপ কেন? আমার মতন সুন্দরী ভারতে অনেক পাবে।' একটু থেমে ফের বললো, 'শুনেছি সারা দুনিয়ায় তাদের জোড়া নেই। তারা নাকি এমন পানীয় তৈরি করে দিতে পারে যা খেলে তাদের প্রেমে তুমি পাগল হয়ে যাবে।'

সিলভিয়ার কথাগুলো শুনতে শুনতে স্তেফান কোভালস্কীর লেখা চিঠির কথাগুলো মনে পড়ে গেল ম্যাক্সের। চিঠিতে বস্তির যে বর্ণনা আছে তা শুনলে, সুন্দরী সিলভিয়ার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাটুকু আর থাকবে না। তবুও মেয়েটাকে একটু ঈর্ষাকাতর করতে ভারি ইচ্ছে হলো ম্যাক্সের। অপাঙ্গে চেয়ে বললো, 'তাহলে ত তোমার মন পাবার জন্যে কায়দাটা আমায় শিখে আসতেই হয়।'

আসলে এটা ঠাট্টা। নিছকই পরিহাস। ম্যাক্স জানে রূপরম্যা সিলভিয়ার হৃদয়-ভরে আছে অন্য এক অনুরাগে। মমতায় সুরভিত এই অনুরাগই তার আসল প্রেম। সিলভিয়া কাব্যানুরাগী। কাব্যই তার প্রথম প্রেম। তার মনে গাঁথা হয়ে আছে হাজার হাজার কবিতাগুচ্ছ। লংফেলো, শেলী, কীট্‌স্‌, বায়রণ, বোদলেয়ার, গ্যেটে—সবাই যেন ভিড় করে আছে সুন্দরী সিলভিয়ার মনে। দীর্ঘ ছন্দোবন্ধ কবিতার মণিমুক্তো-গুলো যখন তখন উৎসারিত হয় তার মুখ থেকে। সে যখন আবৃত্তি করে তখন অভিভূত হয়ে যায় ম্যাক্স। প্রেমের প্রথম কদমফুলটি সেই কৈশোরেই ফুটেছিল। যেদিন আর্থার লোয়েবের কেবিন ক্রুজারটি নিয়ে তারা সোর্ড ফিস্‌ ধরতে অভিযানে বেরোয় সেদিনই ওদের প্রথম মন জানাজানি। কৈশোরের সেই প্রেম ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়েছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ওদের এই প্রেমের সবটাই যেন বুদ্ধিপীড়িত, অনুরাগ উদ্দীপ্ত প্রেম নয়। পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে ছোটা বা টেনিস খেলা ছাড়া অন্য রকম যৌবনোচিত উদ্দাম ক্রীড়াকৌতুকে ওদের মন নিবিষ্ট হয়নি। পার্টিতে গিয়ে ওরা নাচে না বা উদ্দাম জীবনযাপন করে না। বরং সমুদ্রবেলায় পাশা-পাশি শুয়ে ওরা কাব্যচর্চা করে, জীবন মৃত্যুর রহস্য নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করে। কিংবা আধুনিকতম কবির কাব্যস্তবক থেকে আবৃত্তি করে সিলভিয়া এবং ম্যাক্স মুগ্ধ হয়ে শোনে।

ম্যাক্স যখন নিউ অরলিনসের মেডিক্যাল স্কুলে পড়তো, তখন প্রায়ই সিলভিয়া আসতো। দুজনে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে তখন। একবার ওরা লুসিয়ানার ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ দেখতে গিয়েছিল। ঘুরে ঘুরে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল ওরা। একবার মিসিসিপি নদীর তীরে একটা বড় খামার দেখতে গিয়ে-ছিল দুজনে। রাত্রে দারুণ ঝড় উঠলো, সঙ্গে বৃষ্টি। ওরা আশ্রয় নিল একটা ছোট্ট খামারবাড়িতে। সে রাতটা ওখানেই কাটায় তারা। এক বিছানায় সিলভিয়াকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে পেয়ে ম্যাক্সের মন যেন ভরে উঠেছিল। ওর মনে হয়েছিল আকাশের তারা সাক্ষী রেখে ওরা যেন পরস্পরের কাছে বাগদত্ত হলো। ওদের

বিয়ের পথে আর কোনো বাধা থাকলো না। ধর্মে গোঁড়া হলেও সিলভিয়ার খ্রীস্টান বাবা মা ইহুদিসন্তান ম্যাক্সকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে না।

বস্তুত তাই-ই হলো। বিয়ের সব ঠিকঠাক। হঠাৎ, বিয়ের ঠিক সাতমাস আগেই অঘটনটি ঘটে গেল। ম্যাক্সের মনোজগতে একটা দারুণ বদল এনে দিল একটা ঘটনা। ম্যাক্স যেন হঠাৎই স্থির করে বসলো এক বছরের জন্যে সে দেশের বাইরে যাবে। কিন্তু কেন এমন মত পরিবর্তন হলো তার? গভীর গোপন কারণটি সিলভিয়াকে আগে জানায় নি ম্যাক্স। তার মনে হয়েছিল সব মানুষের জীবনেই এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ঘটা করে অন্যকে বোঝানো যায় না। এটাও ঠিক তেমনি গভীর কোনো কারণ। কিন্তু সেদিন রেস্তোরাঁর স্তিমিত আলো এবং দামী শ্যাম্পেনের মদির পরিবেশের প্রভাবে ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির মুহূর্তে ম্যাক্সের সব সিদ্ধান্ত কেমন যেন বিপরীত হয়ে গেল। সে স্থির করলো, সিলভিয়াকে সে সব বলবে। চোরা পথে চালান হয়ে আসা হাভানা মন্টিক্রিস্টো চুরুটের মৃদু সুবাস ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বোলিঞ্জার শ্যাম্পেনের উচ্ছল ক্রিয়ার আচ্ছন্ন ম্যাক্স আর একটু ঘন হয়ে বসলো সিলভিয়ার। তারপর সরাসরি তার মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'হঠাৎ আমার কিছু হয়ে গেলে ভেব না যে স্রেফ খেয়ালের বশে ইণ্ডিয়ায় গিয়ে এটা হলো। আমি চাই, তোমরা সবাই সত্যি কথাটা জানো।'

সিলভিয়া একদৃষ্টে চেয়ে আছে ম্যাক্সের মুখের দিকে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি কথা?'

একটুও ইতস্তত না করে ম্যাক্স শুরু করলো তার লম্বা কাহিনীঃ

'একদিন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কানাডা থেকে ছাপা একটা সচিত্র সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা ছবি নজরে পড়লো আমার। একটা বাচ্চা ছেলের ছবি। একটি ভারতীয় বাচ্চা। বছর পাঁচ কি ছয় তার বয়স। কলকাতার একটা ধসে পড়া বাড়ির দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক মাথা কালো চুলে কপালের অনেকটা ঢাকা। কিন্তু চুলের গুছির আড়ালে ঝকঝকে দুটি চোখে যেন রাজ্যের বিস্ময়। ছবিটা দেখেই আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। বাচ্চার ছবি আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এমন অবাক হইনি আগে কখনও। বাচ্চাটার মুখে ঝলমল করছে একমুখ নির্মল উজ্জ্বল হাসি। দুধের চারটি কাঁচ সাদা দাঁত চিকচিক করছিল হাসির আড়াল থেকে। ছেলেটা সম্পূর্ণ ন্যাংটো। তাতেই মনে হয় ওরা খুব গরিব। কিন্তু মুখে এতটুকু দৈন্যভাব নেই। ওর কোলের মধ্যে দু-তিনদিন বয়সের একটা শিশু। কোলের হাড়জিরজিরে বাচ্চাটার গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ছেলেটার সে কি গর্ব! যেন সবাইকে বলতে চাইছে সেও দায়িত্ব নিতে পারে। ছবিটার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যা সেটি হলো ছেলেটার হাসি হাসি মুখের এই পরম বিজ্ঞ ভাবটা।'

ম্যাক্স চুপ করলো। একবার সিলভিয়াকে দেখলো তারপর ফের শুরু করলো তার কাহিনী।

'কলকাতায় আনন্দ নগর নামে একটা বস্তি আছে। ছেলেটা সেই বস্তিতে থাকে। কোলের বাচ্চাটা তার ভাই। যে জার্নালিস্ট স্টোরিটা লিখেছেন তিনি আনন্দ নগর বস্তি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন একজন বিদেশী ফাদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।'

'বিদেশী ফাদার?'

সিলভিয়ার প্রশ্নের উত্তরে ম্যাক্স বললো, 'হ্যাঁ। তিনি ইওরোপের মানুষ। পোল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছেন বঞ্চিত মানুষদের সেবা করবার জন্য। ওঁর নাম স্তেফান কোভালস্কী। সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপের সময় কোভালস্কী একজন আধুনিক মনের যুবক ডাক্তারের কথা বলেন। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করা একজন যুবক ডাক্তারের সাহায্য পেলে তিনি আনন্দ নগর বস্তির মধ্যে একটা মেডিক্যাল ইউনিট খুলতে পারেন।'

ম্যাক্স চুপ করলো।

সিলভিয়া বললো, 'তুমি তাই আনন্দ নগরে চিঠি লিখেছিলে।'

'হ্যাঁ। পরের ডাকেই কোভালস্কীর উত্তর পেলাম। উনি লিখেছেন যত তাড়াতাড়ি পারি যেন চলে আসি। ওখানে এখন শীত শেষ হচ্ছে। এরপরেই শুরু হবে আগুনঝরা গরম। তারপর বর্ষা নামবে ঝমঝম শব্দে। সুতরাং মার্চে বলে যেন বেরিয়ে পড়ি।'

কিন্তু বর্ষার নাম শুনেই সিলভিয়ার চোখ দুটিতে আবেশ ঘনিয়ে উঠেছে তখন। গ্রীষ্মকালীন দেশের বর্ষা। আহা! মরি মরি! কুঞ্চিত কেশদামের মতন মেঘে ছাওয়া আকাশ আর কান্নার ফোঁটার মতন নিঃশব্দে ঝরে পড়া বৃষ্টি, এই হলো বর্ষার রূপ। মার্কিন সুন্দরী সিলভিয়ার মনটিও গুমরে উঠলো অব্যক্ত কান্নায়। বর্ষার মতন আর কোনো ঋতু তাকে কাঁদায় না। পল ভার্লেনের সেই লাইন দুটি চকিতে মনে পড়ে গেল সিলভিয়ার। প্রিয় লাইন দুটি যখনই মনে পড়ে তখনই তাকে কাঁদায়। ম্যাক্সের হাতখানা ধরে আদর করতে করতে ফরাসীতেই সে আবৃত্তি করলো লাইন দুটি,

'আমার বুকের এই কাঁদন
যেন শহরের বুকে ঝরে পড়া ঝরঝর বৃষ্টি
কিন্তু কি সেই ব্যথা যা আমায় এমন কাঁদায়?
(দেয়ার ইজ উইপিং ইন মাই হার্ট
লাইক দ্য রেন্ ফলিং অন দ্য সিটি
হোয়াট ইজ দিস্ ল্যাংগর, দ্যাট পিয়ার্সেস মাই হার্ট?)

বিয়াল্লিশ

সোনারবরণ ফ্রেমের মধ্যে মাল্যভূষিত ওই যে দেবমূর্তি দেখা যায়, উনি হলেন শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। বহুমূল্য বসনভূষণ ও অলংকারাদি দ্বারা ভূষিত হয়ে ইনি যুদ্ধবিজয়ী রাজাধিরাজের মতন হস্তীপৃষ্ঠে বিরাজ করছেন। এঁর অঙ্গভূষণাদি মণিমুক্তা খচিত। মনুষ্যরূপী এই দেবতার দুটি পক্ষ এবং ইনি চতুর্ভুজ। ইনি চার হস্তে চারটি আয়ুধ ধারণ করেছেন। কুঠার, মুদ্গর, ধনুক এবং তুলাযন্ত্র। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মনুষ্যদেহী এই দেবতার এইটুকুই তফাত।

ইনি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এবং দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সর্বাধিক প্রতাপশালী। বিশ্বকর্মা হলেন সৃষ্টিশক্তির রূপক নাম। বেদে বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। ইনি সর্বদর্শী ভগবান এবং স্বর্গ ও মর্ত্য নির্মাণ করেছেন। ইনি পিতা, সর্বজ্ঞ, দেবতাকুলের নামদাতা এবং মর্ত্যলোকবাসীর বোধবুদ্ধির অগম্য। মহাভারতে

আছে যে, কেবল দেবশিল্পীই নন, ইনি তাঁদের অস্ত্রাদিও নির্মাণ করেন। ইনি শিল্পের শ্রেষ্ঠ কর্তা ; ইনি দেবতাদের বিমান-নির্মাতা এবং অলংকারাদির শিল্পী। ইনি সর্বপ্রকার কারুকার্য নির্মাতা এবং কারিগর-শিল্পীদের রক্ষক। তাই যারা শ্রমজীবী এবং বৃত্তিজীবী তাদেরই দেবতা ইনি।

খ্রীশ্চানরাও এমনি ভাবে বিশ্বপিতার ভজনা করে কারণ তিনি শ্রমজীবী মানুষের হাতে রুটির টুকরো তুলে দেন। প্রতি বছর ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন হাজার হাজার কলকারখানায় খুব ধুমধামের সংগে বিশ্বকর্মা পুজো করে শ্রমিক-মজুররা। জমজমাট দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায় বোঝা যায় না। শ্রমিক-মালিকে ভেদ থাকে না। দিন দুটো আনন্দে উচ্ছল হয়ে ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সবাইকে মাতিয়ে রাখে।

সব বস্তির মতন আনন্দ নগর বস্তিতেও রীতিমত ঘটা করেই বিশ্বকর্মার পুজো হয়। এই দেবতার বিশেষ মর্যাদা, কারণ গরিব বস্তির মানুষদের তিনিই অন্ন যোগান। বস্তির মধ্যে জড়াজড়ি করে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট কারখানা। অপরিসর এবং নোংরা পরিবেশের মধ্যে গাদাগাদি করে পড়ে আছে যন্ত্রপাতি। সব ঘরেই মেশিনের ঠুকঠাক। নানা মাপের নানা আকারের মেশিন: কোভালস্কীর তাই মনে হয় এটা বুঝি একটা কারখানানগরী। রোজই একটা করে ছোট কারখানা গজিয়ে উঠছে। এই সব কর্মশালায় অর্ধ-উলঙ্গ শিশু শ্রমিকরা কত রকম আয়াসসাধ্য কাজ করছে দিনের পর দিন। এদের মধ্যে নাসীরের মতন মা মরা হতভাগা ছেলের সংখ্যাই বেশি। কেউ টিন কাটছে, কেউ বা বিস্ফোরক নানা রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে অসংকোচে নাড়াচাড়া করছে এবং ঘ্রাণ নিচ্ছে বিষাক্ত, রাসায়নিক ধোঁয়ার।

কোভালস্কীর কুঁড়ের ঠিক সামনেই একটা ছোট্ট ঝালাই কারখানা আছে। কারখানার অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে বড় বড় কড়াইতে তেল পুড়ছে, লোহা গলছে। কালো কালো মানুষগুলো সেই তপ্ত, জ্বলন্ত পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিব্যি ঝালাইয়ের কাজ করছে। কামারশালার পাশেই একটা বিড়ি তৈরির কারখানা। গবাক্ষহীন ছোট্ট চারচৌকো ঘরখানার মধ্যে প্রায় ডজনখানেক মানুষ একমনে বিড়ির পাতার মধ্যে মসলা পুরে চলেছে। এককালে এদের অনেকেই রিক্সাওলা বা কারখানার মজুর ছিল। কিন্তু ক্ষয়রোগের শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত এই জীবিকাই বেছে নিয়েছে এরা। একটানা কাজ করলে সারা দিনে মোট তেরোশ' বিড়ি পাকানো যায়। প্রতি হাজার বিড়ির মজুরী মোট এগারো টাকা হিসাবে এরা দাম পায়। আরও কিছুটা এগোলেই আর একটা কারখানা। বস্তিঘরের অপ্রশস্ত পরিসরের মধ্যে একটা বড় সড় জাহাজের প্রপেলর হাপরের পাশে পড়ে আছ। কোভালস্কী অবাক। এ ছোটখাট যন্ত্রদানবটিকে সরু দরজা দিয়ে বার করতে গলদঘর্ম হচ্ছিল লোকগুলো। ছেনি হাতুড়ি দিয়ে ঘরের দোর কেটে শেষ পর্যন্ত বার করা হলো সেটিকে। তারপর লোকজন দিয়ে বাইরে দাঁড় করানো ঠেলাগাড়ির উপর চাপানো হলো তাকে। মালিক নামক লোকটি করুণার অবতার যেন। জনা তিন কুলি নিযুক্ত করে ঠেলাগাড়ি চালাবার নির্দেশ দিল। কিন্তু নির্দেশ দিলেই কাজ হয় না। চাকা এক ইঞ্চিও নড়লো না। কুলিদের পায়ের শিরা ফুলে উঠলো। মুখের চেহারা রক্তবর্ণ হলো। শেষ পর্যন্ত চাকা নড়লো। মালিকও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। অন্তত একজন কুলির মজুরীর পয়সা সে বাঁচাতে পেরেছে। চতুর্থজনকে নিযুক্ত করার দরকার

হলো না। কিন্তু কোভালস্কীর দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। হাওড়া ব্রিজের তলা থেকে মোট তিনজন মানুষ কি করে টেনে তুলবে গাড়িটাকে?

এমনভাবে জীবনপাত করে কত হাজার হাজার শ্রমিক শিশু তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে কে জানে? কোভালস্কীর প্রায়ই জানতে ইচ্ছে হয় এ তত্ত্ব। তার মনে হয় এ জানা এক মস্ত আবিষ্কার। বড় মানুষদের সঙ্গে শিশু শ্রমিকরাও কেমন নিপুণভাবে কত কি সারাচ্ছে বা নতুন করে বানাচ্ছে। অথচ এইসব যন্ত্রপাতির কাজকর্ম সম্বন্ধে এদের প্রত্যক্ষ কোনো জ্ঞান নেই। যেমন দেখছে তেমনিটি নকল করছে। নানারকম স্প্রিং, বল্টু, তাঁতের মাকু, উড়ো বিমানের ট্যাঙ্ক, লরির যন্ত্রাংশ, এমনকি টারবাইনের গায়ে তার জড়ানোর কাজটিও কত নিপুণভাবে পালন করছে এরা। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ধুলোময়লার মধ্যে বস্তির মানুষগুলো তাদের ঘামেভেজা শরীর দিয়ে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করছে। একটা ছোট লোহার টুকরো বা তামার পাত থেকে দরকারী অংশটুকু তৈরি করে নিচ্ছে। কোনটাই অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দিচ্ছে না। কোভালস্কী যেন নতুন পুরনো তত্ত্বটাই আবার শিখলো। তার মনে হচ্ছিল, 'জগতে কোনোকিছুরই বিনাশ হয় না, নতুন আকারে তারা আবার ফিরে আসে।' আনন্দ নগরের এই শ্রমজীবী মানুষরাই ঈশ্বরের গর্বের ধন। তাই যিনি অন্নদা তিনি মানুষকে অন্ন দেন এই মানুষগুলোর কায়িক শ্রমের বদলে। কিন্তু হায়! মানুষ মাঝে মাঝে তাঁকে দারুণ মর্মপীড়াও দেয়।

ভারতীয় সংবিধানের ২৪ ধারায় নির্দিষ্ট আছে, 'কোনো শিশুকেই কারখানা বা খনিতে কিংবা কোনো বিপজ্জনক জীবিকার মধ্যে কর্মযুক্ত করা যাবে না।' কিন্তু সংবিধানের এই নিষেধবাণী ভারতবর্ষের কোথাও মানা হয় না। অধিক লাভ বা বশ্যতা, আনুগত্যের জন্যে শ্রমজীবী কর্মীর এক বৃহৎ অংশই শিশু বা কিশোর শ্রমিক। তাদের নরম হাতের ছোট ছোট আঙুলগুলি যতখানি দক্ষ এবং নিপুণ, তেমন দক্ষতা বয়স্ক শ্রমিকের শক্ত আঙুলে নেই। তাছাড়া মজুরীর বদলে যৎসামান্য খয়রাতি সাহায্য দিয়েই শিশু শ্রমিককে খুশী করা যায়। তবুও উদয়াস্ত গায়ে-গতরে খেটেও নামমাত্র এই পারিশ্রমিকটুকু দিয়ে সংসারের অভাব আর দারিদ্র্যের চিরন্তন হাঁ মুখটি এরা পুরোপুরি ভরাট করতে পারে না।

বস্তির শিশু শ্রমিকরাই সবচেয়ে নিরাশ্রয়। তাদের না আছে সামাজিক নিরাপত্তা না চাকুরিগত। দিনে বারো-চোদ্দ ঘণ্টা একটানা খেটেও তারা মালিকের মন পায় না। যে নির্লজ্জ পরিবেশে একটানা বারো-চোদ্দ ঘণ্টা তাদের খাটানো হয়, তেমন পরিবেশে চিড়িয়াখানার জন্তুরাও বাস করে না। অনেকেরই ঘরবাড়ি নেই। যেখানে-সেখানে শুয়ে রাত কাটায়। আলোবাতাসহীন বন্ধঘরেই দিনের চব্বিশঘণ্টা কেটে যায়। যা পায় খায়। ছুটিছাটার ব্যবস্থা নেই। তাদের কোনো দাবি নেই অথবা থাকলেও দাবি আদায়ের অধিকার নেই। একদিনের কামাই কিংবা একঘণ্টা দেরিতে হাজিরা হলে, ক্ষতিপূরণ ছাড়াই তাদেব ছাঁটাই করা হয়। ব্যতিক্রম শুধু তারাই যারা কোনো বৃত্তিগত পেশায় কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

আনন্দ নগর বস্তিতেই এমন শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পনেরো-বিশ হাজারের মতন। অর্থাৎ কলকাতা তথা সারা ভারতে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ লক্ষাধিক শিশু শ্রমিক বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমজীবীর কাজ করে। কোভালস্কীর অবাক লাগে যখন মনে হয় এত অধিক সংখ্যক শিশুশ্রমিক একজোট হতে পারে না কেন? প্রশ্নটা প্রায়ই তাকে পীড়ন করতো। কিন্তু সদুত্তর খুঁজে পায়নি সে। হয়ত গ্রামের

পরিবেশে থাকার দরুন বুদ্ধবন্ধ হবার নাগরিক শিক্ষা এরা অর্জন করতে পারেনি। কিংবা হয়ত নির্মম দারিদ্র্যই এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মোটকথা অভাব এবং দারিদ্র্য যেখানে নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য, সেখানে এক দানা ভাতের জন্যে যে কোনো কাজই ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ। কর্মহীন বেকারের সংখ্যা যেখানে অধিক, সেখানে প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করার অর্থ হলো এক মুষ্টি চাল থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। যে সংসারে রোজগেরে বাপ মরে যায় বা রুগ্ন হয়ে পড়ে, সেখানে সংসারের দরকারেই শিশুদের যে কোনো কাজে ব্রত হতে হয়। মানুষের ন্যায়নীতিবোধ যে কথাই বলুক, যে দেশে ক্ষুধাই একমাত্র আবেগ, প্রজ্বলিত জঠরাগ্নি নিবারণই যেখানে অন্যতম আচরিত ধর্ম, সেখানে ন্যায়নীতির পরাকাষ্ঠা দেখানো নিদারুণ অধর্মাচরণ।

কিন্তু ইউনিয়নগুলি এদের আশ্রয় দেয় না কেন? তাদের দায়িত্ববোধ কি এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি? ভারতে তিনটি ইউনিয়ন সংস্থার শাখাপ্রশাখার সংগে যুক্ত হয়ে আছে কয়েক লক্ষাধিক শ্রমিক কারিগর। এ ছাড়াও আছে প্রায় ষোলো হাজার পৃথক ইউনিয়ন। শুধু পশ্চিমবংগেই ইউনিয়নের সংখ্যা সাত হাজার চারশ' পঞ্চাশ। ইউনিয়নের নির্দেশে পালিত ধর্মঘটে কর্মহীন দিনের সংখ্যা বছরে এক কোটি। কিন্তু আনন্দ নগরের মতন বস্তিতে একটি দিনও কর্মহীন দিবস হিসাবে পালিত হতে পারে না। সে স্পর্ধা কারও নেই কারণ শূন্যস্থান পূরণ হতে দেরি হয় না এখানে।

তাই বিশ্বকর্মার পায়ে গড় করেও বলা যায় যে আনন্দ নগর বস্তির এই হত-ভাগ্য শিশুশ্রমিকরাই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম শ্রমজীবী। ক্ষুধার তাড়নাই এদের ক্রীতদাস করে দিয়েছে। তবুও অচলা ভক্তিবিশ্বাসে গদগদ হয়ে এরা প্রতিবছর বিশ্বকর্মার পুজো করে। যেমন নিজেরা করুণা পেতে চায় তেমনি কর্মযন্ত্রগুলির জন্যেই কৃপাকণা প্রার্থনা করে, কারণ এই যন্ত্রগুলির সংগেই জড়িয়ে আছে এই হতভাগ্য মানুষগুলোর ভাগ্য।

পুজোর আগের দিন বিকেল থেকেই সব কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক কারিগরেরা তাদের নিজের যন্ত্রপাতিগুলো ঝাড়াপোঁছা করে। তাদের গায়ে ফুলের মালা পরায়। কারখানার দোরগোড়ায় ঘটের মধ্যে নবপত্রিকা রাখা হয়। মালিকরা পটুয়া পাড়ায় গিয়ে পছন্দমত মূর্তি কিনে আনে। যাদের ব্যবসার ঘটা বেশি তাদের ঠাকুরও তত বড়। জাঁকজমক এবং জেল্লা দেখবার মতন। যথেষ্ট দাম দিয়েই তারা প্রতিমা কেনে।

এক রাতের মধ্যেই কষ্টের এইসব জেলখানাগুলো হয়ে ওঠে মুক্তির মন্দির। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। ফুলের মালা আর ধুপের ধোঁয়ায় ভরে ওঠে বস্তির অলিগলি। পরদিন ভোর থেকেই সারা বস্তি মেতে ওঠে উৎসবের খুশীতে।

আগের দিনেও মানুষগুলো যেন গোলাম ছিল। আজ ওরা সবাই রঙিন পোশাক পরেছে। সারা বছর ধরে বাক্সর মধ্যে রাখা শাড়িজামা বার করে মেয়েরা পরেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গায়ে ঝলমল করছে নতুন নতুন জামা। আজ আর মেশিনের শব্দ নেই। ঢাকের বাদ্যি শোনা যাচ্ছে সব বস্তিঘর থেকে। পুরোহিত মশাই প্রতিটি যন্ত্র ঘুরে ঘুরে পুজো করছেন। তাঁর এক হাতে ধুনচি, অন্য হাতে ঘণ্টা। শ্রমিকের হাতের সব কটি যন্ত্রই দেবতার আশীর্বাদ পেয়ে পবিত্র হচ্ছে।

একসময় ওরা সবাই এসে হাজির হলো কোভালস্কীর ঘরে। ওরা চাইছে যীশুও যেন ওদের হাতের কর্মযন্ত্রগুলো আশীর্বাদ করেন। কোভালস্কী তখন বস্তির সব কারখানা ঘরে গিয়ে ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা করলো, 'হে বিশ্বপিতা, তুমি যাদের ক্ষুধার অন্ন দাও, আনন্দ নগরের তোমার সেই সন্তানগণ তোমায় ভালবাসে, বিশ্বাস করে। ওরা চায় ওদের দুঃখময় জীবনের এই আলোকিত দিনটিতে তুমিও ওদের আনন্দের ভাগ নাও।'

পুজো-পার্বণ এবং আশীর্বাদের পালা শেষ হলো। এবার শুরু হবে পংক্তিভোজ। পংক্তিভোজে সবাই নিমন্ত্রিত। মালিক শ্রমিক পাশাপাশি পাত পেতে বসেছে। পুরী লাড্ডুর সঙ্গে পঞ্চ ব্যঞ্জনের আয়োজন হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে 'বাঙ্লা পানীয়ের। সবাই হাসছে, নাচছে, গাইছে। অন্তত এই দিনটিতে শ্রমিকরা তাদের বেদনাময় দিনগুলো যেন ভুলেছে। ওদের সঙ্গে ফুলের আসনে বসে বিশ্বকর্মাও হাসছেন। সব শ্রমজীবী মানুষকে তিনি এক করে দিয়েছেন আজ।

পানভোজন চললো প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত। বস্তির অলিগলি ঝলমল করছে সার্চলাইটের আলোয়। ছেলেমেয়েরা নির্ভয় আশ্বাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে বস্তির মধ্যে। যাদের জীবনে আর কোনো প্রমোদোপকরণ নেই, তাদের সব আমোদ-প্রমোদ যেন পুজোর আনন্দ উৎসবের মধ্যেই নিবেদিত হয়। তাই সারা রাত ধরেই লাউড্স্পিকার থেকে হিন্দি গান বাজলো। সারা রাত ধরেই লোকজন ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখলো। যে প্রতিমা ভাল লাগলো তার প্রশংসা করলো। বস্তির জীবন ঝলমল করে উঠলো আতসবাজির রোশনাইতে।

পরদিন ঠেলাগাড়ি এবং রিক্সার ওপর আসীন হলেন বিশ্বকর্মা। আনন্দ নগর বস্তির ঘরগুলো থেকে একটার পর একটা মাটির ঠাকুর বেরোচ্ছে এবং রিক্সা বা ঠেলাগাড়িতে উঠছে। মিছিল করে প্রতিমাগুলো নিয়ে যাওয়া হলো বাঁধাঘাটে। তারপর ছোট ছোট নৌকার উপর তুলে মাঝ গঙ্গায় সেগুলি বিসর্জন দেওয়া হলো। বিসর্জনের সময় সবাই চীৎকার করে জয়ধ্বনি দিল 'বিশ্বকর্মাজী কি জয়!' শেষ হলো পুজো উৎসব সেই বছরের মতন। এক বছর পরে আবার পর্দা উঠবে। আবার বিশ্বকর্মা আসবেন এবং নতুন উৎসাহে শুরু হবে পুজোৎসব।

তেতাল্লিশ

'বিশ্বকর্মা পুজোকে আমরা বলি রিক্সাপুজো।'

হাসারির কথা শুনে সবাই হাঁ। তখন বুঝিয়ে বললো হাসারি, 'কেন বলি জানো? আমাদের কলকারখানা বলতে যা কিছু সব অই রিক্সাটি লয়্যে। তার দুটি চাকা, গাড়িখানা আর ডাণ্ডা দুটিই আমাদের সব। চাকাটি ভাঙলে কিংবা বাসগাড়ির সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে গেল তোমার। ত্যাখন মালিক এসে তুমায় রক্ষা করবেন না। ত্যাখন কেঁদেও কূল পাবে না। মালিক তোমায় বাঁচাবেন না। তুমার রক্ষাকর্তা ভগবান। তিনিই তোমায় দিশা দেবেন। গাড়িখানা যেমন রক্ষা করবেন, তেমনি তুমাকেও বাঁচাবেন।'

হাসারির কথাটা মিথ্যে নয়। তবে শুধু রিক্সাওলা নয়, রিক্সার মালিকরাও বিশ্বকর্মার গোঁড়া ভক্ত। ওদেরও আশ্রয় হলেন বিশ্বকর্মা ঠাকুর। তাই সংসারে আর

কিছুর জন্যে না হলেও, অন্তত এই দেবতার পুজোর বেলার মালিক এবং শ্রমিক মিলে মিশেই এই কাজটি করে। কলকাতার অন্য কলকারখানায় যেমন সমারোহ করে পুজো-উৎসব হয়, রিক্সামালিক এবং চালকদের পুজোতেও তেমনি ধুমধাম আর আড়ম্বর হয়।

সাধারণত মালিকের নিজের বাড়িতেই এই দেবতার পুজো হয়ে থাকে। তবে বুড়ো বিপিনের বেলায় নিয়মটা একটু আলাদা. কারণ নিজের ঠিকানা সে গোপন রেখেছে। রিক্সাওলারা সবাই সে কথা জানে। তাই সুযোগ পেলেই ঠাট্টা পরিহাস করে। হাসারিও বলে সে কথা। 'উয়ার ভয় পাছে সমবেত হয়্যে আমরা উয়ার ঘর চড়াও হই।' তা আশঙ্কাটা নেহাত অমূলক নয়। তাই বুড়ো বিপিনের বড় ছেলে পার্কসার্কাস অঞ্চলে একটা বড়সড় বাগানবাড়ি ভাড়া করেছে। পুজো এবং উৎসব দুটিই সেখানে হবে। জমকাল একটা প্যাণ্ডেল তৈরি হয়েছে বাগানের মধ্যে। ফুল, মালা আর আলো দিয়ে সাজানো এই বাগানবাড়িতেই পুজো এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

পুজোর আগের দিন সব রিক্সাওলারাই যত্ন করে গাড়ি ঝাড়াপোঁছা করে। হাসারিও করে। এবার সে খানিকটা কালো রঙ কিনে এনেছে। গাড়ির গায়ে আঁচড়ের দাগগুলো রঙ দিয়ে ঢেকে দিল সে। চাকার গর্তে খানিকটা সরষের তেলের ফোঁটা ফেললো, যাতে অবাঞ্ছিত ঘড়ঘড় শব্দে দেবতা বিরক্ত না হন। এসব কাজ সমাধা করে রিক্সা নিয়ে সে বউ ছেলেমেয়ে আনতে গেল।

হাসারির জামাকাপড় আগেই গুছিয়ে রেখেছে ওর বউ অলকা। হাসারি আসতেই সেগুলো বার করে দিল সে। নীল-সাদা ডোরাকাটা একটা নতুন সার্ট আর লাল লাল ছোপ দেওয়া একটা লুঙ্গি। সে নিজেও পরলো তার বিয়ের লাল এবং হলুদ পাড়ের শাড়িখানা। ভারি যত্ন করে সে এই শাড়িখানা রেখেছে। তাহলেও ভাঁজে ভাঁজে পোকায় কেটেছে। কেমন যেন স্যাঁতা লেগে গেছে পুরনো শাড়িখানায়। তবে শাড়িটা পরে অলকার খুব ঝরঝরে লাগলো। ছেলেমেয়েরাও নতুন জামাকাপড় পরে ফিটফাট বাবুটি সেজেছে। আজ উৎসবের দিনে ওদের আমোদই সবচেয়ে বেশী। ওদের হাসিখুসি মুখ আর ঝলমলে জামাকাপড় পরা চেহারাগুলো দেখে কে বলবে যে ওরা রাজার ছেলে নয়।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে জরাজীর্ণ গাড়িটার ওপর চেপে বসলো অলকা। গাড়িটার আজ পরম ভাগ্যি। তাই এমন সুবেশ যাত্রী পেয়েছে। ওদের সবাইকে নিয়ে অলকাকে দেখাচ্ছে একটা বাহারি ফুলের তোড়ার মতন। বড় ছেলে মনোজ আজ রিক্সা চালাবে কারণ হাসারি চায় না যে তার বাহারি সার্টখানা ঘামে ভিজে নষ্ট হয়ে যাক।

ভাড়া করা বাগানবাড়িটা খুব দূরে নয়। তাড়াতাড়ি পেঁছে গেল ওরা। কলকাতা শহরের এটাই বিশেষত্ব। বড়লোকের বাড়ির পাশেই বস্তি ঝোপড়ি গজিয়ে ওঠে। এ শহরে গরিব বড়লোক গায়ে গায়ে বাস করে।

পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমোদ করার সুযোগ সব রিক্সাওলার নেই। বেশিরভাগ রিক্সাওলাই শহরে একলা থাকে। দেশগাঁয়ে পড়ে আছে ওদের বউ ছেলেমেয়েরা। হাসারির পছন্দ হয় না এই ব্যবস্থাটা। এটা এক ধরনের স্বার্থপরতা। একা একা আমোদ করাটা বেহায়াপনা। সবাইকে নিয়ে আমোদ করার মধ্যে যে আনন্দ, তাতেই উৎসবের সার্থকতা। তখন ভগবানকেও আপনজন করে পাওয়া যায়।

বাগানবাড়ির ফটকের কাছে এসে হাসারি মোহিত হয়ে গেল। আহা! কি সুন্দর ব্যবস্থা! প্যান্ডেলটির গড়ন ঠিক মন্দিরের মতন। লাল এবং সাদা ফুলের তোড়া এবং মধ্যে সবুজ পাতার বাহার দিয়ে মন্দিরের তোরণটি তৈরি হয়েছে। মধ্যিখানে জুঁই এবং গাঁদা ফুলের আসনের উপর বিশ্বকর্মার বিশাল মূর্তিটি অধিষ্ঠিত। টুকটুকে লাল দুই ঠোঁট এবং কাজল পরা দুটি চোখে কি উদার ব্যঞ্জনা! অমন ঐশ্বর্যময় দৃপ্তভঙ্গির মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মুগ্ধ হয়ে গেল হাসারি আর তার বউ। উচ্ছ্বসিত হাসারি বলে উঠলো, 'দ্যাখো ক্যামন সোন্দর আমাদের ঠাকুরটি। দ্যাখো কি তেজ উয়ার। তাই না?'

অলকা ঘাড় নাড়লো। চক্ষু দুটি তার সত্যিই সার্থক হয়ে গেছে আজ। ঠাকুরের বিরাট মূর্তি প্রায় চাঁদোয়া ছুঁই ছুঁই। দুটি হাত মাথার উপরে তোলা। এক হাতে ঝকমক করছে একটা কুঠার, অন্য হাতে মুদ্গর। যেন স্বর্গরাজ্য থেকে ওদের জন্য উপহার ছিনিয়ে আনবেন। প্রশস্ত বক্ষোদেশে আছড়ে পড়া ঝড়তুফান যেন ধারণ করেছেন উনি। তেজোদৃপ্ত পেশীবহুল বাহুর শক্তি যেন উত্তোলিত করবে গিরি-শৃংগ এবং পায়ের চাপে দলিত হবে পশুরাজ। এমন শক্তিমান দেবতার প্রসন্ন আশ্রয় লাভ করে ওরা কৃতার্থ, ধন্য। হাসারির মনে হচ্ছিল যত বিপন্নই দেখাক না কেন, এমন দেবতার কৃপা লাভ করলে ওদের জরাজীর্ণ গাড়িগুলি কি হয়ে উঠবে না আকাশচারী রথ এবং তাদের মতন হতভাগ্য বাহকরা কি ডানাওলা ঘোড়া হতে পারবে না?

মোহিত হয়ে দেখতে দেখতে ওরা সবাই গড় হলো ঠাকুরের মূর্তির সামনে। অলকা ভারি ভক্তিমতী। কাঁসার থালায় সে পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছে। এক মুঠো আতপ চাল, একখানা কলা আর কিছু ফুল। ঠাকুরের পায়ের কাছে পুজোর থালাটি রাখলো অলকা। হাসারি তার রিক্সাখানা অন্য গাড়িগুলোর পাশে রেখে এল। পাশাপাশি রিক্সাগুলো ফুল এবং মালা দিয়ে সাজাচ্ছে বিপিনের আর এক ছেলে। হাসারির মনে হলো নির্বাক গাড়িগুলোর বোবা প্রাণে কত না কৃতজ্ঞতা। যদি বাকহীন না হতো নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা জানাতো। শকটদণ্ডগুলো অলংকৃত হয়ে ঊর্ধ্বমুখ সড়কির মতন আকাশের দিকে উঁচু করা। সরল রেখার মতন সুসজ্জিত দণ্ডগুলো যেন আকাশপানে চেয়ে আছে। দৃশ্যটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল হাসারি। মানুষটানা এই জীর্ণ গাড়িগুলো যেন চেনাই যাচ্ছে না। অথচ প্রতিদিন হাক্লান্ত হয়ে শহরের রাস্তায় এই গাড়িগুলোই তারা টেনে নিয়ে বেড়ায়। কোনো যাদুকরের যাদুকাঠির ছোঁয়া পেয়ে গাড়িগুলো যেন নবজন্ম লাভ করলো আজ।

তখন সব রিক্সাওলা এসে হাজির হয়েছে। ঢাকের বাদ্যি উঠলো। সঙ্গে ঝম্ ঝম্ করতালের শব্দ। একজন মাঝবয়সী পুরোহিত তখন এসে দাঁড়িয়েছেন গাড়িগুলোর সামনে। তার পিছনে প্রায় পঞ্চাশজন মানুষের বাজনদারের দল। বাজনদারের গায়ে লাল রঙের জ্যাকেট এবং প্যান্ট। খালি গায়ে একজন যুবক ব্রাহ্মণ এসে হাতের ঘন্টি নাড়িয়ে সবাইকে যেন হুঁশিয়ার করে দিল। ছেলেটির আদুড় গায়ে আড়াআড়ি ঝুলছে সাদা পৈতাটি। এরপর মাঝবয়সী পুরোহিত প্রতিটি গাড়ির গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সবাই এই অনুষ্ঠান দেখছে। লোকগুলোর মন আবেগে অভিভূত। তাদের মনে হচ্ছিল যে শুধু চোখের জল বা গায়ের ঘাম নয়, আজ তাদের গাড়িগুলো ধন্য হলো গঙ্গা-জলের ছোঁয়ায়। গংগবারি শুধু পূত নয়। দ্রবময়ি এই জলের মহিমা অপার।

মুমূর্ষুর প্রাণে নবজীবন দান করে এই গঙ্গাবারি।

রিক্সাগাড়িগুলোর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ হলে পুরোহিত বিশ্বকর্মার মূর্তির সামনে এলেন। মূর্তির মুখে ঘি এবং আতপ চাল দিলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করলেন। মালিকের এক ছেলে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'বিশ্বকর্মাজী কী জয়!' সবাই একযোগে জয়ধ্বনি দিল তিন বার। সম-স্বরের এই জয়ধ্বনিতে উত্তাল হলো মণ্ডপ। ওদের দিগ্বিজয়ী এই জয়ধ্বনির মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে। দাবিদাওয়া সম্বলিত ওদের উদ্ধত স্লোগানের স্বর মালিকের কানে যেমন কটু লাগে, দেবতার জয়ধ্বনি সে তুলনায় অনেক মধুর। তাই এই জয়ধ্বনি ভাল লাগলো মালিকদের।

কিন্তু হাসারির কানে কটু লাগলো দেবতার এই জয়ধ্বনি। তার মনে হচ্ছিল বিশ্বকর্মার জয়ধ্বনির সঙ্গে কেন ওরা 'রিক্সামজুরদের একতা দীর্ঘজীবী হ'ক' ধ্বনি দিল না? কেন বললো না 'বিপ্লব জিন্দাবাদ?' বিশ্বকর্মাজী ত মালিকের দেবতা নন। তিনি শ্রমিক কর্মীদেরই দেবতা!

পুজো উৎসব শেষ হলো। বিপিনের বড় ছেলে সবাইকে আসন গ্রহণ করতে বললো। সবাই ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজ নিজ দলের সঙ্গে বসেছে। কলাপাতার ওপর গরম ভাত আর মাংসের ঝোল ঢেলে দিয়ে গেল বিপিনের বড় ছেলে। রীতিমত ভুরিভোজ। ওদের মরা পেট। তবুও সবাই তৃপ্তি করে খাচ্ছে। মালিকের লোকেরা কোমর নুইয়ে কেমন পরিপাটী করে পরিবেশন করছে। এ দৃশ্য দেখে হাসারির মন ভরে উঠলো খুশীতে। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে তার মনে হলো যেন একদল হিংস্র শার্দুল নিরীহ হরিণদের সামনে তৃণ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চুয়াল্লিশ

মনে হলো কেউ যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুললো কোভালস্কী। দরজার সামনে হাটু মুড়ে বসে আছে আনোয়ার। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে চৌকাঠ পার করিয়ে আনলো কোভালস্কী। তারপর ঘরের মেঝেতে পাতা খড়ের মাদুরের ওপর বসাল আনোয়ারকে। আনোয়ারের বিপন্ন চোখ মুখ দেখে কোভালস্কীও চিন্তিত।

'কি ব্যাপার আনোয়ার?'

'স্তেফানদাদা!' একটু থমকাল আনোয়ার। তারপর দুহাত জোড় করে কাতর ভাবে বললো, 'আপনার কাছে একটা অনুগ্রহ চাইতে এসেছি স্তেফানদাদা!'

কোভালস্কীও বিচলিত বোধ করছে। নিচু হয়ে আনোয়ারের মুখের কাছে মুখ এনে বললো, 'অনুগ্রহ কেন বলছো ভাই? যখন দাদা বলেছ যা খুশি চাইতে পার।'

আনোয়ার একটু ইতস্তত করে বললো, 'তাহ'লে পুলিকে গিয়ে বলুন যে মিতাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

কোভালস্কী অবাক। বললো, 'মিতাকে বিয়ে করতে চাও? কি আশ্চর্য! কিন্তু মিতা যে খুব ছোট!'

'তা জানি স্তেফানদাদা। আর সেইজন্যেই আপনার কাছে এলুম। পুলি আপনার

কথা শুনবে। সে আপনাকে খাতির করে।'

কোভালস্কী চুপ। কি বলবে সে আনোয়ারকে? পুলিকে চেনে কোভালস্কী। ছোটখাট রোগা মানুষ। বছর পঞ্চাশ তার বয়স। দাক্ষিণভারতীয় এই মানুষটি অনেকদিন আগে কলকাতায় এসেছিল। সেই থেকে এখানেই থেকে গেছে। ছেড়ে যায় নি কলকাতা। পুলিও কুষ্ঠরোগী। তবে রোগটা তার পুরনো। ছেলেবেলা থেকেই পুলি ভবঘুরে জীবন যাপন করে। যখন যেখানে থাকে সেটাই তার দেশঘর। এই দীর্ঘ ভবঘুরে জীবনের গোড়াতেই হয়ত তাকে রোগে ধরে। তখন শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে বাঁদর নাচ দেখতো। কিন্তু বেশিদিন এই পেশায় থাকে নি। পরে সে ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করে। কালীঘাট মায়ের মন্দিরের সামনে বসে সে ভিক্ষে করতো। একদিন পাড়ার এক ভিখিরি সর্দারের সংগে বখরা নিয়ে গোলমাল হলো। ফলে মন্দির চত্বর থেকে তাকে চলে যেতে হলো। সেই থেকে হাওড়া স্টেশনের বাইরে বসে ভিক্ষে করে। পুলির একটা বড় গুণ তার কৌতুকপ্রিয় স্বভাব। তার নকুলেপনা আর ভাঁড়ামি দেখতে লোকে ভিড় করে এবং দু-চার পয়সা দেয়। ইদানীং তার কুষ্ঠক্ষত খানিকটা সেরে গেছে। তাই ক্ষতস্থানের চারপাশে লাল আইডিন মাখিয়ে সেগুলো ভীতিকর করে রাখে। আনন্দ নগরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গায় বউ ছেলেমেয়ে আর বাপ-মা মরা তেরো বছরের ভাইঝি মিতাকে নিয়ে থাকে। পুলির যুবতী বউটি দেখতে ভারি মিষ্টি। তার বয়স সবে সাতাশ।

আনোয়ারের অনুরোধ শুনে কোভালস্কী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তবে তার জানা নেই যে কুষ্ঠরোগীদের জগৎ কত আলাদা। সভ্য সুস্থ মানুষের জগতের নিয়ম নিষেধ যে এ জগতে মানা হয় না, তাও সে জানতো না। সত্যিই তাই। কুষ্ঠরোগীদের নীতিবোধ আলাদা, জীবনযাপনের ধারা আলাদা। সাধারণভাবে কুষ্ঠরোগীদের যৌনবোধ একটু বেশি। রোগ যত বৃদ্ধি পায় ওদের সম্ভোগইচ্ছাও তীব্র হয়। তাই অধিকাংশ কুষ্ঠরোগী একজনের বেশি নারী নিয়ে ঘর করে। ওদের ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেশি হয়। তাদের অভিশপ্ত জীবন সুস্থ সমাজ স্বীকার করে না বলে, সামাজিক নিয়ম-নিষেধের ভ্রূকুটি তারা গ্রাহ্য করে না। তারা মুক্ত এবং যথেচ্ছ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই এই অধিকারটির উপর কারও হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করে না। আনন্দ নগরেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। খঞ্জ, বিকলাংগ এবং পতিত মানুষগুলো তাই সমাজের নাকের ওপরেই একাধিক নারীর সংগে যৌনসম্ভোগ করে। ভিক্ষে করে যেটুকু জমায় তাই দিয়েই তারা মেয়েমানুষ কেনে এবং ভোগ করে। সংসারে গরিব বাপ-মায়ের অভাব নেই। তাই ক'টা টাকার বিনিময়ে মেয়ে বেচতে তারাও কুণ্ঠিত হয় না।

কোভালস্কী চুপ করে আছে দেখে আনোয়ার অধৈর্য হয়ে উঠলো। একসময় বললো, 'স্তেফানদাদা!'

আনোয়ারের ডাকে চিন্তিত কোভালস্কীর সম্বিৎ ফিরে এল। আনোয়ার বললো, 'আমি কথা দিচ্ছি স্তেফানদাদা। আপনার একটুও অসুবিধে হবে না। পুলি আপনাকে খাতির করে। সে আপনার কথা শুনবে। আমার কাছে টাকা আছে। ন্যায্য দাম দিয়েই আমি মিতাকে ঘরে আনবো। তাকে সুখে রাখবো।'

বলতে বলতে পরনের কাপড়ের গিঁট খুলে আনোয়ার দড়ি বাঁধা একতাড়া নোট বার করলো। তারপর কোভালস্কীর মুখের সামনে নোটের তাড়াটা তুলে বললো, 'এতে তিনশ' টাকা আছে।'

কোভালস্কীকে যেন বিচলিত দেখাচ্ছে তখন। সেভাব গোপন করে ধীরে ধীরে সে বললো, 'মিতাকে বলেছ? তার মত নিয়েছ?'

কোভালস্কীর কাছে এখন এটাই আসল বলে মনে হলো যেন।

আনোয়ার বেশ অপ্রতিভ হলো। কোভালস্কীর মুখের দিকে চেয়ে অবাক স্বরে বললো, 'মিতার মত কেন? ওর কাকা যা বলবে মিতা তাই করবে।'

হয়ত তাই। কিন্তু কোভালস্কী আর কথা বাড়াতে চাইল না। নিজেকে এর মধ্যে জড়াতেও চাইল না সে। এদের জন্যে সে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। কিন্তু কারও শৃঙ্গারদূত হয়ে মেয়েমানুষ যোগাড় করতে পারবে না। ইচ্ছে করলে আনোয়ার নিজেই তার বিয়ের কথাবার্তা বলতে পারে। আর সেটাই সংগত হবে।

তাই-ই হলো। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পুলিকে রাজী করাতে পেরেছে আনোয়ার। তবে দক্ষিণার মূল্যে আর দুশ' টাকা বাড়াতে হলো আনোয়ারকে। মোট পাঁচশ' টাকায় লেনদেন রফা হলো। বাকি টাকাটা বস্তির সেই পাঞ্জাবী মহাজনের কাছে কর্জ করলো আনোয়ার।

যে সমাজের মানুষ নিজেদের অশুচি ভাবে কিংবা জন্মটাকে অনবরত ধিক্কার দেয় সেখানে কোনো ধর্মীয় সংস্কারই টেকে না। এ জাতীয় সংস্কারগুলো এইসব ব্রাত্য সমাজে অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। ফলে কুষ্ঠপল্লীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দু ব্রাহ্মণ বা মুসলমান মোল্লা যোগ দেয় না। বিয়ের আচার-বিচার বা রীতি-নীতি নিজেরাই পালন করে যতদূর সম্ভব। এদের আলাদা ধর্মবিশ্বাসও নেই। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীশ্চান পাশাপাশি বাস করছে নিস্পৃহ উদাসীনতায়। ধর্মাধর্মবোধ নিয়ে কেউ বিচলিত নয়। তবে কোনো সংস্কারই যে মানছে না তা নয়। বিয়ের দিনক্ষণ বা লগ্ন বিচার নিয়ে কিছুটা খুঁতখুঁত ভাব আছে। সে কাজটুকু করে দেয় এখানকার একজন জ্যোতিষী। লোকটার নাম যোগা। একমুখ সাদা দাড়ি দেখলেই বোঝা যায় বেশ পুরনো দিনের মানুষ সে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গড়ের মাঠের কাছের রাস্তার ফুটপাতে বসে সে লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেয়। তবে যোগার পক্ষেও এই দিনক্ষণ বিচারের কাজটা সবসময় সহজ হয় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আনোয়ার বা মিতার মতন বরকনের সঠিক জন্মদিন যোগাড় করতে পারে না সে। তখন তার জ্ঞানবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে যোগা বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে। হিন্দু পঞ্জিকামতে মঙ্গল, শনি ও রবিবার দিন বিবাহব্যবস্থা নিষিদ্ধ। সুতরাং বৈরী দিনগুলি বাদ দিয়েই আনোয়ার ও মিতার বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করেছে যোগা। আনোয়ার নিজেও রাজী হয়েছে হিন্দু মতে বিয়ে করতে।

বিয়ের দিন সকাল থেকেই নোংরা বস্তির রুগ্ন মানুষগুলো উৎসবে মেতে উঠলো। বড় বড় সার্চ লাইটের আলোয় বস্তির চেহারা চকচকে হয়ে উঠেছে। মাইক্রোফোনের উন্মত্ত গাঁ গাঁ রবে আশপাশ সশঙ্কিত। অভিশপ্ত এই বস্তিতে কোভালস্কী যখন ঢুকলো তখন কোলাহল যেন চরমে উঠেছে। এই বিবাহ সম্বন্ধটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারে নি কোভালস্কী। কোথায় যেন একটা সংশয় আছে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই মিলন বাঞ্ছিত হবে না। কিন্তু এ-আশঙ্কা প্রকাশ করা চলে না। তাই আনোয়ারের আমন্ত্রণ সে সরাসরি এড়িয়ে যেতে পারেনি। মনোমত না হলেও এসেছে। তাছাড়া এমন বিরল অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সহজে মেলে না। আর কিছু না হ'ক, তার উপস্থিতিটাই এই বিকৃত মানুষগুলোকে

অনেকখানি সান্ত্বনা দেবে। মেয়েরা নতুন চকচকে শাড়ি পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছে। কোভালস্কী আসতেই তার গলায় গাঁদা ফুলের মালা আর কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল। এ যেন বৃষভবাহন শূলপাণির তৃতীয় নেত্র। কোভালস্কীর মনে হলো শিবের মতন ত্রিনেত্র না হলে অসাধারণ এই উৎসবের অনেক কিছুই অদেখা থেকে যাবে। কোভালস্কীর পরনেও আজ নতুন সাজ। সেই অতিচেনা বাস্কেটবল বুট জুতো আর কালো রংয়ের সার্টের বদলে পায়ে পরেছে ডোঙার মতন চপ্পল আর গায়ে সাদা সুতির কোর্তা। এই নতুন পরিচ্ছদগুলো হবু বরকনে তাদের একমাত্র দুর্ভাগ্যের সংগীর কাছে খাতির করে পাঠিয়েছে।

তাকে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলোর চেহারা দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না কোভালস্কী। নতুন রঙবেরঙের জামা-কাপড় পরে সবাই ঝলমল করছে। নিখুঁত কামানো মুখগুলো চকচক করছে আলো পড়ে। সবাই ছিমছাম, ফিটফাট। নতুন সাজপোশাকের আড়ালে ঢাকা পড়েছে ওদের বিকৃত চেহারা। আজ যেন ওরা সত্যিকার মানবাধিকার লাভ করেছে। আনন্দ খুশী যেন উপচে পড়ছে ওদের মুখেচোখে। সবচেয়ে স্ফূর্তি হয়েছে পুলির। আজকের এই অনুষ্ঠানের সেই-ই প্রধান। বরকর্তা, কনেকর্তা দুই-ই। কোত্থেকে একটা সাদা সুতির কোট আর উঁচু টুপি যোগাড় করে পরেছে সে। কোভালস্কীকে দেখেই জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'আরে স্তেফানদাদা! আসুন আসুন!'

কাছে এসে হাত ধরলো পুলি। ভক্ করে একটা চড়া পানীয়র গন্ধ পেল কোভালস্কী। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই কয়েক ঢোক বাঙলা পেটে পড়েছে তার। পুলিই তাকে টানতে টানতে বরের ঘরের দিকে নিয়ে গেল। আনোয়ারের নোংরা চালাটা চেনাই যায় না। এরা সবাই মিলে চালাঘরের চেহারা বদলে দিয়েছে। কলি ফিরিয়ে আর রঙ লাগিয়ে ঘরখানা প্রায় নতুন করে দিয়েছে। বাঁশের দরমা থেকে গোড়ের মালা ঝুলছে। মেঝের ওপর চমৎকার আলপনা আঁকা। চালবাটা গুলে জ্যামিতিক ছবি এঁকে আলপনা দেওয়া হয়। হিন্দুদের সব শুভ অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হয়।

ঘরের মধ্যিখানে একটা চারপায়ার ওপর তোশকের গদি পেতে আনোয়ার বসে আছে। কুচো ফুল আর মালায় শয্যাখানি সজ্জিত। খাটের পাশেই বরাসন পাতা হয়েছে। সেই বরাসনে বসিয়ে আনোয়ারকে বিয়ের বাসরে নিয়ে যাওয়া হবে। কোভালস্কীকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো আনোয়ার। খঞ্জ দুই হাত বাড়িয়ে দিল কোভালস্কীর দিকে। কাছে যেতেই আনোয়ারের হাসি হাসি মুখখানা বেদনায় থমথমে হয়ে উঠলো যেন। কোভালস্কী অবাক হলো। হঠাৎ চুপি চুপি আনোয়ার জিজ্ঞেস করলো, 'স্তেফানদাদা! আপনার কাছে কিছু ওষুধ আছে? বিকেল থেকেই খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।'

অভিজ্ঞতা থেকে কোভালস্কী জানে যে পকেটের ভেতরে মরফিন বা যাতনা নিবারক কোনো ওষুধ না নিয়ে কুষ্ঠরোগীর কাছে আসতে নেই। আনোয়ারের ব্যকুলতা দেখে সে একটু চিন্তিত হলো। আর কিছুক্ষণ পরেই যুবতী বউয়ের সঙ্গে একলা থাকবে আনোয়ার। তখন কি ওষুধের কোনো উপকার সে পাবে? ভেবেচিন্তে তাই তখনকার মতন অর্ধেক ওষুধ ইঞ্জেকশন দিল। বাকি অর্ধেক ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দিল। সিরিঞ্জটা পকেটে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কলধ্বনি

করতে করতে একদল যুবতী-বউ এল। তাদের বেশবাস, চুলের বিন্যাস, গহনার ঠাটবাট দেখে সবাই ভুলে গেছে ওদের বিকৃত শরীরের কথা। এয়োরা গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো। ওদের হাতে বাটা হলুদের পাত্র। আনোয়ারের গায়ে হলুদ মাখিয়ে ওরা তাকে চান করাতে এসেছে। হিন্দুবিয়ের এক অপরিহার্য অনুষ্ঠান এটি। তাই আনোয়ার খুশী হলো ওদের দেখে।

ওরা এসেই বরের খোলা গায়ে তেলহলুদ মাখিয়ে দিল। গাঢ় পীতবর্ণের প্রলেপ থেকে জাফরান কস্তুরীর চড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। দৃশ্যটা উপভোগ্য হতো যদি আনোয়ারের শরীরটা অমন বিকৃত না হতো। সবাই দেখছে ওর আধখানা শরীরটা। রোগে খেয়ে গেছে বাকিটুকু। হলুদতেল মাখানোর পর ওরা আনোয়ারকে চান করিয়ে দিল। তারপর নতুন জামা পরিয়ে দিল। ঘোর সবুজ রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিটি গায়ে দিয়ে আনোয়ারের মুখখানি খুশীতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তখন। যে মানুষটা চাকার গাড়িতে বসে পাঁকের মধ্যে চলে ফিরে বেড়ায় সে কি স্বপ্নেও এমন ঝলমল পোশাক পরার কথা ভাবতে পেরেছিল? কোভালস্কী মানতে বাধ্য হলো তা।

এদিকে বিয়ের আচার-বিচারের দায়িত্বটা পুলি নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছে তখন। কারণ কুষ্ঠরোগতদের সমাজে কোনো ধর্মেরই আচারি ঋত্বিকরা অনুষ্ঠানের জটিলতার মধ্যে ঢুকতে চায় না। তাহলেও যেখানে পুলির মতন উৎসাহী মানুষ আছে, সেখানে অপরিহার্য অনুষ্ঠানগুলো পড়ে থাকে না। বিশেষ যেখানে তার পরোক্ষ স্বার্থ আছে, সেখানে পুলি একাই একশো।

বরের পাঠানো দানসামগ্রীগুলো নিয়ে পুলির একটু দুর্ভাবনা হচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো এর পুরোপুরি দায়িত্ব কোভালস্কীর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই তাকে আড়ালে ডেকে চুপিচুপি বললো, 'স্তেফানভাই! আপনার ওপর একটা ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

কোভালস্কী অবাক। কি ভার দেবে পুলি?

'মিতার বিয়ের দান উপহারগুলোর দায়িত্বটা আপনিই নিন। তাহলে আমিও একটু নিশ্চিন্ত হই। অন্তত মাঝপথে খোয়া যাবে না।' কথাটা বলে চোখ টিপলো পুলি।

কোভালস্কী আপত্তি করলো না। আনোয়ার তখন তোসকের তলা থেকে তেল-কাগজ মোড়া অনেকগুলো ছোট ছোট প্যাকেট বার করেছে। প্রতিটি প্যাকেটের ভেতরেই কিছু কিছু উপহার। ছোট ছোট গহনা, যেমন রুপোর আংটি, পায়ের মল, কানের ফুল, নাকের ছোট্ট একটা পাথর, গলার হার, মাথার-টায়রা ইত্যাদি। কোনটাই তেমন দামী নয়। তবে পুলির পছন্দমতই এগুলো কেনা হয়েছে। আরও আছে। খানকয়েক শাড়ি, কিছু প্রসাধনের জিনিস আর এক বাক্স রঙকরা মিষ্টি। দানের জিনিসগুলো একটা ঝুড়ির মধ্যে পুরে সেটা কোভালস্কীর হাতে দিল পুলি। তারপর বাজনদারদের ডাকলো।

মোট আটজন বাজনদার ঘরে ঢুকছে তখন। এরা সবাই কুষ্ঠরোগী হলেও ড্রাম বাজায়। মাথায় পালকগোঁজা টুপি পরা লোকগুলোর পরনে হলুদ জ্যাকেট আর সাদা প্যান্ট। এদের কারও নুলো হাতে ড্রামের কাঠি, কারও কর্তাল, কারও বা ভেঁপু। পুলির ইঙ্গিত পেয়েই ড্রামপার্টির দল বাজনা বাজানো শুরু করলো। মিছিল করে সমারোহ করে তখন সবাই চলেছে কনের বাড়ির দিকে। সব পিছনে

উপহারের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কোভালস্কী চলেছে জেরুজালেমের পথে রাজা বেলশাজারের মতন। চলতে চলতে প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছে ডোঙার মতন চপ্পলপরা পদক্ষেপ এই বুঝি ড্রেনের মধ্যে স্খলিত হলো।

আজকের উৎসবের সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি হলো কোভালস্কী। তাই তাকে আশপাশটুকু দেখাবার জন্য মিছিল নিয়ে সব জায়গাটা ঘুরে এল পুলি। তারপর মিতার ঘরের কাছে এসে পৌঁছলো ব্যান্ডপার্টি নিয়ে। মিতার ঘরের কাছে এসে কোভালস্কী অবাক। এর আগেও অনেকবার সে এখানে এসেছে এদের দেখাশোনা করতে। আজ কিন্তু সেই নোংরা বিপন্ন ছবিটা অন্তর্হিত। শুধু মানুষগুলো নয়, গোটা জায়গাটাই ঝকঝক তকতক করছে। মিতার ঘরের সামনেটা চাদর দিয়ে মোড়া। এখানে ওখানে ঝুলছে ফুলের মালা। ভাড়া করা জেনারেটর লাগিয়ে ইলেকট্রিক আলো জ্বালানো হয়েছে। এমন তকতকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে কোভালস্কী সত্যিই অবাক হয়ে গেল।

মিতার ঘরের দোরগোড়ায় যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, তারই হাতে উপহারের ঝুড়িটা দিয়ে কোভালস্কী দায়মুক্ত হলো। এইটুকুর জন্যেই কোভালস্কীকে টেনে এনেছে পুলি। কাজটুকু সম্পন্ন হলে দলবল নিয়ে পুলি আবার ফিরে চললো আনোয়ারের ঘরের দিকে। তখন প্রায় মধ্যরাত। অনুষ্ঠান শুরুর লগ্ন আগতপ্রায়। এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটিতেই দিন এবং রাত পাশাপাশি বিরাজ করে।

না, রত্নখচিত সাদা ঘোড়া এল না খঞ্জ আনোয়ারের জন্যে। তবে বরাসনটি ফুল এবং রঙিন কাপড় দিয়ে মুড়ে বাহারি করা হয়েছে। শিবিকার মতন দেখাচ্ছে বরাসনটা। চারজন বেহারা সেটি বয়ে নিয়ে চলেছে কনের বাড়ির দিকে। বরের মাথায় রঙিন উড়নি। গায়ে জোব্বা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মোগল সম্রাট অভিষেকের জন্য দরবারে চলেছেন। শিবিকার আগে আগে চলেছে পুলি। বরের ডুলির ঠিক পেছনেই কোভালস্কী চলেছে। তার হাতে ভাঁজ করা একখণ্ড কাপড়। বাসরে ঢোকার আগে বরের মুখখানি এই উড়ানিখানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বরযাত্রীদের বিরাট শোভাযাত্রা উল্লাস করতে করতে চলেছে মেয়ের বাড়ির দিকে। সবাই হাসছে, চেঁচিয়ে কথা বলছে। বিকৃত অঙ্গের এই মানুষগুলোর মনে আজ থৈথৈ করছে আনন্দ। কোভালস্কীর জীবনে এই দৃশ্য এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আশা এবং আশ্বাসের এক বিস্ময়কর শিক্ষা পেল সে আজ। এদের এই অন্ত্যজ ঘৃণ্য জীবনেও যে এত আনন্দ এবং প্রাণরস আছে তা কে জানতো! আনন্দ এবং প্রাণরস যেন উথলে উঠছে এদের এই ঘৃণ্য জীবনের অভ্যন্তর থেকে।

বিবাহবাসরের কাছাকাছি পৌঁছে পুলির ইঙ্গিতে ব্যান্ডবাদ্য থেমে গেল। দুজন প্রৌঢ়া সধবা এসে কোভালস্কীর হাত থেকে ভাঁজ করা কাপড়টা নিয়ে বরের মুখটা ঢেকে দিল। ওড়না ঢাকা বরের মুখখানি তখন সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। পুলির ইঙ্গিতে আবার ব্যান্ড বেজে উঠলো। মিছিলও চললো। মিছিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে হতাশ রোগপাণ্ডুর মুখের সারি। বিকৃত চেহারার মানুষগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোভালস্কীর মনে হলো ঈশ্বরের রাজ্যে এই হতভাগ্য বিপন্ন মুখগুলিই হয়ত সবচেয়ে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠবে।

আলপনা আঁকা ঘরের মাঝখানে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। প্রজ্বলিত এই অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দান করা হয় যাতে এদের মিলন সুখের হয়। ক্লান্ত বিষণ্ণ মিতা মাথা নিচু করে বসে আছে। মুখের ওপর ঘোমটা টানা, ঠিক যেন ধ্যানমগ্না তাপসী। তার মাথার চুল ঝকঝক করছে সোনালিরঙের গিলটি করা গহনায়। ঘরের

বাতাস ধ্পধ্নোর স্বাসে ভারি হয়ে উঠেছে। প্লির ইঙ্গিতে কোভালস্কী বসেছে কনের বাঁ পাশে। আনোয়ারকে ধরে এনে কনের ডান পাশে বসানো হলো। আজ এই অন্ষ্ঠানের প্রধান প্রোহিত প্লি। মাথায় আঁটসাঁট টুপি আর বড়সড় কোটের তলায় প্লির শ্কনো ব্কের আস্ফালন প্রায় যেন নজরেই পড়ছে না।

হ্যাঁ, প্লিই আজ এই অন্ষ্ঠানের আসল মান্ষ। এই দায়িত্বটা পেয়ে সে খ্ব উদ্দীপ্ত, কারণ সে ছাড়া উৎসব সম্পূর্ণ হবে না। অন্ষ্ঠানের মন্ত্রগ্লো খসখসে গলায় সে তখন পড়ে যাচ্ছে। চ্পচাপ দাঁড়িয়ে সবাই শ্নছে সেই মন্ত্রপাঠ। এরপর শ্র্ হলো বিয়ের প্রধান অন্ষ্ঠান। পাণিগ্রহণ অন্ষ্ঠান। পকেট থেকে সে একখণ্ড হল্দ স্তো বার করলো। তারপর বর ও কনের ডান হাতে স্তোটি একসঙ্গে বেঁধে দিল। স্থাপিত হলো বর ও কনের প্রথম দৈহিক সম্বন্ধ। প্লি তখনও বিড়বিড় করে মন্ত্র বলে চলেছে। কোভালস্কী স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে বরকনের ন্লো হাতদ্টির দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফরাসী লেখক লিঁয় ব্লয়ের সেই অবিস্মরণীয় লাইনটি মনে পড়ে গেল তার। 'আমরা কেউ কাল বা আগামী দশ বছরেও দিব্যধামে প্রবেশ করবো না। তবে যদি আর্তপীড়িত হই, যদি ক্র্শবিদ্ধ হই, তবে এই ম্হ্র্তেই সেই স্বর্গধামে আমাদের স্থান হবে।'

এখনই শ্র্ হবে উৎসবের সবচেয়ে নিবিড় অন্ভবের অন্ষ্ঠানটি। সাগ্রহে তাকিয়ে আছে সবাই। কোথাও এতট্কু শব্দ নেই। বর ও কনের নাম ডাকলো প্লি। ম্খের আড়াল সরিয়ে বর ও কনে প্রথম দেখবে পরস্পরকে এই শ্ভদ্ষ্টি অন্ষ্ঠানে। ভীর্ সলজ্জ কাঁপা হাতে ওরা একে অন্যের ঘোমটা সরিয়ে ম্খখানি প্রথম দেখলো। বড় বড় সরল দ্টি সলজ্জ চোখ নিবিড়ভাবে চেয়ে আছে আনোয়ারের স্ন্দর দাড়িওলা ম্খখানার দিকে। কোভালস্কী আরও ঘন হলো ওদের। দ্টি উন্ম্খ হৃদয়ের আবেগটি সে তার মনের মধ্যে রাখতে চায়। অন্ভব করতে চায়। অন্ভব করতে চায় ওদের মনের কথাটি। কি দেখছে মিতা অমন অবাক হয়ে? পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে ওর কাকা ওকে এই ছেলেটির কাছে বেচে দিয়েছে। এখন থেকে মিতার সব দায় এই ছেলেটির। মিতার দ্ই কালোভ্রমর চোখে তাই টলটল করছে দ্ফোঁটা কৃতজ্ঞ জল।

হিন্দ্র বিয়েতে আরও অসংখ্য দেশাচার লোকাচার আছে। এক এক দেশে এক এক রকম দেশাচার। কোথাও আবার সব দেশাচার মান্য নয়। কিন্তু সপ্তপদী অন্ষ্ঠানটি সব অঞ্চলের হিন্দ্বিবাহে মানা হয়। বিয়ের সময় মণ্ডপের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে পবিত্র যজ্ঞবেদিটি সাতবার প্রদক্ষিণ করে। প্লির ইঙ্গিত পেয়ে মিতা উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু তার সঙ্গে গিঁটবাঁধা হয়ে আছে আনোয়ার। তাই মিতা দাঁড়ালেও অক্ষম আনোয়ার উঠতে পারলো না। তখন বিকলপদ খঞ্জ আনোয়ার অসহায় হয়ে তাকিয়ে আছে প্লির দিকে। কোভালস্কী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। তারপর আরও তিনজনের সাহায্যে আনোয়ারকে কোলে নিয়ে মিতার সঙ্গে সাতবার তাকে যজ্ঞবেদি ঘোরাল। এই স্ন্দর অন্ষ্ঠানটি সবাই দেখলো উদ্গ্রীব হয়ে। আনোয়ারকে ফের স্বস্থানে বসাবার সময় কোভালস্কীর সঙ্গে ছোট্ট পরিহাস করলো সে। তার কানের কাছে ম্খ এনে আনোয়ার চ্পি চ্পি জিজ্ঞেস করলো, 'স্তেফানদাদা! আপনার বিয়ে হবে না?'

যারা শ্নতে পেয়েছিল তারা সবাই হেসে উঠলো হাহা করে।

বিয়ের অন্ষ্ঠান শেষ। এবার আত্মীয়ক্ট্ম্বদের নিয়ে নতুন বর-বউ আহার

করবে। এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণই সবচেয়ে বেশী। এরও আসল মানুষ স্বয়ং পুলি। তার ইঙ্গিত পেতেই সারি সারি কলাপাতা পেতে দেওয়া হলো। মেয়েরা পরিবেশন করলো ভাত, তরকারি এবং মাছ। সবাই হাসছে, কথা বলছে। একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে মজা করছে একজন বুড়ো কুষ্ঠরোগী। তার নাকহীন মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করছিল সে। তা দেখে খিলখিল করে হাসছে বাচ্চা মেয়েটা। একপাশে এঁটো পাতার স্তূপ জড়ো করা হয়েছে। রান্নার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশে। ভূরিভোজে সবাইকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। কেউ যেন বাদ না পড়ে। বরবউকে নিয়ে কোভালস্কী বসেছে নরম গদির ওপর। সবাই এসে আশীর্বাদ করে যাচ্ছে তাদের। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে ঘরখানা। নতুন পোশাকের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। মিতাকে বউয়ের সাজে দেখে খুশীতে চকচক করে উঠলো পুলির চোখ। মিনিটে মিনিটে তার ভাঁড়ামি বেড়ে চলেছে। ছটফট করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। মনে হয় কিছু যেন খুঁজছে। কোভালস্কী জানে কি খুঁজছে মানুষটা।

হ্যাঁ। পুলি যা খুঁজছে তা মদ। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই অমন উৎসবমুখর বিয়ের আসর গেঁজে গেল। ওটা তখন শুঁড়িখানা হয়ে উঠেছে। লুকিয়ে রাখা 'বাঙ্‌লার' বোতল তখন অতিথিদের হাতে হাতে ঘুরছে। অপুষ্ট পেটে মদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোর বোলচাল অন্যরকম হয়ে উঠলো যেন। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, নাচানাচি করছে। যাদের হাত-পা আছে তারা দিব্যি নাচছে। যারা ছিন্নহস্ত এবং নুলো, তারাও জড়াজড়ি করে এমন কাণ্ড করছে যে সবাই হেসে কুটোকুটি। উঠোনময় ছুটোছুটি করছে ছেলেমেয়েরা। মেয়েরাও নেশা করেছে। আজ আর কোনো নিষেধের চোখরাঙানি নেই। তাদের হাতেও 'বাঙ্‌লা' মদের গেলাস। মদমত্ত কামিনীরা নেশার ঘোরে লাটিমের মতন বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। মানুষগুলোর এই মত্ততা দেখে কোভালস্কী স্তম্ভিত। এখনও এদের এত প্রাণশক্তি! এত হতাশা এবং দুর্দশার মধ্যেও বাঁচার এত বাসনা! শুধু স্তম্ভিত নয়, কোভালস্কীর কাছে এ যেন এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। তার মনে হলো সবাইকে শুনিয়ে চীৎকার করে সে বলে, কুষ্ঠরোগীরা জীবনবিরাগী নয়। সমাজ থেকে নির্বাসিত হলেও ওরা অবাঞ্ছিত হয়নি। ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে ওরা নিঃশব্দে মৃত্যুর প্রহর গুনছে না। ওরাও জীবনবিলাসী। ওদের জীবনপাত্র ভরা হয়ে আছে উচ্ছল প্রাণমাধুরীতে। ওরা নিজেরাই প্রাণময়। যে প্রাণ সজীব, যে প্রাণ জীবনহীনের বুকে স্পন্দন আনে, যে প্রাণ ছড়িয়ে আছে ধন্য, কৃতার্থ কলকাতা মহানগরীর অলিগলিতে, সেই উচ্ছল প্রাণটি কানায় কানায় ভরপুর করে রেখেছে এই অভিশপ্ত মানুষগুলোকেও।

পয়তাল্লিশ

ইদানীং হাসারির নিজেকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। প্রায়ই মনে হয় এ তার কি হলো? শুরু হয় অবসাদ দিয়ে। নড়তে চড়তে ইচ্ছে করে না। তারপর হাড়ের মধ্যে কেমন এক তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করে। তখন মনে হয়, 'পুলিস লাঠি পেটা করেছে।' মাঝে মাঝে মনে হয় বোধহয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু এত শীঘ্র বুড়ো হয়ে যাবে কেন? আবার হতেও পারে। 'কলকেতার বাগানে গাছের পাতাগুলি কত শীঘ্র ঝরে পড়ে, দ্যাখনি তা?' বসে বসে এইসব কথা ভাবে আর মাথা নাড়ে।

একদিন শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো। বুকের কাছে কিসের যেন উত্তাপ। রিক্সার পাদানির ওপর সওয়ারির জন্যে বসে থাকতে থাকতেই তার সারা গা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো হাসারির। 'ব্যাপারটি কি তবে?' দিব্যি ঠান্ডার সময়। গায়ের সোয়েটারটা গায়েই আছে। তবুও শীতভাব গেল না। 'তবে কি আমার মশাজ্বর হয়েছে?' বাস্তবিকই রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছে হাসারি। ওর এক ট্যাক্সি ড্রাইভার বন্ধু আছে। তার মুখেই প্রথম মশাজ্বরের কথা শুনেছে হাসারি। সে জ্বরেও নাকি এমনি কাঁপুনি হয় শরীরে। তারও একবার মশাজ্বর হয়েছিল। তখন ক'টা সাদা বড়ি খেয়েই সে চাংগা হয়ে যায়। একদিন খবরের কাগজে মুড়ে সাদা বড়ি আর এক বোতল 'বাঙলা' নিয়ে এল সে। গোটা-চারেক বড়ি আর এক বোতল 'বাঙলা' দিয়ে শুরু হলো হাসারির চিকিৎসা। কিন্তু ব্যাধি সারলো না। 'বাঙলা' খেলেই শুয়োরছানার মতন সে ঘামতে শুরু করে। 'বুকের মধ্যি সেই আগুনপারা ভাবটি দিবানিশি আমায় কষ্ট দেয়। নিশ্বাস নিতে পারি না। বাচ্চা সওয়ারি নিলেও দু'মিনিট অন্তর থামতি হয়।' একদিন খুব ভীত হয়ে পড়লো সে। পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাতের গায়ে রিক্সাটা রেখে সে ক'টা বিড়ি কিনতে গিয়েছিল। ফ্লুরির কেকের দোকান পেরিয়ে যাবার সময় শো কেসের বড় লম্বা আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলো হাসারি। চমকে উঠলো চেহারাটা দেখে। এই বুড়ো লোকটা কে? গাল দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। মাথাভর্তি সাদা চুল। এত বুড়ো হয়ে গেছে হাসারি? হঠাৎ তার বাবার চেহারাটা মনে পড়ে গেল। গাঁ ছেড়ে আসার সময় বাবা ওদের আশীর্বাদ করছেন। হুবহু সেই ছবিটা দেখলো সে। ছবিটা কোনদিন ভুলতে পারবে না হাসারি।

অলকাও ইদানীং ঠায় চেয়ে থাকে তার দিকে। হাসারি বুঝতে পারে যে ওর বউয়ের মনেও ভয় ঢুকেছে। ইদানীং হাসারির প্রতিটি চালচলন আর কথাবার্তার দিকে তীক্ষ্ন নজর রেখেছে অলকা। সামান্য কিছু বেচাল দেখলেই সে মরিয়া হয়ে ওঠে। নিজেকে প্রবোধ দেয়, যেন তার স্বামী বেজায় সুস্থ। হাসারি বেশ বুঝতে পারে নিজেকে এমনি করে ঠকাচ্ছে অলকা। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে হাসারি। যখনই তার যৌন সঙ্গমের ইচ্ছে হয়েছে, অলকা একটুও বাধা দেয়নি। যেন তার স্বমী সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। ইদানীং দাম্পত্য আকর্ষণটাও অনেক বেড়ে গেছে হাসারির। ফলে যা অনিবার্য তাই ঘটলো। একদিন সকালবেলা অলকা এসে বললো সে অন্তঃসত্ত্বা। সেদিন হাসারির খুব আনন্দ হয়েছিল। অসুখের কথা একবারও মনে হয়নি।

কিন্তু এই ঘটনার পর থেকেই হাসারির শরীরটা ভাঙতে শুরু করলো। একদিন রিক্সায় একজন মারোয়াড়ী সওয়ারি তুলে প্রায় প্রাণ যায় অবস্থা হলো তার। লোকটার সঙ্গে দু-একটা পোঁটলা-পুঁটলিও ছিল। কিন্তু রিক্সা টেনে সে যেতে পারে না তখন। দু'পা চলে ত রিক্সার ডান্ডা নামিয়ে দম নেয়। তখন নিশ্বাস নিতে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল তার। হাঁটু দুটো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে যেন একটা গজাল ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। মারোয়াড়ীটা একবারে নির্দয় অমানুষ নয়। সে তখনই আর একটা রিক্সা ডেকে চলে যেতে পারতো। কিন্তু তা না করে সে গাড়ি থেকে নামলো। তারপর উবু হয়ে বসা হাসারির পিঠে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগলো, যাতে সে স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারে। হঠাৎ গলার কাছে কিছু একটা সুড়সুড় করতে লাগলো হাসারির। থক্ করে সে খানিকটা থুথু ফেললো। থুথুর চেহারা দেখেই লোকটার উৎসাহ নিভে গেল। মুখটা বিকৃত করে তখুনি

আর একটা রিক্সা ডাকলো, তারপর মালপত্র নিয়ে চড়ে বসলো সে। যাবার আগে হাসারির হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গ‌ুঁজে দিয়ে হাত নেড়ে চলে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলো হাসারি। তবে থুথু ফেলার পর থেকেই যেন কিছুটা আরাম পাচ্ছে সে। ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাসও অনেক সহজ হয়ে এল। মনে হলো শরীরে বেশ বল পেয়েছে। তাহলেও রাস্তায় রাস্তায় না ঘুরে সে ঘরে ফিরে এল। সব শুনে অলকা কেঁদেই আকুল। মেয়েরা অনেকটা জীবজন্তুর মতন। ঝড়ের সংকেত আগাম টের পায়। পুরুষের ঢের আগে বিপদের গন্ধ পায় তারা। ওদের ঝোপড়ির কাছেই একজন হাতুড়ে ডাক্তার বসে। ফুটপাতের ডাক্তার। তাই যারা গরিব, তাদের চিকিৎসা করে একটা-দুটো টাকা নিয়ে। অলকার ইচ্ছে হাসারি তখুনি লোকটার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসে। তবে তার আগে ঠাকুরের পুজো দিতে হবে। অলকার ধারণা রাক্ষসী সুর্পনখার ভর হয়েছে তার স্বামীর ওপর। পুরুষের সব বিপত্তির মূল নাকি ওই সর্বনাশী। সুতরাং জীবন থেকে ওকে তাড়াতে হবে। একটা থালার ওপর কিছু ফুল, কলা আর আতপ চাল দিয়ে নৈবেদ্য সাজাল অলকা। তারপর ভয়ত্রাতা, বিঘ্ননাশকারী গণেশের মন্দিরে পুজো দিতে গেল। মারোয়াড়ীর দেওয়া পাঁচটাকার নোটখানা হাসারির সংগেই ছিল। পুরোহিতের হাতে সেটি প্রণামীস্বরূপ দিল অলকা। পুরোহিত অদের পুজাটি গণেশের পায়ের কাছে নিবেদন করলো। ধুপ-ধুনার ধোঁয়ায় পুজোস্থানটি তখন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ধোঁয়ার আড়ালে হারিয়ে গেছে দেবতার মূর্তি। ওরা চলে এল মন্দির থেকে। অলকার বিশ্বাস যে, অতঃপর অনন্তশক্তিশালী মহাকায় গণেশের শুণ্ডাঘাতে রাক্ষসীর পতন হবে। পরের দিন কোন্ মন্ত্রবলে হাসারি যেন দেহেমনে দারুণ বল পেল। অনায়াসে রিক্সাটি নিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু হাসারির এই স্বস্তিভাব যে মনের ভুল, তা কদিনেই বুঝতে পারলো সে। তখন শীতটাও খুব পড়েছে। উত্তর থেকে শীতের হাওয়া আছড়ে পড়ছে শহরের বুকে। গরমের সময় পিচ গলে যেমন পায়ের তলা জ্বালিয়ে দেয়, শীতেও তেমনি জ্বালা ধরে। শক্ত ঠাণ্ডা রাস্তা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটা যায় না। পা ফেটে রক্ত ঝরে। দিনের বেলা তবু কাটে। কিন্তু রাত বাড়ার সংগে সংগে শীতের কামড় যেন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় কুমিরের ধারালো দাঁতের পাটি কামড়ে বসেছে মানুষের গায়ে। প্যাকিং বাক্সের মধ্যে শুকনো মাছের মতন হাসারির সংসারের ক'টা প্রাণী রাতটুকু কাটিয়ে দেয় জড়াজড়ি করে।

শেষমেশ ওয়েলেসলী স্ট্রীটের সেই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছেই যেতে হলো হাসারিকে। কিন্তু অবাক কাণ্ড। দুবোতল ওষুধ পেটে পড়তে না পড়তেই দিব্যি চাংগা হয়ে উঠলো সে। হাড়ের মধ্যে সেই ছুঁচ ফোটানো যন্ত্রণা নেই। নেই বুকের মধ্যে সেই আগুনপারা জ্বালাটা। ক'টা দিনেই বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠলো হাসারি। তখন দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সে। হঠাৎ একদিন গলার মধ্যে কেমন যেন জ্বালা-জ্বালা ভাব হলো। যেন কেউ গলার ভেতরটা আঁচড়ে দিয়েছে। সংগে শুকনো কাশির ধমক। যখন শুরু হয় তখন থামানো যায় না। কাশির ধমক একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ক্রমে শরীরের অবস্থা এমন কাহিল হলো যে মনে হয় ঝড়ের ঝাপটায় নারকেল গাছের মত কেউ তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। অবশ্য রিক্সাওলাদের জীবনে এই শুকনো কাশির ধমক অপরিচিত অভিজ্ঞতা নয়। ঘণ্টার ঠুনঠুন আওয়াজের মতন খুকখুক কাশির বাদনটিও রিক্সাওলাদের জীবনের সংগে মাখা-

ঝাঁপিয়ে হয়ে আছে। তবে এর পরিণাম যে ভয়ঙ্কর তা সবাই জানে। হাসারিও জানে। সে এখন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে ঠাকুর তার কাতর প্রার্থনা শোনেন নি।

ছেচল্লিশ

মোটরবাইকের স্টিয়ারিং হাতলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ঝকঝকে হেডলাইট আর হর্ন, লাল ও সবুজ রঙ করা দুটি পুরুষ্টু চাকা, রুপোর পাতের মতন চকচকে তেলের ট্যাঙ্ক এবং চিতাবাঘের চামড়া মোড়া চালকের সীটওলা গাড়িটা দেখতে সিনেমায় দেখা গাড়ির মতন। বিদ্যুল্লতার মতন ছটা তুলে গাড়িটা যখন ছুটে যায় তখন বস্তির সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে। গাড়ির চালকের আসনে যে যুবকটি বসে আছে তার চামড়ার ট্রাউজার এবং ঢোলা সিল্কের সার্ট পরা চেহারাটা বস্তির সবাই চেনে। বস্তির কাদালেপা অলিগলি দিয়ে কটু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে যখন গাড়ি নিয়ে দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে খুশীর হাসি বিলিয়ে চলে, তখন ঠিক মনে হয় ভোট চাইতে আসা একজন ঝানু রাজনৈতিক নেতা। চোখে কালো চশমা আঁটা ছোকরার পরিচয় এ পাড়ায় বলে দিতে হয় না। বড় মসজিদের কানা মোল্লা বা রেল লাইনের ধারে মন্দিরের বুড়ো পুরুতঠাকুরটার মতন সবাই তাকে চেনে। ছোকরার নাম অশোক। ইতিহাসের মহামতী সম্রাট অশোকের মতনই বিখ্যাত সে। এখানকার কুখ্যাত মফিয়া চক্রের প্রধানপুরুষ যে লোকটা তারই বড় ছেলে অশোক। বাপের সুযোগ্য সহকারীও সে।

বস্তির জনসংখ্যা সত্তর হাজার ছাড়িয়ে গেলেও আনন্দ নগরে না আছে থানা, না কোনো পৌরব্যবস্থা। এমনকি নালিশ জানাবার মতন কোনরকম কর্তৃপক্ষও এখানে নেই। ফলে হাসারিদের বস্তির মতন আনন্দ নগরের প্রশাসনটাও মাস্তান-চক্রের হাতে নির্বিবাদে চলে গেছে। এরাই হুকুম দেয়, হুকুম মানায়, পারিবারিক ঝগড়াবিবাদে সালিসী করে। এ নিয়ে কারও নালিশ নেই। আনন্দ নগরের মাস্তানচক্র এবং তাদের সর্বশক্তিমান নেতাকে বস্তির সব মানুষই জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠর আসনে বসিয়ে দিব্যি ঘরসংসার করছে। পরিবারে পরিবারে ঝগড়াবিবাদ থাকলেও এই শ্রেষ্ঠ মানুষটার শাসন মেনে নিয়েছে সবাই। বস্তির মানুষ এই মানুষটাকে পিত-স্থানীয়রূপেই দেখে এবং মান্য করে। এই সর্বশক্তিমান মানুষটি একজন বাঙালী। বয়স ষাটের কোঠায়। সংসারটিও ছেলেমেয়ে পোষ্যবর্গ নিয়ে বেশ বড়। কলকাতা-দিল্লির হাইওয়ের ধারে বস্তির উল্টোদিকে বেশ বড়সড় আধুনিক ধাঁচের চারতলা বাড়িতে সে থাকে। কার্তিকবাবু নামেই এই অঞ্চলে তার হাঁকডাক। কার্তিক অর্থাৎ দেবসেনাপতি। তা বাপের দেওয়া নামটা সার্থক হয়েছে তার ক্ষেত্রে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা আর মোটা ভুরুর এই মানুষটাই এই আনন্দ নগরের অবিসংবাদিত নেতা।

বস্তির প্রায় সবকটা বেআইনি চোলাই ঠেক্ তার সম্পত্তির অধিকারভুক্ত। এ ছাড়াও চোরাই মাদক চালান এবং বেশ্যাপাড়ারও কর্তৃত্ব তার হাতে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তালুকদার এই কার্তিকবাবু। যতগুলো বস্তিঘর আছে তার প্রায় সব-কটার মালিক সে। বস্তিঘরের ভাড়াটে বাছাই নিয়ে তার নানারকম বাছবিচার আছে। ওপার বাংলা থেকে আগত গরিব উদ্বাস্তুদের সে ভাড়াটিয়া হিসেবে মোটেই পছন্দ করে না। বরং খাটাল বানিয়ে সে গরুমোষ রাখে। ফলে বস্তির প্রায় সাড়ে

আট হাজার গবাদিপশু এবং খাটালগুলো তার এক্তিয়ারভুক্ত। খাটালের সংগে জড়িয়ে আছে দুর্গন্ধময় পরিবেশ, লক্ষকোটি মক্ষিকাকুলের নিয়মিত প্রজনন এবং বস্তির খোলা নালা দিয়ে নিত্য বহমান তরল মলমূত্রের প্রবাহ। বস্তুত, বিরাট এই পশু অভিযান শুরু হয়েছিল বেশ কিছু বছর আগে যখন জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে কলকাতার হৃদয়স্থল থেকে খাটালগুলি নির্বাসিত করার সরকারী হুকুমনামা বের হয়। সেই সময় নাগাদ শহরের উপকণ্ঠে সরকারী কর্তৃত্বে ডেয়ারি বা দুগ্ধশালা তৈরির জোর আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ না হলেও শহর থেকে খাটালগুলো উঠে যায় এবং আনন্দ নগর বা অনুরূপ বস্তিতে গবাদিপশুদের চালান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকারী আদেশ কার্যকর হবার পর আসল লাভ হলো কার্তিকবাবুর মতন মতলবাজদের। ন'জন মানুষের গোটা পরিবারকে ঘর ভাড়া দেবার চেয়ে একটা খাটাল তোলা অনেক লাভজনক। সমান ভাড়া এবং সমান জায়গার মধ্যে খাটাল তোলার দায়ও কম। দাবি বা নালিশ মেটানোর দায় নিতে হয় না মালিককে। কার্তিকবাবুর বাণিজ্যবুদ্ধি যে ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ দিয়েছিল উত্তরকাল।

লোকটার বেআইনি রোজগারের আরও অনেক ধান্দা আছে। সবাই জানে সে কথা। রেলের ওয়াগন-ভাঙা একটা চক্রের সংগেও তার যোগাযোগ আছে। চোরাই মাল কেনা-বেচার এই কারবারে কোনো লগ্নী নেই অথচ আয় লক্ষ লক্ষ টাকা। আর একটি নীচ কর্মের নায়ক এই লোকটা। কোনো খেদ বা কুণ্ঠা ছাড়াই এটি সে পালন করে। আনন্দ নগরের কুষ্ঠরোগীদের অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে নিপীড়ন করে এই শয়তানটা।

ছোট ছোট কুঠুরির মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা রোগকাতর মানুষগুলোর কাছ থেকে শুধু ঘরভাড়া আদায় করে সে খুশী নয়। ওদের 'আশ্রয়' দেবার অজুহাতে সে এক টাকা দু টাকা হারে শুল্ক আদায় করে। পরিবর্তে হাওড়া স্টেশনের ফুটপাতের ওপর বসে ওরা ভিক্ষে করার সুযোগ পায়। এর দরুন বেশ পাকাপোক্ত রাজনৈতিক প্রশ্রয় দরকার, কারণ এটি আইনত দণ্ডনীয়। বাজারে গুজব যে লোকটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের তহবিলে মুক্ত হাতে দানধ্যান করে এবং তাদের হয়ে ভোট যোগাড় করে। অর্থাৎ আনন্দ নগর বস্তির মধ্যে ভোটপত্রের লেনদেনটিও তার অন্যতম ব্যবসায়িক হাতিয়ার। খঞ্জ কুষ্ঠরোগীর হাতে ভোটপত্র ধরিয়ে দিয়ে লোকটা দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তির মানুষ খুশী হয়েই ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নালিশ জানাবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ না থাকায়, সময়ে অসময়ে এই মানুষটারই স্বারস্থ হতে হয় সবাইকে। ফলে আনন্দ নগরের মানুষদের কাছে কার্তিকবাবু হয়ে উঠেছে একালের রবীনহুড।

অবশ্য কোথাও হাঙ্গামা হলে সরাসরি কখনও সামনে এসে দাঁড়ায় না কার্তিকবাবু। অশোককে ব-কলমা দেওয়াই আছে তার। তবে আড়ালে বসে সে হয় সুতো নাড়ায় নয়ত গুটি সাজিয়ে তার অস্তিত্বটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এর দরুন নানারকম ফন্দিফিকির বা ছলনার আশ্রয় নিতে হয় তাকে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এসব তঞ্চকতা করতে হয় তাকে। যেমন, লোক লাগিয়ে শুঁড়িখানায় হাংগামা বাধিয়ে সে হয় অশোককে পাঠায় নয়ত নিজে এসে অবস্থা সামাল দেয়। এর ফলে বস্তির মধ্যে তার সাধু ভূমিকার দারুন প্রশংসা হয়। কার্তিক জেনেছে যে শুধু ক্ষমতাবান হওয়া নয়, লোকের চোখের সামনে ভাল থাকার বিদ্যাটাও তাকে আয়ত্ত করতে হবে। এমনকি মেয়েঘটিত কোনো কেলেঙ্কারিতে অশোক বা পরিবারের কেউ জড়িয়ে

পড়লেও মেয়ের বাপ-মার কাছে সে এত উদার হয়ে যায় যে, তারাই ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে। মোটকথা, সজ্জন এবং সৎ ও ভদ্র মানুষ হিসেবেই আনন্দ নগরে তার নামডাক।

সেদিন সকালে স্তেফানদাদার ঘরের সামনে অশোকের মোটরসাইকেলটা দেখে বস্তির লোকের মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। কে যেন বলে বেড়াচ্ছে আনন্দ নগর থেকে 'ফাদার'কে তাড়াতে চায় ওরা। কিন্তু কোভালস্কীর দোরগোড়ায় এসে যা দেখলো তাতে ওদের আশঙ্কা অমূলক মনে হলো। অশোক তখন প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে স্তেফান কোভালস্কীর পায়ের ধুলো নিচ্ছে। কোভালস্কী রীতিমত বিচলিত। 'ব্যাপার কি?'

ভক্তি গদগদ স্বরে অশোক বললো, 'ফাদার! আপনাকে অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে। সেইজন্যেই বাবা আমায় পাঠালেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ এই অনুগ্রহ কেন?'

'আজ্ঞে, তেমন কিছু নয়। বাবা আপনার সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে একটু আলাপ করতে চান। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই তুচ্ছ। তাই আপনাকে বলতে এসেছি।'

কোভালস্কী বিলক্ষণ চেনে এই দাম্ভিক ছোকরার বাবাকে। সে জানে এইসব লোকগুলোর কাছে কোনো ব্যাপারই নেহাত তুচ্ছ নয়। তবে এ নিয়ে এই অর্বাচীনের সঙ্গে অযথা বাক্যব্যয় করতেও তার প্রবৃত্তি হলো না। বরং বললো, 'ভাল কথা। আমি তৈরি। কখন যেতে হবে? এখনই?'

'না। না। এখনই নয়। বাবা যখন তখন দেখা করেন না। বরং কাল সকাল দশটায়। আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

সেই কথাই থাকলো। পরদিন সকালে অশোকের পুরুষ্টু এবং শব্দভেদী মোটর-সাইকেলের পিছনের সীটে বসে আনন্দ নগর কলোনি পেরোবার সময় কোভালস্কীর দারুণ মজা লাগলো। কোভালস্কীর মনে হলো সে যেন রাজদর্শনে চলেছে। ঠিক এই অবস্থায় প্যারিশ চার্চের যাজকমশাই ফাদার কার্দিয়েরোর চোখে পড়লে তার মুখের চেহারাটা কেমন হতো, সেটাই ভাবতে ভাবতে চললো কোভালস্কী। তা সে যাই হ'ক, সেদিন একালের এই রাজামশাইটির রাজকীয় আপ্যায়নের ঘটা দেখে কোভালস্কী রীতিমত তাজ্জব। কে জানে, সেকালে হিন্দু বা মোগল রাজারাজড়রা তাদের আদরের অতিথিদের কেমন আপ্যায়ন করতেন!

বাড়িখানাও তেমনি জমকাল। যাকে প্রাসাদোপম বলে, তাই। দরজার বাইরে তিনখানা অ্যামব্যাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি গাড়ির সঙ্গে রেডিও অ্যান্টেনা লাগানো। গাড়ির জানলাগুলো মোটা দুর্ভেদ্য কাচ ঢাকা। তিনটে মোটরগাড়ি ছাড়াও বেশ ক'টা মোটরসাইকেলও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেমন মহা-করণের সামনে রক্ষী পুলিসরা মন্ত্রীমহোদয়দের অনুগামী হবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি। ঢুকেই পেল্লায় এক হলঘর। সেটা দিয়ে পাশের বড় ঘরখানায় যেতে হয়। মেঝেয় পাতা পুরু দামী গালচে। তাছাড়া অনেকগুলো গদিমোড়া বসার আসন। এককোণে রাখা একটা কাজ-করা কাঠের তাক। তাকের ওপর নানা দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে একটা লিঙ্গমূর্তি। দেবদেবীর মূর্তির সামনে অনেকগুলো ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপের সুবাসে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

রাজামশাই বসে আছে কাঠ কুঁদে তৈরি করা সিংহাসনের মতন দেখতে একটা চেয়ারের ওপর। এটি বোধহয় রাজাসন। রাজাসনটির গায়ে সুন্দর নকশার কাজ। মাঝে মাঝে মুক্তো বসানো। লোকটা বসে আছে সম্ভ্রান্তভাব নিয়ে আমীর ওমরাহদের

মতন। লোকটার গায়ে মখমলের কালো আঙরাখা, মাথায় সাদা টুপি। চোখে পরেছে পুরু লেন্সের চশমা। চশমার কাচ রঙিন। ফলে চোখ দুটো কাচের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। তবে চোখের ভাষা পড়া না গেলেও লোমশ দুই ভুরুর ভাঁজের মধ্যে মনের ভাব ফুটে ওঠে।

বাপের মুখোমুখি গদিমোড়া চেয়ারে কোভালস্কীকে বসতে বললো অশোক। তারপর বাপের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় তখনই খাবারের ট্রে হাতে উর্দি পরা চাকর ঢুকলো। ট্রের ওপর চা মিষ্টি এবং ঠান্ডা লেমনেডের বোতল। এক বোতল লেমনেড খেল কার্তিকবাবু। তারপর চেয়ারের হাতলের ওপর কিছু একটা ভাবতে ভাবতে হাত ঠুকতে লাগলো। কোভালস্কী দেখলো লোকটার ডানহাতের তর্জনীতে জ্বলজ্বল করছে একটা মোটাসোটা পোখরাজ।

মিনিট কয়েক এইভাবে নিঃশব্দে কাটলো। হঠাৎ কোভালস্কীর দিকে চেয়ে শিষ্টাচারসম্মত স্বরে লোকটা বললো, 'আপনাকে ধন্যবাদ ফাদার। আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে। এ বাড়ি আপনার নিজের ভেবে আরাম করে বসুন।'

কার্তিকবাবুর গলার স্বর ঘড়ঘড়ে। তাই কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডান পাশে রাখা ঝকঝকে পিকদানির মধ্যে খানিকটা কফ্ ফেললো। কোভালস্কী দেখলো সে পায়ে পরেছে মুক্তো বসানো নাগরা। কফ্ ফেলে গলাটা পরিষ্কার করে সে আবার বললো, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হলো, এ আমার মস্ত সম্মান।'

ততক্ষণে আর একটা ট্রের ওপর রাঙতা মোড়া চুরুটের প্যাক নিয়ে এসেছে চাকর। প্যাক খুলে একটা চুরুট কোভালস্কীর দিকে এগিয়ে নিজে একটা নিল। বিনীতভাবে ঘাড় নাড়লো কোভালস্কী। ততক্ষণে লোকটা তার চুরুটটা ধরিয়েছে। একমুখ ধোঁয়া টেনে লোকটা বলে উঠলো, 'আপনি যথার্থই অসামান্য। মানে ঠিক সাধারণ মাপের নন।'

কোভালস্কী তাকিয়ে ছিল। লোকটা খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'শুনলাম, কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভারতীয় নাগরিক হবার জন্যে আবেদন করেছেন? আমার ত বিশ্বাসই হয়নি শুনে।'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন।'

মুখ চেপে একটু হেসে লোকটা চেয়ারে আরাম করে বসে বললো, 'তা ভাল। তবে সব শুনে আমাদের খুব অবাক লেগেছে। একজন বিদেশী তাঁর টাকা-পয়সা, মানমর্যাদা, সামাজিক প্রতিপত্তি, সব ছেড়েছুড়ে একজন গরিব বস্তিবাসী হয়ে এদেশে থাকতে চাইছে? এ যেন ভাবতেই পারি না আমরা! তাই না?'

'কি জানি! তবে বোধহয় টাকা-পয়সা, মান-মর্যাদা বা সামাজিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আপনার আমার ধারণাটা একরকম নয়।'

জবাব শুনে লোকটা একটু থমকে গেল। তবুও বললো, 'মোট কথা, এটা আমার কাছে মস্ত গৌরবের ব্যাপার যে আপনার মতন মানুষকে আমার স্বদেশবাসী হিসেবে পাচ্ছি। আর একটা কথা; আপনার আবেদনে সাড়া পেতে যদি অকারণ দেরি হয়, আমায় জানাবেন। ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি নিশ্চয়ই আপনার জন্যে চেষ্টা করবো।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার ভরসা ঈশ্বর।'

কোভালস্কী শান্ত জবাবটা শুনে মনে মনে যেন জ্বলে উঠলো লোকটা। সে ভাববার চেষ্টা করলো যা শুনেছে তা সত্য না মিথ্যে! এ কি সম্ভব যে তার

অনুগ্রহটা এমনভাবে ফিরিয়ে দেবার সাহস আছে কারো? শেষ পর্যন্ত এই লোক-টার কাছে সে যেচে মান খোয়াল? চশমার আড়ালে তার চোখদুটো তখন হিংস্র হয়ে উঠেছে। একটা ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'শুনুন ফাদার। সবাই বলাবলি করছে আপনি নাকি বস্তির মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের একটা হাসপাতাল বানাবেন? গুজবটা কি সত্যি?'

'খানিকটা সত্যি।' কোভালস্কীর স্বর আগের মতনই শান্ত। একটু থেমে সে আরও বললো,'তবে হাসপাতাল বলতে যেমন জমকাল কিছু বোঝায় তেমন নয়। বলতে পারেন একটা ছোটখাট ডাক্তারখানা খুলতে চাই। যে সব রোগীদের অবস্থা খুব খারাপ, তাদেরই চিকিৎসা হবে সেখানে। মাদার টেরেসা দু-তিনজন সিস্টার পাঠাবেন বলেছেন।'

লোকটা রীতিমত রুষ্ট চোখে কোভালস্কীকে দেখছিল। এবার কঠিন স্বরে বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমার অনুমতি ছাড়া আনন্দ নগরের কুষ্ঠ-রোগীদের সম্বন্ধে কেউ কোনো দায় নিতে পারে না।'

'সেক্ষেত্রে আপনিই বা দায় নিতে এগিয়ে আসছেন না কেন? আপনার সাহায্য আমরা মাথা পেতে নেব।'

লোকটার ভুরুর ভাঁজ তার মোটা চশমার আড়াল থেকেও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে সে বললো, 'আনন্দ নগরের কুঠেরা বারো বছর ধরে আমারই আশ্রয়ে আছে। তারাও ভাল করেই জানে যে কার আশ্রয়ে তারা বেঁচে-বর্তে আছে। আমি না থাকলে বস্তির অন্য অধিবাসীরা ঢের আগেই ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিত এখান থেকে।'

লোকটা চুপ করলো। তারপর গলার স্বর নামিয়ে কোভালস্কীকে দলে টানার মতলব নিয়ে সামনে ঝুঁকে বললো, 'কুঠেরা রোজ ডাক্তারখানায় যাতায়াত শুরু করলে আশেপাশের লোকেদের মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া হবে জানবার চেষ্টা করেছেন?'

কোভালস্কী যেন একটুও বিচলিত হলো না। তেমনি শান্ত স্বরেই বললো, 'ওরা আমার ভাই। ওদের মনে দয়া-মায়া আছে। কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না ওদের। সে বিশ্বাস আমার আছে।'

কার্তিকবাবু ততক্ষণে রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থাতেই ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো, 'অঃ! দয়া-মায়া, করুণা! আপনারা সাধু মানুষেরা কথাগুলো খুব বলেন। তা দেখবেন, দয়া দেখাতে গিয়ে না দাঙ্গা বেধে যায়! তখন একদিকে ডাক্তারখানা জ্বলবে, অন্যদিকে রোগী পেটাই শুরু হয়ে যাবে। কাকে সামলাবেন?'

লোকটার নির্লজ্জ হৃদয়হীন কথাটা শুনতে শুনতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল কোভালস্কী। জবাব দেবার প্রবৃত্তি হলো না। তবে বেহায়া হলেও শয়তানটার কথাই হয়ত ঠিক। তেমন লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেতেও পারে।

কোভালস্কীকে খুব গভীরভাবে দেখছে কার্তিক। চুরুটটা নিভে গেছে। লাইটার জ্বালিয়ে সেটা ধরাবার পর একটা লম্বা টান দিল সে। তারপর চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে বসে বললো, 'একটাই উপায় আছে ঝঞ্ঝাট এড়াবার।'

'কি উপায়?'

'আপনাকে একটা চুক্তি করতে হবে আমার সঙ্গে। ওদের নিরাপত্তা চুক্তি।'

'নিরাপত্তা চুক্তি?' কোভালস্কী রীতিমত স্তম্ভিত। বলে কি লোকটা?

কার্তিকবাবু ফের বললো, 'এর দরুন আপনার খরচ হবে মাসে তিন-হাজার

টাকা। আমাদের দর একটু চড়া। তবে সেটা সাধারণ লোকের বেলায়। আপনি ভদ্র মানুষ, আপনার কাছে সেই দর নেব না। নিশ্চয় জানেন যে ভারতীয়রা ভদ্র মানুষ-দের ভক্তি শ্রদ্ধা করে, কি করে তাদের মানসম্মান রাখা যায় আমরা তা জানি।'

কথাটা বলেই লোকটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। কোভালস্কীর জবাব শোনার তর সইল না তার। তাড়াতাড়ি দুহাতে তালি দিল। অশোক ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। বাপবেটায় কি কথা হলো চোখে চোখে। তারপরেই কার্তিকবাবু সাড়ম্বরে বলে উঠলো, 'শোনো! ফাদারের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও হয়েছে। এখন ওঁর সঙ্গে বসে শর্তটর্তগুলো ঠিকঠাক করে নেবে তুমি।'

লোকটার কথায় আত্মতুষ্টির ভাবটা বেশ স্পষ্ট। তাই ঘটা করে জানিয়ে দিল যে চুক্তির শর্তটর্তের খুঁটিনাটি নিয়ে সে একটুও ভাবছে না। মানুষটা সজ্জন বৈকি!

সেদিন সন্ধ্যাতেই পারস্পরিক সহায় কমিটির জরুরী মিটিং বসলো স্তেফান কোভালস্কীর ঘরে। আনন্দ নগর ধর্মপিতার হুমকির কথাটাই ওরা আলোচনা করতে এসেছে। বেশ দৃঢ়তা নিয়ে সালাউদ্দিন বললো, 'আজ্ঞা করেন ত একটা কথা বলি।' খানিক চুপ করে সে ফের বললো, 'ওদের বল্ ক্ষ্যামতা ঢের। আগের বার ভোটের সময় কি হয়েছিল মনে নেই? বোমা, ডাণ্ডাবাজি, খুনখারাপি কি হয় নি! ক'টা কানা-খোঁড়া আধমরা মানুষের জন্যে আবার নতুন করে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়া কি উচিত? টাকা আমাদের দিতে হবেই।'

মার্গারেটার মতটাও একরকম। সেও বললো, 'শুধু চিকিৎসার জন্যে ওদের পেছনে মাসে তিন হাজার টাকা ব্যয় করা অসংগত।'

কোভালস্কী চুপ করে ছিল। একসময় বললো, 'কোনটা অসংগত? টাকাটা না ওদের চিকিৎসা করাটা?'

মার্গারেটা একটু অবাক হয়ে তাকালো কোভালস্কীর দিকে। তারপর বললো, 'নিশ্চয়ই টাকাটা!'

কোভালস্কী স্তব্ধ। এইকরমই সাদামাটা একটা উত্তর সে যেন আশা করেছিল। মজার কথা, বস্তির জীবনেও উৎপীড়ন আছে, দুর্নীতি আছে এবং এদের গায়ে মাছির মতন সেঁটে গেছে সেগুলো। বন্দনা ছাড়া আর সবাই সালাউদ্দিনের প্রস্তাব-টাই মেনে নিল। বন্দনাই জোর দিয়ে বললো, 'জাহান্নমে যাক লোকটা। একথা ঠিক, আমরা যদি একটা টাকাও দিই সেটাও অপাত্রে দেওয়া হবে। আমাদের দরিদ্রনারায়ণ সেবার নীতির অসম্মান হবে।'

বন্দনার কথা শুনে কোভালস্কী যেন প্রেরণা পেল। মার্গারেটা আর সালা-উদ্দিনের দিকে চেয়ে সে বললো, 'বন্দনা ঠিক কথাই বলেছে। ওদের স্পর্ধার জবাব দিতে হবে আমাদের। এটা আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া অসহায় মানুষগুলোও জানবে যে সংসারে তারা একা নয়। তাদের পাশেও দাঁড়াবার মানুষ আছে। একাজ আমাদের এখনই করতে হবে।'

পরদিন ভোরেই ভট্‌ভট্ শব্দ করতে করতে অশোকের মোটরসাইকেল কোভালস্কীর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। বাপের কথামত চুক্তির খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলতে এসেছে সে। কিন্তু কোভালস্কীর সঙ্গে মাত্র ক'টা সেকেন্ড কথা হলো তার। এই সময়টুকুর মধ্যেই কোভালস্কী তার মতামত জানিয়ে দিয়েছে। এই প্রথম

ওরা দারুণ ধাক্কা খেল যেন। আনন্দ নগরের সর্বশক্তিমান মানুষটাকে আর কখনও প্রত্যাখ্যাত হতে হয় নি। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে তাচ্ছিল্য করার স্পর্ধা দেখায় নি।

এক হপ্তা পরের ঘটনা। আনন্দ নগরে ছোট্ট এক সেবাশ্রম খোলা হয়েছে। সেদিন ভোরেই কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে বন্দনা গেল কোভালস্কীর নির্দিষ্ট ছজন রোগীকে সেবাশ্রমে আনতে। ভোরে উঠেই কোভালস্কী নিজে গেছে মাদার টেরেসার হোম থেকে তিনজন সিস্টার আনতে। কিন্তু মসজিদের কাছাকাছি পৌঁছতেই হাতে লাঠিসোঁটা আর লোহার রড নিয়ে বন্দনার পথ আটকে দিল ক'টা ছোকরা। ওদের যে নেতা তার সবে গোঁফ উঠেছে। বয়ঃসন্ধির কাল। সারা মুখে ব্রণ। এই বয়সেই সামনের ক'টা দাঁত নেই। ছোঁড়াটা বন্দনার দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে বলে উঠলো, 'খবর্দার! কেউ এক পা এগোবে না।'

ছোঁড়াটার হুকুম অগ্রাহ্য করে যেমনি সে কয়েক পা গেছে, অমনি এক ঝাঁক কিল চড় বৃষ্টিপাতের মতন বন্দনার গায়ে এসে পড়লো। থমকে গেল বন্দনা। উল্টোদিক থেকে তখন কোভালস্কীও এসে পড়েছে সিস্টারদের নিয়ে। গলির মুখে হাঙ্গামাটা চোখে পড়তেই সে দাঁতে দাঁত ঘষলো। হঠাৎ কাছাকাছি একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো, সঙ্গে আর্তনাদ। ততক্ষণে আর এক হাঙ্গামাকারী দল ঘটনাস্থলে এসে পড়েছে। হাতে লোহার ডান্ডা আর গাঁইতি নিয়ে পুরনো ইস্কুলবাড়িটা ভাঙচুর করতে লাগলো ওরা। এই বাড়িতেই কুষ্ঠ সেবাশ্রম তৈরি হয়েছে। আশপাশের দোকানদারেরা ভয়ে জানলার সার্সী ফেলে দিল। গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের দোকানঘর থেকে সাটার ফেলার আওয়াজ আসছে। কুষ্ঠাশ্রমটা মনের মতন ভাঙচুর করে ওরা ভারি খুশী। ইতিমধ্যে তিন নম্বর দল এসে পড়লো। তাদের কাঁধে চামড়া বাঁধাই ঝোলা। ঝোলার মধ্যে নানারকম বিস্ফোরকের সরঞ্জাম। ভয়ংকর চেহারার যুবকদের দেখেই রাস্তা জনমানবহীন হয়ে গেল। খাঁ খাঁ করছে পরিত্যক্ত গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড। রাস্তার নেড়ীকুত্তারাও ভয়ে মুখ লুকিয়েছে। হঠাৎ শুরু হলো একের পর এক বিস্ফোরণ। থরথর করে কেঁপে উঠলো আশপাশের অঞ্চল। বিস্ফোরণের শব্দ আনন্দ নগর ছাড়িয়ে পেঁৗছে গেছে রেল লাইন পর্যন্ত বা তারও ওপারে। স্তেফান কোভালস্কীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সিস্টার তিনজন চীৎকার করে যীশুর নাম জপ করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি মেয়েগুলোকে গোডার আশ্রয়ে রেখে কোভালস্কী ছুটলো অকুস্থলের দিকে। হঠাৎ তার মনে হলো কেউ যেন মিনতি করে তাকে ডাকছে। ঘাড় ঘুরিয়ে কোভালস্কী দেখলো উন্মাদিনীর মতন তার দিকে মার্গারেটা ছুটে আসছে। কোভালস্কীকে ফিরে তাকাতে দেখে মেয়েটা মিনতি করে বলে উঠলো, 'স্তেফানদাদা! ঈশ্বরের দোহাই! আর এগোবেন না। ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে!'

তখনই ওরা দেখলো বস্তির পাশের রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল আসছে এই দিকে। মিছিলের সামনে লাল শালুর ওপর হিন্দি, উর্দু এবং ইংরিজিতে লেখা কোভালস্কী-বিরোধী স্লোগান। 'আনন্দ নগরে আমরা কুষ্ঠ হাসপাতাল চাই না।' একজনের হাতে মাইক্রোফোন। সে ক্রমাগত চেঁচিয়ে বলে চলেছেঃ 'একজন কুষ্ঠ-রোগীও এখানে থাকবে না।' 'ফাদার তুমি ফিরে যাও!' ইত্যাদি।

বিক্ষোভকারীরা কেউ এখানকার মানুষ নয়। তবে এতে অবাক হবারও কিছু-নেই। কলকাতা হলো পেশাদার বিক্ষোভকারীদের বৃহত্তম ভাণ্ডার। যে কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা প্রতিষ্ঠান দৈনিক পাঁচ-ছ' টাকার বদলে এমন কয়েক হাজার ভাড়াটে বিক্ষোভকারী যোগাড় করতে পারে। ফলে সকালে যে মানুষগুলো লাল

ঝাণ্ডা নিয়ে বেরিয়েছে, তারাই বিকেলে তেরঙা ঝাণ্ডা নিয়ে বেরোয়। যে শহরটা অভাব, অভিযোগ আর নালিশে ক্রমাগত ফুঁসছে, তার একটা নির্গমন পথ থাকা দরকার। এই মিছিলওলারাই সেই কাজটি সম্পন্ন করছে। কোভালস্কী-বিরোধী দলটার হাতে কংগ্রেস ঝাণ্ডা দেখেই স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা যোগা বান্দারকর প্রতিপক্ষ মিছিল বের করার প্রেরণা পেল যেন। বত্রিশ বছর বয়সের বান্দারকর একসময় হিন্দুস্থান মোটর্সের একজন ফোরম্যান ছিল। চাকরি থেকে উৎখাত হওয়া এই মানুষটা রীতিমত করিৎকর্মা পুরুষ। সে তাড়াতাড়ি স্থানীয় বেশ কিছু কমরেডদের জড়ো করে একটা পাল্টা মিছিল সংগঠন করে ফেললো। দেখতে দেখতে বস্তির রাস্তা এবং বিশাল গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডটিতে লাল ঝাণ্ডা এবং তেরঙা নিশান পতপত করে উড়তে লাগলো। দুই বিপক্ষ শিবিরের সমর্থকদের ভিড়ে আর স্লোগানের গর্জনে সারা অঞ্চলটা তখন যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে। মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে উঠলো রাজনৈতিক।

এই ধরনের ঘটনার পরিণতি কি হয় তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ নেই, কারণ, সবাই তা জানে। সামান্য বচসা থেকে যেমন তুলকালাম কলহের সূত্রপাত হয়, তেমনি কলহ থেকেই পাড়া জুড়ে দাঙ্গা বেধে ওঠে। এই দ্বন্দ্বদীর্ণতার ফলভোগ করে নিরীহ মানুষ। তারা কেউ মরে, কেউ আহত হয়। যেদিন হতভাগ্য এক পাগলিনীকে অনেক মানুষের পীড়ন থেকে কোভালস্কী বাঁচিয়েছিল, সেদিনই বুড়ো সূর্য তাকে মানুষের বীভৎস তাণ্ডব আচরণের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানায়। সে যা বলেছিল তার মর্মার্থ এইরকম :

চিরকাল মাথা হেঁট করে, সব স'য়ে থাকতে হবে আপনাকে। আপনার নালিশ থাকবে না, অভিযোগ থাকবে না। যে আপনাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কাজে লাগাচ্ছে, যে আপনার রক্ত শুষছে চালের দাম বাড়িয়ে, আপনার বাঁচার জন্যে যে মালিক একটা চাকরি দিচ্ছে না, আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে যে প্রতিবেশী, যে রাজনৈতিক দাদারা আপনার সর্বস্ব লুঠ করেও কিছু দেয় না, শুধু মন্ত্রপড়ার জন্যে যে পুরুত দশটাকা মজুরী নিচ্ছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমিয়ে রাখবেন আপনি। আপনার সারা গায়ে কাদা লাগবে, পচা দুর্গন্ধ গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াবেন আপনি। পোকামাকড় ইঁদুর বেড়াল নিয়ে আপনি ঘর করবেন। হঠাৎ একদিন সুযোগ আসবে আপনার। জমানো ক্ষোভের বিস্ফোরণ হবে। আপনি চীৎকার করবেন, ভাঙবেন-চুরবেন, আপনি ঘর জ্বালাবেন, সুখের সংসার তছনছ করবেন, আপনি হত্যা করবেন নির্দ্বিধায়। কেন এমন করলেন আপনি জানবেন না। অথচ তিলতিল করে এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি আপনাকে গ্রাস করে নেবে।

সমাজ ব্যবস্থা যেখানে এত নির্মম সেখানে মানুষের রোশবহ্নি প্রায়ই কেন জ্বলে ওঠে না সেটাই আশ্চর্য লাগে কোভালস্কীর কাছে। কতবারই সে দেখেছে যে বস্তির মধ্যে ধস্তাধস্তি হাতাহাতির চড়া অবস্থাটা কেমন অবিশ্বাস্যভাবে শিথিল হয়ে নিরীহ বচসায় নেবে এসেছে। যেন আনন্দ নগরের সব নিরীহ ভাল মানুষরাই ঘটনার মন্দ পরিণতি দেখতে চায় না। যেন সবাই বুঝে নিয়েছে এই খুনোখুনি মারামারির কি ভয়াবহ দাম তাদের দিতে হবে। দেশভাগের আগের সেই সব উচ্ছৃঙ্খল নারকীয় দিনগুলোর কথা কেউ ভোলে নি। নকশাল আন্দোলনের সেই জ্বলন্ত দিনগুলোর কথা এখনও তাদের স্মৃতিতে দগদগে হয়ে আছে।

তবুও সেদিন সকালবেলার সেই উত্তপ্ত ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলো। কোথাও শাসন, সংযম নেই। সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে পাশবপ্রবৃত্তির

আড়নায়। স্ত্রী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধা নির্বিচারে মারণযজ্ঞে মেতে উঠেছে সবাই। চওড়া গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের দুপাশ থেকে যুযুধান দুটি মিছিল এগিয়ে আসছিল পরস্পরের দিকে। হঠাৎই শুরু হয়ে গেল বোমাবর্ষণ। রাস্তার দুপাশের বাড়ির ছাত থেকে তখন বৃষ্টিধারার মতন ঝরে পড়ছে শক্তিশালী মলোটভ ককটেল। কোভালস্কীর চোখের ওপর ভেসে উঠলো তার বাবার রক্তঝরা মুখখানি। ১৯৪৭-এর এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় পুলিস ও ধর্মঘটী খনিকর্মীরা মেতে উঠলো সর্বনাশা যুদ্ধে। কোভালস্কীর মনে হলো আজকের লড়াই সেদিনের চেয়েও ভয়াবহ। এই প্রথম ওদের মুখচোখে প্রতিহিংসা আর ঘৃণার যে আগুন সে জ্বলতে দেখলো, তা বুঝি কখনও নিভবে না। এটা সেই পুরোনো আগুনের ধিকিধিকি আঁচ যা সে ভেবেছিল বুঝি চিরতরে নিভে গেছে। ঘেন্না আর অসূয়ায় ওদের মুখগুলো বেঁকে গেছে। চোখদুটো ভাঁটার মতন জ্বলছে। ওরা ছুটে যাচ্ছে বিকট মূর্তি নিয়ে। কুৎসিত, কদাকার রাক্ষস প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটে যাচ্ছে সংহার করতে। আটকে পড়া বাচ্চাদের দিকে বারুদভরা বোতল ছুঁড়ে দিয়ে খল্‌খল্‌ করে হাসছে। যাত্রীভরা বাসের গায়ে আগুন লাগিয়ে উল্লাসে নাচছে। ফাঁদে পড়া বুড়োদের দিকে হা হা করে তেড়ে যাচ্ছে। বস্তির মেয়েরাও নিষ্ঠুর মারণক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। কোভালস্কী ওদের অনেককেই চিনতে পারলো, যদিও ওদের বিকৃত মুখচোখ দেখে সহজে ওদের চেনা যায় না। বস্তির লোকগুলোর আজ আর বিচারবুদ্ধি নেই। ওরা যেন সত্তাহীন জড়প্রকৃতি হয়ে উঠেছে। কোভালস্কী যেন সেই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যেদিন কলকাতার গরিব মানুষেরা ধনীদের ওপর হামড়ে পড়বে। না জানি সেই চিত্রটি আরও কত সর্বনাশা হবে!

হঠাৎ শিসের শব্দ কানে যেতেই কোভালস্কী চকিত হলো। পরক্ষণেই হাওয়ায় ঝাপটা তুলে একটা পেট্রল বোমা ফেটে পড়লো ওর পাশে। হাওয়ার সেই ঝাপটা এত তীব্র যে কোভালস্কী এবং মার্গারেটা দুজনেই ছিটকে পড়লো দুজনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জমাট ধোঁয়ায় ঢেকে গেল দুজনে। যখন ধোঁয়া কাটলো ওরা সবিস্ময়ে দেখলো অনেক মানুষের ভিড় ওদের ঘিরে। কোভালস্কী বুঝতে পারলো যে আহত না হয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম করুণা। লড়াইটা তখন সাময়িক থেমেছে। এই সাময়িক বিরতি সব যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘটে। নইলে লুণ্ঠন বা অপহরণ নামক এক অতি প্রাচীন আনুষ্ঠানিক রীতির উদ্‌যাপনের সুযোগ পায় না হত্যাকারীরা। সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল ইঁটপাথর এবং বোমা বৃষ্টি।

মানুষের এই হিংস্রতা তখন প্রায় বিকারে পৌঁছে গেছে। কেউ আর প্রকৃতিস্থ নেই। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে আহত মানুষের কাতরানির শব্দ। ড্রেনের পাশে পড়ে থাকা একটা গোলা হাতে নিতে গেল একটা বাচ্চা। তখনই সশব্দে ফেটে গেল সেটা। কোভালস্কী সভয়ে দেখলো বাচ্চাটার ডান হাতটা উড়ে গেছে। এর কয়েক মিনিট পরেই কোভালস্কী আতঙ্কিত হয়ে দেখলো মার্গারেটার মাথা তাক্‌ করে একটা লোহার ডান্ডা নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে মার্গারেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে। ইতিমধ্যে একটা খুনে গুন্ডা বাঁকানো তলোয়ার নিয়ে ওদের দিকে ধাওয়া করে আসছিল। যখন কোপটা দিতে উদ্যত হয়েছে সে, তখনই একটা শক্ত থাবা পড়লো লোকটার ঘাড়ে, তারপর হেঁচকা টানে খুনেটাকে পেছন দিকে ছুঁড়ে দিল কেউ। কৃতজ্ঞ কোভালস্কী দেখলো যে তার রক্ষাকর্তা মেহবুব। ওর হাতেও একটা লোহার ডান্ডা। ওর বিবি মরে যাবার পর থেকেই লোকটা কেমন যেন বেসামাল

হয়ে যায়। বুড়ো আম্মার জিম্মায় ছেলেমেয়েদের রেখে সে কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার ফিরে এসেছে কার্তিকের বশংবদ হয়ে। মাস্তানচক্রের অবিসংবাদিত নেতার ছায়া-অনুচর সে, তার অনেক কুকর্মের অংশীদার। কিন্তু আজ সে কোভালস্কীরও পরিত্রাতা। মেহবুবের কপালে আর নাকে গভীর ক্ষত। রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। ঘরে টাঙানো যীশুর ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল কোভালস্কীর। রক্তঝরা মেহবুবের মুখখানা ঠিক যেন যীশুর মুখ। তার মনে পড়ে গেল সেই পুরনো কথাগুলো। কতদিন তার ঘরে এসে যীশুর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতো মেহবুব! ততক্ষণে ওর চারপাশ ঘিরে আবার শুরু হয়ে গেছে সেই আদিম মারণযজ্ঞের তাণ্ডব।

কোভালস্কী অবাক হয়ে দেখলো যুবকরাই যেন এই মারণযজ্ঞের সবচেয়ে উৎসাহী খুনে। হাসতে হাসতে মানুষ খুন করছে তারা। ছবিটা দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো তার। এ কি নির্দয় খেলা ওদের! একটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে অবলীলায় তার হাতের ছুরিটা একজন স্ত্রীলোকের পেটে ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা ছটফট করতে করতে মাটিতে পড়েই স্থির হয়ে গেল। তখনই সে প্রথম দেখতে পেল কালো চশমা পরা অশোকের আবছা মূর্তিটা। ঘটনাস্থলে এই তার প্রথম আবির্ভাব। দুষ্কৃতকারীদের সামনে ডেকে সে কিছু নির্দেশ দিল। কোভালস্কীর মনে হলো এবার অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না কোভালস্কীকে। যেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় হত্যালীলা হঠাৎ থেমে গেল। লোকগুলো নিজের নিজের মারণাস্ত্র গুছিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেখান থেকে। কয়েক মিনিট পরেই আবার যেন সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। শুধু আহত মানুষগুলো তখনও কাতরাচ্ছে। এখানে ওখানে জড়ো হয়ে আছে ইঁট, কাঠ, পাথরের স্তূপ। বাতাসে ভারি হয়ে ঝুলে আছে পোড়া বারুদের কটু গন্ধ। এই নিদর্শনগুলোই বলে দেয় যে একটু আগেই এখানে ঘটে গেছে এক নারকীয় হত্যালীলা। মানুষের কল্যাণবুদ্ধি তখন ফিরে এসেছে। যে ক্ষতি অপূরণীয়, তা এবার নিবৃত্ত হলো।

বলাবাহুল্য, দুষ্কৃতিচক্রের প্রধান সেই সর্বশক্তিমান পুরুষটির প্রতিহিংসা-স্পৃহা আজ তৃপ্ত। বস্তির অবাধ্য মানুষগুলোকে সে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল তা দিতে পেরেছে বলেই তার তৃপ্তি। স্তেফান কোভালস্কী নামক ওই বিদেশী ধর্ম-ধ্বজী একরোখা মানুষটাকে সে উচিত শাসন করতে পেরেছে। অন্তত আনন্দ নগরের আর কোনো অবাধ্য মানুষ তাকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস পাবে না, কিংবা সাজা না পেয়ে ছাড়া পাবে না।

সাতচল্লিশ

'উয়াদের গালভরা কথা, পিতিজ্ঞে আর লাল ঝাণ্ডার ফাঁদে আটকে গেচিলুম গো! তা ভোটে উয়াদের জেতালুম অই কারণেই। এখন অরা দিব্যি আমাদের দিকে পিছন ফিরেচে। আমাদের কথা মনেও হয় না অদের।'

হাসারি পালের ধারণাটি নেহাত ভ্রান্ত নয়। নির্বাচনে জয়জয়কার হয়েছে কমিউনিস্টদের। ওরা সরকার গঠন করতে পেরেছে গরিব মানুষের ভোট পেয়েই। কিন্তু ক্ষমতায় বসেই ওরা দিব্যি সব কথা ভুলে গেল। আইন করে জানিয়ে দিল

যে, লাইসেন্সবিহীন একখানা রিক্সাও রাজপথে চলবে না। তেমন গাড়িগুলি যে শুধু আটক করা হবে তা নয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। অথচ এই মানুষগুলোই গরিব মানুষদের অধিকার আর ন্যায়বিচার নিয়ে একদিন গালভরা বুলি আওড়েছে। বড়লোকদের বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে ক্ষেপিয়েছে, মালিকের জুলুমের প্রতিবাদ করতে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছে। এখন এরাই ওদের জীবনসংগ্রামের হাতিয়ারটা কেড়ে নিতে চায়। একটা রিক্সা জ্বালিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো পাকা ধানে মই দেওয়া। কিন্তু এমন একটা অসৈরন হুকুম ওরা দিল কেন? এতে লাভ কার? মালিকরা নিশ্চয়ই এই পাগলামির বলি হবে না? তাহলে? রোজ ছ'টাকা হারে ভাড়ার টাকায় মালিকদের সর্বগ্রাসী ক্ষিদে মেটে না। ওদের পেট ভরাবার অন্য আয়োজন আছে। কিন্তু রিক্সাওলাদের বেলায় অন্যরকম ব্যবস্থা। ভগবান জানেন কত মর্মান্তিক তা হতে পারে। রিক্সার চাকা না ঘুরলে অচল হবে সংসার। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবার সামিল হবে তা।

হাসারির স্বভাব হলো সবকিছুরই কারণ খুঁজে বের করা। তাই চেষ্টা থামালো না সে। কিন্তু সকলের সব ব্যাখ্যাই তার তেমন মনঃপূত হলো না। গালকাটা সেই লোকটা বললো সরকারী বাবুরা নিজেরাই বেনামে অনেক রিক্সাগাড়ির মালিক। কোনরকমে লাইসেন্স যোগাড় করতে পেরে ওরা ধরাকে সরা-জ্ঞান করছে। বাবুরা প্রতিযোগিতা চাইছে না বলেই এমন একটা নিয়ম করেছে সরকার। ওদের রিক্সা ইউনিয়নের সেক্রেটারী গোলাম রসুলের ধারণাটা একটু অন্যরকম। এই ক'দিনের ঘোরাঘুরিতে লোকটার অবস্থা হয়েছে নীড় হারা পাখির মতন। কমিউনিস্ট বাবু-দের সঙ্গে মিশে মানুষটার মাথা নানারকম উদ্ভট কল্পনায় ঠাসা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সে এমন সব কথা বলে যা হাসারির মতন সরল মনের মানুষ বুঝতে পারে না। অবশ্য সে-জন্যে রসুলকে দায়ী করতে চায় না হাসারি। সে জানে তারই অক্ষমতা এটা। সংসার সামাল দিতেই হিমসিম খাচ্ছে সে। বুদ্ধির চর্চা করার সময় কই তার?

রসুল তাকে বোঝাল যে এই নির্দয় আইনের প্রবর্তক হলো বিশেষজ্ঞ যন্ত্র-বিদরা। রিক্সাওলাদের তারা দ্বেষ করে, কারণ সরকারী অনুগ্রহের মুখ-চাওয়া হয়ে নেই রিক্সাওলারা। সরকারী নিয়ম-নীতির হস্তক্ষেপের বাইরে তারা দিব্যি জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছে। সরকার বা বাবুদের ওপর তারা একটুও নির্ভর করে বসে নেই। অর্থাৎ এককথায় রিক্সাওলারা কিছুটা স্বাধীন বৃত্তিধারী। কিন্তু তাতে কি এসে গেল? হাসারি তা বুঝলো না। 'সরকার কি খেতে না পাওয়া বস্তির বেকার মানুষদের ডেকে ডেকে কাজ দিচ্ছে?' তবে হাসারির সংশয় হলেও নিজের মতামত সম্বন্ধে রসুলের একটুও সংশয় নেই। হাসারিকে সে বুঝিয়ে দিল যে আগামী দিনের কলকাতার যে কল্পচিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে রিক্সার ঠাঁই হবে না। প্রাসাদ-নগরী সমৃদ্ধ হবে শিল্পনগরীরূপে। স্থপতির কল্পনায় মানুষ নামক ঘোড়াদের স্থানটি অধিকার করবে যন্ত্রেরা। এক লক্ষ গরিব মানুষের ঘামঝরা মেহনত যা দিতে পারবে না, তা দেবে পাঁচ হাজার বাস বা ট্যাক্সি। কেন তা বলে দিতে হবে না। শহরের মানুষ টানা রিক্সাগাড়িতে প্রতিদিন যত যাত্রী যাতায়াত করে, সেই সমপরি-মাণ যাত্রী পাঁচ হাজার বাস এবং ট্যাক্সি চড়েই দিব্যি আরামে গমনাগমন করবে। শুধু তাই নয়, সহযোগী শিল্পগুলিও সমৃদ্ধ হবে। বেশি সংখ্যায় মোটরগাড়ি তৈরি হবে। টায়ার কোম্পানির উৎপাদন বাড়বে। বেশি পরিমাণে তেল বিক্রি হবে এবং গ্যারেজের সংখ্যাও বাড়বে। তাছাড়া দূষণজনিত রোগবৃদ্ধির ফলে ওষুধ

কোম্পানিগুলিরও বাড়বাড়ন্ত হবে। মোটকথা, দেশ এগোবে আরও দ্রুততালে।
কারণ যাই হ'ক, সরকারী হুকুমের নড়চড় হলো না। লাইসেন্সবিহীন রিক্সা-গাড়িগুলো বাজেয়াপ্ত হয়ে থানায় চালান যেতে লাগলো। রিক্সাওলারা তখন পুলিসের নজর এড়িয়ে অলিগলিতে যাতায়াত শুরু করেছে। কিন্তু তাতেও রেহাই হলো না। পুলিসের লোকজন স্ট্যান্ডে এসে হামলা শুরু করলো।
স্ট্যান্ডে এসে প্রায়ই তারা রিক্সাওলাদের ওপর জুলুম করতো। লাইনে দাঁড়ানো প্রথম রিক্সাওলার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিসের অফিসার হুকুম করতো।
'এই! তোর লাইসেন্স দেখা!'
'আজ্ঞে! আমার ত লাইসীন নেই!'
ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল রিক্সাওলা। তারপর পরনের ধুতির ভাঁজ খুলে হয়ত ক'টা ময়লা টাকা বের করলো। কিন্তু পুলিস অফিসারের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এখন দিনকাল বদলেছে। ঘুষ বা বকশিশের যুগ আর নেই। এখন তারা শুধু সরকারী কর্তব্য পালন করে। তবে যাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, তারা কোনো উত্তরই দেয় না। শুধু ঘাড় নাড়ে। এ সবই কর্মভোগ। এরপর পুলিস অফিসারের নৈতিক কর্তব্য শুরু হয়। ধরা পড়া রিক্সাগাড়িগুলো একত্র করে সে থানায় টেনে নিয়ে চললো। থানার সামনের ফুটপাতের ওপর সাপের মতন একে'বে'কে গাড়ি-গুলো জড়ো করা হয়েছে। চাকার সঙ্গে লোহার চেন দিয়ে গাড়িগুলো পরপর বাঁধা। এইভাবে অবহেলায় পড়ে থাকা নিঃসঙ্গ গাড়িগুলো দেখলে মনে বড় ব্যথা লাগে। হায় হায় করে মন। যেন ঝড়ের তাণ্ডবে উপড়ে পড়া ক'টা গাছ, কিংবা জেলের জালে আটকে পড়া মাছ।
দলবল নিয়ে থানায় গিয়ে সব দেখেশুনে ভারি মনোকষ্ট পেল হাসারি। এ কি হাল হয়েছে গাড়িগুলোর! তবে পুরোপুরি হতাশ হলো না হাসারি। অন্তত যে ক'দিন গাড়িগুলো থানায় পড়ে থাকবে, সে ক'টাদিন ওরাও ধিকিধিকি আশা নিয়ে বাঁচবে যে হয়ত আবার ওদের জীবিকার অবলম্বন ফিরে পাবে। কিন্তু তেমন ছলনা বেশিদিন টিকলো না। খুবই তাড়াতাড়ি আশার ইমারত ভেঙে গেল।
ক্রোক করা রিক্সাগুলো নষ্ট করার রায় দিয়েছে আদালত। তাই একদিন সন্ধ্যে-বেলা কর্পোরেশনের জঞ্জাল গাড়ির মধ্যে বোঝাই হয়ে কোনো এক অজানা গন্তব্যে চালান হলো রিক্সাগাড়িগুলো। রসুল একজন চর লাগিয়ে দিয়েছিল ওদের পেছনে। সে লোকটা ফিরে এসে জানালো যে চামারপট্টির পিছনের ধাপার মাঠে সেগুলো জড়ো করা হয়েছে। চরটা আরও বললো যে হয়ত গাড়িগুলো ওরা জ্বালিয়ে দেবে। সবাই শুনে দারুণ মুষড়ে পড়লো প্রথমটা। কিন্তু পরে মনে হলো এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে ওরা।
দূরে দূরে থাকার জন্যে রিক্সাওলাদের চট করে জড়ো করা যায় না। তবে এবার দুঃসংবাদ শুনে এক ঘণ্টার মধ্যেই লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর মিছিল জমায়েত করে ফেললো ওরা। রীতিমত বড়সড় মিছিল। ঝাণ্ডা পোস্টার হাতে নিয়ে মিছিলকারীরাও বেশ উত্তেজিত। মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রসুল এবং সেই গালকাটা রিক্সাওলা। সুশৃঙ্খল সৈন্যদের মতন রাজপথ দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে ওরা চললো ধাপার মাঠের দিকে। সুন্দর স্লোগান দিচ্ছে ওরা । বলছে 'রিক্সাই আমাদের ভাত। রিক্সা ভেঙে আমাদের ভাত মেরো না।' ওরা যত এগোচ্ছে আরও রিক্সাওলারা এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। মিছিলের শহর কলকাতায় যখন প্রতি-বাদ সমাবেশ হয়, তখন ওরা খালি পেটের কথা ভুলে যায়। রাজপথের প্রত্যেক

মোড়ে পুলিস যানবাহন থামিয়ে মিছিলকারীদের গমনপথ বাধামুক্ত করে দিচ্ছে। এটাই কলকাতা শহরের রীতি। অধিকারের দাবি নিয়ে যারা বিক্ষোভ করে অন্য নাগরিকদের চেয়ে তারাই বেশি মর্যাদা প্রাধান্য পায় এ শহরে।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বেশ কয়েক মাইল হেঁটে অবশেষে তারা গন্তব্যস্থানে পেঁছল। জনমানবশূন্য বিরাট মাঠ। পেঁছেই একটা ধাক্কা খেল সবাই। পচা এক অসহনীয় দুর্গন্ধ নাকে যেতেই মনে হলো ওদের ফুসফুসে যেন আগুন জ্বলছে। যেন হাজার হাজার মড়া পচছে। যেন স্বর্গ-মর্ত্য জুড়েই সবকিছুর পচনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো ধাতস্থ হতে। বমি ভাবটা কাটিয়ে ওরা চোখ খুলে দেখলো মাত্র কয়েকশ' গজ দূরেই এক বিরাট ধূধু মাঠ। এখানে ওখানে স্তূপ করা আছে জঞ্জালের পাহাড়। দুর্গন্ধটা ওখান থেকেই আসছে। এটাই শহরের জঞ্জাল ফেলার জায়গা। ধূধু এই ধাপার মাঠে গদির মতন পুরু হয়ে জঞ্জাল জমেছে। আরো জঞ্জাল আসছে ময়লা ফেলা গাড়ি করে। বাতাসে থিকথিক করছে রোগজীবাণু। লরির পর লরি আসছে এবং জঞ্জাল মাড়িয়ে চলছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসারি অবাক। আকাশ কালো করে উড়ছে শ'য়ে শ'য়ে শকুন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলো যখন দেখলো ভয়ভীতি তুচ্ছ করে পোকা-মাকড়ের মতন কালো কালো ক'টা মানুষ সেই জঞ্জালের স্তূপ থেকে খুঁটে খুঁটে ছেড়া ন্যাকড়া কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

জঞ্জাল স্তূপের কাছে পেঁছে অনতিদূরে চেন বাঁধা রিক্সাগুলো পড়ে থাকতে দেখলো ওরা। গায়ে গায়ে চাকা লাগিয়ে রিক্সাগুলো আঁকাবাঁকা সাপের মতন পড়ে আছে। ছবিটা ভারি মর্মান্তিক। এতদিন যারা ওদের দুমুঠো ভাত দিয়ে এসেছে আজ তাদের এ কি দশা! হায় হায় করে উঠলো হাসারিরা। এত নির্দয়তা যেন ভাবাই যায় না। 'ভগবান নিশ্চয় অই বড়বাবুদের হাতধরা হয়েছে গো! তাই এমন নিন্দয় আইন হয়েছে। গরিব মানুষের জন্যি ও'র মনে কি কোনো দরদ নাই?'

এরপর সে যা দেখলো তা আরও ভয়ংকর। রিক্সাগুলোর পিছনে জঞ্জালস্তূপের আড়ালে তিনটে পুলিসের গাড়ি মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিছিলটা যেমনি রিক্সা-গুলোর কাছে পেঁচেছে অমনি আড়াল থেকে পুলিস বাহিনী ঝাঁপিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো। এরা কেউ সাধারণ ট্র্যাফিক পুলিস নয়। এদের হাতে বন্দুক ও বর্ম এবং মাথায় শক্ত টুপি। মিছিলকারীদের হটিয়ে দেবার নির্দেশ আছে ওদের ওপর যাতে বহ্নিউৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

ইতিমধ্যে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করলো রসুল। ওরা সবাই একযোগে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রাণ থাকতে ওরা রিক্সা জ্বালাতে দেবে না। প্যান্টশার্ট পরা খবরের কাগজের বাবুরা ক্যামেরা হাতে এসে পড়েছে ততক্ষণে। ওদের ঝকঝকে জামা-কাপড় এই পরিবেশে যেন ঠিক মানায় না। দেখতে দেখতে আরও অনেক মানুষ জড়ো হলো আশেপাশের গ্রাম থেকে। ওরা সবাই মজা দেখতে এসেছে। ন্যাকড়া তোলা লোকগুলো কাজ ফেলে হাঁ করে দেখছে ওদের। দেখতে দেখতে জায়গাটা মানুষের মাথায় ভরে গেল। হাতে বন্দুক উঁচিয়ে মিছিলকারীদের পথ আটকে দাঁড়ালো পুলিস। কিন্তু একজন মিছিলকারীও বিচলিত হলো না। ওরাও আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রয়োজন হলে বন্দুকের তলায় শুয়ে পড়বে কিন্তু এক পা পিছু হটবে না। মনে মনে হাসারি শপথ নিল। 'জেবন থাকতে পিছু হটবো না কেউ। আজ আমরা বুঝিছি যদি একত্তর থাকতে পারি উয়াদের ভয় হবে। কারো সাধ্যি হবে না আমাদের হটায়। এ আমাদের হক্‌। গাড়ির হাতলটি যেমন শক্ত তেমনি

শক্ত হয়েছি আমরাও।'

তখনি শুরু হলো আসল নাটক। হঠাৎ একজন পুলিস একটা দেশলাইকাঠি জ্বালালো। তারপর হাতের মশালে আগুন দিয়ে চকিতে সেটা ছুঁড়ে দিল রিক্সা-গাড়ির জটলার মধ্যে। প্রথমে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো গাড়ির সীট আর কাপড়ের চাল। তারপর আগুন ছড়িয়ে গেল পরের রিক্সায়। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে একটা মুহূর্ত থমকে গিয়েছিল সমাবেশকারীরা। তখন অসংখ্য পুলিস ওদের সামনে দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মতন দাঁড়িয়ে আছে। পুলিসের বেড়া ডিঙিয়ে কারও এক পা এগোবার সাধ্য নেই। ঠিক তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। হাসারি দেখলো এক অভাবিত উপায়ে সেই গালকাটা লোকটা তখন বিক্ষোভকারীদের শরীরের ওপর উঠে পড়েছে। সেই অবস্থাতেই লোকটা প্রথমে চীৎকার করে স্লোগান দিল। তারপর পায়ের ঝাঁকানি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসদের মাথা টপকে এক মরণ ঝাঁপ দিল লেলিহান আগুন শিখার মধ্যে। যথার্থই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে সে। কিন্তু গায়ে আগুন ধরার আগেই জ্বলন্ত গাড়িগুলো ধরে একে একে ফেলতে পাশের নালার জলে। সবাই তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে দৃশ্য দেখে। মানুষটা কি উন্মাদ হয়ে গেছে? পুলিসের লোকগুলোও হাঁ করে চেয়ে আছে ওই বিকৃতমনা লোকটার দিকে। তখনই হাসারি দেখলো মানুষটার গায়ে আগুন ধরেছে এবং আগুনের শিখা জাপটে ধরেছে মানুষটার সর্বঅংগ। অসহায় একটা চীৎকার ভেসে এল অগ্নিতরঙ্গ থেকে। একটা আর্ত আশ্রয়ভিক্ষা যেন। সভয়ে হাসারি দেখলো একটা হাত শূন্যে উঠে রিক্সার দণ্ডদুটি আঁকড়ে ধরার ক্ষীণ চেষ্টা করলো, তারপর স্খলিত হয়ে এলিয়ে পড়লো জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে। আর কিছু দেখা গেল না। অনেকখানি কালো ধোঁয়ায় ছবিটা ঢেকে গেছে তখন। চামড়াপোড়া কটু গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। সমস্ত মাঠটা জুড়ে তখন শ্মশানভূমির নিস্তব্ধতা। কেউ কথা বলছে না। নিশ্বাস নিতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে পাছে শব্দ হয়। এ লড়াইয়ে বাবু-মশাইরাই শেষমেশ জিতলো।

একসময় যখন আগুন নিভেছে, তখন ন্যাকড়াকুড়নো লোকগুলোর কাছ থেকে একটা টিন যোগাড় করলো হাসারি। তারপর ভস্মকুণ্ড থেকে তপ্ত ভস্ম তুলে টিনের মধ্যে রাখলো। আজ বা কাল ওই পূত ভস্মরাশি ওরা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। গঙ্গার স্রোতোধারায় বাহিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে যাবে মানুষটার এই মহান আত্ম-ত্যাগের কথা।

আটচল্লিশ

শীতকালে রোজ সন্ধ্যের সময় একই ঘটনা ঘটে বস্তিতে। মেয়েরা তোলা উনানটিতে আঁচ দিলেই পশ্চিমদিকে আবির রঙের গোল চাকতিটা ঘুঁটের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। তাজা মুক্ত বাতাসের স্তর ভেদ করে এই কালো ধোঁয়া বাড়ির ছাত এবং কার্নিস ছাড়িয়ে উপরে উঠতে পারে না। তাই বস্তির মাথার ওপর ঢাকনার মতন ঝোলে এই বিষাক্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা হয় তখন। অনবরত খুক খুক কাশি এবং বুকচাপ. গলা-ধরা ভাব। কোনো কোনোদিন ধোঁয়ার কুণ্ড-লীতে বস্তির পথঘাট এত অন্ধকার হয়ে যায় যে, ছ'ফুট দূরের মানুষও স্পষ্ট দেখা যায় না। গন্ধকের কটু গন্ধে অন্য সব গন্ধ হারিয়ে যায়। গায়ের চামড়ায়

জ্বলুনি ধরে। চোখ জ্বালা করে। তবুও শীত এলে বস্তির কেউ আপত্তি করে না। কারণ, নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের পীড়ন শুরু হবার আগে শীতের এই ক'টা দিনেই যা শান্তি।

এবারের গরমটা শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব দিয়ে। দুপুর বেলাতেই যেন মাঝ-রাত। ভয় পেয়ে গেল বস্তির লোকজন। বস্তির গলিতে বেরিয়ে পড়লো খোঁজ নিতে। কোভালস্কী তখন ওষুধ সাজাচ্ছিল। আকাশের মূর্তি দেখে সেও থমকে গেছে। তার মনে হলো আবহমণ্ডলে ঘোর আলোড়ন ঘটতে চলেছে। আকাশের এমন ভয়াল চেহারা সে আগে কখনও দেখেনি। প্রথমে মনে হলো অরোরা বরিয়া-লিশ দেখছে। আসলে তখন বালির একটা দেওয়াল বিদ্যুৎবেগে বস্তির দিকে ছুটে আসছে। লোকজন মাথা বাঁচাবার জন্যে আশ্রয় পাবার আগেই সেই বালির ঝড় আছড়ে পড়লো আনন্দ নগর বস্তিতে।

ঝড় এল এবং পথে যা পেল তাকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। ঘরের চালা উড়লো। ভেতরের মানুষদের তোলপাড় করে দিল। খাটালের মধ্যে গরু মোষগুলো তখন ভয় পেয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে সারা আনন্দ নগর হলুদ বালির ঝাঁকে চাপা পড়ে গেল। তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আলোর চকিত ঝলকানিতে চমকে উঠছে আনন্দ নগর! সবাই জানে এ হলো বৃষ্টিপাতের সঙ্কেত। অচিরেই প্রবল বন্যার মতন বৃষ্টি শুরু হলো। সেই সঙ্গে শিলাপাত। বৃষ্টি যখন থামলো তখন সারা বস্তি থেকে গরম ভাপ উঠছে। তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রিতে লাফিয়ে উঠে গেছে। আনন্দ নগরের সত্তর হাজার মানুষের সঙ্গে কোভালস্কীও বুঝতে পারলো যে শীতের ক্ষণিক আরামের দিনগুলি শেষ হলো। ফিরে এল জ্বলন্ত যাতনাময় সেই নরকের দিনগুলো, ফিরে এল সেই ১৭ই মার্চ।

গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রিয়তম গ্রীষ্ম ঋতু তখন অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা নিয়ে আছড়ে পড়েছে গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলোর উপর। তবে গরমের উৎকট কষ্ট এবং পীড়ন-টুকু বস্তির মানুষদেরই বেশি সইতে হয়। জানলাহীন বস্তির ঘরে যারা গাদাগাদি করে থাকে, কিংবা টানা বারো ঘণ্টা যারা খাড়াই রোদের মধ্যে মেশিনের সঙ্গে কাজ করে এবং ভাজাপোড়া হয়, গ্রীষ্ম তাদের জীবনেই নিষ্ঠুর উৎপাত। বস্তির গলি-পথে নিশ্বাস নেবার বাতাসটুকুও বয় না। জীবনধারণের সামান্য আরাম বা স্বস্তি-টুকুও গরিব হবার দরুন ওরা জোটাতে পারে না কেউ। এমনি করে দীর্ঘ গরমের দিনগুলো নিরতিশয় কষ্টের মধ্যে ওরা কাটায়, যতদিন বর্ষা না আসে। গরিব বস্তিবাসীর জীবনে ক্ষুধা যেমন নির্দয়, তেমনি নির্দয় এই আগুনঝরা দিনগুলো।

কলকাতার রাজপথেও ছাতা ছাড়া কেউ হাঁটাচলা করে না। বেল্টের সঙ্গে ছাতা গুঁজে ট্র্যাফিক পুলিসরা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। যে সব পথচারীদের ছাতা নেই তারা ব্রিফ্‌কেশ, খবরের কাগজ বা ধুতির খুঁট দিয়ে মাথা ঢেকে পথ চলে। এক-দিকে জ্বলন্ত হাপরের মতন গরম তাত, অন্যদিকে গুমট ভ্যাপসা। কোনো কোনো-দিন বাতাসে আর্দ্রতার ভাগ একশ'ভাগ উঠে যায়। একটু নড়াচড়া করলেই ঘামে ভিজে শরীর ন্যাতা হয়ে যায়। সকাল দশটা থেকেই নড়াচড়া যেন বারণ। গুমট নির্বাত এক অসহনীয় অবস্থা হয় তখন। মানুষ পশু সবারই অবস্থা সঙ্গিন। বাতাসে এতটুকুও কম্পন নেই। দেয়ালে রোদ পড়ে ছুরির ফলার মতন ঝকঝক করছে। খালি চোখে তাকালে মনে হয় চোখের মধ্যে গলানো সীসে ঢেলে দিচ্ছে কেউ। পিচের রাস্তা দিয়ে নগ্নপদ হয়ে পথচলা আরও যন্ত্রণাদায়ক। গরম পিচ লেগে পায়ের তলার চামড়া ঝলসে যায়। এমন ঝলসানো রাস্তা দিয়ে রিক্সা চালানো

যথার্থ বীরত্বের কাজ। হাসারিও কষ্ট পাচ্ছে। পায়ের তলায় বড় বড় ফোস্কা খা হয়েছে তার। একদিন ঠিক করলো বিয়ের সময় পাওয়া চপ্পলটা পরে সে রিক্সা টানবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ হয়ে গেল। পিচগলা রাস্তার গায়ে সেঁটে গেল চপ্পল জোড়া। পা থেকে ভিন্ন হয়ে গেল তারা। হাসারি হাঁ করে চেয়ে রইল চটি জোড়ার দিকে।

কোনরকমে দিন সাতেক এই দুঃসহ অবস্থায় কাটাবার পর শুরু হলো নরবলি যজ্ঞ। গরম শুকনো বাতাসের ছোঁয়ায় শরীর থেকে রসকষ শুষে নিয়েছে। হাঁপ এবং ক্ষয়রোগী ও বাচ্চারাই বেশী কাহিল হয়ে পড়লো। বেশ ক'জন মারাও গেল এই শুকনো তাপ প্রবাহে। মার্গারেটা এবং বন্দনাকে নিয়ে তখন বস্তিময় ছুটে বেড়াচ্ছে কোভালস্কী এবং রোগীর সেবা করছে। তবে ছুটছে বললে অতিশয়োক্তি হবে। বস্তুত তারাও পায়ে পায়ে হাঁটছে এবং দাঁড়িয়ে জিরোচ্ছে। একটু পরিশ্রম করলেই গরমের দাপটে শরীর শুকিয়ে আঙার হয়ে যায়। ঘামে চান করে যায় শরীর। শরীরের সেই কাহিল অবস্থার কথা প্রায়ই মনে পড়ে কোভালস্কীর। 'তখন ঘামের বন্যায় ভেসে যেত শরীর। মনে হতো শরীরের রসকষ শুষে নিচ্ছে কেউ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরশির করতো। দারুণ শীত শীত ভাব। মনে হতো মাথাটা হাল্কা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। তখন প্রায় রোজই সর্দিগর্মিতে অনেক মানুষ কাহিল হয়ে পড়ছে। রোজই দেখতাম অনেক লোক রাস্তা দিয়ে মাতালের মতন টলতে টলতে চলেছে।'

তবে আশ্চর্য ব্যাতিক্রম কোভালস্কী নিজে। এই আগুনঝরা গরমে নিজেকে সে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে। মাথায় টোকা এবং লুঙ্গি পরে, খোলা বুকের ওপর ক্রুশচিহ্ন দুলিয়ে মানুষটা যখন বস্তির রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়, তখন তাকে দেখায় দ্বীপবাসী এক অন্তরীণ বন্দীর মতন। দশদিনের মাথায় কলকাতার তাপ-মাত্রা একশ' চোদ্দ ডিগ্রিতে উঠে গেল। এর সংগে বাতাসের আর্দ্রতা যোগ করে তাপমাত্রা দাঁড়ালো একশ' তিরিশ ডিগ্রিতে। তবে সবচেয়ে অসহ্য হলো স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা। ভিজে ভ্যাপসা বাতাস ভর করে রোগজীবাণু মহানন্দে শরীরে ঢুকে পড়ছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড জ্বরবিকারে আক্রান্ত হচ্ছে বস্তির মানুষ। বেশ কিছু লোক ইতিমধ্যে মরলো। আন্ত্রিক রোগের আক্রমণটাই সব থেকে মারাত্মক। এর ছোবল খেয়ে চব্বিশ ঘন্টাও কাটছে না। গঙ্গাযাত্রা করছে মানুষ।

তবে এ ত সবে শুরু! কলির সন্ধ্যে! কোভালস্কীর কপালে আরও অনেক ভোগান্তি ছিল। সারা বস্তিতে মহামারীর মতন ঘা, ফোড়ার আবির্ভাব ঘটতে লাগলো। এ এক নতুন উৎপাত। কলকাতারও অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো এই রোগ। ঠেলাগাড়ি বা রিক্সাওলারাই এর অসহায় শিকার হয়ে উঠলো সব আগে। খালি পায়ে নোংরা ময়লা মাড়িয়ে চলাফেরা করার দরুন এইসব রোগ তাড়াতাড়ি ছড়ায়। ঘা পরিষ্কার হয় না, ক্ষতস্থানে ওষুধও লাগায় না ওরা। ফলে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে যায়। মেহবুবের ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই ঘা নিয়ে ভুগছে। মেহবুবেরও কার্বাঙ্কল ঘা হয়েছে। ইদানীং সে বাড়িতেই থাকে। মানুষটার কষ্ট দেখে কোভালস্কী একদিন পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে ওর ঘা অস্ত্র করে দিল। মার্চের শেষের দিকে গরম আরও বেড়ে গেল। বস্তিতে এক নতুন উপসর্গ জুটলো। গরমের দাপটে হাজারে হাজারে পোকামাকড় মরতে লাগলো। ডিম ফোটার আগেই মশা মরছে। কোভালস্কী ভারি অবাক। বস্তি থেকে কেন্নো, বিছে, মাকড়সারা প্রায় অদৃশ্য। বস্তিতে টিকে রইলো শুধু আরশোলা। শুধু টিকে থাকা নয়, এক আশ্চর্য

প্রক্রিয়ায় তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো হু-হু করে। যেন অন্য কীটের পরিত্যক্ত শূন্যস্থান ভরাট করার পবিত্র অঙ্গীকার নিয়েছে এই শব্যাকীটের দল। সন্ধ্যে হলেই কোভালস্কী ওদের তাড়া করতো এবং নির্বিচারে নিধন করতো। কিন্তু গায়ে গতরে ওদের সংখ্যা বাড়তেই লাগলো। যীশুর ছবির আড়ালেও অনেকে গিয়ে আশ্রয় নিত। হয়ত পরম প্রেমময় বলেই তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে যেত তারা। তবে ওদের দেখতে পেলেই কোভালস্কীর শরীরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতো। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যেত সাধু কোভালস্কী। তখন নিজের ধৈর্যহীনতা দেখে সে নিজেই অবাক হতো। এ কি পরিণতি তার? 'তবে কি বৃথাই এ দেশে এতদিন কাটালাম? কোথায় গেল আমার ওম্ মন্ত্রোচ্চারণ? কোথায় গেল সেই প্রার্থনা? বুড়ো সূর্যের শেখানো সেই নির্বেদ অনাসক্তিও কি আমায় কিছু দিতে পারলো না? আজও কেন আমার মন বিদ্রোহী হয়? বস্তির এই হতভাগ্য মানুষগুলোর অমানুষিক দুরবস্থায় কেন আমার মন এমন বিরূপ হচ্ছে?'

একদিন সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে চমকে উঠলো কোভালস্কী। দারুণ ধাক্কা খেল সে। এ কি চেহারা হয়েছে তার? সারা মুখে গভীর কুঞ্চন। এমন বলিরেখাবহুল মুখ ত তার ছিল না! দু গালে দুই গভীর খাদ। ফলে সারা মুখমণ্ডলে তার থ্যাবড়া নাকটাই সকলের আগে চোখে পড়ে। গায়ের চামড়ার রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কোনরকমে হাড় ক'খানা ঢেকে রেখেছে চকচকে অয়েলক্লথের মতন ফিনফিনে চামড়া দিয়ে।

তবে তাপদগ্ধ আনন্দ নগরের আসল শহীদ হলো বস্তির অসংখ্য কারিগর কর্মীরা। বস্তির ঘরে ঘরে কারখানা বসেছে। জানলাহীন সেই সব বন্ধ ঘরে যারা মেসিনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে, তাদের অবস্থা ডুবন্ত সাবমেরিনের নাবিকের মতন। বস্তির মেয়েদের অবস্থাও করুণ। শাড়ি আর ঘোমটায় সারা শরীর মুড়ে সংসারের নানা খুঁটিনাটির দায় বইতে হয় ওদের। ঘরের পেছনে মেসিন বসিয়ে জ্বলন্ত হাপর করে রেখেছে সবাই। ফলে শরীর নিঙড়ে ঘাম বেরিয়ে নেতিয়ে পড়ে ওরা।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হলো যে এই দমবন্ধ পরিবেশে যেখানে রীতিমত বলবান মানুষও নেতিয়ে পড়ছে, সেখানে কাজকর্ম না করে নিশ্চেষ্ট থাকাও দুষ্কর। গরমের অনুভূতিটা আরও তীব্র হয় যখন চলতে চলতে হঠাৎ কেউ থেমে পড়ে। তখন মনে হয় গায়ের ওপর ভারি কোনো বস্তু চেপে বসেছে এবং শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে। সেই অবস্থায় সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে বিকল্প বাতাসের দরকার হয়। মুখের সামনে খবরের কাগজ বা শক্ত কার্ডবোর্ড নাড়িয়ে বাতাসে ঢেউ তুলে মানুষ নিশ্বাস নেয়। মজার ব্যাপার যে, অনেকে ঢুলতে ঢুলতে ব্যজনী চালায়। কেউ বা ঘুমন্ত অবস্থাতেও। কোভালস্কীও একবার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়াটা পরখ করতে গেল। কিন্তু অকৃতকার্য হলো। তন্দ্রার ঘোর আসতেই হাত থেকে ব্যজনী পড়ে গেল। সে বুঝতে পারলো যে এর জন্যে রীতিমত অনুশীলন দরকার। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে এই নৈপুণ্য আয়ত্ব করেছে এরা। বংশপরম্পরায় এখানকার মানুষ গরমের দাবদাহ থেকে মুক্তি পাবার যে সাধনা করেছে, একদিনে তাকে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়।

একদিন রাত্রে কোভালস্কীর সারা শরীর চুলকাতে লাগলো। রীতিমত অস্বস্তিকর কণ্ডুয়ন। শুরু হয়েছিল বগলের তলা থেকে। দেখতে দেখতে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়লো এই বিষ। কোভালস্কীর তখন মনে হচ্ছিল

যেন কয়েক লক্ষ পোকা তার সারা গা চিবোচ্ছে। অবস্থা এমন হলো যে না চুলকে স্থির থাকা যায় না। দেখতে দেখতে গায়ের চামড়া দগদগে হয়ে উঠলো। একে অমন গুমট গরম, তার এই শারীরিক অস্বস্তি—অসহায় কোভালস্কীর গলা বুজে এল নৈরাশ্যে। অবসন্ন শরীরটাকে কোনরকমে ঘরের মধ্যে এলিয়ে দিল। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। তবে পশ্চিমদেশের শ্রমিক-দের বাসস্থান শহরতলিনগর আর এ দেশের বস্তির মধ্যে তফাত আছে। ওদেশের শহরতলিনগর নিরিবিলি আত্মগোপনের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সেখানে সে দিব্যি হারিয়ে যেতে পারে। মরতে চাইলেও বাধা দেবার কেউ নেই। এখানে তেমনটি হবার জো নেই। রোজকার অভ্যাস থেকে একটু ব্যত্যয় হলেই লোকের কৌতূহল হয়। এসে খোঁজাখুঁজি করে।

কোভালস্কীর হঠাৎ হারিয়ে যাবার ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করলো নাসির। রোজ সকালে সে ফাদারের হয়ে পায়খানার লাইন দেয়। ফাদারকে শুয়ে থাকতে দেখে সে তার বাপকে আগে বললো। সব শুনে মেহবুব ছুটলো বন্দনার কাছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাছাকাছি সবাই জেনে গেল যে ফাদার অসুস্থ। একের পর এক সবাই তাকে দেখতে আসছে তখন। ছুটতে ছুটতে বুড়ো সূর্যও এল। সূর্য এসেছে চা বিস্কুট নিয়ে। খানিক পরে সাবিয়ার মা এল বাটিভর্তি ঢেঁড়শ, বরবটি আর আনাজ সেদ্ধ নিয়ে। কোভালস্কী অভিভূত হয়ে গেছে তখন। মানুষগুলো তাকে এত ভালবাসে! পরে মনে হলো যাদের পদে পদে মৃত্যু ; মৃত্যু নিয়েই যাদের ঘর, বোধহয় তারাই পারে এত ভালবাসা দিতে। বন্দনা এল সব শেষে। ফাদারের গায়ের দিকে চেয়েই সে রোগ ধরতে পারলো। খুব ছোট ছোট একধরনের বিষাক্ত পোকা কামড়েছে ফাদারকে। তবে এরা ছারপোকা নয়। না হলেও এদের আক্রমণ হলে যে কেউ কাবু হতে পারে। সারা বস্তির বহু মানুষই এই চর্মরোগে ভুগছে। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে একটু দুষ্টু হেসে বন্দনা বললো, 'স্তফানদাদা! তোমারও খোস হলো!'

এপ্রিলের শেষাশেষি তাপমাত্রা আরও বাড়লো। সে এক অসহনীয় অবস্থা যেন! তবে এই ব্যাপারের পর সবাই একটা ঘটনা লক্ষ্য করলো। বস্তিবাসীদের জীবনে কোলাহল একটা ভূষণ। কিন্তু সেই কোলাহলটাই তখন বারণ হয়ে গেছে। দারুণ নৈঃশব্দ নেমে এসেছে বস্তিতে। বস্তির একমাত্র পাখি হলো বায়স। এক-দিন সকাল থেকে সেই অতি চেনা কা কা রব আর শুনতে পেল না কেউ। দিন কয়েকের মধ্যেই কারণটা বোঝা গেল। বাড়ির ছাতে ছাতে কাক মরে আছে। অসহ্য তাপে ওদের ফুসফুস ফেটে গেছে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে চুঁইয়ে পড়েছে রক্ত। অন্য প্রাণীর কপালেও একই দুর্ভোগ হলো। এরপর মরতে লাগলো ইঁদুরগুলো। ইঁদুর মরার ঘটনাটা প্রথমে সাবিয়ার মায়েরই নজরে আসে। ওর ছোট মেয়েটার মায়ের দয়া হয়েছে। চৌকির ওপর শুয়ে ছিল মেয়েটা। একদিন সাবিয়ার মা দেখলো মেয়েটার কপালে ক'টা পোকা কিলবিল করছে। কি সন্দেহ হতে ওপর দিকে চাইল সাবিয়ার মা। দেখলো বাঁশের কড়িকাঠের গায়ে একটা মরা ইঁদুর ঝুলেছে।

সোনায় সোহাগার মতন ধাঙড় ধর্মঘটও শুরু হলো তখনই। ক'দিনের মধ্যেই মানুষ আর পশুর মলমূত্রের প্লাবনে ভাসতে লাগলো আনন্দ নগর। দুপাশের খোলা নালার মধ্যে চূড়ার মতন পড়ে আছে গোময়স্তূপ। নালা উপচে পড়ছে পাঁকভর্তি কালো ময়লা জলে। বাতাসহীন সেই উৎকট বীভৎস পরিবেশ যেন নরককেও হার মানায়। চুল্লীর ধোঁয়ার সঙ্গে পাঁকের পচা দুর্গন্ধ মিশে হাওয়ার

ভাসছে। মে মাসের শেষাশেষি একটা প্রবল বর্ষণ হলো। প্রাক বর্ষার এই ধারাপাত ভাসিয়ে দিল আনন্দ নগর। এক রাত্রের বর্ষণেই প্রায় দুফুট উঁচু হয়ে গেল খোলা নালার জল। বস্তির পথঘাট, ঘরদোর, নালানর্দমা সব চৌরস হয়ে গেল নোংরা জলে। শ'য়ে শ'য়ে মরা আরশোলা আর ইঁদুর, কুকুর ভেসে বেড়াতে লাগলো সেই জলে। বস্তির লোকেরা অবাক হয়ে দেখলো দু-একটা পেট ফোলা মরা ছাগলও ভাসছে সেই নোংরা জলে। ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডবে আর একটা কাণ্ড হয়েছে। পচা জলে লক্ষ লক্ষ মশামাছির ডিম ফুটেছে। বস্তির ঘরগুলো যেন আঁস্তাকুড়। থৈ থৈ করছে নোংরা নালার জল। সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস চেহারা হয়েছে বস্তির। কিন্তু পচা পাঁকেই পদ্মফুল ফোটে। এত বীভৎসতা সত্ত্বেও একটা যেন অলৌকিক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলো কোভালস্কী। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তার নোংরা বন্ধ ঘরে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্বের পরবর্তী সপ্তম রবিবারের পুণ্য পবিত্র উৎসবটি পালিত হতে দেখলো কোভালস্কী। মাথার চুলে লাল ফুল গুঁজে সাদা কাপড় পরা একটা ছোট্ট মেয়ে গোবর মাড়িয়ে বস্তির রাস্তা দিয়ে কেমন রানীর মতন চলেছে! কোভালস্কী মোহিত হয়ে গেল ছবিটা দেখতে দেখতে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়তমা কলকাতা

উনপঞ্চাশ

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিমানের গতিবেগ কমে গেল এবং সংগে সংগে সীটের পিছন দিকে হেলে পড়লো ম্যাক্স। বোয়িং বিমানটির ডানা তখন মাটির দিকে মুখ করেছে। মাটির দিকে তাকাতেই ম্যাক্সের চোখের ওপর সবুজ সতেজ একটা মধুর ছবি ভেসে উঠলো। তাল তমাল বনরাজীনীলা সদৃশ এক মোহময় প্রকৃতির ছবি। দূরে দূরে চষা ক্ষেত আর নারকেল গাছের সারি। এর আগে দু ঘণ্টা ধরে একটানা মধ্য ভারতের শুকনো ঝলসান ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সে উড়ে এসেছে। এখানে এই ছবি দেখে ম্যাক্সের মনে হলো সে যেন উষার মরুভূমি পার হয়ে শ্যামল মরূদ্যানে এসে পেঁছিল। নদী-নালা, খাল-বিল, জলাশয়—সর্বত্রই জল। বিমান থেকে শালুক ফুলে ঢাকা জলাশয়গুলি দেখতে দেখতে তার মনে হলো যেন কোনো ভাসমান ফুলবাগান দেখছে। মনে পড়লো ফ্লোরিডার এভারগ্লেড কিংবা মেক্সিকোর সীমা-দেশের জলাভূমির কথা। ওদের বিমান তখন শহরের মাথার ওপর সোজা হয়ে গেছে। এক নজরে শহরের অনেকখানি দেখতে পেল ম্যাক্স।

বিপুল শহর কলকাতার না আছে কোনো শেষ না দিগন্ত। শহরের একধার দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। নদীর বাদামি জলে নোঙর করা জাহাজগুলো হাঁসের মতন স্থির হয়ে আছে। শহরের রূপরেখাটি ধোঁয়ার আবরণের আড়ালে অস্পষ্ট। শহরের মাথার ওপর ঝুলছে ধোঁয়ার স্তূপ। আর ধোঁয়ার সেই পুরু ঢাকা ফুঁড়ে উঠেছে কোনো পেট্রল ট্যাঙ্ক, কিংবা কারখানাবাড়ি বা নদীপাড়ে পড়ে থাকা কোনো ক্রেনের চূড়া।

বিমান সেবিকার ঘোষণা শুনে সবাই বুঝতে পারলো যে ওদের বিমানটি কল-কাতার মাটি ছুঁই ছুঁই। তখনই ম্যাক্স দেখে নিয়েছে সেন্ট পল্স্ ক্যাথিড্রালের সেই গম্ভীর স্থাপত্যশৈলী এবং কলকাতা রেসকোর্সের চমৎকার স্ট্যান্ড। রাজ-পথের ওপর দিয়ে সার দিয়ে চলেছে লাল রঙের দোতলা বাস। অবশেষে ওদের বোয়িং বিমান রানওয়ের সমান্তরাল হলো এবং কলকাতার মাটি স্পর্শ করলো।

বিমান থেকে বেরোবার দরজাটা খুলতেই এক ঝলক গরম হাওয়া ঢুকে পড়লো বিমানের মধ্যে। যেন বাইরে হাপর জ্বলছে। সে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। 'আমার মনে হলো বড়সড় হেয়ার ড্রায়ার থেকে গরম শুকনো হাওয়ার ঝাপটা আছড়ে পড়লো আমার ওপর। আচম্বিতে এই ধাক্কা খেয়ে থমকে গিয়েছি তখন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিশ্বাস-প্রশ্বাসটা সহজ হলো বটে, কিন্তু গ্যাংওয়েতে ঢুকেই দিনের আলোর ছটায় আমার চোখ দুটি প্রায় অন্ধ করে দিল। তখন কোনরকমে একটা রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে সে যাত্রা সামলালাম।'

কিছুক্ষণ পরে একটু ধাতস্থ হয়ে চোখ তুলে তাকাল ম্যাক্স। টার্মিনালে অপেক্ষমাণদের ভিড়ে হলুদ রঙের ফুলের মালা হাতে নিয়ে একজন বিদেশী দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই কোভালস্কী। ওরা অনায়াসেই পরস্পরকে চিনে নিল। ক্ষণিক হলেও ওদের এই দেখা হওয়াটা উচ্ছ্বাসে আবেগে মাখামাখি হয়ে ছিল।

ম্যাক্সকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে কোভালস্কীই প্রথম কথাটা তুললো। বললো, 'আমি ভাবছি আগে তোমায় গ্র্যান্ডে নিয়ে যাই। ওটাই এ শহরের সবচেয়ে বিলাসী

হোটেল। অবশ্য আমি এ হোটেলে কখনও ঢুকিনি। তবে আমার ধারণা কোনো বিদেশীর কলকাতা চেনার পক্ষে আনন্দ নগরের চেয়ে গ্র্যান্ড হোটেল আরও উপযুক্ত হবে।'

নবীন মার্কিন যুবক ম্যাক্স লোয়েব ট্যাক্সির মধ্যে বসে গলগল করে ঘামছে। কোভালস্কী থামতে সে একবার তাকাল। কোভালস্কী ফের বললো, 'অবশ্য যদি তুমি সরাসরি বস্তির জীবনের মধ্যে ডুবে যেতে চাও, সে আলাদা কথা। তবে ওখানে গেলে যথার্থই ডুবতে হবে তোমায়। কারণ ধাঙড়রা ফের ধর্মঘট শুরু করেছে এবং এটা যে ফ্লোরিডা নয় তা নিশ্চয়ই বুঝছো!'

শুনতে শুনতে ম্যাক্সের মুখখানা বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবটা কোনরকমে সামলে নিল সে। কোভালস্কীর প্রস্তাবটাই সে তখন মনে মনে ভাবছে। হঠাৎ কোভালস্কীর হাতের দিকে নজর পড়লো তার। হাতময় ঘা। 'আপনার হাতে কি হয়েছে?'

'চুলকানি ঘা।'

গা ঘিনঘিন করে উঠলো ম্যাক্সের। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে যেন মোটেই সইয়ে নিতে পারছে না। হয়ত কোভালস্কীর কথাটাই ঠিক। হয়ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে একটু সময় নেওয়াই ভাল। কোটিপতির বিলাসবহুল ঘরদোর ছেড়ে এই নরকতুল্য বস্তিজীবনে ঢুকে পড়লে যে ক্ষতি হবে, তা সহজে মেরামত হবে না। ম্যাক্সের অন্তত এটুকু বাস্তববুদ্ধি আছে। তাই চট করে আবেগের শিকার সে হয় না। সে সতর্ক মানুষ। সে জানে যে একটু একটু করে সইয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দূর থেকে দারিদ্র্য দেখা যায়। কিন্তু সামনাসামনি হলে তার তীব্রতায় অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সে ত জানে শান্তি মিশনের হয়ে কাজ করতে গিয়ে কত বড়সড় নেতা দারিদ্র্যর মুখোমুখি হয়ে কেমন বিভ্রান্ত হয়েছে! মানিয়ে নিতে পারে নি! তার চেয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের আরামের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দু-এক গেলাস স্কচ হুইস্কির সঙ্গে নরম একটা মন্টিক্রিস্টো চুরুট ধরিয়ে অনায়াসে দু-একটা দিন কাটানো যায়। তাছাড়া তেমন তাড়াহুড়োও ত নেই। কিন্তু......!

ব্যাপারটা তাই অন্যরকম ঘটলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ম্যাক্স হঠাৎ কোভালস্কীর দিকে ঘুরে বললো, 'না। আমায় আনন্দ নগরেই নিয়ে চলুন আপনার সঙ্গে।'

ঘণ্টাখানেক পরের ঘটনা। দুই নতুন বন্ধু বস্তির একটা সস্তা ভাতের হোটেলে টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে আছে। মিটমিট করছে ইলেকট্রিকের আলো। মাঝে মাঝে আলোর তেজ কমে আসছে। মাথার ওপর বেঢপ চেহারার মরণাপন্ন সিলিং পাখাটা শুধুই ঘুরছে। বাতাস না দিক, রান্নার ফোড়নের গন্ধে সারা ঘরের বাতাস ভারি করে দিয়েছে।

ম্যাক্সের সামনে বিচিত্র বর্ণের তরল একটা খাদ্যবস্তু থেকে ধোঁয়া উঠছে। খাদ্যবস্তুর চেহারা দেখেই প্রায় আঁতকে উঠেছে ম্যাক্স। সেইভাবেই অস্পর্শ পড়ে আছে খাবারটা। হঠাৎ কোভালস্কীর দিকে চেয়ে ম্যাক্স বললো, 'এটা কি বস্তু? ষাঁড়ের স্ট্যু?'

'উঁহু!' লোভীর মতন থালা চাটতে চাটতে বললো কোভালস্কী। তারপর ম্যাক্সের ধারণাটা শুধরে দেবার জন্যে বললো, 'সস্।'

'সস্? কিসের সস্?'

'হাড়, মজ্জা, ছাল, চর্বি দিয়ে ভাল করে ফুটানো একরকম ঝোল। তবে প্রোটিন ভর্তি। চেখে দেখ, মনে হবে নিউ ইয়র্কে বসে বীফের স্যুপ খাচ্ছ। মাত্র তিরিশ পয়সা দাম। অর্থাৎ দু পেনির মতন। এই দামে হাঁসের মাংস নিশ্চয়ই আশা করতে পার না?'

কোভালস্কীর কথাগুলো শুনতে যে ভাল লাগছে না তা ম্যাক্সের মুখ দেখেই বোঝা গেল। মুখখানা হাঁড়ির মতন করে সে বসে ছিল। কোভালস্কী ফের বললো, 'আমরা যে এই খাবার-টেবিলটা পেয়েছি এটাই আমাদের ঢের ভাগ্যি। অন্তত এখানকার লোকের এইরকম ধারণা।'

ম্যাক্স বুঝতে পারছিল যে অবস্থাটা যতটা সম্ভব মনঃপূত করে বলতে চাইছে কোভালস্কী। কোভালস্কী আবার বললো, 'এটাকে এ অঞ্চলের ম্যাক্সিমস্ বলা চলে।'

মার্কিন ছোকরার মুখচোখের সেই বিরক্তি ভাবটা চলে গেলেও নোংরা থালা-বাসন, নোংরা টেবিল-চেয়ার কিংবা নোংরা অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরা মানুষ-গুলোকে দেখে বিরক্তি ভাবটা একটুও কমলো না। প্রায় বিশ-পঁচিশ জন খদ্দের তখন হৈহুল্লোড় করে খাচ্ছে। এরা সবাই আশপাশের কল-কারখানায় শ্রমিক মজদুরের কাজ করে। ঘর সংসার বলতে যা বোঝায় এদের তা নেই। লোড্-শেডিংয়ের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে অনেককেই মেশিনের পাশে দিনরাত বসে থাকতে হয়। হোটেলের মালিক একজন মুসলমান। মোটাসোটা টাকমাথা লোকটার নাম নাসের। উনানের ওপর চাপানো জ্বলন্ত কড়াইয়ের সামনে ধ্যানীবুদ্ধের মতন সে দিনরাত স্থির হয়ে বসে থাকে। মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় কর্মী নাসের। দোকানটাই তার পর্যবেক্ষণশালা। এই আসনটিতে বসেই সে আশপাশের লোকজন এবং দোকানের খরিদ্দারদের দিকে নজর করে। তাই যত তাতই লাগুক না কেন এই আসনটি সে হাতছাড়া হতে দেয়নি। তার আসনটিতে বসে নাসের আজ দেখলো তার দোকানের বাচ্চা কর্মচারীরা প্রায় সবাই বিদেশী পাদরীটাকে ভারি সমীহ করে। কথা বলছে রীতিমত সম্মান দিয়ে। কেউ ডাকছে 'ফাদার', কেউ বা 'স্তেফান-দাদা।' বাচ্চা শ্রমিকদের মধ্যে পাঁচ জন বস্তিরই ছেলে। বড়টার বয়স আট বছর। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে ওরা পেটের ভাত যোগাড় করে। বেতন পায় মাসিক দশ টাকা এবং দুবেলা পেট ভরে ভাত ডাল। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা পরে সারাদিন খালি পায়ে ওরা ছুটোছুটি করছে। বালতি বালতি জল ভরছে, এঁটো থালাবাসন ধুচ্ছে, খাবার টেবিল পরিষ্কার করছে, মাছি তাড়াচ্ছে এবং খরিদ্দার এলে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। সারাদিনই হাসিমুখে কাজ করছে ছোঁড়াগুলো। এরা ছাড়াও আরও তিনটি ছেলে আছে। এরা মানসিক ভাবে একটু অপুষ্ট। কাঁচা আনাজ তরকারি ধুয়ে রাখছে তারা। একসময় গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের ওপর বসে এই ছেলেগুলো ভিক্ষে করতো। দুসারি লরির মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গায় বসে তারা ভিক্ষে করতো। প্রায়ই আশঙ্কা হতো এই বুঝি লরির চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেল ছোঁড়াগুলো। নাসের কৃপাপরবশ হয়ে তার দোকানের খাতায় ওদের নাম লিখিয়ে দিয়েছে। ওরা দোকানেই থাকে। বাঁশের কড়িকাঠ থেকে তক্তা ঝুলিয়ে ওদের শোবার জায়গা করে দিয়েছে নাসের। নাসেরের আরও দুজন কর্ম-চারী আছে। একজন অন্ধ, অন্যজনের এক চোখ কানা। অন্ধ বুড়ো লোকটা ভারি ধর্মভীরু এবং আল্লাহ্ ভক্ত। মানুষটার থুতনিতে সাদা এতটুকু ছাগদাড়ি। এই ঈশ্বরভক্ত মানুষটা কোভালস্কীকে বড় টানে। তাই এখান দিয়ে যাবার সময় দুদন্ড

তার কাছটিতে সে বসে। 'বুড়ো সূর্যের মতন এই মানুষটারও এক দুর্লভ ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। এর সান্নিধ্যে এলেই আমার মনের ঈশ্বরপ্রেম দারুণ উজ্জীবিত হয়। মনে হয় যেন আমার সর্বঅঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরন হলো।'

কিন্তু কোভালস্কীর এই সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অনুভূতির ভেদাভেদটা সদ্য আগত ওই মার্কিন ছেলেটাকে কি করে বোঝাবে? সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের মানুষ ম্যাক্স লোয়েব। মানুষ হয়েছে অফুরন্ত ভোগবিলাস আর পার্থিব সুখের মধ্যে। যথার্থ দারিদ্র্য কী তা সে জানে না। অভিজ্ঞতা থেকে কোভালস্কী বুঝেছে যে, আনন্দ নগরকে তিল তিল করে জানতে হয়। চিনতে হয় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাত্রায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো চেনবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। এ পথ কঠিন এবং দীর্ঘ।

তবে বিধাতাপুরুষ যেন এই কঠিন পথটিই খুলে দিলেন ম্যাক্স লোয়েবের জন্যে। বস্তির প্রথম সন্ধ্যেতেই এমন এক ঘটনা ঘটলো, যার দরুন এই কঠিন এবং দীর্ঘ যাত্রাপথের জটিলতার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল ম্যাক্স। বস্তি-জীবনের আন্তরিক ব্যথার ক্ষেত্রটি যে এমনভাবে প্রকট হবে তা কে জানতো! খাওয়া-দাওয়ার পর কোভালস্কী তাকে রাংতা মোড়া একটুরো সন্দেশ খেতে দিয়েছিল। পাতলা রাংতা মোড়া এই মিষ্টান্নটি বাঙালীর বড় প্রিয়। সবে দুর্লভ এবং দেবভোগ্য সন্দেশটি সে খাওয়া শেষ করেছে, তখনই ঘটনাটা ঘটে গেল। হঠাৎ বেঁটে মতন একটা লোক ঘরে ঢুকেই কোভালস্কীর পায়ের গোড়ায় শুয়ে পড়লো। কোভালস্কী রীতিমত বিব্রত। লোকটা তখনও হাতজোড় করে কোভালস্কীর পায়ের গোড়ায় বসে। লোকটার মুখে চোখে গভীর উৎকণ্ঠা। ম্যাক্স অবাক হয়ে চেয়ে আছে লোকটার হাতের দিকে। দুহাতের অনেকগুলো আঙুলই তার নেই। লোকটা বাংলায় কিছু একটা বলতেই কোভালস্কী ঘুরে তাকাল ম্যাক্সের দিকে। বললো, 'ধাইয়ের কাজ করতে পারবে? কিছু জানটান?'

'বিশেষ কিছু না। যেটুকু মেডিকেল স্কুলে পড়েছি সেইটুকু।'

'ওতেই হবে। একেবারে না জানার চেয়ে ত ভাল! এস আমার সংগে।'

এই বলে কোভালস্কী একটু হাসলো। তারপর বললো, 'মনে হচ্ছে আমার এখানকার বন্ধুরা তোমার উপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওরা একটা চমৎকার উপহার তোমায় দেবে।'

ম্যাক্স লোয়েব অবাক। এবং তার এই অবাক ভাবটাই কোভালস্কীকে যথার্থ খুশী করলো। 'হ্যাঁ ডাক্তার! ওরা আজ তোমায় একটা সদ্যোজাত বাচ্চা উপহার দেবে।'

'তার মানে এই প্রসবের ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে হবে।'

কোভালস্কী ফের সেই রহস্যময় হাসি হাসলো। তারপর বললো, 'তোমার কি মনে হয়?'

বার্তাবাহককে অনুসরণ করে ওরা দ্রুত পথ চলছে। লোকটাকে দেখেই মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে ওর উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছে। জলকাদায় পিচ্ছিল পথ। খুব সাবধানে ওরা হাঁটছে। প্রতি পদক্ষেপে পায়ে নরম কিছু ঠেকছে। অন্ধকারে ঠাহর হয় না। তাহলেও বোঝা যায়। মরা ইঁদুর কুকুর জাতীয় কিছু রাস্তার ওপর পড়ে আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি নামে এবং রাত্রির চেহারা হয় কালির মতন ঘুটঘুটে কালো। বস্তির ভেতর দিয়ে ছ'ফুট গভীর নালা চলে গেছে। চলতে চলতে সে কথা মনে পড়লো কোভালস্কীর। ম্যাক্সকে সাবধান করে বললো, 'দ্যাখো!

নালার মধ্যে আবার পড়ে যেও না।'

ম্যাক্স পরিহাস করে বললো, 'পড়লেই বা। অন্তত ফ্লোরিডার সাগরবেলায় চান করতে না পারার আক্ষেপটা ত মিটবে!'

'তা মিটবে, যদি নালার ভেতর থেকে বেঁচে উঠে আসতে পারো। এই নোংরা নালার জলে যে বিষাক্ত গ্যাস আছে তাতে তোমার মরতে লাগবে কয়েক সেকেন্ড মাত্র।'

প্রায় আধ ঘন্টা তাদের হাঁটা হয়ে গেছে তখন। অন্ধকার শুঁড়ি পথের দুধারে অনেক মানুষ হাঁ করে দেখছে তাদের। এই ভর সন্ধ্যের সময় কাদা মাড়িয়ে সাহেব দুজন যাচ্ছে কোথায়?

হঠাৎ হেঁকে উঠলো কোভালস্কী, 'মাথা সামলাও!'

ভাগ্যিস হাঁক দিয়েছিল কোভালস্কী! নইলে এখুনি বাঁশের কড়িকাঠে ধাক্কা খেয়ে খুলি ফেটে যেত ম্যাক্সের। কোভালস্কী ফের লঘু স্বরে উপদেশ দিল ম্যাক্সকে। 'এখানে প্রতি পদে তোমায় মাথা নোয়াতে হবে। তবে তুমি বিনীত হতে শিখবে। নিচুর কাছে নিচু হতে শিখবে।'

কোনরকমে বিপুল শরীরটাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে ম্যাক্স উঠানে ঢুকলো। উঠান ভর্তি মানুষ। সবাই চেঁচিয়ে আলাপ করছে। সাহেব দুজনকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল। মিটমিটি একটা কুপি জ্বলছে। পলায়নপর আলোর চেহারা দেখে মনে হবে এই বুঝি নিবে যাবে আলো। ম্যাক্স স্তম্ভিত হয়ে দেখলো যে, তার চার-পাশে একটা মানুষও অক্ষত নয়। কারো নাক নেই, কেউ নুলো। পুতুলনাচের পুতুলের মতন ওরা চলাফেরা, নড়াচড়া করছে। ম্যাক্স বুঝতে পারলো যে সে কুষ্ঠ কলোনিতে এসেছে।

কলোনিতে ঢুকতেই ভক্ করে একটা গন্ধ নাকে লেগে গিয়েছিল। সেটাই ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। চামড়া পচা একটা উৎকট গন্ধ। গন্ধটাই সবচেয়ে অসহ্য। কিন্তু আবছা আঁধারে সে যা দেখলো তা যেন গন্ধের চেয়েও ভয়াবহ। কোভালস্কীরও এমনি হতবাক অবস্থা হয়েছিল যেদিন সে প্রথম কুষ্ঠ কলোনিতে ঢোকে। ম্যাক্স দেখলো বিকৃতাঙ্গ লোকগুলোর পায়ের কাছে বসে নধর বাচ্চাগুলো দিব্যি খেলা করছে। মিষ্টি বাচ্চাগুলো দেখলে মনে হবে যেন বিজ্ঞাপনের ছবি থেকে সবে উঠে এসেছে তারা। ওদের নিয়ে তখন পাকা মাথার একজন বুড়ো একটা জঘন্য ঘরের দিকে চলেছে। খুব ক্ষীণ গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু চৌকাঠ ডিঙোবার আগেই দুজন বুড়ি ওদের রাস্তা আটকাল। পানের ছোপ লাগা দাঁত বার করে ওরা তখন বুড়ো লোকটাকে গালাগালি করছে। ম্যাক্স অবাক। কোভালস্কী ফিসফিস করে বললো, 'ওরা ধাই। আমাদের আসাটা ওরা পছন্দ করছে না। অপমান ভাবছে।'

বুড়ো লোকটা প্রায় বর্বরের মতন ধাক্কা দিয়ে বুড়ি দুটোকে সরিয়ে ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকলো। একজন একটা কুপি দিয়ে গেল ঘরে। কোভালস্কী দেখলো বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে একটা শরীর। বসা চোখের কোলে গভীর কালি। মুখখানি শুকনো এবং পান্ডুর। কিন্তু এ ত তার চেনা? আর একবার দেখেই কোভালস্কী চিনতে পারলো মেয়েটাকে।

'মিতা?' অবাক হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সে। আনোয়ারের যুবতী বউ। শরীর একেবারে ভেঙে গেছে মিতার। রক্তে ভাসাভাসি হয়ে শুয়ে আছে। কোভালস্কীর ডাকে চোখ খুললো। খুলেই দেখলো এক অতি চেনা মুখ ভেসে

উঠেছে মুখের ওপর। সেই খড়্গ নাক। চওড়া কপালে আর পাতলা চুলওলা দীর্ঘদেহী মানুষটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। খুশীর ম্লান হাসি ফুটে উঠলো মিতার পান্ডুর মুখে। ম্যাক্স তখন গায়ের ওপর ফেলা রক্তমাখানো কাপড়টা সরিয়ে দিচ্ছিল। প্রসূতির অবস্থাটা খুবই সঙ্গিন। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে সে বললো, 'যা করবার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে দুজনের কাউকেই বাঁচানো যাবে না।'

মিতার দুই উরুর মাঝখানে সে এখনই রক্তমাখা বাচ্চার মাথার ডগাটা দেখতে পেয়েছে। জরায়ু থেকে বেরিয়ে মাঝপথে আটকে গেছে। মেয়েটাও পারছে না বাচ্চাটাকে বের করতে। বোধহয় মরেই গেছে বাচ্চাটা। মিতার নাড়ি ধরে বসে রইল ম্যাক্স। সেই অবস্থাতেই কোভালস্কীকে বললো, 'ওর হৃদস্পন্দন চালু রাখা যায় এমন কিছু ওষুধ আছে আপনার সঙ্গে?'

কোভালস্কী তখন কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট শিশি বের করলো। কিছু না কিছু জরুরী ওষুধ সব সময়েই সে রাখে। শিশিটা বের করতে করতে বললো, 'এক শিশি কোরামিন আছে।'

ম্যাক্স মুখ মচকাল। বোঝাই গেল সে খুব খুশী নয়। ব্যগ্রভাবে বললো, 'আরও তেজী কিছু নেই? ইনট্রাভেনাস কোনো কার্ডিয়াক ওষুধ?'

ম্যাক্সের দাবিটা এই পরিবেশে এতই অসঙ্গত যে না হেসে থাকতে পারলো না কোভালস্কী। ভেবেছে কি ও? বললোও সে কথা। 'তোমার কি ধারণা বলো তো? আমি কি মিয়ামির ওষুধের দোকান?'

অপ্রতিভ ম্যাক্স জোর করেই হাসলো। কোভালস্কী তখন একটা কাপ চেয়ে নিয়েছে। কাপের মধ্যে জল দিয়ে তাতে কোরামিন ঢেলে কোভালস্কী হাঁটু মুড়ে মিতার বিছানার পাশে বসলো। তারপর একটু একটু করে প্রসূতির মাথাটা তুলে তার মুখে ঢেলে দিতে লাগলো। তার গায়ের ঘাম টপটপ করে ঝরে পড়ছে কাপের মধ্যে। কিন্তু বিব্রত কোভালস্কী নিরুপায়। ঘরের মধ্যে অসহ্য গুমট গরম। অন্তত একশ' দশ ডিগ্রি-তাপমাত্রা ত বটেই!

ম্যাক্স স্থির হয়ে চেয়ে আছে মিতার দিকে। কোরামিনের প্রভাবে মিতার সেই নেতিয়ে পড়া ভাবটা তখন কেটে গেছে। একটু চনমনে দেখাচ্ছে তাকে। কোভালস্কীকে প্রায় আদেশের স্বরে ম্যাক্স বললো, 'ওকে ফের জোরে জোরে চাপ দিতে বলুন।'

কোভালস্কীর কথামত মিতা নিশ্বাস চেপে চাপ দেবার চেষ্টা করলো। শরীরটাকে গুটিয়ে জোর দেবার চেষ্টা করলো। পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠলো সে। চোখ দিয়ে দরদর করে কান্না বেরিয়ে পড়লো।

ম্যাক্স তীক্ষ্ন চোখে দেখছিল। মেয়েটার কান্না দেখে সে বললো, 'না। ওভাবে নয়। আগে খানিকটা বাতাস টানতে বলুন। তারপর বাতাসটা ছাড়ার সময় যেন ঠেলা দেয়। তাড়াতাড়ি।'

ম্যাক্সও তখন বিন্দু বিন্দু ঘামছে। তাড়াতাড়ি ঘাড় গলা মুছে সে একটু সহজ হবার চেষ্টা করলো। গলার মধ্যে দলা দলা ভাব। পচা তেলের ঢেঁকুর উঠলো। যা খেয়েছে সেগুলো বেরোতে চাইছে। কিন্তু কারণটা কি? এই বিকৃত মানুষগুলোর চেহারা দেখে বমিবমি ভাব হলো? না কি অসহ্য গরম কিংবা ষাঁড়ের ঝোল? কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলো। কিন্তু বমিবমি ভাবটা কিছুতেই আটকাতে পারছে না। মুখখানা কাগজের মতন সাদা হয়ে গেছে। ওকে এই

অবস্থায় দেখে কোভালস্কী তাড়াতাড়ি বাকি কোরামিনটুকু কাপের মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর ম্যাক্সকে বললো, 'এটা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল দেখি!'

ম্যাক্স হতবাক। হাঁ করে কানাভাঙা ময়লা কাপটার চেহারা দেখছে সে। কোন-ক্রমে বললো, 'আপনি কি পাগল হলেন?'

কোভালস্কী একটুও বিব্রত বা লজ্জিত হলো না। বললো, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ম্যাক্স। এরা সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন যদি কোনো অছিলায় তুমি বিরক্তি দেখাও এরা উগ্র হয়ে উঠবে। তুমি এদের জান না ম্যাক্স।'

ম্যাক্সের মুখের সেই বিবর্ণ পান্ডুর ভাব তখনও যায় নি। কোভালস্কী তাকে আশ্বস্ত করে বললো, 'তোমার উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই। কুষ্ঠ ছোঁয়াচে রোগ নয়। সুতরাং ওর ছোঁয়াচ তোমার শরীরে লাগবে না।'

নিরুপায় ম্যাক্স কাপটা মুখের কাছে তুললো। তারপর চোখ বুজে এক ঢোকে খেয়ে ফেললো সবটা। একটা বাচ্চা মেয়ে এসে ওকে হাতপাখার বাতাস করতে লাগলো। খানিক পরেই ভাল বোধ করতে লাগলো ম্যাক্স। একটু সুস্থ বোধ করায় ম্যাক্স নিচু হয়ে মিতাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলো যে, বাচ্চাটা উল্টোভাবে বেরোচ্ছে। মাথার ওপর দিকের বদলে উঁকি দিচ্ছে গ্রীবার পিছন দিক। বাচ্চাটাকে মুক্ত করার এখন একটাই পথ আছে। ওকে ঘুরিয়ে সোজা করে দিতে হবে।

ম্যাক্সকে চিন্তিত দেখে কোভালস্কী সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছো? বাচ্চাটা এখনও বেঁচে আছে মনে হয়?'

'স্টেথো ছাড়া কি করে বলি?'

এই বলে মিতার পেটের ওপর কান পাতলো ম্যাক্স। কিন্তু তখনই হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'কিছু শুনতে পেলে?'

'নাঃ। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বাচ্চাটা ঘুরে গেছে। এখন ঈশ্বরের নাম নিয়ে ওকে জোরে জোরে ঠেলা দিতে বলুন।'

ততক্ষণে কোরামিন অনেকখানি কাজ করেছে। শরীরটাকে গুটিয়ে নেবার জোর পেয়েছে মিতা। সেই অবস্থায় আর একবার ঠেলা দেবার চেষ্টা করলো সে। ম্যাক্স জানতো যে এই সুযোগটা তাকে নিতে হবে। এটাই তার শেষ সুযোগ। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে সে বললো, 'আপনি ওপাশে যান। বাচ্চাটাকে আমি সোজা করার চেষ্টা করছি। তখন প্রসূতির পেটে ওপর থেকে নিচে হাত বোলান। এর দরুন ঠেলাটা নিচের দিকে গড়াবে।'

কোভালস্কী ওপাশে যেতেই বাচ্চার ঘাড়টা আঁকড়ে ধরলো ম্যাক্স। মিতা তখন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ম্যাক্স বললো, 'ওকে বলুন জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে সমান-ভাবে চাপ দিতে। একটুও কোঁত না দেয় যেন।'

মিতার শরীরের সব মাংসপেশীগুলো তখন শক্ত হয়ে গেছে। অবশ মাথাটা হেলে পড়েছে। মুখখানাও কুঁচকে গেছে যন্ত্রণায়। তবুও কোভালস্কীর কথামত সে আর একবার চেষ্টা করলো চাপ দিতে।

এরপরেই যা ঘটলো তা একেবারে অবিশ্বাস্য। ম্যাক্সের মুঠোর মধ্যে তখনও বাচ্চাটার ঘাড় ধরা আছে। হঠাৎ মনে হলো দুটো পশমের বল তার মাথায় পড়ে ছিটকে প্রসূতির পেটের ওপর গড়িয়ে পড়লো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ম্যাক্স চমকে হাত সরিয়ে নিল। সভয়ে দেখলো চালের বাতা থেকে দুটো বড় বড় ধেড়ে ইঁদুর লাফিয়ে

পড়েছে তার ঘাড়ে। অঘটনটা তখনই ঘটলো। হয়ত আকস্মিক মানসিক ধাক্কাতেই এমনটি সম্ভব হলো। মোটকথা বাচ্চাটা সোজা হয়ে গেল এবং আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাক্স। 'ওকে আর একটু জোরে ঠেলা দিতে বলুন কোভালস্কী। হ্যাঁ! আর একটু। আর একটু!' তারপর দশ মিনিট সময়ও গেল না। রক্ত আর শ্লেষ্মা মাখানো হড়হড়ে পিচ্ছিল একটা মাংসপিণ্ড পিছলে গড়িয়ে এল ম্যাক্সের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিজয়চিহ্নটি মাথার ওপর তুলে সকলের চোখের সামনে মেলে ধরলো ম্যাক্স। সত্যিই যেন এটা তার জেতা ট্রফি।

চমৎকার স্বাস্থ্যপুষ্ট বাচ্চা। অন্তত ছ'পাউণ্ড ওজনের বাচ্চা। উৎফুল্ল ম্যাক্স দেখলো বাচ্চার ফুসফুস ফুলে উঠেছে। ছোট্ট মুখখানা হাঁ করা। তখুনি কঁকিয়ে উঠলো বাচ্চা। উঠান ভর্তি মানুষ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো। একটা ধাই এসে নাড়িটা কেটে পাটের সুতো দিয়ে গিঁট বেঁধে দিল। অন্য ধাইটা গামলা ভর্তি করে জল এনে বাচ্চাটার গা পরিষ্কার করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে বাচ্চাটার পরনের জামা এনেছে ওরা। জামার চেহারা দেখে ম্যাক্সের নাড়ি ছেড়ে যাবার অবস্থা। এত নোংরা! তার মনে হচ্ছিল এখানকার লোকগুলোর ধাত নিশ্চয়ই ইস্পাতের চেয়ে শক্ত ধাতুতে গড়া। কুষ্ঠ কলোনিতে কোনো বামুন ঢোকে না। তাই নবজাতকের প্রথম সংস্কারটি পালনের ভার পড়লো কোভালস্কীর ওপর। হঠাৎ কোভালস্কীর মনে হলো কে যেন তার পা ছুঁয়েছে। চোখ নামিয়ে দেখলো পায়ের তলায় বসে আছে খঞ্জ আনোয়ার। এখনই সুখবরটা শুনে এসেছে। চোখে মুখে চাপা খুশী। কোভালস্কীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়াল আনোয়ার। আজ যথার্থই খুশীর দিন তার। কোভালস্কীর দিকে আনন্দোদ্ভাসিত মুখে তাকিয়ে আনোয়ার বললো, 'স্তেফানদাদা! আপনার দয়াতেই আমি ছেলের মুখ দেখলাম। ছেলে! আমার ছেলে!'

আনন্দে, খুশীতে আনোয়ারের কৃশ মুখখানা ঝলমল করছে যেন। এতক্ষণ ইচ্ছে করেই উৎকণ্ঠা চেপে সে আড়ালে সরে ছিল এই বিজয়ী মুহূর্তটির জন্যে। খানিক পরে একবাটি ভাত নিয়ে এল আনোয়ার। দুই নুলো হাতের মধ্যে বাটিটা চেপে ধরে সেটিকে কোভালস্কীর উদ্দেশে অর্পণ করলো সে। বললো, 'আমার ছেলের মুখে দুটো ভাত দিন স্তেফানদাদা। তারপর আল্লাহ্‌কে বলুন যেন আমার ছেলে সুখে শান্তিতে অনেকদিন বেঁচেবর্তে থাকে। একজন ধাইয়ের হাত থেকে একটা কুপি চেয়ে নিল আনোয়ার। রীতি অনুযায়ী এই কুপিটি চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলবে। নিভে গেলে ছেলের অকল্যাণ হবে। তার আয়ু লম্বা হবে না।

পরদিন ম্যাক্স লোয়েব কলকাতা থেকে তার প্রিয়তমার উদ্দেশে যে চিঠিটা পাঠালো সেটাই তার প্রথম চিঠি। ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে ম্যাক্স লিখলো, 'কুষ্ঠ কলোনির সবাই তখন খুশীতে অভিভূত। কে তাদের বারণ করে! আর বারণ করলেই বা শুনছে কে! আমার গলা জড়িয়ে ধরলো নুলো হাত দিয়ে। বুকে জাপটে ধরলো কেউ কেউ। আনন্দে জ্বলজ্বল করছে ওদের ক্ষয়ে যাওয়া মুখগুলো। খঞ্জ মানুষগুলো ক্লাচ দিয়ে ঠোকাঠুকি করে বাজনা বাজাচ্ছে আর তালে তালে নাচছে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলে উঠছে, "জয়! স্তেফানদাদার জয়! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" ধাইগুলোও ওদের সঙ্গে নাচছে। এমন সময় ছোট ছোট মেয়েরা থালায় করে বিস্কুট আর সন্দেশ নিয়ে এল। খেতেই হবে সবাইকে। নইলে ওদের আতিথেয়তার অপমান করা হবে। আমার তখন দমবন্ধ হয়ে আসছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কেমন যেন বমিবমি ভাব। ঘরের ভেতরের চেয়েও বাইরে সেই পচা

গন্ধটা আরও তীব্র মনে হলো। কিন্তু স্তেফান কোভালস্কীর কী আশ্চর্য সংযম। একটুও বিচলিত দেখাচ্ছে না তাকে। যারা নমস্কার করছে তাদের আঙুলহীন হাতগুলো পরমপ্রীতিতে জড়িয়ে ধরছে। একটুও বিকার নেই মানুষটার। এটাই এ দেশের আপ্যায়নের চিরচরিত প্রথা। আমিও তখন দুহাত জড়ো করে ওদের কাছে বিদায় চাইলাম। কলকাতা এয়ারপোর্টেও এইভাবে বিদেশীদের আপ্যায়ন করতে দেখেছিলাম। কি চমৎকার প্রথা! তাই না? তখন সদ্যোজাত বাচ্চাটার অবিচ্ছিন্ন কান্নায় কলকাতার রাতের আকাশ ভরে উঠেছে। এই শহরে আমারও প্রথম রাতটি কাটলো শিশুর কান্না শুনতে শুনতে।'

পঞ্চাশ

'কলকেতার জঙ্গলে শুধু যে বিষধর সর্প আর মানুষখেকো বাঘ থাকে তা নয়; আমাদের যারা মানুষজ্ঞান করে না স্বভাব দুর্জন সেই ট্যাক্সিওলাদের মধ্যেও অনেক শান্ত ও নির্বিরোধ লোক থাকে।'

হাসারির অনুমানটি নেহাত ভুল নয়। ট্যাক্সির ড্রাইভাররা সত্যিই যেন রাজা উজির, জন্তুজানোয়ার ভাবে তাদের। তাদের ওপর কোনরকম দরদ ট্যাক্সিওলাদের নেই। কালো-হলুদ রঙের চারচাকার পালকি চড়ে তারা রাজার মতন রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কাউকে পরোয়া করে না। ট্যাক্সিওলারা ভাবে রাজপথে তারাই শ্রেষ্ঠ। তারাই রাজা। তাই সুযোগ পেলেই নিকৃষ্টদের কাছে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়ে দেয়।

একদিন যানজটের শৃংখল থেকে মুক্তি পেয়ে সবে দুপা চলেছে, ওমনি পাশ থেকে এক 'রাজামশাই' তাকে ছোট্ট একটু গুঁতো দিল। গাড়িশুদ্ধ হাসারি হুমড়ি খেয়ে পড়লো পাশের নালার মধ্যে। কিন্তু অবাক কান্ড! ট্যাক্সির ড্রাইভারটা বীরত্ব দেখিয়ে চলে গেল না। কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমা ত চাইলই, হাসারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে গাড়িখানা নালার ভেতর থেকে টেনে তুললো। হাসারির রীতিমত অবাক। এমনটি যে ঘটে তা তার জানা ছিল না। হাঁ করে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। বেঁটেখাটো মানুষ। মাথাজুড়ে টাক। ঘাড়ে একটা গভীর ক্ষতের দাগ। তবু ভাল, লোকটা পাগড়িধারী শিখ নয়। হাতে কৃপাণ আর পাকানো দাড়িওলা দশাসই চেহারার শিখদের দিকে সমীহ করে তাকায় হাসারি। এ মানুষটা হাসারির মতন বাঙালী। গঙ্গার ধারে ব্যান্ডেল নামে একটা জায়গায় এর ঘরবাড়ি আছে। হাসারিদের গ্রাম থেকে নাকি মাইল কুড়ির পথ। তা এসব তত্ত্ব সে পরে জেনেছে। হাতাহাতি করে গাড়িটা তোলার পর অবিশ্বাস্য উপায়ে ওরা দুজনে পরম মিত্র হয়ে গেল। দুজনে একসঙ্গে 'বাঙ্‌লা' খেল। পরের দিনটা ছিল ঘোর বর্ষার দিন। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। ওরা কেউ-ই গাড়ি বের করলো না। সারাটা দিন পার্ক স্ট্রীটের পেছনে একটা 'ঠেক-এ' কাটিয়ে দিল মানুষটার 'জীবনবেত্তান্ত' শুনে।

মানুষটার নাম মানিক। মানিকের 'জীবনবেত্তান্ত' রীতিমত চমকপ্রদ। আগে সে ছিল বাস ড্রাইভার। রাতবিরেতে এ জেলা ও জেলায় যাত্রীবাহী বাস চালাত। একদিন রাত্রে হাইওয়ের ওপর কয়েকজন ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের হাতে পড়লো ওর বাস। গাড়ি থামিয়ে তারা যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করলো এবং মারধোর করলো। অবশেষে ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মানিকের ঘাড়ে। সে যাত্রা মানিক কিভাবে বেঁচেছিল

তা ঠাকুরই জানেন। তাঁর কৃপা হলে সবই হয়। তাই সে-ও রক্ষা পায়। তবে সেই বীভৎস রাত্রির সাক্ষ্যটুকু সে এখনও সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। ঘাড়ের ওই ক্ষতের দাগটিই সেই ভয়াবহ রাত্রির স্মারক হয়ে জ্বলজ্বল করছে তার স্মৃতিতে। সেই থেকে মানিক হলো 'চমৎকার।'

হাসারির চোখেও মানুষটা যথার্থই চমৎকার। তবে কারণটি অন্য। হাসারির মতন সে শকটদণ্ডধারী নয়। তবে সে চক্রপাণি। তার হস্তধৃত চক্রটি যেন স্বয়ং নারায়ণের হস্তধৃত সুদর্শন চক্র। সযত্নে এই চক্রটি পরিচালনা করেই মানুষটি যেন কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করে। পথ-বৈতরণীর অসংখ্য প্রতিবন্ধ কাটিয়ে যাত্রীকে গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছে দেয়। চাকাটি ছাড়াও তার পায়ের গোড়ায় রয়েছে রাবার মোড়া আরও তিনটি পরিচালনযন্ত্র। এদের নাম 'পেডাল।' এই পাদচালিত যন্ত্রগুলিতে পটুতার সঙ্গে চাপ দিয়ে সে তার শকটখানির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এর দরুন তার পথচলার ক্লান্তি হয় না। কিংবা গুরুশ্রমজনিত অবসাদ আসে না। হাসারির মনে হচ্ছিল যেন মানিকের শকটখানি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের শ্বেত-বাহন রথ এবং জমকাল এই রথের আসনে উপবিষ্ট হয়ে সে যেন অর্জুনের চেয়েও সমাদৃত হচ্ছে। বলাবাহুল্য এই রথখানিই কলকাতার ট্যাক্সি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁর চতুর্ভুজের পারদর্শিতা দেখিয়ে যদি মানুষটানা কোনো রিক্সা গাড়িকে তাঁর পুণ্য হাতের ছোঁয়ায় কালো-হলুদ রঙের ট্যাক্সিগাড়িতে রূপান্তরিত করে তা হবে স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু তেমন আশা বাতুলতা।

একদিন মানিক তাকে ট্যাক্সিতে চড়াল। হাসারির জীবনে এই ঘটনাটা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা যেন তার জীবনের এক সমৃদ্ধ সঞ্চয়। তার মনে হলো বানরসৈন্যের সঙ্গে সে যেন লংকাদ্বীপ জয় করতে যাচ্ছে, কিংবা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের শ্বেতবাহন রথে চড়েছে। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাটি আরও প্রীতিসুখকর হলো। নরম গদির আসন, সুসজ্জিত অভ্যন্তর দেখে সে মুগ্ধ। মৃদুতম চাপ দিতেই গদির কোমলতার মধ্যে শরীরটা ডুবে গেল। তার চোখের সামনে রয়েছে অনেকরকম মাপযন্ত্র এবং ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটা উঠছে নামছে। এদের ওঠানামার মধ্যেই নাকি গাড়ির শরীরের বিভিন্ন অংশের ভালমন্দ অবস্থা নিরূপণ হচ্ছে। একটা ছিদ্রের মধ্যে চাবি ঢুকিয়ে সামান্য চাপ-দিতেই গাড়ির ইঞ্জিনে চকিত উল্লাসধ্বনি উঠলো। তখন পায়ের গোড়ায় অবস্থিত একটা পেডালে চাপ দিল মানিক এবং হাতে ধরা চাকার সঙ্গে যুক্ত দণ্ডটি পরি-চালিত করলো। এই সামান্য ক'টি ক্রিয়াকর্মতেই হাওয়াগাড়ি গতিসম্পন্ন হলো এবং চলতে লাগলো। হাসারি তখন স্তম্ভিত। এ যেন ভাবাই যায় না যে পায়ের আঙুলের সামান্য চাপেই এই হাওয়াগাড়িখানা উত্তরোত্তর গতিময় করা যায়। হত-বাক হাসারি তার নতুন বন্ধুর পাশটিতে বসে আকাশপাতাল ভাবছিল। তার মনে হলো, এমনটি কি সে পারবে? মানিক নামে এই মানুষটা কি আগের জন্মেও ট্যাক্সি চালাত? না কি এসব তত্ত্ব সে এই জন্মেই শিখেছে? পাশে বসে থাকা বিমূঢ় হাসারিকে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে নজর করছিল মানিক। হঠাৎ সে একটা পেডালে পায়ের চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বিমূঢ় হাসারি হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর। হো হো করে হেসে উঠলো মানিক। তারপর লঘু স্বরে বলে উঠলো, 'কেমন লাগলো বন্ধু? সামান্য পায়ের ছোঁয়া। ব্যস! গাড়ি যেন পর্বতের মতন স্থির। তোমারটার চেয়ে এ গাড়িটা চালানো কত সহজ, দেখলে?'

হাসারি তখন এক নতুন জগৎ খুঁজে পেয়েছে। এ জগতে কিছুই নাকি অলভ্য নয়। যন্ত্ররা তোমার কেনা গোলাম। যা চাও তাই এনে দেবে। এখানে ক্লান্তি আসে না। অবসাদ নেই। কাজ করতে করতে হাস, গান গাও, বিড়ি খাও, তোমার শরীর একটু টসকাবে না। যেমনটি আছে তেমনটি থাকবে। মানিক রীতিমত সুযোগ-সন্ধানী মানুষ। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের বিলাসবহুল হোটেল রেস্তোরাঁর দালালদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ দহরম-মহরম। তাদের প্রাপ্য দালালিটুকু দিয়েই সে খালাস। তখন ট্যাক্সির জন্যে তারাই শাঁসালো খদ্দের এনে দেয়। সমস্ত ব্যবস্থাটিই সুশৃংখল। তাই কাজও হয় স্বপ্নের মতন।

সেদিন পার্ক হোটেলের সামনে থেকেই দুজন বিদেশী যাত্রী তুললো মানিক। ওরা কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত যাবে। হাসারি জড়সড় হয়ে বসে আছে। হঠাৎ যেন অন্যরকম ঘটনা ঘটলো। মানিক তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। দ্রুতপায়ে সে গাড়ির বাঁদিকে চলে এল। তারপর উইন্ডস্ক্রীনের পাশে দৃঢ়বন্ধ একটা মাপ-যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে একটা পতাকা খাড়া করে দিল। খাড়া করা পতাকার নিচে মাপযন্ত্রটির দিকে ঠায় চেয়ে ছিল হাসারি। অবাক হয়ে দেখলো গাড়ির গতিবেগ যত বাড়ছে এবং যত পথ তারা অতিক্রম করছে, ততই টাকার অংক বেড়ে যাচ্ছে সেই পরিমাপযন্ত্রের গায়ে। প্রায় প্রতি পাঁচ বা ছয় সেকেন্ড অন্তর টাকার সংখ্যা বাড়ছিল তখন। হাসারির কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য ঠেকেছে। হায়! হায়! বিশ্বকর্মা কি এমন টাকা তৈরির যন্ত্র রিক্সাওলাদের জন্যে বানিয়ে দিতে পারেন না? রিক্সাওলাদের জীবনে কি এমন সৌভাগ্য আসবে না কোনদিন? কই! তাদের পকেটের মধ্যে তো এমনভাবে টাকা এসে জমা হয় না? রিক্সাওলাদের প্রতিটি যাত্রাপথের ভাড়া নির্দিষ্ট হয়ে যায় আগেভাগেই। খুশী হয়ে কোনো যাত্রী দু-চার পয়সা বেশি দিতে পারে। কিন্তু এ ত অন্যরকম ব্যবস্থা! এ যেন অবিশ্বাস্য! পেডাল নামক যন্ত্রটির ওপর চাপ দিলেই টাকার সংখ্যা বাড়তে থাকলো পৌনঃ-পুনিক হারে। তখন উড়তে উড়তে টাকা এসে জমা হবে তোমার পকেটে। ঝড়ের দিনে যেমন বুনো গোলাপ বোঁটা থেকে খসে পড়ে, তেমনি আকাশ থেকে খসে পড়বে কাগজের নোট। মনে হবে ধানজমিতে টাকার ফসল ফলানো। এয়ারপোর্টে পৌঁছবার পর মিটার নামক যন্ত্রটিতে টাকার যে অংক উঠলো, তা শুনে হাসারির চক্ষুস্থির। পঁয়ত্রিশ টাকা! এত টাকা সে সারা হপ্তাতেও উপায় করতে পারে না। অথচ মানিকের এই দেবশকটে এটি কত সহজলভ্য! ফেরার পথে দ্বারকানাথ রোডের ওপর একটা বড়সড় গ্যারেজের কাছে গাড়ি থামাল মানিক।

মোটর গাড়ির গ্যারেজটি যথার্থই বড়। হাসারিও তখন গাড়ি থেকে নেমেছে। তার দিকে চেয়ে মানিক বললো, 'তোমার হাতে যখন অনেক টাকা জমবে তখন এখানে এলে তোমার কর্মমুক্তি হবে।'

হাসারি বুঝতে পারলো না কোন মুক্তির কথা বলছে মানিক। খানিক পরেই কথাটা সে বুঝলো। মুক্তি বা নির্বাণের ছাড়পত্র হলো লাল মলাট দেওয়া একটি পুস্তিকা। পুস্তিকার প্রথম দুটি পাতায় টিকিট সাঁটা। আর আছে সনাক্তকরণের জন্য মানিকের একখানা আলোকচিত্র আর তার আঙুলের ছাপ। হাসারির মনে হলো মানিক ঠিক কথাই বলেছে। যে কোনো রিক্সাওলার কাছে এই পুস্তিকার অধি-কারটি দামী রত্নের অধিকারের মতন। কর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার চাবিকাঠি হলো এই লাল মলাটের বইটি। এই বইটিই তাকে নতুন কর্মজীবনে প্রবেশের প্রেরণা দেবে। বলাবাহুল্য, পুস্তিকাটি হলো পশ্চিমবঙ্গ মোটরভেহিকল

ডিপার্টমেণ্ট থেকে স্বাক্ষরিত ড্রাইভারের লাইসেন্সপত্র এবং গ্যারেজটি হলো কলকাতার নামকরা গ্রেওয়াল মোটর ট্রেনিং স্কুল। ট্রেনিং স্কুলের ভেতরে প্রশস্ত চত্বর। অনেকগুলো বাস, লরি এবং ট্রেনিংকার সেখানে যেন নোঙর করা আছে। একদিকে ক্লাস নেবার ঘর। ঘরের ভেতরে সারি সারি বেঞ্চি পাতা আছে। ক্লাসঘরের দেওয়ালের একদিকে মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতির ছবি। অন্যপাশে ট্রাফিকচিহ্ন সম্বলিত অনেকগুলো আলোকচিত্র। শহরের বিভিন্ন রাস্তাঘাট এবং বাসরুটের নির্দেশ সমন্বিত একটা রঙিন মানচিত্রও টাঙানো আছে একপাশে। হাসারি বুঝতে পারলো যে শিক্ষণপ্রাপ্ত ড্রাইভারদের অবগতির জন্যেই এই তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে হাসারি। যা দেখছে সেটিই যেন তার ভাল লাগছে। আরও অনেক আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য বস্তু এখানে আছে। কিন্তু সে ত সামান্য একজন রিক্সাওলা! তার মতন যারা সামান্য তারা কি কোনোদিনও এমন ইস্কুলের চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশের অধিকার পাবে? শিক্ষণপ্রাপ্তির জন্যে তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে মোট ছ'শ টাকা। অর্থাৎ চারমাসে দেশঘরে যে টাকা সে পাঠায়, তার চেয়েও বেশি। নাঃ! কোনভাবেই সম্ভব নয়। আপনমনেই মাথা নাড়লো হাসারি।

তবুও ট্যাক্সিতে উঠে হাসারির মনে হলো যেন স্বপ্নটি তার অঙ্গের সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে গেছে। মনে মনে এক কঠিন অঙ্গীকার করে বসলো সে। গাড়ি চলছে। কিন্তু তন্ময় হাসারি আত্মচিন্তায় মগ্ন। মনে মনে সে তখন বলছে, 'আমার সংসারের জন্যি আরও কর্ম করতে হবেক। আরও কঠিন কর্ম। আমার প্যাটের ক্ষুধাটিও কমাতে হবেক। নইলে সঞ্চয় হবে না, মনোজ শম্ভুর মাথার দিব্যি দিয়া পিতিজ্ঞে করবো যেন রিক্সার ঘন্টিটা বাক্সর মধ্যি তুলে রাখতে পারি। যেন রিক্সাখানি মুসাফিরের হাতে জমা কর‍্যা দিতে পারি। ত্যাখন আমার কর্মমুক্তি হবে। ত্যাখন উয়ার লাল বইখানির মতন আমিও একখানি লাল বই অর্জন করবো। অর্জন করবো এমনি কালো-হলুদ বর্ণের একটি ট্যাক্সি গাড়ি। তারপর বাদলদিনের টাপরটোপর বিষ্টির ফোঁটার মতন য্যাখন ট্যাকার আগমন হবে অই মিটারের মধ্যে, তখন দেমাক কর‍্যা সেই শব্দ শুনবো।'

একান্ন

ম্যাক্সকে ঘরখানা দেখিয়ে একটু কুণ্ঠিত স্বরে কোভালস্কী বললো, 'এটা মিয়ামি হিল্টন্ নয় ঠিক। তবে একটা কথা মনে রেখ ব্রাদার। এখানে এমনি একখানা ঘরে বারো-পনেরো জন মানুষ এইভাবে গাদাগাদি করে দিনের পর দিন বাস করছে।'

ম্যাক্স কোন জবাব দিল না। তবে ঘরখানা সে যত দেখছে ততই বিরক্ত হচ্ছিল। হয়ত একথাটা ঠিক যে আনন্দ নগরের মাঝখানে এমন একখানা ঘর যোগাড় করতে কোভালস্কীকে অনেক মাথাকুটতে হয়েছে। অন্য ঘরের তুলনায় এটা যেন রাজপ্রাসাদ। কিন্তু তাই বলে এমন একখানা ঘরে সে কি করে থাকবে? ঘরের মধ্যে আসবাবাদিও অনেক। একখানা চারপায়া আছে। লেখাপড়ার জন্যে একটা টেবিল আছে। টুকিটাকি জিনিসপত্তর রাখবার জন্যে একটা তাকও আছে। আছে দুটো টুল, একটা বাতি, একটা জলের কুঁজো আর হাসিখুশি বাচ্চার ছবিওলা একটা ইংরিজি ক্যালেন্ডার। তবে ঘরখানার আসল ঐশ্বর্য তার জানালাটা। জানালার পাল্লাদুটো খুলতেই বস্তির রাস্তাটা চোখে পড়লো। ঘরখানার আর একটা বাড়তি

সুযোগ হলো রাস্তা থেকে এর মেঝেটা অন্তত ফুট খানেক উঁচু। ফলে বর্ষার জলে গলিপথ ভাসলেও ঘরের মেঝে ডুববে না। উপচে পড়া নালার জলও ঘরে ঢুকতে সমীহ করবে।

খুঁটিয়ে সব কিছু দেখার পর ম্যাক্স হঠাৎ উদ্বিগ্ন স্বরে কোভালস্কীকে বললো, 'সব ত দেখলুম। কিন্তু পায়খানা? তার ত কোন ব্যবস্থা দেখছি না?'

'সেও আছে। গলির একেবারে শেষে।' একটু থেমে কুণ্ঠিত কোভালস্কী বললো, 'তবে খুব ঘনঘন সেটা ব্যবহার না করাই ভাল।'

ম্যাক্স স্তম্ভিত। বলে কি মানুষটা? বাহ্যে-পেচ্ছাব বন্ধ করে থাকতে হবে তাকে?

ম্যাক্সের মুখের হতভম্ব ভাবটা দেখে কোভালস্কী এবার একটু মজা করতে চাইল। ছোকরার বিপন্ন চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে বললো, 'অর্থাৎ দুবেলা তোমায় নিয়মিত ভাত খেতে হবে। শুধু ভাত। তবেই ঘনঘন পায়খানা যাওয়া বন্ধ করতে পারবে।' কোভালস্কীর চোখ কৌতুকে চিকচিক করছে। সে ফের বললো, 'ভাতের একটা আলাদা দ্রব্যগুণ আছে। একেবারে কন্ক্রিট হয়ে যাবে তোমার নাড়ীভুঁড়ি।'

ওদের হাসিঠাট্টার মধ্যেই বন্দনা ঢুকলো। সে ঢুকতেই ম্যাক্সের মনটা যেন প্রসন্ন হয়ে গেল। তার মনে হলো ঘরের চেহারাটাই বদলে গেল মেয়েটার আগমনে। কি দারুণ মিষ্টি এই শ্যামলা মেয়েটা! মুগ্ধ হয়ে দেখছিল ম্যাক্স। ঘোর লাল একখানা শাড়ি পরেছে। দেখাচ্ছে পটের বিবির মতন।

ম্যাক্সের মুগ্ধ চোখের সঙ্গে তখন দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেছে বন্দনার। লাজুক চোখদুটো তুলেই নামিয়ে নিল সে। তারপর এক থোকা যুঁই ফুল ম্যাক্সের হাতে দিয়ে বললো, 'আপনাকে স্বাগত জানাতে এলুম ডাক্তারবাবু।' সাদা যুঁইয়ের থোকা থেকে মিষ্টি মদির গন্ধ বেরিয়ে পরিবেশটা মাতাল করে দিয়েছে তখন। বুকভরে মিষ্টি গন্ধটা টেনে নিল ম্যাক্স। তখন সে ভুলে গেছে ঘরখানার কথা। ভুলে গেছে কুশ্রী পরিবেশের কথা। উননের ধোঁয়া, রাস্তার ধুলোকাদা আর আশপাশের তীব্র শব্দ, কোলাহল সব যেন হারিয়ে গেছে তার স্মৃতি থেকে। মন চলে গেছে হাজার মাইল দূরে তাদের ফ্লোরিডার বোগানভিলায়। ঠিক সেই গন্ধ যা ওদের বাড়ির চাতালে ভরিয়ে দিত বসন্তে। কি আশ্চর্য! সেই গন্ধটাই এই পরিবেশে সে কেমন করে পেল!

ঘরের অগোছালো চেহারাটা ঢুকেই দেখে নিয়েছিল বন্দনা। তাই তার প্রথম কাজ হলো এলোমেলো ঘরখানা গুছিয়ে ফেলা। ক্ষিপ্র লঘু পায়ে কেউ জানার আগেই সে মোটামুটি গুছিয়ে দিল ঘরখানা। খাটিয়ার ওপর একটা চাটাই পাতলো, বাতি ক'টা জ্বাললো, কয়েকটা ধূপকাঠি ধরালো, তারপর একটা তামার পাত্রের মধ্যে যুঁই ফুলের থোকাটা রেখে তাতে একটু জল দিল। ভুরভুরে যুঁইয়ের গন্ধ তখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বন্দনার মনটাও ভরে উঠলো খুশীতে। হঠাৎ সে ঘরের সিলিংয়ের দিকে কপট শাসনের চোখে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'খবর্দার! এই মানুষটাকে আজ তোমরা মোটেই বিরক্ত করবে না। ওঁকে আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও। অনেক দূর থেকে, পৃথিবীর আর এক কোণ থেকে উনি আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন। কি? মনে থাকবে তো?'

ম্যাক্স বুঝতে পারলো যে ঘরটি তার একার অধিকারে নেই। তাকে সহবাস করতে হবে লোমশ একটি জন্তুর সঙ্গে। একটু আগেই মিতার ঘরে সেই অভিজ্ঞতাটা

তার হয়েছে। সহবাসে তার অবশ্য আপত্তি নেই। ওই মিষ্টি মেয়েটা বা কামসূত্রের কোনো সেবীরা এলে সে খুশী হয়েই তার আধখানা অধিকার ছেড়ে দিত। কিন্তু সেটি হবার জো নেই। হঠাৎ একটা কর্কশ টিক্‌টিক্‌ আওয়াজ শুনলো সবাই। বন্দনার চোখদুটি খুশীতে চিকচিক করে উঠলো। উৎফুল্ল মুখে ম্যাক্সের হাতটা ধরে সে বললো, 'কি ডাক্তারবাবু! শুনতে পেলেন? টিকটিকির আওয়াজ! টিক-টিকিটা বলছে ঠিক ঠিক। এ ডাক ভারি সুলক্ষণ। বুঝলেন মশাই? আপনি ঠিক এক হাজার বছর বাঁচবেন।'

বিব্রত ম্যাক্স ওপর দিকে চেয়ে দেখলো যে দেওয়ালে বসে তার দিকে চেয়ে আছে একটা সবুজ টিকটিকি।

মস্তানদের হামলা আর বোমাবাজির পর পুরনো ইস্কুলবাড়ির আর অস্তিত্ব নেই। ভেঙেচুরে মাঠ হয়ে গেছে সেটা। তাই বাধ্য হয়েই ডাক্তারখানাটা ম্যাক্সের ঘরে সরিয়ে এনেছে কোভালস্কী। ঠিক হয়েছে যে দিনের বেলায় এই ঘরখানাই হবে একাধারে ডাক্তারখানা এবং অপারেশন থিয়েটার। কুষ্ঠরোগীদের সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি ছোটখাট কাটাছেঁড়ার চিকিৎসাও চলবে। এই ডাক্তারখানার সাহায্যটা যাতে বস্তির অন্য মানুষরাও পায় সেটাই দেখতে হবে। মোটকথা রাত দশটা পর্যন্ত মার্কিন যুবক ম্যাক্স লোয়েবের এই বস্তির ঘরখানাই হলো আনন্দ নগরের প্রথম ডাক্তারখানা। বস্তির সত্তর হাজার মানুষের একমাত্র আরোগ্য নিকেতন। এই এক-খানা ঘরেই রোগী পরীক্ষা, চিকিৎসা, অস্ত্র করা, সেবাশুশ্রূষা সবই হচ্ছে একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতন নিপুণতায়। ব্যবস্থাটা খুবই সেকেলে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায়ই বা কি! ম্যাক্সের অভিজ্ঞতাটা তার মুখ থেকেই শোনা যাক।

'আমার টেবিল এবং বিছানাটা হয়েছে রুগীর পরীক্ষার জায়গা। অস্ত্র করার কোনো যন্ত্রপাতিও নেই। গোটা চারেক সন্না আর ছুরি ছাড়া আমার বাক্সের মধ্যেও কিছু ছিল না। সব থেকে অসুবিধে হলো স্টেরিলাইজার না থাকায়। অন্তত মিয়ামি যদি এতদূরে না হতো, তাহলে আমাদের বেল্ এয়ার ক্লিনিক থেকে দর-কারি জিনিসগুলো আনিয়ে নিতাম। তবে তুলো, ব্যান্ডেজ এবং গজের কোনো অভাব নেই। বরং দরকারের চেয়ে বেশিই পাচ্ছি। কোভালস্কী আরও একটা দর-কারি জিনিস উপহার দিয়েছে আমায়। একজন সহৃদয় বেলজীয়ান মহিলা বেশ কিছু স্টেরিলাইজ্‌ড্‌ কমপ্রেস উপহার পাঠিয়েছেন পোড়া-ঘায়ের চিকিৎসার জন্যে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শুল্কছাড় যোগাড় করেছে কোভালস্কী। নইলে শুল্ক এবং ঘুষবাবদ শ'চারেক টাকা গলে যেত বেচারার। তবে ওষুধের অভাবটাই সব থেকে বেশি বোধ করছি। আমার যা কিছু পুঁজি সব রেখেছি একখানা টিনের তোরঙ্গের মধ্যে। কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্যে সামান্য কিছু সালফোন, ক্ষয়-রোগীদের চিকিৎসার জন্যে রাইফোমাইসিন, ম্যালেরিয়ার জন্যে কুইনিন এবং চর্ম-রোগের চিকিৎসার জন্যে কয়েক শিশি মলম। এ ছাড়াও, যে সব বাচ্চা অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের জন্যে আছে কিছু ভিটামিন বড়ি এবং সংক্রমণ থেকে বাঁচতে কিছু য়্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট। আমি জানি যে বড়াই করার মতন যথেষ্ট নয় এই পুঁজি। তবে কোভালস্কী যেমন জনে জনে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, তাতে মনে হয় মানুষের প্রীতি শুভেচ্ছা দিয়েই অভাবটাকে পুরিয়ে দেওয়া যাবে।'

ভারতবর্ষে কথা কানে হাঁটে। অর্থাৎ মানুষই হলো সব রকম সংবাদের সার্থক প্রচার মাধ্যম। আনন্দ নগরে যেদিন ডাক্তারখানা খুললো সেদিনই বস্তির সবাই

রটে গেল ঘটনাটা। গলিতে, রাস্তায়, ঘরে যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা সেখানেই তারা এই কথাই কানাবলি করলো। ওরা শুনেছে, আমেরিকা থেকে এমন একজন বড়লোক এসেছে যে বস্তির গরিব মানুষের দুঃখকষ্ট ঘোচাবার দায় নিয়েছে। মানুষটা নাকি মস্ত একজন ডাক্তারবাবু। সুতরাং এখন থেকে যার যত রোগবালাই আছে সব জুড়োবে ওই মানুষটার কাছে গেলে। ম্যাক্সের সাহায্যের জন্যে বন্দনাকে নিযুক্ত করেছে কোভালস্কী। বন্দনার মতন চালাক চতুর মেয়েই দরকার। নইলে নকল রোগীর ভিড় থেকে আসল রোগীদের বাছাই করে নেওয়া মুশকিল। বস্তির অনেক মানুষই রোগের ভান করে পড়ে থাকে। তাদের সনাক্ত করে আলাদা করা দরকার। নইলে যারা পুরনো রোগে ভুগছে এবং মনে করে যে তাদের রোগের নিরাময় হবে না, অথবা যাদের তখুনি চিকিৎসা হওয়া দরকার, তারা কেউ চিকিৎসার সুযোগ পাবে না।

ডাক্তারখানার কথাটা জানাজানি হতেই যেন রোগীর বান ডেকে গেল। দলে দলে মায়েরা আসছে কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে নিয়ে। বাচ্চাদের সকলেরই প্রায় একরকম রোগ। ফোড়া, ঘা, চুলকানি, মাথায় চুল না হওয়া ইত্যাদি। উৎকট তাপপ্রবাহ বা কোনো ভাইরাস সংক্রমণ থেকে এই রোগ বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়েছে। বাচ্চাদের অন্য অসুখও হয়। খুব সাধারণ যা তা হলো শ্লেষ্মাজ্বর এবং আন্ত্রিক জ্বর। প্রতি তিনজনের মধ্যে অন্তত দুজন শিশু এই রোগে ভুগছে। সব দেখে শুনে ম্যাক্সের মনে হলো নতুন ডাক্তারের কাজ শেখার পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষণকেন্দ্র হলো এইসব বস্তি। কতরকম অসুখ যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন অনেক রোগ আছে যেগুলো পাশ্চাত্যদেশে সম্পূর্ণ অচেনা। এইসব রোগ চেনা এবং চিকিৎসাবিধি নির্ণয় করা যে কোনো যুবক ডাক্তারের কাছে এক লোভনীয় প্রস্তাব। তবে একথাও ঠিক যে বন্দনার সাহায্য না পেলে ম্যাক্সের পক্ষেও এইসব রোগের লক্ষণ মেলানো দুঃসাধ্য হতো।

সেদিন ম্যাক্সকে একটা বাচ্চার চোখ দেখিয়ে বন্দনা বললো, 'ওর চোখের তারায় সাদা সাদা দাগ দেখেছেন?'

সত্যিই তাই। ম্যাক্স অবাক হলো। বন্দনা বললো, 'বাচ্চাটা দু-এক বছরের মধ্যেই অন্ধ হয়ে যাবে। ওটা হলো জ্যারপ্থ্যালমিয়ার লক্ষণ। ভিটামিন-এ'র অভাবে চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে।'

রুগীর ভিড়ে ম্যাক্স লোয়েব আর যেন থৈ পাচ্ছিল না। তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। পাঠ্যকেতাবে এতদিন সে যা শিখেছে, এখানে তার কিছুই কাজে লাগছে না। তৃতীয় বিশ্বের এইসব দেশের রোগব্যাধির কোনো হদিসই সে জানতো না। তার বিদ্যের তেমন জোর নেই যা দিয়ে সে এদের শারীরিক রোগতাপের উপশম ঘটাতে পারে। রোগের প্রকাশও অনেক রকম। চোখের তারা হলুদ হয়ে যাওয়া, নিয়মিতভাবে ওজন কমা, গলা ফোলা এবং ব্যথা হওয়া ইত্যাদি উপসর্গগুলির সঙ্গে তার তেমন পরিচয় নেই। তবুও এগুলো হলো ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এক মারাত্মক রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ। এ এমন এক রোগ যার মৃত্যুহার সর্বাধিক। এ রোগের নাম ক্ষয়রোগ। দি ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট ফর টিউবার-কুলোসিস নামক সংস্থার মতে ভারতবর্ষে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দুশ' ষাট মিলিয়ন।

প্রথম হপ্তায় মোট চারশ' উনআশিজন রোগীর চিকিৎসা করলো ম্যাক্স। ছবিটা তার চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ভাসছে। 'ওরা যেন মিছিল করে এল। কি

করুণ এবং মর্মস্পর্শী ওদের এই বিরামহীন আসা। মাঝে মাঝে ওদের চেহারা এবং হাবভাবে প্রাচীন গ্রামাত্মার ছোঁয়া লক্ষ্য করছিলুম। শিশুদের বাচ্চার গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়াও নেই। শুধু নাভির ওপর দুলছে সুতোয় বাঁধা একটা ঘুনসি। ওদের বুকের ধুকপুকুনি শুনে চিকিৎসা করাটাই আরও সুবিধাজনক। কিন্তু সহজভাবে সেটি করার জো নেই। ছোটছোট শরীরগুলো এত রোগা আর শীর্ণ যে আঙুলের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। পিছলে যায়। মেয়েরা এসেছে গা-ভরা গয়না পরে। অনেকের সারা গায়ে উল্কি আঁকা। ঘরে যার যেটুকু অলঙ্কার আছে সে তাই পরে এসেছে। হাতে একগাছি রঙিন কাঁচের চুড়ির সঙ্গে পরেছে কানে দুল, নাকে নোলক, পায়ে মল, আঙুলে আংটি। কারো কারো গলায় দুলছে সোনার বা রুপোর হার। লকেটের গায়ে খোদাই করা আছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন। মুসলমানদের চাঁদতারা, হিন্দুদের ত্রিশূল, খ্রীশ্চানদের ক্রুশচিহ্ন আর শিখেদের কৃপাণ। যারা অলৌকিকে বিশ্বাসী তারা পরেছে নানারকম তাগা তাবিজ আর কবচ মাদুলি।

'অনেক মেয়ে আর বালিকার হাতে পায়ে মেহেদি আঁকা। কেউ কেউ খিদে মারতে পান খেয়েছে। পানের রসে টুকটুক করছে ওদের মুখগুলো। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কেমন করে ত্বকের আসল রঙ আলাদা করবো। আমার বিব্রত অবস্থা দেখে ওদের হয়ত দয়া হলো। অন্যভাবে আমায় সাহায্য করতে চাইল। খুনখুনে বুড়োর মতন খকখক করে কেশে একদলা কফ্ হাতের তেলোয় ফেলে আমায় দেখাতে এল। কফের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলুম। রক্তবর্ণ কফের মধ্যে কোটি কোটি জীবাণু থিকথিক করছে। আমার শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল। আমার কাজের প্রথম দিন থেকেই কিছু কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার চেষ্টা কর-ছিলুম। জীবাণু-সংক্রমণ ঠেকাতে এই সতর্কতা খুবই দরকারী, বিশেষ এই পরিবেশে। তবে সেটাও খুব সহজ হলো না। একজন রুগী দেখার পর হাত ধোওয়ার জন্যে একখানা বেসীনও পেলাম না। একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলাম প্রথম দিনেই। এখানে স্বপ্ন বলে কিছু নেই। সবই বাস্তব, সবই সত্য। জীবাণু ব্যাধি, মৃত্যু এরা সবাই দৈনন্দিন জীবনের অংশ। পাশাপাশি হাঁটছে হাত ধরাধরি করে। একটি মেয়েকে দেখলাম শাড়ির আঁচল দিয়ে নির্বিবাদে পায়ের ঘা থেকে পুঁজরক্ত মুছছে। আর একজন আমার চোখের সামনেই হাতের চেটো দিয়ে তার ঘায়ের ওপর পাতলা করে লাগানো মলমটা রগড়ে দিল।

'তবে পাশাপাশি চুটকি মজাও অনেক হলো। ভারি উপভোগ্য সে সব ঘটনা। নিচু হয়ে একটা বাচ্চাকে পরীক্ষা করছি, হঠাৎ আমার গায়ে মুখে পেচ্ছাব করে দিল বাচ্চাটা। তার মা ভারি বিব্রত। তাড়াতাড়ি ঘোমটা সরিয়ে তার আঁচল দিয়ে আমার মুখখানা যত্ন করে মুছিয়ে দিল। একজন এসেছে বেশ কয়েক বছরের পুরনো প্রেসক্রিপশন নিয়ে। একদা মানুষটার ঘা হয়েছিল। সারার মুখের প্রেসক্রিপশন সেটা। রোজ ছ'টা করে এ্যাসপিরিন বড়ির ব্যবস্থা করেছে ডাক্তার। খুব হাসাহাসি হলো যখন সবাইকে শুনিয়ে ঘটনাটা বললো বন্দনা। কিংবা সেই বুড়ো লোকটার কথা! বুকের ওপর ঠাকুরের ছবির মতন এক্স-রে প্লেটখানা আঁকড়ে ধরে রেখেছে মানুষটা। বন্দনা আমায় বললো যে প্লেটখানা তোলা হয়েছে অন্তত কুড়ি বছর আগে। ওকে নিয়েও একটু হাসাহাসি হলো।

'তবে বস্তিতে চোখের জলের গল্পই বেশি। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলের গল্প সে-সব। হৃদয় মুচড়ে ওঠে বেদনায়। টনটন করে বুক। একটা কচি মেয়ের সর্বাঙ্গে

ফোস্কা যা। শুনলাম রেল লাইনের ধারে বসে মেয়েটা রোজ পোড়া কয়লা তোলে। সেদিনও তুলছিল আনমনে। হঠাৎ ইঞ্জিন থেকে গরম বাষ্প ছাড়লো। ঝলসে দিল মেয়েটার সারা শরীর। আর একটা ঘটনা বলি। ভারি সুন্দরী একটা মেয়ে এসেছে। ওর ফর্সা সুন্দর মুখের একজায়গায় একটা ছোট্ট সাদা দাগ। বন্দনার কি সন্দেহ হলো যেন। তাড়াতাড়ি একটা পিন ফুটিয়ে দিল ওই দাগের ওপর। এই সামান্য কাজটুকু দিয়েই বন্দনা যেন আমার চোখের ওপর থেকে একটা আবরণ সরিয়ে দিল। বন্দনা যে ব্যাধি নির্ণয় করেছে তা আজও মার্কিনী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পাঠ্যবিষয় নয়। ব্যাধিটির নাম কুষ্ঠ। ওই হিন্দু মেয়েটার কুষ্ঠ হয়েছে। আর একদিনের কথা। কুণ্ঠিত পায়ে একটি যুবক এল আমার কাছে। ছেলেটাকে পরীক্ষা করে বুঝলাম যে ওর সারা গায়ে মারাত্মক সিফিলিশ রোগ। এই রোগের বিষ যে কী ভয়ানক ছোঁয়াছে তা ও জানে না। বন্দনাকে দিয়ে সেই কথা বুঝিয়ে দিলাম। শুধু বউ নয় ওর ছেলেমেয়েরাও সংক্রমিত হতে পারে ওর এই রোগের বিষে। কিংবা সেই হতভাগ্য যুবতী মায়ের কথা যে একদিন এক দলা মাংসপিণ্ডের মতন আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো তার কোলের মরা ছেলেটা! এরা সবাই আমার কাছে কি চায় জানি না। হয়ত অলৌকিক কিছু। নইলে দলে দলে ওই সব কানা, খোঁড়া, বিকৃতাঙ্গ রোগজর্জর মানুষগুলো কি আশা নিয়ে সাহেব ডাক্তারের কাছে ছুটে ছুটে আসে?

'আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন রিকেট হওয়া কোলের বাচ্চাদের দেখি। হয়ত এ দৃশ্য দেখার অভ্যেস নেই বলেই আমার এই অস্বস্তি! বালরোগে হাড়-গোড়গুলো বেঁকেচুরে নজ্‌গজে হয়ে গেছে। কোলের মধ্যে শুইয়ে এনেছে মায়েরা। পেটটা ফোলা, মাথাটা বড়। কেমন যেন বিকটমূর্তি হয়েছে বাচ্চাগুলো। টেবিলের ওপর বাচ্চাদের শুইয়ে মায়েরা কাতর চোখে আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এক-দেড় বছর বয়স যাদের তাদেরও ওজন ন'পাউন্ডের কম। রোগে এবং অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে এত কাহিল যে মাথার খুলির ওপর পাতলা চামড়ার আবরণটাও উঠে যায়নি। ক্যালসিয়ামের অভাবে ওদের মাথার গঠনটা বিকৃত হয়ে গেছে। লম্বা সরু মাথাটা দেখতে হয়েছে মিশরের ম্যমীর মতন। এই ভয়ঙ্কর অপুষ্টির দরুন ওদের ব্রেনের সব সেল্‌গুলো বোধহয় মরে গেছে। তাই চেষ্টা-চরিত্র করে ওদের খাড়া করে তুললেও ডাক্তারি ব্যাখ্যায় নির্বোধ ছাড়া ওদের আর কিছু বলা যাবে না।'

ম্যাক্স পরে জেনেছে যে বস্তির এই রোগজর্জর শিশুরাই যেন সারা দেশের শিশু-অপুষ্টির এক করুণ দর্পণ। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার পর নিউট্রিশন ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া নামে এক বিশেষজ্ঞ সংস্থার ডিরেক্টর মহোদয় প্রমাণ করেছেন যে পুষ্টির অভাবের দরুন ভারতবর্ষে নিম্নমানের মানুষের (subhuman) সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এই বিশেষজ্ঞের মতে আগামী দিনের অনেক মানুষই পরিণত বয়সে সুস্থ সবল হয়ে বড় হবে না। অন্তত চোদ্দ কোটি ভারতীয়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধির নিষ্ঠুর শিকার হবে। ভারতবর্ষে প্রতি বছর যে দু'কোটি তিরিশ লক্ষ শিশু জন্মায়, তাদের মধ্যে মাত্র তিরিশ লক্ষ ভাগ্যবান শিশু পৌষ্টিক আহারাদি পেয়ে দেহেমনে সুস্থ হয়ে বড় হয়। হাজার চল্লিশ শিশু আট বছর বয়সের আগেই হয় মরে হেজে যায় নয়ত মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে বেঁচে থাকে। পাঁচ বছর বয়সের নিচে মোট পঞ্চান্ন শতাংশ শিশুরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মানসিক বা স্নায়বিক নানা রোগসমস্যা নিয়ে

তারা বেড়ে ওঠে। সমাজে এরাই হয় প্রবলেম চাইল্ড। ব্যবহারে, চালচলনে নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় এদের। বাকীরা বড় হয়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধিজনিত গলগন্ড ইত্যাদি রোগে ভোগে।

দ্বিতীয় দিনে কালো বোরখা পরা একটি মুসলমান সধবা মেয়ে কাপড়-মোড়া একটা পুঁটলি হাতে করে ম্যাক্সের ঘরে ঢুকলো। তারপর ন্যাকড়া জড়ানো পুঁটলিটা টেবিলের ওপর রেখে বোরখা সরিয়ে ম্যাক্সের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। মেয়েটার চোখের চাউনি কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ, বন্য। হঠাৎ একটা আশ্চর্য কান্ড করলো মেয়েটা। দুহাত দিয়ে বুকের জামাটা টেনে ছিঁড়ে দুহাত দিয়ে বুকের স্তনদুটো ধরে হা হা করে চেঁচিয়ে উঠলো পাগলিনীর মতন। 'এ দুটো শুকনো! মরে গেছে! একটুও দুধ নেই এর ভেতরে! শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে!'

ধক্ করে উঠলো ম্যাক্সের বুকটা। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মেয়েটা। ওর চাউনি অনুসরণ করে ম্যাক্স দেখলো মেয়েটা অপলক চোখে ক্যালেন্ডারের হাসিখুশি বাচ্চাটাকে দেখছে। বিজ্ঞাপনের ছবিটা দেখতে দেখতেই ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েটা। নেস্‌ল্ কোম্পানির দুধের বিজ্ঞাপন, যা খেলে শিশুরা স্বাস্থ্যপুষ্ট হয়। হঠাৎ মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্যালেন্ডারখানার ওপর। তারপর স্তম্ভিত ম্যাক্সের চোখের সামনেই পাতাখানা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দিল। ঠিক তখনই আর একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। তার কোলেও বাচ্চা! বাচ্চাটাকে বিমূঢ় ম্যাক্সের হাতে সঁপে দ্বিতীয় মেয়েটা আকুল স্বরে কেঁদে উঠলো যেন, 'নিয়ে যান সাহেব! একে নিয়ে যান আপনার দেশে! নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না।'

বিচ্ছিন্ন ঘটনা দুটো দুজন অভাগী মায়ের জীবনের ঘটনা। কিন্তু কি বিপুল হতাশা নিয়ে এই হতভাগ্য মায়েরা দিনের পর দিন কাটাচ্ছে তাই-ই যেন বলে দেয় এই দুটি হতভাগ্য ঘটনা। অভিভূত কোভালস্কী বলেছিল, 'এমন করুণাময়ী মায়ের জাত আর কোথাও আমি দেখি নি ম্যাক্স! এত স্নেহ এত মমতা আর কোনো জাতির মা তাদের ছেলেমেয়েদের দেয় না। নিজেদের বঞ্চিত করে, সাধ-আহ্লাদ খুইয়ে একটু একটু করে আত্মজকে বড় করে তারা। না, না, এমনটি হতে পারে না। যে ভালবাসা এত দেয় তা কখনও মরতে পারে না। তার ধারা কখনও শুকিয়ে যেতে পারে না। এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা/স্বর্গ কি হবে না কেনা?'

এখন ম্যাক্স লোয়েবও উপলব্ধি করেছে সত্যটা। তার মনে হলো যতদিন এই বাচ্চাদের যন্ত্রণাকাতর অসহায় মুখগুলো প্রতিকারহীন চোখে মায়েরা দেখবে, ততদিন আনন্দ নগরের মায়েদের চোখের এই ধিকিধিকি আগুন নিভবে না। সেদিন সন্ধ্যেতেই কলকাতা তাকে আর একটা স্মরণীয় সংবাদ উপহার দিল। একটা সান্ধ্য দৈনিক বড়বড় হেডলাইন দিয়ে সংবাদ বেরোল, 'কলকাতার চিকিৎসকেরা টেস্ট টিউব বেবির জন্ম দিল।'

বাহান্ন

'সবাই বলে যে গোক্ষুর সর্প দুবার ছুবলোয়। তা কথাটি মিথ্যে লয় বটে। বিপদটিও য্যাখন আসে সাথীটিকে সঙ্গে লয়ে আনে। বুকের মধ্যি লাল ব্যামো

ছেলাই। এবার আর একটি ঘা খেলাম। উচ্ছেদের নুটিশ। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙা চোখে তড়াক করে বিছানায় উঠে বসেই শুনলুম ট্রাকের ঘড়ঘড় শব্দ। অলকাকে ঠেলা দিয়ে বললুম, "ওই শুনো! হারামির বাচ্চারা ঠিক এয়েচে!"

সত্যিই তাই। হাসারি তখন উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসেছে। তারপর পরনের লুঙিগখানা ঠিকঠাক করে সে ছুটে এসে দাঁড়াল বাইরে। তখন সারা বস্তির লোক জমা হয়েছে বাইরে। খুব চীৎকার চেঁচামেচি চলছে। বেশ কিছুদিন ধরেই উচ্ছেদের গুজবটা শুনে আসছিল সবাই। তাই 'বেজন্মা'রা এসে পড়েছে। ওদের সংগে এসেছে একটা বুলডোজার আর পুলিসঠাসা দুটো পুলিসভ্যান। পুলিসরা সবাই মোটামুটি সশস্ত্র। হাতে ঢাল, লাঠি আর কাঁদানে গ্যাসের সেল্। একটু পরেই দলবলের সংগে কালো একখানা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে যোগ দিল। গাড়ির ভেতর থেকে ধুতিপরা দুজন বাবু নামলো। সার্টের ওপর কোট চড়ানো সাবেক কালের পোশাক দুজনের। গাড়ি থেকে নেমে ওরা একবার পুলিস অফি-সারের সঙ্গে সামান্য দু-একটা কথা বলে সোজা এসে দাঁড়ালো ঝুপড়ির মানুষ-গুলোর মুখোমুখি।

এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে তার হাতেই কিছু কাগজপত্তর আছে। কথা শুরুর আগে হাতের কাগজগুলো নাড়িয়ে সে বললো, 'কলকাতা পুরসভা থেকে তোমাদের ঘরদোর ভাঙার হুকুম এসেছে।'

'কেন?'

মানুষগুলোর অর্বাচীন উত্তর শুনেই ভুরু কুঁচকে উঠলো বয়স্ক লোকটার। না, না, এ ভাল কথা নয়! গরিব মানুষ গরিব মানুষের মতন থাকবে। মুখে মুখে জবাব দেবে না। সেটাই রীতি। তাহলেও কারণ ব্যাখ্যা করে জবাব দিল সে। বললো, 'কারণ জানতে চাও? এখানে নতুন সাবওয়ে হবে। তোমাদের এই ঝুপড়িটা কাজ আটকে দিয়েছে। তাই এটা ভাঙার হুকুম হয়েছে।'

বস্তির লোকগুলো এ ওর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। সবাই বিমূঢ়। হাসারির বিস্ময়টা অন্যরকম। সাবওয়ে কি বস্তু? কেউ কি জানে? হাসারির পাশে থাকে অরুণ। অরুণ দেশদেশান্তর ঘোরা মানুষ। কিন্তু সেও বলতে পারলো না। বাবুটি এবার হাতঘড়ি দেখে বললো, 'এখন থেকে দুঘণ্টা সময় দেয়া হলো। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ঘর ছেড়ে দাও। তারপর...'

বাবুটি আর কথা বাড়ালো না। অযথা বাক্যব্যয়ে কি লাভ? তার চেয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। বাবুটি তখন ইঙ্গিতে অদূরে দাঁড়ানো বুলডোজারখানা দেখিয়ে দিল। সে এসেছে খুবই তুচ্ছ একটা সরকারী হুকুম এদের জানাতে। তাই গলা চড়িয়ে কথা বলার কি দরকার! লোকগুলো চুপচাপ শুনলো। প্রতিবাদের একটা কথাও বললো না। কিন্তু ওরা এত চুপচাপ কেন হলো? বাবুরাও তাই কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। সবাই আশংকা করেছিল হুকুম শুনে কিছুক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ, তর্কাতর্কি হবে। কিন্তু না। কিছুই হলো না। 'কিন্তু কেন হবে না পিতিবাদ? ওরা কি আমাদের ইঁদুর আরসুলা ভেবেছ্যে! তাই দূরদূর কর‍্যে তাড়াতে চাইছে?'

সত্যি কথা বলতে, কেউই চায় না আশ্রয়টুকু হারাতে। বস্তির ঘর হলেও মাথার ওপরে একটা চালা ত বটে! চট মোড়া হলেও রোদবাদল ঠেকায়! রাতটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ঘুমোতে পারে। এই আশ্রয়টুকু চলে গেলে ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাদের। তবু কেন প্রতিবাদ করছে না কেউ?

আসল কারণ হলো যে, প্রতিবাদ করার জোর আর তাদের নেই। কোনো সংগতিও তাদের নেই। নিষ্ঠুর শহর তাদের মনের সব সাহস, বল শুষে নিয়েছে। প্রতিবাদ করার জোর কেড়ে নিয়েছে। বলভরসা যোগান দেবার মানুষও এই পচা ঝুপড়িতে নেই। না আছে ইউনিয়ন না কোনো রাজনৈতিক দাদা। মাস্তানরা প্রতি মাসে আসে ভাড়ার টাকা আদায় করতে। কিন্তু তাদেরও ধারেকাছে দেখা গেল না। সবচেয়ে বড় কথা, ক্রমাগত মার খেয়ে ওরা নিঃসাড় হয়ে গেছে। তাই নতুন মারের ধাক্কায় চেতনা উস্‌কে উঠলো না। ওরা মরেই রইলো। এটাই ওদের কর্মদোষ!

বাবু দুজন আর মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাত ধরাধরি করে গাড়িতে উঠে বসলো। পুলিস আর বুলডোজারখানা রইলো। রইলো বস্তির লোকজনও সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটলো। যেন মাটি ফুঁড়ে একটা উৎপাত গজিয়ে উঠলো হাসারির চোখের ওপর। সেই অরুণ নামের ছোকরা চকিতে একটা বাঁশের খোঁটা তুলে নিয়ে হৈ হৈ করে ছুটে গেল শান্তি-রক্ষকদের দিকে। ওর দেখাদেখি একজন একজন করে প্রায় সবাই। রাগ-বিদ্বেষের ঝাঁজ লেগে ওদের সারা গা যেন জ্বলছে। একটার পর একটা ঝুপড়ি ভেঙে বাঁশ ও কাঠের খোঁটাগুলো টেনে তুলছে সবাই আর তেড়ে যাচ্ছে পুলিসের দিকে। হতভম্ভ পুলিসগুলো হাতের লাঠি ব্যবহার করার সুযোগই পেল না। বিনাবাধায় পুলিস-দের ধরাশায়ী হতে দেখে মানুষগুলোর প্রতিশোধস্পৃহা তখন যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। ধরাশায়ী পুলিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁশ কাঠ পেটা করছে। ঘরের মেয়েরাও থেমে নেই। বাচ্চারাও খুশীতে চেঁচাচ্ছে। হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছে ইঁট কাঠ বাঁশ। হাসারি স্তম্ভিত। যেন ছোটখাট একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেল জায়গাটা। একজনকে দেখলো হাতে কাঁটা নিয়ে একজন আহত পুলিসের চোখের দিকে ছুঁড়ে দিল। এক বোতল প্যারাফিন এনে পুলিসের গায়ে ঢেলে দিল একটা লোক। কয়েকজন পুলিস টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হাতে পেট্রলের বোতল নিয়ে কয়েকজন লোক তেড়ে গেল ওদের দিকে। একটা লোক সেই অবসরে বুল-ডোজারটার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো গাড়িখানা। দাউ দাউ করে সেটা তখন জ্বলছে। আকাশখানা ছেয়ে গেছে কালো ধোঁয়ায়। লড়াইয়ের তেজ তখন কমে এসেছে। সমস্ত বস্তিটা যেন শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। আহত পুলিসগুলো একজায়গায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে পুঁটুলির মতন। সে এক বিসদৃশ্য যেন। প্রায় ছাই হয়ে গেছে অমন নিরেট শক্ত বুলডোজারখানা। ভাঙা ঝুপড়িগুলো মুখ থুবড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এখানে ওখানে আধপোড়া বাঁশ আর কাঠের টুকরো। যেন ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে বস্তির ঘাড়ের ওপর দিয়ে। বস্তি ভাঙতে বুলডোজার ব্যবহার করার দরকার হলো না। ওরা নিজেরাই ঘর-সংসার ভেঙে দিয়ে কর্তব্য শেষ করলো। গরিব মানুষের ক্রোধ আর ঘৃণাই বুলডোজারের কাজটুকু সম্পন্ন করলো। আশা করা যায় এবার বোধহয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবওয়ের কাজ শুরু হতে পারবে।

এখনই বদলা নিতে দলবল নিয়ে পুলিস এসে পড়বে। তার আগেই সরে পড়া দরকার। গৃহস্থালির সবই গেছে তছনছ হয়ে। যা অবশিষ্ট ছিল সেগুলো হাতে হাতে গুছিয়ে নিল অলকা। রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেতে যেতেই পুলিসের গাড়ির সাইরেন শুনলো ওরা। আবার বাস্তুহারা হলো হাসারিরা। এবার কোথায় ঠাঁই হবে কে জানে! দলে দলে ঠাঁইনাড়া গৃহহীন মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছে সবাই। এই প্রতিযোগিতার ভিড়ে হাসারি কি পারবে ফুট-

পাতে একটু জায়গা পেতে? আশা করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না হাসারিরা। কিন্তু ঠাকুর কি কৃপা করবেন তাকে? আজ কলকাতার সব ঠাকুরই ত কালা হয়ে গেছেন।

একটু আশ্রয়ের খোঁজে ওরা সারা সকালটা পথে পথে ঘুরলো। শেষ পর্যন্ত লোয়ার সার্কুলার রোডের একটা গির্জার ফটকের কাছে ওদের পথচলা থামলো। ফটকের সামনের ফুটপাতে ইতিমধ্যেই কয়েক ঘর আদিবাসী ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার পেতেছে। হাসারি শুনেছে এরাই তাদের দেশের আদিমতম অধিবাসী। কিন্তু কি শোচনীয় দুরবস্থা এই মানুষগুলোর? হাসারির মনে হচ্ছিল তার নিজের অবস্থার চেয়েও নির্মম করুণ এই মানুষগুলোর অবস্থা। এই জায়গাটা বাছার একটা সুবিধে হলো যে এর কাছেই জলের টেপাকল আছে। তাছাড়া পার্ক-সার্কাসের রিক্সাস্ট্যান্ডটাও খুব নিকটে। রোজ ভোরে এই স্ট্যান্ড থেকেই সে রিক্সা তোলে। আজকাল সে আর একজনের সংগে ভাগে রিক্সা চালায়। লোকটা বিহারী মুসলমান। নাম রহমতুল্লা। মানুষটার ধর্মবোধ আছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে এই বয়সেই। গলায় একটা চেন ঝুলছে। চেনের সংগে একটা ছোট্ট কোরান বাঁধা। রহমতুল্লা খাটিয়ে মানুষ। দরকার হলে ভোর চারটে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সে যাত্রী টানতে পারে। তার লক্ষ্য একটাই। যতটা পারা যায় সে সঞ্চয় করে সংসারের জন্যে। রিক্সার পা-দানির ওপর বসেই সে রাতটুকু ঘুমোয়। তখন হাতলের দুপাশে তার সরু ঠ্যাংদুটো শিথিলভাবে ঝুলে থাকে। ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই আরাম-দায়ক নয়। তবে এর দরুন রিক্সা পাহারার কাজটাও সে করতে পারে।

বন্ধু হিসেবে রহমতুল্লা ভারি চমৎকার মানুষ। মনটাও খুব উদার। অন্তত হাসারিকে সে ভালবাসে। তার খুকখুক কাশির সংগে রক্তপড়ার ছবিটা রহমত দেখেছে। তাই অনেকভাবেই সে সাহায্য করেছে হাসারিকে। রোজ ভোরে ঠিক সময়ে হাজির হতে না পারলে রহমত নিজেই হ্যারিংটন স্ট্রীটের একটা বাড়ি থেকে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেয়। এটা হাসারির বাঁধা টাকার কাজ। এই মাস মাইনের কাজে গাফিলতি হলে হাসারির ক্ষতি হবে। কত রিক্সাওলাই ঘুরঘুর করছে এই বাঁধা টাকার কাজ পেতে। কিংবা বেলা শেষে হাসারি যখন ক্লান্ত, দিনের শেষ সওয়ারি টানার ক্ষমতা আর নেই, তখন রহমতই যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। শুধু তাই নয়, বদলির কাজ করে সে যা রোজগার করে সেটুকুও অসুস্থ হাসারির হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দেয় রহমত।

কিন্তু সেদিন সকালে হাসারিকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠলো রহমতুল্লা। এ কি চেহারা হয়েছে হাসারির! তার মুখ দেখে হাসারিও বিপন্ন বোধ করলো। কিন্তু না। রহমত সন্তুষ্ট হলো না। তার কোমল দুটি চোখ যেন আরও কিছু খুঁজছে হাসারির বিপন্ন মুখচোখ থেকে। একসময় রহমত বললো, 'তুমহাকে এখনই আমার সোংগে ডাগদারের কাছে যেতে হবে।'

'ডাক্তার?'

'হাঁ, হাঁ। ডাক্তার। তুমহার মুখটা শুকিয়ে গেছে শুকনো লিম্বুর মতন। উঠো! রিক্সায় উঠো! আজ তুমিই হামার পেরথম সওয়ারী।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই হিন্দু বন্ধুকে সওয়ারী করে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের এক ছোট্ট ডাক্তারখানার সামনে এসে দাঁড়াল মুসলিম বন্ধুটি। এটা এক কবিরাজের ডাক্তার-খানা। এ অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ কবিরাজ হিসেবেই এ'র নামডাক। বেশিরভাগে আরও

দুজন রোগী বসে আছে। হাসারি তিন নম্বর রোগী। মোটাসোটা গোলগাল চেহারার মানুষটার মাথাজোড়া টাক। ধপধপে সাদা ধুতি পরে একটা হাতলওলা চেয়ারে বসে আছেন রাজামশাইয়ের মতন। ছোট্ট ঘরখানার দেওয়াল জুড়ে কাঁচের শিশি, বোতল, জার। নানারকম ভেষজ শিকড়বাকড় আর গুঁড়ো ওষুধ ভরা আছে থরে থরে সাজানো শিশিবোতলের মধ্যে। একজন করে রোগী দেখা শেষ করে শিশি থেকে নির্বাচন করে ওষুধ বের করে সেগুলি নিক্তিতে মেপে তারপর ওষুধ বানান তিনি। তাই রুগী দেখতে সময় লাগে কবিরাজমশাইয়ের।

একসময় হাসারির ডাক পড়লো। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। একবার টাক মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর হাসারির বয়স জিজ্ঞেস করে তাকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাসারি দেখলো অন্তত দশরকম শিকড়বাকড় বার করে সেগুলো নিক্তিতে মেপে আরও কয়েকরকম ট্যাবলেট গুঁড়িয়ে ওষুধ তৈরি করলেন তিনি। ওষুধের সঙ্গে এক মাত্রা য়্যালকোহলও মেশানো হলো যাতে রুগী দুর্বল না হয়ে পড়ে। ওষুধের দাম কুড়ি টাকা। হাসারির চক্ষুস্থির। তার মনে হলো এর চেয়ে ফুটপাতের হাতুড়ে বদ্যিই ভাল। টাকাটা দেবার পর থেকেই হাসারির মন খচ্‌খচ্‌ করছে। কিন্তু রহমত তাকে বোঝালো যে এই ডাক্তারবাবু নাকি বুকের ব্যামোর সুচিকিৎসা করেন। তার আরও দুজন বন্ধুর এইরকম লালজ্বর হয়েছিল। ইনিই নাকি সারিয়ে দিয়েছেন তাদের। রহমতের কথা শুনে মনে মনে হাসলো হাসারি। ভান করলো যেন তার সব কথাই বিশ্বাস করে নিয়েছে সে। কিন্তু মনেপ্রাণে সে জানে যে, এ রোগের 'চিকিচ্ছে' নেই। নইলে রামের মতন অমন শক্তপোক্ত মানুষ এই রোগে মরতো না।

পার্ক সার্কাসে ফেরার সময় পেছনে গাড়ির টায়ারের কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল হাসারি। ট্যাক্সি নিয়ে মানিক ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানিকের মুখচোখে কেমন এক বন্য ভাব। যেন এখুনি গোটা তিনেক 'বাঙ্‌লা' শেষ করে এসেছে। কিন্তু মানুষটার হাসিমুখ দেখেই হাসারির নেতিয়ে পড়া মনটা যেন চনমন করে উঠলো খুশীতে। তাই-ই হয়। মন যখন গভীর নৈরাশ্যে ডুবে থাকে, যখন বিপন্ন মন সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিও যোগাতে পারে না, তখন এমন হাসি-হাসি চেনা মুখ চোখে পড়লে দারুণ প্রসন্ন হয়ে ওঠে মন। হপ্তাখানেক ধরে অবিরাম বর্ষণের পর যেদিন প্রথম সূর্য ওঠে সেদিনের মতন ঝলমলে হয়ে গেল হাসারির মনের বিষণ্ণ আকাশ।

বিহ্বল হাসারিকে চেয়ে থাকতে দেখে গাড়ির ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো মানিক।

'আরে! তোমাকেই ত খুঁজছি বন্ধু! একটা দারুণ খবর এনেচি তোমার জন্যে! কিন্তু তার আগে মাল খাওয়াতে হবে।'

বলতে বলতেই ট্যাক্সির দরজা খুলে হাসারি আর রহমতকে গাড়িতে তুলে নিল মানিক। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের পেছনের গলিতে একটা গোপন ঠেক আছে। মানিক তার সন্ধান জানে। ওদের দুজনকে সেখানেই নিয়ে গেল সে। তারপর দু বোতল 'বাঙ্‌লা' আনালো। প্রথম গেলাসটা শেষ হতেই মানিকের চোখদুটো ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগলো উৎসাহে। জ্বলজ্বলে চোখে হাসারির দিকে চেয়ে ঈষৎ জড়ানো গলায় মানিক বললো, 'আমাদের বস্তিতে একটা ঘর খালি হবে শীগগির। ঘরখানা যে ভাড়া নিয়েছিল সে গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। তোমার জন্যেই আমি ঘরখানা মনে মনে ঠিক করেচি। বেশ ভাল ঘর। মাথার ছাতটা পাকা, মেঝেও পাকা। আবার একটা

দরজাও আছে। কি পছন্দ হচ্ছে...'

কিন্তু ওইটুকু শুনতে শুনতেই হাসারির চোখে তখন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। মাথার মধ্যে তখন উন্মত্ত কোলাহল। যেন কয়েকশ' রিক্সার ঘণ্টি বিরামহীন হিংস্র কলরবে বেজে চলেছে মাথার মধ্যে। হঠাৎ সে দেখলো চোখের সামনে একটা আবছা মূর্তি যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আর চুলের ঝুঁটি ধরে তার মাথাটা একটা শক্ত জিনিসের গায়ে ধাক্কা মারলো। এরপরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল হাসারি। একটা আধো অচেতন অবস্থা তখন তার। 'আর কিছু মনে নেই আমার। একসময় জ্ঞান ফিরলে দেখলুম মাটিতে শুয়ে আচি। আমার মুখের উপর দুজনের লালপানা মুখ ড্যাবড্যাব কর‍্যে চেয়্যে আছে। ও দুখানি মানিক আর রহমতের মুখ। শক্ত শক্ত হাতে উয়ারা ত্যাখন আমার গালে ঠাসঠাস করে চড় মারছিল, যাতে আমার জ্ঞানটি ফিরে আসে।'

তিপ্পান্ন

যতরকম পোকামাকড় আর জীবজন্তু নিয়ে ম্যাক্স লোয়েবকে ঘর করতে হয়, তাদের মধ্যে সবথেকে বিতৃষ্ণাউদ্রেককারী জীব বোধহয় আরসোলাজাতীয় জীব। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে এদের সংখ্যা। তাছাড়া জীবটি যে সর্বভুক তা যেন এই ক'দিনেই টের পেয়েছে ম্যাক্স। কীটবিনাশক ওষুধের বিষক্রিয়া ঠেকিয়ে খাদ্য অখাদ যতরকম বস্তু আছে, মায় প্লাস্টিক পর্যন্ত, সব তারা অনায়াসে উদরস্থ করে ফেলে। দিনের বেলায় এদের তেমন দাপট চোখে পড়ে না। মুখ লুকিয়ে নিরীহ ভাবে গোপন জায়গায় ঢুকে থাকে। কিন্তু অন্ধকার হলেই এদের রুদ্রমূর্তি বেরিয়ে পড়ে। সেইসব গোপন রন্ধ্র থেকে তখন পিলপিল করে বেরিয়ে পড়ে তারা। তার-পর ত্বরিত পায়ে ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। মানুষ নামক উচ্চতর জীবকেও এরা গ্রাহ্য করে না। হাত পা থেকে শুরু করে মুখ পর্যন্ত সর্বত্র এদের বিচরণ অবাধ এবং নিঃসঙ্কোচ। আরসোলাজাতীয় জীবদের মধ্যে সবথেকে দুর্ভেদ্য হলো কালো গুবরে পোকা। এদের শরীরের গড়ন লম্বাধাঁচের এবং বাদামি রঙের তেলা-পোকাদের মতন পেটের বেড় তত স্থূল নয়। তবে সংসারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে প্রকৃতিকেও নিষ্ঠুর হতে হয়। তাই খাদ্য ও খাদক এই দুই শ্রেণীর জীবেরই অস্তিত্ব টিকে আছে। সুতরাং আরসোলা এবং গুবরে পোকাদেরও শত্রু সংসারে আছে। ঘরের চালের বাঁশের কড়িবরগার গায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জালের আশ্রয়ে ঝুলে থাকা অতিকায় দাড়াওলা অষ্টপদী মাকড়সারাই এদের নির্মম শত্রু। অক্টোপাসের মতন দাড়াগুলি ছড়িয়ে এরা দিব্যি ঘরের চালে বাস করছে এবং প্রয়োজনমত শিকার ধরছে।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যেবেলাতেই একটা মজাদার দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হলো ম্যাক্সের। কুপির ম্লান আলোয় একটা টিকটিকির গতিবিধি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল ম্যাক্স। বাঁশের কড়ির গা বেয়ে একটা গুবরে পোকাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে টিকটিকিটা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অর্থাৎ শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তেই শিকারটা হাতছাড়া হয়ে গেল তার। তবে পোকাটারও অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তাই কৌশলগত একটা মারাত্মক ভুল করে বসলো পোকাটা। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো ঊর্ণনাভের পেটের মধ্যে। ম্যাক্স স্তম্ভিত হয়ে দেখছে পরের

ব্যাপারটা। শিকারটিকে কেমন চকিতে দাঁড়ার আবেষ্টনীর মধ্যে আঁকড়ে ধরলো মাকড়সাটা এবং বঁড়শীর মতন দুখানি বাঁকানো শুঁড় চকিতে ঢুকিয়ে দিল শিকারের পেটের মধ্যে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই গুবরে পোকাটাকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেললো মাকড়সাটা। তারপর ডিমের খোলার মতন সেটাকে ফেলে দিল। এমন দন্ডপ্রাপ্তির ব্যাপারটা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজই ঘটছে। রোজ সকালে পাজামা পরার আগে ম্যাক্স সেটি বুঝতে পারে। ভাল করে ঝেড়েমুছে তবে সেটিকে ব্যবহার করতে পারে। নইলে মরা পোকামাকড়ের শুকনো দেহগুলো প্রায়ই তার পরনের প্যান্ট বা পাজামার মধ্যে লেগে থাকে।

এখানে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই এমন একটা ঘটনার বলি সে হলো যার দরুন ম্যাক্সের মনে হলো এইসব সহবাসকারী জীবজন্তুদের সংগে সে দীর্ঘদিন ঘর করছে। অন্তত এদের স্বভাব চরিত্রের ব্যাপারটা এই ঘটনার পর থেকে আরও ঘনিষ্ঠ হলো তার কাছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তার খাটিয়ার ওপর আধশোয়া হয়ে সে একটা বই পড়ছিল। হঠাৎ দেখলো মাটির দেওয়াল বেয়ে সরসর করে একটা জন্তু তার দিকে এগিয়ে আসছে। ফড়িংয়ের চেয়ে সামান্য বড় জন্তুটাকে দেখেই ম্যাক্সের গা হিম হয়ে গিয়েছিল। বিছানা থেকে লাফিয়ে সরে যাবার আগেই জন্তুটা তার পায়ের গোড়ালিতে হুল ফুটিয়ে দিল। হুল ফোটানোর সংগে সংগেই সে তখন চীৎকার করে উঠেছে। যন্ত্রণার চেয়ে ঢের বেশি ভয় ধরেছে তখন তার। তবে কাতর হলেও চৈতন্যহীন হয়নি। পায়ের চটিজোড়া দিয়ে কাঁকড়া বিছেটাকে আগে পিষে দিল। তারপর পায়ের উরুতে শক্ত করে বাঁধন দিল, যাতে বিষের প্রভাবটা শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে না যায়। কিন্তু এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বিষক্রিয়া ঠেকাতে পারলো না ম্যাক্স। ধীরে ধীরে সারা অংগ তার অবশ হয়ে আসছে তখন। সংগে দারুণ বমিবমি ভাব। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বরফের মতন ঠান্ডা হয়ে এল শরীর। সেই সংগে শুরু হলো দারুণ কাঁপুনি। খানিক পরেই সে ভুল বকতে শুরু করলো এবং নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলো। তারপর বেঘোর অচৈতন্য অবস্থায় বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লো।

'সেদিন কতক্ষণ এই ঘোর ছিল জানি না। ঘোর কাটলে মনে হলো আমার জ্বরতপ্ত কপালে একটা ভিজে ন্যাকড়া জড়ানো আছে। আর খানিক পরে দেখলাম আমার মুখের দিকে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে আছে দুটি উজ্জ্বল হাসি হাসি চোখ। চাপা হাসি মাখানো সেই ছোট ছোট দুটি বাদামি চোখ দেখে মন যেন ভরে উঠলো স্বস্তিতে। মনে হচ্ছিল আমি যেন বেঁচে উঠেছি। আমার চারপাশে তখন অনেক মানুষের ভিড়। বেশ রোদঝলমল দিন। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমায় নিয়ে। কেউ পা টিপে দিচ্ছে। বাচ্চারা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে। কয়েকজন আমার নাকের কাছে তুলো ধরে আমায় ঘ্রাণ নিতে বললো। বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধে আমার গা গুলিয়ে উঠছিল তখন। কেউ আমার মুখের কাছে চড়া পানীয় এনে খেতে বললো। আরও অনেকে কতরকম কথা বলছিল। কি তারা বলছে কিছুই কানে ঢুকছিল না।'

মোটকথা সেদিনকার ঘটনাটা বস্তির আপাত নিস্তরংগ জীবনে একটু যেন অন্যরকম। বস্তির অনেক মানুষ তার কাছাকাছি হবার সুযোগ পেল যেন। ম্যাক্সকে নিয়ে ব্যস্ত হলেও নানারকম মতামত প্রকাশের সুযোগ পেল তারা। তবে মার্কিন এই যুবকটির কাছে যেটা সবচেয়ে অবাক লাগলো তা হলো মানুষগুলোর নিরুদ্বেগ মনোভাবটা। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। কোনোরকম গুরুত্বই দেওয়া যায় না কাঁকড়া বিছের কামড়ের যন্ত্রণাকে। এ যেন অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা। একজন ত

বললো যে মোট সাতবার তাকে বিছার কামড় খেতে হয়েছে! আর একজন তার উরু দেখিয়ে বললো, 'গোক্ষুরের ছোবল সায়েব! গোক্ষুরের ছোবল!'

লোকটা এমন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো যেন মনে হলো বৃশ্চিক দংশন অতি তুচ্ছ। আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকগুলোর নিস্পৃহ উদাসীন ভাবটাই ম্যাক্সের কাছে আরও বিস্ময়কর। অথচ মজার ব্যাপার হলো যে প্রতি বছর এই বস্তিতেই দশ থেকে পনের জন মানুষ কাঁকড়া বিছার কামড়ে প্রাণ হারাচ্ছে।

ঘোরটা তখন প্রায় কেটে গেছে। বন্দনার মুখের দিকে চেয়ে ম্যাক্স ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি করে জানতে পারলে?'

মুখ টিপে একটু হেসে বন্দনা বললো, 'ভোরবেলা যখন সবাই দেখলো যে আপনি পায়খানায় গেলেন না, তখনি সবাই ধরে নিয়েছিল যে আপনি বোধহয় অসুস্থ। তারপর যখন চান করতেও গেলেন না, তখন সবাই মনে করে নিল যে আপনি নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। তখনই ওরা আমায় ডাকতে যায়।'

একটু থেমে বন্দনা ফের বললো, 'এখানে কিছুই লুকিয়ে রাখা যায় না ম্যাক্স-ভাই। এমন কি আপনার মনের গোপন রঙটাও আমাদের কাছে আর লুকনো নেই।' কথাটা বলেই ফিক করে হেসে ফেললো বন্দনা।

চুয়ান্ন

এটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হবে যদি বলা যায় যে, খবরটা পেয়েই আনন্দে উর্ধ্বাহু হয়ে নাচানাচি শুরু করে দিল কোভালস্কী। তবে এ যে ঈশ্বরের নির্দেশই হলো সে ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ ছিল না। তার জীবনের এক দারুণ সঙ্কটের কাল চলছে এখন। এই সময়েই ঈশ্বর যেন তার জীবনের ব্রতটি যথার্থ বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। এমন এক সময় তাঁর নির্দেশ সে পেল যখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে সে। একদিন সে সব দুঃখই ভাগ করে নিয়েছে। সব বাধাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু সেই সাহস আর আত্মশক্তি এখন নেই। সত্যিই ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে। বস্তির এই অসহ্য গরম আর সে সইতে পারছে না। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ধাঙড় ধর্মঘট। নোংরা শৌচাগার, পায়খানা আর বস্তির পথঘাট দেখলে গা ঘিনঘিন করে। একটা আঁস্তাকুড় হয়ে উঠেছে আনন্দ নগর। আর যেন সে সইতে পারছে না এই কষ্ট। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসে না। গলগল করে ঘামতে ঘামতে মন ছুটে যায় তার গ্রামে। স্বপ্ন দেখে উদার বিস্তীর্ণ গমক্ষেতের কিংবা ব্রিটানীর নির্জন সমুদ্র-সৈকতের। আসলে মনটা তার বাঁধা থাকতে চাইছে না এই সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে। ছড়িয়ে পড়তে চাইছে গ্রামের মাঠঘাট প্রান্তরের সৌরভের মধ্যে, নির্জন অরণ্য-প্রকৃতির মধ্যে কিংবা যত্ন করে সাজানো ফুলের বাগানে। যখন এই বস্তিতে সে প্রথম ঘর করতে এল তখন সে প্রায়ই তার কান দুটো চেপে রাখতো। মানুষের দুঃখের কথা শুনতে চাইত না সে। এখন সে যেন চোখের ওপরেও পর্দা ফেলতে চাইছে যাতে বস্তির কিছুই আর দেখতে শুনতে না হয়। আসলে দারুণ এক মানসিক অবক্ষয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে সে। এমনকি ম্যাক্স লোয়েবের সান্নিধ্যও তাকে যেন টেনে তুলতে পারছিল না। মনের যখন এইরকম দুঃসহ অবস্থা কোভালস্কীর, তখনই একদিন শান্তাকে নিয়ে আশিস খবরটা দিতে এল তাকে।

হয়ত একটু দ্বিধা ছিল শান্তার। তাই সসংকোচে বললো, [illegible]

আমাদের পাড়ায় একটা খালি ঘরের সন্ধান আছে। ঘরটা ভাল। তবে অনেকদিন খালি পড়ে আছে। আগের ভাড়াটে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল, তাই লোকে ও ঘরে থাকতে চায় না। আমাদের ঘরের পাশেই এ ঘরটা।'

যে পাড়ায় কোভালস্কীর নতুন ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে প্রায় শতখানেক লোক কায়ক্লেশে থাকে। দীর্ঘদিন একসংগে বাস করছে ওরা। এখানেই তাদের জন্ম, কর্ম এবং মৃত্যু। খাওয়াপরা, অনাহারে দিন কাটানো সবই হয় একসংগে। হাসিকান্নার ঘটনাও একরকম। একই রকম মান-অপমান বোধ। প্রেম-ভালবাসা-ঘৃণার প্রকাশও একরকম। একইরকম দুঃখ-বেদনা কিংবা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। অনেকদিন ধরেই কোভালস্কী চাইছিল তার আপাত নিঃসংগ জীবনের সংকীর্ণ বৃত্তপথ থেকে বেরিয়ে আসতে। চাইছিল বৃহত্তর কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এখন সেই ব্যবস্থা-টাই পাকা করে এসেছে শান্তা আর আশিস।

আশ্রিত কোভালস্কীকে ওরা নিয়ে এল পাড়ার সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটির কাছে। সে নাকি এককালে নাবিকের কাজ করতো। কলকাতা বন্দরে ছুটি কাটাতে এসে শুঁড়িখানায় পড়ে থাকার দরুন তার চাকরিটা খোয়া যায়। সেই থেকে সাতাশ বছর এই বস্তিতেই থেকে গেছে কৃষ্ণ। লোকটার অসম্ভব রোগা চেহারা, নিশ্বাসের সাঁই সাঁই শব্দ আর ভাঙা গলার স্বর শুনে মনে হয় যেন মানুষটা ক্ষয়রোগে ভুগছে। কোভালস্কীকে সংগে নিয়ে পাড়ায় ঘুরে সকলের সংগে আলাপ করিয়ে দিল কৃষ্ণ। সবাই খুশী হয়েছে কোভালস্কীকে পেয়ে। শান্তা বুঝিয়ে দিল যে তাদের অনেক ভাগ্যি তাই এমন মানুষটিকে তারা কাছে পেল। তাদের ধারণা যে ফাদার সাহেব কল্পতরু হয়ে তাদের মধ্যে থাকবেন।

পঁয়ত্রিশ ফুট বনাম ন' ফুট আয়তক্ষেত্রের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করছে মোট এগারোটি পরিবার। এই এগারোটি পরিবারের লোকসংখ্যা আশীজনের মতন। এরা সবাই হিন্দু। এটাই নিয়ম। একই পাড়ায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা প্রায়ই একসংগে বাস করতে চায় না। অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য ধর্মীয় মতবিরোধ উৎকট ধর্মীয় দাংগায় পরিণত হয়। হিন্দু পড়শীর দোরগোড়ায় উনোন ধরিয়ে গোমাংস রান্নার চেষ্টা একধরনের উস্কানি, কারণ একটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাসে গোজাতিকে সসম্মানে পুজো করা হয়। শুয়রের মাংস রান্নার ক্ষেত্রেও একইরকম ধর্মীয় অভিমান কাজ করে। মোটকথা, যে সমাজে ধর্মীয় আচারবিচারগুলো এমন নিষ্ঠার সংগে মেনে চলা হয়, সেখানে বাদানুবাদের সম্ভাব্য কারণগুলো সম্বন্ধে আগেই সাবধান হওয়া ভাল। এদেশের সমাজে প্রতি ঘন্টায় একটা-না-একটা ধর্মোৎসব হচ্ছে। হিন্দু, মুসলীম, শিখ, খ্রীশ্চান ধর্মধ্বজীরা রীতিমত রেষারেষি করছে এই উৎসব নিয়ে। বড় বড় ধর্মোৎসব ছাড়াও অন্য সামাজিক বা পারিবারিক উৎসবের সংখ্যাও স্বল্প নয়। ফলে সারা বছর ধরেই কোন-না-কোন উৎসব হয় পাড়ায়। বিয়ে, পৈতে, অন্ন-প্রাশন লেগেই আছে এ-পাড়ায়। রীতিমত ধুমধাম আর উত্তেজনার মধ্যেই এইসব অনুষ্ঠান পালিত হয়। মেয়েদের প্রথম ঋতুমতী হওয়া থেকে শুরু করে গর্ভধারণের কাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে উৎসব পালিত হয়। ঋতুমতী কন্যার প্রথম ঋতুপালনটি যেমন আনন্দ উৎসব, তেমনি অনূঢ়া কন্যার শিবপূজো বা গর্ভধারণের মাসে 'সাধ' ভক্ষণও এক উৎসব। অতঃপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো এবং প্রথম সন্তানের 'অন্নপ্রাশন' উপলক্ষে মহা আড়ম্বর ও ধুমধামের সংগে শিশুর মুখে অন্ন দেওয়া হলো উৎসব করেই।

কোভালস্কী যেদিন নতুন ঘরে এল সেদিনও এখানে একটা উৎসব হচ্ছিল।

অন্তত জনা পনের সধবা মহিলা টেপাকলের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে দেবীর ভজনা করছে। ওদের হাতে চাল, কলা, ফুল দিয়ে সাজানো নৈবেদ্যর থালা। কোভালস্কী অবাক হয়ে দেখছে মেয়েদের। পাড়ার মাতব্বর কৃষ্ণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল কোভালস্কীকে।

'মা শীতলার পুজো করতে এসেছে ওরা। একটা বাচ্চা মেয়ের মায়ের দয়া হয়েছে। তাই মায়ের পুজো হবে।'

যে বাচ্চাটির মায়ের দয়া হয়েছে তার নাম অনিমা। কোভালস্কী শুনলো যে মা শীতলা নাকি বসন্তাদি রোগের দেবী। তাঁর কোপেই স্ফোটকাদি রোগ হয়। তাই তাঁর পুজাব্যবস্থা করে তাঁর কোপ প্রশমন করা হয়। পুজাবিধিতে দেবী যদি প্রসন্না হন তবে রোগী নিরাময় হয়। পুজাবিধিতে আছে যে তিনদিন উপবাস করতে হবে এবং অন্যরাও আমিষভক্ষণ করবে না। তাছাড়া বাচ্চার গায়ের গুটি না শুকানো পর্যন্ত দেবীর কোপ শীতল হয় না। সুতরাং সেই ক'টি দিন অগ্নিদগ্ধ কোন খাদ্য ভক্ষণও নিষিদ্ধ। পাছে দেবী কুপিতা হন, তাই মেয়েদেরও নানা নিষেধ মানতে হয়। সাবান জাতীয় কোন বস্তু ব্যবহার করা বা ভেজা কাপড় ঝুলিয়ে শুকানো ইত্যাদিও নিষিদ্ধ। যাই হক, এইসব নিষেধাদি থাকার দরুন কোভালস্কীর সম্মানে কোনো পংক্তিভোজ হলো না। তবে ঘটা না হলেও আপ্যায়নের ত্রুটি হলো না। ফুলের মালা নিয়ে মেয়েপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। কোভালস্কীর ঘরের মেঝেতে আলপনা এঁকে সুদৃশ্য অলংকরণ করেছে শান্তা। কোভালস্কীকে মাঝখানে নিয়ে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে কোভালস্কী পাঠ করলো, 'আজি আনন্দযজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ' ইত্যাদি। তারপর পুরনো প্রতিবেশীদের অনেককে নিয়ে কোভালস্কী তার নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ করলো। এতকাল এদের নিয়েই সে কঠিন দিনগুলি কাটিয়েছে। এরাই ছিল তার সুখদুঃখের নিত্যসাথী। পুরনো পাড়ার অনেক মানুষ এসেছে। সবাই আজ বিষণ্ণ। দুই পাড়ার মধ্যে কতটুকুই বা দূরত্ব। কিন্তু সবাই ভাবছে কোভালস্কী বুঝি অন্য গ্রহে চলে যাচ্ছে। সাবিয়ার মা যখন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো তখনই বোঝা গেল সবাই কত ব্যথিত হয়েছে কোভালস্কীকে হারিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে সাবিয়ার মা তখন বলছিল, 'আমাদের ছেড়ে যাবার আগে একটু আশীর্ব্বাদ করে যাও বাবা। আর ত তোমায় পাব নি। আমরা আবার অনাথ হয়ে যাব।'

কোভালস্কীও অভিভূত। মনে মনে বললো, কেন তোমরা অনাথ হবে? তারপর ওদের সকলের মাথার ওপর হাতখানা তুলে ক্রুশচিহ্ন এঁকে শান্তভাবে বললো, ঈশ্বর তোমাদের দেখবেন। তোমরা তাঁরই সন্তান। তোমরাই জগতের জ্যোতি।'

আশীর্বচন শেষ করে ধীর পায়ে কোভালস্কী তার ঘরে ঢুকলো। তারপর কোনদিকে না চেয়ে কাঁধের ঝোলাটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে চাটাইখানা বিছিয়ে ফেললো। অবাক হয়ে একজন মহিলা বললো, 'আপনার সঙ্গে আর কিছু নেই?'

কোভালস্কী মাথা নাড়লো। সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তখনই মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল খবরটা। একজন টুল আনলো। একজন রান্নার বাসনকোশন। একখানা খাটিয়াও এসে গেল তখুনি। কিন্তু কোভালস্কী অটল। কিছুই সে নেবে না। তৃণাদপি দীন হয়েই থাকতে চায় সে এবং এই ঘরখানায় থেকেই সে তার ইচ্ছাটি পূরণ করবে। গত পনের মাস এই ঘরখানা শূন্য পড়ে আছে। ভুলেও মানুষ এ ঘর মাড়ায় নি। ছোট ঘরটা হয়ে গেছে ইঁদুরের উপনিবেশ। ছোট, বড়, মোটা, রোগা নানা জাতের ধেড়ে ও নেংটি ইঁদুরের দৌরাত্ম্য আর চীৎকারে সর্বক্ষণ মুখর হয়ে

আছে ঘরটা। ঘরের চাল, দেওয়াল, মেঝে সর্বত্র ঘুরঘুর করছে মানুষের চোখের ওপর। ইঁদুরের বিষ্ঠায় নোংরা হয়ে আছে ঘরের মেঝে। কাউকে পরোয়া করে না ওরা। এমনকি বেপরোয়া চলাফেরা দেখে মনেই হয় না যে মানুষকে তারা আদৌ মান্যগণ্য করে। কোভালস্কী অবাক হয়ে ভাবছিল কোন্ অলৌকিক উপায়ে গত গ্রীষ্মের অমন আগুনঝরা তাপ বা ঝড়ের তান্ডব থেকে তারা রেহাই পেল। এ ঘরখানার আসল প্রভু এরাই। অন্তত এতদিন সেইরকমই ব্যবস্থা ছিল। এখন সেই-ই বোধহয় অনধিকারী। তাই সংকোচের সঙ্গেই যীশুর ছবিখানি টাঙাবার মতন সামান্য একটু জায়গা তাকে ভিক্ষে করে পেতে হচ্ছে। পেতে হচ্ছে মেঝেতে চাটাইখানা পেতে ধ্যান করার মতন সামান্য একটু জায়গা। তা হ'ক! এই সামান্য অনুগ্রহটুকু পেয়েই কোভালস্কী খুশী। ঈশ্বর যথার্থ করুণাময়, তাই এই করুণাটুকু সে লাভ করতে পেরেছে যাতে সকলের দুঃখের সমভাগী হতে পারে, সবাইকে ভালবাসতে পারে।

হ্যাঁ! যথার্থই সে নির্বিশেষে সবাইকে ভালবাসতে চাইছে, সবার দুঃখের অংশভাগী হতে চাইছে। কোভালস্কীর মনে হলো এই ছোট্ট সাম্প্রদায়িক পল্লীতে এসে এটাই তার উপলব্ধি। কি বিস্ময়কর এঁদের খোলামেলা জীবনযাপন! কোথাও আবরণ নেই, আড়াল নেই। সামান্য একটা কথা, তুচ্ছ একটা কাজ বা আবেগটাও এখানে আবর্ত সৃষ্টি করে। সব কিছুরই সমালোচনা হয়, ব্যাখ্যা হয়। তবে সেটিকে মেনে নেয় এখানকার মানুষ। তাই এমন খোলামেলা পরিবেশে প্রতিটি কাজ সতর্ক হয়ে করতে হয় ; মেপেজুপে করতে হয়। লুঙ্গির খুঁট দাঁতে চিপে যেমন স্নান করা শিখতে হয়, তেমনি কৃত্যকর্ম সমাপন করে ডাবাটি পরিষ্কার করারও একটা বিশেষ কৌশল আয়ত্ব করতে হয়। হয়ত তখন নর্দমার ধারটিতে বসে কোন মহিলা প্রস্রাব করছেন। তাই কোনদিকে না তাকিয়ে প্রস্রাবাগার থেকে বেরিয়ে আসার সংযম এবং আবরুটুকুও শিক্ষা করতে হয়! কিন্তু এহ বাহ্য! সেদিন রাত্রে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল তার জন্যে। ইঁদুরদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়ে ঘর থেকে প্রায় ছিটকে বারান্দায় বেরিয়ে এল কোভালস্কী। ঘরের কোলে বারান্দা। সারা বারান্দাটায় থিক থিক করছে মানুষ। সবাই একরকম বিতাড়িত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষগুলোর গায়ে হোঁচট খেল কোভালস্কী। কিন্তু এখন সে কোথায় আশ্রয় নেবে? কোথাও এতটুকু ঠাঁই নেই। সৌভাগ্যক্রমে ঘরে ঢোকার মুখে একটা নিচু পাঁচিল দেখতে পেল সে। উপচে পড়া নালার জল যাতে ঘরে না ঢোকে তাই নিচু পাঁচিলটা দেওয়া আছে। কোনরকমে তারই ওপর গুটিসুটি শুয়ে পড়লো। গামলার মধ্যে সার্ডিন মাছের মতন অন্য লোকগুলোর গায়ের সঙ্গে লেপটে শুয়ে রইল সে।

কিন্তু এখানে নিশিযাপনের প্রথম দিনের দুটি ঘটনা চিরকাল তার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে। ঘটনা দুটো খাপছাড়া এবং তার চেনা অভিজ্ঞতা নয়। তুরি ভেরি নিনাদের মতন প্রতিবেশীর নাসাজর্গন, গায়ের ওপর দিয়ে আরসোলা-সৈন্যর মিছিল করে যাতায়াত, সারারাত ধরে ক্ষয়রোগীদের কাশির ধমক নেড়ি কুকুরের চিৎকার, মাতালের চেঁচামেচি, জলভরা পেতলের হাঁড়িকলসির ঠোকাঠুকি ইত্যাদির মতন কোন ঘটনা এ নয়। এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা তার জীবনে আগে হয়নি। সবে একটু তন্দ্রা এসেছে তখনই বাচ্চাদের কান্নার শব্দে ঘোর কেটে গেল। কোভালস্কী অবাক। একসঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা ভয় পেয়ে কাঁদছে। কিন্তু কেন? একটু পরেই

ওদের কান্না জড়ানো টুকরো-টুকরো কথা থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো কোভালস্কীর কাছে। বাচ্চাগুলো অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। ওরা বাঘের স্বপ্ন দেখেছে এবং ঘুমের মধ্যে বাঘের নাম করছে। এদেশের সাধারণ মানুষ সরাসরি বাঘের নাম উচ্চারণ করে না। কোভালস্কী জানে এটা ওদের সংস্কার। পাছে বাঘের নাম উচ্চারণ করলে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়, তাই এই সতর্কতা। বাঘের অনেক নাম এখানে। 'বড় বিড়াল', 'বড় জানোয়ার' ইত্যাদি। সংস্কারগত নিষেধটা সবাই মানে-গনে। কারণ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই প্রতি বছর প্রায় তিনশ' মানুষ বাঘের পেটে যায়। অতএব দীর্ঘ লাঙ্গুলধারী এই বনরাজাটিকে সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলে গাঁ গঞ্জের মানুষ। আনন্দ নগরের মা-মাসিরাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাচ্চার আবদার থামাতে প্রায়ই ভয় দেখাতে হয় মায়েদের, 'অই বড় বেড়াল আসছে। শীগগির দুষ্টুমি থামাও। নইলে ও ঠিক এসে পড়বে।'

দ্বিতীয় ঘটনার স্মৃতিটাও সমান বিস্ময়কর। ভোর সাড়ে-চারটে বাজতে-না-বাজতেই এক কুক্কুটের উচ্চরব কোঁকর-কোঁ শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল কোভালস্কীর। সারা রাত ধস্তাধস্তি করে সবে চোখ দুটো একটু জুড়িয়েছে তখন। চোখ কচলে উঠে পড়তে হলো কোভালস্কীকে। বারান্দায় বাঁধা মুরগীটাকে সে রাত্রে দেখতে পায়নি। জীবটা নাকি তার পাশের-ঘরের বাসিন্দাদের সম্পত্তি। শুধু পাশের ঘরের এই মানুষগুলোর সঙ্গেই কোভালস্কীর দেখাসাক্ষাত বা আলাপ-সালাপ হয়নি। সারা দিনই ওরা বাইরে বাইরে থাকে। সেদিনও তাই ছিল। ফিরেছেও অনেক রাত্রে। অন্ধকারের রেশ সবে কাটছে। কোভালস্কী দেখলো ঠিক ওর পাশেই রঙচঙা ছাপা শাড়ি পরে জনা পাঁচ মহিলা গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। কোভালস্কীর খুব অবাক লাগছে ওদের দেখে। গড়ন পেটন বেশ শক্ত। কোথাও যেন কোমলতা নেই। সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় এরা বেশ লম্বা এবং গায়েগতরে বলিষ্ঠ। বাহুযুগলও মৃণালের মতো দেখায় না। ইতিমধ্যে তাদেরও ঘুম ভেঙেছে। নিজেদের মধ্যেই কথা বলছে ওরা। কোভালস্কী স্তব্ধ। এ ত নারীর কণ্ঠস্বর নয়! কবির ভাষায়, 'কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।' শক্ত, কর্কশ, ভারি কণ্ঠস্বরের এই মানুষগুলোর নারীসজ্জা, কি ছলনা? নাকি...? কোভালস্কীর মনে হলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু না। স্বপ্ন নয়। তার অনুমান ঠিক। ওরা কেউ নারী নয়। পুরুষও নয়। ওরা নপুংসক।

পঞ্চান্ন

মন্টিক্রিস্টো চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করে সবে ধরিয়েছে, ওমনি ম্যাক্সের মনে হলো যেন তার ঘরের ছাতের ওপর কেউ বোমা ফেললো। ম্যাক্স জানে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বস্তিতে আজ তার দশদিন হচ্ছে। এর আগে ঘূর্ণি ঝড়ের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। কিন্তু অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতের অভিজ্ঞতা আজই প্রথম হলো। প্রবল অকাল বর্ষণে কলকাতা প্রায় ডুবুডুবু।

সামনে স্কচ হুইস্কির ডবল পেগ নিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে ম্যাক্স। বসে বসে দেখছে কখন সেই ভয়াবহ মুহূর্তটি আসে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ভীতিকর ঘটনাটা ঘটে গেল তখনই। ছাতের টালির ফাঁক দিয়ে ঠিক ঝরনার জলের মতন তখন বৃষ্টির জল পড়ছে। শুধু ছাত নয়, আশেপাশে যত ফাঁক ফোকর আছে সবগুলি ছিদ্র দিয়েই তখন প্রবল তোড়ে বৃষ্টির জল ঢুকছিল।

দেখতে দেখতে ঘরখানার চেহারা হলো টলটলে পুকুরের মতন। ম্যাক্স স্তম্ভিত। হাত-পা গুটিয়ে চারপায়ার ওপর বিগ্রহের মতন বসে আছে স্থির হয়ে। জলও বাড়ছে ভয়াবহ দ্রুততায়। পাশাপাশি বস্তিঘরের লোকজনেরা সবাই ব্যস্ত। গেরস্থালির জিনিসপত্র আগলাচ্ছে। একে ওকে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের সঙ্গে আর্ত মানুষের চিৎকার মিশে একটা অদ্ভুত কোলাহল হচ্ছে বস্তিতে। ঘরে জল পড়ার সময়েই খাটিয়ার ওপর ওষুধের বাক্স, ডাক্তারি যন্ত্রপাতির বাক্স আর তিন পেটি গুঁড়ো দুধের টিনগুলো তুলে নিয়েছিল ম্যাক্স। গুঁড়ো দুধের টিনগুলো বিলিতি। বেলজিয়াম থেকে কোভালস্কীর নামে পারসেল হয়ে এসেছে। বস্তির যে সব বাচ্চা অত্যধিক অপুষ্টিতে ভুগছে, তাদের ব্যবহারের জন্যেই ম্যাক্সের হাতে এই তিন পেটি গুঁড়ো দুধ তুলে দিয়েছে কোভালস্কী। খাটিয়ার ওপর তখন স্তূপ করে রাখা ওষুধপত্র আর রাজ্যের জিনিস। নৈবেদ্যর মাথায় বাতাসার মতন এই পাহাড়-প্রমাণ জিনিসগুলোর মাথায় শোভা পাচ্ছে ম্যাক্সের হাতব্যাগটা। উপস্থিত এই ব্যাগ-ই তার একমাত্র জীবনরক্ষাকারী সঞ্চয়। থলির মধ্যে আছে তিনটে স্কচ হুইস্কির বোতল আর তিন বাক্স চুরুট। তখন বস্তির মধ্যে জোয়ারের জলের মতন উপচে পড়া নালার জল ঢুকছে। আর সেই মহাপ্লাবনের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে চুপচাপ বসে আছে ম্যাক্স। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিল কে জানে। হঠাৎ তার মনে হলো দরজায় জোরে জোরে করাঘাত হচ্ছে। গোড়ালিতে ভর করে ঘরের জল ডিঙিয়ে ম্যাক্স দোর খুললো। সারা বস্তি ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চের আলো জেলে খানিকটা আস্বস্ত হলো সে। দরজার সামনে বন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা দিয়ে টপটপ করে জল ঝরছে। সঙ্গে একটা কালো ছাতা এনেছে ম্যাক্সের ব্যবহারের জন্যে। ছাতাটা রেখে বন্দনা চলে গেল। খানিক পরে ম্যাক্সের পাশের বস্তিঘরের বেকার ছেলেটা, বুকের কাছে এক গোছা ইঁট জাপটে ধরে ঘরে ঢুকলো। কি ব্যাপার? ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢোকার নিচু পাঁচিল এবং তাঁর টেবিল ও খাটিয়াখানা ইঁট পেতে উঁচু করতে এসেছে সে। ম্যাক্সের মনে হলো বস্তির জীবনে এই সামাজিকতাটা মোটেই গাল-গল্প নয়। একটা নিবিড় আত্মীয়বন্ধনের স্বাদ আছে এর মধ্যে।

ঘন্টাখানেক বৃষ্টির পর ধারাবর্ষণ একটু কমলো। ম্যাক্সের তখন ক্ষণে ক্ষণে বিলাসবহুল ফাইভ স্টার হোটেলের আরামপ্রদ ঘরখানা এবং তার লাগোয়া শৌচাগার-টার কথা মনে হচ্ছিল। এখন শৌচাগারের বাথটাবে ঠান্ডা এবং গরম জলের সঙ্গে বাথসল্টের ফেনায় শরীরটাকে দোল খাওয়ালে মন্দ হতো না। হঠাৎ সেই মধুর কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল। উৎকট ধাক্কায় ঘরের সদর দরজার পাল্লা দুটো মড়-মড় শব্দে ভেঙে তিনজন যোয়ান মদ্দ ঘরে ঢুকলো। একজন দুহাত দিয়ে তার কাঁধখানা ধরে ঠেলতে ঠেলতে দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে দিল তাকে। ম্যাক্সের মনে হলো পেটের ওপর ছুরির তীক্ষ্ন ফলার খোঁচা দিচ্ছে লোকটা। ম্যাক্স বুঝতে পারছিল লোকগুলো ডাকাতি করতে এসেছে। মনে মনে সে বিড়বিড় করে বললো. 'এটাই বোধহয় আমার দরকার ছিল।'

যে ষণ্ডা লোকটা তার পেটের ওপর ছুরির ফলা রেখেছে তার নাকটা ভাঙা। ছুরিটা সেই অবস্থায় রেখেই সে ঘোঁত্ ঘোঁত করে বললো, 'দুধ কোথায়?'

ম্যাক্স তখনই মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। এদের সঙ্গে বদমেজাজি করে খেসারত দিতে সে মোটেই রাজী নয়। সুতরাং চোখের ইসারায় বিছানার ওপর রাখা তিন পেটি গুঁড়ো দুধের টিনগুলো দেখিয়ে দিল।

'ওখানে আছে। নিয়ে যাও!'

চাকতে তিনজন দুর্বৃত্ত তিনটে পেটি ঝাপটে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় নাক ভাঙা লোকটা বললো, 'ধন্যবাদ সায়েব! আমরা আবার আসবো!'

সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটলো যে মার্কিন ছোকরা ম্যাক্সের মনে হচ্ছিল যে সে বোধহয় দুঃস্বপ্ন দেখছে। যাহক, দরজার ভাঙা পাল্লা দুটো স্বস্থানে রাখবার চেষ্টা করার সময় তার নাকে একটা উৎকট দুর্গন্ধ লাগলো। কাজ বন্ধ করে সে দেখবার চেষ্টা করছিল কি হতে পারে সেটা। হঠাৎ মনে হলো পায়ের ডিমে যেন কিসের ভিজে ছোঁয়া লাগছে। জলের স্রোতের গড়্গড়্ শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ বৃষ্টির জলে নর্দমা ফেঁপে উঠেছে এবং নোংরা পাঁকের জল রাস্তা ছাপিয়ে তার ঘরে ঢুকছে। তাই পায়ের ডিমে ভিজে পাঁকের স্পর্শ পেল সে।

এইভাবে শুরু হলো বিভীষিকার রাত। সারা ঘর অন্ধকার। একটাও দেশলাই নেই। টর্চটাও জ্বলছে না। ঘরের সব জিনিসপত্তর জলের তলায় ডুবে গেছে। ম্যাক্সের যেন কান্না পাচ্ছিল তখন। সেদিন কোভালস্কীর ডাক পেয়ে কি দুর্মতি হয়েছিল কে জানে! সাড়া দিয়ে ফেললো তার ডাকে। কিসের দংশনে সে এমন অপরিণামদর্শীর মতন কাজ করলো? এটা কি শুধুই আবেগ? বারে বারেই মন ফিরে ফিরে যাচ্ছে সীলভিয়ার সুন্দর শরীরটার দিকে। কতদিন ওর মখমলের মতন নরম গায়ে হাত দেয়নি। কবিতা আবৃত্তির সময় সেই সরলতা মাখানো মুখখানার ছবি সে কতদিন দেখেনি। হাতঘড়ি দেখলো ম্যাক্স। জ্বলজ্বল করছে কাঁটা। এখন মিয়ামিতে বিকেল। হয়ত যুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধ ভরিয়ে দিয়েছে তাদের বাইরের ঢাল বারান্দা। খালের জলে দোল খাচ্ছে নৌকো। ছোট ছোট স্রোত ঠোক্কর দিচ্ছে নৌকোর গায়ে। মৃদু শব্দ হচ্ছে, ছলাৎ ছলাৎ। যারা বসে আছে তারা কান পেতে শুনছে সেই মৃদু কলধ্বনি।

অবশেষে বিভীষিকার রাত শেষ হলো। তখনো ভাল করে অন্ধকার কাটেনি। ভাঙা দরজার ফ্রেমের গায়ে বন্দনার হতাশ বিধ্বস্ত চেহারাটা দেখে চমকে উঠলো ম্যাক্স। অমন ঝোড়ো চেহারা হয়েছে কেন মেয়েটার? অবশ্য ভোরের আবছা আলোয় মুখের চেহারাটা ঠিকমতন বোঝা যাচ্ছিল না। তাহলেও ম্যাক্স অনুভব করতে পারলো যে মেয়েটা ভীষণ হতাশ হয়ে গেছে। মন তার স্ববশে নেই। বাদামের মতন ছোট ছোট চেরা চোখ দুটো স্থির। শরীরটা টানটান। কি ব্যাপার?

'ম্যাক্স ভাই! এখুনি আসতে হবে আপনাকে। আমার মা'র শরীর ভাল নয়। তাঁর রক্তবমি হচ্ছে।'

চমকে উঠলো ম্যাক্স এবং তখুনি তৈরি হয়ে নিল। তারপর এক হাঁটু জলকাদা মাড়িয়ে ওরা দুজন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটতে লাগলো বস্তির গলি দিয়ে। লাঠি হাতে আগে আগে চলেছে বন্দনা। সাবধানে পা ফেলে চলেছে সে। বন্দনা জানে বস্তির ভেতর দিয়ে বড় বড় খোলা নর্দমা বয়ে গেছে। জলের তলায় ডুবে আছে নালাগুলো। সাবধানে না হাঁটলে যে কোন মুহূর্তে সলিল সমাধি হবে। বন্দনাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলেছে ম্যাক্স। চলতে চলতে মাঝে মাঝে বন্দনা থামছে। জলে ভেসে চলেছে মরা কুকুর বেড়ালের শব। হাতের লাঠি দিয়ে চলার পথ থেকে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছে বন্দনা। বস্তির ল্যাংটো বাচ্চারা সেই ভোরেই পাঁকগোলা জলের মধ্যে খলবল করে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। তাদের লাফালাফিতে জল ছিটোচ্ছে চতুর্দিকে। পাছে ম্যাক্সের গায়ে পচা জলের ছিটে লাগে, তাই সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। ম্যাক্সের সবচেয়ে অবাক লাগলো মানুষগুলোর জীবনীশক্তি দেখে। কোন কিছুতেই ওদের যেন ভয়ডর নেই। তাই এই দুঃস্বপ্নের পরেও জীবন থেমে যায়নি

আনন্দ নগর বস্তিতে। জীবনের নক্সীকাঁথায় একটার পর একটা নক্সা আঁকা হচ্ছে। রাস্তার মোড়ে বিচিত্র সাজের মজাদার এক ফেরিওলা দেখলো ম্যাক্স। ছোটখাট লোকটার মাথায় ইয়া পাগড়ি। একটা তিন চাকার গাড়ির ক্যারিয়ারে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাচ্চাদের ডাকছে। হাঁটুভর্তি জলের মধ্যে লোকটাকে ঘিরে প্রায় ডজন-খানেক বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে গোল হয়ে। তিনচাকার সাইকেল গাড়ির মধ্যিখানে দাঁত বসানো একটা গোল চাকা। চাকাটা অনবরত ঘুরছে। চাকার চারপাশে নম্বর আঁটা। লোকটা ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে। 'ঘোরাও! চাকা ঘোরাও! দশ পয়সার লটারির ঘোরাও! প্রাইজ পাবে!'

এই নোংরা জলেও লটারির খেলা চলছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপেক্ষা করে! না হবেই বা কেন? দশ পয়সার বদলে দুটো বিস্কুট আর একটুকরো মিছরি প্রাইজ মিলবে। বাচ্চাদের অভুক্ত পেটে রীতিমত রাজকীয় পুরস্কার বৈকি!

যেমনটি আশংকা করা গিয়েছিল তেমন নয়। ওরা পেঁাছে দেখলো যে বন্দনার মা দিব্যি উঠে বসেছে। বৃদ্ধার চেহারা ছোটখাট। মাথার চুল বিড়ের মতন খোঁপা বাঁধা। মুখের ত্বক কোঁচকান। দেখতে অনেকটা চীন দেশের গ্রাম্য বৃদ্ধাদের মতন। যে ঘরটিতে ওরা থাকে সেটি তকতকে ঝকঝকে। এমন পরিপাটি নিকানো ঘর ম্যাক্স এ বস্তিতে দেখে নি। পাড়াপড়শীরা খবর পেয়ে বৃদ্ধাকে দেখতে জড়ো হয়েছে। সবাইকে নিয়ে বন্দনার মা তখন হাসি ঠাট্টা মস্করা করছিল। শোবার খাটের পেছনের দেওয়ালে জ্ঞানী বুদ্ধের দুখানি ছবি টাঙানো। ওদের মাথায় হলুদ ঢাকা। দেওয়ালে আর একখানা ছবি টাঙানো। সেটি দলাই লামার। ছবির সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে।

ডাক্তার দেখে বৃদ্ধা যেন অসন্তুষ্ট হলো। একবার মেয়ের দিকে, একবার ম্যাক্সের দিকে চেয়ে বললো, 'না না। ডাক্তারের এত কষ্ট করার দরকার ছিল না। আমি দিব্যি ভাল আছি। ঈশ্বর এখনই আমায় নিতে চান না।'

এই বলে ম্যাক্সকে সামনে বসিয়ে বৃদ্ধা চা মিষ্টি খাওয়াল। বন্দনাও অনেক সহজ হয়েছে ততক্ষণে। মুখের হাসিটি ফিরে এল তার। বন্দনার দিকে চেয়ে ম্যাক্স মন ঠিক করে নিল। সহজ ভাবে বললো, 'তাহলেও আপনাকে আমি একবার দেখবো।'

'কিছু দরকার নেই বাবা। আমি আবার বলছি বেশ ভাল আছি। অযথা তোমার খাটুনি হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না।'

বন্দনা যেন বুঝতে পারছিল ম্যাক্সের অবস্থাটা। মাকে আশ্বস্ত করতে বললো: 'উনি যখন চাইছেন তখন একবার দেখাও না, মা! এই কাজ করতেই উনি আমেরিকা থেকে এসেছেন।'

'আমেরিকা' কথাটায় যেন জাদু আছে। যারা বসে আছে তারা সবাই নড়েচড়ে বসলো। কিন্তু উঠে যাবার লক্ষণ দেখাল না কেউ। বস্তি জীবনে কিছুই অপ্রকাশ্য নয়; এমনকি রোগ পরীক্ষার ব্যাপারেও কোন গোপনতা থাকে না। সুতরাং সবার চোখের সামনেই বৃদ্ধার দেহ পরীক্ষা করলো ম্যাক্স।

প্রায় আধঘণ্টাখানেক স্টেথো নিয়ে পরীক্ষা করলো সে। তারপর স্টেথো গুটিয়ে রেখে বন্দনার দিকে চেয়ে বললো, 'বন্দনা! তোমার মার শরীর পাথরের মতন নিরেট। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।'

বেশ সহজ ভাবেই কথাটা বললো ম্যাক্স। কিন্ত তার কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই দারুণ অঘটনটা ঘটে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে চায়ের পটে জল ঢালার সময়

হঠাৎ কাশির ধমক উঠলো বৃদ্ধার। মনে হলো যেন নিশ্বাস আটকে যাচ্ছে কাশির ধমকে। সংগে সংগে মাটিতে নেতিয়ে পড়লো বন্দনার মা। সকলের চোখের সামনে এক নিমেষে ঘটে গেল ঘটনাটা। বন্দনা ছুটে গেল মাকে তুলতে। ম্যাক্সও গেল। তারপর দুজনে ধরাধরি করে বৃদ্ধার দেহটা বিছানায় শোয়াল। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বৃদ্ধার কষের রক্ত যত্ন করে মুছে দিল বন্দনা। স্থির হয়ে ম্যাক্স চেয়েছিল বৃদ্ধার মুখের দিকে। ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে। ম্যাক্স বুঝতে পারলো যে বৃদ্ধা নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে। খানিক পরে চোখ দুটি খুলে সবার মুখের দিকে তাকাল বৃদ্ধা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখলো। ম্যাক্সের দৃষ্টি স্থির। বৃদ্ধার মুখে এতটুকুও ভয়ের ছায়া নেই। বরং সারা মুখখানা জুড়ে ছড়িয়ে আছে গভীর এক প্রশান্তি। ততক্ষণে ম্যাক্স ইঞ্জেকশন রেডি করে ফেলেছে। কিন্তু সিরিঞ্জে ওষুধ ভরার সময়টুকুও বৃদ্ধা দিল না। হঠাৎ শরীরটা শক্ত হয়ে গেল তার। একটা হিক্কা উঠলো। তারপরেই সব শেষ।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় নিয়েছিল বন্দনার। তারপরেই তীব্র শোকে মায়ের দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে এবং হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বেশ খানিকক্ষণ ঘরখানার মধ্যে যেন শোক, বিলাপ আর কান্না ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য! পুরুষরা মাথা চাপড়াচ্ছে। আর মেয়েরা হাতের নখ দিয়ে নিজেদের মুখগুলো ক্ষতবিক্ষত করছে। বাপ-মার দেখাদেখি ছেলেমেয়ে-রাও চেঁচিয়ে বিলাপ করছে। পাড়াপড়শীরাও শোকবিহ্বল। কেউ কেউ বন্দনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। খানিকক্ষণ এমনি বিলাপ চললো। হঠাৎ শোকতাপ কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল বন্দনা। যেমন হঠাৎ সে ভেঙে পড়েছিল, তেমনি হঠাৎই শোকের ভাব কাটিয়ে সহজ হয়ে গেল সে। পরনের শাড়ির ধুলো ঝেড়ে বিনুনি বেঁধে নিল সে। তারপর স্তব্ধ গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ম্যাক্স অবাক হয়ে দেখলো বন্দনার চোখ দুটো শুকনো খটখটে। তার দুচোখে এক ফোঁটাও জল নেই।।

অতঃপর যা ঘটলো ম্যাক্সের কাছে তা অকল্পনীয়। ম্যাক্স অবাক হয়ে দেখলো ধাতস্থ হয়ে মেয়েটা যেন অন্য মূর্তি ধরেছে। একজনকে বলছে একে ওকে ডেকে আনতে : আর একজনকে বলছে এখানে ওখানে যেতে। আদেশ হুকুমের ছড়াছড়ি শুরু হলো যেন। ইতিমধ্যে নিকট আত্মীয়দের খবর দেবার জন্যে ভাইদের পাঠিয়েছে। বস্তির কাবুলিওলার কাছে দুটো বালা বাঁধা দিয়ে হাজারটা টাকাও যোগাড় হয়ে গেল সংগে সংগে। এসব কাজে টাকার দরকার হাতে হাতে। শবদাহর জন্যে খাট এলো। বৌদ্ধ সংস্কার অনুযায়ী সাদা-রঙের খাট আনিয়েছে বন্দনা। মায়ের দেহ সাজাবার জন্যে ফুল এল, ধূপকাঠি এল, সিঁদুর এল। আরও নানা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদির জন্যেও টাকার দরকার। তা ছাড়া আত্মীয় বন্ধুদের ভোজন করানোও একটা রীতি। তাই সে ব্যবস্থাও করে রাখলো বন্দনা। বাজার থেকে পরিমাণ মতন চাল, ঘি, ময়দা, কাঁচা আনাজ ইত্যাদি আনিয়ে রাখলো। হাওড়ার প্যাগোডা থেকে একজন বৌদ্ধ পুরোহিত আনাল একশ' টাকা ব্যয় করে।

ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই শবযাত্রার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে শবদেহটি। যুঁই, বেল, রজনীগন্ধার মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে শবযানটি। ধূপকাঠিগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শবদেহের পা এবং হাতদুটি আলতা মাখিয়ে দিয়েছে মেয়েরা। বৃদ্ধার মুখখানি শান্ত। মৃত্যু যেন জরাযন্ত্রণা সব মুছিয়ে দিয়েছে। চেয়ে থাকতে থাকতে ম্যাক্সের মনে হলো যেন মিশরের ম্যমীর দিকে চেয়ে আছে সে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাদি সেরে ফেলতে চাইছে। বৌদ্ধ

পুরোহিতের গায়ে গেরুয়া জোব্বা। তাঁর হাতে করতাল। করতাল বাজিয়ে তিনি মন্ত্র পড়লেন। মৃতার কপালে ঘি এবং কর্পূর মাখালেন, তারপর মৃতার শরীরে ধান ছড়িয়ে দিলেন মুক্তির জন্যে। কৃত্যকর্মগুলি সুসম্পন্ন হবার পর বন্দনার ভাইরা শবযানটি কাঁধে তুলে নিল এবং ঘরের বাইরে নিয়ে এল। বন্দনার চোখদুটো স্থির। বুকখানা হু হু করছে কান্নায়। এই ছোট্ট ঘরখানিতে মায়ের কোলের কাছ-টিতে বসে কত দিন সুখে দুঃখে কাটিয়েছে সে। কত কথাই মনে তখন ভিড় করে আসছিল! সবাই কাঁদছে। মাতৃহারার বিয়োগব্যথা বড় করুণ। এর শোক বড় নিবিড়।

নিয়ম অনুযায়ী শুধু পুরুষরাই শবযাত্রার সংগী হয়। বৃদ্ধার শবদেহ কাঁধে তুলে পুরুষরা হরিবোলধ্বনি দিল। উপযুক্ত বৌদ্ধ শ্মশান ঘাট না থাকায় হিন্দু মতেই দাহকার্য সম্পন্ন হবে। শবানুগামীদের ছোট্ট মিছিল যখন শ্মশানঘাটে পৌঁছলো তখন বেশ বেলা। ঘাটে পৌঁছে একটা বটগাছের তলায় শবদেহটা নামিয়ে রাখলো বাহকেরা। বন্দনার এক ভাই গেল শ্মশানপুরোহিতের খোঁজ করতে এবং চিতার ব্যবস্থা করতে। এরপর চুল্লীতে কাঠ সাজিয়ে শবদেহ স্থাপন করা হলো। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে মৃতার মুখে গঙ্গাজল অর্পণ করলো। বন্দনার বড়ভাই শবদেহ পাঁচবার প্রদক্ষিণ করলো এবং মৃতার মুখাগ্নি করলো। দাউ দাউ করে চিতা জ্বললো এবং আগুনের শিখা গ্রাস করলো মৃতদেহটি।

ম্যাক্স শুনলো যে দাহকাজ শেষ হতে ঘন্টা চারেক সময় লাগবে। তার মনে হলো শোকবিহ্বল মেয়েটাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। এক ফাঁকে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লো শ্মশান থেকে এবং বস্তিতে ফিরে এল। কিন্তু বন্দনাদের চালা ঘরে পৌঁছবার একটু আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল: একজায়গায় পা ফেলতেই তার মনে হলো পায়ের তলায় মাটি নেই এবং শরীরটা ডুবে যাচ্ছে। গা হিম হয়ে গেল ম্যাক্সের। হাত পা ছুঁড়ে শরীরটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। ততক্ষণে কালো পাঁক জলের স্রোতে ডুবে গেছে তার নাক, মুখ, চোখ, কান! যত সে হাত, পা ছুঁড়তে লাগলো, ততই যেন কিসের টানে তার শরীরটা পচা ডোবার মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো। এর আগেও দু-একবার তার জীবনে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সাঁতারু ম্যাক্সের জীবনসংশয় হয় নি। এবারের ঘটনাটা আলাদা। চটচটে পাঁকের জলে ডুবে যাওয়া শরীরটাকে সে যেন কিছুতেই ভাসিয়ে রাখতে পারলো না। জলের ভার এবং ঘনত্বের জন্যে তার সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে গেল। সারা শরীর তখন অবসাদে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ম্যাক্স বুঝতে পারছিল যে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে সে।

শোনা যায় যে এমন সংকটকালে সারা জীবনের ঘটনাগুলো যেন ছায়াছবির মতন মনের উপরে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই পচা দুর্গন্ধময় জলের স্রোতে একটাই ছবি তার চোখের ওপর ভেসে উঠলো। ম্যাক্স দেখলো যেন তাদের ফ্লোরিডার বাড়ির ঘেরা বারান্দা দিয়ে হাতে একখানা মস্ত বার্থডে কেক নিয়ে মা আসছেন। ঠিক তখনই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো ম্যাক্স।

পরে কি ঘটেছিল সে খবরটা ম্যাক্স অন্য লোকের মুখে শুনেছে। পচা ডোবার ঘূর্ণিজলে সাহেবের অচেতন দেহটা বেশিক্ষণ বস্তির মানুষের অগোচর ছিল না। অনেকেই তার হারিয়ে যাওয়াটা নজর করেছিল। তারাই কয়েকজন মিলে ডোবার জলে ঝাঁপিয়ে মানুষটাকে উদ্ধার ক'রে বন্দনার ঘরে নিয়ে এল।

সেদিন বন্দনার ঘরে যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবারও বন্দনাকেই

সব কাজের ভার মাথায় তুলে নিতে হয়েছে। তবে দায়িত্বটা ভাগ করে নিল সে। কোভালস্কী, মার্গারেটা সবাইকেই আনিয়ে নিয়েছে সে। এমনকি হাওড়া থেকে একজন ডাক্তারকেও আনিয়ে নিল বন্দনা। জলে ডোবা মানুষকে বাঁচানোর জন্যে যা যা করণীয় সবই করা হলো। কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস নেওয়ানো, পাকস্থলী থেকে জল বের করা, বুকে মালিশ করা, ইঞ্জেকশন দেওয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ার একটাও বাদ দেওয়া হলো না। এইভাবে ঘণ্টা তিনেক অনলস চেষ্টার পর ম্যাক্স চোখ খুললো। তখন মানুষটার আবছা দৃষ্টির সামনে ভাসছে অনেকগুলো হাসি হাসি মুখ। তবে সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে বাদামের মতন সরু দুটি ছোট ছোট চোখের মমতা-মাখানো দৃষ্টি। মুগ্ধ ম্যাক্স দেখলো মমতাময়ীর দুটি চোখের দৃষ্টি যেন আকুল হয়ে আছড়ে পড়েছে তার মুখের ওপর। কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে ওই দুটি চোখ। আজ সারাটা দিনই বড্ড কেঁদেছে মেয়েটা!

ছাপ্পান্ন

ম্যাক্সকে চাঙ্গা করতে পরদিনই কোভালস্কী তাকে প্রস্তাবটা দিল। নালার জলে প্রায় ডুবুডুবু হয়ে গিয়েছিল বেচারা। কোনরকমে বেঁচেছে। ম্যাক্সকে বললো, 'ইচ্ছে করলে অনায়াসে তুমি একটা ক্লিন বাথ্ নিতে পার। পরিপাটী ক্লোরোফিল বাথ্। একটা চমৎকার জায়গা আমার জানা আছে। আমি নিজেও প্রায়ই যাই। যদি চাও ত চল। সবুজের সমুদ্রে অবগাহন চান করে তুমি শুদ্ধ হয়ে যাবে।'

কোভালস্কী হাসলো। ম্যাক্স যেন দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বললো, 'সত্যি কথা বলছি ভাই। খুব ভাল হতো যদি পাঁচতারা হোটেলে বাথটাবে শুয়ে একটা সফেন বাথ্ নিতে পারতুম।'

ম্যাক্সের কথা শেষ হবার আগেই কোভালস্কী বলে উঠলো, 'আরে ওটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। চাইলেই পাবে। কিন্তু তোমায় এখন যেখানে নিয়ে যাচ্ছি...বাকিটুকু শেষ করলো না কোভালস্কী। ম্যাক্সকে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

ঘন্টাখানেক বাদে সাহেব দুজনকে বাসটা যেখানে নামিয়ে দিল, সেটা নন্দন-কাননের প্রবেশদ্বার। সেটা দিয়ে ঢুকেই সেই সুরোদ্যানটি দেখতে পেল ম্যাক্স। চারপাশের এই ইঁটকাঠের রসহীন মরুভূমির মধ্যে এ যেন এক মরুদ্যান! গাছপালাহীন শুকনো ঠা ঠা ইঁটকাঠের শহরের মধ্যে এমন কাননের অস্তিত্বটাই অসম্ভব লাগছে ম্যাক্সের কাছে। সবুজের এমন সমারোহ আশা করে নি ম্যাক্স। সতেজ উদ্দাম সবুজের মধ্যে সত্যিই যেন অবগাহন স্নান করলো সে। এই ট্রপি-ক্যাল বাগানে বোধহয় হাজার হাজার রকমের মহীরুহ আছে। এশিয়া মহাদেশে যত রকম গাছের নমুনা আছে সবই আছে এখানে। বৃদ্ধ বটের গা জড়িয়ে উঠেছে অসংখ্য লতানে গাছ। এই লতানে গাছেরা শক্ত বটকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। আছে কয়েক শ' বছরের পুরনো দেবদারু। এদের গুঁড়িগুলোর আকার হয়েছে মোটা থামের মতন। একজায়গায় শুধু দামী কাঠের গাছ। মেহগনী, সেগুন ইত্যাদি। পিরামিডের চেহারার অশোক গাছ কিংবা বিশাল ম্যাগনোলিয়া গাছের চকচকে চিকন পাতাও চেয়ে দেখবার মতন। ওদের সুন্দর পাতাগুলো এত মসৃণ যে মনে হচ্ছিল চীনা প্যাগোড়ার গায়ে বসানো ঝকমকে টালিদেরও হার মানায়। তখন সব রূপ ঐশ্বর্য নিয়ে ম্যাক্সের চোখের ওপর হঠাৎ জেগে উঠেছে এই স্বর্গোদ্যান।

চোখদ্যটি জ্যড়িয়ে গেল তার। খানিক আগেও তার চোখ দ্যটো যেন আনন্দ নগরের ধোঁয়া আর জমাকরা আবর্জনা থেকে নির্গত প্যতিগন্ধে জ্বালা করছিল। তবে সবচেয়ে ম্যগ্ধ হলো পাখিদের দেখে। অসংখ্য পাখিদের এক বিচিত্র সমাহার। যেমন র্যপ তেমনি গ্যণ। সমস্ত উদ্যানটি যেন ওদের র্যপের আলোয় উজ্জ্বল, ম্যখর ওদের মধ্যর কাকলিকুজনে। গাছের শাখায় শাখায় দোল খাচ্ছে ওরা। একটা মস্ত গাছের ডালে বসে মধ্যর তান ধরেছে ওই যে পাখিটা তার কি মনোহারী র্যপ! সারা গা উজ্জ্বল হল্যদ। ওটা বৌ কথা কও পাখি। ম্যগ্ধ ম্যাক্স আকুল হয়ে ওর গান শ্যনছে তখন। একজায়গায় দেখলো সোনালী প্যচ্ছওলা কাঠঠোকরাটা তার শক্ত ছুঁচলো ঠোঁট বাগিয়ে বসে আছে। মাথার ওপর চক্রাকারে ঘ্যরছে জমকাল চেহারার চিলগ্যলো। ওদের শ্যেন দ্যষ্টি। ঘ্যরতে ঘ্যরতে ওরা শিকার তাক করছে। এক-জায়গায় ক'টা কাদাখোঁচা পাখি দলবেঁধে তাদের লম্বা সর্য সর্য পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁশঝাড়ের মাথায় মাথায় লাফিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে ছাতার, দোয়েল আর কাকাতুয়ারা। হঠাৎ কোথা থেকে ওদের দ্যজনের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা মাছরাঙা। পাখিটার গায়ের পালকের রঙ টকটকে লাল। তার মস্ত বড় ঠোঁটটি রক্তবর্ণ। ওরা কেউ পাখিটাকে ভয় দেখাতে চাইল না। কিন্তু পাখিটা নিজেই ভয় পেয়ে যেখানে গিয়ে বসলো সেটা ওদের আরও নাগালের মধ্যে। পাখিদের এই নাচানাচি দেখতে দার্যণ ভারি ভাল লাগছে ওদের। কি নিঃশঙ্ক ওরা! ম্যগ্ধ কোভালস্কী বলেও ফেললো কথাটা, 'এ যেন একট্যকরো ম্যক্তির স্বাদ! তাই না ম্যাক্স! সত্যিই বন্যেরা বনে স্যন্দর। কথাটা নেহাত বস্তাপচা মিথ্যে নয়।' চুপ করলো কোভালস্কী। তারপর ফের বললো, 'ঈশ্বরের স্যষ্ট সব জীবই তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে ম্যক্তির আনন্দ পায়। ওদের দ্যাখ! কত নির্ভয় ওরা। ডালে ডালে দোল খেয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ইচ্ছেমত পোকা ধরে খাচ্ছে। খ্যশীতে গান গাইছে। ডানা মেলে র্যপের হাট ছড়িয়ে দিয়েছে যেন। চেয়েও দেখছে না কে আছে, কে নেই।'

সব পাখিরা যা করে, ওই পাখিরাও তাই করছে।' বললো ম্যাক্স ম্যগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে।

কোভালস্কীও চেয়ে ছিল। সেইভাবেই বললো, 'পাখিটা যে আমাদের পরোয়া করছে না, চেয়েও দেখছে না, সেটাই লক্ষ্য করার বিষয়।'

'যদি দেখতো তাহলে মনে হতো সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো, তাই না?'

'ঠিক বলছে ম্যাক্স! পাখিটা যথার্থই ম্যক্ত স্বাধীন জীব। ঠিক যেরকম পরিবেশে আমরা আছি বা আমাদের থাকতে হয়, সেখানে অমন ম্যক্ত স্বাধীন সত্তা আমরা দেখতে পাই না। মান্যষ সব সময়ই সমস্যার পাঁকে ড্যবে আছে। তুমি যদি তাকে সাহায্য করতে চাও, তাহলে প্রশ্ন করে তোমায় অনেক কথা জানতে হবে তার সমস্যা ব্যঝতে হবে, বাধাগ্যলো কাটাবার উপায় বার করতে হবে; আরও কত কি করতে হবে, তবে তাকে সাহায্য করতে পারবে তুমি।'

ম্যাক্সের মনে পড়ে গেল আগের দিনের কথা। উঃ! কি কঠিন সময় তার গেছে আনন্দ নগরে! কোভালস্কীর কথার জবাবে বললো, 'সে কথা ঠিক। বস্তির মধ্যে একটা তুচ্ছ কাজের দায়ও টেন্‌শেন্‌ তৈরি করে। কিছ্যতেই মনের চাপ কমানো যায় না।'

মাছরাঙা পাখিটার দিকে চেয়ে আছে কোভালস্কী। চেয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'টেন্‌শন্‌ কমানো যায় শ্যধ্য বাচ্চাদের সংগে মিশলে। সংসারে শ্যধ্য

বাচ্চারাই টেনশনে ভোগে না। আনন্দ নগরে যখন কোন বাচ্চার চোখের দিকে তাকাই তখন ওই দুটো চোখে আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাই। শিশু ভান করতে জানে না। তার মনে ছলনা নেই। অবস্থা বুঝে সে নিজেকে বদলায় না। সে একেবারে খোলা হাট। ঠিক এই পাখিটার মতন। একটা পাখি সার্থক ভাবেই পক্ষিজীবন যাপন করে বেঁচে থাকে যা মানুষ পারে না।'

দুজনে পাশাপাশি ঘাসের ওপর বসলো। দুজনেই চুপচাপ। দুজনেই ভাবছিল যেন আনন্দ নগর থেকে লক্ষকোটি মাইল দূরে চলে এসেছে তারা। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে অনেকটা স্বীকারোক্তির মতন কোভালস্কী বললো, 'জানো ম্যাক্স! আনন্দ নগর যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন মনটাকে গোছাতে এখানে ছুটে আসি। যখনই মন ভেঙে যায়, মনে হয় আর পারছি না, তখনই বাসে চড়ে এখানে চলে আসি। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকি। বলি, সহিবারে দাও শকতি। এখানে এসে যখন আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকি তখনই মনে মনে এই শক্তিটুকু পাই। হয়ত তখন সন্ধ্যালগ্ন আসন্ন। তাকিয়ে দেখি ঝোপের মাথায় কেমন পাখা নাচিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা ফড়িং। আকাশময় ছড়িয়ে যায় নীড়ে ফেরা কাঠঠোকরা পাখিটার মধুর কুহুতান। ধীরে ধীরে বুজে যায় ফুলগুলি। আমার তখনকার অবস্থায় এই ঘটনাগুলোই অবসন্ন মনটাকে টেনে তোলে। নতুন করে জীবনীশক্তি পাই।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। কেউ কথা বলছে না। মনে হয় এই পরিবেশে নৈঃশব্দ ছাড়া যেন আর কিছু মানায় না। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দ ভেঙে কোভালস্কী বললো, 'তুমি ত ইহুদি! তাই না?'

ম্যাক্স একটু অবাক হলো। তার এই অবাক ভাব দেখে অপ্রস্তুত কোভালস্কী বললো, 'আমি জানি ঠিক এইরকম একটা প্রশ্ন তুমি আশা করো নি। এটা এদেশের রীতি। এদেশে ধর্ম দিয়ে মানুষের যাচাই হয়। ধর্মই মানুষের সব কিছু নির্ধারণ করে।'

ম্যাক্স তখনও চুপচাপ। কোভালস্কীর কথা শেষ হলে বললো, 'হ্যাঁ, আমি একজন ইহুদি।'

কোভালস্কীর মুখখানা উজ্জ্বল হলো। নির্মল হাসিতে ভরে উঠলো তার মুখ। ম্যাক্সের দিকে চেয়ে বললো, 'তুমি ধন্য ম্যাক্স। তোমাদের ধর্ম জুড্যাইজ্‌ম্ জগতের অন্যতম সুন্দর ধর্ম।'

'কিন্তু সব খ্রীশ্চানরা সেকথা মানে না স্তেফান!' শান্ত স্বরে জবাব দিল ম্যাক্স।

'না, মানে না, সেটাই খ্রীশ্চানদের দুর্ভাগ্য।' খানিক চুপ করে কোভালস্কী ফের বললো, 'কিন্তু ভেবে দেখ, হাজার হাজার বছরের কী দারুণ সেই বীরত্ব যা তোমায় আজও অনুপ্রাণিত করছে! কি অবিচলিত সেই বিশ্বাস! দুঃখ সইবার সে কি মহিমা! ঈশ্বর এক বই বহু নন। তাই একেশ্বরকে মেনে নেবার নিষ্ঠায় সে কি দৃঢ়তা তোমাদের! 'শেমা' (Shema) তোমাদের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রার্থনা। এটাই তোমাদের প্রধান ধর্মপালন। 'শেমা ইজরাইল!' রোজ সকাল সন্ধ্যায় তোমরা প্রার্থনা করো—'ইজরাইলবাসী শোনো! ঈশ্বর এক! তিনিই একমাত্র প্রভু!' আমার মনপ্রাণে শিহরন আনে তোমাদের ওই 'শেমা' প্রার্থনা। ঘরের দরজার গায়ে তোমরা 'শেমা' বাণী লিখে রাখ। তাই না ম্যাক্স? মানবজাতির কাছে কি গভীর তাৎপর্য বহন করে এনেছে ওই বাণী। বিশেষ করে যারা খ্রীশ্চান, তাদের কাছে!'

এরপর ইহুদি যুবক ম্যাক্সের কাঁধে হাতখানা রেখে ঘনিষ্ঠ স্বরে কোভালস্কী বললো, 'আধ্যাত্মিক বিচারে আমরা সবাই অর্থাৎ খ্রীশ্চানরাও ইহুদি। আব্রাহাম

আমাদের সকলের পিতা, মোজেস আমাদের সবার পথপ্রদর্শক। রেড্ সী আমার সংস্কৃতির একটা অংগ—। না, আমার জীবনের। যেমন নীতিমালা সম্বলিত স্তবকগুলি কিংবা ধর্মসংহিতাটি, ঠিক তেমনি। ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষরা আমাদের বিবেক-জ্ঞান। ডেভিড আমাদের স্তবকুসুমগুলির রচয়িতা। তোমরাই প্রথম জগতকে শিখিয়েছ যে ঈশ্বর এক! তিনিই সর্বশক্তিমান এবং সর্বোত্তম। তিনি মহান এবং সর্বত্রব্যাপী। তোমরাই শিখিয়েছ যে প্রতিবেশীকে ঈশ্বরের মতন ভালবাসতে হয়। কি মহান এই নির্দেশ! মনে করে দেখ ম্যাক্স, যীশুর আবির্ভাবের আটশ' বছর আগে বিশ্বের দরবারে তোমাদের ধর্ম ঘোষণা করে বলেছিল যে ঈশ্বর এক এবং তিনিই নিত্য ও বিশ্বজনীন। তিনি সকলের। এই উপলব্ধি যেন সত্যের এক প্রকাশ। মহান হিন্দুধর্মের উপলব্ধি এবং নানারকম মিস্টিক শক্তির বিকাশ সত্ত্বেও, সে ধর্মে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের এমন প্রতীতি নেই। বিশ্বের মানুষের কাছে এই স্বপ্রকাশ সত্যটি পৌঁছে দেবার অধিকার অর্জন করেছে শুধু ইজরাইল। কি বিস্ময়কর এই প্রকাশ! একবার ভাব ম্যাক্স! যে আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তে ধরাধাম ধন্য করতে বুদ্ধ, কনফুশিয়াস এবং মহাবীরের আবির্ভাব হয়েছিল, মানবেতিহাসের সেই পরম লগ্নেই একজন ইহুদি মহাপুরুষও আবির্ভূত হন। তিনি ঈশা এবং তিনি প্রচার করেন যে নীতি, অনুশাসন নয় প্রেমই সব।'

হ্যাঁ, প্রেমই সব। এবং এই ভারতবর্ষে এসেই একজন বিদেশী খ্রীশ্চান এবং ইহুদি যুবক প্রেমনামের মাহাত্ম্য আবিষ্কার করলো। সেদিন আনন্দ নগরে ফেরার পর বস্তির দুটি হতভাগ্য মানুষ যেন এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়ে দিল ওদের। বছর তিরিশ বয়সের একজন অন্ধ যুবক বস্তির প্রধান সড়কের একধারে বসে আছে। অন্ধের কোলে রয়েছে একটি বাচ্চা-কিশোর। পোলিও রোগের প্রকোপে কিশোরের পা পড়ে গেছে। ম্যাক্স দেখলো যে অন্ধ যুবক খুব যত্ন ভরে বাচ্চার সেবা করছে। তার পংগু হাত পা টিপে দিচ্ছে। হাসির কথা বলছে। বাচ্চাটাও পংগু হাত দুটি দিয়ে অন্ধ যুবকের গলা জড়িয়ে বসে আছে। তার মলিন মুখের উজ্জ্বল হাসিতে ছড়িয়ে পড়েছে স্বর্গীয় সুষমা। খানিক পরে বাচ্চাকে তার পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল যুবক। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ভিজে রাস্তায় পা ফেলে চলতে লাগলো বাচ্চাটি। প্রথমে এক পা। তারপর আর এক পা। বাচ্চা নিজের পায়ে হাঁটছে। আর অন্ধ যুবক তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। এক পা দুপা করে আরও এগোল ওরা। এমনি করে ওরা দুজনে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়লো। একজন অন্ধ, অন্যজন পংগু। কিন্তু পংগু বাচ্চাটা তখন যেন অন্ধের যষ্ঠির কাজ করছে। একজন অন্যজনের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে দুজনে। সুস্থ মানুষের সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়েও ওরা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। এই ঘটনা যেন এগিয়ে চলার এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাই বস্তির ছেলেরাও মার্বেল খেলা ভুলে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

সাতান্ন

চটকদার গলার হার এবং হাতে গিল্টির বালা পরা ওই মেয়েটা যেন পাড়ার সবার চোখ চুম্বকের মতন টেনে রেখেছে। রঙচঙে শাড়ি পরে, মুখে চোখে রঙ মেখে বিশ বছরের যুবতী কালীমা যখন রাস্তা দিয়ে কোমর দুলিয়ে হেঁটে যায়, তখন

সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে। বস্তির এই অন্ধকার গহ্বরে কালীমার উপস্থিতিটাই যেন চনমনে করে তোলে মানুষগুলোকে। পান-খাওয়া লাল ঠোঁট আর কাজল-টানা চোখে ওর তাকানোর ভঙ্গি দেখে কোভালস্কীও তখন চিন্তিত হয়ে ওঠে। মনের উৎকণ্ঠা বেড়ে ওঠে। তবে কালীমার কোমর অব্দি লম্বা চুলের ঢাল এবং পরিপাটী কেশসজ্জা দেখে কোভালস্কী মুগ্ধ। নীল রেশমী ফিতে এবং সাদা যুঁই ফুল দিয়ে সযত্নে বিনোদ বেণীটি বেঁধে কালীমা যখন হেলেদুলে চলে যায়, তখন কোভালস্কীর মনে হয় এত কুশ্রীতার মধ্যেও মেয়েটার রূপবোধ প্রশংসনীয়। কিন্তু সুন্দরী হলেও কালীমা নারী নয়। পুরুষের মনোহরণকারিনী এবং ছলাকলা-নিপুণা রমণীও সে নয়। কালীমা ক্লীব।

কালীমা যে নারী নয় কোভালস্কী তা নিজের চোখে দেখেছে। আসলে ও এমন এক সমাজের মানুষ যাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায় না। গোপন এবং রহস্যময় এই সমাজের লোকেদের 'হিজড়া' বলে। ভারতবর্ষের সর্বত্র হিজড়ারা ছড়িয়ে আছে। এদের পুরুষাঙ্গ ছেদন করে ক্লীব করে রাখা হয়।

নপুংসক হিজড়ারা সমাজের কোন্ কাজে লাগে কোভালস্কী তা জানতো না। কিন্তু দিন কয়েক পরেই এমন এক ঘটনা ঘটলো যার ফলে হিজড়াদের কাজের একটা নমুনা দেখতে পেল সে। সেদিন সবে সন্ধ্যে উতরেছে তখনই হঠাৎ একটা বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠলো। কোভালস্কী শুনলো যে ওদের সংসারে নতুন মানুষের শুভাগমন হয়েছে। মনে মনে খুশী হলো কোভালস্কী। সত্যিই এ এক আনন্দ সংবাদ। পাড়ার সবাই তখন বাচ্চার কান্না শুনেছে। অন্তঃসত্ত্বা মাকে কোভালস্কী দেখেছে। ওর বরের একটা চোখ কানা। এখনই সন্তান প্রসব করেছে পোয়াতি মা। যেমন তেমন সন্তান নয়। রীতিমত পুত্র সন্তান। তখন নাতি হয়েছে শুনে বৃদ্ধা পিতামহী পাড়ার আরও ক'জন মহিলা গিয়ে হিজড়াদের ঘরে এসে খবরটা দিয়ে গেল। এটা এক দেশাচার। হিজড়াদের আশীর্বাদ না পেলে নবজাতক সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকে না। বিধবা বৃদ্ধার কথা শুনে হিজড়াদের মধ্যে সাজসাজ রব শুরু হয়ে গেল। রঙিন শাড়ি আর গয়নাগাঁটি পরে কালীমা এবং তার সঙ্গের লোকজন তৈরি হয়ে নিল। কালীমাকে নাচতে হবে। তাই পায়ে নূপুর পরতে হলো তাকে। অন্য তিনজন হিজড়া ঢাক ঢোল নিয়ে তৈরি। ঢোলের গায়ে ওরা সিঁদুর মাখিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। এইভাবে সেজেগুজে দলের কর্তাকে নিয়ে পাঁচ-জনের দল চললো নবজাতকের ঘরে গিয়ে তাকে আশীর্বাদ করতে। কোমর দুলিয়ে এবং হাতে তালি মেরে ওরা নাচছিল আর পুরুষের গলায় তাল দিয়ে গাইছিল।

'ছেল্যে হইয়েছে! ছেল্যে হইয়েছে! হিরোলা! হিরোলা!'

ওদের দলের কর্তার নাম বুলবুল। সেও হিজড়া। বেশ বয়স তার। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। গালের হাড় বের করা বুলবুলের সাজের ঘটাও কম নয়। কোমরে লাল সায়া, গায়ে কাঁচুলি, নাকে পাথর বসানো নথ আর কানে দুল পরেছে সে। দলের সে কর্তা। ওরা 'মা' বলে। ঘরের দাওয়ায় উঠে গা দুলিয়ে বুলবুল চেঁচাল, 'কই গো! ছ্যালে দেখাও! আমরা আশীব্বাদ করি!' বুড়ি ঠাকুমা তাড়া-তাড়ি সদ্যোজাত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাইরে এল। বুড়ির কোল থেকে ভারি যত্ন করে বাচ্চাকে নিজের কোলে নিল কালীমা। তারপর খুব ধীরে ধীরে তাকে দোল খাওয়াতে লাগলো। কালীমার পায়ের নূপুর বাজছে ঝুন ঝুন ঝুন। সেই ছন্দে মৃদুস্বরে বাজছে ঢোল। নাচতে নাচতে ওরা গাইলো,

'আমরা আশীর্বাদ করচি গো!
তোমার ছেলের একশ' বচ্ছর পরমায়ু হবে।
শরীরটা ডাগর হবে, অনেক ট্যাকা রোজগার করবে।'

গানের আওয়াজ শুনে আশপাশ থেকে পড়শীরা এসে জমা হলো ছোট্ট ঘরখানার সামনে। বাচ্চাদের উৎসাহই বেশী। খাড়া রোদের তাপ উপেক্ষা করে তারা ছাতের ওপর চড়ে বসেছে। বস্তির লোকজনদের কাছে এটা যেন এক উৎসব। তালি দিয়ে কালীমা নাচছে আর ওর সঙ্গীরা নাচের তালে তালে ঢোল বাজাচ্ছে। দলের 'মা' বুলবুল ঘুরে ঘুরে পয়সা তুলছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের কাছ থেকে। এসব উপলক্ষ্যে হিজড়াদের চড়া হারে মজুরী দিতে হয়। তবুও কেউ দর-কষাকষি করে না। শখ করে ওদের অভিশাপ কুড়িয়ে ছেলের অমঙ্গল করতে চায় না কেউ।

তখন নাচতে নাচতে হিজড়ারা গাইছে, 'শুনো গো মায়েরা! আমাদের ছেলে শিবঠাকুরের মতন যোয়ানমন্দ হবে গো! আমরা ভগবানের কাছে মেনেছি, ওর আগের জন্মের পাপ কেটে যাবে। এ জন্মের সব পাপ আমরা নিয়েছি।'

হিজড়াদের এটাই ধর্মবিশ্বাস। এইভাবেই ওরা সমাজের সেবা করে এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই করে। অনধিকারী এবং অন্ত্যজ এই শ্রেণীর মানুষদের এই সাধুযোগীর দেশ বাঁচবার যোগ্য মর্যাদা দেয় নি। তবে অন্যের পাপের বোঝা এদের মাথায় চাপিয়ে কায়ক্লেশে জীবনধারণের অধিকার দিয়েছে শুধু।

দলের গুরু ফিরে এসেছে। ওর হাতে এক বাটি চাল। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঢোলকের গা থেকে খানিকটা সিঁদুর তুলে সে বাচ্চার কপালে টিপ পরিয়ে দিল। এটা প্রতীকী ব্যবস্থা। এই কৃত্যটুকু পালন করে ওরা সদ্যোজাতর পাপদোষটি নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিল। হিন্দুর বিয়ের অনুষ্ঠানে সিঁদুরের ভূমিকা খুব পবিত্র। বিয়ের সময় হিন্দু মেয়েরা এয়োতির লক্ষণ হিসেবে সিঁদুর ব্যবহার করে। বরকনের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে সিঁদুর। হিজড়ারা নারী নয়, পুরুষও নয়। তাই ঢোলকের সঙ্গেই ওদের বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন হয়। এর পর ঢোলকের গায়ের ওপর ওরা চাল ছড়িয়ে দিল। খানিকটা চাল ছড়াল ঘরের দোরগোড়ায়। তারপর চালের বাটি মাথার ওপর রেখে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো।

ওরা নাচছে। তালে তালে ঢোল বাজছে ডুম ডুম। ওরা নাচছে আর বলছে, 'গঙ্গার জলে চান করে ওর পাপ ধুয়ে দেব গো!' সবাই কালীমার নাচ দেখছে মুগ্ধ চোখে: তার মুখখানি ভরে উঠেছে মাতৃস্নেহে। ওর কোলে দোল খাচ্ছে বাচ্চাটা। কালীমার নৃত্যরত ভঙ্গিতে লাবণ্য ঝরে পড়ছে যেন। ছলনা তখন সত্য হয়ে উঠেছে। কোভালস্কীর মনে হচ্ছিল কি নিষ্ঠুর এই পরিহাস! যে শিশুটি এখনই জন্মাল তার দিকে মমতামাখানো দুটি অপলক চোখ থেকে ঝরে পড়ছে বিরল এক মাতৃস্নেহ। এর সবটাই কি ছলনা? কিন্তু অবাক হবার আরও ঘটনা তখনো বাকি ছিল। এর পরে যে দৃশ্যগুলো অভিনীত হলো সেগুলো নির্বাক। বাচ্চাকে ঠাকুমার কোলে ফেরত দিয়ে কালীমা তার পরনের শাড়ির তলায় ন্যাকড়ার পুঁটলি গুঁজে পেটটা মোটা করলো। ওকে তখন দশমাস অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের মতন দেখাচ্ছিল। তখন হঠাৎ যেন প্রসব বেদনা উঠেছে তার। মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে কালীমা এবং চিৎকার করে কাঁদছে। অন্য হিজড়ারা তাড়াতাড়ি কালীমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে তখন। অতঃপর সন্তান প্রসব করলো কালীমা। তীব্র প্রসব বেদনার যাতনার পর মাতৃরূপিণী কালীমার শরীর তখন

অবসাদে বিধ্বস্ত। তবুও মুখখানি মাতৃস্নেহে ঝলমল করছে যেন। সদ্যোজাত শিশুটিকে তার কোলের পাশটিতে শুইয়ে দিয়েছে ওরা। কালীমা তখন যথার্থ মায়ের মতন শিশুকে আদর করছে। বুকের উষ্ণতার মধ্যে ধারণ করে পরম মমতায় আগলে রেখেছে বাচ্চাকে। নবজাতকের আগমনে আনন্দমুখর হয়ে উঠলো পরিবেশ। কোভালস্কী অবাক হয়ে দেখলো এক অবিস্মরণীয় অভিনয়।

আটাম

সব দেখে শুনে ম্যাক্স লোয়েব মনে মনে বলে উঠলো, 'হায় ঈশ্বর! এ ত দেখছি রীতিমত স্বর্গধাম! পাঁকে পদ্মফুল!'

তখন সাদা পাগড়ি এবং ঢোলা উর্দী পরা হোটেল বয় হোটেলের ঘরে ঢুকছে। লোকটার উর্দীর বুকে ঝলমলে বর্ম আঁটা। তার হাতে একটা রুপোর ট্রে। ট্রের ওপর ডবল্ হুইস্কি এবং সোডার বোতল। সঙ্গে প্লেট ভর্তি ভাজা কাজু বাদাম। ম্যাক্সের ভীষণ লোভ হলো পানীয় দেখে। পেঁকো ডোবায় ডুবে যাবার পর থেকেই শরীরটা নেতিয়ে গেছে। চাঙ্গা করতে নতুন করে ব্যাটারি চার্জ করিয়ে নেওয়া দরকার। ইডেন গার্ডেনের ওই সবুজ সমারোহের মধ্যে নিমজ্জিত হলেও সেটা যথেষ্ট হয়নি তার কাছে। এখন তাই হোটেলের সঙ্গোপন বিলাসিতার মধ্যে থাকবে বলে এখানে এসেছে। ঘরের লাগোয়া বাথরুমের বাথটাবে ইতিমধ্যেই সুগন্ধী ফেনা দোল খাচ্ছে। আনন্দ নগরের দুঃস্বপ্নের স্মৃতিটা কোনরকমে সরিয়ে দিয়ে এসেছে সে। তারা এখন অন্য গ্রহে বিতাড়িত। লোকটার হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিল ম্যাক্স। টাকাটা পকেটে পুরে বেরিয়ে যাবার আগে লোকটা ফের ঘুরে দাঁড়ালো। বোঝা যায় কিছু বলতে চাইছে লোকটা। ম্যাক্স তাকাল। সারা মুখখানায় বয়সের ছাপ পড়েছে। বলিরেখাবহুল কপাল। ছোটখাট বেঁটে চেহারার মানুষটার থুতনিতে সাদা একটু ছাগদাড়িও আছে। কুতকুতে চোখ পিটপিট করে লোকটা হঠাৎ বললো, 'ছুকরী চাই সায়েব? খুপসুরুত ছুকরী আছে।'

লোকটার কথায় থমকে তাকাল ম্যাক্স। হাতের গেলাসটা টেবিলে রেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

লোকটা ফের বললো, 'যেমন দেখতে খাসা, তেমনি মিষ্টি কথাবার্তা। বলেন ত নিয়ে আসি।'

ইতিমধ্যে আর এক গেলাস পানীয় গলাধঃকরণ করে ফেলেছে ম্যাক্স। চোখে সামান্য ঘোর। ম্যাক্সের ঘোর-লাগা চোখের দিকে চেয়ে লোকটা চোখের ইসারা করে বললো, 'যদি চান দুজন ছুকরীকেও আনতে পারি। তবে এরা একাই আপনাকে খুশী করে দিতে পারবে। ভারি সেয়ানা মেয়েছেলেগুলো। একেবারে কামসূত্র সায়েব! যেমনটি চাইবেন, ঠিক তেমনটি করতে পারে এরা।'

ম্যাক্সের চোখে তখন খাজুরাহো মন্দিরের গায়ে আঁকা বিভিন্ন ভঙ্গির মিথুন মূর্তির ছবিগুলো ভাসছে। মিথুনাসক্ত নরনারীর বিচিত্র ভঙ্গির মূর্তি সেসব। দিন কয়েক আগে ছবির একটা য়্যালবাম হাতে এসে গিয়েছিল তার। অনুপম লীলা-মধুর ভাস্কর্যগুলোর আলোকচিত্র তখনই সে দেখেছে। ম্যাক্সের মনে পড়ে গেল তার প্রেমিকা সীলভিয়ার কথাগুলো। ডিনার টেবিলে বসে সীলভিয়ার কথাগুলো এখন

তার মনে পড়ছে। সীলভিয়া বলেছিল, 'দেখো! ভারতবর্ষে গিয়ে ভেড়া বনে যেও না। শুনেছি ওখানকার মেয়েরা খুব পটিয়সী। ওদের জোড়া সারা পৃথিবীতে নেই। একেবারে তুলনাহীনা ওরা।'

লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। মনে হয় আরও কিছু বলতে চায় সে। এই সব বিদেশী বাবুদের খুব ভাল করে চেনা আছে তার। বিশেষ করে আমেরিকান ছোকরাদের। এখানে ওরা স্ফূর্তি করতে আসে। এক একজন আস্ত শয়তান বনে যায় এখানে এসে। কোন দুষ্কর্মেই এরা পিছিয়ে নেই। কিছুই অশ্লীল নয় এদের কাছে। লোকটা তাই তার কুতকুতে চোখে ম্যাক্সকে আর একটু যাচাই করে বললো, 'তাহলে কি একটা ছোকরা আনবো সায়েব? বেশ ফুটফুটে ছোকরা। দেখতে শুনতেও মিষ্টি।' কথাটা বলেই একটা কুৎসিত ভঙ্গি করলো সে। ম্যাক্স তেমনি নিরুত্তর। মাঝে মাঝে শুধু কাজু বাদাম চিবোচ্ছে। ম্যাক্সের এই মৌনতা লোকটাকে আর একটু দুঃসাহসী করেছে তখন। নিজেও যে ওর দুষ্কর্মের সহায়, সেটা বোঝাতে লোকটা এবার খুব আস্তে আস্তে বললো, 'দুটো ছোকরা আনবো সায়েব?' এবারও ম্যাক্স উত্তর দিল না। লোকটারও যেন আর তর সইছে না। ম্যাক্স তখনও চুপচাপ।

ম্যাক্স তখন কোভালস্কীর মুখখানা ভাববার চেষ্টা করছিল। সব কথা শোনার পর কোভালস্কীর মুখের চেহারাটা কেমন হবে সেটাই ভাবছিল সে। খানিক পরে বাথরুমে গিয়ে সে মুখেচোখে জল দিল। তারপর ঘরে ফিরে দেখলো লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। তার মানে ওর স্ফূর্তির তালিকা তখনও শেষ হয়ে যায়নি।

ম্যাক্সকে দেখে লোকটা এবার নতুন এক প্রস্তাব দিল। ইতিমধ্যে মনে মনে সে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করেছে। তাই দ্বিধাহীন ভাবে বললো, 'মনে হচ্ছে সায়েব বোধহয় এসব ঠিক পছন্দ করেন না। তবে যদি নেশা করতে চান তার ব্যবস্থা করতে পারি। ভুটান থেকে আনা মাল আমার কাছে আছে। ধরিয়ে টানুন, খুব নেশা হবে। আবার যদি পাইপে ভরে টানতে চান তাও পাবেন। চীনমুলুক থেকে আমদানি করা আপিং আছে আমার কাছে।' বলতে বলতে লোকটা যেন চনমন করে উঠলো। ম্যাক্স তখনও নিরুত্তর। লোকটার একটা প্রস্তাবও তার কানে যায়নি মনে হয়। লোকটা এবার শেষ চেষ্টা করলো। বললো, 'তাহলে সায়েবের জন্যে ভাঙ্ মেশানো একটা ইঞ্জেকশন করিয়ে দিই। এসব দিশি নেশার জিনিসেও চড়া নেশা হয়, সায়েব।'

বলা বাহুল্য মাননীয় বিদেশী অতিথিটির কোন কিছুতেই যেন চাড় হলো না। লোকটার মনে হচ্ছিল মানুষটা কি অসাড় না আর কিছু! তার কাছে এটাও এক পরম বিস্ময়ের বস্তু।

তবে সরাসরি অসফল হয়ে ফিরে যাবার মানুষও সে নয়। তাই শেষমেশ নেহাতই নিরীহ একটা প্রস্তাব দিল ম্যাক্সের কাছে। তার ধারণা এবার সে ওই মার্কিন ছোকরাকে কাত করে দেবে। যে কোনো বিদেশী ট্যুরিস্টের কাছে এই প্রস্তাবটা জপমন্ত্রের মতন কাজ করবে বলেই তার বিশ্বাস। তাই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে লোকটা বললো, 'আপনি কি ডলার বদলে টাকা চান সায়েব? যদি চান ত আপনার জন্যে আমি ভাল রেটে ব্যবস্থা করে দেব। এক ডলার এগারো টাকা। নেবেন?'

ততক্ষণে ম্যাক্স আর একটা গেলাস শেষ করেছে। খালি গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে সে বলে উঠলো, 'তার চেয়ে আমার জন্যে আর একটা ডব্‌ল্‌ হুইস্কির ব্যবস্থা করে দাও চাঁদ! আমি বাঁচি, তুমিও বাঁচ।' বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়াল। লোকটা তখন করুণ চোখে ম্যাক্সকে দেখছে। করুণা অনুকম্পা মাখামাখি হয়ে আছে তার মুখে। সেই অবস্থাতেই বললো, 'মনে হচ্ছে জীবনের অনেক ভাল জিনিসই আপনি চেখে দেখেন নি সায়েব!' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না। বেরিয়ে গেল ডব্‌ল্‌ পেগ্‌ হুইস্কি আনতে। লোকটার কথাগুলো তখন ম্যাক্সের মন তোলপাড় করছে। কে বলে যে সে ভাল জিনিসের গুণগ্রাহী নয়! নিশ্চয়ই সে ভাল জিনিসের কদর জানে। অন্তত ক'টা হপ্তা আনন্দ নগরের আঁস্তাকুড়ে কৃচ্ছ্রসাধনের পর সে তার জীবনদর্শণ বদলে ফেলেছে। আর একটা ডব্‌ল্‌ হুইস্কি শেষ করে খানসামা-টাকে তার ফুর্তির জন্যে একটা ছুকরি আনতে বললো ম্যাক্স। যাকে কামক্রীড়ানিপুণ বলে তেমন এক পটিয়সী যুবতী আনতে চলে গেল লোকটা। কিন্তু কল্পলোকের যে মোহিনীকে সে সঙ্গে করে নিয়ে এল তাকে দেখে নিরাশ হলো ম্যাক্স। একদা মন্দির ভাস্কর্যের প্রেরণা হয়েছিল যে দিব্যাঙ্গনারা, তাদের মতন অনুপম দেহলাবণ্য এর নেই। হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া মেয়েটার চেহারা শুকনো। জোর করে ওকে আকর্ষণীয় করে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিয়েছে ম্যাক্সের ঘরের দোরগোড়ায়। কিন্তু এত ভয় পেয়েছে মেয়েটা যে, থরথর করে কাঁপছিল ম্যাক্সকে এগোতে দেখে। ওর ত্রাস দেখে ম্যাক্সও শঙ্কিত হলো। লোভ হলেও মেয়েটার অমন কালো সুন্দর চুলের ঢাল হাত দিয়ে ছুঁতে পারলো না। বরং তার মনে হলো মেয়েটা ক্ষুধার্ত। ওকে কিছু খাওয়ানো দরকার। টেলিফোন করে কেক, প্যাস্ট্রি, আইসক্রিম আনালো বেশি করে। অমন অপর্যাপ্ত লোভনীয় খাদ্যসম্ভার দেখে মেয়েটার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তখন। দেহবেচা যুবতী মেয়েটার চোখের পাতা তখন যেন ব্যাকুল হয়ে নাচছে। আলোর চারপাশে ফরফর করে উড়ে বেড়ানো পতঙ্গের মতন চঞ্চল ওর চোখের পাতা। এত খাবার! আর কি উদার এই বিদেশী লোকটা! এমন উদার 'বাবু' সে আগে কখনও দেখেনি। যেন স্বয়ং শিব!

কোভালস্কীর কাছে ঘটনাটা বলার সময় ম্যাক্স বলেছিল, 'সেদিন দুটো পেটুক ছাত্রছাত্রীর মতন খাবারগুলো আমরা মন দিয়ে খেলাম। আমাদের মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই সান্টা ক্লজ খুশী হয়ে আমাদের জন্যে এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

এই ঘটনার বেশ কয়েক হপ্তা পরের কথা। একদিন সন্ধ্যেনাগাদ একটা জমকাল বাড়ির গেট পেরিয়ে ম্যাক্সের ট্যাক্সি ঢুকলো। পাঁচিলঘেরা বিরাট চত্বর। ফটকের দুপাশে বন্দুক হাতে দুজন সেপাই দাঁড়িয়ে। গেট থেকেই শুরু হয়েছে চমৎকার এবং পরিচ্ছন্ন একটা ড্রাইভ্‌ওয়ে। ড্রাইভ্‌ওয়ের দুপাশে যুঁইফুলের ঝাড়। রাত হলেই ফুলের মিষ্টি গন্ধ আশপাশের বাতাস উদাস করে দেয়। ড্রাইভ্‌ওয়ে শেষ হয়েছে মোটা মোটা থামওলা এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে এসে। বিশাল ভবন এবং গ্র্যান্ড স্টেয়ারকেস্‌ দেখে ম্যাক্সের মনে হলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। 'গন্‌ উইথ্‌ দ্য উইন্ড' উপন্যাসের সেই জর্জিয়ান প্রাসাদভবনের সুবিখ্যাত সোপান-শ্রেণী এবং উৎসবরাতের আলোকোজ্জ্বল চেহারাটা ম্যাক্সের দৃষ্টির সামনে যেন ফুটে উঠলো। মনে মনে বললো, 'বাঃ! এ ত দেখছি জর্জিয়ার সেই টারা!' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আলো ঝলমল বিশাল প্রসাদভবনটি তাকে সত্যিই স্বপ্নের দেশে

নিয়ে গিয়েছিল তখন।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রাসাদভবন তৈরি হয়। সে কালের চটকল শিল্পের একজন ঝানু ইংরেজ শিল্পপতির বসতবাটী ছিল এটি। এই মস্ত ইমারতটি ছাড়াও কলকাতায় তখন আরও অনেক প্রাসাদভবন ছিল। তাই কলকাতার একটি চলতি নামকরণ হয় 'প্রাসাদনগরী।' হয়ত সেকালে এই নামকরণ নেহাত অসাথ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এর চতুষ্পার্শ্বের অসংখ্য বস্তি এবং ঘন লোকবসতির চাপের পীড়নে এই নামকরণ যেন কালাতিক্রম দোষ বলেই গণ্য হবে। তবুও সেই হারিয়ে যাওয়া যুগের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অল্পস্বল্প যে ক'টি আকর্ষণের বস্তু এখনো টিকে আছে, তার মধ্যে এই বাড়িখানা অন্যতম। এই প্রাসাদভবনের বর্তমানের মালিক সুন্দরী এবং মোহিনী মনুবাঈ চ্যাটার্জি। মনুবাঈ শুধু রূপসী নয়। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতন তার দেহলাবণ্য অনুপম। মনুবাঈ বিধবা। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। কিন্তু শরীর থেকে যৌবন গড়িয়ে যায়নি। মনুবাঈয়ের অনুরাগের বিষয়-বস্তুতে একটা বৈচিত্র্য আছে। আধুনিক চিত্রকলা, ভারতীয় রাগসংগীত প্রভৃতি থেকে শুরু করে ঘোড়ায়চড়া পর্যন্ত সবক'টি বিষয়েই তার কৌতূহল স্বচ্ছন্দ। চেহারাখানা আকর্ষণীয় হলেও মনুবাঈ একটু কৃশ। অনেকটা এ দেশের চাষীঘরের ঘরণীদের মতন। এদেশের মেয়েরা ব্যাংকের টাকা বাড়ার সংগে সংগেই স্থূলাংগী হয়। তখন যৌবনবতীদের চেহারার স্বাভাবিক ছিরিছাঁদ থাকে না। মনুবাঈ ব্যতিক্রম। ধনবতী হলেও সে স্থূলাংগী হয়নি। বরং যথেষ্ট কর্মতৎপর সে। নানা-রকম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সে জড়িত। ইন্ডো-আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সভাপতি হিসেবেই আজ তার গরিবখানায় এই সান্ধ্য খানাপিনার আয়োজন করেছে মনুবাঈ। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের দ্বিশততম স্বাধীনতা উৎসবের উদযাপন হবে পরের দিন। এই উৎসব তারই স্মারক।

পরিবেশের সংগে মানিয়ে নিতে ম্যাক্সের সময় লাগলো মাত্র কয়েক মিনিট। হোটেলের ঘরে বসে যুবতী বেশ্যার সংগে আহার করা থেকে শুরু করে ব্যয়বহুল ফাইভ স্টার হোটেলে রাত্রিবাস করা পর্যন্ত সবই হয়েছে। কিন্তু বস্তির অতি কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতটা সে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এটা যেন দ্বিতীয় সারির ত্বক হয়ে লেগে আছে তার শরীরে। এই আনন্দোচ্ছ্বল পৃথিবী থেকে ট্যাক্সি চড়ে সেই আঁস্তাকুড়ে যেতে যা মোট একঘন্টা সময় লাগে, তা কি কেউ জানে? অথচ কত আলাদা সেই জগৎ। সেখানে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে ফোলা পেট নিয়ে, মায়েদের দৈন্যদশা চোখের ওপর বিজবিজ করে। এবং পুরুষের মুখচোখের হতাশা দেখে মন বিব্রত হয়। সেখানে মানুষের মৃত্যু যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। খাটের ওপর শব হয়ে শুয়ে বাহকের কাঁধে চড়ে নাচতে নাচতে যেতে মানুষ যেন তৈরি। আনন্দ নগরের জানলা দরজা বিহীন ঘরের কারখানাগুলোর চেহারা জেলখানারও অধম। মানুষগুলো জেলের কয়েদি যেন। সেখানে কদাচিৎ হাসির হররা ওঠে। সর্বক্ষণই চাপা কান্নায় সবাই গোঙাচ্ছে কিংবা চীৎকার করে ঝগড়া করছে।

উজ্জ্বল ফ্লাডলাইটের আলোয় ঝলমল করছে তৃণাবৃত লন্। বেশ কয়েক শ' মানুষ এসেছে এই উৎসবে যোগ দিতে। এরা সবাই শহরের বিশিষ্ট মানুষ। কল-কাতার সেরা শিল্পপতিদের প্রায় সবাই জড়ো হয়েছে এখানে। এসেছে আমদানি-রপ্তানির কারবারীরা সস্ত্রীক, এসেছে বাঙালী বুদ্ধিজীবী। মোটকথা বেশ

জমজমাট অতিথি সমাগম হয়েছে এই পার্টিতে। সত্যজিত রায় এবং রবিশংকরের মতন কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষকেও দেখা গেল আজকের সান্ধ্য উৎসবে। দেখা গেল বিশিষ্ট ছবি আঁকিয়ে এবং ভারতের পিকাশো নামে খ্যাত নীরদ মজুমদারকেও।

সাদা উর্দি পরা খানসামারা ট্রে হাতে ঘুরছে এবং জনে জনে পানীয় বিলি করছে। মাথায় উষ্ণীষ আর কোমরে লাল ভেলভেটের কোমর বন্ধনী পরে বড় বড় রুপোর বারকোশের ওপর নানারকম স্ন্যাকও রয়েছে হুইস্কির সঙ্গে। লন্-এর শেষ মাথায় একটা মস্ত সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সামিয়ানার তলায় বুফে টেবিল-গুলিতে দেশি-বিদেশি খাদ্যসম্ভার। বুফে টেবিলগুলোর একপাশে বাদ্যকরেরা বসে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর বাজাচ্ছে। ওরা বাজাচ্ছে গিলবার্ট এবং সুলীভ্যান অপেরার অর্কেস্ট্রা এবং মার্কিন চটুল সংগীতের সুর। অক্ষম হলেও বাজিয়েদের বাদ্যকারিতা খানিকক্ষণের জন্যে ম্যাক্সকে মোহময় অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যেন। তখন তার কেবলই মনে হচ্ছিল এখুনি হয়ত রোলস্‌রয়েশ গাড়ি চড়ে সস্ত্রীক বড়-লাটবাহাদুর রক্ষীবাহিনী পরিবৃত হয়ে এই সমাবেশকে কৃতার্থ করতে হাজির হবেন।

মনুবাঈ আজ খুব পরিচ্ছন্ন সেজেছে। পরনের শাড়িখানা যেমন দামী তেমনি রুচিসম্পন্ন। হালকা নীল জমির গায়ে সোনালি হলুদ বুটি দেওয়া শাড়িখানা পরে রীতিমত অভিজাত দেখাচ্ছিল তাকে। লন্-এর সর্বত্র মাননীয় অতিথিদের ছোট ছোট জটলা। উজ্জ্বল বহ্নিশিখার মতন সে এদল ওদলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে এই মক্ষিরানীর দিকে। রমণীর রূপের ছটায় ঝলসে গেছে তার চোখের দৃষ্টি। কিন্তু এই বিভ্রমটুকু আনতে মনুবাঈকে যে কত যত্ন এবং আয়াস নিতে হয়েছে তা কেউ জানে না। যদিও হিন্দু বিধবাদের এখন আর মরা স্বামীদের সঙ্গে এক চিতায় শুতে হয় না, তাহলেও সমাজে এদের কোন মর্যাদা নেই। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর এই বিশাল বিত্তের উত্তরাধিকারিণী হবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। এই প্রাসাদ-ভবনে থাকবার অধিকারটুকু পেতে কিংবা এস্টেটের আয় থেকে প্রাপ্য হিস্যাটুকু আদায় করতে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে তাকে। স্বামীর চিতার আগুন নেভার আগেই ভিটে থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এর ওপর আছে ভুতুড়ে টেলিফোনের দৌরাত্ম্য। গত দু-বছর ধরে প্রায় রোজই সে এই উৎপাত সয়ে আসছে। কেউ বলে টাকার পিশাচ, কেউ বলে বেশ্যা। তাছাড়া নানারকম ভয় দেখান বা অপমান করাও চলেছে নির্বি-চারে। তবুও অপমান গায়ে মাখে নি সে। মুখ বুজে সব সয়েছে তার দুই সন্তানের লেখাপড়ার কথা ভেবে। জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছে সে। নবীন প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের ভবিষ্যত গড়ে দেওয়া বা অন্ধ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্যে চক্ষুব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেও সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। ক'জন মানুষ জানে যে শহরের প্রথম চক্ষুব্যাংকটি তারই তৈরি? কিংবা অন্ধের সেবায় মরকতমণির মতন তার দুটি চোখ সে যে আগেই দান করে দিয়েছে, এই খবরটাই বা শহরের ক'টা মানুষ জানে!

ম্যাক্সের হঠাৎ মনে হলো কে যেন তার বাহুর মধ্যে হাতখানি গলিয়ে দিল। কখন মনুবাঈ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি ম্যাক্স। দুজনে ধীরে ধীরে হাঁটছে। মনুবাঈ-ই প্রথম কথা বললো, 'তুমিই ত ডাক্তার লোয়েব?'

মহিলার গা থেকে চড়া প্রসাধনের সুবাস ছড়াচ্ছে। ম্যাক্স একটু বিচলিত বোধ

করলো। তবুও বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই।'

'তোমার সব কথা আমি শুনেছি। আমার ধারণা তুমি সত্যিই অসাধারণ।' ম্যাক্স তাকাল।

, মনুবাঈ বললো, 'তুমি বস্তিতে থাক এবং গরিবদের সেবা-শুশ্রূষার জন্যে সেখানে একটা ডিসপেনসারি খুলেছ।...ঠিক বলি নি?'

ম্যাক্স দারুণ লজ্জা পেল মহিলার প্রশংসা শুনে। সালাউদ্দিন, বন্দনা এবং মার্গারেটদের মুখগুলো সারিবন্ধভাবে তখন তার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। এরাই তার বস্তির বন্ধু। এই মানুষগুলোই সত্যিকার অসাধারণ, কারণ দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের গন্ডির বাইরে এরা একটা মুহূর্তও কাটায়নি। বিলাসবহুল হোটেলের আরামদায়ক ঘরে বসে রাত কাটাবার স্বপ্নও এরা দেখেনি কেউ। এদের কপালে অভিনন্দন, আপ্যায়নও জোটে না কখনও। তাই লজ্জিত ম্যাক্স বললো, 'ওভাবে বলবেন না, প্লিজ! ওদের জন্যে খানিকটা সময় দিই, এই মাত্র।'

'ও তোমার বিনয়!' মৃদু প্রতিবাদ করলো মনুবাঈ। তারপর ম্যাক্সের হাতখানা ধরে টানতে টানতে একদিকে নিয়ে চললো। যেতে যেতে একসময় বললো, 'তোমায় কার কাছে নিয়ে যাচ্ছি বলো তো?' একটু চুপ করে মনুবাঈ ফের বললো, 'আজ তোমার সঙ্গে একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আলাপ করিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইনি খুব শীগ্‌গির নোবেল প্রাইজ পাবেন।'

ছেচল্লিশ বছরের জি. পি. তলোয়ার পেশায় অধ্যাপক। অত্যন্ত দিলখোলা এবং আমুদে এই মানুষটির মুখে হাসি লেগেই আছে। প্যারিসের পাস্তুর ইন্‌স্টি-টিউটে খানিকটা গবেষণা করে উনি সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। বর্তমানে যুক্ত আছেন দিল্লির ইন্‌স্টিটিউট ফর মেডিক্যাল সায়েন্স নামক গবেষণাগারের সঙ্গে। ভেষজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার পীঠস্থান হলো এই প্রতিষ্ঠানটি এবং এর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইনি। বেশ কয়েক বছর ধরেই অধ্যাপক তলোয়ার নিরলস-ভাবে একটা গবেষণার কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। গর্ভনিরোধক একটা টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন ইনি। গবেষণায় সফল হলে সেটি এক যুগান্ত-কারী সৃষ্টি হবে। সিরিঞ্জের একটা ছোট ফোঁড়েই মেয়েরা তখন একবছরের জন্যে বন্ধ্যা হয়ে যাবে। ভারতের মতন উন্নতিশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক চালচিত্রটাই সরাসরি বদলে যাবে এর ফলে। তখন শ'য়ে শ'য়ে মায়েরা ম্যাক্সের টেবিলের ওপর জড়পিন্ডের মতন অপোগন্ড শিশুদের শুইয়ে আশাভরসাহীন চোখে চেয়ে থাকবে না আর। তেমন দিন আদৌ আসবে কিনা ম্যাক্স জানে না। তবে একথা ঠিক যে মানবসমাজের এই হিতৈষী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আজ সে ধন্য হলো। এদিকে মনুবাঈ তখন তাকে আর একজন হিতৈষীর কাছে টেনে নিয়ে গেল।

কোঁচকান চুল আর হাসি হাসি মুখের জেমস্ স্টিভেন্‌স্ একজন ইংরেজ। স্টিভেন্‌স্-এর সদানন্দ মুখখানা মাদার টেরেসার অনুরাগীভক্তের চেয়ে সাবানের বিজ্ঞাপনের ছবির মতন দেখতে। তবুও বত্রিশ বছরের এই মানুষটা পোশাকআশাকে ভারতীয়দের মতন। তার পরনে সুতির পুরোহাতা শার্ট আর সুতির প্যান্ট। অনেকটা স্তেফান কোভালস্কী কিংবা অসংখ্য অপরিচিত ভারতীয়দের মতন সাদা-সিদে। এরা সবাই নামগোত্রহীন এক একজন মাদার টেরেসা। এই দেশের মাটিতে নাম-না-জানা ফুলের মতন ফুটে আছে আনাচেকানাচে। স্টিভেন্‌স্ যাদের সেবার জন্যে তার মূল্যবান জীবনটি উৎসর্গ করেছে, এই শহরে তারাই সবচেয়ে অবহেলিত,

সবচেয়ে অসহায়। এরা হলো কলকাতার শিশু কুষ্ঠরোগীরা। তবে এই সফল মানুষটাকে কিছুতেই ভারতবর্ষে টেনে আনা যেত না, যদি না ভাগ্যান্বেষণে বেড়াতে বেড়াতে সে কলকাতায় চলে আসতো। তার কলকাতায় আগমন স্টিভেন্‌স্‌-এর জীবনটাকে আমূল বদলে দেয়। তাই ইংল্যান্ডে ফিরেই স্টিভেন্‌স্‌ তার যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি বেচে ভারতে ফিরে এল। তারপর সম্পত্তি বেচা টাকা দিয়ে একটা মালবওয়া পুরনো গাড়ি কিনে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে রুগ্ন এবং খেতে-না-পাওয়া বাচ্চাদের জড়ো করতে লাগলো। এমনি করে এক বছরের নিরলস চেষ্টার পর প্রায় শতখানেক রুগ্ন শিশুদের যোগাড় করে ফেললো স্টিভেন্‌স্‌। ইতিমধ্যে বাগান সমেত একটা মস্ত বাড়ি সে ভাড়া নিয়েছে। প্রায় শতাধিক শিশু এই হোম-এ থাকে। হোম-এর নাম দিল 'উদয়ন' এবং তার সমস্ত সঞ্চিত পুঁজি সে এর পেছনেই নিয়োগ করলো। তবে সৌভাগ্যবশত মনুবাঈর মতন কিছু উদার মানুষের সাহায্যও জুটে গেল স্টিভেন্‌স্‌-এর সেবাধর্মের কাজে।

প্রায় তখন মাঝরাত। দুহাত জড়ো করে সনাতনী ভারতীয় প্রথায় নমস্কার জানিয়ে বিদায় চাইতে এসেছে ম্যাক্স। কিন্তু ছুটি মিললো না। ম্যাক্স লোয়েবের মুখের দিকে চেয়ে অনুনয় করে মনুবাঈ বললো, 'ম্যাক্স! প্লিজ! আর কিছুক্ষণ থাক। আজকের রাতটা দারুণ! আঃ! কি মধুর, শীতল এই রাতটা!' বলতে বলতেই মনুবাঈর নীল চোখদুটি উৎসাহে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠলো। তারপর আরও খানিক পরে যখন শেষ নিমন্ত্রিতও চলে গেছে, তখন ম্যাক্সকে নিয়ে মনুবাঈ তার দোতলার শোবার ঘরে ঢুকলো।

পুরো দোতলা নিয়ে মনুবাঈর শোবার ঘর। কাঠের মেঝেটা আয়নার মতন চকচকে। দামী কাঠের তৈরি আসবাবপত্র থেকে মিষ্টি সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। ঘরের শেষ প্রান্তে একটা দামী খাট পাতা। খাটের সংগে লাগানো আছে বাহারি ছত্রি। ছত্রির গায়ে ভেলভেটের চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার গা থেকে ঝুলছে সূক্ষ্ম নেটের মশারি। ঘরের একদিকের দেওয়াল রঙিন ওয়ালপেপার দিয়ে মোড়া। কোনটার গায়ে আঁকা আছে লতাপাতা ফুল, কোনটার বা পুরনো ঔপনিবেশিক কলকাতার নাগরিক দৃশ্যাবলী কিংবা গ্রামবাংলার জীবনযাপনের চিত্র। অন্যদিকের দেওয়ালটি নিরাভরণ। একটি মাত্র আলোকচিত্র ছাড়া সেই দেওয়ালটিতে আর কোন আভরণ নেই। বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো আলোকচিত্রটি একজন কঠোর মুখের পুরুষ-মানুষের ছবি। মানুষটার মুখখানা যেন জীবন্ত মানুষের মতন সারা ঘরখানায় ছড়িয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই রেকর্ড প্লেয়ারটা বাজিয়ে দিয়েছিল মনুবাঈ। হঠাৎ মস্ত ওই শোবার ঘরখানা গমগম করে উঠলো লুই আর্মস্ট্রংয়ের সুরেলা এবং ভরাট কণ্ঠস্বরে। তখন মনে হচ্ছিল যেন সুস্পষ্ট উচ্চারিত লুই আর্মস্ট্রংয়ের দানাবাঁধা কণ্ঠস্বর সারা ঘরটা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। গানের সংগে বাজছে মধুর সুরের ট্রাম্পেট্‌। ধীরে ধীরে সারা ঘরখানার পরিবেশ উদ্দাম হয়ে উঠেছে তখন। মুহূর্তে ম্যাক্স নিজেকে হারিয়ে ফেললো। মনুবাঈ নামে রমণীর উপস্থিতিটাই যেন ভুলে গেল সে। খাটের সামনে রাখা কোচটার গায়ে দিব্যি হেলান দিয়ে বসে ডুবে গেল গানের সুরের ছন্দে এবং তালে। কখন ট্রে হাতে হুইস্কি এবং সোডার বোতল নিয়ে খানসামা ঘরে ঢুকেছে সে জানে না। একসময় তার মনে হলো যেন সে স্বপ্ন দেখছে। খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসা পাখির গান আর আর্মস্ট্রংয়ের সুরেলা

কণ্ঠস্বর তখন এক হয়ে মিশে গেছে ঘরের বাতাসের সঙ্গে। আনন্দ নগরের সেই জরাজীর্ণ অথচ নিষ্ঠুর, শক্ত জীবনযাপন থেকে সে তখন এত দূরে চলে এসেছে যে, এই রমণীর উষ্ণ আতিথেয়তার আরামের মধ্যে হারিয়ে যাবার বাসনা কিছুতেই যেন ঠেকাতে পারলো না।

তখন বেশ বেলা। হঠাৎ দরজার গায়ে মৃদু ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ম্যাক্সের। আস্তে আস্তে মনুবাঈর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুললো সে। দোরের সামনে একজন পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাক্সকে দেখে লোকটা বললো, 'সায়েব! আপনার সঙ্গে এখুনি একজন দেখা করতে চান। বললেন, খুব জরুরী।'

কোনরকমে গায়ে জামা এবং প্যান্টটা গলিয়ে ম্যাক্স নিচে নেমে এল। অবাক-কাণ্ড! সামনে দাঁড়িয়ে স্তেফান। 'কি ব্যাপার? এত সকালে মরতে এখানে কেন?'

স্তেফান কোভালস্কীর মুখে দুষ্টুমির হাসি। সে বললো, 'আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলুম যে পার্টির পর তুমি এখানেই থাকবে। তাই এখানেই এসে পড়লুম। এখন চল দেখি আমার সঙ্গে! তোমায় আমাদের ভীষণ দরকার।'

তারপর পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে কোভালস্কী বললো, 'লেপার বাসটা এখুনি এসে পড়বে। তোমায় ক'টা য়্যাম্পুটেশন কেস্ এ্যাটেন্ড করতে হবে।'

প্রতি বুধবার মাদার টেরেসা যে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িটা পাঠান কোভালস্কী তার নাম দিয়েছে কুষ্ঠ বাস বা লেপার বাস। গাড়ির সঙ্গে তিনজন সিস্টারও পাঠান তিনি। বস্তির মধ্যে কুষ্ঠাশ্রম চালু করতে না পারার দুঃখ এমনি করেই মেটালো কোভালস্কী। পরিভ্রমণশীল অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির মধ্যে চিকিৎসাদির সবরকম বিকল্প ব্যবস্থা তাকে রাখতে হয়েছে। মস্তানকর্তা বা তার চেলাশিষ্যদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধ এড়াতে গাড়িটাকে সে স্টেশনে যাবার রাস্তার পাশের ফুটপাতে পার্ক করিয়ে রাখে।

মাদার টেরেসার এই তিনজন শিষ্যাই হলো কোভালস্কীর প্রধান শক্তি। এরাই তার শক্তিসাহসের উৎস। এদের মধ্যে আবার যে মেয়েটি বয়সে বড় তার নাম গ্যাব্রিয়েল। লম্বা ছিপছিপে চেহারার মেয়েটিকে দেখতে ভারি সুশ্রী। যেমন সুন্দর তার মুখশ্রী, তেমনি শ্যামল চিকন তার গড়ন-পেটন। নীল পাড় দেওয়া সাদা শাড়িতে তাকে দেখাচ্ছেও মহীয়সীর মতন। গ্যাব্রিয়েলের বয়স পঁচিশও পেরোয় নি। কিন্তু এই বয়সেই তার চেহারায় একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে তার ব্যক্তিত্ব। গ্যাব্রিয়েল মরিশাসের ভারতীয় মেয়ে। ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে যখন সে কথা বলে তখন ভারি মিষ্টি শোনায়। কোভালস্কী নতুন নামকরণ করেছে গ্যাব্রিয়েল। 'দুতো স্তেত' (Dotteu Stef)! মেয়েটার মজাদার নামকরণ শুনে কোভালস্কী হো হো করে হাসে। ওরা যেদিন আসে সেদিন বস্তির চেহারা বদলে যায়। এঁদো পচা পুকুরে পদ্মফুলের মতন নির্মল হয়ে ওঠে বস্তির পরিবেশ। তবুও বুধবারটা এলেই হৃৎকম্প শুরু হয় ওদের। সবাইভাবে কঠিন সঙ্কটের কাল এল বুঝি।

অন্য দিনের মতন সেদিন সকালেও লালসাদা গাড়িখানা এসে দাঁড়াতেই খোঁড়া, পঙ্গু মানুষগুলো ভিড় করে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে উপচে পড়লো রোগীরা। তাঁর জাপানের সহকর্মীরা মাদার টেরেসাকে এই গাড়িখানা উপহার

দিয়েছে। গাড়িটা দেখেই দলে দলে কুষ্ঠরোগীরা আসছে। কেউ এল বস্তির ভেতর থেকে। কেউ হয়ত ফুটপাতেই শুয়ে ছিল সারা রাত। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ছুটে এসেছে ক্রাচে ভর দিয়ে। সবারই ক্রাচ নেই। কেউ বা পিঁড়ির ওপর বসে থাকে এবং তাকে মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে আসে চাকা লাগানো কাঠের গাড়িতে চড়ে। ফুটপাতের ওপর তিনখানা ফোল্ডিং টেবিল পেতে দিয়েছে সিস্টাররা। একটা টেবিলে ওষুধ রেখেছে, একটার ওপর রেখেছে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, ওষুধের অ্যাম্পিউল ইত্যাদি। তিন নম্বর টেবিলের ওপর অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলো সাজিয়ে রেখেছে ওরা। যথাসম্ভব চেষ্টাচরিত্র করে রোগীদের সারিবন্ধ করে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল গ্যাব্রিয়েল। ম্যাক্সকে নিয়ে কোভালস্কী যখন পৌঁছল তখনই লাইন একশ' ফুটেরও বেশী লম্বা হয়ে গেছে।

উঃ! কি দুর্গন্ধ! পাশ দিয়ে যাবার সময় ভক্ করে দুর্গন্ধটা নাকে লাগছে মানুষের। রুমালের মধ্যে নাক মুখ গুঁজে ওখানটা পেরিয়ে যাচ্ছিল পথচারীরা। তবুও তামাসা দেখতে সায়েবদের ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে মানুষের ভিড়ে রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

তখন দান্তের ইন্ফার্নো থেকে যেন একটা দৃশ্য তুলে আনা হয়েছে আনন্দ নগরের ফুটপাতের ওপর। টেবিলের ওপর একজন কুষ্ঠরোগীর হাতখানা রাখতেই হাতের ঘা থেকে কিলবিল করে পোকা বেরিয়ে টেবিলের ওপর পড়লো। পচে গলে যাওয়া হাত পা থেকে খসে খসে পড়ছে টুকরো টুকরো মাংস। উইপোকা লাগা কাঠের গা থেকে যেমন ঝুরঝুর করে কাঠের গুঁড়ো ঝরে পড়ে, তেমনি ঝুরঝুর করে হাড়ের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে ঘা থেকে। সে এক নারকীয় দৃশ্য যেন। অথচ এই বীভৎসতার মধ্যেই যন্ত্রপাতি নিয়ে ম্যাক্সকে কাটাছেঁড়ার কাজ শুরু করতে হলো। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে। ধুলো উড়ে এসে পড়ছে ঘায়ের ওপর। ঘায়ের চারপাশে ভনভন করছে মাছি। অসহ্য গরমে ম্যাক্সের গা থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছে ঘায়ের ওপর। ম্যাক্সের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সিস্টার গ্যাব্রিয়েল। সেই-ই তার অ্যানাশথেটিস্ট। অস্ত্রোপচারের সময় যাতনাবোধের উপশম ঘটানোই তার কাজ। কিন্তু মরফীন বা অন্য কোন বেদনারোধক ওষুধই তার কাছে নেই। তার সম্বল শুধু প্রেম। যাতনাক্লিষ্ট রোগীদের পরম মমতা দিয়ে যখন সে বুকে জড়িয়ে ধরে, কিংবা তার কানের কাছে মুখ এনে যখন সে ঘুমপাড়ানি গান গায়, তখন অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে ম্যাক্স। এত মমতা এত ভালবাসা কোথা থেকে পেল মেয়েটা! যাই হ'ক, রোগীর সাময়িক ঘুমঘোরটুকুর অবসরে ম্যাক্সকে তার অস্ত্রকরার কাজ শেষ করতে হয়। হয়ত তার পা খানাই সে কেটে দিল সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মুহূর্তে।

ইতিমধ্যে ম্যাক্স প্রায় ঘন্টা তিনেক সময় ধরে অস্ত্রোপচার করেছে। হঠাৎ তার টেবিলের ওপর প্রায় পঙ্গু একজন কুষ্ঠরোগীকে শুইয়ে দিয়ে গেল ওরা। দুজন মানুষ ধরাধরি করে বয়ে এনেছে তাকে। লোকটার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। তবুও তাকে দেখেই চিনেছে কোভালস্কী। 'আনোয়ার না?' ঠিক তাই। চেঁচিয়ে ম্যাক্সকে বললো, 'চিনতে পেরেছ ম্যাক্স? এ আমাদের আনোয়ার। এরই স্ত্রীকে তুমি প্রসব করিয়েছিলে! মনে নেই সেই প্রথম রাত্রির কথা?'

ম্যাক্সের মনে আছে। বস্তুত মুখখানা দেখেই তার মনে হয়েছিল মানুষটাকে যেন কোথায় দেখেছে। বললোও সে কথা; 'আমারও মনে হচ্ছিল মানুষটাকে চিনি।

কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছিলুম না। নিশ্চয়ই মিয়ামিতে নয়।'

ম্যাক্সের কথা শুনে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু হাসি-ঠাট্টার সময় সেটা নয়। তাই তখনই কোভালস্কী চুপসে গেল আনোয়ারের দিকে চেয়ে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে বেচারী। দেখেই মনে হয় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে সে। গলগল করে ঘামছে। চোখদুটি বোজা। কথাবার্তা যা বলছে সবই অসংলগ্ন। মেদ মাংসহীন শরীরটা ছিবড়ের মতন পড়ে আছে টেবিলের ওপর। নিশ্বাসপ্রশ্বাসও স্বাভাবিক-ভাবে পড়ছে না। নিশ্বাস নেবার সময় সারা শরীরটা বেলুনের মতন ঢাউস হয়ে ফুলে উঠছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ম্যাক্স তার নাড়ী পেল।

কনুয়ের তলা থেকে আনোয়ারের হাতটা দগদগ করছে ঘা। নোংরা ঘা থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোভালস্কী বললো, 'মনে হয় শোষ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তাই।' গ্যাব্রিয়েলের সাহায্যে ওরা ধীরে ধীরে ব্যান্ডেজ খুললো। আনোয়ার পড়ে আছে অচেতন হয়ে। ব্যান্ডেজ খুলে যখন মাংস দেখতে পেল তখন হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল ম্যাক্সের। মনে হলো তুলোর পাঁজার মধ্যে তার পা দুটো ডুবে যাচ্ছে। আনোয়ারের হাতের পচা মাংস, দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর উদগ্রীব মুখ, চলন্ত বাসের তীব্র হর্ণ, সব মিলিয়ে একটা তালগোল পাকানো শব্দতরঙ্গ আছড়ে পড়লো তার মাথার মধ্যে। হঠাৎ সব কেমন ফাঁকা হয়ে গেল চোখের সামনে। ফুটপাত থেকে একটা ভোঁতা শব্দ গড়িয়ে আসছে। সেটুকুও শুনলো ম্যাক্স। তারপরেই আর কিছু কানে গেল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। পা দুমড়ে অতবড় শরীরটা নড়বড় করছে। মনে হলো এখুনি ভেঙে পড়বে। তাড়াতাড়ি ওকে জাপটে ধরলো কোভালস্কী আর গ্যাব্রিয়েল। তারপর কোনরকমে য়্যামবুলেন্স গাড়ির মধ্যে শুইয়ে দিল। এরপর যা ঘটলো তার জন্যে তৈরি ছিল না কোভালস্কী। দেখলো গরম বাতাসের ঝাপটা তুলে গ্যাব্রিয়েলের ডান হাতখানা সপাটে ম্যাক্সের গালের ওপর পড়লো। একবার নয়, পরপর বেশ কয়েকবার চড় মারলো সে। তারপর ম্যাক্সের শরীর ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে চেঁচাতে লাগলো, 'রেভেই তোয়া! রেভেই তোয়া! (Reveille-toi) ওয়েক আপ! উঠুন! উঠে পড়ুন!'

ধাক্কা, চিৎকার আর চড়ের দাপটে ধীরে ধীরে চোখ খুললো ম্যাক্স। অবাক হয়ে চেয়ে আছে সে। ঝুঁকে পড়েছে অনেকগুলো মুখ। আস্তে আস্তে বললো, 'আমি কোথায়?'

'কোথায় আবার? কলকাতার ফুটপাতের ওপর শুয়ে আছ। তোমার চারপাশে হাত পা কাটা রোগীদের নিয়ে শুয়ে আছ তুমি!'

শক্ত কথাগুলো হঠাৎই মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো কোভালস্কীর। ম্যাক্সের কাণ্ডজ্ঞান দেখে বাস্তবিকই ক্ষুব্ধ হয়েছে সে। কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি না করাই উচিত ছিল। ম্যাক্স নিজেও যেন মনে মনে লজ্জিত। অপ্রস্তুত স্বরে বললো, 'এটা কিছু নয়, ফ্রেন্ড! গরমে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।'

একটু পরেই উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স। এখন তার হাতে কসাইয়ের করাত আর ফরসেপ্‌স্। এবার আনোয়ারের কাঁধ থেকে পুরো হাতখানা কেটে তাকে আলাদা করতে হবে। হ্যাঁ, আনোয়ারের হাতখানা তাকে চিরে চিরে কাটতে হবে। সবটাই পচন ধরে গেছে। নইলে আনোয়ারকে বাঁচানো যাবে না। য়্যান্টিবায়োটিক জাতীয় কোন ওষুধই জোটে নি আনোয়ারের। তাই সংক্রমণ হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

আনোয়ারকে ওরা শুইয়ে দিয়েছে। অস্ত্র করার জন্যে ম্যাক্সও তৈরি। যারা ভিড় করে দেখছে তাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। ফরসেপস্ চালাচ্ছে ম্যাক্স। তার মনে হলো যেন একতাল মাখনের মধ্যে সে ছুরি চালাচ্ছে। গায়ের চামড়া ভেদ করে মাংস-পেশী এবং স্নায়ু অব্দি পৌঁছে গেছে পচন। একটা রক্তবাহী ধমনী কেটে ফেলল ম্যাক্স। খানিকটা কালো রক্ত ঝলক দিয়ে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি তুলো দিয়ে ক্ষত-স্থানটি মুছে দিল গ্যাব্রিয়েল। হাড়ের কাছে পৌঁছে গেল তার অস্ত্র। এবার ফরসেপস্ রেখে সে করাত নিল। চিরে চিরে হাড় কাটতে হবে তাকে। কিন্তু বার দুয়েক করাত চালাবার পরই, ম্যাক্সের মনে হলো তার দুপায়ের জোর কমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আবার সে তুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। হারানো শক্তি ফিরে পেতে খুব শক্ত করে সে করাতের হ্যান্ডেলটা চেপে ধরলো। কিন্তু কোথায় সেই জোর? তবে কি আবার সে চেতনা হারিয়ে ফেলবে? না। কিছুতেই না। মন থেকে এদের ভাবনা সরিয়ে দিতে চাইল ম্যাক্স। শুধু ভাবনা নয়। এ দৃশ্য সে দেখতেও চায় না। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? হঠাৎ তার সীলভিয়ার কথা মনে হলো। শুধু সেই পারে তাকে এই আত্মক্ষয় থেকে উদ্ধার করতে। সুন্দরী সীলভিয়ার চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। শুধু তাই নয়। মনে মনে তার সংগে যেন কথা বলছে সে। বিড়বিড় করে ম্যাক্স বলছিল, 'সীলভিয়া! তোমায় আমি ভুলি নি। তোমায় আমি ভালবাসি সীলভিয়া!' নিষ্প্রাণ ম্যাক্স তখন যেন যন্ত্র হয়ে গেছে। হাতের করাতখানা দিয়ে সে তখন নির্মমভাবে হাড়ের ওপর ঘষে চলেছে। হাড় চেরার শব্দ হচ্ছে। আর কতটা বাকি আছে কে জানে! হঠাৎ শেষ পোঁচটুকু দিতেই গা থেকে আনোয়ারের হাতখানা গোড়া কাটা গাছের মতন খসে পড়লো টেবিলের ওপর। ম্যাক্স এখন নিশ্চিন্ত। তার কর্তব্য শেষ হয়েছে। অস্ত্র করার যন্ত্রপাতিগুলো সরিয়ে রেখে তোয়ালে দিয়ে সে কপাল মুছলো। কিন্তু তখনই আবার জ্ঞান হারাল ম্যাক্স।

উনোষাট

মা মনসা হলেন সর্পগণের দেবী। ইনি বিষহরি। সর্পদংশনভীত মানুষ ভক্তিভরে এঁর পুজো করে। দুধকলা দিয়ে ভক্তিভরে সর্পপুজো করলে মা মনসা তুষ্ট হন এবং ভক্ত মানুষ নিরাপদ হয়। এ দেশের মানুষ মনে করে, যে বাস্তুতে সাপ ঢোকে সে বাস্তু নাকি বড় পবিত্র, বড় ধন্য। সর্পগণের দেবী মা মনসার মন্দির আছে এ দেশের সর্বত্র। মায়ের পুজো উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ ভক্তসমাগম হয়। কিন্তু এত ভয়ভক্তি সত্ত্বেও প্রতি বছর সর্পদংশনে যত মানুষ মরে, তত মানুষ ওলাওঠা রোগেও মরে না। তবুও ভক্তির আসনটি টলে যায় নি। এদেশে সর্পনিধন শুধু অন্যায্য নয় রীতিমত অধর্মাচরণ। তাই কোন ভক্তই সর্পহত্যা করতে চায় না। সবাই জানে, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে মা মনসাও একজন দেবী।

বেচারা কোভালস্কী! সেদিন আনন্দ নগর বস্তির সারা চত্বরের মানুষ তার ভীত চিৎকার শুনে ছুটে এল তার ঘরে। বস্তির মানুষের অনেকদিন মনে থাকবে কোভালস্কীর চিৎকারটা। একটু একটু করে সবাই জানলো ঘটনাটা। সন্ধ্যের মুখে ঘরে ঢুকেই এই বিপত্তি। যীশুর ছবির তলায় বিড়ে পাকিয়ে বসে থাকা গোখরো সাপটা নিরীহ এই খ্রীশ্চান সাধুটির জন্যে বোধহয় অপেক্ষা করছিল। তাই ঘরে

ঢুকে টর্চের আলো ফেলতেই একহাত উঁচু হয়ে ফোঁস করে উঠলো নাগরাজ। বাপরে! সাক্ষাৎ যম! দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো কোভালস্কী। আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে লাঠিসোঁটা নিয়ে দলে দলে ছুটে এল বস্তিবাসীরা। ততক্ষণে কোভালস্কীও একটা আস্ত ইঁট তুলেছে। ইঁটখানা ছুঁড়ে সাপের মাথাটা এখনই থেঁতলে দেবে সে। কিন্তু সেটি হলো না। কোত্থেকে ছুটে এসে তার হাতখানা চেপে ধরলো শান্তা।

'না। না। স্তেফানদাদা! ওকে মারবেন না। আর যা খুশি করুন, কিন্তু প্রাণে মারবেন না!'

অবাক স্তেফান হাতটা নামিয়ে নিল। ততক্ষণে আরও লোকজন জড়ো হয়েছে ছোট্ট ঘরখানায়। কোভালস্কীর মনে হলো তার ঘরে যেন রামায়ণ দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে। হাজার হাজার বানর সৈন্যরা যেন রাক্ষস রাজা রাবণের ডেরায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে আশিসরা কম্বল চাপা দিয়ে সাপটাকে ধরে ফেললো। তারপর থলের মধ্যে পুরে সেটাকে বাইরে নিয়ে গেল। সাপটাকে ধরার পর সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বস্তিও শান্ত হলো।

কিন্তু বস্তি শান্ত হলেও কোভালস্কী যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। গভীরভাবে চিন্তা করতেই ব্যাপারটা একটু একটু করে স্পষ্ট হলো। সাপটা যে তার আগমনের অপেক্ষায় ঘরে ঢুকে বসেছিল তা নয়। ঘটনাটা অতখানি নিরীহ নয়। সাপটাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল কেউ। কিন্তু সে কে? নিশ্চয়ই যারা তাকে পছন্দ করে না তাদেরই কেউ। সারা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলো না কোভালস্কী। ঝাঁক ঝাঁক ভাবনাচিন্তা তখন ছেঁকে ধরেছে তাকে। একটা ব্যাপার তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তার চিৎকার শুনে এত মানুষ এল কিন্তু পাশের ঘরের হিজড়ারা একবারও উঁকি দেয়নি। হাওয়া-বাতাসহীন ঘরে দোর বন্ধ করে দিব্যি শুয়ে রইল। এত লোকের সোরগোলটাও কি ওদের কানে যায়নি? গুমট ঘরে নিশ্বাসটাও কষ্ট করে নিতে হয়। কিন্তু লোকগুলোর যেন সে হুঁসটুকুও নেই। তবে কি...? পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে অভিযানে এসে কোভালস্কীর একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছে। সে এখন বুঝতে পারে যে নিঃস্বার্থভাবে প্রেম ভালবাসা বিলিয়েও সব মানুষের হৃদয়দুয়ারটি সে খুলতে পারেনি। তাদের কাছে সে আজও সাদা মানুষ এবং বিদেশী খ্রীশ্চান ধর্মপ্রচারক। এতদিন সে বস্তির অনেক মানুষের ভিড়ে আড়াল হয়ে বাস করছিল। কিন্তু এখানকার এই প্রকাশ্য পরিবেশে সেই আড়ালটুকু আর নেই। নাৎসী ধাঁচের বন্দী শিবিরের মতন এই জায়গাটায় এমন কিছু করা যাবে না, যেটি ওদের পছন্দ নয়। তেমন কিছু ঘটলে এদের সমাজে পতিত হয়ে যাবে সে।

পরের দিন ভোরবেলায় প্রাতঃকৃত্য সেরে ফেরার পর বেঁটেখাট একটা লোক নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল। একমাথা ছোট ছোট কোঁচকান চুল। চাপচাপ শক্ত চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে গেছে। মুখের রঙ ভুসো কালির মতন কালো। নাকটা থ্যাবড়া। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। কোভালস্কী ওকে আগে দেখেছে। কলতলার ওপারে একটা বস্তিঘরে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। কোভালস্কী তাকাতে লোকটা হঠাৎ বললো, 'ছায়েব! তুমার মতন আমাদেরও গোক্ষুরের ছুবল খেতে হ'ত?'

'কেন?'

'তুমার দোষ তুমি ছায়েব। তুমার গায়েব চামড়া কটা। তুমার গলায় যীশুক্রেষ্টর মেডেল ঝুলছে। আমাদের দোষ, আমরা জংগুলের মানুষ। আমাদের চুলগুলো কোঁচকান!'

কোভালস্কী স্মিত মুখে ওর ব্যাখ্যা শুনছিল। বললো, 'তোমাদের আর একটা অপরাধ আছে। তোমরাও খ্রীশ্চান।' এই বলে লোকটার গলায় মেরী মাতার পদকটা ইংগিতে দেখাল সে। নিজের তৈরি এই ব্যাখ্যাটা শুনে তার নিজেরই আশ্চর্য লাগছিল। আজকাল কোভালস্কীও এ দেশের লোকের মতন ধর্ম দিয়ে মানুষের বিচার করছে। লোকটা অস্বীকার করলো না। তবে বললো, 'হুঁ! অযথাথ লয় তুমার কথাটা। কিন্তু জংগুলে মানুষ বুলেই আজ আমাদের এই হেনস্তা গো!'

জংগল অর্থাৎ অরণ্য! নামটা শুনেই গাছপালাহীন নিষ্পত্র মরুময় বস্তির নোংরা, ধুমাকীর্ণ চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠল যেন। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সবুজ রনময় প্রান্তর! সেই বন্য, মুক্ত উদ্দাম, আনন্দময় জীবন? দাম দিয়েই এগুলি অর্জন করতে হয়। কিন্তু সেই জীবনটাই আসল, মেকী নয়। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' শুধু কবিরই আকুলতা নয়।

কোভালস্কী তাকিয়ে ছিল। এবার বললো, 'তোমরা আদিবাসী?'

লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিল। এদের সম্বন্ধে সে সামান্য যা কিছু জেনেছে, সেগুলোই মনে পড়ে গেল তার। ভারতবর্ষের প্রথম অধিবাসী এরাই। এরাই প্রথম বসবাস শুরু করে এদেশে। কিন্তু কবে? তার কোন হদিস নেই। হয়ত দশ-বিশ হাজার বছর আগে। বর্তমানে এ দেশে প্রায় চার কোটি আদিবাসী বাস করে। কয়েক শ' উপজাতিতে ভাগ হয়ে সারা দেশে এরা ছড়িয়ে আছে। এই মানুষটাও ওইরকম এক আদিবাসী উপজাতি। কিন্তু বন ছেড়ে হঠাৎ ও শহরে এল কেন? শহরটাও ত আর এক জংগল? একটা জংগল ছেড়ে আর একটা জংগলে কেন এল ওই মানুষটা?

কেন এল সেই ঘটনাই বললো আটান্ন বছরের আদিবাসী প্রতিবেশী বুধু কুঞ্জর। 'সেটা ওদের পরবের সময়। সারা রাত ধরে মাদল বেজেছে। বনের মধ্যে সব গ্রামেই সেদিন উৎসব চলছে। বুড়ো বট বা প্রাচীন তেঁতুল গাছ কিংবা উঁচু আমগাছের ঝাঁকড়া মাথার নিচে পরবের নাচগান হচ্ছে। ঘরের মেয়ে-বউরা হাত ধরাধরি করে নাচছে। আদিবাসী বউ-ঝিয়ারীরা দেখতে ভারি সোন্দর। চালচলনেও মিষ্টি ঠাট। উল্কি আঁকা শরীরগুলো তুলোর মতন নরম। গায়ের চামড়ায় কি চেকনাই। ওরা যখন নাচে তখন ওদের প্রসৃত নিতম্ব তালে তালে দোলে। হঠাৎ রে রে করে ছুটে এল আদিবাসী যুবকরা। ওদের পেশীবহুল খালি গায়ে নাচের মনোহর ছন্দ। ওদের হাতে তীর ধনু, মাথায় পাগড়ি, পায়ে ঘুঙুর আর কপালে বাঁধা শিমীপাখা। নৃত্যরতা বউঝিয়ারীদের সংগে পুরুষরাও নাচছে। সে কি উদ্দাম নৃত্য! নাচের ছন্দে সবাই তখন মাতাল হয়ে গেছে। মেয়েরা গান ধরেছে। পুরুষরা ধুয়া তুলছে। খুশীর হাওয়া লেগেছে সবার মনে। তখন পরের দিনের কথা কেউ ভাবছিল না। মাদলের তালে তালে নাচছে সবার হৃদয়। সবাই ভাবছিল এই অবিচ্ছিন্ন সুখের জীবনের বুঝি আদিঅন্ত নেই। এই সুখ চলবে অনন্তকাল। এর কোন শেষ হবে না। টলটলে এই জীবন ছাড়া আর কিছুই যেন সত্য নয়। মেয়েরা ওদের নরম শরীরগুলো কখনও ধনুকের মতন বাঁকাচ্ছে, কখনও সোজা

হচ্ছে। নিচু হয়ে কখনও তারা মাটিতে নুইয়ে পড়ছে, কখনও খাড়া হচ্ছে। ওদের ধারণা এই পরবে মৃতপুরুষদের আত্মাও যোগ দেয়। যেন সারা জাতটাই আনন্দে নাচছিল। নাচের তালে মাদল বাজছে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। তারপর রাত্রির নিঃশব্দতার মধ্যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে মাদলের বোল।'

বৈকুণ্ঠপুরের আদিবাসীরাও সেদিন বুড়ো বটগাছের তলায় উৎসবের আসর সাজিয়েছিল। ওদের এ উৎসব হাজার বছরের পুরনো। সেদিন সারা রাত ধরে ওরা নাচলো, গাইলো, আনন্দ করলো। কিন্তু ভোরের দিকে এমন একটা নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটলো যার দরুন ওদের সুখটুকু আর রইল না। প্রায় দুশ'জন মানুষের একটা ঠ্যাঙাড়ে দল শকুনের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ঘরদোরের ওপর। ওরা এসেই ঘরদোরে আগুন লাগালো, টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি লুঠ করলো, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করলো। এরা সবাই স্থানীয় জমিদারের লোক। শুধু ঠ্যাঙাড়ে নয় সঙ্গে পুলিসও পাঠিয়েছে জমিদার। খাজনা না দেওয়ায় পুলিস ওদের পুরুষদের গ্রেপ্তার করলো। গরুছাগল বাজেয়াপ্ত করলো। গেরস্থালির জিনিসপত্র কেড়ে নিল। বেশ কয়েক শ' বছর ধরে জমিদারের সঙ্গে ওদের লড়াইয়ের শেষ হলো সেদিন। বাপপিতামহের আমল থেকে চাষ করা জমিতে আর তাদের কোন স্বত্ব রইল না। সেকালে আইন অন্য-রকম ছিল। বনের গাছপালা কেটে জমিটুকু উদ্ধার করে যারা দায় নিতে পারতো, জমির অধিকার তারাই পেত। এতদিন এইভাবেই আদিবাসী মানুষ তাদের জীবন-ধারণের সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করেছে। এখন সে আইন নেই। চাষ করা জমির খাজনা চায় জমিদার। তাদের লোলুপ আগ্রাসী দৃষ্টি আড়াল করার আয়োজন নেই এখন। আদিতে যাযাবর হলেও কালে এইসব যাযাবর জাতিই ছোট ছোট চাষী পরিবারে পরিণত হয়। তখন চাষআবাদ করেই তারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতো। উদ্বৃত্ত থাকতো না, তাই সঞ্চয়ও হতো না। বনের মধ্যে সব ফলমূল তারা ভোগ করতো। ছেলেবেলায় গাছ থেকে ফলমূল পেড়ে খেত। মাটির তলায় জন্মানো আলু ওল তুলতো। এইসব দিয়েই খাদ্যাভাব পূরণ করতো তারা। ফাঁদ পেতে নানারকম জীবজন্তু ধরতো। শিকারে গিয়ে বুনো শুয়র মারতো। পিপ'ড়ের ডিম, পাখির ছানা আরও কতকিছু কীট-পতঙ্গ ধরতো। খাদ্যবস্তু যা বাঁচতো সেগুলি তারা দীনদুঃখী অনাথ আতুরের মধ্যে ভাগ করে দিত। সারা আদিবাসী সমাজটা ছিল যেন একটা পরিবার। ওদের গলায় গলায় গান ছিল, ছিল গোলায় গোলায় ধান।

তারপর একদিন মাদলের সেই মধুর ধিতাং ধিতাং বোল্ চিরকালের মতন থেমে গেল। ওরা সবাই তখন ঠাঁইহীন হয়ে গেছে। একদিন সবার মতন বুধুও ছেলেমেয়ে নিয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। ওরা প্রথমে গেল পাটনা। সেখান থেকে গেল লখনউ। কিন্তু কোথাও রুজি-রোজগার জুটলো না। শেষ পর্যন্ত অনেকের সঙ্গে ওরাও এসে পেঁছিলো কলকাতায়। শহরের বাইরে ফুটপাতে পড়ে ছিল কতদিন। ইঁটখোলায় কাজ করতো পুরুষরা। মেয়েরা ফুটপাতের সংসার দেখতো। তখন রাস্তার কুকুরের মতন জীবনযাপন করতো বুধুরা। তারপর এক-দিন আনন্দ নগরের এক বস্তিঘরের খোঁজ পেল বুধু। সেই থেকে এই বস্তির ঘরের বদ্ধতার মধ্যে বাস করছে একদা স্বাধীন এবং মুক্ত বুধু। এক স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ যেন খাঁচায় বন্দি হলো। দেশটা যেন নতুন করে হেরে গেল বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যেনাগাদ ওদের বারোঘরের সংসারে পা দিয়েই কোভালস্কীর মনে হলো একটা অঘটন ঘটেছে। সারা চত্বরটা থমথম করছে। এমনকি বাচ্চারাও যেন হাসতে খেলতে ভুলে গেছে। আরও দু-এক পা যেতেই অস্পষ্ট একটা গোঙানির শব্দ কানে গেল তার। কারা যেন ইনিয়ে বিনিয়ে শোক করছে। ঘরের কোলে বারান্দাটা আলো-আঁধারি। কোভালস্কী ঠাহর করে দেখলো ক'টা মানুষ উবু হয়ে বসে আছে সেখানে। বারান্দায় রাখা খাটিয়া-খানার ওপর সাদা চাদর মোড়া একটা মানুষকে যেন শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। খাটিয়াটার চারপাশে ক'টা তেলের কুপি জ্বলছে। সেই আবছা আলোয় চাদরের তলায় দুটো পায়ের পাতা দেখতে পেল সে। 'বোধহয় কেউ মারা গেছে।' মনে মনে বললো কোভালস্কী। তারপর খাটিয়ার পাশে নীল ফিতে বাঁধা কালো বেণীটা দেখতে পেল সে। নিশ্চয়ই কালীমা। কালীমা নিঃশব্দে কাঁদছে। ঘরের ভেতরে যারা আছে তারাও কাঁদছিল। কোভালস্কীর মনটা বিষণ্ণ হলো যেন। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ঢুকে যীশুর ছবির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে মৃতের জন্যে প্রার্থনা করলো। তখন লঘু পায়ে ঘরে ঢুকেছে আশিস। কোভালস্কীর ঠিক পিছনেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কোভালস্কীর প্রার্থনা শেষ হলে আশিস চুপি চুপি বললো, 'স্তেফানদাদা! একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। বুন্ধু নামের ওই আদিবাসী লোকটা বেলাকে খুন করেছে।'

চমকে ঘুরে তাকাল কোভালস্কী। ঘরের ভেতরেও আলোআঁধারি। আশিসকে ভালভাবে দেখাও যাচ্ছে না।

'খুন করেছে মানে?'

'ওরা দুজনে মারামারি করছিল। তখনই দৈবাৎ মরে যায় বেলা। ও যে মরবে তা কে জানতো? কিন্তু মরে ত গেল!' একটু চুপ করে আশিস ফের বললো, 'আপনার ঘরের সাপটাকে নিয়েই ওরা মারামারি করছিল।'

'আমার ঘরের সাপ?'

কোভালস্কীকে তখন বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে আশিস বললো, 'বেশ ক'দিন ধরেই সাপটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছিল বুন্ধু। তার ধারণা সাপটাকে আপনার ঘরে কেউ ঢুকিয়ে দেয়।' কোভালস্কী নিঃশব্দে শুনছে। আশিস ফের বললো, 'ক'দিন আগেই একটা বিয়েবাড়িতে একজন সাপুড়ে এসে সাপ খেলা দেখাচ্ছিল। বেলা, কালীমা সবাই ছিল সেখানে। সেই সাপুড়েটাই বুন্ধুকে সব কথা বলে দেয়। বেলা নাকি দুশ'টাকা দিয়ে গোখরো সাপটা কিনে নেয়।'

'দুশ' টাকা?' অবাক হয়ে বললো কোভালস্কী।

'হ্যাঁ, আমারও কেমন অদ্ভুত লাগছিল। ওইটুকু একটা জীবের জন্য দুশ' টাকা! বেলা নাকি বলে যে সে পুজো দেবে। তাই সাপটাকে কিনতে চাইছে। তার-পর সেদিনই বিষধর সাপটাকে সে আপনার ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।'

'কেন? আমায় মেরে ফেলতে?'

'ঠিক তাই।' খানিক চুপ করে আশিস বললো, 'ওর একটা কুমতলব ছিল। কে জানে কি দুষ্কর্ম সে করতে যাচ্ছিল!'

দুজনেই চুপ। একটু পরে আশিস বললো, 'অনেকেই একটা কথা বলছে।' কোভালস্কীর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে আশিস বললো, 'আপনাকে খুন করে ও আপনার পুরুষাঙ্গটা নিতে চেয়েছিল যাতে পরের বার ও পুরুষ হয়ে

জন্মায়।'

কোভালস্কী স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি কথা সে শুনলো? এমনও হয় নাকি? তার মনে হলো কি মর্মান্তিক ওদের এই বিশ্বাস! একটা কিছু বলতে চাইল সে। কিন্তু কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে। নিশ্বাস নিতেও তার কষ্ট হচ্ছিল। এই ছোকরার কথাটা তার মাথার মধ্যে তখন পাক দিচ্ছে। আশিস আরও বললো যে সেদিন সন্ধ্যায় এই হিজড়াটাকে শিক্ষা দিতে বুন্ধু ওদের ঘরে ঢোকে। তখন বেলা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুন্ধুকে দেখেই বেলার মাথা বিগড়ে যায়। তাড়াতাড়ি একটা ছুরি বের করে বুন্ধুর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু বুন্ধুর গায়ে পুরুষের শক্তি। একে সে জঙ্গলের মানুষ তায় শুয়র শিকার করা গায়ের শক্তি। তাগরা চেহারার বুন্ধুর সমকক্ষ নয় মেয়েলিস্বভাবের হিজড়াটা। তাই ধস্তাধস্তির সময় বেলার হাতের ছুরিটা তার নিজের শরীরেই শুলের মতন গেঁথে গেল। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে ছুটে এসে বাধাটুকুও দিতে পারে নি কেউ। অবশ্য বস্তির ঘরকন্নায় এমন খুনজখমের ঘটনা নাকি প্রায়ই হয়।

চুপ করে ঘটনাটা শুনছিল কোভালস্কী। মনটা তার চুরচুর হয়ে ভেঙে গেছে তখন। পাশের ঘর থেকে হিজড়াদের চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। ওদের নিঃশব্দ চলাফেরা বা চাপা কথাবার্তার স্বরও কানে যাচ্ছে তার। হয়ত এবার ওরা শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে শ্মশানে যাবে। এখানে দাহকাজ শেষ হতে দেরি হয় না। কিন্তু হিজড়াদের হয়ত আলাদা কোন সংস্কার আছে। শুনেছে ওদের দাহকাজ রাত্রে সম্পন্ন হয়। কেন তা সে জানে না। কোভালস্কী জানে না যে হিজড়াদের মড়ার গতি হয় না। তাদের যেমন শবদাহ হয় না, তেমনি মাটির তলায় কবর দেওয়ারও বিধি নেই। তাই রাতের আঁধারে চুপিচুপি ওরা মড়ার গতি করে। আরও একটা নিষ্ঠুর সংস্কার এ দেশে আছে। জীবিত হিজড়াদের নারী বলে মেনে নিলেও মৃত হিজড়াদের সে অধিকার সমাজ দেয় না। তাই কাপড় দিয়ে বেলার শরীরটা ঢেকে দেবার আগে ওকে লুঙ্গি এবং সার্ট পরিয়ে দিল ওরা। একটা কাঁচি দিয়ে বুলবুল ওর লম্বা বেণীটা কেটে দিল। আশিস চলে গেছে। হঠাৎ দরজার কপাটে আঁচড়ের শব্দ শুনে কোভালস্কী তাকাল। কালীমা ঘরে ঢুকেছে। অন্ধকারেও ওর গলার হার আর হাতের বালাজোড়া চিকচিক করছে। একটু ইতস্তত করে কালীমা বললো, 'স্তেফানদাদা! আপনি আমাদের বোনকে নিয়ে শ্মশানে যাবেন? এটা আমাদের অনুরোধ।'

এইরকম অনুরোধ আরও ক'জনকে করলো ওরা। এটিও সামাজিক রীতি পালনের ব্যাপার। হিন্দুর শ্মশানযাত্রায় নারীরা শবানুগমন করে না। শাস্ত্রমতে এটি নিষিদ্ধ। হিজড়ারা জীবিত অবস্থায় নারীর অধিকার পায়। তাই বেলার শবযাত্রায় ওরা সঙ্গী হতে পারলো না। সুতরাং স্থির হলো শবদেহটি বয়ে নিয়ে যাবে চারজন পুরুষ বাহক। কোভালস্কী, আশিস এবং আরও দুজন পুরুষ। সুখে দুঃখে অনুগত মানুষটার অন্তিম যাত্রার সময়ে ওরা কেউ সঙ্গী হতে পারবে না। বোধহয় এই শোকটাই তখন ওদের তীব্র হয়ে উঠেছিল। কোভালস্কী দেখলো বুলবুল হাঁটু মুড়ে বেলার শবের পাশটিতে মুখ নিচু করে বসে আছে। অন্যরাও শোকে কাতর হয়ে বুক চাপড়াচ্ছে। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো ওরা। বাহকরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। হয়ত আরও কিছু কৃত্যকর্ম বাকি আছে। কিন্তু কোভালস্কীর জন্যে যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল তা সে

জানতো না। হিজড়ারা সবাই তখন জুতো খুলে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে। বুলবুলের চোখের ইসারায় ইঙ্গিত করতেই সবাই মিলে পরিত্যক্ত জুতোগুলি হাতে নিয়ে মড়ার গায়ের ওপর পিটতে শুরু করলো। কোভালস্কীর বাকরোধ হয়ে গেল দৃশ্যটা দেখে। মৃত বেলা যাতে হিজড়া হয়ে আবার না জন্মায় তাই কি এই শাস্তিদানের ব্যবস্থা?

ষাট

ইদানীং হিজড়ারা যে তাকে অন্য চোখে দেখছে তাতে আর কোন সন্দেহই নেই কোভালস্কীর। বেলা নামে সেই হিজড়ার অন্ত্যেষ্টির পর থেকেই এই সদ্ভাবটা গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। দুদিন আগে যার মড়া কাঁধে করে শ্মশানে বয়ে নিয়ে গেছে, সেই লোকটাই তার ঘরে জ্যান্ত বিষধর সাপ ঢুকিয়ে তাকে মারতে চেয়েছিল। অন্য হিজড়াদের কাছে এটাই যেন দারুণ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন অভিনব প্রতিহিংসার কথা ওরা ভাবতেও পারে নি। তাই বন্ধুত্বের নানা অজুহাত দেখিয়ে ওরা নিজেরাই এগিয়ে এসেছে কোভালস্কীকে অবাক করে। রোজ সন্ধ্যের সময় ঘরে ফিরে নানারকম উপহারের বস্তু কোভালস্কী দেখতে পেত। সে বুঝতে পারতো ওরা তার ঘরে এসেছিল। হয়ত দেখতো কুপিতে নতুন সলতে পরিয়ে দিয়েছে। কিংবা দেখতো যীশুর ছবিটা সরিয়ে সারা দেওয়ালটা চুনকাম করে দিয়েছে। এইটুকু পেয়েই মন ভরে উঠতো কোভালস্কীর। কখনো বা বিব্রতও হয়েছে সে। তার প্রায়ই মনে হতো, 'সংসারে যে কোন অবস্থায় আমি মিলেমিশে থাকতে শিখেছি। কিন্তু প্রতিবেশী হয়ে যারা আমার পাশের ঘরে বাস করছে তারা কত অদ্ভুত! তাদের সমাজও আলাদা। মনেই হয় না তারা আমার চেনা। অথচ ঘৃণ্য, অবহেলিত এবং সমাজ ছাড়া বলে তারাই কি আমাদের সবচেয়ে বেশী সেবা পাবার অধিকারী নয়? তাই যদি হয় তবে আমার এই বিরাগ কেন? হায়! মানবসেবার যথার্থ মনোভাবটা গড়ে নিতে না জানি আরও কত পথ হাঁটতে হবে!'

শেষপর্যন্ত কালীমাই তার সংকোচটুকু কাটিয়ে দিল। রোজ সকালে স্নান করে সে কোভালস্কীর কাছটিতে এসে বসতো। এই বিদেশী পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে তার বড় ভাল লাগে। সত্যিই তাকে নিজের বড় ভাইয়ের মতন মনে হয়। তাই গভীর স্বরে যখন 'বড়ভাই' বলে ডাকে তখন ওর আন্তরিকতার আঁচটুকু কোভালস্কী পায়। হিজড়াদের একটা গোপন ভাষা আছে। নিজেদের মধ্যে সেই ভাষায় তারা কথাবার্তা বলে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা হিন্দিতে কথা বলে। কালীমাও হিন্দিতেই কোভালস্কীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ওর সঙ্গে আলাপ করে কোভালস্কীর মনে হয়েছে, ভাগ্যের ফেরে যারা এখানে এসেছে তাদের মধ্যে কালীমার জীবনটাই সবচেয়ে বিচিত্র।

হায়দ্রাবাদের এক ধনী মুসলমান বণিকের ছেলে সে। ছেলেবেলা থেকেই তার পুরুষাংগটি কিছুটা অপুষ্ট ছিল। তাহলেও তাকে কেউ মেয়ে ভাবতো না। কিন্তু কিছুদিন পরেই ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। যখন সে ইস্কুলে পড়ে তখন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো ওর বাড়ির লোক। কেমন যেন মেয়েলী ভাব ফুটে উঠলো তার স্বভাবে। তার ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন ছুটোছুটি করে ক্রিকেট হকি খেলতে

যেত, কালীমা তখন নাচ শিখতো। ছেলেদের মতন বয় স্কাউটের ড্রেস না পরে সে শালোয়ার কামিজ পরতো। গায়ে দোপাট্টা দিয়ে মেয়েদের মতন প্রসাধন করতে ভালবাসতো। বাড়ির লোকজন ওর এই বদলটা লক্ষ্য করেছিল। তাদের ধারণা হলো ছেলেটাকে কেউ গুণ করেছে। তাই সাত তাড়াতাড়ি এক ধনী ব্যাপারীর মেয়ের সঙ্গে কালীমার বিয়ে দিল। কালীমার তখন বছর চোদ্দ বয়স। কিন্তু বিয়ের ফল ভাল হলো না। যাকে বলে হিতে বিপরীত তাই হলো। দাম্পত্য মিলন হলো না বলে পরের দিন সকালেই নতুন বউ বাপের বাড়ি পালিয়ে বাঁচলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। স্থানীয় এক পীরের দরগায় কয়েকজন ভক্ত তীর্থ করতে এসেছে। ওদের সঙ্গে একজন হিজড়াও ছিল। রোগা অস্থিচর্মসার চেহারা। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। ভিড়ের মধ্যে সেই-ই প্রথম কালীমাকে চিনতে পারে। তারপর তার পিছু পিছু গিয়ে লুকিয়ে তার বাড়িটাও চিনে নেয়। এর দিনসাতেক পরেই একদিন সবাই দেখলো যে কালীমা ঘরে নেই। সবাই জানতে পারলো যে ওই বুড়ি হিজড়ার সঙ্গে কালীমা পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সেই তখনকার অজ্ঞাতবাস এবং অজ্ঞাত সাধনকর্মের অনেক কথা সে কোভালস্কীকে বলেছে। কালীমা যার সঙ্গে চলে আসে সে তার ধর্ম-মা বা গুরু। তার নাম সুলতানা। সেইই দলের পান্ডা। বেশীরভাগ হিজড়ার মতন সুলতানারও স্তন নেই। তুলোর মধ্যে দুধ ঢেলে সে তার বুকে বেঁধে কালীমাকে স্তন্যপান করাত। হিজড়া সমাজে কাউকে গ্রহণ করার আগে তাকে স্তন্যপান করানো হয়। এই সর্তপালনের পরে কালীমা হিজড়া সমাজে গৃহীত হলো। তারপর তাকে একশ' এক টাকা, শাড়ি, ব্লাউজ, জামা, সায়া, কাঁচের চুড়ি, চটিজুতো এবং কিছু বাসনপত্র দেওয়া হলো। কালো ফিতে বেঁধে তিন বিনুনি করা হলো চুলের। হিজড়া সমাজে তার প্রথম পরিচয়ের এটাই হলো নিদর্শন। এইভাবে হিজড়া সমাজে পোষ্য হবার পর ঘটা করে তাকে দীক্ষা দেওয়া হলো। এই দীক্ষাদান অনুষ্ঠানে সব হিজড়াদের সেদিন নেমতন্ন করা হয়েছে। কালীমাকে মেয়েদের মতন সাজ-পোশাক পরিয়ে দিল ওর গুরুমা। এরপর কালীমাও তার গুরুমাকে নতুন শাড়ি ব্লাউজ পরাল এবং গুরুমা ও অন্য মাতৃস্থানীয়াদের প্রণাম করে, তাদের আশীর্বাদ নিয়ে সে তার নতুন জীবন শুরু করলো।

এই আনুষ্ঠানিক রমণীবেশ নেবার পর তার রমণী নামকরণ করা হলো। বয়স্কা হিজড়ারা আলোচনা করতে বসলো। আলোচনার পর সবার পছন্দ মতন ওর নাম হলো কালীমা। কোভালস্কী শুনে অবাক। হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকরা হলেন কালী। তিনি করালবদনা এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষালী কণ্ঠস্বর ছাড়া ওর মুখের ছাঁদে বা দেহের গড়নে কোথাও এতটুকু ভয়ঙ্কর ভাব নেই। বরং তার কমনীয় দেহকান্তি এবং হেলেদুলে চলার ছন্দে এমন এক মোহিনীভাব আছে যার দরুন সহজেই তাকে রমণী ভাবতে ভাল লাগে।

কালীমার দীক্ষাদান তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। এই অনুষ্ঠানের যেটি সবচেয়ে মন্দ দিক, সেটি তখনও বাকি আছে। কারণ আসল হিজড়া এবং রমণীবেশী পুরুষের মধ্যে অনেক তফাত। যারা আসল হিজড়া তাদের পুরুষাঙ্গ ছেদন করা হয়। সে কথায় পরে আসছি। যে সব পুরুষ মেয়েদের মতন বেশভূষা পরে তারা অন্য এক জাত। সামাজিক কাঠামোর একেবার তলার ধাপটিতেই তাদের স্থান। সমাজে তারা অচ্ছুৎ। আনন্দ নগরের রাস্তায় কোভালস্কী তাদের দেখেছে। এইসব

হতভাগ্য মানুষগুলো এক নিম্নমানের প্রবৃত্তির তাড়নায় স্ত্রীলোক সেজে ঘুরে বেড়ায়। শুধু বেশভূষাই নয়, তাদের ঠাটঠমকও মেয়েদের মতন। বুকের ওপর নকল স্তন বসিয়ে তারা মেয়ে সাজে। পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করে। পাছা দুলিয়ে নাচে, মুখ চোখ ঘুরিয়ে কথা বলে। যখন এঁকেবেঁকে হেঁটে যায় তখন কে বলবে যে তারা স্ত্রীলোক নয়। বিয়ের আসরে কিংবা কোন ধর্মীয় উৎসবে তাদের মেয়েলী ঢঙ্ দেখতে অনেক মানুষ ভিড় করে। অতি কুৎসিত এই ছেনালিপনা দেখে সবাই হাসাহাসি করে। কোভালম্কীর কাছেও ব্যাপারটা খুব রুচিহীন মনে হয়েছে। তার মনে হয় এই ছেনালিপনা এক বীভৎস প্রবৃত্তি। হয়ত এটাই ওদের জীবনধারণেরও একটা উপায়। তবে মজার কথা, এরা কেউই পৌরুষশক্তিহীন নয়। অনেকেই নাকি বিয়ে করেছে এবং তাদের একাধিক ছেলেমেয়েও আছে। রীতিমত বউ ছেলেমেয়ে নিয়েই তারা নাকি ঘর সংসারও করছে।

সমাজ কাঠামোয় হিজড়াদের আলাদা পদমর্যদা। তারা স্ত্রীলোক নয়, পুরুষও নয়। তারা হিজড়া নামেই সমাজে পরিচিত। যে সংসারে সদ্যোজাতর আগমন হয়েছে, সে সংসারের ঠাকুমা, দিদিমা মানসম্মান দিয়ে হিজড়াদের ডেকে আনে। কারণ সদ্যোজাতর আগের জন্মের পাপকর্মের দায় নিয়ে হিজড়ারা শিশুদের পাপ-মুক্ত করে দেয়। এইসব মাতৃস্থানীয়া বয়োজ্যেষ্ঠারা জানে কারা আসল হিজড়া আর কারা প্রতারক।

হিজড়াদের পুরুষাঙ্গচ্ছেদনের অনুষ্ঠানটা শীতের গোড়াতেই করা হয়, যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না যায় এবং তাড়াতাড়ি ঘা শুকোয়। এ জাতীয় সংকটগুলো তুচ্ছ বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না কারণ এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ হয়। খবরের কাগজে এর কোন পরিসংখ্যান না বেরোলেও প্রতি বছরেই এই ছেদন অনুষ্ঠান পালন করতে বেশ কয়েক শ' লোক মারা যায়। অবশ্য কাগজওলারা দিল্লির এক হেয়ার ড্রেসারের পুরুষাঙ্গচ্ছেদনের ঘটনাটা খুব ধটা করে ছেপেছিল। লোকটার বয়স বছর তিরিশ। হিজড়াদের প্ররোচনায় সে তার লিঙ্গচ্ছেদন করাতে রাজী হয়, কিন্তু তার পরেই মারা যায়। একসময় এই ছেদনের ব্যাপারটা খুবই নৃশংস ছিল। তখন লিঙ্গের গোড়ায় টান্‌টান্‌ করে ঘোড়ার লেজের চুল বেঁধে দেওয়া হতো। তারপর প্রত্যেক দিন সেই বাঁধন এমনভাবে কসা হতো যাতে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গটি খসে যায়।

কালীমাকে নিয়ে সুলতানা একদিন এক নির্জন গ্রামে গেল। ছোট্ট গ্রামখানার সঙ্গে অন্য লোকালয়ের তেমন যোগাযোগ নেই। গ্রামে কয়েক ঘর হিজড়াও আছে। ওদের একজন গণৎকারও সেখানে ঘর-সংসার পেতেছে। লোকটা গণনা ক'রে একটা অমাবস্যার রাত স্থির করে দিল যে রাত্রে কালীমাকে খোজা করা হবে। ছেদন অনুষ্ঠানের পর হিজড়া সমাজে তার অভিষেক হবে। হিজড়ারা এইসব অমাবস্যার রাত'কে 'কালো রাত' বলে। অস্ত্র করার আগে কালীমাকে ভাঙ্ মেশানো অনেকটা তাড়ি খাইয়ে দিল সুলতানা। তাড়ি খেয়ে ধীরে ধীরে অচেতন হলো কালীমা। ও জ্ঞান হারানোর পর আগুন জেবলে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হলো। একজন পুরুত এল। মন্ত্র পড়লো এবং আগুনে ঘি ঢেলে যজ্ঞানল বাড়িয়ে দেওয়া হলো। কিংবদন্তী হলো যে আগুনের শিখা যত উঁচু হবে, ততই নবব্রতীদের অভিষেক নিষ্কলঙ্ক হবে। তা সেদিন যজ্ঞানল যেন আকাশ ছুঁয়েছিল। তাই সবাই ভাবলো যে হিজড়াদের দেবীরা খুশী হয়েছেন। কালীমার অভিষেকে কোন খুঁত নেই। এরপর অচেতন কালীমার লিঙ্গের গোড়ায় বেশ শক্ত করে বাঁধন দিল পুরোহিত।

খানিক পরে পরে বাঁধন কসতে লাগলো সে। আঁট করার দরুন কালীমার পুরুষাংগটা তখন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তার পুরুষাংগ যখন পুরোপুরি অসাড় হয়ে গেছে, তখন একটা ক্ষুর দিয়ে কালীমার লিংগটা গোড়া থেকে ছেদন করে দেওয়া হলো।

কাটার পরেই ভয় এবং যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে পড়লো কালীমা। তখন তার নেশার ঘোর কেটে গেছে। ভয়ার্ত চোখে কালীমা দেখলো আগুনের কুন্ড ঘিরে হিজড়ারা ধেই ধেই করে নাচছে আর ঢোল বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছে। ঢোলের বাজনা আর গানের চীৎকারে সেই রাতের আকাশ থমথম করছিল তখন। একজন একটা পদ গাইছে আর অন্য সবাই সমস্বরে ধুয়া তুলছে 'হাঁ জি' বলে। সেই বীভৎস কান্ডকারখানা দেখতে দেখতে কালীমা ভয় পেয়ে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ওরা গাইছিল,

নতুন হিজড়া হয়েচে!
হাঁ জি!
মেয়ে নয়, শাড়ি পরেচে!
হাঁ জি!
চাকা নেই, গাড়ি চলেচে!
হাঁ জি!
ফল নেই, আঁটি হয়েচে!
হাঁ জি!
লিংগ নেই, পুরুষ হয়েচে!
হাঁ জি!
যোনি নেই, মেয়ে হয়েচে!
হাঁ জি!

ফের যখন কালীমার জ্ঞান ফিরে এল, সে দেখলো তার ধর্ম-মা সুলতানা ক্ষতস্থানে মলম লাগাচ্ছে। মলমের উপকরণগুলো বংশপরম্পরায় হিজড়ারা শিখেছে। একরকম তেল, ভস্ম এবং এক বিশেষ গুল্মে গুঁড়ো করে লেই বানানো হয়। মোগল যুগে এই বিশেষ মলমের ব্যবস্থাপত্র তৈরি হয়। খোজা নপুংসকদের স্বর্ণযুগ ছিল সেই বাদশাহী কালটা। তখন সারা দেশেই গরিব বাপ মায়েরা পয়সার লোভে ছেলে বেচতো। এদেরই লিংগচ্ছেদন করে খোজা বানানো হতো। তখন এক একজন অমাত্যের অধীনে প্রায় হাজার বারশ' খোজা থাকতো। তাদের সামাজিক অবস্থারও খুব বাড়বাড়ন্ত ছিল সেকালে। শুধু হারেমের দ্বাররক্ষী হওয়া ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে তারা নবাবের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হতো। বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসেবে বাদশাহী আমলে তাদের অনেককে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সেনাধ্যক্ষও করা হয়েছে।

সেরে ওঠার পর পেশাদারী গায়কের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শিখতে লাগলো কালীমা। গান নাচ দুই-ই। মূকাভিনয়ও শিখতে হলো তাকে। কি করে বাচ্চাকে আদর-সোহাগ করতে হয়, কি করে স্তন্যপান করাতে হয়, সেটিও শিখলো সে। অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের যখন প্রসববেদনা ওঠে, তখন তার কেমন অভিব্যক্তি হয়, সেইসব খুঁটিনাটি অনুষংগগুলিও শিখলো কালীমা। শিক্ষাদান শেষ হবার পর কালীমাকে 'বাই' বা নর্তকী আখ্যা দেওয়া হলো। তারপর শুরু হলো দেশভ্রমণ। হিজড়াদের

সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়। সারা দেশের হিজড়াদের সংগে সম্বন্ধ পাতাতে হয়। হিজড়ারা সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। কেউ বোন, কেউ মাসি, কেউ চাচী ইত্যাদি। উত্তর ও পশ্চিমভারতের সব জায়গাতেই এই সমাজের মানুষ ছড়িয়ে আছে। নতুন হিজড়াদের আপনজন এরাই। কালীমাকে সংগে নিয়ে উত্তর ভারতের অনেক শহর ঘুরলো সুলতানা। দিল্লি, নাগপুর, বেনারস ইত্যাদি। কিন্তু বেনারসে এসেই কালীমার কপাল পুড়লো। একদিন ভোর বেলায় গংগাস্নানে যাবার সময় সুলতানার বুকে ব্যথা উঠলো। রাস্তার ওপরেই ঢলে পড়লো সে। আর উঠলো না।

ধর্ম-মা'র এই হঠাৎ মৃত্যুতে প্রথমটায় দারুণ মুষড়ে পড়েছিল কালীমা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে নিঃসংগ হয়ে পড়লো না। হিজড়ারা নিঃসংগ হয় না। তখন কিসের উৎসব হচ্ছে বেনারসে। অনেক হিজড়া ভক্ত এসেছে তীর্থ করতে। এইরকম এক দলের নেত্রীর ভারি পছন্দ হলো কালীমাকে। সেই-ই তাকে নিজের দলে টেনে নিল। এই বৃদ্ধা দলপতির নাম বুলবুল। সে কলকাতার হিজড়া এবং স্তেফান কোভালস্কীর প্রতিবেশী। সেদিন এই বৃদ্ধা হিজড়ার দয়াতেই নতুন দলে ঠাঁই পেল কালীমা।

একষট্টি

ঘুম! আরও ঘুম! একটানা পনেরো-বিশ ঘণ্টা ঘুমতে চায় কোভালস্কী। যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে, শয়নম হট্ট মন্দিরে! ঠিক তাই। কেন্নো. বিছে, ইঁদুরের সংগে একত্রে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেও তার অরুচি নেই। মোটকথা নিবিড় সুপ্তির নিরাপদ কোলে সে ঢলে পড়তে চায়। বস্তিতে এসে পর্যন্ত কোভালস্কীর সমস্ত চিত্তজগৎ একাকার হয়ে আছে এক দুঃস্বপ্নে। পুরো একটা রাতও সে সুখে ঘুমতে পারেনি। কোনরকমে তিন-চার ঘণ্টা সময় আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে থেকেছে মাত্র। সেটা যেন ঘোর লাগা ভাব। কিন্তু ঘুম নয়। ক্ষণিক নৈঃশব্দের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে আত্মসমর্পণ। তাও একটানা নয়। বিরামচিহ্নের মতন হাঁচি কাশিতে বিপর্যস্ত। ভোর সাড়ে চারটে থেকে শুরু হয় ঘুম ভাঙানিয়া গান। প্রথমেই ট্র্যান্‌জিসটর থেকে ভেসে আসা সংগীতের ঢক্কানিনাদ ঝাপটা মারে কানের পর্দায়। খানিক পরেই হিজড়াদের পোষা কুক্কুটের চোস্ত্ কোকর কোঁ ডাক শুনে পাড়ার অন্য মুরগীরা সমবেত ভাবে সাড়া দিতে শুরু করে। ততক্ষণে ঘরে বা বারান্দায় শুয়ে থাকা বাচ্চাদেরও ঘুম ভেঙেছে। ভোর থেকেই ওদের খাবারের বায়না শুরু হয়ে যায়। একে একে গেরস্থালির অন্য কাজগুলোও হতে থাকে। হাতে জলভর্তি টিনের কৌটা নিয়ে সেই আবছা আলোয় পায়খানার খোঁজে মানুষগুলো তখন ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। ধাঙড় ধর্মঘটের দরুন উপচে ওঠা খোলা নালার ধারেও অনেকে প্রাতঃকৃত্য সারতে বসে পড়েছে। কচি বাচ্চা মেয়েরা ঘুম-চোখে সারি দিয়ে উনোন ধরিয়ে দিয়েছে। সমস্ত চত্বরটা ধোঁয়ায় ভরতি। উনোন ধরিয়ে ওরা বাসি বাসন মাজতে বসলো। এঁটো বাসন ধুয়ে ওরা বিছানা তুলবে. বালতি করে জল তুলবে. গোবর মেখে ঘুঁটে দেবে। এসব কাজ শেষ হলে অনেকে আবার জটা ছাড়িয়ে দিদির চুল আঁচড়ে দেবে। এইভাবে বস্তির সংসারে ভোর থেকেই কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। তখন কোভালস্কীকেও ঘুমের পাট তুলে দিয়ে সেই কাকডাকা ভোর থেকেই জেগে

বসে থাকতে হয়।

কোভালস্কী রোজ দেখতো যে ভোর পাঁচটা নাগাদ সেই আদিবাসী বন্ধুর বাচ্চা মেয়েটা কোথায় যেন যায়। মেয়েটা নিতান্তই কচি। ওর নাম পদ্মিনী। কোভালস্কীর খুব জানতে ইচ্ছে হতো রোজ ভোরে মেয়েটা কোথায় যায়। একদিন ভোরে ওর পিছু নিল কোভালস্কী। বস্তির এলাকা পেরিয়ে মেয়েটা রেল লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। ভোরের ট্রেনগুলো তখন কলকাতায় ফিরছে। প্রথম ট্রেনের হুইসল্ শুনেই মেয়েটা তার তালি মারা ব্লাউজের তলা থেকে একটা সরু বাঁশের লাঠি বের করলো। লাঠির মাথাটা চেরা। সেই ফাঁকের মধ্যে একটাকার একটা নোট গুঁজে সে লাঠিটা তুলে ধরলো। ততক্ষণে ট্রেনটা এসে পড়েছে। ট্রেনের গতি মন্থর। ড্রাইভারের কেবিন থেকে কয়লামাখা একটা লোমশ হাত নিচু হয়ে নোটটা তুলে নিল। তারপর ক'টা বড় বড় কয়লার চাঙড় ছুঁড়ে দিল মাটিতে। ট্রেনটা চলে গেলে কয়লার টুকরোগুলো মাটি থেকে তুলে নিল পদ্মিনী। তারপর ঘাগরার তলায় ঢুকিয়ে দৌড় দিল বাড়িমুখো। কোভালস্কী পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, পদ্মিনীর বাপ ওই চুরি করা কয়লার খানিকটা সংসারের জন্যে রেখে বাকিটা বেচে দেয়। বস্তির গরিব গুর্বোদের বেঁচে থাকার অসংখ্য ফিকিরের মধ্যে এটাও এমনি এক ফিকির।

তাই ঘুমের সময়ের অভাব হলেও বস্তির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ কোভালস্কী হারায় না। বস্তির গলি যেন এক তুলনাহীন পর্যবেক্ষণশালা। চোখ দুটি খোলা রাখলে কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে তার মতন অনুভূতিপ্রবণ যারা তাদের কাছে বস্তির এই চত্বরটা যেন অভিজ্ঞতার খনিবিশেষ। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত নানান ঘটনায় গমগম করছে এখানটা। মানুষের আসা যাওয়ার যেমন বিরাম নেই তেমনি বিরাম নেই বিচিত্র কর্মচাঞ্চল্যের। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এর কর্মচাঞ্চল্য। কখনো ঘণ্টা বাজিয়ে, কখনো শঙ্খধ্বনি দিয়ে ব্যাপারীরা বস্তির মধ্যে ঢুকছে। হয়ত বা তার পিছু পিছু কাঁসর বাজিয়ে বাসনওলা ঢুকলো। টিনের মধ্যে গঙ্গাজল ভরে পুরুতঠাকুর গঙ্গা-বারি ফিরি করে বেড়াচ্ছে। তবে বস্তির বাচ্চাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলো ভালুকওলা। তার ডুগডুগির আওয়াজ শুনলেই হুড়মুড় করে বাচ্চারা ঘিরে ধরে লোকটাকে। শুধু ডুগডুগিওলাই নয়। বাচ্চাদের আরও আকর্ষণের মানুষ আছে। বাঁদরনাচওলা, বেজিওলা, সাপুড়ে, কাকতাড়ুয়া, খাঁচার কাকাতুয়াওলা ইত্যাদি। এরা ছাড়াও আসে নানা বিচিত্র পেশার মানুষ। আসে বোষ্টম, বাউল। গান গেয়ে তারা ঠাকুরের নাম শোনায়। আসে পুতুলনাচওলা, আসে আলখাল্লাপরা ফকির আর ব্যায়ামবিদ। আসে বাজিকর আর ভাঁড়ের দল। আসে ম্যাজিকওলা, পালোয়ান, বামন। আসে পাগল কিংবা ছাইমাখা সাধুবাবা, কে না আসে এই বিচিত্র মানুষের সংসারে! বস্তুত, দুঃখের বারমাস্যা থেকে খানিকক্ষণের জন্যে পালিয়ে যাবার যত রকম আমোদ-প্রমোদের উদ্ভাবন হয়েছে, সে সবেরই প্রদর্শনী হয় এই বস্তির সমাজে।

তবে বস্তিটা যেন মুখ্যতঃ বাচ্চাদেরই রাজত্ব। আনন্দ নগরের এইসব বিস্ময়কর শিশুরা যেন এখানকার রাজা। ছোট ছোট এইসব সরল, নিষ্পাপ শিশুরা নিত্য অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হচ্ছে। অথচ কী ভরপুর ওদের প্রাণশক্তি! ওরা কেউ নিঃস্ব নয়। ওরা সবাই যেন রাজার রাজা। ওদের উৎকণ্ঠা নেই। তাই জীবন থেকে

ওরা রস ছেঁকে নিতে পারে। নির্মল হাসির ছটায় ওরা বর্ণময় করে তোলে পৃথিবীর সব নিষ্প্রভতা। ওদের কালো কালো মুখের মধ্যে ঝলমল করে হাসির দীপ্তি। এই বস্তির পৃথিবীকে রঙিন করেছে এইসব বাচ্চারাই। তাই মনে হয় যে বয়স্ক বিষণ্ণ মানুষগুলোর মধ্যে যেটুকু আশার কিরণ টিকে আছে, তার সবটুকুই বাচ্চাদের মুখের সরল হাসি থেকে ধার করা। ওদের চোখ ঝলসানো টাটকা তাজা প্রাণগুলো বস্তির মৃতপ্রায় মানুষদের এইভাবেই সঞ্জীবিত করছে। শিশুদের উষ্ণ স্পর্শ না পেলে বস্তিটা কয়েদখানা হয়ে উঠতো। ওরাই যেন বস্তির এই নিরন্তর ক্লেশকর জীবনটা আনন্দময় করে তুলেছে।

কোভালস্কী গুণে দেখেছে যে আলো-বাতাসহীন এই ছোট্ট চত্বরটুকুর মধ্যে প্রায় বাহাত্তরটা বাচ্চা ছুটোছুটি করে খেলাধুলো করে। তারা এখানেই বাস করে এবং যা কিছু তারা শিখছে সবটাই এই সংসার নামক নির্মমরুক্ষ পাঠশালা থেকে। তিন বছর বয়স থেকেই ওরা শিখছে কি করে লড়াই করে বাঁচতে হয়। এমনকি আরও কচি যখন ওদের বয়স, তখনও হাতে ধরে ওদের কেউ সংসারটা চিনিয়ে দেয়নি। ওরা যা কিছু শিখেছে সব নিজেরাই। ছোট ছোট নরম পেলব হাতদুখানাই তাদের একমাত্র সাথী যা তাদের স্বাবলম্বী করেছে। সেই শিশু বয়স থেকেই তাদের শিখতে হয়েছে যে ডান হাত দিয়ে খাবার খেতে হয়, ঘর ঝাঁট দিতে হয়, বাসন মাজতে হয়। কিন্তু জলশৌচ করতে হয় বাঁ হাত দিয়ে। ছোট্ট একটা পাথরের ঢেলা বা একটা কাঠের টুকরোই হলো ওদের প্রথম খেলনা। জ্ঞান হওয়া থেকেই সংসারের যাবতীয় জিনিসের সঙ্গে ওদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়েছে। ফলে বাচ্চা বয়স থেকেই ওদের মনে সৃষ্টির প্রেরণা জন্মায়। হাতদুখানাই হলো বস্তির বাচ্চাদের কর্মযন্ত্র· প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হয় এই হাতদুখানা দিয়েই। এই চেনা-জানা এত গভীর যে জীবনভর একে সম্বল করে ওরা পথ চলে। বস্তির বাচ্চাদের খেলাধুলোর জিনিসগুলোও এইরকম সাদামাটা, সরল। বিদ্যুৎচালিত বা স্বয়ংক্রিয় খেলার জিনিস ওরা পায় না। ওরা নিজেরাই খেলার সরঞ্জাম তৈরি করে নেয়। দড়ির একটা দিক বাঁ পায়ের সঙ্গে বেঁধে অন্য দিকে পাথর জুড়ে পদ্মিনী নামে বাচ্চা মেয়েটা কেমন চমৎকার স্কিপিং রোপ তৈরি করেছে। এইভাবে স্কিপিং করার সময় পদ্মিনীর হাত দুটো মুক্ত থাকে। তখন হাতের নানান ভঙ্গিমায় সে আপন মনে নাচে। কতরকম ভাব করে নিজের মনে। বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে মোহিত হয়ে যায় কোভালস্কী। তার মনে হয় মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্যভঙ্গিমার হুবহু নকল করেছে এই বাচ্চা মেয়েটা। বস্তির এই কচি মেয়েটা যেন ভারতীয় নৃত্যশিল্পের সব প্রতিভাটুকুই তার খেতে-না-পাওয়া কাঠিসার শরীরের মধ্যে ধরে রেখেছে। কাঠের পিঁড়ির ওপর বসে বস্তির ছেলেরা রথ চড়ার আনন্দ পায়। ওই পিঁড়িই যেন বেনহুরের চ্যারিয়ট। পিঁড়ির ওপর বাচ্চাদের বসিয়ে বয়সে বড় ছেলেগুলো ঘড়ঘড় শব্দে চ্যারিয়ট টেনে নিয়ে চলে বস্তির রাস্তা দিয়ে। খানকয়েক পাথরের নুড়ি আর ফলের বিচি দিয়ে ওরা মার্বেল খেলার সাধ মেটায়। উঠোন চত্বরের এক দিক থেকে আর এক দিক পর্যন্ত চেঁচামেচি করে ওরা মার্বেল খেলে। উঠোনে যখন জায়গা হয় না তখন কোভালস্কীর ঘরের মধ্যেও ওরা মার্বেল খেলে। মল্লিকা নামে যে ছোট্ট মেয়েটা রোজ সকালে কোভালস্কীর জন্যে চা আনে, সে একদিন ছেঁড়ান্যাকড়া দিয়ে তৈরি করা একটা পুতুল দেখাল। পুতুলটা যেন ওর মেয়ে। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হলো, পুতুলটাকে সে লক্ষ্মীঠাকুর বানিয়ে পুজো

করতে লাগলো। হয়ত বস্তির অসংখ্য জ্যান্ত বাচ্চাদের দেখেই এই পুতুলখেলা তার পছন্দ হয়নি।

বস্তির ছেলেমেয়েরা নানারকম খেলার উদ্ভাবন করেছে। মাটির ওপর ছক কেটে এক্কাদোক্কা খেলা, লাট্টু ঘোরানো, লাঠি দিয়ে চাকা চালানো ইত্যাদি। সব ক'টি খেলার মধ্যেই ওদের উদ্ভাবনপটুতা দেখে অবাক হয়েছে কোভালস্কী। খেলার আনন্দটাই যেন আসল। তাই ফাঁপা পেট, সরু হাত-পা এবং রুগ্ন চেহারা নিয়েও ওরা খেলা করে। একদিন তার দু পায়ের ভেতর দিয়ে লোহার একটা চাকা চালিয়ে নিয়ে একটা বাচ্চা ছুটেছিল। ইজের পরা বাচ্চাটার ঊর্ধ্বাংগে কোনো বস্ত্র নেই। খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেললো কোভালস্কী। তারপর লোহার চাকাটা আংটা লাগানো সরু কাঠি দিয়ে চালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বার তিনেক চেষ্টা করেও চাকাটাকে খাড়া রেখে চালাতে পারলো না সে। ওর এই অক্ষমতা দেখে বাচ্চাদের সে কি হাসি! খিলখিল করে হেসে এ ওর গায়ে হেলে পড়ছে তখন। কোভালস্কী জানে যে ভিড়ের মধ্যে চাকা চালানো খুবই দক্ষতার কাজ। সার্কাসে যারা দড়ির ওপর খেলা করে বা নাচে, তাদের মতন করিৎকর্মা হতে হয়। তবুও ওর নিজের এই অক্ষমতা বাচ্চাদের স্বতঃস্ফূর্ত আমোদের কারণ হলো দেখে তার খুব ভাল লাগছিল।

তবে সব খেলার সেরা হলো ঘুড়ি ওড়ানো। বস্তির ছেলেবুড়ো সবাই এমন মেতে ওঠে যে খেলাটা তখন আর বাচ্চাদের নির্দোষ আনন্দ থাকে না। রীতিমত রেষারেষি শুরু হয় নিজেদের মধ্যে। শূণ্যগামী এই ক্রীড়নকবিশেষ যেন বস্তির কয়েদী মনগুলোকে আকাশপথে ছেড়ে দিয়ে আসে। অবরুদ্ধ মন মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়। অথচ কত সামান্য উপকরণ দিয়ে এই সোনার তরী তৈরি হয়! বাঁশের তৈরি একটা কাঠামো, খানিকটা পাতলা কাগজ আর লাটিমের সুতো—সামান্য এই উপকরণগুলির মধ্যে যেন একটা সভ্যতার প্রতিফলন হয়। ঘুড়ি শুধু খেলা নয়। অসীম শূন্যতার মধ্যে দোল খেতে খেতে ভেসে বেড়ানোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক জীবনদর্শন। আছে ধর্মবোধ আর নান্দনিক অনুভূতি। আনন্দ নগরে ভাসতে ভাসতে মনে হয় মর্নাবহংগ যেন তার অন্ধ পাখা কখনো বন্ধ না করে। ইলেকট্রিকের তারে আটকে থাকা অসংখ্য ছেঁড়াখোঁড়া ঘুড়িগুলো দেখে মনে হয় বস্তির মানুষের প্রসাধিত মনের নিদর্শন ওরা।

বস্তির ছেলেরা বাচ্চা বয়স থেকেই ঘুড়ি তৈরির নক্সা করে। ছ'সাত বছর বয়সেই ওরা মোটামুটি রপ্ত হয়ে যায় এই কারুশিল্পে। ছেঁড়া ন্যাকড়া বা সার্টের টুকরো দিয়েই ওরা বানিয়ে ফেলে এমনি এক শূণ্যগামী খেলনা। তারপর হয়ত অলংকৃত করলো নানারকম ছবি এঁকে। সুন্দর করে নাম লেখালো স্তেফানদাদাকে দিয়ে। ডানা লেজ দিয়ে তাকে মনোরম করে তুললো।

সেদিন বিকেল থেকেই ঝোড়ো বাতাস বইছে। ছেলেরা স্থির করলো হাতে তৈরি ঘুড়িখানা আকাশে ওড়াবে। বস্তির লোকের সে কি উত্তেজনা! কোভালস্কীও মনে মনে উত্তেজিত। তার মনে হলো যেন মহাশূন্যে রকেট ছোড়া হবে শ্রীহরিকোটা থেকে। জয় নামে কেরলী ছেলেটি ততক্ষণে ছাতে উঠে পড়েছে। অনুকূল বাতাসের স্রোতে তার ঘুড়িটা তখন দোল খেতে খেতে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বস্তির ছেলেরা তখন আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। বড়দেরও দারুণ উৎসাহ। ছেলেদের সংগে গলা মিলিয়ে তারাও চেঁচাচ্ছে। ধীরে ধীরে শূণ্যগামী হচ্ছে ঘুড়ি। কোভালস্কীর

মনেও আনন্দোচ্ছ্বাস। তার মনে হচ্ছিল দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো ফুঁ দিয়ে আকাশপথে উড়িয়ে দিয়েছে ঘুড়িখানা। এ ছাতে ও ছাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে জয়। যখনই মনে হচ্ছে এটা তারই সৃষ্টি তখনই উদ্দাম হয়ে উঠছে মন। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে ঘুড়ি এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। মাতাল ঘুড়িকে কোনরকমে নিয়ন্ত্রণ করছে সে।

বাচ্চারা চেঁচাচ্ছিল 'আরও উঁচুতে তোল জয়দাদা!' শুধু বাচ্চারা নয়, বড়রাও যেন তাদের মনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল তখন। তারাও উৎসাহে চেঁচাচ্ছে। ক্রমশ সাদা ঘুড়িখানা আকাশের বুকে ছোট্ট বিন্দু হয়ে যেন হারিয়ে যাচ্ছিল তখন। সবাই দারুণ খুশী। উল্লাসে হৈ হৈ করছে বস্তির সবাই। এই মুক্তি যেন তাদের পরম বাঞ্ছিত কামনা। উল্লাসের আঁচ লেগেছে কোভালস্কীর মনেও। তারও অবরুদ্ধ কামনা ভেসে গেল মুক্ত মহাশূন্যে। হঠাৎ যেন নির্মেঘ আকাশে মেঘসঞ্চার হলো। সবাই দেখলো পাশের মুসলমান পাড়া থেকে একটা ঘুড়ি উড়েছে। ওরা যেন যুদ্ধ চায় তাই এই রেষারেষি। ব্যাপারটা তখন আর নির্মল আনন্দ রইলো না। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম হয়ে গেল। খেলার মাঠ হয়ে উঠলো যুদ্ধক্ষেত্র। শুরু হলো লড়াই। অনেকক্ষণ লড়াই চললো। চট করে কোনো পক্ষই জয়ী হলো না। খেলাটা তখন আর বাচ্চাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দায়িত্ব তুলে নিয়েছে দুজন বয়স্ক লোক। জয়ের বাবা এবং আশিস। যে কোন মূল্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার এক হিংস্র উন্মাদনায় ওরা উদ্দীপ্ত। ততক্ষণে দুপক্ষেই অনেক উৎসাহী সমর্থক জুটে গেছে। দুপক্ষই চাইছে অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিতে। হঠাৎ বাতাসের গতিবেগ পাল্টে গেল। আশিসরা এটাই চাইছিল। মুসলমান পাড়ার ঘুড়িটাকে তাড়া করে তারা ইলেকট্রিকের তারের সঙ্গে জড়িয়ে দিল। ওদের এই বিপর্যয়ে হিন্দুপাড়ার সমর্থকরা পৈশাচিক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো। একে হারার লজ্জা, তায় এই অপমান। দারুণ ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠলো মুসলমান পাড়ার ছেলেরা। সে এক ভীতিকর অবস্থা। দুই প্রতিপক্ষ তখন রণোন্মত্ত। মানুষের দাপাদাপি দেখে ঘরের ইঁদুরগুলোও ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

অসহায় কোভালস্কী পাথরের মতন স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই একসময় সে তার ঘরে চলে এল। খোলা দরজা দিয়ে সে দেখতে পেল কেমন বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয় আর পদ্মিনী। ওদের শিশু মন দারুণ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে মানুষের ক্রোধ দেখে। কেন রেষারেষি মারামারি করছে বড়রা? এটা ত খেলা? ওদের হাত থেকে খেলাটা কেড়ে নিয়ে বড়রা এমন মারামারি শুরু করলো কেন? কোভালস্কী জানে যে এর জবাব ওরা কোনদিন পাবে না।

আশিসরা যে দেশে ফিরে যাচ্ছে এ কথা সবাই জানতো। তাই মানিকের কথা শুনে আশিস রীতিমত অবাক হলো। বললো, 'সে কি? এর মধ্যে লুকোছাপার কি আছে? আমরা যে চলে যাচ্ছি এ কথা ত সবাই জানে! তাছাড়া এই পিপ'ড়ের বাসার সবাই সবার ওপর নজর রাখছে! এখানে কি লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করার জো আছে? জানাজানি হয়ে যাবেই। না না ভাই। তোমার কথা মানা অসম্ভব।'

এ যে অসম্ভব মানিকও তা জানে। বস্তি হলো ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি। হাঁড়ির মধ্যে ফুটন্ত চাল যেমন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, এরাও তেমনি। এখানকার ঘরকন্নায় কিছুই লুকিয়ে রাখার জো নেই। ঘরে শুয়ে বউকে সোহাগের কথা বললে বা ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকলেও লোকে তা জেনে ফেলে। আর ঠিক এই কারণেই আশিসদের বস্তি ঘরটা ছেড়ে দেবার ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছিল মানিক। তার ধারণা খবরটা জানাজানি হলে খালি ঘরখানা হাতছাড়া হয়ে যাবে। হাসারির কপালে আর জুটবে না এটি। তাই মালিকের সংগে কথা না বলা পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিল আশিসকে। অন্তত একটা রাত।

আশিসদের আসন্ন বিদায়ের কথাটাই তখন বস্তির ঘরে ঘরে আলোচনা হচ্ছে। তবে খালি ঘরটা নিয়ে ওরা যত না ভাবছিল তার চেয়ে অনেক বেশী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আশিসদের গ্রামে ফিরে যাবার সংকল্পের কথা শুনে। এতদিন শহরে থাকবার পর আবার গ্রামে ফেরার স্বপ্ন দেখা যে এক ধরনের পাগলামি তা কি ওরা জানে না? এই মায়াভ্রম ওদের কি করে হলো? শুধু তাই নয়। ওরা আরও শুনেছে যে দুজনেই শহরের চাকরি ছেড়ে গ্রামে গিয়ে চাষ-আবাদ করবে। এ ত এক অবাস্তব চিন্তা! শুধু এখানেই নয়। ওরা শুনেছে যে গ্রামের বাড়িতে আশিসের পূজনীয় অভিভাবকরাও নাকি দারুণ অসন্তুষ্ট। ছেলের এমন কান্ডজ্ঞানহীন কাজকর্ম দেখে যেন তেন প্রকারে তাদের গ্রামে ফিরে আসাটা বন্ধ করতে তারা নাকি বদ্ধপরিকর।

যাই হ'ক, পরদিন ভোর থেকেই খালি ঘরখানার অধিকার পেতে রীতিমত গণ আন্দোলন শুরু হলো আশিসের ঘরের সামনে। দলে দলে লোক এসে চড়াও হলো। সবাই ভাড়া নিতে চায়। শেষমেশ মালিকের কাছেও খবরটা পেঁাছোল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মালিকের আবির্ভাব হলো আশিসের ঘরখানার সামনে। মালিক বাঙালীবাবু। মোটাসোটা তেলচুকচুকে চেহারা। বস্তিতে যে ঘরখানা সব থেকে নিকৃষ্ট তারও মালিক আছে। কোন ঘরের একাধিক মালিক। আবার কোথাও একাধিক ঘরের মালিক একজন।

কিন্তু সশরীরে মালিকের আগমনটা খুব সহজ ঠেকলো না মানিকের কাছে। তার মনে হলো এর ফলে প্রমাদ ঘটবে। তা, সে যা ভেবেছিল তাই-ই হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো তার আশঙ্কা অমূলক নয়। মালিকের আগমনের উদ্দেশ্য টের পেল মানিক। লোকটা খুশীতে প্রায় গদগদ হয়ে বললো যে ঘরখানার ভাড়া সে দ্বিগুণ করবে। অর্থাৎ তিরিশের বদলে ষাট। লোকটার প্রস্তাব শুনে মানিকের চক্ষুস্থির। এইরকম বুকচাপা আলোবাতাসহীন একটা ঘরের

এত ভাড়া? ঘরে না আছে জানলা না আছে ইলিকট্রিক আলো। এমনকি সহজ ভাবে নিশ্বাস নেবার বাতাসটুকুও বয় না সেখানে! সুতরাং হাসারির মতন গরিব রিক্সাওলার পক্ষে এমন একখানা ঘরে বাস করার স্বপ্ন দেখাও বাতুলতা। মানিক বুঝতে পারলো যে পাকা ঘরে থাকার সুখস্বপ্নটা চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বে, যখন হাসারি ঘরটার বর্ধিত ভাড়ার কথা শুনবে। এবং যথার্থই তা হলো।

তবে ট্যাক্সি ড্রাইভার মানিকও বাপের বেটা। সে মনে মনে স্থির করলো, 'লোকে আমায় অদ্ভুতের বেটা বলে। তা কাজটিও আমার নামের উপযুক্ত হওয়া উচিত। হাসারি আমার বন্ধু মানুষ। তার ঘরের ঠেকা আমায় নিতেই হবে।' এইসব ভেবে ঘরে গিয়ে বউকে চালকলা দিয়ে সিধে সাজাতে বললো। তারপর সিধার থালা হাতে নিয়ে স্বামী স্ত্রী ঠাকুরবাড়ি গেল। ঠাকুরবাড়িটি অনতিদূরেই। সারা বস্তিতে একটাই মন্দির। শিবঠাকুরের ছোট্ট মন্দির। মন্দিরের পুজারীও ছোটখাট মানুষ। রোগা মানুষটি মন্দিরের লাগোয়া একটা মাথা নিচু ঘরে পরিবার নিয়ে থাকে। মন্দিরের একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে কয়েকজন তেলেঙ্গীর বাস। পুজারী ব্রাহ্মণের হাতে দুটো টাকা দিল মানিক। পুজারী ব্রাহ্মণ তাদের কপালে হোমের ফোঁটা পরিয়ে দিল। মন্দিরের বিগ্রহ মহাদেব। তাঁর পাশে অনুচর নন্দীর বিগ্রহ। নন্দী প্রাচুর্যের বিগ্রহ। তিনি গণনায়ক। নৈবেদ্যর থালাটি নিয়ে পুজারী সেটি ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করলো। হাতঘন্টি নেড়ে মন্ত্রপাঠ করলো। ঘি, ধূপ জেবলে অর্ঘ্য দিল। তারপর পঞ্চপ্রদীপটি নিয়ে বিগ্রহ ও তাঁর বৃষটি প্রদক্ষিণ করলো। পুজো শেষ। মানিক খুব খুশী। তার ধারণা পুজো পেয়ে স্বর্গের দেবতারা তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু মর্ত্যলোকেও দেবতা আছে। তাকে তুষ্ট করার দায় সেই-ই নেবে। সুতরাং মন্দির থেকে ফিরে আশিসকে তার মনের কথা বললো।

আশিস বললো, 'কি করবে?'

'কেন? গুরুর কাছে যাব! ওই চামারটাকে চিট্ করতে পারে শুধু সেই-ই।'

আশিসের মনে ধন্দ ছিল। সে বললো, 'এই সামান্য ব্যাপারে লোকটা কি মাথা ঘামাতে রাজী হবে?'

'নিশ্চয় রাজী হবে।' বেশ জোর দিয়েই বললো মানিক। আরও বললো, 'এই ধরনের কাজ করতেই সে চায়। এতে ওর মানসম্মান বাড়ে। জানো না ও নিজেকে কি বলে বেড়ায়? ও নাকি গরিবের মা-বাপ!'

আশিসের সঙ্গে কথা বলে মস্তান গুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের আর্জি পেশ করলো মানিক। দিন দুই পরে সাক্ষাতের অনুমতি পেল সে। একটা লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো গুরুর বাড়িতে। ওকে প্রথমে একটা ছোট ঘরে বসাল লোকটা। ক'টা ষণ্ডামার্কা লোক বসে বসে তাস খেলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। এরা নাকি গুরুর পার্শ্বচর। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। খানিক পরে গুরুর বড়ছেলে তাকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এল। বসার ঘরখানা যেমন বড়সড়, তেমনি জমকাল তার আসবাবপত্র। অবাক হয়ে মানিক তাকিয়ে আছে ঘরখানার দিকে। ঘরের শেষ মাথায় একটা হাতলওলা সিংহাসনের ওপর হাসি হাসি মুখে একজন সৌম্যদর্শন মানুষ বসে আছে। লোকটার মুখখানা চৌকো। তার গালের হনুদুটো মাংসল। চোখে কালো চশমা। দামী পাথর বসানো সিংহাসনটার ওপর মোগল বাদশার মতন বসে থাকা এই প্রৌঢ় লোকটাকে বুড়ো ব্যাঙের মতন দেখাচ্ছিল।

লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। ঘরে ঢুকেই মানিক তার ঝাঁজটুকু টের পেয়েছে। তাই

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে বেশ বিনীতভাবেই সে তার বক্তব্য পেশ করলো। স্থির শান্তভাবে মানিকের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ হাত তুলে তাকে থামতে বললো। মোটা মোটা লোমশ হাত। হাতের প্রায় সবক'টা আঙুলেই জ্বলজ্বল করছে দামী পাথরের আংটি। মানিক বুঝতে পারলো যে তার বক্তব্যটি গুরু বুঝেছে। অধিক ব্যাখ্যার দরকার হবে না। এরপর ইসারায় ছেলেকে কাছে ডাকলো গুরু। তারপর ফিসফিস করে ছেলের কানে কিছু বললো। যোয়ান ছেলে মানিককে বুঝিয়ে দিল বাপের বক্তব্য। বললো, 'বাবা রাজী। তবে জানেন ত এসব কাজে অনেক হুজ্জত! যদিও গরিবের মা-বাপ উনি, তাহলেও ঘোড়ার দানা-পানি চাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সে ত বটেই! তা কত দিতে হবে?'

'ছি ছি! টাকা চাই না। গরিবের সেবায় কি টাকা পয়সা চাওয়া যায়?'

'তবে?'

'বস্তির মধ্যে একটা চোলাই ঠেক্ খুলতে দিতে হবে। কিন্তু দেখবেন! এ নিয়ে পরে যেন কোন ঝঞ্ঝাট না হয়।'

মানিক হতবাক। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ছেলেটা ফের বললো, 'কিছু মন্দ হলো না ত?'

'না মন্দ কিসের। মাথার ওপরে চালখানা ত পাকা হলো হাসারির!' মনে মনে ভাবলো মানিক।

বস্তির জীবনে সচরাচর যা ঘটে না সেটাই যেন সকলের অলক্ষ্যে ঘটে গেল। বস্তির ঘরকন্না গুটিয়ে মাটির টানে দেশে ফিরে যাচ্ছে আশিসরা। অথচ আশ্চর্য! এতবড় ঘটনাটা কি করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কে জানে! একদিন ভোরে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আশিস যখন রিক্সায় উঠছে, তখন সকলের হুঁস হলো। ওরা শেষমেশ জানলো যে চিরকালের মতন শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে আশিসরা। ওরা দুঃখ পেল মনে মনে। একসংগে অনেককাল এই জেলখানায় কাটিয়েছে। একসংগে অনেক দুঃখকষ্ট সয়েছে। সামান্য অভাববোধ যে হলো না তা নয়। কিন্তু খুবই তুচ্ছ সেই আবেগ। তবে বাচ্চারা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই বিদায়ব্যথা শুধু ওরা তীব্রভাবে বোধ করেছে। আশিসের বড় মেয়ে মল্লিকার সমবয়সী পদ্মিনী। তার ন্যাকড়ার পুতুলটা আজ স্বেচ্ছায় পদ্মিনীকে দান করে দিল মল্লিকা। অথচ ক'টা দিন আগেই এই পুতুলটাকে লক্ষ্মীঠাকুর বানিয়ে ও পুজো করেছে। পুতুলটা হাতে নিয়ে পদ্মিনীর চোখদুটি ছলছল করে উঠলো।

ওদের সংগে স্টেশনে এসেছে কোভালস্কী। ওদের ট্রেনে চড়িয়ে সে ফিরবে। ওরা এখন ক্যানিং যাবে। সেখান থেকে স্টিমারে চড়ে মাত্‌লা নদী পেরিয়ে ওপারে যাবে। আবার এক ঘণ্টা বাসজার্নির পর ঘণ্টাদুই হেঁটে তবে ওদের গ্রামে পেঁছবে আশিসরা। দীর্ঘ ছ'বছর নির্বাসনের পরে দেশে ফিরছে আশিস। আজ সত্যিই বড় সুখের দিন তার জীবনে। বোধহয় ওরাই প্রথম দেখালো যে উল্টোদিকেও টান আছে। শহরের মতন মাটিরও টান আছে। ওরা আরও প্রমাণ করলো যে শহর কলকাতার টান ছিঁড়েও বেরিয়ে আসা যায়। কোভালস্কীর কাছেও এটাই এক আশ্বাস যেন। মনে মনে সেও যেন এইটুকুই পেতে চেয়েছিল। তবুও আশিস বা শান্তাকে হারাবার ব্যথা সহজে ভোলা যায় না। কোভালস্কীও তা ভুলবে না। নিজামুদ্দিন লেনের সেই ছোট্ট ঘরখানায় আশিস আর শান্তাকে নিয়ে মার্গারেটা যেদিন প্রথম

আসে, সেদিনের কথাটা বার বার মনে পড়ছে কোভালস্কীর। সেই থেকেই এক নিবিড় অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের মধ্যে। দিনের পর দিন ওরা একসঙ্গে দীনদুঃখীর সেবা করেছে। কখনও এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি। ট্রেনে ওঠার ঠিক আগে আশিস সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। তারপর কোভালস্কীর দিকে চেয়ে গভীর স্বরে বললো, 'স্তেফানদাদা! আমরা চললাম।'

ঘাড় নাড়লো কোভালস্কী। আশিস ফের বললো, 'আমরা হিন্দু। আপনি যদি আমাদের জন্যে প্রার্থনা করেন, যদি যীশুর আশীর্বাদ দেন, তবে আমাদের মঙ্গল হবে।'

কোভালস্কী ভারি খুশী হলো। আশিসের বউ আর ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে ওদের মাথার ওপরে হাতখানি তুলে সে ক্রুশচিহ্ন আঁকলো। তারপর বললো, 'পরম পিতা যীশু মঙ্গলময়! তিনি তোমাদের মঙ্গল করবেন। কারণ, তোমরাই জগতের জ্যোতি।'

তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। রেলের জানলার ফ্রেমে আঁটা মুখগুলো ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথ থেকে সরে সরে যাচ্ছে। ক্রমে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে ঝলসান রোদের তাতে ট্রেনখানা যখন আবছা হয়ে আসছে, তখনি কোভালস্কী টের পেল যে সে কাঁদছে।

সেই মোটাসোটা বাঙালী মালিকটা যে কি করে টের পেল কে জানে। দেখা গেল আশিসরা ঘরখানা ছেড়ে দেবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক গুণ্ডা নিয়ে লোকটা এসে হাজির। কলকাতা শহরে গুণ্ডা ভাড়া করতে বেশী ধকল সইতে হয় না। যে দাম দিয়ে গুণ্ডা ভাড়া পাওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী দাম লাগে গাড়িটানা একটা বলদ যোগাড় করতে। বাড়িওলার হাতে মস্তবড় একটা তালা। খালি ঘরখানায় তালা দিয়ে সে ওই ঘরখানার অধিকার সাব্যস্ত করতে এসেছে।

হস্তিনাপুরের যুদ্ধ হলো মহাভারতের একটা ঝলমলে অধ্যায়। তা আনন্দ নগরের মহাকাব্যেও সেদিনকার লড়াইটা এমনি এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তবে তফাত আছে। এ লড়াইয়ের প্রতিপক্ষরা কেউ পৌরাণিক বা কাল্পনিক চরিত্র নয়। এরা সবাই বাস্তব চরিত্র এবং নিষ্কর্মা চাষাড়ে মানুষ। টাকার বদলে মানুষ খুন করতেও ইতস্তত করে না। ইতিমধ্যে প্রতিপক্ষরাও হাজির হয়েছে। বস্তির ধর্মবাপ তার বড় ছেলে অশোককে পাঠিয়ে দিয়েছে ঘরটার অধিকার পেতে। তার সঙ্গেও প্রায় দশবারোজন ঠ্যাঙাড়ে এসেছে। লোকগুলোর হাতে বেঁটে বেঁটে লাঠি। ওরা এসেই বাড়িওলার গুণ্ডাদের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যস! শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি ধস্তাধস্তি। হঠাৎ কোভালস্কী দেখলো একজন একটা ক্ষুর বের করেছে। কিছু বোঝার আগেই লোকটা একজনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্ষুরটা নিয়ে। আহত লোকটা তখন চিৎকার করছে। ছোট্ট চত্বরটার মধ্যে দাপাদাপি করছে। বস্তির অন্য বাসিন্দারাও ভয় পেয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে তখন। শুধু মানুষ নয়। হিজড়াদের পোষা মুরগীগুলো ডাকাডাকি করতে লাগলো। হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে তাই ছুড়ছে পরস্পরের দিকে। টালি ছাওয়া ঘরের মাথা থেকে উধাও হলো টালি। উধাও হলো ভাঙা উনোন, বালতি ইত্যাদি। হামাগুড়ি দিয়ে লোকগুলো নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছে। কেউ গোঙাচ্ছে, কেউ চিৎকার করছে। সে এক বীভৎস অবস্থা যেন। সারা অঞ্চলটা

যথার্থই রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে তখন। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল নাটকের একটা দাঙ্গার দৃশ্যে হুবহু অভিনয় হচ্ছে এখানে। তবে তফাত হলো, মানুষগুলো কেউ অভিনয় করছিল না। হিংস্র বন্য জন্তুর মতন মারামারি করছিল নিজেদের মধ্যে।

ঠিক তখনই রঙ্গমঞ্চে যেন মহাপুরুষের আবির্ভাব হলো। অন্তত আনন্দ নগর বস্তির ভাগ্যবিধাতা যে এই লোকটাই তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝকঝকে সাদা পোশাক। পরনে ডিমের খোলার মতন সাদা ধপধপে ধুতি। গায়ে সোনার বোতাম লাগানো সাদা পাঞ্জাবি। হাতে হাতির দাঁতের মাথাওলা বাহারি ছড়ি। একেবারে ফুলবাবুটি। দুপাশে দুজন দেহরক্ষী নিয়ে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার মতন লোকটা যখন এল, তখন মানুষগুলো নিষ্ঠুর মারামারি করছে। লোকটা এসেই হাত তুলে ইসারা করলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় সবাই মারামারি ছেড়ে শান্ত হয়ে গেল। কোভালস্কী স্তম্ভিত। তার মনে হলো যেন বাদশা আকবর স্বয়ং এসেছেন দুষ্ট প্রজাদের শাসন করতে। লড়াই থেমে গেছে। মানুষটার নির্দেশ যেন সর্বশক্তিমান ভগবানের নির্দেশ। সে নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারো নেই। বস্তির নিরীহ মানুষগুলো তখন একে একে ফিরে আসছে এই অসাধারণ দৃশ্যটা চাক্ষুস করতে। মস্তানরাজা খুশী। স্মিত মুখের প্রশ্রয় ছড়িয়ে সবাইকে সে কৃতার্থ করছে। বাড়িওলার মুখোমুখি হলো মস্তান-রাজা। হাতের বাহারি ছড়িটা পাশে দাঁড়ানো একজন অনুচরের হাতে দিয়ে মস্তানরাজা হাতদুটো জড়ো করে তাকে নমস্কার করলো। বাড়িওলাও কৃতার্থ। মস্তানরাজা এবার হাতের ছড়িটা দিয়ে বাড়িওলার হাতের তালাটা নির্দেশ করলো। একজন দেহরক্ষী এসে দাঁড়ালো খালি ঘরটার সামনে। তালাটা হাতে নিয়ে বাড়িওলা লোকটা হতবুদ্ধির মতন দাঁড়িয়ে ছিল। একটুকরো মিষ্টি হাসি উপহার দিল মস্তানরাজা। শুধু নিঃশব্দ ইসারা আর ইঙ্গিতেই কাজগুলো সম্পন্ন হলো। কোথাও প্রতিবাদ হলো না। কেউ একটা কথাও বললো না। বরং মস্তানরাজার সম্মান রাখতেই মোটা চেহারার বাড়িওলা দলবল নিয়ে পায়ে পায়ে সরে পড়লো অকুস্থল থেকে। মস্তানরাজার মুখে তখন বিজয়ীর গর্বিত হাসি। সারা চত্বরটা ঘুরে ঘুরে সে তখন সবাইকে কৃতার্থ করছে। মায়ের কোলের বাচ্চাদের গাল টিপে আদর করছে। মানুষটা সত্যিই অসাধারণ।

মানিকও অসাধারণ। সত্যিই সে আজ অসম্ভবকে সম্ভব করলো যেন। তার রোগা বুকখানা তখন গর্বে সাতহাত ফুলে উঠেছে। অবশ্য ফন্দিটা কিছু ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নেই। বস্তির মধ্যে চোলাইখানা খোলার জন্যে মানুষগুলোর মুখবন্ধ করতে হয়েছে তাকে। ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য। তবে এটুকু ত্যাগস্বীকার নিষ্ফল হবে না। অন্তত ফুটপাতবাসের অবমাননা থেকে হাসারি মুক্তি পাবে। মাথার ওপরে পাকা একটুকরো ছাত পাবে। আশ্রয় পাবে একটা নিরাপদ চারদেওয়ালের কুঠুরিতে। তবে আরও কিছু পাবে হাসারি। পাবে একজন সত্যিকার সায়েব প্রতিবেশী। পাবে তার মতন একজন উপকারী বন্ধু আর চারজন আসল হিজড়াকে। আজকের লেনদেনের এই লভ্যাংশটুকু মন্দ কি! আনন্দ নগর বস্তির ধর্মবাপ ওই মস্তানগুরু তৈরি হয়েই এসেছিল। সে যেন জানতো যে যুদ্ধজয় হবেই। তাই ঘটা করে উৎসব করার উপকরণও সঙ্গে করেই এনেছে সে। বস্তির পানশালার উদ্বোধন আজই করবে সে। সঙ্গে আনা 'বাঙলা' বোতলগুলো তখন হাতে হাতে ঘুরতে লাগলো তার ইসারায়।

নাঃ! ম্যাক্স লোয়েবের মনে আর কোন ধন্দ নেই। বারবার চোখ রগড়েও যে ছবিটা সে দেখছে সেটা অবিশ্বাস্য হলেও দারুণ সত্যি। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? তবে কি গরমের দাপটে তার মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে? নিশ্চয়ই সে পাগল হয়ে গেছে। অস্ত্র করার যন্ত্রপাতিগুলো টেবিলের ওপর রেখে সে আর একবার চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিল। তারপর ফের তাকাল রাস্তার দিকে। না। কোন ভুল নেই। থকথকে জলকাদা মাড়িয়ে যে লোকটা আসছে সে তার বাবা। যেমনি ধারণাটা তার মাথায় ঢুকলো অমনি সে চেঁচিয়ে ঘর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল।

'বাবা!'

ঠিক তাই। দোহারা চেহারা আর লালচে বাদামি চুলওলা মানুষটা যথার্থই আর্থার লোয়েব। তবে হাঁটু অব্দি মোড়া প্যানটালুন পরা মানুষটাকে বেঁটে দেখাচ্ছে। চেহারাটা হয়ে উঠেছে মাছ ধরা জেলের মতন। এক মুহূর্ত বাপবেটা পরস্পরের দিকে চেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কথা বলছে না। খানিক পরে দু-হাত বাড়িয়ে দিল আর্থার লোয়েব। আর দুরন্ত শিশুর মতন বাপের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাক্স লোয়েব। সে এক ভারি মজাদার দৃশ্য। দশাসই চেহারার দুজন সায়েব আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে দেখে দুপাশে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর সে কি হাসি! এরা সবাই চিকিৎসা করাতে এসেছে। কিন্তু উপরি পাওনা হলো এই মজাদার দৃশ্যটা। লোকগুলো খিলখিল করে হেসে উঠলো সেই দৃশ্য দেখে।

শেষমেশ জড়াজড়ি ছাড়িয়ে একটু সুস্থির হলো আর্থার। আশপাশে নজর দেবার সুযোগ পেল। বেশ লম্বা রোগীদের ভিড়। যে ঘরটার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে তার দেওয়ালটা মাটির। মাথায় টালির ছাত। ঘরখানার আপাদমস্তক দেখে আর্থার একটু কৌতুক করে বললো, 'তাহলে এই-ই তোর হাসপাতাল?'

বাপের মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে মাথা নাড়লো ম্যাক্স। দুজনেই চেয়ে আছে দুজনের দিকে। তারপর দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে আর্থারের শরীরটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। ততক্ষণে দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে আরও ভাল করে দেখতে পেয়েছে সে। ওদের শীর্ণ, শির বের করা মুখ, কোলের মধ্যে নেতিয়ে পড়া বাচ্চাগুলোর হাড়জিরজিরে চেহারা আর ঠেলে বেরিয়ে আসা বুকের খাঁচা দেখে আর্থার বুঝতে পেরেছে যে, এরা সবাই ক্ষয়রোগী। লাইনে দাঁড়িয়েই কখনো কাশছে, কখনো থুথু ফেলছে। ছেলের দিকে চেয়ে বাধ-বাধ-ভাবে কোনরকমে বললো, 'এত দেখছি রুগ্ন মুমূর্ষু মানুষের জনতা! এরা সবাই অসুস্থ?'

ম্যাক্স বুঝতে পারছে বাপের মনের অবস্থাটা। ঠিক এমনি এক নিষ্ঠুর বাস্তব ছবি সে নিজেও দেখাতে চায় নি। কিন্তু কী বা করার আছে! না জানিয়ে আসার এটাই শাস্তি। বললোও সে কথা। 'আমি দুঃখিত ড্যাড। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে এই দৃশ্য ছাড়া আর কিছু দেখাবার নেই। একটু যদি আগে জানিয়ে আসতে তোমার উপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারতুম।'

'সেটা কি রকম?'

'ধরো হাতে ফুলের মালা আর চন্দন বাটা নিয়ে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি এলে। ওমনি ব্যান্ড বেজে উঠলো। মেয়েরা নাচতে নাচতে এসে তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিল। কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিল।'

'তিলক কি?

'তিলক হলো তৃতীয় নয়ন। কপালে জ্বলজ্বলে লাল চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে সম্মানিতদের আপ্যায়ন করা হয়। এটাই এখানকার রীতি। তৃতীয় নয়ন দিয়ে দৃষ্টির বাইরেও দেখতে পায় মানুষ। সেটাই তার সত্যদর্শন।'

আর্থার সত্যদ্রষ্টা হবার ভান করলো না। যা দেখেছে তাতেই সে থমকে গেছে। সরাসরি মেনে নিল সে কথা। বললো, 'এখনই যা দেখলুম তাতেই চমকে গেছি। নতুন দর্শন আর কি হবে? যাক সে কথা। এখন বল্। তোদের এই শহরে দুজনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারার মতন নিরাপদ, নির্ঝঞ্ঝাট কোনো জায়গা কি আছে?

'কেন? বাপবেটার পুনর্মিলন উৎসব করবে?'

আর্থার ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ম্যাক্স বললো, 'কোথায় উঠেছ? গ্র্যান্ড হোটেলে নিশ্চয়?'

আর্থার এবারও ঘাড় নাড়লো। ম্যাক্স বললো,

'তবে ত ভালই হলো। গ্র্যান্ড হোটেলেই তন্দুরী ডিনার করা যায়। 'ঠিক আটটায়।'

কথাটা বলে ম্যাক্স অপেক্ষামাণ অসুস্থ লোকগুলোর দিকে তাকাল। ওরা অধৈর্য হয়ে পড়ছে। তার মনে হলো আর্থারের এখন বিদায় নেওয়া উচিত। চকিতে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'কাল কিন্তু এখানে এসে আমায় তুমি সাহায্য করবে। এদের অনেকেই শ্বাসকষ্ট পাচ্ছে। আর তুমি ত এই রোগেরই বিশেষজ্ঞ! তাই না?'

একটু সুযোগ সাশ্রয় হলেই কলকাতার বাবুরা আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নিজস্ব ব্যবস্থা করে নেয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী গ্রীষ্মকাল হলো গরমের সময়। কিন্তু বড়লোক বাবুদের ধাতে গরম সয় না ব'লে চরম গ্রীষ্মেও অন্যরকম ব্যবস্থা করতে হয়। গ্রীষ্মের রক্তচোখের শাসন তাচ্ছিল্য করতে একজন শিল্পপতি তার নিজস্ব বাগানটাকে আইস্‌স্কেটিং রিংক বানিয়ে ফেলে। ঘরের কোলের সেই বরফাচ্ছন্ন বাগানটাই হলো সেই ব্যতিব্যস্ত বড়বাবুর গ্রীষ্মের শান্তি। শহরের সব আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ বা সমাবেশস্থানের মতন ম্যাক্সের নির্বাচিত রেস্তোরাটাও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তবে এতই এর ঠান্ডার বহর যে ঘরে ঢুকেই বাপবেটার প্রায় জমে যাবার অবস্থা হলো। ভাগ্যক্রমে পাগড়ি পরা হেড ওয়েটার তাদের জন্যে বড় মাপের এক শ্যাম্পেনের বোতল ডম্ পেরিগনন্ এনে দেওয়ায় ওরা সে যাত্রা রেহাই পেল। দু এক গেলাস পানীয় পেটে পড়তেই কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হলো বাপবেটা। খিদেটাও চনমনে হয়ে উঠলো। পাঞ্জাবী খানার সঙ্গে ম্যাক্সের নেহাত অপরিচয় নেই। এখানেই একবার সুন্দরী মনুবাঈ চ্যাটার্জি তাকে বসিয়ে খাওয়ায়। সেদিন বেশ তৃপ্তি করেই সে পাঞ্জাবীখানা খেয়েছিল। সেই-ই বলে দেয় কোনটা কিভাবে খেতে হবে।

গেলাসে পানীয় ভরে গেলাসটা উঁচু করে তুললো আর্থার। তারপর বললো, 'ঘরের ছেলে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এস, এই আমার কামনা।'

ম্যাক্সও গেলাস তুললো। তারপর বাপের গেলাসের সঙ্গে ঠেকিয়ে বললো, 'আমি চাইব, সব আগে তোমার কলকাতা-দর্শন সার্থক হ'ক।'

বেশ কয়েক গেলাস পানীয় খেয়ে ফেললো ওরা। তারপর বিরস মুখে আর্থার বললো, 'জাহান্নমে যাক তোর কলকাতা! যা জিনিস আজ বিকেলে দেখলাম!'

ম্যাক্স চেয়ে আছে বাপের মুখের দিকে। বললো, 'আসল খারাপ ত কিছুই দেখলে না!'

আর্থারের চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে তখন। বললো, 'এর চেয়েও খারাপ?'

ম্যাক্স লোয়েব তাকাল বিত্তবান বাপের মুখের দিকে। সুখ, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য মাখামাখি হয়ে আছে ওই মুখখানায়। যথার্থ কষ্ট-দুঃখ যে কি বস্তু তার কোন ধারণাই নেই। একটু থেমে বললো, 'আমি জানি তোমার পক্ষে ধারণা করা কত কঠিন। সত্যি বলতে কি কেউই একদিনে পারে না। মিয়ামির স্বচ্ছল জীবনযাত্রা থেকে উড়ে আসা কোন মানুষই বুঝবে না কি চরম দুরবস্থার মধ্যে এখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে। যতক্ষণ পোলীশ ধর্মযাজক কোভালস্কীর মতন ওদের সংগে কেউ না মিশছে বা ওদের দুরবস্থার দায় নিচ্ছে, ততক্ষণ কারো পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব নয়। কার কথা বললুম তা নিশ্চয় বুঝেছ? চিঠিতে এ'র কথা আমি লিখেছি।'

হঠাৎ আর্থার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'তুই নিজে কিছু বুঝিস?'

'বুঝি, তবে অনেক কম।'

কিছুটা বিস্ময় আর সমীহ ভাব নিয়ে ছেলের কথা শুনছিল আর্থার। শুনতে শুনতে জলপ্রপাতের মতন আছড়ে পড়লো ম্যাক্সের শিশু বা কিশোর বয়সের নানান ঘটনার কথা। সব ঘটনাগুলোই যেন চরিত্রের একটি দিক খুলে দেয়। নোংরা ময়লা নিয়ে ওর মনে একটা রুগ্ন ভয় আছে। একটা গা ঘিনঘিন ভাব। এই বয়সেই যে কতবার অন্তর্বাস বদলায় তার ইয়ত্তা নেই। যখন ইস্কুলে পড়তো দিনে যে কত-বার হাতমুখ ধুতো কে জানে। ছুঁচিবাই বলে ওর নাম হয়ে গিয়েছিল তখন। তারপর যখন ডাক্তারি পড়তে এল তখন পোকামাকড় নিয়ে ওর ছুঁইছুঁই ভাবটা এত বেড়ে গেল যে সবাই ঠাট্টা তামাসা করা শুরু করলো। রীতিমত মারাত্মক ঠাট্টা সেসব। হয়ত বিছানার চাদরের মধ্যে কেউ এক দল আরশোলা ঢুকিয়ে দিল। কিংবা মাকড়সার একটা গোটা সংসার রেখে এল তার যন্ত্রপাতির বাক্সের মধ্যে। তখন চেষ্টা করেও ছেলের মন থেকে এই ভয়ত্রাস সরাতে পারে নি আর্থার। আজ তার ছেলের কথা শুনে মনে হচ্ছিল আনন্দ নগরের ঈশ্বর ছেলেকে গুণ করেছে। এত তাড়াতাড়ি কি করে সে নিজেকে তৈরি করে নিল সেটাই বুঝতে চাইছিল আর্থার। ছেলের কথা শুনতে শুনতে সে জিজ্ঞেস করলো, 'প্রথম যখন এলি তখন 'এই আঁস্তাকুড় থেকে ছুটে পালাতে চাস নি?'

'নিশ্চয় চেয়েছিলুম। কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়! পায়ে পায়ে বাধা। তবে পালাতে চেয়েছিলুম কারণ কোভালস্কী আমায় দারুণ বিপদে ফেলে দিয়েছিল। ওর এক বন্ধুর অন্তঃসত্ত্বা বউয়ের বাচ্চা হবার সময় ডাক্তার হিসেবে আমাকে জড়িয়ে দেয়। সে যে কি সংকট নিশ্চয় তা অনুমান করতে পার। আমার মুখের চেহারাটা তখন কেমন হয়েছিল তা তোমার দেখা দরকার ছিল। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ অবস্থা আমার গেছে।'

এই বলে ম্যাক্স তার বিচিত্র এবং শ্বাসরোধকারী অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলো একে একে বলতে লাগলো বাবার কাছে। বস্তির মধ্যে সেই শরীর জ্বালানো তাত,

অলৌকিক কিছু পাবার আশায় দলে দলে মুমূর্ষু মানুষদের মিছিল করে তার ঘরে ঢোকা, ধাঙড় ধর্মঘটের দরুন সারা বস্তিটা নালার পচা জলে ডুবুডুবু হয়ে যাওয়া, কালবোশেখী ঝড়ের তাণ্ডব, বন্যার মতন বর্ষার জলে থৈ থৈ বস্তির ঘর-দোর, মাঝ রাত্তিরে ঘরে ঢুকে ভয় দেখিয়ে ছিনতাই, কাঁকড়া বিছের কামড়, নোংরা পচা জলের এঁদো পুকুরে ডুবে গিয়ে মরণাপন্ন হওয়া—ঘটনাগুলো তার জীবনের এক মহার্ঘ্য সঞ্চয় যেন। শেষমেশ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের ওপর দাঁড়ি টেনে ম্যাক্স বললো, 'সেই প্রথম দিন থেকেই আনন্দ নগর আমার জন্যে থরে থরে মায়ার ডালি সাজিয়ে রেখেছিল। তাই যা ঘটবার তাই ঘটেছে। আমি ক্ষতবিক্ষত হয়েছি থাকতে থাকতে। পালিয়ে বেড়িয়েছি। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ছুটে চলে এসেছি। কিন্তু দু-তিনদিন থাকতে না থাকতেই সেই মায়াবিনীর টানে আবার ফিরে গেছি বস্তির ঘরকন্নায়।'

ইতিমধ্যে গরম খাদ্যবস্তু নিয়ে এল ওয়েটার। অনেকগুলো প্লেটের ওপর রসন তৃপ্তিকর খাবারদাবার। গরম গরম ভোজ্যবস্তু থেকে ভুরভুর করে সুগন্ধী মসলার গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রায় পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে আছে রান্না করা পাটকিলে রঙের মাংস। মাংসের রঙ দেখেই আর্থারের মুখখানা ভয়ে সিঁটিয়ে উঠলো যেন। বাপের ভয় পাওয়া মুখের চেহারা দেখে মনে মনে বেশ মজা পেল ম্যাক্স। বললো, 'ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

আর্থার নিরুত্তর। ম্যাক্স বললো, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই বাবা। রঙটা পাঞ্জাবী ঘরানার রন্ধনরীতির একটা বিশেষত্ব। এর পাকপ্রণালীটা বললেই তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। প্রথমে মাংসের টুকরোগুলো টক দইয়ের মধ্যে সবরকম মসলা দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর হলুদ এবং লঙ্কাবাটা দিয়ে ভাল করে কষা হয়। ওই কারণেই রঙটা অমন পাটকিলে। শেষে তন্দুর উনোনের মধ্যে মাংসটা ভাল করে সেদ্ধ করে নেওয়া হয়। একটু চেখে দেখ! দারুণ টেস্ট!'

ছেলের মুখে মাংস রান্নার তারিফ শুনেই বোধহয় বাপের লোভ হলো। কিন্তু এক টুকরো মাংস মুখে দিতেই আর্থারের ফর্সা গালদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠলো। গা জ্বলছে ঝাল এবং গরমে। মানুষটার অবস্থা দেখে বোধহয় করুণা হলো ছেলের। জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু যেন বলতে চাইছে আর্থার। ম্যাক্স বুঝলো বাবা শ্যাম্পেন চাইছে। তাড়াতাড়ি বাপের গেলাস ভর্তি করতেই ঢকঢক করে সেটা গিলে ফেললো আর্থার। ম্যাক্স ততক্ষণে খানকয়েক নাণ্‌রুটি আনিয়ে নিয়েছে। বেশ কয়েকটা নান্ চিবোবার পর একটু যেন ধাতস্থ হলো আর্থার। নিঃশব্দে আরও একটা নান্ হাতে নিয়ে আর্থার এরপর সরাসরি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললো, 'ধর্, আমি যদি তোদের এই আনন্দ নগর বস্তিটা কিনে নিই?'

ম্যাক্স তখন মন দিয়ে কচি চিকেনের হাড় চিবোচ্ছিল। বাপের কথায় চমকে উঠলো সে। বললো, 'তার মানে? পুরো বস্তিটা?'

'নিশ্চয়ই!' একটু থেমে আর্থার বললো, 'ঘরবাড়ি ভেঙে ধূলিসাৎ করে নতুন ঘরদোর বানিয়ে দেব ওখানে। কলের জল, ইলেকট্রিক আলোপাখা, টিভি—সব ব্যবস্থা থাকবে। যারা এখন আছে তারাই থাকবে। শুধু ঘরের চেহারাটা বদলে যাবে। ঘুপচি অন্ধকার বস্তিঘরের বদলে আলো বাতাসওলা পাকা ঘর হবে। কেমন হয় তাহলে? ভাল না? তোর কি মনে হয়?'

ম্যাক্স ধীরে ধীরে শ্যাম্পেনের গেলাস শেষ করলো। একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে

তাকে। খানিক পরে বললো, 'আইডিয়াটা দারুণ! কিন্তু অসুবিধেও অনেক।'

'যেমন?'

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ম্যাক্স বললো, 'এটা কলকাতা। দক্ষিণ মিয়ামি নয়। এ শহরে অমন এক প্রস্তাব কার্যকর করা মুশকিল।'

আর্থার কিন্তু কোন আমলই দিল না ছেলের কথার। জোর দিয়ে বললো, 'ঠিক মতন দাম দিলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যা খুশি করা যায়।'

ম্যাক্স ঘাড় নেড়ে বললো, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু বাবা, এখানকার অসুবিধেটাও একটু অন্যরকম। টাকাই এখানে সব নয়। অন্য ব্যাপারও আছে।'

'যেমন? খুলে বল!'

'প্রথম অসুবিধে হলো যে এদেশে বিদেশীরা কোন স্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারে না। আইনে আটকাবে। এ আইন খুবই পুরনো এবং এককালে বিদেশী শাসক ইংরেজরাও এই নিষেধ মানতে বাধ্য হয়েছিল।'

আর্থার মুখ মুচকে হাসলো। ছেলের অনভিজ্ঞতা দেখে তার কৌতুক হলো। শূন্যে হাতখানা নাড়িয়েই যেন ছেলের আপত্তিটা উড়িতে দিতে চাইল সে। বললো, 'ওটা কোন অসুবিধেই নয়। কেনার ইচ্ছে থাকলে এদেশী লোকের নামেই স্থাবর সম্পত্তি কেনা যায়। আমিও তাই করবো। ওরাই আমার নামে বস্তিটা কিনে নেবে। আসল কথা হলো শেষটুকু সম্পন্ন করা। মানুষ ফলটাই দেখে। অন্য কিছু নয়। তাই না?'

আর্থার তখন দারুণ উত্তেজিত। ঝাঁঝাল মসলাদার রান্না, না আনন্দ নগর প্রথম দেখার উদ্বেগ—কোনটা যে আসল কারণ তা বুঝলো না ম্যাক্স। মোটকথা সার্জন আর্থার লোয়েবকে তখন যথেষ্ট উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সেই উত্তেজিত অবস্থাতেই সে বললো, 'অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কার্যক্রম দিয়ে অনুন্নত দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করা যায় না ম্যাক্স। কথাটা আমার নয়। ইউনাইটেড্ নেশন্স্-এর মতন আন্তর্জাতিক সংগঠনও এ কথা স্বীকার করে। শুধু টাকা ছড়িয়ে কোনো দেশকে ভিখিরী করা যায় কিন্তু বড় করা যায় না। বরং এই ধরনের সাহায্য বা এইড্ দিয়ে কাজ করলে সাফল্য অনেক ব্যাপক হয় এবং এর ফলটাও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।' ম্যাক্স হয়ত অস্বীকার করে না। তবুও তার মনে হলো এতে 'কিন্তু'র একটা বড় ভূমিকা আছে। ওর চোখের সামনে তখন সরকারীবাবুদের হতভম্ব মুখগুলো ভেসে উঠেছে। একজন আমেরিকান সাহেব কলকাতার বস্তি কিনতে চায় শুনলে না জানি কেমন হতবুদ্ধি হয়ে যাবে লোকগুলো। হয়ত প্রাণপণ চেষ্টা করবে যাতে তেমন অঘটন না ঘটে। তবে এহ বাহ্য! সবচেয়ে বড় আপত্তিটা অন্য জায়গায়। যবে থেকে ম্যাক্স এই তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দারিদ্র্যর মধ্যে ডুবে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করছে, তবে থেকে তার অনেক ঝকঝকে ধারণা বদলে গেছে। এখন সে বেশ বুঝতে পারে যে দারিদ্র্য থেকে যে সমস্যা তৈরি হয়, তার সমাধান ধরাবাঁধা রাস্তায় আসে না। বাবাকেও সেই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। সে বললো, 'শোন বাবা! যখন প্রথম আমি বস্তিতে কাজ করতে যাই, তখনই আমার সঙ্গে একমত হয়েছিল কোভালস্কী। অবশ্য মতটা একজন ব্রাজিলিয়ান আর্চবিশপের। ও'র দেশের গরিবদের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে কাজ করতে গিয়েই এই ধারণা হয়। ও'র মতে বাইরে থেকে সাহায্য দিয়ে বা উদারতা দেখিয়ে গরিবদের অবস্থার উন্নতি করা যায় না। এতে ওরা আরও পরনির্ভর হয়ে ওঠে। যতক্ষণ দারিদ্র্যের শিকড় থাকবে, ততক্ষণ

এসবই পণ্ডশ্রম। আসল কথা হলো শিকড়টা উপড়ে ফেলার মতন কার্যক্রম করা। সেটি না হওয়া অব্দি কিছুই কিছু নয়।'

ম্যাক্স চুপ করতে আর্থার বললো, 'তার মানে কি এই যে কাউকে নোংরা অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাল ঘরদোরে আশ্রয় দেওয়া যাবে না? আর যদি কেউ সে চেষ্টা করে তবে সেটার কি কোন দাম নেই?'

ম্যাক্স খুব দুঃখিত হলো যে তার বাবা তাকে ভুল বুঝছে। কিন্তু এটা যে বাস্তবসত্য তা কেমন করে বোঝাবে সে? বিস্ময়কর এক সত্য সে আবিষ্কার করেছে। শেষমেশ সেই কথাটাই সে বোঝাতে চেষ্টা করলো। ম্যাক্স বললো, 'বাবা! বস্তিতে কাজ করতে গিয়ে আমার যেন নতুন আত্মদর্শন হয়েছে। একটা অদ্ভুত বাস্তবসত্য আমি আবিষ্কার করেছি। বস্তির গরিবদের যারা শোষণ করে তারা তবু ভাল। কারণ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায়। কিন্তু ভালমানুষি দেখিয়ে সান্টা ক্লজের মতন যারা গরিবদের দানখয়রাত করে তারাই গরিবদের শত্রু। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তারা ওদের নির্জীব করে রাখে। ফলে ফোঁস করতেও ভুলে যায় গরিবরা।'

ছেলের কথাগুলো ঠিকমতন বুঝতে বেশ ক'টা দিন সময় লাগলো আর্থারের। আর্থার নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে। 'রোজ সকালে ট্যাক্সি চড়ে আমি বস্তিতে যেতাম ম্যাক্সকে সাহায্য করতে। তখনই কয়েক শ' মানুষ ডাক্তারখানার সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে। ভোর থেকেই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ আগের রাত থেকেও। আমি যেতেই বন্দনা নামে সেই হাসিখুশি মেয়েটা ঘরের কোণে একটা জায়গা পরিষ্কার করে দেয়। তারপর সেই-ই রুগীদের বেছে বেছে আলাদা করে। মেয়েটার রোগ চেনার ক্ষমতা আছে। যেগুলো কঠিন কেস্ এবং আমার দেখা দরকার, বেছে বেছে তাদের আমার সামনে আনে। এই লোকগুলোর তখন প্রায় শেষ অবস্থা। বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। ওদের দেখতাম আর আশ্চর্য হতাম। এই ভাঙা-চোরা জরাজীর্ণ শরীরগুলো ওরা বয়ে বেড়াচ্ছে কি করে? আমার সারা জীবনে এমন চরম অবস্থার রোগীদের আগে দেখিনি। মানুষের কাঠামোয় এরা যেন এক একজন ছায়া শরীর। আমার ডাক্তারি চোখে ওরা কেউ জ্যান্ত নয়। অনেক আগেই মরে গেছে। এখন ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমারই ভুল। ওরা দিব্যি জলজ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, জ্যান্ত মানুষের মতন নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, হাসি-ঠাট্টা করছে। বস্তির এই অবারিত জীবনধারার স্রোতে সত্যিই মৃত্যু যেন কাছে ঘেঁষতে পারে না।'

এইভাবে প্রতিদিন বস্তির মানুষের চরমতম দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করতে গিয়ে আর্থার লোয়েব যেন বুঝতে পারলো ওদের ঠিক কেমন সাহায্য দরকার। 'বস্তিটা ভেঙে কয়েক হাজার ডলার খরচ করে সেখানে নতুন ইমারত গড়তে চেয়েছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল ওদের জীবনধারণের জন্য যা যা দরকার সব আমি দিতে পারি। কিন্তু বাইরের উপকরণ নয়। ওদের দরকার প্রতিদিনের খাদ্য-বস্তু বা ভেষজ। হয়ত প্রতিটি রিকেটি বাচ্চাদের জন্যে ছটাকখানেক দুধ কিংবা হাজার হাজার যক্ষ্মারোগীদের জন্যে কয়েক পেটি ভ্যাক্সিন্। বন্দনা আর ম্যাক্সের মিলিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিটাই আমার কাছে এক মৌল সত্য হয়ে তখন দেখা দিল। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, যথার্থ একাত্মবোধ টিকে আছে একেবারে

নিচের তলায়। নিটোল একটুকরো হাসি দিয়ে যা পাওয়া যায় পৃথিবীর সব ডলার দিয়েও তা কেনা যায় না।'

হ্যাঁ, ঠিক তাই। স্নিগ্ধ, সরল একটুকরো হাসির দাম অনেক! প্রতি বুধবার সকালে একটা মিনিবাস ভাড়া করে বন্দনা, মার্গারেটা আর ম্যাক্স যেন কোথায় যেত। ওদের সঙ্গে থাকতো দশ-বারোজন রিকেটি বাচ্চা। নানারকম শারীরিক বিকলতায় বাচ্চাগুলো ভুগছে। পক্ষাঘাতে কারও হাত পা পড়ে গেছে। কারও বা হাড়গোড়ের ব্যাধি। অনেক বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের মায়েরাও থাকে। একটা বুধবার দিন ওরা আর্থারকেও সঙ্গে নিল। হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে কলকাতার ট্র্যাফিক জট ছাড়িয়ে মিনিবাসটা যেখানে এসে থামলো সে রাস্তার নাম সার্কাস এ্যাভেনিউ। ৫০ নম্বর ঠিকানার দোতলা বাড়িটা পুরনো, ভাঙাচোরা। বাড়ির গায়ে সাদামাটা একটা বোর্ড টাঙানো আছে। বোর্ডের গায়ে লেখা এস্‌ট্রিড ডেন্‌ ক্লিনিক, দোতলা। দোতলার পুরো হলঘরটা নিয়ে এই ক্লিনিক। দোতলায় উঠে আর্থার রীতিমত আহত হলো ক্লিনিকের চেহারা দেখে। হলঘরের মেঝে ও দেওয়ালগুলো যেন ধুলো ময়লায় থিকথিক করছে। এমন কি ঘরের আলোও অপ্রচুর। হলঘরের মাঝখানে দুটো বড় বড় টেবিল পাতা আছে। মার্কিন অধ্যাপক সার্জন লোয়েব তখন রীতি-মত হতবাক। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। এর নাম ক্লিনিক? হাঁ করে সে তখন তাকিয়ে রইল ধুলো ময়লা ভরা টেবিল দুটোর দিকে। কিন্তু খানিক পরেই সে যা দেখলো তা যেন চিকিৎসাশাস্ত্রের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়ে রইল তার জীবনে।

বাচ্চাদের যথাস্থানে রাখার পর হলঘরের মধ্যে ক্লিনিকের কর্ত্রী এলেন। কর্ত্রী নয়, তিনি যেন এখানকার মা জননী। প্রায় থুনথুনে এক বুড়ি। ছোট্ট একহারা চেহারা। বয়সের ভারে শরীরটা সামান্য নোয়ানো। মাথায় চুল নেই বললেই হয়। চেহারা বা ব্যক্তিত্বে কোথাও কোন অসাধারণত্ব নেই। কিন্তু প্রৌঢ় আর্থারকে যা স্পর্শ করলো তা ওঁর মুখের ঝলমলে হাসিটি। সদা প্রফুল্ল মুখখানি মাখামাখি হয়ে আছে স্নিগ্ধ সরল হাসির কিরণে। কি দারুণ মমতা ওই হাসামাখা শীর্ণ মুখ-খানি ঘিরে! কোন্‌ আলোতে তাঁর প্রাণের প্রদীপটি জ্বালানো কে জানে! কিন্তু আশা ও প্রাণের স্পর্শে ওই হাসি যেন বাঙ্ময়। আর্থার লোয়েবের মনে হচ্ছিল যেন শুধু হাসির দ্যুতি দিয়েই পৃথিবীর যাবতীয় কদাকার আবর্জনা ঝলমলে বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। যথার্থই এ যেন এক পবিত্র প্রেরণা।

বিরাশি বছরের এস্‌ট্রিড ডেন্‌ চিকিৎসা জগতে এক বিরল সম্পদ। অথচ সাদা শাড়ি পরা এই মহীয়সী নারী চিকিৎসক নন, শল্যবিদ নন, অস্থিবিশারদও নন। লণ্ডন শহরে প্রায় চল্লিশ বছর এই ক্লিনিক চালাবার পর এই মহীয়সী মহিলা জীবনের গোধূলিবেলায় কলকাতায় চলে আসেন। যতদিন লণ্ডন শহরে ছিলেন সবাই তাঁকে একডাকে চিনতো। সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন ইত্যাদি সব প্রচার মাধ্যমেই তাঁর ভূরি ভূরি প্রচার হয়েছে। দীর্ঘ কৃশ হাতদুখানির ছোঁয়ায় যে কি মধুর উষ্ণতা ছিল কে জানে। কিন্তু তাঁর করস্পর্শে পীড়িত মানুষগুলো যেন পরম সান্ত্বনা পেত। তাঁর প্রসন্ন কণ্ঠস্বর আর স্নিগ্ধ হাসির দীপ্তি রুগ্ন মানুষের রোগতাপের জ্বালা জুড়িয়ে দিত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাঁর কাছে যাদের পাঠাত, তাদের নিরাময়ের কোনো আশা ভরসা থাকতো না। কিন্তু মজার কথা, এস্‌ট্রিড ডেনের আরোগ্যশালায় এসে তারা সবাই আরোগ্যলাভ করতো। অলৌকিক এবং

বিস্ময়কর দর্টি হাতের ছোঁয়ায় যেন জাদ্ব ছিল। সারা ইংল্যান্ডের মানর্ষই জানতো যে এস্‌ট্রিড ডেন্‌ যেন দেবদ্তৃ-সদৃশ। অতঃপর জীবন-সায়াহ্নে এসে তিনি মনস্থির করলেন যে গরিবের সেবা করবেন এবং তাদের স্বার্থেই এই জীবন উৎসর্গ করবেন। তাই শেষমেশ কলকাতায় এলেন এবং সার্কাস এ্যাভেনিউয়ের এই ভাঙাচোরা বাড়িটায় তাঁর ক্লিনিকটি প্রতিষ্ঠা করলেন। রোজ সকালে কয়েকজন যুবতী স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় এই ক্লিনিকে কলকাতার গরিব প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা করতেন তিনি এবং সেই সূত্রেই ম্যাক্সের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়।

বন্দনা এবং মার্গারেটা প্রথম টেবিলে যাকে শোয়ালো সে বাচ্চাটার বয়স পাঁচ কি ছয়। রোগা টিকটিকির মতন চেহারা। সারা শরীর নির্জীব। কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। একেবারে একটা জড়পিণ্ড যেন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এখনই মরে গেছে বাচ্চাটা। তাই শরীরটা এখনও তাজা রয়েছে। ছেলেটার নাম সুভাষ। পোলিও রোগে ছেলেটার হাত পা পড়ে গেছে। কাল রাত্তিরে বাচ্চাটাকে ওর মা ম্যাক্সের টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে মিনতি করে বললো, 'ছায়েব, ওকে আপুনি লয়ে যান! মা হয়ে আমি ত অর জন্য কিছু করলাম না!' মায়ের সেই করুণ আক্ষেপ ম্যাক্সের হৃদয় তোলপাড় করে দিয়েছিল। ছেলেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে সুভাষের মাকে ম্যাক্স বললো, 'ওকে কাল সকালেই এখানে নিয়ে আসুন। ওকে আমরা আর এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

সুভাষকে টেবিলে শোয়ানোর পর বৃদ্ধা এস্‌ট্রিড ডেন্‌ তার গায়ে বুকে হাত বোলাতে লাগলেন। প্রথমে গায়ে বুকে তারপর ক্রমশ তার শুকনো উরুদেশ অব্দি। আর্থার তাকিয়েছিল বৃদ্ধার মুখের দিকে। তাঁর মুখ চোখ এবং টোল খাওয়া গালের ওপর তখন ধীরে ধীরে প্রতিভাত হচ্ছে স্বর্গীয় হাসির দ্যুতি। দেখতে দেখতে তাঁর সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লো সেই হাসির কিরণ। হাসির দীপ্তি তখন বাচ্চাকেও অনুপ্রাণিত করেছে। সেও হাসছে। তার নিষ্প্রাণ চোখ দুটি হাসির দীপ্তিতে ঝলমল করছে। অবিশ্বাস্য হলেও অতি মধুর সে দৃশ্য। এরপর শুরু হলো বিস্ময়কর চিকিৎসাপদ্ধতি। বাচ্চার অবশ নির্জীব শরীরের ওপর দিয়ে বৃদ্ধার হাত যেন নাচের তালে তালে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শিরা, পেশী এবং অস্থির ওপর দিয়ে বৃদ্ধার শীর্ণ হাতখানা তখন যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল শরীরের নিষ্প্রাণ জায়গাটা। আর্থারের মনে হচ্ছিল বাচ্চার পড়ে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোধহয় সম্পূর্ণ মরে যায়নি। বৃদ্ধা এস্‌ট্রিড ডেন্‌ যেন বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে সেই স্পন্দনটিই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যেন দুটি প্রাণে সাড়া তুলে নিজেকেই প্রশ্ন করছেন। খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেনর উত্তর। কেন কেন ওই অবোধ বাচ্চার দেহকোষে এই ক্ষয়? কেন মরে গেছে ওর স্নায়ুমণ্ডল? কি এর কারণ? এ কি কোনো শারীরিক বিকলতা না অপুষ্টিজনিত ক্ষয়? শারীরযন্ত্রের এক বিশেষ স্থানটিই যেন অনুভূতিহীন। কিন্তু কেন এই বিকৃতি? আর্থার দেখলো যেন বারে বারেই বৃদ্ধার হাত খুঁজে খুঁজে ফিরছে সেই অবশ ইন্দ্রিয়টি। বৃদ্ধার হাতটি যেন পথনির্দেশ করছিল ওঁর ছাত্রীদের হাতগুলিকে। তারাও খুঁজছে কোথায় লুকিয়ে আছে অবশ ইন্দ্রিয়। এইভাবে বাচ্চার সারা শরীরের অবশাঙ্গের একটা পরিপূর্ণ চিত্র নেওয়া হলো যেন। গণনকাজ শেষ হবার পরের আধঘণ্টা ধরে চললো সেই অলৌকিক চিকিৎসাপ্রকরণ। বৃদ্ধা তাঁর পেলব হাতের ছোঁয়ায় বাচ্চার সংবেদনশীল অসাড় নির্জীব অঙ্গের ওপর মাসাজ করছেন। যেন তার নিভে যাওয়া অসাড় চেতনা উদ্দীপ্ত করতে

চাইছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই। আর্থার লোয়েবের মনে নানা সন্দেহ। এ ত অলৌকিক? কিন্তু তার মনে হলো যেন ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বাচ্চার নিষ্প্রাণ অঙ্গে। যেন প্রাণশক্তির স্ফুরণ হচ্ছে তার অবশাঙ্গে। আর্থার তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মনে হলো বৃদ্ধার হাতের ছোঁয়া পেয়ে সুভাষের মরাপ্রাণে বান ডাকবে। মাসাজরত বৃদ্ধার হাত যেন প্রাণের গোপনে প্রতিধ্বনি তুলেছে। যেন বলছে, 'সুভাষ! তুমি জাগো! তুমি ওঠো সুভাষ! তুমি ভাল হয়ে গেছ সুভাষ!' বৃদ্ধা এস্‌ট্রিড ডেনের ঠিক পেছনেই মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে আছে সুভাষের মা। উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে ছেলের নির্জীব শরীরটার দিকে। সবাই ঠায় তাকিয়ে আছে ওই জড়পিণ্ডের দিকে। সবাই দেখছে সুভাষের শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া হলো কি না। নিশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে আছে সবাই। দেখছে বিদেশী পিতাপুত্রও। ঘরের মধ্যে থমথম করছে নিঃশব্দতা। বাচ্চার শরীরের শুকনো চামড়ার গায়ে বৃদ্ধার হাত বুলানোর চাপা খসখস শব্দ ছাড়া ঘরের আর কোথাও অন্য শব্দ ছিল না।

কিন্তু অলৌকিক কিছু ঘটলো না। পঙ্গু ছেলেটা হঠাৎ হাত পা নেড়ে উঠে বসলো না। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়েও পড়লো না। কিন্তু যা ঘটলো তাও এক বিস্ময়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক অসাধারণ ঘটনা। পিতাপুত্র দুজনেই স্তম্ভিত, কিছুটা অনুপ্রাণিত। এ দৃশ্য যেন অকল্পনীয়। হঠাৎ যেন সুভাষের মরা শরীরে দোলা উঠলো। বেশ কয়েকবার স্পন্দন উঠলো তার শরীরে। তারপর একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেল ওর নির্জীব শরীরটা। সবাই অবাক হয়ে দেখলো সুভাষ তার ডান হাতখানা নাড়াচ্ছে। অসাড় হয়ে পড়া হাতখানা সে বাঁদিকে নিয়ে গেল। তারপর বাঁ হাতেও যেন উদ্দীপন সঞ্চারিত হলো। বাঁ হাতখানাও সে ডান দিকে নিয়ে গেল। চিবুকের সঙ্গে আটকে থাকা মাথাটাও সে তখন ধীরে ধীরে নাড়াতে পারছে। কি আশ্চর্য! এতদিন প্রায় বল্টুআঁটা হয়ে ছিল বাচ্চাটার হেঁটমুণ্ড। সেখানেও প্রাণের ছোঁয়া এসেছে। শুধু সেখানে নয়, আর্থারের মনে হলো প্রাণস্পন্দন এসেছে বাচ্চার প্রতিটি অসাড় অঙ্গে। ভীরু পায়ে প্রাণ ফিরে আসছে ওই অবশ শরীরে। অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ আসছে। ওই বৃদ্ধার করস্পর্শের মোহিনী শক্তিতেই প্রাণ এল সুভাষের শরীরে। বাচ্চার মরে যাওয়া অবশাঙ্গ আবার পুনর্জীবিত হলো। প্রাণের উদ্দীপন হলো বাচ্চার স্নায়ুমণ্ডলে। তবে এটা শুরুমাত্র। সুভাষের রোগমুক্তির প্রথম পদক্ষেপ। সম্পূর্ণ নিরাময় হতে আরও পথ হাঁটতে হবে তাকে। তা হ'ক! তবুও এই সফলতা নতুন করে আশার বাণী শোনাল বিভীষিকাময় কলকাতার হতাশ মানুষকে। আর্থার লোয়েব আজ ধন্য হলো এই মুমূর্ষু শহরে এসে। মরে যাওয়া কলকাতা তাকে যেন নতুন করে শেখাল যে জীবন সুন্দর, জীবন মহান।

চৌষট্টি

সারা পরিবারটাকে বস্তির কম্পাউণ্ডে ঢুকতে দেখে কোভালস্কীর মনে হলো ওদের যেন কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো যেন একপাল ছাগল। সবার আগে পরিবারের কর্তা। দেশলাই কাঠির মতন সরু সরু পায়ের গোছের ওপর ধুতিটা তুলে পরা। লোকটার মাথায় একটা ঝুড়ি। ঝুড়ির মধ্যে গেরস্থালির

যাবতীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র। উনোন, বালতি, মাটির ঘড়া, কিছু বাসনকোসন আর পুরনো খবরের কাগজ মোড়া কিছু ভদ্র শৌখিন জামাকাপড়। রোগা শীর্ণ চেহারার মানুষটার পুরুষ্টু গোঁফজোড়া দুপাশ থেকে ঝুলে আছে। মাথাভর্তি ঘন কোঁচকান চুল, খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে বলিরেখাবহুল মুখখানি ঢাকা। ওর চালচলন হাবভাবে একটা বিশেষ ত্রস্ততা আছে। যার দরুন ওকে বয়সের তুলনায় বেশ বুড়ো দেখায়। মানুষটার ঠিক পেছনেই মাথায় ঘোমটা টানা একজন স্ত্রীলোক। মহিলার পায়ে পায়ে যেন লজ্জা জড়িয়ে আছে। মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে সে। কমলা রঙের একটা শাড়ি পরা স্ত্রীলোকটির গায়ের রঙ শ্যামলা। ওর কাঁখে একটা বাচ্চা। মনে হয় পরিবারের সর্বশেষ আগন্তুক। বাচ্চাটা বেশ স্বাস্থ্যবান। চুলবুলে। একমাথা নরম কোঁচকান চুল। লাইনের সবশেষে আসছে একজন বছর ষোলো বয়সের তন্বী কিশোরী। মাথার দুপাশ দিয়ে ঝুলছে দুটো লম্বা বেণি। মেয়েটির পাশাপাশি হাঁটছে বছর বার এবং চোদ্দ বছরের দুজন কিশোর। ওরা সবাই মাথা হেঁট করে হাঁটছে। ওদের হাবভাবে একটা ভয়ত্রস্ত ভাব। আর এই ছবিটা দেখেই কোভালস্কীর মনে হলো মানুষগুলোকে জবাই করার জন্যে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার মানিক উঠোনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল ওদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। এ বাজারে ঘর পাওয়া যেন ট্রোফি জেতা। গায়ে গতরে অনেক খেটে বস্তির এই ছোট্ট ঘরখানা হাসারির জন্যে জোটাতে পেরেছে সে। যা কষ্টের ধন তাকে যত্ন করতে শিখতে হয়। মানিক তাই ওর ঘরের মেঝেতে আলপনা আঁকিয়েছে। দেখতে দেখতে বস্তির আরও অনেকে জড়ো হলো ওদের ঘিরে। সবাইকে দেখে হাসারিরা হতবাক। মানিক সকলের সঙ্গে একে একে আলাপ করিয়ে দিল। বস্তির ঠেক্ থেকে কয়েক বোতল চোলাই আনিয়েছে সে। সবার হাতে হাতে ঘুরছে পানীয়র গেলাস। বস্তির যে কর্তা সেও এসেছে দলবলের সঙ্গে। সকলের হয়ে হাসারিদের অভ্যর্থনা করলো সে। হাসারির গেলাসের সঙ্গে তার নিজের গেলাস ঠেকিয়ে যেন ধন্য করে দিল হাসারিকে। বস্তির মানুষদের এই উষ্ণ আতিথেয়তা দেখে হাসারি বাস্তবিক অভিভূত হয়ে গেছে। সে আজ দারুণ খুশী। তার মনে হচ্ছিল ভগবান বোধহয় মুখ তুলে চেয়েছেন। এতদিন ধরে দুঃখকষ্টের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছে সে। এখন সে যথার্থই মুক্ত স্বাধীন। ভগবান হাতখুলে তাকে অনেক কিছু দিলেন। স্বর্গরাজ্যে ঢোকার দোরগুলো হাট করে খুলে দিলেন তিনি।

সেদিন ওদের এই ছোট্ট উৎসবের সর্বশেষ অতিথি হলো কোভালস্কী। এখন থেকে হিজড়াদের মতন আর একজন প্রতিবেশী হলো তার। হাসারি আর বউ ছেলে-মেয়েরাও তার নিকটতম প্রতিবেশী হয়ে পাশের ঘরটিতে ঠাঁই পেয়েছে। অনেক ধাক্কা সইলেও এই ভরদুপুরেও এখন তার পাকস্থলী দু-এক পাত্র এই নির্জলা বিষ হজম করতে পারে। কিন্তু সবাই পারে না। অন্তত একজনের কাছে এই পানীয় যে গরল তা একটু পরেই বোঝা গেল। কোভালস্কীর চোখের সামনেই এটা ঘটলো। এক গেলাস 'বাঙলা' পেটে ঢুকতেই থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটির ওপর বসে পড়লো হাসারি। শরীরে তখন খেঁচুনি শুরু হয়ে গেছে। সবাই ভাবছে কি করবে। কোভালস্কী দেখলো মানুষটার গলা এবং বুকটা কেমন ফুলে ফুলে উঠছে। তার মনে হলো ও বোধহয় বমি করবে। কিন্তু বমি ভাবটা কাটাবার জন্যে চেষ্টা করছে। কোভালস্কী তাড়াতাড়ি হাঁটুমুড়ে ওর পাশে বসে পড়লো। তারপর হাসারির মাথাটা

উ'চু করে তুলে ধরলো যাতে সহজভাবে সে বমি করতে পারে। কিন্তু তখনই বমি হলো না। কোভালস্কী তখন তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে বললো 'বমি করবে? তাই করো। বিষটা বেরিয়ে যাক!'

কোভালস্কী দেখলো এবার মানুষটা ঠোঁটদুটো অল্প খুলেছে। মনে হলো বমি করতে চাইছে তার শরীর। কোভালস্কী তাকে উৎসাহ দিয়ে ফের বললো, 'বড়ভাই! বমি পেলে করো। শরীরে আরাম পাবে।' কোভালস্কীর কথা শেষ না হতেই হাসারির গলার মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ উঠলো। মনে হলো একটা কিছু সড়সড় করছে তার গলার মধ্যে। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে সেটা। আর প্রায় সংগে সংগেই পার্টিকুলে রক্তের খানিক গাঁজলা হুড়হুড় করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। বমির রঙ আর চেহারা দেখে বস্তির সব মানুষ থ। এ ত চোলাই নয়! এ ত 'রক্ত'! তাহলে হাসারি নামে তাদের নতুন মানুষটিও লাল ব্যাধির শিকার!

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় যীশুর ছবির সামনে বসে কোভালস্কী যখন ধ্যান করছে তখন পশ্চিম আকাশে সূর্যদেব আড়াল হচ্ছেন। হঠাৎ মোটরগাড়ির হর্নের মতন তীক্ষ্ন শব্দ শুনে কোভালস্কীর মনোযোগ ছি'ড়ে গেল। সারা কম্পাউন্ডটা তখন উনোনের ধোঁয়ায় ভরতি। শব্দটা তার ভারি চেনা। ধড়মড় করে ধ্যান ছেড়ে উঠে পড়লো সে। শাঁখ বাজাচ্ছে হাসারি। তার ছোট্ট ঘরে গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান করছে সে। ঘরের চারকোণে চারটে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে হাসারি শাঁখ বাজালো। হিন্দু গৃহস্থেরা শাঁখ বাজিয়ে মঙ্গলাকাঙ্খী রাত্রিকে আবাহন করে। এই মধুর সংস্কারটি লক্ষ লক্ষ হিন্দুগৃহস্থ নিয়ম করে পালন করে আসছে সেই অনাগত কাল থেকে। কোভালস্কীও মনেপ্রাণে চাইত রোজ সন্ধ্যায় শাঁখের আওয়াজ বস্তির মানুষের কল্যাণ করুক। ইদানীং বস্তির ভগবানের কানে গরিবের দুঃখকষ্টের কথা পৌঁছয় না। যদি শঙ্খধ্বনি হয় তবে হয়ত তিনি শুনবেন।

একজন ক্ষয়রোগীকে পাশে নিয়ে শোওয়ার চেয়ে হিজড়াদের পাশে শোওয়াও যে অনেক বাঞ্ছনীয় কোভালস্কী তা জানে। কিন্তু তবুও হাসারি আর বড় ছেলেকে তার ঘরের কোলের বারান্দায় ঠেসাঠেসি করে নিজের পাশে জায়গা করে দিল কোভালস্কী। জ্যষ্ঠি মাস। থমথম করছে দুঃসহ গরম। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কোথাও একটা পাতাও নড়ছে না। সে জানে বন্ধ ঘরে কোনো মানুষের পক্ষেই নিশ্চিন্তে ঘুমনো সম্ভব নয়। কিন্তু বারান্দায় শুয়েও সে রাতটা তার বিনিদ্রই কাটলো। পাশে শুয়ে হাপরের মতন শ্বাস টানছে হাসারি। তাও সওয়া যায়। কিন্তু সবে তন্দ্রা এসেছে এমন সময় চাপা ফিসফিস স্বরে হাসারি বললো, 'স্তেফান-দাদা! ঘুমোলেন?'

তখন বেশ রাত। সারা পৃথিবী ঘুমচ্ছে। কোথাও কোন শব্দ ছিল না। হাসারি ফিসফিস করে বললো, 'স্তেফানদাদা! আমার কিছু কতা আছে। শুনবেন?'

কোভালস্কীর জীবনে এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। বস্তির অনেক মানুষই বিশ্বাস করে তাকে মনের কথা বলে। ওরা সবাই তাকে বিশ্বাস করে, তাই মনের কথা বলে। তার ওপর মানুষগুলোর অনেক ভরসা। সুতরাং কোভালস্কী মোটেই অবাক হলো না। বললো, 'বেশ ত! বলো না কি বলবে? আমি শুনছি।'

একটু ইতস্তত করছিল হাসারি। বোধহয় ভাবছে কেমন করে কথাটা পাড়বে। খানিক পরে গভীর স্বরে বললো, 'স্তেফানদাদা! আমি জানি আমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে। আর বেশিদিন চাকা ঘুরবে না।'

কোভালস্কী বুঝতে পারলো ওর মনের অবস্থাটা। মানুষটা যেন বুঝতে পারছে যে এবার ওর কর্মচক্র শেষ হয়ে আসছে। তাই এই খেদ। কোভালস্কী প্রতিবাদ করতে চাইছিল। কিন্তু সে জানে এটা কতবড় বঞ্চনা। সে নিজেও উপলব্ধি করেছে যে সেই ভয়ংকর শেষের দিনটি ওর জীবন থেকে বেশী দূরে নেই। আজই বিকেলে কোভালস্কী তার প্রমাণ পেয়েছে। ম্যাক্স বা আর্থার কেউই বোধহয় এ যাত্রায় ওকে বাঁচাতে পারবে না। হাসারি চুপ করে ছিল। আবার ফিসফিস করে বললো, 'মরতে আমি ডরাই না স্তেফানদাদা। য্যাখন দেশ ছেড়ে এলাম তারপর আমার ওপরে কত ঝড়ঝাপ্টা গ্যাছে। ত্যাখনই জানি...' হাসারি আবার চুপ করলো। কোভালস্কী বুঝতে পারছিল কেন সে ইতস্তত করছে। মানুষ যখন বোঝে তার দিন ফুরিয়ে আসছে তখন নিজের মুখে সে কথা মানতে চায় না। হাসারিরও একই রকম মনের অবস্থা। তবুও কথাটা শেষ করলো হাসারি। বললো, 'ত্যাখনই জানি আমার কর্ম শ্যাষ হয়ে আসছে। এবার যেতে হবে আমায়। তাই যাব। তবে এবার ভাল ঘরে জন্ম নেব। যাতে এত দুঃখকষ্ট না পাই।'

হতভাগ্য মানুষগুলোর ব্যথার জায়গাটা কোভালস্কী ঠিক বুঝতে পারে। দুঃখকষ্টে জর্জরিত এই জীবনটা যখন আর টানতে পারে না, তখনই মনে করে এই কষ্টের জীবন পরের জন্মে আর থাকবে না। বস্তির মানুষদের এইটুকুই সান্ত্বনা। তবে সেদিন রাত্রে হাসারি তাকে নতুন কথা শোনাল। দুই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা তুলে বললো, 'কিন্তু স্তেফানদাদা! আমি যে শান্তিতে মরতে পারবো না!'

হঠাৎ কাশির ধমকে তার গলা বুজে এল। কোনরকমে কাশি চাপলো হাসারি। কোভালস্কী তার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তখন। সারা পৃথিবী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমচ্ছে। ওর আশেপাশে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর নিরুপদ্রব নাক ডাকার আওয়াজ কানে শুনছে সে। অনেক দূর থেকে কোলাহলের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসছিল গানের ভাঙা সুর। কোথাও বোধহয় উৎসব হচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। কোভালস্কীরও অবাক লাগছে। এত গভীর রাতে মানুষটা কি এমন কথা বলতে চায় তাকে? কাল সকাল পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা যেত না? শেষ পর্যন্ত কোভালস্কীর কৌতূহল মিটলো। শ্বাস টেনে টেনে হাসারি বললো, 'মেয়েটার বিয়ে না দিয়ে আমি শান্তিতে মরতে পারবো না স্তেফানদাদা!'

কথাটা বলেই হতাশায় নেতিয়ে পড়লো হাসারি। মানুষটার খেদ যেন ভারতবর্ষের সব মেয়ের বাপের খেদ। বিয়ের যুগ্যি মেয়ের উপযুক্ত বর খোঁজার দুশ্চিন্তা তাই প্রায় সব বাপেরই মন আচ্ছন্ন করে রাখে।

হাসারির মেয়ে অমৃতা সবে ষোলোয় পড়েছে। তবে বছরের পর বছর ফুটপাতে আর বস্তির চালাঘরে থাকবার সময় নিষ্ঠুর দিনগুলো ওর চেহারার লালিত্য একটুও মলিন করতে পারে নি। তাই তার ভরাট মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় যে অমৃতা এখন আর খুকিটি নেই। ভারতীয় সমাজে মেয়েদের ভূমিকাটাই সবচেয়ে অগৌরবের। ঘর গেরস্থালির এমন কোন কাজ নেই যা তারা করে না। সবার আগে তাদের ঘুম থেকে উঠতে হয় এবং সবার শেষে তারা শুতে যায়। তারপর দিনমানের সর্বক্ষণ সংসারের নানা প্রয়োজনকে প্রদক্ষিণ করে তারা। এই প্রাত্যহিকের বৃত্তের চারদিকে দিশেহারার মতন পাক খেতে খেতে সংসারে তারা একটাই ভূমিকা

পালন করে। সেটা হলো সকলের সব ঋণ মেটাবার দায়িত্ব। এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারের শেকল পরা তাদের জীবন। সংসারে সবার দাসী-বাঁদী তারা। মা না হয়েও মায়ের মতন ছোট ছেলেপুলের দায়িত্ব নিতে হয় তাদের। সুতরাং অমৃতার জীবনও এই এক বৃত্তের মধ্যেই পাক খেত। রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা। জীবনের সুরু থেকেই এক চাকাতেই বাঁধা। আঁতুড় থেকেই ভাইবোনের যত্ন নেওয়া, তাদের জন্যে কাঁথা সেলাই করা, হাতপায়ে তেল মালিশ করা, খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা, চুল আঁচড়ে দেওয়া ইত্যাদি সব কাজের দায়িত্ব শুধু অমৃতার। সেই ছেলেবেলা থেকেই অমৃতার মা অদম্য উৎসাহ আর চেষ্টায় অমৃতাকে এই একটা বড় ঘটনার জন্যে তৈরি করে চলেছে। ঘটনাটা হলো তার বিয়ে। সেদিন সে আর দুঃস্থ শিশু থাকবে না, সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। তার সব শিক্ষার লক্ষ্য ওই একটাই। ফুটপাত আর ঝুপড়ির ঘরসংসার থেকেই শুরু হয়েছিল অমৃতার শিক্ষানবিসী। সেখান থেকেই সে শিখেছে কি করে আদর্শ ঘরণী হতে হয়, মা হয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হয়। হাসারি আর তার বউ জানতো যে মেয়েকে ঠিকমতন সহবৎ না শেখালে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের নিন্দে হবে। নিন্দে হবে মেয়ের বাপ-মায়েরও। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই অমৃতাকে নিজস্ব মতামত, ভালমন্দ জ্ঞান ছাড়তে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে শখআহ্লাদ বা আমোদ-প্রমোদ। সে জেনেছে যে হাসিমুখে বাপ-মা এবং ভাইবোনের সেবা করাই তার ব্রত। যখন সে নেহাত বালিকা তখন থেকেই এ দেশের বিয়ের আদর্শ সম্বন্ধে তাকে টনটনে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। তখন থেকেই সে জানে যে মেয়েরা বাপের কেউ নয়। স্বামীর ঘরই তার নিজের ঘর। বাপের ঘর তার আপন ঘর নয়। হাসারিও একদিন কোভালস্কীকে এই কথাটা বলেছিল। অমৃতা তার আপন কেউ নয়। ভগবান তাকে তার কাছে থাকতে দিয়েছেন যতদিন অমৃতার বিয়ে না হচ্ছে। অমৃতার আপনজন একজনই, সে তার বর।

এদেশের সনাতন রীতি অনুযায়ী ঋতুমতী হবার অনেক আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। সুতরাং বাল্যবিবাহ প্রথা পশ্চিমী মানুষের কাছে বর্বরোচিত মনে হলেও এদেশের সংস্কার অনুযায়ী তার যথেষ্ট সমাদর। তবে বাল্যবিবাহ সামান্য একটা অনুষ্ঠান মাত্র। বিয়ের আসল উৎসব হয় কন্যা ঋতুমতী হবার পর। এই সুসংবাদটি বরের বাড়িতে পৌঁছে দেয় কনের বাবা। অর্থাৎ বর-বধূর দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যখন কন্যা সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়। তখন দিনক্ষণ দেখে কনেকে তার পিত্রালয় থেকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয়। সেই থেকে স্বামী-স্ত্রী হয়ে তারা ঘরসংসার করে।

গরিব রিক্সাওলার মেয়ে হবার দরুণ অমৃতা কোনদিনই বাঞ্ছিত কনে হতে পারেনি। তাই সে যখন প্রথম ঋতুমতী হোলো তখনো তার বিয়ে হয়নি। অমৃতা তখন নেহাত বালিকা। বয়স সবে এগারো। তাহলেও নিয়ম অনুযায়ী অমৃতা তখন রজঃস্বলা নারী। সুতরাং জোর করেই ফ্রক ছাড়িয়ে তাকে শাড়ি পরানো হলো। তবে ফুটপাতের সংসারে এ নিয়ে কোন উৎসব হলো না। কেউ জানলোও না সে কথা। শুধু ঋতুকালের প্রথম দিনে অমৃতার মা খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে প্রথম ঋতুস্রাবের রক্ত মুছে আলাদা করে সেটি রেখে দিল। বিয়ের পর অমৃতা কাপড়ে মোড়া রক্ত মাখানো সেই ন্যাকড়াটি নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে যাতে বধূরূপে গর্ভোৎপাদনে সে ধন্য হয়। হাসারির আক্ষেপ হচ্ছিল, যেন তার অকর্মণ্যতার জন্যেই অমৃতার জীবনের অমন গৌরবময় অধ্যায়টি আসছে না। তাই

কালবিলম্ব না করে যে সমস্যাটি সবচেয়ে তীব্র তার সমাধানের কথাই সে ভাবতে বসলো।

তবে ভেবেচিন্তে এসব সমস্যার সমাধান হয় না। হাসারির বাপঠাকুর্দা যা করেছিল, কিংবা এদেশের লক্ষ লক্ষ মেয়ের বাপেরা যে উপায়ে মেয়ের বিয়ের পণের টাকা যোগাড় করে, তাকেও সেইভাবেই এগোতে হবে। যদিও ইন্দিরা গান্ধী একদিন আইন করে এই সার্বিক পণপ্রথা নিষিদ্ধ করে দেন, তা হলেও আধুনিক ভারতবর্ষে এ প্রথা দিব্যি চলছে। বরং আগের চেয়ে নিপীড়নের মাত্রা অনেক বেড়েছে। প্রথাটি আরও নিষ্ঠুর হয়েছে। হাসারির খেদও এই কারণেই। যারা ভাগ্যবিমুখ শুধু তারাই পণ না নিয়ে বিয়েতে সম্মত হয়। যেমন কুটে বা কানা-খোঁড়া বর। কিন্তু না। তেমন বরের সংগে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে চায় না হাসারি। অথচ পণের টাকা সংগ্রহ করাও প্রায় দুঃসাধ্য। সে সবরকম ভাবে হিসেব করে দেখেছে যে শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাড়া অন্য যে কোন সুস্থ বরের জন্যে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা বরপণ তাকে সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় কেউ তার মেয়েকে বিয়ে করবে না। পাঁচ হাজার টাকা! ঠিক তাই। অর্থাৎ পুরো দুটি বছর রিক্সার শকটদণ্ড দুটি হাতে নিয়ে তাকে শহরের পথে পথে সওয়ারি নিয়ে ছুটে বেড়াতে হবে। অন্য পথও আছে। সারা জীবনের জন্যে মহাজনের কাছে ঋণী হয়ে থাকা। কিন্তু তার সারা জীবন? ব্যাধিগ্রস্ত হাসারির জীবনের সময়সীমা তো সীমাবদ্ধ? অন্তঃসারহীন জীবনটি সে কতকাল বইতে পারবে? প্রতিদিন যে মানুষ সূর্যোদয় দেখে সে যে সূর্যাস্তও দেখতে পারবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? অন্তত হাসারি তার জীবনে সেই নিশ্চয়তা আর দেখতে পায় না।

হাসারির মুখে সব কথা শুনে ম্যাক্সের হাতেই তার চিকিৎসার ভার তুলে দিল কোভালস্কী। ঘটা করেই চিকিৎসা শুরু হলো তার। ভিটামিন এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স ভিত্তিক চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল ম্যাক্স। ফলও পেল খুব তাড়াতাড়ি। দেহমধ্যে পুষ্টিকর উপাদানের পরিবর্তনের ফলে চমৎকার সাড়া পাওয়া গেল। ওষুধের চমৎকার ক্রিয়ায় কাশির ধমক অনেক কমে গেল। আগের চেয়ে অনেক অধিক শক্তি সংগ্রহ করলো সে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রিক্সা চালাতে শুরু করলো হাসারি। জষ্ঠির ঠা ঠা রোদ এবং গুমট গরম সত্ত্বেও সে থমকে গেল না। তারপর যখন বর্ষা শুরু হলো, তখনও শক্তিহীন হয়ে পড়লো না হাসারি। অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে কিংবা হাঁটুভর জল ভেঙে যাত্রীদের পারাপার করাল সে। এ সময় দু পয়সা বেশি আয় হয়। কারণ, জলমগ্ন শহরে তখন পারাপারের একমাত্র খেয়া হয় রিক্সা। তবুও অপরিহার্য পাঁচ হাজার টাকা উপার্জনের লক্ষ্যস্থলে সে কি পৌঁছতে পারবে?

ভাগ্যের মোচড়ে আর একটা সমস্যা এল হাসারির জীবনে। নতুন এক প্রতিরোধ -প্রতিকূল ভাগ্য ঠিক এই সময় নাগাদ যেন একজনের হাত ধরে এল। আবার নতুন করে শুরু হলো বিড়ম্বনা। কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা অবৈধ ব্যাবসার আড়কাঠিরা। শকুনের মতন এদের চোখের দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে। সন্ধানী চোখ দিয়ে এরা খুঁজে বেড়াচ্ছে ভাগাড়ের মড়া বা আধমরা মানুষ। হাসারির অশেষ দুর্ভাগ্য। তাই এমনি এক লোলুপ শকুনের সংগে তার হঠাৎ সাক্ষাৎ হলো স্যাস (SAS) এয়ার লাইন আপিসের সামনে। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এই বিমান কোম্পানির আপিসের সামনে সে সবে নামিয়েছে রিক্সাটা। রিক্সার দুজন মহিলা যাত্রীর সংগে দুটো ভারি স্যুটকেশ ছিল। স্যুটকেশ দুটো নামাবার পর হঠাৎ কাশির ধমক

এল। অনেকদিন পর এই ধমক এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত জোরালো কাশির দাপটে শরীরটা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে তখন। ঝড়ের মুখে বাঁশ পাতার মতন থরথর করে কাঁপছে শরীর। কোনরকমে রিক্সার পাদানির ওপর এলিয়ে পড়লো হাসারি। ওর এই অবস্থা দেখে আরও দু-তিনজন রিক্সাওলা তাড়াতাড়ি ছুটে এল। তারপর সবাই মিলে প্রায় অচেতন হাসারিকে ধরাধরি করে গাড়ির সীটের ওপর কোনরকমে শুইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর ঘোরলাগা ভাবটা কমলো। গলার কাছে ডেলার মতন খানিকটা শ্লেষ্মা আটকে আছে। হাসারি জানে ওটা রক্ত। মুখের দুপাশের কষেও রক্ত লেগে আছে। হঠাৎ তার মুখের ওপর বসন্তর দাগধরা একটা লম্বাটে মুখ ভেসে উঠলো। লোকটার দুচোখ ছাপিয়ে উঠেছে মায়া। স্নিগ্ধ স্বরে সে বললো, 'কি বন্ধু! শরীরটায় যুত নেই মনে হচ্ছে?'

হাসারির ভাল লাগলো 'বন্ধু' ডাক শুনে। এই নিষ্ঠুর শহরে কেউ বন্ধুর মতন ব্যবহার করে না। সান্ত্বনার কথা বলে না। তাই মানুষটার নরম কথাগুলো তাকে খুব শান্তি দিল। রক্তলাগা মুখখানা ফতুয়ার খুঁট দিয়ে মুছে সে লোকটার মুখের দিকে চাইল। ওকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে লোকটা ফের বললো, 'আহা! কত কষ্ট তোমার। এই শরীল নিয়ে কি রিক্সা টানা যায়? কাশির ধমকে মাথা ঘুরে যাচ্ছে তো?'

হাসারি হাঁ করে চেয়ে আছে লোকটার দিকে। বলে কি ও? ঠাট্টা করছে নাকি? বললোও সে কথা. 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'না। না। সে কি?' একটু থেমে লোকটা বললো, 'আচ্ছা! দুমাসে তুমি যা রোজগার করবে তা যদি একসঙ্গে পাও তোমার সুবিধে হবে তো? তোমায় রিক্সা টানতে হবে না। শুধু ঘরে বসে বিশ্রাম করবে।'

হাসারি ভাবছিল সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। দুমাসের রোজগারের সব টাকাটা ওর হাতে তুলে দিতে চায় লোকটা। কিন্তু কেন? ওর এত দয়া কেন? ও কি মানুষ না স্বয়ং ভগবান! হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই হাসারির শরীর দিয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই আড়কাঠি। তার মনে পড়লো সেই লোকটার কথা. যার সঙ্গে বড়বাজারের রাস্তায় তার দেখা হয়েছিল। সে লোকটা রক্তচোষা বাদুড়। তার 'শরীল' থেকে অনেক রক্ত বার করে নিয়ে গেছে সেই বদমাসটা। হয়ত এ লোকটাও এসেছে রক্তের লোভে। কিন্তু না। আর সে রক্ত বেচবে না। তাছাড়া তার শরীরের রক্ত পচে গেছে। কোন কাজ হবে না তার রক্তে। সন্দেহটা মনে হতেই লোকটার মুখের দিকে স্পষ্টাস্পষ্টি চেয়ে বললো. 'না। আমি রক্ত বেচবো না। আপনি ভুল লুকের কাচে এয়েচেন গো! তাছাড়া আমার রক্ত পচে গেছে। ও রক্ত শকুনেও ছোঁবে না।'

লোকটা স্থির হয়ে হাসারিকে দেখছিল। হাসারির কথা শেষ হলে বললো. 'রক্ত নয়। আমার চাই এই খাঁচাটা। তোমার শরীলের হাড়পাঁজরাগুলো।' বলে খিক খিক করে হেসে উঠলো সে।

লোকটার কথা শুনে ভয়ে হিম হয়ে গেল হাসারির শরীর। লোকটার কথা শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মনে হলো ছুটে পালাবে। কিন্তু লোকটার চোখে যেন সম্মোহন আছে। হাসারিকে অমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখে লোকটা বললো. 'আমার সঙ্গে চলো মালিকের কাছে। সে তোমার হাড়পাঁজরাগুলো পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে নেবে।' একটু থেমে লোকটা ফের বললো, 'যখন মরে যাবে তখন

এই খাঁচাটার দাম এক কানা কড়িও থাকবে না। খাঁচাটাকে লাথি মেরে দিব্যি উড়ে যাবে আকাশে। তাহলে এত মায়া কিসের? যা পাচ্ছ নিয়ে নাও।'

হাসারি কি বুঝলো কে জানে। তবে শরীরটা শিরশির করছে তার। এই লোক-টাকেই সে বিশ্বাস করেছিল! বন্ধু ভেবেছিল!

লোকটা সত্যিই দালাল। যারা কঙ্কাল বেচে তাদের জন্যে গ্রাহক জুটিয়ে দেয় উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে। বিশ্বের বাজারে নরকঙ্কাল রপ্তানিকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হলো ভারতবর্ষ। বোধহয় এটাই অন্যতম বাণিজ্য যাতে ভারতবর্ষ সেরা। প্রতি বছর অন্তত হাজার কুড়ি আস্ত কঙ্কাল এখান থেকে রপ্তানি হয়। এ ছাড়াও আলাদাভাবে গাঁটবন্দি করে কয়েক লক্ষ অস্থি ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান দেশে চালান যায়। ওই সব দেশের ডাক্তারি স্কুল এবং কলেজগুলোর পঠন-পাঠনের জন্যেই এই অস্থিপঞ্জর পাঠানো হয়। বলাই বাহুল্য যে খুবই লোভনীয় ব্যবসা এটা। বছরে লাভের অঙ্ক কয়েক কোটি টাকা। কলকাতাই হলো এ ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। মোট আটটা কোম্পানি এই পণ্যটি বিদেশে চালান করে। শহরে এদের সকলেরই নিজস্ব আপিসভবন আছে। কলকাতা কাস্টম্স্‌এর সচিবালয়ে এই আটটি কোম্পানির নাম নথিভুক্ত করা আছে। এরা হলো, ফ্যাশিওনো এ্যান্ড কোম্পানি, হিলটন এ্যান্ড কোম্পানি, কৃষ্ণরাজ স্টোরস্‌, আর, বি. এ্যান্ড কোম্পানি। এম, বি, এ্যান্ড কোম্পানি, ভিস্টা এ্যান্ড কোম্পানি, সোরাব এ্যান্ড রেক্‌লাস্‌ লিমিটেড এবং পরিশেষে মিত্র এ্যান্ড কোম্পানি। এই পণ্যটি বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধান লিপিবদ্ধ করা আছে এক্সপোর্ট ম্যানুয়্যালে। ম্যানুয়্যালটির নাম এক্সপোর্ট পলিশি বুক (Export Policy Book)। এই ম্যানুয়্যালের মধ্যে রপ্তানি বিষয় নিয়ে যে নির্দেশটি বিশদভাবে উল্লেখ করা আছে, সেটি এইরকম: 'নরকঙ্কাল এবং নরঅস্থি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার প্রদত্ত কোম্পানিগুলিকে একজন সুপারিনটেন্ডেট্‌ অব পুলিস অথবা তদূর্ধ্ব পদাধিকারীর স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে। অন্যথায় মৃতব্যক্তির শব পণ্যরূপে গণ্য হবার অধিকারী হবে না।' আরও বলা আছে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন কিংবা গবেষণা ছাড়া নরকঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জের রপ্তানি করা নিষিদ্ধ এবং আইনত দন্ডনীয়। তবে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণগুলি কার্যকর হবে না, সেগুলির প্রতিটির জন্য পৃথক পরীক্ষাদি বাঞ্ছনীয়।

মজার কথা হলো যে বিচিত্র এবং অদ্ভুত এই পণ্য রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার বস্তিবাসীর মৃত্যু সংখ্যার আনুপাতিক হার কম-বেশী হয় না। এই বিচিত্র ব্যবসার সফলতার মূলে আছে বিহার থেকে আগত কয়েক হাজার ডোম। এই বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ জাতির লোকগুলোই এর প্রধান অবলম্বন। দেশান্তরি এই মানুষগুলো সমাজে একেবারে অচ্ছুৎ। ওদের জীবনযাপনের ধারা-টিও কদাকার। কারণ জন্ম থেকেই ডোম সম্প্রদায়ের মানুষের প্রধান জীবিকা হলো মড়া আগলানো। শ্মশানে, গোরস্থানে বা মর্গের কাছাকাছি এরা দল বেঁধে বাস করে। সাধারণত অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে এরা মেশে না। রপ্তানিকারী কোম্পানিগুলোকে এরাই মড়া যোগান দেয়। ডোমেরা নানাভাবে মড়া যোগাড় করে। নানা ফন্দি-ফিকির অবলম্বন করে এরা মড়া সংগ্রহ করে। গঙ্গার ধারে বা অন্যত্র পড়ে থাকা বেওয়ারিশ মড়া চুরি বা রাহাজানি করে এরা সংগ্রহ করে। সাধারণভাবে সাধু, কুষ্ঠরোগী বা এক বছরের কম বয়সের শিশুর মড়া হিন্দুধর্মের সংস্কার

অনুযায়ী দাহ করা হয় না। হয় তাদের মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, নয়ত গংগায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় দাহ করতে আসা দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে গোপন লেনদেনের কথা বলে কিছু টাকা দিয়ে তারা মড়া কিনে নেয়। সৎকারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ডোমেরা তা পালন করে না। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন জানতেও পারে না যে তাদের নিকট আত্মীয়ের শবদেহটি তখন হয়ত কাছাকাছি কোন ঝুপড়িতে খণ্ড খণ্ড করে কেটে হাড় মাংস আলাদা হচ্ছে। তারপর কোন একদিন অস্থি, মাথার খুলি, শিরদাঁড়া কিংবা হয়ত আস্ত কঙ্কালটাই পাচার হয়ে গেল বিদেশে এবং সেখানকার কোন মেডিক্যাল স্কুলের য়্যানাটমি ক্লাসে প্রদর্শিত হলো। হাসপাতালের মড়ার ঘর হলো কঙ্কাল যোগানোর আর একটা উৎস। শুধু মাত্র মোমিন পুর মর্গ থেকেই প্রতি বছর প্রায় আড়াই হাজার বেওয়ারিশ মড়া ডোমেদের হাতে চলে যায়। যখন চাহিদা বেশী থাকে তখন ভাগাড়ে গিয়ে শেয়াল শকুনের সঙ্গে লড়াই করেও এরা মড়া নিয়ে আসে। অনেক সময় খ্রীশ্চান বা মুসলমানদের কবরখানায় গিয়েও এরা মাটি খুঁড়ে মড়া আনে। মোটকথা, বাজারে এই বিশেষ পণ্যটির যোগানে কখনও ঘাটতি হয় না। তবুও কেনাবেচাকারীরা নানাভাবে এর যোগানের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকিরের কথা ভাবছে। যে জ্যান্ত মানুষটা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে মরার পর তার হাড়গোড়গুলো বেচে দেবার অধিকার সুনিশ্চিত করতেই তাকে আস্ত কিনে নেওয়া হয়। তেমনি, জবাই করার জন্যে যদি একটা আস্ত জানোয়ার কেনা হয়, তবে দুটোর মধ্যে খুব একটা তফাত থাকে না। দুটো ঝোঁকই সমান নিষ্ঠুর আর শঠ। তাছাড়া কলকাতা শহরে যখন মুমূর্ষু রুগ্ন লোকের অভাব নেই. তখন আগে থেকে তার মৃতদেহটার ওপর অধিকার সাব্যস্ত রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে ভাঁড়ে মা-ভবানী হলে পণ্যের যোগানও নিয়মিত রাখা যাবে না।

'পাঁচশ' টাকা!' চিন্তাটা সেই থেকে তার মাথার মধ্যে বলের মতন ঘুরপাক খাচ্ছে। মুখে দাগধরা লোকটা ঠিক লোককেই বঁড়শিতে গেঁথেছে। এসব কাজে সবাইকে বাছা যায় না। রাস্তায় এমন শুঁয়ে শুঁয়ে হেঁপো কেশো রুগী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের না আছে নামধাম, না কোনো পরিচয়। এরকম লোক বাছলে লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাবে। এমন লোক বাছতে হবে যাকে লোকে চেনে, যার ঘর-সংসার আছে। যার একটা স্থায়ী অস্তিত্ব আছে। নইলে সে মড়া ত বেওয়ারিশ মড়া হয়ে যাবে!

হাসারির হতাশ, অবসন্ন মুখ-চোখের দিকে চেয়ে লোকটা এবার একটু জোর দিয়ে বললো, 'রাজী তো?' হাসারি চাইল। হতাশ শূন্য দৃষ্টি। মানুষটার মুখের কথা যেন হারিয়ে গেছে। লোকটারও আর কোন তাড়া নেই। সে জানে যে এসব কাজে তাড়া করতে নেই। মানুষটার মনের অবস্থা সে বুঝতে পারে। যে মানুষটা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বাঁচার জন্যে লড়াই করছে সেও বোধহয় জ্যান্ত অবস্থায় তার খাঁচাটা বেচে দিতে চাইবে না। আর যাই হ'ক, শরীরটা ত একটুকরো কাপড় নয়।

'পাঁচশ' ট্যাকা কম কিছু লয়! তুমি কি বলো?'

শেষ পর্যন্ত রহমতের কাছেই কথাটা সে পাড়লো। আজকাল রহমতের কাছেই সে মনের কথা বলে। ওর সঙ্গেই সে এখন ভাগে রিক্সা টানছে। তাই রহমতই এখন তার সবচেয়ে কাছের মানুষ। রহমত মুসলমান। সে বিশ্বাস করে যে মানুষ মরে গেলে তার শরীরটা আল্লাহর সম্পত্তি হয়। আল্লাহ তার শরীরটা টানতে টানতে

স্বর্গে নিয়ে যান। সুতরাং শরীর খণ্ডিত হলে আল্লাহ সে দেহ ছোঁবেন না। আল্লাহর কাছে যা নিবেদন করা হয়েছে, তাতে কোন খুঁত থাকা উচিত নয়। এমনকি তাদের ধর্মের যারা মোল্লা, পুরোহিত তারা ত শরীরের কোন অংগ দান করারও পক্ষপাতী নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটা নেহাত নিরীহ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাঁচশ' টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। টাকার অঙ্কটাও রীতিমত চোখ ধাঁধানো। তাই হালকা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং হাসারির প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না রহমত। বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছ! পাঁচশ' ট্যাকা ফ্যালনা নয়। তুমি রাজী হও বন্ধু। তোমার মেয়ের বিয়ের পণের টাকা তোমায় যোগাড় করতে হবেই। আল্লাহ অন্তর্যামী। তিনি ঠিক ক্ষমা করবেন তোমায়।'

কিন্তু হাসারির মনে তখনো অনেক সংকট। ভগবানকে চটাতে কে চায়! সেও চায় না। কিন্তু সে যে বড় নিরুপায়! সে জানে হিন্দুধর্মে আত্মার ক্ষয় নেই। এই দেহখোলটাই পড়ে থাকে আর আত্মা ছেড়ে যায়। আত্মা তখন আর একটা দেহ আশ্রয় করে। তাই ফেলে দেওয়া দেহখোল চিতার আগুনে ভস্মীভূত করতে হয়। কিন্তু তার আত্মার কি হবে? মরার পর তার শবটা যদি কসাইখানায় চলে যায় তবে কি করে তার আত্মা মুক্তি পাবে? হাসারি মনে মনে ভারি দুঃখু পেল। কিন্তু কার কাছেই বা যাবে সে? কাকেই বা সে জিজ্ঞেস করবে? শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো কোভালস্কীর কাছেই সে তার মনের কথা বলবে। তাই গেল হাসারি। খ্রীশ্চানের ধর্মবিশ্বাসও মুসলমানের মতন। তারাও বিশ্বাস করে যে অক্ষত দেহখোলেই পুনর্জীবনপ্রাপ্তি হয়। সুন্দর ও বীর্যবান নতুন জীবন, ফেলে দেওয়া শরীরটাকে অক্ষত রেখেই সৃষ্টিকর্তার কাছে স্থান পায়। কিন্তু এ ধর্মবিশ্বাস আজ আর কোভালস্কীর নেই। বস্তিতে থাকতে থাকতে অনেক কিছুই আপোস করে নিয়েছে সে। একদিকে ধর্মবিশ্বাস আর আদর্শ অন্যদিকে বেঁচে থাকার স্থূল বাধ্যবাধকতা। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আপোস করা ছাড়া উপায় নেই তার।

তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসারিকে তার আদর্শের বিপরীত পরামর্শই দিল সে। কোভালস্কী দেখলো অমৃতা তখন উঠোনের উল্টো দিকে বসে ছোট ভাইটার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সেদিকে বাপের নজর টেনে নেহাত অনিচ্ছায় কোভালস্কী বললো, 'তাই করো বন্ধু! সুযোগ যখন এসেছে তখন তার সদ্ব্যবহার করো। মনে রেখ ওই মেয়েটার বিয়ে দেওয়াই তোমার জীবনের ব্রত।'

গুদামঘরের মতন একটা ঘরের পাশে মিত্র অ্যান্ড কোম্পানির কারবারের আপিস। তবে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট শিল্পোদ্যোগের মতন মিত্র অ্যান্ড কোম্পানির আলাদা সত্তা বোঝানোর ব্যবস্থা কিছু নেই। নোনা ধরা স্যাঁতস্যাঁতে দোতলা বাড়িটার কোথাও মিত্র অ্যান্ড কোম্পানির কারবার সম্বন্ধে আলাদা কোনো নোটিশ টাঙানো নেই। হাসারিকে সঙ্গে নিয়ে মুখে গুটির দাগ ধরা লোকটা এই বাড়িটায় এসে কোম্পানির গুদামঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। তারপর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলো। খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর আধাখানা পাল্লা খুলে ভেতর থেকে একটা মুখ উঁকি দিল। দালাল লোকটা ইসারায় হাসারিকে দেখাতে লোকটা এবার দরজার পাল্লা হাট করে খুলে দিল। হাসারির মনে হলো ভেতরের লোকটা বোধহয় মজুর শ্রেণীর কেউ। যাই হক, তার ইঙ্গিত পেয়ে ওরা দুজনে তখন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ভক্ করে একটা

পচা দুর্গন্ধ নাকে লাগলো ওদের। এমন দুর্গন্ধ হাসারি আগে কখনও পায় নি। মনে হয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শরীর ঝিমঝিম করছে। এক মুহূর্তের জন্যে হাসারির মনে হলো, না এলেই ভাল হতো। কিন্তু ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে তোলার আগেই সংগের লোকটা তাকে সামনের দিকে ঠেলা মারলো। তখন হাসারির সংশয় কেটে গেছে। দু-এক পা সামনে হাঁটতেই এই দুর্গন্ধের উৎসটা চোখে পড়ে গেল তার। হাসারির সামনে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলছে। তার মনে হচ্ছিল এ জায়গা নরককেও হার মানায়। বোধহয় শুধু দান্তেই কল্পনা করতে পারতেন এই জায়গার কথা। ঘরটা যেন এক সমাধিক্ষেত্র। থরে থরে সাজানো নানা মাপের কঙ্কালগুলো দেয়াল ঘেঁষে টেবিল আর তাকের ওপর রাখা আছে। বোধহয় কয়েক হাজার কঙ্কাল আর শরীরের নানা অংগের অস্থি আছে। মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, বক্ষোদেশ, হাত-পায়ের অস্থি, মেরুদণ্ডের নিচের ত্রিকোণ হাড় (Coccyges), এমনকি ঘাড়ের নিচে ইউ আকারের যে ছোট ছোট হীওয়েড্ (Hyoid) বোন্ থাকে সেগুলোও দেখা গেল এই অভিনব অস্থি প্রদর্শনীতে। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো এই কঙ্কাল বাজারের সুশৃঙ্খল বিন্যাস। প্রতিটি অস্থিখণ্ডের গায়ে পরিচয় দিয়ে লেবেল আঁটা। লেবেলের গায়ে মার্কিন ডলারে দাম লেখা। প্রমাণ মাপের একটা পুরো নরকঙ্কালের দাম ২৩০ থেকে ৩৫০ ডলার। কঙ্কালের প্রতিটি অস্থি তার দিয়ে বাঁধা এবং সেগুলো খোলা যায়। একটা শিশুর কঙ্কালের দাম ১০০ থেকে ১২০ মার্কিন ডলার। সম্পূর্ণ বক্ষোদেশের দাম চল্লিশ ডলার। মাথার খুলির দাম ৬ ডলার। তবে প্রতিটি অস্থিখণ্ডের দাম অন্তত দশগুণ বেশী হয় যদি কোন বিশেষ নির্দেশ থাকে।

মিত্র অ্যাণ্ড কোম্পানির অধীনে একটা পুরো বিশেষজ্ঞদল এই কাজের সংগে যুক্ত। এরা সবাই বিশেষ বিশেষ বৃত্তির কারিগর। কেউ অস্থি, কেউ রঙ, কেউ বা ভাস্কর্যের। লম্বা গ্যালারির শেষ মাথায় নানা মাপের কঙ্কাল এবং স্তূপ করা হাড়-গোড়ের মধ্যে ঝাপসা আলোয় বসে, নিবিষ্ট মনে এরা কাজ করে চলেছে। আবছা আলোয় এদের চেহারাগুলো দেখে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক কোনো মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া ক'টি মানুষ বসে বসে যেন তাদের মৃত্যুর অক্ষর সাজাচ্ছে। সামান্য কারিগর হলেও এদের হাত থেকে কখনো কখনো অতি অনুপম শিল্পবস্তুর সৃষ্টি হয়। মাথার খুলির সংগে জোড়া লাগানো চোয়ালের হাড় এবং দাঁতের পাটি যখন আলাদা করা হচ্ছে, তখন অবাক হতে হয়। বোঝাই যায় যে কোন বড়সড় মার্কিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডেণ্টাল বিভাগের ফরমাস মতই এগুলি তৈরি করা হয়েছে। মোটকথা ভারতবর্ষ থেকে যে সব পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, তার কোনটার মধ্যেই এত যত্ন বা সতর্কতা থাকে না। ব্যতিক্রম শুধু এর ক্ষেত্রেই। প্রতিটি অস্থি আলাদাভাবে তুলোর বিছানায় শুইয়ে শক্ত কার্ডবোর্ড বাক্সের মধ্যে পুরে কাপড়ের ফেটি দিয়ে যত্ন করে বেঁধে বাক্সর গায়ে লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়। লেবেলের গায়ে লেখা হয় 'ফ্র্যাজাইল' বা 'হ্যাণ্ড্‌ল উইথ্ কেয়ার' ইত্যাদি। সব দেখে শুনে হাসারি তখন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, 'হায়! হায়! বেঁচে থাকতি অদের হাড়গোড়ের এত যত্ন আত্তি কেউ করে নাই গো! একেই বলে জ্যান্তে দেয় না ভাতকাপড়/মরলে করে দান-সাগর!'

তবে ডোমেদের পাঠানো সব অস্থিকঙ্কালের সমান খাতির-যত্ন হয় না। এমন অনেক অস্থিকঙ্কাল পড়ে আছে যেগুলো অক্ষত নয়। হয় শেয়ালে আধখাওয়া বা

জলের তলায় পড়ে থেকে পচে বা ক্ষয় হয়ে যাওয়া হাজার হাজার অস্থি। এদের মধ্যে সব রকম অস্থি আছে। মাথার খুলি, পায়ের হাড় (Tibia), কণ্ঠাস্থি (Collarbone) জংঘার হাড় (Femurbone) ইত্যাদি। এইসব হাড়ের টুকরো-গুলো পেষণযন্ত্রে গুঁড়ো করে ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে লেই বানানো হয়। হাসারি দেখলো যে পচা দুর্গন্ধটা উঠছে এই জলে ফোটানো হাড়ের গুঁড়ো থেকে।

গ্যালারির একেবারে শেষ মাথায় ছোট্ট চেয়ারটার মধ্যে যে লোকটা বসে আছে, সেই-ই দরদস্তুর করে 'জীবন্ত' কঙ্কাল কেনে। এটাই তার আপিসঘর। লোকটার পরনে সাদা পায়জামা আর ঢিলে আলখাল্লা। লোকটার সামনে ধুলোভর্তি একটা টেবিল। টেবিলের ওপর অজস্র কাগজপত্র, ফাইল, রেজিস্টার ইত্যাদি। লোকটার মাথার ওপরে বনবন করে একটা পাখা ঘুরছে। প্রতি পনেরো সেকেন্ড অন্তর হাওয়ার ঝাপটা থেকে আলগা কাগজপত্র সামলাচ্ছে লোকটা। টেবিলের ওপর ইতস্তত পড়ে আছে কয়েক ডজন লালকালো ডোরাকাটা সদ্যোজাত বাচ্চার মাথার খুলি। এগুলো দিয়েই পেপারওয়েট বানিয়েছে লোকটা। প্রতি বছর এরা নেপাল, তিব্বত, চীনদেশে তন্দ্রসাধনার জন্যে কয়েক হাজার মাথার খুলি চালান করে। কোথাও কোথাও এইসব মাথার খুলি শোধনপাত্র কিংবা ছাইদানি হিসেবেও ব্যবহার হয়।

টেবিলের ওপাশে বসে থাকা দন্তহীন ফোকলামুখের বাবুটি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাসারিকে দেখলো। ওর ঠেলে ওঠা কণ্ঠাস্থি, সরু বুকের খাঁচা, উদ্গত শিরদাঁড়া দেখে বাবুটি বোধহয় মনে মনে আশ্বস্ত হলো। অন্তত হাবভাব দেখে সেইরকমই মনে হলো। 'মালটা' যে জাল নয়, তা নিয়ে কোন ধন্দ নেই। ওর খুশী খুশী ভাবটা দেখেছে হাসারি। সেও খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হলো যেন। লোকটার খুশী হবার আর একটা গোপন কারণও আছে। তার অভিজ্ঞ এবং অভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে সে বুঝেছে যে 'মাল'টার জন্যে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। হাসারি যে শীগগিরই টেঁসে যাবে তা সে বুঝতে পেরেছে। তাই দালালটার দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ চোখ-ইসারা করলো সে। অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করণীয় কাজটা সেরে ফেলতে হবে। একটা আইনসম্মত চুক্তিপত্র তৈরি করে ফেলতে হবে। লোকটার ঘরের কাছাকাছি ডোমপাড়ায় একটা খবর দিতে হবে যাতে আত্মা খাঁচাছাড়া হবার পর খোলটা হাতছাড়া না হয়ে যায়।

এসব করতে দিন তিনেক সময় লাগলো। তিনদিনের মাথায় প্রথম কিস্তির দেড়শো টাকা হাসারির হাতে গুনে দিল। সেই সংগে হাসারিকে সতর্কও করে দিল বাবুটি। 'দ্যাখো বাপু! এসব ঝক্কি-ঝামেলার কাজ। বেশিদিন ঝুলিয়ে রাখা যায় না। তোমায় তাই একটু তাড়াতাড়ি...।' কথাটা আর শেষ করলো না সে। শুধু চোখ টিপে ইসারায় বুঝিয়ে দিল। হাসারি বুঝলো এখন থেকে এ খোলটা আর তার নেই। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি এটাকে ওদের হাতে তুলে দেয়া যায় ততই মঙ্গল। ভালই হলো 'শরীল'টাকে আর মজবুত করার দায় থাকলো না তার।

পঁয়ষট্টি

খুবই আটপৌরে সাদাসিদে কয়েকটা দৃশ্যপট আর বাঁশ-কাঠ দিয়ে খাড়া করা একটা উঁচু মঞ্চ হলেই হলো। তাহলেই বস্তির নোংরা, পচা, দুর্গন্ধওলা পরিবেশ যেন রাতারাতি সুন্দরী হয়ে উঠবে। তখন মাছি, মশা, আরশোলা, ইঁদুরের উৎপাত বা দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগযন্ত্রণা, খিদের দাপট, কিছুই যেন গায়ে লাগবে না। এমনকি মৃত্যুশোকও ম্লান হয়ে যাবে। সেই স্বপ্নের সময়টাই আবার এসেছে বস্তির দোরগোড়ায়। দুঃখশোক ভুলে মানুষগুলো এবার আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়াবে। খিদে তেষ্টা থাকবে না। ওদের রোগা শরীরে হাসির দুলুনি উঠবে। কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়বে না। মোটকথা এখন থেকে বস্তির ছোট বৃত্তের মধ্যে বন্দী মানুষগুলো যেন পুরাণ মহাকাব্যের গল্পগাথার মধ্যে মুক্তির আশ্বাস খুঁজে পাবে। রামায়ণ মহাকাব্যের এই কাহিনী কোটি কোটি ভারতবাসীর মন গড়েপিঠে দিয়েছে। এই দেশের মাটিতে রামায়ণ যা, ইওরোপের মাটিতে বাইবেলও তা। ক্যাথিড্রেলের সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে ইওরোপের মানুষও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাইবেলের কাহিনীর অভিনয় দেখে, প্রেরণা পায়। তিনমাস ধরে যাত্রাওলারা বাক্সতোরংগ ভর্তি করে সাজপোশাক নিয়ে বস্তির মধ্যে বাসা করে বসেছে। দুটো মোষ খাটালের মধ্যে ওদের ঠেলাগাড়িগুলো রেখেছে। বর্ষার সজল মেঘের মতন ওদের আসার খবর প্রথম দিনেই বস্তির মানুষদের চঞ্চল করে দিল। দেখতে দেখতে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ দল বেঁধে ভিড় করে জুটে গেল গায়েনদের চারপাশে। বাচ্চাদের উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। যারা আগে যাত্রার রাজারাজড়াদের দেখে নি, তারাই সব আগে এসে জড়ো হয়েছে মঞ্চের চারপাশে। রাম-সীতার পবিত্র প্রেমকাহিনী দেখে ওরা যেমন আহ্লাদ করবে, তেমনি সীতার দুঃখে ওদের ছোট্ট বুকগুলো কান্নায় ভারি হয়ে উঠবে। প্রথম দিনের যাত্রাগান শুরুর অনেক আগে থেকেই বস্তির লোকজন আসতে শুরু করলো। মঞ্চের সামনে খোলা জমিটা কালো মাথায় ভরে গেল। বাড়ির ছাতে, গাছের মাথাতেও অনেক মানুষ। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে কখন পর্দা উঠবে। ওদের বুকে আশা-আকাঙ্ক্ষার দুলুনি। কিছুক্ষণের জন্যে প্রাত্যহিকের বৃত্ত ভেঙে আনন্দের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। স্বপ্নের নায়করা ওদের যেন নতুন জীবনের আশ্বাস দেবে। সপ্তকাণ্ডের মহাকাব্যের পঁচিশ হাজার শ্লোকের কল্পলোকের মধ্যে নিমজ্জিত হবে ওদের হতাশ মন। নতুন ভাবে বেঁচে ওঠার প্রেরণা পেতে চাইছে ওরা। তাই যেন এই উৎকণ্ঠা।

ঋষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ মহাকাব্য সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। কিংবদন্তী বলে যে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে দেবতাদের নির্দেশে এই মহাকাব্য রচিত হয়। রামায়ণ মহাকাব্য মূলত এক অলৌকিক প্রেমের কাব্য। অযোধ্যার রাজা দশরথের সুন্দরকান্তি যুবক পুত্র রামচন্দ্রই এই কাহিনীর নায়ক। তিনি মহাবীর। জ্যারোপণ করে তিনি হরধনু ভঙ্গ করেন এবং বীর্যশুল্কো কন্যা সীতার পাণিগ্রহণ করেন। বিয়ের পর রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সংকল্প করলেন। কিন্তু প্রিয়তমা পত্নী রানী কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামের বনবাসের আজ্ঞা দিলেন। মধ্য-

ভারতের দণ্ডকারণ্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে রামচন্দ্রের বনবাসকাল শুরু হলো। সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনে লঙ্কাদ্বীপের রাক্ষসরাজা রাবণ তাঁর প্রতি কাম-মোহিত হন। পঞ্চবটী কুটীরে সীতাকে একাকী রাখার জন্যে রাবণ মায়াবী মারীচের সাহায্য নেন। সীতা যখন পঞ্চবটী কুটীরে একাকী ছিলেন, তখন সবলে সীতাকে অপহরণ করেন রাবণ এবং লঙ্কাদ্বীপে নিয়ে যান। সেখানে প্রথমে তাঁর অন্তঃপুরে এবং পরে অশোকবনে সীতাকে বন্দিনী করে রাখেন এবং তাঁকে বশীভূত করার জন্যে অনেক রাক্ষসী নিযুক্ত করেন।

সীতার উদ্ধারের জন্যে বনের রাজা সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্র মিত্রতা স্থাপন করলেন। এর ফলে কাঠবিড়ালদের সহযোগিতায় সমস্ত বানরকুল এবং হনুমানের সাহায্যের আশ্বাস পেলেন রামচন্দ্র। সীতার সন্ধানে সাগর লংঘন করে হনুমান লংকায় উপস্থিত হলো। সীতার খোঁজ পেয়ে হনুমান তাঁকে রামের অঙ্গুরীয় দিয়ে আশ্বস্ত করলো। সীতাও তাকে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি দান করলেন। লঙ্কায় নিজের বীরত্বের পরিচয় দিতে নানারকম দুঃসাহসিক কর্ম করলো হনুমান। শেষে সাগর লংঘন করে রামের কাছে ফিরে সীতার সংবাদ ও অভিজ্ঞান দিল। সীতার সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে যাবার আয়োজন করলেন। বানরকুলের সাহায্যে রামচন্দ্র সাগরবন্ধন করলেন এবং সদলবলে লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছলেন। লঙ্কাদ্বীপে রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হলো। ঘৃণ্য রাবণকে স্ববংশে নিধন করলেন রামচন্দ্র এবং সীতাকে উদ্ধার করলেন। রাবণের মৃত্যুতে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হলো। অতঃপর সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

কাহিনীতে এই পর্যন্ত কোন জটিলতা নেই। কিন্তু সরল কাহিনীতে জটিলতা এল যখন প্রিয়তমা সীতাকে নির্বাসনে পাঠাতে চাইলেন রামচন্দ্র। যে স্ত্রী পর-পুরুষের অন্তঃপুরে বাস করেছেন তাঁকে কি তিনি গ্রহণ করবেন? সীতার চরিত্র সম্বন্ধে এই সন্দেহটি দেখা দেওয়ায় রামচন্দ্র তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে ত্যাগ করার কথা বললেন। লোকাপবাদের ভয়ে তাঁকে ত্যাগ করবেন শুনে স্বামীকে তিরস্কার করলেন সীতা। এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সীতা বিষণ্ণ হয়েছেন, অভি-মানাহত হয়েছেন। তাই অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মাহুতি দেবেন স্থির করলেন। চিতা সাজানো হলো এবং সেই প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করলেন সীতা। কিন্তু স্বর্ণ-প্রতিমা সীতাকে স্পর্শ করলেন না অগ্নিদেব। অপাপবিদ্ধা সীতা তাঁর চরিত্রের শুদ্ধতা প্রমাণ করলেন স্বামীর কাছে। রামচন্দ্র হতবাক হয়েছেন সীতার সতীত্বের প্রমাণ পেয়ে। সীতাকে তিনি গ্রহণ করলেন এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্যে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

রামায়ণ কাহিনীর প্রতিটি দৃশ্য, কাহিনীর প্রতিটি মোচড় এবং চরিত্রের সংকট ও জটিলতাগুলো যেন বস্তির সব মানুষের আদ্যোপান্ত জানা। অথচ চেহারা বা সাজপোশাকে লোকগুলো কত হেয়! ফলে কাহিনীর গতির সঙ্গে ওরা যেন নিজে-দের আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে নিয়েছে। যাত্রাগানের অভিনেতাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলেমিশে ওরা হাসছে, কাঁদছে কখনও বা ওদের বীরত্ব দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ওরা নিজেরাই যেন এই মহাকাব্যের নায়ক। তাই ছেঁড়া জামাকাপড়ের ওপর ওরা রাজারানীর সাজপোশাকের স্পর্শ পেয়ে শিহরন বোধ করছে। শুধু কি তাই? এই বিশাল মহাকাব্যের প্রতিটি শ্লোকই যেন ওদের কণ্ঠস্থ। অবলীলায় আবৃত্তি করে চলেছে পরের পর পঙ্‌ক্তি। এমন আশ্চর্য ঘটনা শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব।

এদেশের অক্ষরজ্ঞানহীন অশিক্ষিত মানুষ অনায়াসে হাজার হাজার শ্লোক আবৃত্তি করতে পারে। যেখানে রামায়ণ গানের আসর বসে সেখানে ধর্মের ভেদ থাকে না। সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই অসামান্য মহাকাব্যের কাহিনী দেখে। আনন্দ নগর বস্তির জীবনেও এ ঘটনার ব্যতিক্রম হলো না। যাত্রাগানের আসরে হিন্দু সূর্যের পাশে দাঁড়িয়ে এই কাহিনীর রসাস্বাদন করে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল মেহবুব আর তার ছেলেমেয়ে, নিজামুদ্দিন লেনের কয়লাওলা, মার্গারেটা, হিজড়া কালীমা, বন্দনা, জয়ের বাবা সেই কেরেলী নাবিক, সবাই। এমনকি দর্শকদের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রাতের পর রাত যাত্রাভিনয় দেখতো মস্তানরাজা আর তার সঙ্গোপাঙ্গরাও। এই ভিড়ের মধ্যে একপাশে কুণ্ঠিত পায়ে হাসারিও দাঁড়িয়ে থাকতো। সেও দেখতে এসেছে এই আশ্চর্য রামকাহিনী। বুকভাঙা মানুষটা যেন প্রেরণা সঞ্চয় করতে এখানে আসতো। যাতে জীবনযুদ্ধে সে ভেঙে না পড়ে। তবে শুধু রামচরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তাই নয়। তার সঞ্চয়ের থলি পূর্ণ হয় হনুমানের বীরত্ব দেখে, নিষ্কলুষ সীতার চরিত্র-তেজ দেখে।

হাসারি গভীর ভাবে বিশ্বাস করে যে বীর মহানায়কদের জীবনকাহিনী, তাদের বীরত্ব বা শৌর্যবীর্য যথার্থই মানুষকে সান্ত্বনা দেয়, প্রেরণা যোগায়। বানভাসি মানুষ বন্যার সময় যেমন শক্ত গাছের গুঁড়িকে জাপটে ধরে, তেমনি হতাশ আশা-হীন মানুষ এদের আদর্শটি আশ্রয় করেই সান্ত্বনা পায়। ছেলেবেলার সেই মধুর দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ে। মায়ের কোলে চড়ে ধানক্ষেতের আলপথ ধরে যখন যেত, তখন মা তাকে গুনগুন করে রামায়ণের গল্প বলতো। গল্প বলতো বীর হনুমানের। বীরত্বের সেই সব কাহিনী শুনে তার ছোট্ট মনটি যেন রোমাঞ্চিত হতো। তাদের গ্রামে প্রায়ই যাত্রাগানের আসর বসতো। বড় হয়ে মায়ের হাত ধরে হাসারি যাত্রাগান শুনতে যেত। অবাক হয়ে দেখতো কি আশ্চর্য সেই সব বীরত্ব কাহিনী। সুর করে গলা কাঁপিয়ে ওরা দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় করে যাচ্ছে, আর হাসারির মতন বাচ্চারা স্তব্ধ হয়ে শুনছে এবং দেখতে দেখতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। আজ মনে হয়, সেগুলো কাহিনীমাত্র নয়। যেন অনন্তকাল ধরে এইসব কাহিনী তাদের জীবনবোধের ওপর এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রতিদিনের জীবনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা দিয়ে এসেছে। রামায়ণকাহিনী যেন এ দেশের মানুষের সঞ্জীবনী মন্ত্র। ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশুই এই কাহিনীর মন্ত্রে দীক্ষিত। কোন্ শিশুটি দিদির মুখে রামলক্ষ্মণের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে না পড়ে? কোন্ শিশুটির নির্দোষ খেলার উপজীব্য বিষয়টি সৎ অসতের দ্বন্দ্ব থেকে প্রেরণা লাভ করে না? ইসকুলের প্রতিটি পাঠ্য বইতে রামায়ণকাহিনীর বীরত্বকথা ফলাও করে ছাপা হয়। বিয়ের সময় বয়স্কারা যুবতী কন্যাকে সীতার মতন সাধ্বী এবং পতি-ব্রতা হতে উপদেশ দেয়। সারা দেশে মহাসমারোহে রামের পুজো হয়। রামচরিত্রের শৌর্যবীর্য স্মরণ করে এদেশের সাধারণ মানুষ প্রেরণা পায়। হনুমানের প্রভুভক্তি ভক্তদের কাছে অমলিন দৃষ্টান্ত হয়ে বেঁচে থাকে। রামায়ণের পুণ্য কাহিনী সাধারণ মানুষের রক্তের মধ্যে যথার্থই সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করে। তাই শহরে প্রতি সন্ধ্যা-তেই কলকাতার হাজার হাজার শ্রমিক, রিক্সাওলা, ঠেলাওলা, ফেরিওলারা হয়ত গঙ্গার ধারে কোন বটগাছতলার ছায়ার নিভৃতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মহাকাব্যের আশ্চর্য গল্প শোনে। এই দরিদ্র, অনাহারী, অসুখী মানুষদের জীবন থেকে সুখ নামক মায়াভ্রম অনেকদিন হারিয়ে গেছে। তাই কল্পলোকের এই সুখের স্মৃতি

ক্ষণিকের জন্যে ওদের জীবনধারণের কটুকষায় স্বাদ থেকে মুক্তি দেয়। ওদের মনোমধ্যে যে আনন্দঘন কল্পমূর্তি আঁকা হয় তারই আবেশ নিয়ে ওরা বেঁচে থাকে।

ভারা বাঁধা মঞ্চের চারপাশের চাপাচাপি ভিড়ের মধ্যে প্রায়ই একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতো সবাই। একজন লম্বা মানুষের টাক মাথার কিয়দংশ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। সবাই বুঝতো যে কোভালস্কী যাত্রা শুনতে এসেছে। কিন্তু কোভালস্কী ভাষা জানে না। ভাষার সূক্ষ্ম মোচড়টিও বুঝতে পারে না। তবুও সে এসেছে। সবাই দেখতে পেল, আসরে দাঁড়িয়ে টাকমাথা লম্বা মানুষটা মন দিয়ে রামায়ণগান শুনছে। বস্তির মানুষ ভারি খুশী। ওরা যে খুশী কোভালস্কীও তা বুঝতে পারে। সে জানে, এই ছোট্ট ঘটনাটাই ওদের মনে চিরদিনের জন্যে তার আসনটি পাকা করে দিল। বস্তুত, মানুষের মনে ঠাঁই পাবার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পথ সাধারণ মানুষের মনোমত কিছু করা। রামায়ণ এক অসাধারণ মহাকাব্য। অসংখ্য জীবন্ত মানুষ এবং ঘটনার মিছিলে এই মহাকাব্য ভরা। কি নেই এই সচল কোষগ্রন্থে? তাই অনায়াসেই এই কাহিনীর বিচিত্র গতিপথের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়। 'মন আমার উধাও হয়ে ফিরে যেত সেই বাল্মীকির কালে। মনে হতো সেই মোহিনী কালটির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছি। অতুল প্রভায় দীপ্ত লোকবিশ্রুত অযোধ্যা নগরী আমার চোখের সামনে ঝলমল করছে। রাজসভার সংগীতাদির মূর্ছনা আমার কানে বাজছে। সর্বপ্রকার যুদ্ধযন্ত্র এবং আয়ুধের ঝনঝনা শুনে আমি উদ্দীপ্ত। এ কাল যেন আমার অপরিচিত নয়। আমি এর পথঘাট, মার্গ, বিপণিসমূহ চিনি। এর অশ্ব, হস্তী, গো, উষ্ট্র, মনোহর বন-অরণ্যাদি, অধিবাসীদের স্বভাবাদি সব আমার পরিচিত। সবথেকে বড় কথা, অতি প্রিয় এই মহাকাব্যের দৌলতে বস্তির মানুষের মনের উত্তাপটি আমি যেন স্পর্শ করতে পারি। এদের মানসিকতা আমার কাছে আর দুর্জ্ঞেয় নয়। আমার মজ্জার সঙ্গে তা নিবিড় হয়ে মিশে গেছে। তাই এদের মনে বিশ্বাস আনার জন্যে লোহিত সমুদ্রের বুকের ওপর প্রশস্ত রাজপথ তৈরির সেই রূপকথার গপ্পো পাড়তে হলো না। লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছানোর জন্যে সমুদ্রশাসন ও সেতুবন্ধনের কাহিনী ওরা সবাই জানে। পাশ্চাত্য কোন অলৌকিক কাহিনীর নজির দিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বোঝাতে হয় না এদের। মহাবীর হনু-মানের পরাক্রমের কথা এরা সবাই জানে। কত দুষ্কর কর্মই না সাধন করেছেন হনুমান! ওষধির গন্ধ আঘ্রাণ করে লক্ষ্মণ যাতে শল্যমুক্ত হয়, তাই হিমালয় পেরিয়ে সর্বৌষধিযুক্ত গন্ধমাদন পর্বতটি কাঁধে করে তুলে এনেছেন তিনি। সাধারণ মানুষকে বুকের কাছটিতে টেনে আনার এটাই একমাত্র পথ। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, প্রাকৃত, অতি-প্রাকৃত কিছুরই বিচার না করে, শুধু উদারভাবে সবকিছু মেনে নেওয়া। তাই যখন অন্তঃসত্ত্বা মায়ের কাছে আশ্বাস দিয়ে বলি যে সে পঞ্চপাণ্ডবের একজনের জন্ম-দায়িনী হবে, তখন সরল মনে সে আমায় বিশ্বাস করে। মুসলমানদের বেলাতেও একই রকম ভাব। মহান বাদশা আকবরের কথা বললে ওরা খুশীতে ঝলমল করে। যখন শ্রদ্ধাভরে মহম্মদকে স্মরণ করি তখন ওরা আমার ওপর সশ্রদ্ধচিত্ত হয়। ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের রূপলাবণ্যের তুলনা করলে ওদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তবে যেদিন ওদের বস্তিঘরের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের গায়ে লেখা একটা উর্দু কথা পড়তে পারলুম, সেদিনই বোধহয় ওরা সবচেয়ে খুশী হয়েছিল।'

হেৰ্ষাট্ট

ছেলেটার নাম নিসার। বছর বারো বয়সের এই মুসলমান ছেলেটা যে দলের পাণ্ডা একথা পাড়ার সবাই জানে। ছেলেটার ঝকঝকে মুখশ্রী, তীক্ষ্ন সজাগ চোখ আর কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক ঝোঁকের জন্যেই ও যেন আলাদা। ওর বয়সী ছেলেরা ওকে নিজেরাই তাই নেতা বলে মেনে নিয়েছে। ছেলেটা ঠোঁট-কাটা। তাই কথা বলার সময় ওর ঝকঝকে দাঁতের পাটি উঁকি দেয়। একটা বাচ্চা বাঁদর প্রায় সর্বক্ষণই ওর বাঁ কাঁধের ওপর বসে থাকে। এই বিশেষত্ব দুটোর জন্যেও ওর সমবয়সীদের থেকে ও আলাদা। কোভালস্কীও নিসারকে এই পরিচয়েই চেনে। তার ধারণা ছেলেটা যথার্থই একটা ঝকঝকে হীরে। একটা হাউই-বাজি যেন নিসার। ঝকঝকে এই কমল-হীরেটার গা থেকে সবসময়ই জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিন্তু নিসার এ পাড়ার ছেলে নয়। এই হিন্দু পাড়ায় ও প্রক্ষিপ্ত। নিসারের অস্থিচর্মসার চেহারা আর ছোট্ট করে ছাঁটা চুল দেখলেই মনে হবে যেন অনেকদিন সে ভাল করে খেতে পায় নি। বস্তুত তাই। ডালহাউসী স্কোয়ারের একটা অফিসবাড়ির ফুটপাতের ওপর প্রায় আধমরা এই ছেলেটাকে দেখতে পায় বুদ্ধু নামে সেই আদিবাসী লোকটা। বুদ্ধুই তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই বস্তিতে রোপণ করে। নিসারের জীবনকাহিনী বিচিত্র। বিহারের এক অখ্যাত গ্রামের অভাবপীড়িত পরিবারের ছেলে সে। দিনের পর দিন খেতে না পাওয়া ছেলেটা একদিন অস্থির হয়ে ঘর ছাড়ে। তারপর রেলগাড়ির ছাতে চড়ে এই মরীচিকা শহরে চলে আসে। কলকাতায় এসে প্রথম ক'টা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো সে। কলের জল খেয়ে আর এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতো। একদিন বড়বাজারের গলিতে ঘুরতে ঘুরতে নিসার একটা পুরনো চটের থলি কুড়িয়ে পেল। সেই থেকে এটাই হলো তার জীবিকা আর রক্ষাকবচ দুই-ই। শহরের হাজার হাজার উপোষী ছেলের যে জীবিকা, নিসারের জীবিকাও তাই হলো। রাস্তার ছেঁড়া ন্যাকড়া, কানি কুড়োনোর কাজ শুরু করলো সে। রোজ সন্ধ্যে বেলায় সারাদিনের সংগ্রহ এক পাইকারী কারবারীর কাছে বেচে সামান্য দুটো চারটে টাকা রোজগার করতো নিসার। একদিন এক পুরনো মালের কারবারী তাকে একটা বাচ্চা বাঁদর উপহার দিল। নিসার ওর নাম দিল হনুমান। সেই থেকে বাঁদরটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে গেল। রাত্রেও বাঁদরটা ওর পাশে শুয়ে ঘুমোয়। যেদিন বিষ্টি-বাদল হয় সেদিন কোনো গাড়িবারান্দার তলায় গুটিশুটি শুয়ে থাকে দুজনে। মোটকথা সেই থেকে ওদের কেউ ছাড়াছাড়ি হতে দেখে নি। সিনেমা দেখার খুব শখ তার। হাতে দু-চারটে টাকা জমলেই বাঁদরটা কাঁধে চড়িয়ে সে কোনো সস্তার প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে পড়তো। সেই নিজস্ব কয়েক ঘণ্টা সময় নিশ্চিন্ত মনে স্বপ্নের জগতে চলে যেত এই বস্তির ছেলেটা। নিসারের সবচেয়ে প্রিয়তম নায়ক হলো দিলীপকুমার। দামী রাজারাজড়ার পোশাক পরা এই নায়কের ছবিটা যখন সিনেমার পর্দায় ভেসে ওঠে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় সে। ওর চলাফেরা, কথাবার্তা হাসিকান্নার অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। সুন্দর সুন্দর মেয়েদের সঙ্গে নায়কের ঢলাঢলি নাচানাচি দেখতে দেখতে নিসার

যেন কোন্ এক স্বপ্নলোকে হারিয়ে যেত খানিকক্ষণের জন্যে।

এই ব্রাত্য মুসলমান ছেলেটাকে হিন্দু পাড়ায় ঘর বাঁধতে দেওয়া নিয়ে তেমন কোন সমস্যা হলো না। দু-বছর ধরে শহরের এ-রাস্তা ও-রাস্তায় ছুটোছুটি করে জীবনধারণ করতে গিয়ে ওর একটা ধাত হয়ে গেছে। অসাধারণ একটা তেজী জেদ. যা কোন কাজটাকেই অসম্ভব ভাবতে দেয় না। বস্তিতে এসে নিসার দেখলো এখানকার ছেলেমেয়েদের জীবনটাও কম নির্দয় নয়। হাঁটতে শিখলেই হলো। বাচ্চার হাতে একটা কিছু কাজ ধরিয়ে দেবে বড়রা। এটাই নাকি সমষ্টিগত ভাবে বেঁচে থাকা। বাচ্চাদের ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যেস শিখতে হয়। ফলে এমন কোন কাজ নেই যা থেকে বাচ্চাদের নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। গায়েগতরে খাটুনির কাজগুলোও ওদের করতে হয়। জলভর্তি বালতি হাতে নিয়ে ওদের এঁকে বেঁকে হাঁটতে দেখছে বস্তির সবাই। কিন্তু কেউ ভাবে নি এর দরুন ওদের অপরিণত কাঁচ হাড়ে চিড় ধরতে পারে। হাড়ের বাড়বৃদ্ধি থমকে যেতে পারে। মানুষগুলোর সে গ্রাহ্যই নেই। পঞ্চাশটা বাচ্চার মধ্যে দুটো কি তিনটে বাচ্চা ইস্কুলে যেতে পায়। (কোভালস্কীর সান্ধ্য ইস্কুলে এ পর্যন্ত একজনও পড়তে আসে নি) সাত-আট বছর বয়স হলেই ওরা সাবালক হয়ে যায় যেন। কেউ মুদির দোকানে, কেউ পানবিড়ির দোকানে আনাড়ি হয়ে কাজ শিখতে লাগলো। যাদের কপাল সত্যিই পোড়া তাদের হয়ত কাজ জুটলো বড় রাস্তার ওপর হোটেলগুলোতে। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত একটানা খেটে মরে তারা। আরও নিষ্ঠুর হলো বস্তির কারখানাগুলোয় যারা কাজ করে। এই ছোট ছোট কারখানাগুলো যেন এক একটা কয়েদখানা। কেরেলী লোক-টার দুই ছেলেই এমনি এক কয়েদখানায় কাজ করে। দিনে দশঘণ্টা অমানুষিক খেটে ওরা যা পায় তা দিয়ে সের পাঁচেক চালও জোটানো যায় না। অথচ কি নির্মম নিষ্ঠুর এই অন্ধকূপগুলো।

বস্তিতে এসে নিসার দেখলো আরও তিনজন ছোকরা কুড়োনির কাজ করে। কিন্তু কেউ তেমন খুশী নয়। সবাই জানে এতে খাটুনি পোষায় না। বস্তির ভেতরে এ কাজ একটুও লাভজনক নয়। বস্তিতে কোন দ্রব্যই ফেলনা হয়ে যায় না। ভাঙা বোতল, কয়লার টুকরো, আধখানা ঘুঁটে, নারকেলের খোলা, সার্টের ছেঁড়া টুকরো, যাই-ই পড়ে থাকুক সবই কাজে লেগে যায় গেরস্তর। বস্তিতে বোধহয় কোন কিছুই নেহাত অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় না। সব দেখেশুনে নিসারের মনে হলো এ পুকুরে বড় মাছ নেই। যা আছে সব চুনোপুঁটি। একদিন সন্ধ্যেবেলা তিন কুড়ো-নির কাছে কথাটা সে ভাঙলো। 'এখেনে ত সব চুনোপুঁটি। বড় মাছ পেতে হলে অন্য জায়গায় ঘাই দিতে হবে। বুঝলি?' নিসারের কথাটা সেদিন হাসারিও শুনে ফেললো। নিশ্চয়ই সে কাছাকাছি ছিল। ইদানীং মানুষটার একটাই ভাবনা। 'ট্যাকা চাই! আরও ট্যাকা চাই!' তাই সর্বক্ষণই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। হাসারির মনে হলো ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই সোনার খনির সুলুক-সন্ধান জানে। তাই ভালমন্দ যা-ই হ'ক, শম্ভুকে সে এই দলে ভিড়িয়ে দেবেই। কোভালস্কীর কাছেও সে মনের কথাটা বলে ফেললো। শম্ভু তখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওকে দেখিয়ে সে বললো, 'স্তেফানদাদা! আমার আর পুঁজিপাটা নেই। শরীলখানা বেচে যা পাব তা ওই পাঁচশো ট্যাকা। কিন্তু আরও অনেক ট্যাকা চাই। তা বর্ষাবাদলার দিনে আমার রোজ গার বাড়বে। ধরেন আরও আটশ' ট্যাকা। তারপর শম্ভু যদি আরও দু-তিনশো আনে, তাহলে পৈরায় দুহাজার হয়। তাই না?'

কোভালস্কী অবাক হয়ে এই অক্ষম মানুষটার বাঞ্ছাপূরণের হিসাব শুনছিল। কি বলবে সে এই ভাগ্যহত মানুষটাকে! ইদানীং হাসারিও যেন নিজের ওপর তেমন ভরসা রাখতে পারছে না। রোগের জ্বালা আছে। আছে দারিদ্র্যের কষ্ট। তাই বাঞ্ছাপূরণের হিসাবটাও মনে মনে মেলাতে পারে না। শেষমেশ ভেবে চিন্তে বললো, 'শম্ভুর মায়ের একখানা কানের দুল আচে। সেটিও বেচে দিব গো! তা এটির বদলে মহাজন বাকি ট্যাকাটা যোগাড় করে দেবেক না? লিশ্চয় দেবে।'

কোভালস্কী তাকিয়ে আছে ওই স্বপ্ন দেখা মানুষটার মুখের দিকে। কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওকে। কোভালস্কীর মনে হলো যে, মানুষটা বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে। পুরুতঠাকুর যেন বরকনের দুহাত এক করে দিলেন।

কিন্তু না! রিক্সাওলা হাসারির অক্ষম স্বপ্ন দেখা নয়। বাস্তবিকই নিসার নামে ছোঁড়াটা সোনার খনির সুলুক-সন্ধান জানে। জানে এল্‌ডোরাডোর দেশ, সোনার লংকার দেশের হদিশ। ভোর হলেই ঠোঁট-কাটা ছেলেটা কাঁধে বাঁদর নিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ে। ও যেখানে যায় সে জায়গাটা আপতদৃষ্টিতে সোনার লংকা মনে না হতেও পারে। অন্তত মিউনিসিপ্যালিটির রেকর্ডপত্রে জায়গাটার যে পরিচয় আছে, সেটা অন্যরকম। একদিন এখানেই শহরের অনেকগুলো লাইসেন্সবিহীন রিক্সাগাড়ির বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। তবে যে শহরে পড়ে থাকা কুটোটিও দাম দিয়ে কিনতে হয়, সেখানে খানা, ডোবা, আঁস্তাকুড় ঘেঁটেও মানুষ নামক কীটের দল লাখটাকার মানিক তুলে আনে। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো পোস্টারের টুকরো বা ভাঙা পেরেকটাও লোকের নজর এড়িয়ে যায় না। কারণ সেটা বেচলেও মানুষ দুটো পয়সা রোজগার করে। সুতরাং শহরের একমাত্র জঞ্জাল-ভাগাড়টাও যে মনুষ্য-কীটের প্রত্যাশার বিচরণভূমি হবে তাতে সন্দেহ কি! এইরকম হাজার হাজার মানুষ-কীটের মতন নিসারও একজন। রোজ সকালে সে তাই এখানে ছুটে আসে। এখন থেকে ওর সঙ্গে আরও চারজন কুড়োনিও আসবে। শম্ভুকে দলে নিতে রাজী হয়েছে নিসার। তাই আগের দিন রাত্রেই হাসারিকে সতর্ক করে দিল নিসার। বললো, 'কাল সকালে কাক ডাকার আগেই ও যেন তৈরি হয়ে নেয়। ভোর হলেই আমরা বেরুবো।'

সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নিসার যখন হাওড়া ব্রিজের মুখের কাছে এল, তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। সেই সাত সকালেই বাসগুলো যাত্রী বোঝাই হয়ে ছুটছে। এইরকমই একটা বাস দেখিয়ে শম্ভুকে সে বাসের পেছনে রাখা অতিরিক্ত চাকার ওপর চড়ে বসতে বললো। অন্যদের নিয়ে সে উঠলো সামনের চাকার বাম্‌পারের ওপর। প্রতিদিন এইভাবে হাজার হাজার যাত্রী বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করে। তবে এইরকম অবৈধ বাসবিহারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো বাসের কণ্ডাকটাররা। এরাই মূলত এইরকম অবৈধ কারবারের আসল অংশীদার। জাল টিকিটের বিনিময়ে এরা যাত্রীদের পারাপার করায় এবং লভ্যাংশটা নিজেদের পকেটে পোরে। তবে এদের যাতায়াতের ঝুঁকি ওরা নেয় না। সে দায় যাত্রীদের। কলকাতার মতন জনাকীর্ণ শহরে সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন শরীরের ভারসাম্য ঠিক রেখে বিপজ্জনকভাবে তারা যাতায়াত করে। বাসের দরজা জানলার সঙ্গে মাছির মতন সেঁটে যাতায়াত করতে গিয়ে, কখন যে খসে গেল কেউ জানলো না। তখন হয় বাসের ধাক্কা খায় কিংবা পেছন থেকে তাড়া করে আসা লরির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে বেঘোরে মারা যায় হতভাগ্যরা। কেউ কেউ আবার ট্রামের ঝোলানো তারের

গায়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্থির হয়ে যায়।

এইভাবে অনেকক্ষণ বাস যাত্রার পর সৈন্যাধ্যক্ষ নিসারের আদেশ শুনলো সাঙ্গাতরা। 'নেমে পড় এখানে!'

আদেশ শোনামাত্রই সবাই নেমে পড়েছে তখন। বেশ বেলা। রীতিমত গা ঝলসান রোদের তেজ। ওরা যেখানে নামলো সেটাই পূর্বকলকাতার শেষ শহরতলি। মসৃণ পীচের রাস্তার দুপাশে দিগন্তবিস্তৃত জলা জমি। শম্ভুর চোখে তখনও ভোরের ঘুম লেগে আছে। চোখ দুটো বেশ করে রগড়ে সে ফের তাকালো। প্রায় মাইল দেড়-দুই ধরে ছড়ানো আছে স্যাঁতস্যাঁতে জমি। তারপর জঞ্জালভাগাড়। সেদিকে চেয়ে শম্ভু বললো, 'ওই ওখানে?' শম্ভু দেখতে পেয়েছে ভাগাড়টা। আকাশটা কালো হয়ে আছে শকুনের কালো ডানায়।

শম্ভুর কথায় মাথা নাড়লো নিসার। ওর এক কাঁধে পুরনো চটের থলি, অন্য কাঁধে বাঁদরটা বসে নিসারের চুলের ভেতর থেকে উকুন খুঁটে খাচ্ছে। দলপতি নিসার আগে আগে চলেছে। ওর পেছনে চলেছে অন্যরা। কুড়োনির জীবনটা আজকাল ওর বেশ ভাল লাগে। মুক্ত স্বাধীন জীবন। রোজ সকালে দামী কিছু পাবার প্রত্যাশা নিয়ে নিসার এখানে আসে। কখনও প্রত্যাশা পূরণ হয়, কখনও পূরণ হয় না। প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর একটা উৎকট পচা গন্ধ ভক্ করে শম্ভুর নাকে লাগলো। একদিন রিক্সাচালক হাসারিরও একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেদিন এখানেই রিক্সার বহ্ন্যুৎসব হয়েছিল। কটু গন্ধটা আসছে ওই ভাগাড় থেকে। তবে সদ্য গ্রাম থেকে আসা হাসারির নাকে গন্ধটা যতখানি ঝাঁঝাল লেগেছিল, ততটা কটু ফুটপাতে মানুষ হওয়া শম্ভুর নাকে লাগলো না। অবশ্য আজকাল হাসারি গ্রামের মাটির সেই মিষ্টি সোঁদা গন্ধটা আর পায় না। সে গন্ধ হারিয়ে গেছে অনেকদিন। ওরা নিঃশব্দে দলপতি নিসারকে অনুসরণ করে চলেছে। শম্ভু দেখলো যে শুধু চিল শকুন নয়, জঞ্জালভাগাড়টা তখন মেয়ে-পুরুষ কুড়োনিতে ভরে গেছে। ময়লা ফেলা লরিগুলো যেখানে জঞ্জালের স্তূপ ফেলে, ভাগাড় শুরুর সেই মুখ থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে এসে নিসার দলবল নিয়ে থামলো।

দলপতি নিসারকে নিয়ে ওরা মোট পাঁচজন। সবাই আদেশের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে নিসারের দিকে। নিসারের সন্ধানী চোখ দুটো দ্রুত একবার যাচাই করে নিল জঞ্জালভাগাড়টা। তারপর সাংগোপাংগদের দিকে চেয়ে নিসার হুকুম করলো, 'শোন! আজ হাসপাতাল আর হোটেলের লরি আসবে। অনেকরকম মাল থাকে ওই লরিতে। সুতরাং যা করবার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওদের একটা মালও আমরা যেন না হারাই। মনে থাকবে তো?' কাটা ঠোঁটের ভেতর থেকে নিসারের হুকুমটা শিসের শব্দের মতন তীক্ষ্ম শোনাল।

নিসার ঠিকই বলেছে। হপ্তায় একদিন হোটেল এবং হাসপাতাল থেকে লরিগুলো জঞ্জাল বয়ে আনে। তারপর এই ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে যায়। লরিগুলোর চেহারা দেখলেই কুড়োনিরা প্রায় উন্মাত্তের মতন লরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটাই স্বাভাবিক। আসল হীরে মানিক এই লরিগুলোই নিয়ে আসে। জঞ্জালের গাদার নীচেই লুকিয়ে থাকে আঁস্তাকুড়ের মনিমুক্তো। ফ্ল্যাক্স, ব্যাণ্ডেজ, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, কয়লার চাঙড়, নানারকম খাবারদাবার ইত্যাদি।

নিসারকে তখন দলের পান্ডার মতনই দেখাচ্ছে। শম্ভুর দিকে চেয়ে রীতিমত কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে হুকুম দিল সে। 'শম্ভু! তুই ওই নিচু নালার ভেতরে লুকিয়ে

বসে থাকবি। যেমনি দেখবি লাল ন্যাকড়া ঝোলানো কোনো লরি আসছে ওমনি শিস্ দিয়ে আমায় জানাবি। খবর্দার! মোটেই যেন ভুল না হয়!'

শম্ভুকে হুকুম দিয়ে কোমরের গেঁজের ভেতর থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলো সে। তারপর নোটখানা সকলের নাকের সামনে নাড়াতে নাড়াতে বললো, 'শম্ভুর শিস্ শুনতে পেলেই টাকাটা নাড়াতে নাড়াতে আমি লরির দিকে ছুটে যাব। আমার হাতে নোট দেখেই ডেরাইভার লরিটাকে আস্তে করে দেবে। আমি গিয়ে পৌঁছলেই লোকটা আমার হাত থেকে টাকাটা তুলে নেবে। সেই ফাঁকে আমরা সবাই লরির ওপর উঠে পড়বো। তখন লরিটাকে ভাগাড়ের শেষ মাথায় নিয়ে যাবে। তারপর খাদের মধ্যে জঞ্জালগুলো ফেলে দেবে। ওই সময়টুকুর মধ্যেই আমাদের খোঁজার কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। সবাই বুঝলি তো?'

ওরা হয়ত বুঝেছে, কিংবা বোঝেনি। কিন্তু সবাই মনে মনে মৃদু উত্তেজনা বোধ করছিল। নিসারের মনে এতটুকু উত্তেজনা নেই। গলার স্বর নিরুত্তাপ। দলের পাণ্ডা যেমন নিস্পৃহ থাকে, সেও তেমনি উৎকণ্ঠাহীন। তবে নিসারের হুকুম অমান্য করার দুঃসাহসও ওদের নেই। তার নির্দেশ মতন ওরা যে যার জায়গায় গিয়ে লরি আসার অপেক্ষায় বসে রইল। অন্য কুড়োনিরাও ব্যস্ত। নিবিষ্ট মনে ওরা জঞ্জাল ঘেঁটে চলেছে। এদের বেশীরভাগই মেয়ে বা বাচ্চা। এরা সবাই কাছা-কাছি বস্তিতে থাকে। পুরুষেরা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। মরা জন্তুজানোয়ারের নাড়িভুঁড়ির সঙ্গে জলে ভেজানো শাকসব্জি মিশিয়ে মুখবন্ধ হাঁড়ির মধ্যে পুরে সেগুলো এঁদো পুকুরের পচা জলের পাঁক কাদার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। কিছুদিন রাখার পর পানীয়টির পচন ক্রিয়া শুরু হয়। তখন পুকুরের তলা থেকে হাঁড়িগুলো তুলে তাপ দিয়ে তরল বস্তুটা ঘন করা হয়। তারপর চুয়ানো ফোঁটা ফোঁটা রস আলাদা বোতলে ভরতি করে শহরের চোলাই ঠেক্গুলোতে চালান করে। এই দিশি পানীয়র নাম 'বাঙ্লা'। একদিন হাসারিও রাম আর মানিকের সঙ্গে চোলাই 'ঠেক্' থেকে এই দিশি পানীয়ের রসাস্বাদন করেছিল। এ কড়া বস্তু উদরস্থ করলে নাকি মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে ওঠে। তবুও এই কুখ্যাত 'বাঙ্লা' খেয়ে প্রতি বছর যত মানুষ মরে, তত মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও মরে না।

পরপর তিনখানা হলুদ রঙের লরি এল। কিন্তু একটা গাড়িতেও লাল রঙের ন্যাকড়া নেই। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছে। শম্ভুর মনে হলো সাঙাত্রা এবার হয়ত অধৈর্য হয়ে ফেটে পড়বে। তার চোখের সামনে তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য ঘটছে। শম্ভুর মনে হলো এমন দৃশ্য সে আগে কখনও দেখে নি। সেই চোখ ঝলসান আলোয় যেন এক ব্যালে নাচের আসর বসেছে। আশ্চর্য সেই নাচের আসর। একদল মেয়ে আর বাচ্চা জঞ্জাল পাহাড়ের মাথার ওপর ছুটোছুটি করছে। ওদের এক হাতে ঝুড়ি, অন্য হাতে একটা আঁকশি। একটা করে লরি দেখছে আর ওদের ছুটোছুটি বেড়ে যাচ্ছে। উত্তেজিত মানুষগুলো লরির দিকে ধাওয়া করছে। লরি থেকে জঞ্জাল ঢেলে দেবার পর ওরা যেন পাগলের মতন আলুথালু হয়ে যায়। গন্ধকের কটু ধোঁয়ায় নিশ্বাস তখন বন্ধ হয়ে আসে। জঞ্জাল ঢেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রস্ত খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। অতগুলো পায়ের দাপাদাপিতে উঁচু-নিচু জঞ্জালের ঢাল দেখতে দেখতে চৌরস হয়ে যায়। শম্ভু হাঁ করে চেয়ে দেখছিল ওদের কাণ্ড। লরির তলায়, অনায়াসে-ঢুকে যাচ্ছে বাচ্চাগুলো। তারপর হাতের আঁকশি দিয়ে নোংরা ঘেঁটে খাদ্যবস্তু বার করে আনছে। এদের মধ্যে যে কতজন

বাচ্চা জঞ্জালের চাপে নিশ্বাস আটকে মারা যায় কে জানে! হয়ত ট্রাকের চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মরেও কেউ কেউ। ভাবতে ভাবতে শম্ভুর শরীরটা ভয়ে অবশ হয়ে এল। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল যেন। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে কি অমন দুঃসাহসী হতে পারবে? হঠাৎ সে দেখলো আর একটা লরি আসছে। এটা চার নম্বর লরি। কিন্তু এটাতেও লাল কাপড়ের নিশানা নেই। তার চোখের সামনে কুড়োনিদের নাচ তেমনি চলেছে। রোদের ঝাঁঝ থেকে বাঁচার জন্যে বউঝিয়েরা মাথায় লাল কাপড়ের ফেটি বেঁধেছে। দূর থেকে ওদের নবাব হারেমের বেগমের মতন দেখাচ্ছে। ছেলেদের মাথায় ফুটোওলা টুপি, পায়ে বড় সাইজের ছেঁড়াখোঁড়া জুতো। অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওদের। ঠিক যেন চার্লি চ্যাপলীনের প্রথম দিকের ছায়াছবির চেহারা হয়েছে ওদের। ছেলে-মেয়েদের খোঁজার বস্তু আলাদা। মেয়েরা খুঁজছে কয়লার চাঙড়, কাঠের টুকরো ইত্যাদি। বাচ্চাদের পছন্দ চামড়ার তৈরি জিনিস, প্লাস্টিকের টুকরো, রঙিন কাঁচ, কাগজ, আরও কত কি। তবে ভোজ্যবস্তুর ওপর টানটাই সবচেয়ে বেশী। আস্ত পচা ফল, তরকারির খোসা, পাঁউরুটির মাথা ইত্যাদি। জঞ্জাল থেকে এগুলো খুঁড়ে বার করার ঝুঁকি অনেক। শুধু মানুষ নয়, চিল শকুনও তাক করে বসে থাকে। হঠাৎ কোথেকে টর্পেডোর মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা শকুন, তারপর বাচ্চার হাতে ধরা মাংসের খণ্ডটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। খাদ্যবস্তু অন্বেষণের এই প্রতিযোগিতায় মানুষের সঙ্গে অন্য জন্তুরাও আছে। শুয়োর, কাক, নেড়ি কুকুর, এমনকি রাত বিরেতে হায়না, শেয়ালও এই ভাগাড়ে এসে খাবার খুঁজে বেড়ায়। এরা ছাড়াও আছে লক্ষ লক্ষ পোকা-মাকড় আর মাছি। মাছির আক্রমণটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। সবুজ রঙের অসংখ্য মাছি সর্বক্ষণ ভন্‌ভন্‌ শব্দে মানুষের চারপাশে ঘুরছে। হাতে পায়ে মুখে বসছে স্বচ্ছন্দে। কখনও বা কান বা নাকের ফুটোর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কুৎসিত মাছি-গুলো। জঞ্জালস্তূপের মধ্যে যতরকম পচাগলা জিনিস আছে এ সবের ওপর ওদের অধিকারটাই যে সবচেয়ে কায়েমী, তা বোধহয় সবারই জানা।

এই ভয়ঙ্কর জঞ্জাল ভাগাড়টা যেন এক দুঃস্বপ্নের জগৎ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ভীতিকর পরিবেশেও স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রয়োজনগুলো ঠিকই মিটে যাচ্ছে। শম্ভু অবাক হয়ে গেছে এই ব্যবস্থা দেখে। পচা নোংরা ময়লার ওপর দিয়েই বরফওলা মিষ্টি সরবত বা আইসক্রিম ফিরি করে বেড়াচ্ছে। একদিকে দেখলো যে ভিস্তিতে জল ভরে নিয়ে এসেছে ক'টা মানুষ। দু-চার পয়সার বদলে জলের বোতল মুখে পুরে তেষ্টা মেটাচ্ছে মানুষগুলো। ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে আলুর টিকিয়া বেচছে একজন। এমনকি বোতলে পুরে 'বাঙ্‌লা' বিক্রি হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক লাগলো কোলের বাচ্চাদের দেখাশোনার ব্যবস্থা দেখে। ছাতার তলায় সারি সারি বসে আছে অনেকগুলো ছোট ছোট মেয়ে। তাদের কাছে কোলের বাচ্চাদের দিয়ে মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে ময়লা ঘেঁটে বেড়াচ্ছে।

কেনাবেচার একটা ছোটখাট বাজার বসে গেছে ওই ভাগাড়ে। যারা পুরনো 'মাল' কেনাবেচা করে, তারাও হাজির। কুড়োনিরা যা পাচ্ছে তখনই সেগুলো এদের কাছে বেচে দিচ্ছে। লুঙ্গি আর পিরান পরা লোকগুলো হাতে পুরনো আমলের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজন করছে আর বস্তায় পুরছে। এরা খুচরা ব্যাপারী। সন্ধ্যে নাগাদ পাইকাররা লরি নিয়ে এসে পড়বে। তাদের কাছে সংগৃহীত মালগুলো এরা বেচে দেবে। পাইকাররা এইসব মাল নিয়ে কারখানায় চালান করবে ঝাড়াই বাছাই

করে।

এইসব দেখতে দেখতে একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল শম্ভু। হঠাৎ তার মনে হলো অনেক দূরে যেন একটা লাল বিন্দু সে দেখতে পেয়েছে। রোদের ঝিকিমিকি আলোয় চোখদুটো বড় করে সে তাকিয়ে রইল। ঠিক তাই। ক্রমে লরির চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ড্রাইভারের কেবিনের জানলা দিয়ে একটা লাল কাপড়ের টুকরো বাতাসে দুলছে। শম্ভুর বুক উথালপাতাল হতে শুরু করেছে তখন। লরির চেহারাটা আর একটু স্পষ্ট হতেই মুখের মধ্যে আঙুল পুরে সে চড়া শিস্ দিল। শিস্ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নিসারের ছোটখাট শরীরটা দেখতে পেল শম্ভু। কাঁধে বাঁদরটা নিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিসার। আর ধুলোর মেঘের আস্তরণ ভেদ করে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অস্পষ্ট লরিটা দেখবার চেষ্টা করছে। একটু পরেই নিসার নিশ্চিন্ত হলো, আর তখনই হাতে পাঁচ টাকার নোটটা নিয়ে দৌড় দিল লরিটার দিকে। নিসারের পিছু পিছু ওরাও ছুটেছে তখন। ততক্ষণে নিসারের হাতের নোটখানা ড্রাইভার দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির গতিবেগ কমে গেল। তখন নিসারও পৌঁছে গেছে লরির কাছে। ড্রাইভার নিচু হয়ে ছোঁ মেরে টাকাটা তার হাত থেকে তুলে নিল। লরিটা তখন প্রায় থেমে গেছে। নিসার ইঙ্গিত করতেই ওরা দলবল সমেত টিকটিকির মতন লরির গা বেয়ে লরির ওপর উঠে পড়লো। লরিও তখন চলতে শুরু করেছে। ওপরে উঠেই নিসার হুকুম দিল, 'সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড় এবার!'

লরিটা তখন পাহাড়ের মতন উঁচু জঞ্জালস্তূপের গা বেয়ে উঠছে। ঢালু গা। তাই গাড়ির আবর্জনার মধ্যে এমনভাবে শরীরগুলো মিশিয়ে দিয়েছে, যেন বাইরে থেকে ওদের দেখা না যায়। চটচটে আঠাল আবর্জনা। বিকট দুর্গন্ধে শরীর যেন জ্বালা করে। কোনরকমে শরীরটাকে নিমজ্জিত করে রেখেছে ওরা। তবে সবচেয়ে অস্বস্তিকর হলো আরশোলা, শুঁয়োপোকা জাতীয় জীবগুলোর উপদ্রব। হাত, পা, মুখ—সারা শরীরটা যেন ওদের নির্ভীক বিচরণ-ক্ষেত্র। গায়ের ওপর দিয়ে অসংকোচে লাফালাফি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জঞ্জালস্তূপের মাথায় উঠে লরিটা হঠাৎ অন্যদিকে চলতে শুরু করলো। ড্রাইভারের সঙ্গে নিসারের এটা এক শর্ত। তাই যেখানে অন্য ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, তার উল্টোদিকে লরিটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার। লুণ্ঠন সম্পন্ন করতে নিসারের দলবল দশ মিনিট বেশী সময় পাবে এর দরুন। মার্কিন ছায়াছবিতে লুণ্ঠনকারীরা যে প্রথায় লুঠতরাজ করে, অনেকটা সেইরকম। আবর্জনাস্তূপের সম্পূর্ণ দখলটি এখন এদের এক্তিয়ারভুক্ত। মূল্যবান যা কিছু সে-সবই সংগ্রহ করে নিতে হবে এই সময়টুকুর মধ্যে। ততক্ষণে জঞ্জাল লরির গা বেয়ে জলস্রোতের মতন হুড়হুড় শব্দে আবর্জনাস্তূপ পড়তে শুরু করেছে। ছেলেগুলো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই স্খলিত জঞ্জালপিণ্ডের ওপর। বিপুল বেগে লরির গা বেয়ে সেই জঞ্জালপিণ্ড নামছে আর আঁকশির খোঁচায় লুণ্ঠিত দ্রব্য আলাদা করে রাখছে ওরা। যতক্ষণ অন্য কুড়োনিরা এসে না পৌঁচচ্ছে ততক্ষণই ওরা নিশ্চিন্ত। সুতরাং ক্ষিপ্র হাতে লুণ্ঠনকারীরা 'মাল' সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আস্ত কাঁচের বোতল, রান্নার টুকিটাকি সরঞ্জাম, কাঁচের থালা, পেয়ালাপিরিচ, একটা কাঠের টুল, ভাঙা একখণ্ড মোজেইক টালি, পুরনো টুথপেস্টের টিউব, ক্ষয়ে যাওয়া ব্যাটারি, খালি টিনের কৌটো, প্লাস্টিক, একখণ্ড দামী কাপড়। দেখতে দেখতে ওদের থলি ভর্তি

হয়ে গেল চোরাই মাল-এ।

নিসার কিন্তু সর্বক্ষণই নজর রেখেছে অন্য কুড়োনিদের দিকে। হঠাৎ সে ওদের দেখতে পেল। টের পেয়ে পাগলের মতন ছুটে আসছে ওই ক্ষিপ্ত জনতা। নিসার জানে যে ওই ক্ষিপ্ত জনতা এসে পড়ার আগেই দলবল নিয়ে ওকে সরে পড়তে হবে। নইলে ওই বঞ্চিতদের হাতে অনেক হেনস্থা হবে ওদের। সুতরাং নিসার হেঁকে উঠলো, 'শীগগির শেষ কর্! ওরা আসছে।'

নবাগত হলেও লুঠের নেশায় তখন মাতাল হয়ে গেছে শম্ভু। নিসারের হুকুম কানে যেতে শেষবারের মতন সেই নোংরা জঞ্জালস্তূপের মধ্যে সে আঁকশিটা ঢুকিয়ে দিল। হঠাৎ তার মনে হলো চটচটে জঞ্জালের ভেতরে একটা কি বস্তু যেন রোদের আলোয় চকচক করে উঠলো। 'কি হতে পারে ওটা? টাকা?' কথাটা মনে হতেই আঁকশি দিয়ে আশপাশের জঞ্জাল সরিয়ে দিল শম্ভু। তারপর আঁকশির মুখে জিনিসটাকে অন্ধকার বিবর থেকে তুলে আনলো। শম্ভুর চোখ তখন বিস্ফারিত। চেঁচিয়ে উঠলো নিজের অজান্তেই। 'পেয়েছি! পেয়েছি!' সাঙাত্‌রা সবাই তখন ছুটে এসেছে শম্ভুর কাছে। সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখছে আঁকশির মুখে ঝুলছে সোনার তৈরি একটা ব্রেস্‌লেট-ঘড়ি।

কেমন যেন নির্বোধ হয়ে গেছে হাসারি। বোকার মতন হাঁ করে চেয়ে আছে অমূল্য জিনিসটার দিকে। সবার পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত নিতান্ত সন্তর্পণে জিনিসটা হাতে নিল সে। তারপর অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমনভাবে দেখতে লাগলো যে মনে হলো জিনিসটা বোধহয় ভগবানের পায়ে অর্পণ করবে। আসলে কানের কাছে ধরে ঘড়িটার টিকটিক শব্দ শুনতে চাইছিল সে। উঠানে সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো মুখে কথা নেই। জিনিসটা হাতে নিয়ে চিত্রার্পিত হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে। হাসারিও চুপ। হয়ত ঘড়ির টিকটিক শব্দের সঙ্গে নিজের হৃদস্পন্দন মিলিয়ে একটা সান্ত্বনা পেতে চাইছিল সে।

ঠিক তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। কি এক দুর্বোধ্য ঐশ শক্তির প্রভাবে একটা ঘূর্ণি বাতাস পাক খেয়ে গেল ওদের ঘিরে। প্রবল ঝাপটা এসে লাগলো বাড়ির ছাতে। একটা ভাঙা টালি খসে পড়লো চাল থেকে। আকাশের এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে গমগম শব্দে ধ্বনিত হলো মেঘের ডাক। চকিত সেই মেঘের ডাক শুনে ওরা সবাই তখন আকাশের দিকে তাকিয়েছে। কালো মেঘের পুঞ্জে সারা আকাশ ছাওয়া। কুড়িয়ে পাওয়া মূল্যবান জিনিসটা হাতে নিয়ে হাসারিও তাকালো আকাশের দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। তার মনে হলো ভগবান সত্যিই করুণাময়। তাই মুখ তুলে চেয়েছেন এই হতভাগ্য মানুষটার দিকে। বর্ষা আসছে। আর কোন দুশ্চিন্তা নেই তার। মাভৈ! সবই তাঁর কৃপা। তাই পাঁচশো টাকা আর ঘড়িটা পেয়েছে অযাচিত ভাবে। এবার বর্ষার আগমনে তার ঊষর ভাগ্য আর্দ্র হবে। মেয়ের জন্যে একটি ভাল ফুটফুটে বর এবার সে নিশ্চয়ই যোগাড় করতে পারবে।

সাতষট্টি

'শহর আমাদের দিষ্টি বদলে দিয়েচে গো!'

আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বললো হাসারি। 'গেরামে থাকতি দিনের পর দিন আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতি হতো। কখন ম্যাঘ জমবে, কখন বর্ষা নামবে! তার জন্যে কত ধন্না, কত পুজোপাব্বন, কত কি! পুণ্যিপুকুর ব্রেতো, অশথপাতার ব্রেতো—যাতে মা-লক্ষ্মী রুষ্ট না হন। তিনি রুষ্ট হলে সবই হাহা শূন্যি। তিনি খুশী হলেন, তবে বিষ্টি নামলো, শস্যসম্পদ রক্ষে পেল। ভূমি গভ্ভবতী হলেন, তবে না মরাই ভরা ধান পেল চাষী! কিন্তু কলকেতায় বিষ্টি হলে ভূমি উর্বরা হয় না। কলকেতায় ভূমি নাই। মা-লক্ষ্মী রয়েচেন গেরামে। এখেনে সব পাথরের পথঘাট। সেখান দিয়ে বাসগাড়ি, টেরাক চলে। এ মাটিতে শস্যসম্পদ হয় না। তবে আকাশ থিক্যা জল ঝরলে শহরের মানুষের আঁতেও খুশী উথলে উঠে। আগুন ঝরা দেহগুলি ত্যাখন শীতল হয়। আনচান করা পেরানটা শান্তি পায়। শহরের ইঁটকাঠের মধ্যে গরমের তাত বড় নিষ্ঠুর গো! পথ দিয়ে চলতি চলতি হঠাৎ কখন নেতিয়ে পড়ে শরীল, কেউ জানলো না। ত্যাখন রিক্সার হাতল দুটি নামিয়ে রাখার সময়টুকুও পায় না কেউ। ঢলে পড়লো রিক্সার সীটের গায়ে। যেন পাকা ফলটি বোঁটা থেকে খসে পড়লো। যে সূয্যিদেবের কোপ পেল তার আর রক্ষা নেই। মরণ তার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েচে ত্যাখন।'

সে রাত এবং পরের সারা দিনটা কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে রইলো। সারা শহরটা কালো আঁধারে ডুবে আছে। থমথম করছে পরিবেশ। সে এক ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য। ধোঁয়া এবং ধুলোর সঙ্গে মিশে মেঘের চেহারা হয়েছে মিশকালো দৈত্যের মতন। মনে হয় আকাশটা কালো চাদর মুড়ি দিয়েছে। যেন শনি নামক গ্রহ, যিনি অহিতসাধন করেন, তিনি যেন শ্বাসরোধ করে মানুষকে শাস্তি দিতে চাইছেন। যথার্থই কলকাতার সব মানুষের শ্বাসরোধকর অবস্থা তখন। কোথাও এক ফোঁটা বাতাস নেই। সবাই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কথায় কথায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে পুলিস ; হাতের খেটে নিয়ে তাড়না করছে হাসারির মতন অসহায় রিক্সাচালকদের। হাসারিরও রিক্সা টানতে কষ্ট হচ্ছিল তখন। উড্ স্ট্রীটের জঞ্জালস্তূপের মধ্যে চরে বেড়ানো কাক বা ইঁদুরগুলোর আচরণও যেন কেমন কেমন। বাচ্চারা কান্না থামাচ্ছে না। রাস্তার কুকুরগুলো সর্বক্ষণই ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। হাসারির মনেও যেন ভয় ভয় ভাব। তবে কি কলিকালের শেষ হতে চললো?

পথ চলতে চলতে অসুস্থ হওয়া কত মানুষ হাসারিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে। ওরা হাসপাতালে গিয়ে শ্বাসকষ্টের উপশম করাতে চায়। কিন্তু হাসারি জানে হাসপাতালে গিয়ে ওদের শান্তি হবে না। 'হাসপাতালের অরা মানুষকে শান্তিতে মরতেও দেয় না। সেটুকু দয়াধম্মও ওদের নেই।' কিন্তু সেদিন হাসারির অন্যরকম অনুভূতি হলো। লোয়ার সার্কুলার রোডের মুখে ফুটপাতের ওপর বসে একজন বুড়ী হাঁপাচ্ছিল। মানুষটার শরীর শুকনো। কার্ডবোর্ডের মতন শক্ত খস-খসে হয়ে গেছে বুড়ীর গায়ের চামড়া। বুড়ীর শুকনো আমসি চেহারাটা দেখে মনে

মনে ভারি কষ্ট পেল হাসারি। একটা ডাব কিনে তার ঔষধের জল খাওয়াল ফোঁটা ফোঁটা। তারপর বুড়ীকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢোকার সময় হাসারির মনে পড়ছিল সেই বন্ধুটির কথা। এখানেই সে মারা গিয়েছিল সেদিন। সে আজ কতদিনের কথা যেন। ভুলেই গিয়েছিল মানুষটাকে হাসারি।

এইরকম দম্‌সম্‌ ভাবটি আরও দিনতিনেক চললো। তিনদিন পর একটা প্রবল ধুলোবালির ঘূর্ণিঝড় উঠলো। বর্ষার আগে যেমন হয় প্রায় সেইরকম। দেখতে দেখতে সারা শহরটা হলুদ রঙের বালির চাদরে ঢাকা পড়ে গেল। হাসারির মনে হলো যেন রাশি রাশি বালি উড়ে আসছে হিমালয় পাহাড় থেকে। বালির ঝড় এক ভীতিকর অবস্থা। ধেয়ে আসা বালির রাশি মানুষের নাকমুখ ভরিয়ে দেয়। সেদিন হয়ত এরই তাণ্ডবে কিংবা হয়ত নিজেরই রোগের জ্বালায়, হঠাৎ কাহিল বোধ করতে লাগলো হাসারি। শরীরটা আর যেন টানতে পারছে না। রিক্সার ভারটা এত চেপে বসেছে যে, মনে হচ্ছিল ডাণ্ডা দুটো হাত থেকে খসে পড়বে। তাড়াতাড়ি রিক্সাটা রাস্তায় নামালো সে। বুকের ওপর এক অসহনীয় চাপ। হাত-পা-ওলা মানুষটা যেন আর মানুষ নেই। রিক্সার সীটের ওপর শরীরটাকে শুইয়ে দিল হাসারি। পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। সেই অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগলো হাসারি। কিন্তু বুকের চাপ বেড়েই চলেছে। দৃষ্টি ঝাপসা। মাথার মধ্যে বিনবিন শব্দ। পেটের মধ্যে কেমন একটা মোচড়। কতক্ষণ এইভাবে শুয়েছিল সে জানে না। হয়ত অনেকক্ষণ। বেলা দেখে বোঝার যো নেই। সকাল থেকেই সূর্যিঠাকুর মেঘের তলায় চাপা পড়ে আছেন। এইভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে সে যেন হারিয়ে গেল সময়ের মধ্যে। তার মনে হলো সে বোধহয় সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না।

এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন আরও কতদিন চলবে কে জানে। তখনই ইঁদারা আর টিউবওয়েলগুলো শুকনো খটখটে হয়ে গেছে। বস্তির মানুষগুলোর শরীর থেকে জলবিন্দু শুষে নিয়েছে এই দুঃসহ তাপ। ম্যাক্সের ভাঁড়ার খালি করে 'সেরাম' বিলি হলো। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পুঁজি শেষ। ছ'দিনের মাথায় দুপুর নাগাদ শহরের তাপমাত্রা হলো একশ' সতেরো ডিগ্রি ফারেনহাইট। সারা বস্তিতে কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। বস্তির ঘরদোর হয়ে উঠেছে জ্বলন্ত হাপর। তবুও আকাশ থেকে এক বিন্দু জল চুঁইয়ে পড়লো না। তখন সবারই ধারণা হয়েছে এবার বর্ষা আসবে না। ভয়ঙ্কর শেষের মুহূর্তটি অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে। বস্তির মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে সবাই সেই মুহূর্তটির জন্যে তখন অপেক্ষা করছে যখন কর্মের চাকা আর ঘুরবে না। তাদেরও বেঁচে থাকার জ্বালা জুড়োবে।

পরের দিন দু-একটা ঝোড়ো বাতাস উঠলো। একটু শীতল হলো পরিবেশ। মানুষগুলোও যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। কিন্তু দুপুর নাগাদ আবার সেই অবস্থা। তাপমাত্রা আগের দিনের মতই চড়ে গেছে তখন। মিউচ্যুয়্যাল এইড্‌ কমিটির তরফ থেকে ম্যাক্স এবং বন্দনা দারুণ ব্যস্ত। গরম যত বাড়ছে ওদেরও পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সানস্ট্রোকের রোগীদের পাশে গিয়ে তাদের রোগের আরাম দেবার চেষ্টা করছে ওরা। ডাক্তারখানার সামনেও রোগীদের লম্বা লাইন।

সেদিন এমনি একজন রোগী দেখে ক্লান্ত হয়ে ঘরে এল ম্যাক্স। চেয়ারের ওপর চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে রইল। দেহ যেন আর বইছে না। হঠাৎ একটা মৃদু সুবাস পেল সে। মনে হলো যেন জ্বরতপ্ত কপালের ওপর একটা ঠাণ্ডা শীতল

ছোঁয়া পেল। চোখ খুললো ম্যাক্স। কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বন্দনা। একটু ঝুঁকে রয়েছে তার তরতাজা নরম মিষ্টি মুখখানা। বন্দনার শীতল কোমল হাতের ছোঁয়ায় কেমন যেন রোমাঞ্চ আছে। ম্যাক্সের গা শিরশির করে উঠলো। উত্তপ্ত, বাতাসহীন ঘরের মধ্যে থমথম করছে ইথার এবং য়্যালকোহলের চড়া গন্ধ। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে বন্দনার যুবতী শরীরের ছোঁয়া যেন মাতাল করে দিল ম্যাক্সকে। সে প্রায় আঁকড়ে ধরলো বন্দনার হাত দুটো। তারপর সবলে টেনে আনলো নিজের দিকে। ঠিক এইরকম অবস্থার জন্যে তৈরি ছিল না বন্দনা। কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল মেয়েটা। বাইরে দাঁড়ানো মানুষগুলোও তেমনি হতবাক। প্রেম নিবেদনের ঠিক এমন প্রকাশ্য দৃশ্য তারা আগে দেখ নি। এমন ঘটনা যেন ভাবাও যায় না। যথার্থই বিরল এ দৃশ্য এ দেশে।

বোধহয় ওদের উষ্মার আঁচটুকু বুঝতে পেরেছে ম্যাক্স। তাই তখনই বন্দনার হাতটা ছেড়ে দিল সে। তিরতির করে কাঁপছে বন্দনার শরীরটা। ছাড়া পেতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তীরবেঁধা পাখির মতন। বন্দনার সুগন্ধী রুমালখানা তখনও পড়ে আছে টেবিলের ওপর। রুমালটা তুলে ম্যাক্স তার কপালের ওপর রাখলো। 'আঃ! কি শান্তি!' ঠিক তখনই তার মনে হলো এমনি মিষ্টি গন্ধ সে আর একদিন পেয়েছিল। খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। তাই মনের তলায় চাপা পড়ে যায় নি সেই মধুর স্মৃতি। ম্যাক্সের মনের পরদায় তখন ভেসে উঠেছে সেই অপরূপা মনুবাঈ চ্যাটার্জির ঝলমলে চেহারাটা। বস্তির এই জরাজীর্ণ পরিবেশে ছবিটা কত অসত্য! যেন চুম্বকের টান আছে মনুবাঈ-এর শরীরে। তাই, ছবিটা মনে পড়তেই বন্ধ বস্তিঘরের বাতাসহীন গরমেও শরীরে কাঁপুনি ধরলো তার। সেদিনের সেই মধুর রাতটি যেন ম্যাক্সের জীবনে এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ এনে দিয়েছিল। এমন ঐশ্বর্যের রোশনাই, যা বস্তির দীনহীন পরিবেশে ঠিক মানায় না। তাই সে বেমালুম ভুলে গেল বস্তির কথা। মোহিনী নারীর সেই সোহাগস্পর্শ, মখমলের সেই বাসরশয্যা যেন ভারতবর্ষের আসল চেহারাটা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছিল একরাতের ভালবাসা দিয়ে মোহিনী নারী যেন তাকে নতুন করে আর এক কলকাতার ছবি দেখিয়েছে। এ কলকাতা রূপরম্যা, ভোগসুখশালিনী। এ কলকাতা দীনহীন, রিক্ত নয়। বিকশিত পুষ্পশোভিত হয়ে এ শহর-বাসও রমণীয় হয়ে উঠতে পারে। স্বাদু ভোজ্য এবং পানীয়তে পরিপূর্ণ সুখভোগের সুখী তৃপ্ত জীবনের স্বাদ এখানেও পাওয়া যায়। ভোগবাসনার সবটুকু উপকরণই এখানে বিদ্যমান। ইচ্ছা করলেই অবিমিশ্র সুখী আত্মতৃপ্ত জীবন এখানে পাওয়া যায়। ম্যাক্স তাই কৃতজ্ঞ ওই রমণীয় নারীর কাছে। তার জন্যে কত ঋণী সে করেছে! জনরব উপেক্ষা করে একাধিক নৈশভোজের আয়োজন করেছে ওর সুরম্য ডাইনিং হল্-এ। কতদিন তাকে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়ে গেছে। আলাপ করিয়ে দিয়েছে দূতাবাসের কূটনীতিকদের সঙ্গে। নিয়ে গেছে বড় বড় ব্রিজপার্টির আসরে। টালিগঞ্জের গল্ফ্ ক্লাবের সমতল তৃণভূমির উদ্দাম সবুজ পরিবেশে ম্যাক্সের উপস্থিতি আকর্ষণীয় হয়েছে শুধু এই নারীর চেষ্টায়। ম্যাক্সের মনে হয়েছে এ শহরটার একটা রূপসী অস্তিত্ব আছে। যেখানে ভোগের অভাব নেই, অভাব নেই বিত্তসুখের। তাই প্রিয়দর্শনা, প্রেমমুগ্ধা এই নারীকে আদর করার সময় যখন তার ইন্দ্রিয়সুখইচ্ছার আঘ্রাণ পেত, যখন প্রমত্তা নারীর উচ্ছ্বসিত হাসির কলস্বন শুনতো, তখন যেন ভারতবর্ষ নামক দেশটা তার হাজার বছরের সম্মোহন আ

প্রমোদন নিয়ে ম্যাক্সের সামনে উপস্থিত হতো।

কিন্তু যে নারীর কল্যাণী ইচ্ছার সান্নিধ্য পেয়ে ম্যাক্সের মন ব্রতপালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বস্তির আর্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের প্রেরণা পেয়েছে, সে অন্য নারী। সে বন্দনা। বন্দনার প্রাসাদ নেই। মখমলের শয্যা নেই, নেই আজ্ঞাবাহী পরিচারিকা। বস্তি, কারখানা, ক্লিদে আর পাঁক ছাড়া বন্দনা আর কিছু জানে না। কিন্তু মেয়েটার এই দারিদ্র্য ওর বাইরের রূপ। এ রূপে মনভরাবার ছলাকলা নেই। ওর আসল রূপ অন্তরের। স্মিত হাসির মোড়কে মোড়া এ রূপ দেখে মন ভরে ওঠে। ওর হাসিতে কিরণ আছে, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়াবার আগ্রহ আছে, আর্ত মানুষকে সেবা দিয়ে তার রোগজ্বালার উপশম ঘটাতে পারে সে। দুঃসহ কষ্ট পাওয়া মানুষগুলো যখন রোজ ডাক্তারখানার চারপাশে এসে ভিড় করে, যখন নিরাভরণ দুঃখকষ্টের বার্তা শোনায়, তখন এই নারীই মূর্তিমতি করুণার মতন তাদের পাশে দাঁড়ায়, ম্যাক্সকে প্রেরণা দেয়। তাই একদিকে যেমন ম্যাক্সের জীবনে বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি কল্যাণী নারীর নিঃসর্ত সেবার দান ওদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক অসাধারণ মিলন-সেতু। এত-দিন এই মিলন-সেতুটি মনের অগোচরেই লুকানো ছিল। ম্যাক্স নিজেই তা প্রকাশ্য করে দিল সেদিন।

আনন্দ নগরের বন্দী শিবিরে সামান্য চোখের ইসারাও অলক্ষ্য থাকে না। সুতরাং প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটা যে অলক্ষ্য থাকবে না, তা আশাই করা যায়। অতএব কোভালস্কীর কানেও কথাটা পেঁছিল। একদিন সে নিজেই এসে সাবধান করে দিয়ে গেল ম্যাক্সকে। বস্তির জীবন হলো ফুটন্ত জলপাত্র। এমন বিস্ফোরক ঘটনায় তপ্ত পাত্রে মাতন লাগবেই। তখন পাত্রের ঢাকাটি খুলে যাবে এবং সেটি সশব্দে ফেটে যাবে। মনুবাঈ চ্যাটার্জির সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে। এর জোরে সামাজিকতার দায়টি সে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু বন্দনার সে জোর নেই। তাই রাধার মতন কুলমান তুচ্ছ করে সে অভিসারিকা হতে পারে না। পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিষেধের নানা শাসন আছে। এদের লংঘন করার শক্তি বন্দনার নেই, কারণ এই শাসনের নাগপাশে সে বন্দী। এ দেশের আর পাঁচটা যুবতী মেয়ের মতন বন্দনার ভাগ্যও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অভিভাবকদের পছন্দ করা বরের হাতেই কুমারী কন্যাকে সম্প্রদান করা হবে। এটাই সামাজিক রীতি। তাই বিয়ের আগে অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা মনে মনে তাকে কামনা করাও ব্যভিচার। শুধু বিয়ের রাত্রেই বরের সঙ্গে কনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। প্রথম দৈহিক মিলন হয় বিয়ের রাতে, ধর্মপালনের রীতি রূপে। বর-কনে পুত্র-সন্তানের জন্মদানের অঙ্গীকার নেয় এই রাত্রেই। যৌনমিলনের এটাই তাৎপর্য।

এই রীতিপালনেব ব্যাপারটা কোভালস্কীর অজানা নয়। বরং এই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিটাই তাকে অবাক করে। মাঝ রাত্রে প্রায়ই তার ঘুম ভেঙে যায়। সে লক্ষ্য করে তার আশপাশে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে কেমন যেন অস্থির ভাব। কোভালস্কী দেখতো সেই জমাট অন্ধকারে লোকগুলো বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর চোরের মতন পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল। কোভালস্কী বুঝতে পারতো মানুষগুলো স্ত্রী সম্ভোগ করতেই ঘরে ঢুকেছে।

ওই ঘটনার দিনতিনেক পরের কথা। একদিন দুপুরবেলা বন্দনা এল। তার হাতে যুঁইফুলের তোড়া। ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করছে জায়গাটা। বস্তিতে

এমন উপহারের চল নেই। সেদিনও খুব গরম। দুপুরের দিকে তাতটা যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকে বন্দনা তাকাল ম্যাক্সের দিকে। তারপর টেবিলের ওপর যুঁই ফুলের তোড়াটা রেখে বললো, 'ম্যাক্স ভাই! ভয় পেও না তুমি। তুমি একা নও। আমিও আছি তোমার পাশে। ভালমন্দ যা আসুক দুজনে ভাগ করে নেব।'

ম্যাক্স দারুণ খুশী। বন্দনার কথা শুনে সে যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। যুঁই ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে সে গভীর ঘ্রাণ নিল। যুঁইয়ের মিষ্টি গন্ধে যেন নেশা ধরায়। তখন পৃথিবীর পচা, গলা, কদর্য চেহারাটা চোখের ওপর থেকে সরে যায়। ম্যাক্সের ঘোরলাগা চোখেও বস্তির নোংরা চেহারা আর নেই। তার মনে হলো কোথাও সেই পচা দুর্গন্ধ নেই, পাঁক নেই, কুৎসিত চেহারার ইঁদুরগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে না, জ্বলন্ত তাপে শরীর পুড়ে যাচ্ছে না। ওর চোখে সত্য হয়ে ভাসছে একটাই ছবি। গোলাপি শাড়ি পরা যুবতী বন্দনা আর তার আনা ফুলের মতন একগুচ্ছ আনন্দের ওই তোড়া। ম্যাক্স তাকিয়ে রইলো বন্দনার দিকে। বন্দনাও চেয়ে আছে মরমী চোখে। তার দেহটি আবেগহীন, স্থির। ধ্যানমগ্না বন্দনাকে ভারি পবিত্র দেখাচ্ছে তখন। যেন গির্জার দেওয়ালে আঁকা ম্যাডোনার মূর্তি। ওরা অনেকক্ষণ পরস্পর চেয়ে রইল। যেন চোখে চোখে কথা বলছে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ম্যাক্স বললো, 'মিষ্টি মেয়ে! ফুলের জন্যে তোমায় ধন্যবাদ।' তারপর কোভালস্কীর প্রিয় সম্ভাষণটাই জানালো বন্দনাকে। 'তুমি জগতের জ্যোতি।' বন্দনার চোখে খুশীর চাপা হাসি। সেই হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ম্যাক্স। দুজনে নিঃশব্দে দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ এমন আত্মমগ্ন হয়ে থাকতে পারলো না তারা। হঠাৎ ছাতের ওপর যেন একটানা দুমদুম শব্দ ধ্বনিত হলো। ম্যাক্সের মনে হলো কারা যেন টালির ছাতের মাথায় ক্রমাগত পাথর ছুঁড়ছে। ততক্ষণে আশপাশের ঘরদোর থেকে চিৎকার করে মানুষরা বেরিয়ে পড়েছে। ম্যাক্স তখনও ঠিক বোঝে নি। হঠাৎ মানুষের সোরগোল ছাপিয়ে একটা প্রচণ্ড বজ্রপাতের শব্দ হলো। ঘরদোর ছাত দেওয়ালগুলো থরথর করে কেঁপে উঠলো সেই প্রবল বজ্রপাতের শব্দে। ম্যাক্স অবাক হয়ে দেখলো ভয় পাওয়া ইঁদুরগুলো সার দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছাত থেকে। ছাতের মাথার টালিগুলো তখন থরথর করে কাঁপছে সেই ভয়ংকর শব্দের প্রতিধ্বনিতে। ম্যাক্স দেখলো বন্দনার চোখ আকাশের দিকে মেলা। তার চেরা দুই চোখের কোণে টলটল করছে দু ফোঁটা জল। আকাশপানে চেয়ে মেয়েটা যেন ঈশ্বরের অশেষ করুণার কথা ভেবে নিঃশব্দে কাঁদছে। ম্যাক্স জানে এ অশ্রু আনন্দের। ঠিক তাই। ম্যাক্সের দিকে চেয়ে আনন্দে বিহ্বল বন্দনা বলে উঠলো, 'ম্যাক্স ভাই! শুনতে পাচ্ছ? বর্ষা এল!'

আটষট্টি

হাসারির বেশ মনে পড়ছে সেদিনের সেই প্রথম বৃষ্টিপাতের ঘটনাটা। 'ত্যাখন বেলা প্রায় শেষ। আকাশ থ্যিকে পেরথম ফোঁটাটি পড়লো এ্যাতো বড়। কিন্তু পিচবাঁধানো তপ্ত সড়কে পড়তেই তাকে যেন শুষে নিল রাজপথ। জলের ফোঁটাটি ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল।'

হাসারির মনে আজ বড় খেদ। গ্রাম থেকে চিরকালের মতন নির্বাসিত এই কৃষকটির মনে বড় ব্যথা। মহামারী তাকে ঘর ছাড়িয়েছে, ভিটে ছাড়িয়েছে। আর সে ফিরতে পারবে না গ্রামে। তাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু হাসারির মনে আজও মাটির টান। গ্রামের সেই প্রথম বর্ষার দিনগুলো তার স্পষ্ট মনে আছে। মাটির তপ্ত বুকেও জ্বালা ছিল। তাই প্রথম বর্ষার জলটুকু শুষে নিত মাটি। বৃষ্টি ত নয়! যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে মিছরির পানা। হাসারির মনে হতো মানুষের দুঃখ দেখে ভগবান আজও কাঁদেন। গ্রামে প্রথম বর্ষা নামলো! সে কি খুশী সবার মনে! সবাই আনন্দে নাচছে। ছেলেদের সবাইকে নিয়ে হাসারির বাপ প্রদীপ তাদের ধান ক্ষেতের আলের ধারে বসে থাকতো। আকাশপানে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে কচি ধানের ডগা। আকাশের বুক থেকে জল পেয়ে ওরা খুশীতে ডগমগ। ওদের খুশী দেখে খুশী হতো হাসারিরাও।

'হায়! আর কি সে দিশ্য দেখার ভাগ্যি আমার হবে?'

শহরের বুকেও প্রথম বৃষ্টি নামলো ভৈরব হরষে। পিচ বাঁধানো রাস্তার বুকে বৃষ্টির শব্দ যেন হাজারটা ঢাকের বাদ্যির মতন ভয়ঙ্কর। হাসারি তাড়াতাড়ি রিক্সার মাথায় ঢাকা উঠিয়ে দিল। তারপর রিক্সার পাশে দাঁড়িয়ে জলে ভিজতে লাগলো। জলে ভিজতে খুব ভাল লাগছে হাসারির। একটু পরেই ঠান্ডা বাতাসের বেগ উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে শীতল হলো পরিবেশ। আঃ, কি স্নিগ্ধ এই শীতল স্পর্শ। গা জুড়িয়ে যায়। হাসারির মনে হচ্ছিল যেন অতিকায় একটা হিমঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেছে, আর ঠান্ডা বাতাস শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন সারা শহরে বৃষ্টিপাত ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। আকাশ যেন নিজেকে শূন্য করে তার সব সঞ্চয় বিলিয়ে দিচ্ছিল। যেন নিজের আনন্দেই বৃষ্টি হচ্ছে। লোকের মনেও সেই আনন্দ ভরে আছে তাই। মাথা বাঁচাতে কেউ বারান্দার তলায় আশ্রয় নিচ্ছে না। সবাই ভিজছে। শুধু বড়রা নয়। ভিজছে শিশুরাও। সারা রাস্তা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে উলঙ্গ শিশুরা। ওরা নাচছে, খিলখিল করে হাসছে, ডিগবাজি খাচ্ছে। মেয়েরাও রাস্তায় নেমে ভিজছে। বাঁশের পাতলা বাকলের মতন ওদের গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে ভিজে শাড়ি।

পার্ক স্ট্রীটের রিক্সা স্ট্যান্ডের রিক্সাওলারাও ভিজছিল। ওরা ভিজছে আর গান গাইছে। কাছাকাছি মোড় থেকে আরও রিক্সাওলারা আসছে। সবাই হাসছে, গান গাইছে। দু-হাত তুলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। সারা শহরটা তখন যেন খুশীতে মাতাল হয়ে গেছে। হাসারির মনে হলো পুরো শহরটা যেন জলে নেমে স্নান করে শুদ্ধ হচ্ছে। তফাত শুধু যে, এ নদী মাটির ওপর দিয়ে বহে যায় না, আকাশ থেকে পড়ে। যেন স্বর্গ থেকে গঙ্গাবতরণ। হ্যারিংটন স্ট্রীটের বুড়ো তালগাছ-গুলোতেও খুশীর ছোঁয়া লেগেছে। তাই মাথা দুলিয়ে তারা আনন্দ দেখাচ্ছে। ধুলোভরা গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির জলে ধুয়ে সবুজ চিকন হয়ে উঠেছে।

মানুষের কল্যাণকর এই বৃষ্টিপাত চললো বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে। শহরটা যেন হয়ে উঠেছে নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়ের মানুষের স্নানঘর। কুলি, সর্দারজী, রিক্সাওলা, দিনমজুর, বাবু, মাড়োয়ারি, বিহারী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীশ্চান সবাই গলাগলি করে জলে ভিজে নাচানাচি করছে। এই প্লাবন যেন ওদের নতুন জীবনদান করলো। তাই কৃতার্থ মানুষগুলো ওই পুণ্য প্রবাহে স্নান করে শুদ্ধ হতে চাইছিল।

হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হলো। তখন মেঘ সরে সূর্য উঠেছে। হাসারি অবাক হয়ে দেখলো সারা শহরের বুক বাষ্পাচ্ছন্ন। যেন অতিকায় একটা বাথটাবে জল ফুটছে আর ধোঁয়ায় ঢেকে আছে সারা শহর। খানিক পরেই আবার বৃষ্টিপাত শুরু হলো।

বস্তিতেও তখন খুশীর বান ডেকেছে। ম্যাক্স অবাক হয়ে দেখলো যেন একটা পুরো জাত এই উৎসবে মেতেছে। খানিকক্ষণ আগে এই মানুষগুলোই আধমরা হয়ে ধুঁকছিল যেন। এখন ওদের নবজীবন লাভ হয়েছে। তাই আবেগে উচ্ছ্বাসে এই খুশীর প্লাবনে ভেসে যেতে চাইছে। পুরুষেরা গায়ের জামা খুলে জলে ভিজছে। মেয়েরাও ভিজছে সারা গা কাপড় মুড়ে। উলঙ্গ বাচ্চারা দলে দলে নেমে পড়েছে বস্তির রাস্তায়। তারা নাচছে, হাসছে, সারা বস্তি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। সবাই যেন উৎসবে মেতেছে। এটা যেন ওদের এক পারিবারিক উৎসব। হঠাৎ বস্তির মোড়ে এক দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় মানুষকে দেখতে পেল ম্যাক্স। আশ্চর্য হলো কোভালস্কীকে দেখে। ওই বিদেশী মানুষটার মনেও আজ উৎসবের আঁচ। সবার সঙ্গে সেও নাচছে। ওর মনেও আজ শিশুর চপলতা। নাচের তালে তালে দুলছে ওর খোলা বুকের ওপর সাদা ক্রুশচিহ্নটি। ম্যাক্সের হঠাৎ মনে হলো ওই বিদেশী শ্বেতকায় কোভালস্কী যেন স্বয়ং বরুণদেব। স্বর্গের ঝরনাধারার নির্জন আঙিনায় দাঁড়িয়ে তিনি স্নাত হচ্ছেন।

উনসত্তর

প্লাবন চললো তিনদিন ধরে। যেন বান ডেকেছে পশ্চিমবঙ্গে। বস্তুতপক্ষে তাই। আনন্দ নগরের এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া অব্দি সর্বত্রই থৈ থৈ করছে জল। জল আর জল। চিত্ত বিকল হবার যোগাড়। সবাই বলছে 'বরুহা।' তা বন্যাই বটে। যতদিন ধরে বর্ষাঋতুর অস্তিত্ব আছে ততদিন এমন বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে হয় নি। বলাবাহুল্য, বর্ষার প্রথম দিকের সেই উৎসাহ তখন অনেক থিতিয়ে গেছে। বস্তির ফুটো চালার ওপরে তালি দেবার জন্যে হয় ছাতা নয় অন্য বস্তু, যেমন প্লাস্টিকের চাদর, ক্যানভ্যাস বা শক্ত বোর্ডের সন্ধানে হন্যের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। এই-টুকু ব্যবস্থা না করলে বস্তির ঘরে টেঁকা যাবে না। ভেসে যাবে ঘর গেরস্থালির জিনিসপত্র। তাই ঘরের ভেতর থেকে জমা জল ছেঁচে ফেলার জন্যে টিনের কৌটোও খুঁজছে সবাই।

কিন্তু জল আসার বিরাম নেই। আশেপাশের জলাজমি থেকে অনবরত জল আসছে গড়িয়ে। বানের মতন জল ঢুকছে বস্তির উঠানে এবং ঘরদোরের মধ্যে। শেষপর্যন্ত তলায় ইঁট পেতে ঘরের তক্তপোশ উঁচু করতে হলো। নইলে ছেলে-মেয়েদের আশ্রয়ের নিরাপত্তা থাকে না। কিন্তু ক্রমে অবস্থা এমন সঙ্গিন হলো যে, লোকের মুখে মুখে ভয় আর আতঙ্ক ছড়াতে লাগলো। প্রতি ঘণ্টায় জলের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। উচ্চতা যত বাড়ছে তত বাড়ছে মানুষের আতংক। সেদিন পড়ন্ত বেলায় ম্যাক্সের মনে হলো যেন পাশের ঘর থেকে কান্নার ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছে। ব্যাপারটা জানতে ম্যাক্স বেরুল। বেরিয়ে দেখলো, যে ছোট্ট মেয়েটা এর আগের বৃষ্টিতে তাকে একটা ছাতা দিয়েছিল: সে রাস্তার ওই নোংরা হাঁটু জলের মধ্যে

ডুবে গেছে। জলের স্রোতে মেয়েটা তখন তলিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে তুললো। তারপর নিজের ঘরে নিয়ে এল।

ম্যাক্সের ঘরখানা তখন নানা রোগ ব্যাধির আকর হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝে সর্বক্ষণ জলে থিকথিক করছে। বন্যা বৃষ্টির জল ছাড়াও ঘরে অবারিত ঢুকছে নালার জল, পায়খানার জল, খাটালের জল ইত্যাদি। দরজার সামনের নিচু পাঁচিলের বেড়া টপকে কুলকুল করে সেই নোংরা জল ঢুকছে। গুঁড়ো দুধ আর ওষুধের পেটি-গুলো বাঁচাতে পেটির চারকোণে আস্তরণ খাটিয়ে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে বন্দনা। ডেলাক্রোয়ার আঁকা মেডুসার ভেলার মতন দেখাচ্ছে সেটা। ছাতার ব্যবহারও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যেখান দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে সেখানে ছাতা খুলে উল্টোমুখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ছাতার গর্তের মধ্যে জল ধরে রাখা হচ্ছে। ভর্তি হবার পর জল ফেলে আবার ছাতাটি টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মোটকথা বৃষ্টিপাত যেন বস্তির মানুষদের অস্বাচ্ছন্দ্যের বহর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। বেনোজলের সঙ্গে ভেসে আসা মলমূত্র, পচা দুর্গন্ধ ত আছেই. এর সঙ্গে জুড়ে গেল খিদে নামক আর এক বিড়ম্বনা। জলে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে ঘুঁটে নামক সস্তার জ্বালানি। দেশলাই কাঠির বারুদ ভিজে গেছে। উনানে আঁচ দেওয়া যাচ্ছে না। দেশলাই কাঠি জ্বালানোও তখন যেন জীবনধারণের এক অনি-বার্য অবদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন কোভালস্কীকে দেশলাই কাঠি জ্বালানোর প্রক্রিয়াটা শিখিয়ে দিচ্ছিল কালীমা। একটা দেশলাই কাঠি নিয়ে কালীমা বললো, 'বড়ভাই! কাঠিটা বগলের তলায় রেখে এমনি করে জোরে জোরে ঘষুন. দেখবেন কাঠির বারুদ গরম হয়ে গেছে। তখন বাক্সের গায়ে ঘা দিলেই কাঠি জ্বলবে।'

এরপর অলৌকিক পদ্ধতিটা ও নিজেই করে দেখাল। ঘোর অন্ধকারে জলে ডোবা বস্তির মধ্যে সেদিন হঠাৎ একটা আলোর ফুলকি দেখতে পেল সবাই। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোভালস্কী আলো জ্বালতে পারলো না। হয়ত সাধুফকিরের দেশ ভারতবর্ষের হিজড়াদের গাত্রত্বক থেকে এমন কোন দাহ্য তরল পদার্থ নিস্যন্দিত হয়, যেটি পোল ধর্মযাজকের গাত্রচর্ম থেকে ক্ষরিত হয় না। সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোভালস্কী সেদিন আলো জ্বালাতে পারে নি।

অতএব অন্ধকারে কোমর ভর্তি জল ভেঙে কোভালস্কীকে রাস্তায় নামতে হলো। এখনই মার্গারেটা, বন্দনা, সালাউদ্দিন এবং এইড্ কমিটির অন্য সভ্যদের সঙ্গে বসে জলবন্দী মানুষদের জন্যে একটা সাহায্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে চলেছে। জলের উচ্চতাও বেড়ে যাচ্ছে। একটা কিছু না করলে অবস্থা যে আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে. কোভালস্কী তা জানে।

শুধু আনন্দ নগর নয়. খোদ কলকাতা শহরের অবস্থাও তদ্রূপ। শহরের পূর্ব-দিকের নিচু শহরতলি যেমন তপসীয়া, তিলজলা, কসবা ইত্যাদি এলাকাগুলো সম্পূর্ণ জলেডোবা। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতন জলবন্দী মানুষরা ঘরের ছাতে আশ্রয় নিয়েছে। সারা শহর অন্ধকার। সি. ই. এস. সি কোম্পানির ট্রান্স্ফর্মার আর পাওয়ার কেব্ল্গুলো জলের তলায় ডুবে গেছে। দূর পাল্লার কোন ট্রেন আসছে না। শহরের রাস্তায় যানবাহন চলছে না। সর্বত্র খাঁ খাঁ করছে। যেন মৃতের শহর। খাবার-দাবারের সরবরাহ নেই। এক কিলো চাল বিকোচ্ছে পাঁচ টাকায়। একটা ডিমের দাম এক টাকারও বেশী।

তবে শহরের এই বিপর্যয়ে পোয়া বারো হয়েছে শুধু রিক্সাওলাদের। শহরের রাস্তা ডুবডুবু হলে ওদেরই পৌষমাস হয়। কারণ, তখন শহরে অন্য যানবাহন থাকে না। তাই ঠিক এইরকমই এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যে এতকাল বসে ছিল হাসারি। এমনটি না হলে কি করে সে মেয়ের বিয়ের পণের টাকা যোগাড় করবে? হাসারি তাই সত্যিই খুশী মনে মনে। তার দারুণ আনন্দ হচ্ছিল যখন লাল রঙের দাম্ভিক সরকারী দোতলা বাসগুলোকে সে অসহায়ের মতন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। এই আকস্মিক দুর্বিপাকে পড়ে দাম্ভিক বাসগুলো যেন মূক হয়ে গেছে। সার সার দাঁড়িয়ে আছে নীলসাদা রঙের ট্রামগাড়িগুলো। উদ্ধত ট্যাক্সিওলারাও মিইয়ে গেছে। হলুদ রঙের ট্যাক্সিগাড়িগুলো কেমন যেন করুণা-প্রার্থীর মতন চেয়ে আছে ওদের দিকে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয়েছে ধড়াচূড়া পরা আপিসগাড়ির ড্রাইভারদের। শহরময় দাস্যিগিরি করে বেড়াত এইসব গাড়ি-গুলো। এখন কেমন নেতিয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে। কাদার মধ্যে ডুবে গেছে গাড়ির শ্যাসি। বিকল গাড়ি ছেড়ে চলে গেছে যাত্রীরা। ড্রাইভার, কণ্ডাকটররা পলাতক। বিধ্বস্ত গাড়িগুলোর চেহারা হয়েছে নদীর ঘূর্ণাবর্তে পড়া ভাঙাচোরা নৌকার মতন। হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া চেহারা সব। আহা! কি রূপই বেরিয়েছে ওদের! শুকনোর দিনে ট্যাক্সির 'ডেরাইভার'দের সে কি দপদপানি! নিষ্ঠুরের মতন যাত্রীদের টেনে আনতো ট্যাক্সি ওদের দিকে। যা নয় তাই বলে অপমান করতো হাসারিদের। আজ সে সবের প্রতিশোধ নিচ্ছে হাসারিরা। করুণ সতৃষ্ণ চোখে ওরা চেয়ে আছে যাত্রীদের দিকে। যাত্রীরা ফিরেও তাকাচ্ছে না বিকল গাড়িগুলোর দিকে। বৃষ্টির দিনে রিক্সাই আসল কাণ্ডারী। তখন যে দাম চাও তাই দেবে ওরা। একটা রিক্সার দিকে দশজন যাত্রী ছুটে আসবে। ওরা বেশ জানে যে রিক্সার উঁচু উঁচু চাকা আর তাদের ঠ্যাং দুটিই ওদের প্রধান ভরসা। তাই মরতে মরতেও যখন সে যাত্রীদের আর্ত ডাক শুনতে পায়, তখন নিজেকে কেউকেটা ভাবে হাসারি; নগণ্য তুচ্ছ মনে হয় না নিজেকে। তখন এই আত্মপ্রসাদটুকুই তার উপরি পাওনা হয়। তার মনে হয়, রিক্সায় উঠে বাবুরা পায়ের গুঁতো মেরে তাকে জোরে ছুটতে বলবে না। কিংবা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দশ-বিশ পয়সা কম ভাড়া দেবে না। তার রিক্সায় ওঠার জন্যে ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। ন্যায্য ভাড়ার তিনগুণ বেশী ভাড়া দিতে চাইছে। কলকাতার মহাসমুদ্রে এই রিক্সাই ওদের একমাত্র ভরসা এখন। তাই ভিজে চুপসে যাওয়া সীটে বসতেও বাবুদের এখন আপত্তি নেই।

বর্ষার আগে সারা দিনে তার যা আয় হতো, এখন একটা ছোট ট্রিপেই সেটুকু পুষিয়ে নিতে পারে হাসারি। কিন্তু বিপদও আছে পায়ে পায়ে। জলের মধ্যে যেমন জোরে হাঁটা যায় না, তেমনি আছে আরও অসংখ্য প্রতিবন্ধ। প্রতি পদক্ষেপেই লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর ফাঁদ। হয়ত জলের নিচে লুকোনো লোহার পেরেকটি পায়ে বিদ্ধ হলো, কিংবা খানাখন্দের মধ্যে পদস্খলিত হলো তার পা দুখানা। এমন অসংখ্য বিপদের কথা ঘটা করে বলতে পারে সে। জলকাদার মধ্যে গাড়ি এবং যাত্রী নিয়ে পথ চলা যে কত কষ্টকর তা কি হাসারি জানে না? 'হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে মরা কুকুর বেড়ালের গায়ে হোঁচট খেতে খেতে আমাদের রিক্সা টানতি হয়। তবে এই কষ্টও সহ্যি হয়। কিন্তু বরুণদেবতা য্যাখন কলের জলের মতন আমাদের গায়ের ওপর বিষ্টি ঢালেন, ত্যাখন আমাদের মহাশয় দেহগুলিও আর যেন সহ্যি করতে পারে না। সারা দিন আমাদের শরীলে জল শুকোয় না। হয় বিষ্টি, নয়ত

ঘামে ভিজে শরীলটি সব্বক্ষণ চ্যাপসে থাকে। ধুতি আর পিরানটি জলে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করে। প্রতিবার ধুতি পিরানের জল নিঙড়ান কিংবা হাত পা মুছে শুকনো করার কোন দাম নেই। শরীলটি তো ভিজেই রয়েচে গো সব্বক্ষণ! আরও কত উৎপাত আচে। রাস্তার পচা জলে থাকতি থাকতি আমাদের পায়ের চামড়ায় নোংরা ঘা হয়ে যায়। কসাইখানায় ঝোলানো পাঁঠার বাসি মাংসের মত চ্যায়রা হয় পায়ের। তবে আমার সব থেকে অধিক কষ্ট হয় য্যাখন একবার ঠান্ডা একবার গরম জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা করি। আমার কত বন্ধুর ফুসফুসটি এইভাবে নষ্ট হয়্যে গেচে। এ রোগের নাম নাকি নিউমোনিয়া। প্রবল কম্পজ্বর, সংগে ভুলবিকার এবং কাশ। তারপরেই হঠাৎ একদিন জেবন পিদিমটি হয়ত নিবে গেল। তবে রহমত বলে লালজ্বরের চেয়ে এ রোগ নাকি ভাল। হয়ত তার কথাই ঠিক। এ রোগে নাকি ভোগ নেই। তিলতিল করো শরীলটির ক্ষয় হয় না। শেষের দিনটিতে বড় শীঘ্র পেঁৗছনো যায়।'

সেদিন মানিককে তার দুদিনের আয়ের হিসাবটি দেখালো হাসারি। বৃষ্টিতে মানিকের ট্যাক্সি বসে গেছে। তাই এই দুদিন সে বেকার। হাসারির হাতে অতগুলো টাকা দেখে ঈর্ষা হচ্ছিল মানিকের। বন্ধুর দিকে চেয়ে সে বললো, 'তা হলে বন্ধু! বর্ষাকালটা তোমার কাছে পোষমাস। তাই না? আকাশ থেকে যেটি পড়ছে, সেটি জলের ফোঁটা নয়। সোনার তাল। কি বলো?'

কিন্তু প্রতিদিন আকাশ থেকে সত্যই সোনার তাল ঝরে পড়ে না। পরদিন সকালে পার্ক সার্কাস স্ট্যান্ডে গিয়ে হাসারি দেখলো যে, অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। ওদের মুখগুলো বিষণ্ণ, শুকনো। ভিড়ের মধ্যে ওর পুরনো জরাজীর্ণ রিক্সাখান কাত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু রহমত কোথায়? রহমত নেই। দলের মধ্যে সবচেয়ে বুড়ো যে, সে বললো রহমত মরে বেঁচেছে। কাল সন্ধ্যেবেলায় রাস্তার পিট্‌ খোলা ম্যান্‌হোলের মধ্যে হড়কে গেছে তার অনেকদিনের পুরনো সংগী রহমত। বাবু-দের খেয়ালের শিকার হয়েছে সে। রাস্তা থেকে তাড়াতাড়ি জল সরাবার জন্যে কর্‌পোরেশনের বাবুরাই নাকি বলে দিয়েছিল রাস্তার মরণ ফাঁদগুলো খুলে রাখতে। রহমতের দুর্ভাগ্য যে সে এর শিকার হয়েছে।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কোভালস্কী যখন নিজামুদ্দিন লেনে তার পুরনো ঘরখানার সামনে এসেছে তখন একটা কাঁচ হাতের ছোঁয়া লাগলো তার গায়ে। খপ্‌ করে হাতটা ধরে ফেললো সে। কিন্তু হাতটা কেমন অসাড় যেন। তখন জলে ভেসে যাওয়া অসাড় নিস্পন্দ দেহটাকে কোনরকমে টেনে সূর্যের চায়ের দোকানের রোয়াকের ওপর তুললো। সারা এলাকাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারে ডাকাডাকি করলো কোভালস্কী। তারপর জল ভেঙে প্রথমে মেহবুব, পরে সাবিয়ার মা'র ঘরে গেল। কোথাও কেউ নেই। কোভালস্কী অবাক। অঞ্চলটা যেন সিনেমার শুটিংয়ের জন্যে তৈরি করা পরিত্যক্ত সেট-এর চেহারা নিয়েছে। শুটিংয়ের জন্যে ডেকে আনা একস্ট্রারা যেন এখুনি সেট্‌ ছেড়ে চলে গেছে। একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে ঝুপঝুপ করে। বৃষ্টি আর জলের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়া ইঁদুরগুলো ভয় পেয়ে তীক্ষ্ন চিৎকার করে ছুটোছুটি করছে। দু-একটা মাঝে মাঝে জলে লাফিয়ে পড়ছে। শব্দ হচ্ছে ঝপাঙ্‌ ঝপাঙ্‌। জলের ভেতর দিয়ে খুব সাবধানে পা টিপেটিপে হাঁটছিল কোভালস্কী।

প্রতি মুহূর্তেই বস্তির মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি বয়ে যাওয়া নালার ভেতরে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। এইভাবে আরও কয়েক শ' গজ হাঁটার পর একটু দাঁড়ালো সে। ঠিক তখনই জঙ্গালভরা এঁদো পুকুরের ভেতর থেকে একটা গভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জোরালো কণ্ঠস্বরটা জলের ফোঁটার ভেতর দিয়ে ঝাপসা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। টাইটানিক জাহাজ ডুবির পর জলমগ্ন যাত্রীরা যেমন ভাবে প্রার্থনা করেছিল, কোভালস্কী তেমনিভাবে চীৎকার করে বলে উঠলো, 'হে ঈশ্বর! যেন তোমার কাছে পৌঁছতে পারি! যেন তোমার কাছে থাকতে পারি!' আকাশে তখন ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

মিউচ্যুয়্যাল এইড কমিটির সভ্যরা ম্যাক্সের ঘরেই অপেক্ষা করছিল। সবাই এক হাঁটুজলের মধ্যে বসে। পরিবেশটা থমথমে। বুড়ো সালাউদ্দিনই প্রথম নিঃশব্দতা ভাঙলো। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে বললো, 'স্তেফানভাই! সারা বস্তিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই পালাচ্ছে। প্রায় পাঁচশ' লোক ইতিমধ্যেই ঘরবাড়ি ছেড়ে মসজিদে গিয়ে উঠেছে।'

মসজিদ অর্থাৎ জুম্মা মসজিদ। বস্তির মধ্যে একমাত্র উঁচু বাড়ি হলো এই মসজিদটা। সালাউদ্দিনের কথা শেষ হতে না হতেই মার্গারেটা অভিযোগ করে বললো, 'এ ত সবে শুরু। শুনছি গঙ্গায় নাকি বান ডেকেছে। হু হু করে গঙ্গার জল বাড়ছে।' মার্গারেটার সারা শরীর ভেজা। পরনের জামা কাপড়টাও জলে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। আজকের সভায় অ্যারিস্টটল্ জনও হাজির ছিল। সে বললো, 'খবর খুবই খারাপ। সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু খেদ করার জন্যে ত আসি নি আমরা! একটা রাস্তা বার করতে এসেছি যাতে সবারই উপকার হয়।'

'ঠিক কথা। অ্যালিস্টটল্ ঠিক কথা বলেছে।' বললো কোভালস্কী।

কিন্তু কি করা যায়? দায়িত্বটা একটুখানি নয়। কাজের বহরটা বেশ অনুমান করা যায়। তাই চট করে কেউ কিছু বলতে চাইলো না। প্রথম কথা বললো ম্যাক্স। সে বললো, 'আমাদের এখনই কলেরা টাইফয়েড রোগের টিকা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। নইলে রোগ ছড়াতে পারে।'

ঝোলানো ওষুধের বাক্সর দিকে আঙুল দেখিয়ে কোভালস্কী জিজ্ঞেস করলো, 'কত ডোজ্ ওষুধ তোমার আছে?'

'সামান্যই। অন্য জায়গা থেকে আমাদের যোগাড় করতে হবে।'

ম্যাক্সের কথায় মুখ টিপে হাসলো সবাই। কোভালস্কী দারুণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। রেগে গিয়ে বললো, 'এই আমেরিকান ছোকরাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে এটা কলকাতা শহর। মার্কিন মুলুকের মিয়ামি শহর নয়।'

কোভালস্কী শান্ত হলে সালাউদ্দিন বললো, 'আমরা কি এখন জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য ব্যবস্থা গড়ে তুলবো না? যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে গেছে তারা খুবই আতান্তরে পড়েছে। যারা ছেড়ে যায় নি তাদের অবস্থাও সঙ্গিন।'

কোভালস্কী ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলো সালাউদ্দিনের কথা। বললো, 'ঠিক তাই। সকলের কাছেই হাতে হাতে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া দরকার।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল বন্দনা। এবার তার কথা শোনা গেল। কোভালস্কীর দিকে চেয়ে সে বললো, 'আমার মনে হয় যারা বস্তির মধ্যে রয়ে গেছে, সেই সব বৃদ্ধ অসুস্থদের কাছেই আগে সাহায্য পৌঁছনো দরকার। ও'দের জন্যে এখনই কিছু না করলে ও'দের হয়ত সলিল সমাধি হয়ে যাবে।'

বন্দনার সব পরামর্শের অনেক গুরুত্ব দেয় কোভালস্কী। অভিজ্ঞতা থেকেই সে কথা বলে। বস্তিতে কারা সত্যিকার অভাবগ্রস্ত এ কথা তার চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না। কিন্তু এবার সে ক্রম বাছাইয়ে একটু ভুল করে ফেলেছে। বন্দনার কথায় কোভালস্কীরও মনে পড়ে গেল আর এক হতভাগ্য মানুষদের কথা। এই ক'দিন সে দিব্যি ভুলে ছিল। হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের কথা একটি বারের জন্যেও মনে পড়েনি তার। বন্দনার কথার জবাবে কোভালস্কী বললো, 'কিন্তু কুষ্ঠ কলোনির মানুষদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে বন্দনা। বেশ তাই হ'ক। দুটো দল হ'ক। ম্যাক্স আর সালাউদ্দিনকে নিয়ে তুমি বুড়ো মানুষদের ত্রাণের ব্যবস্থা করো। আমি যাচ্ছি কুষ্ঠ কলোনিতে। আমার সঙ্গে চলুক অ্যারিস্টট্ল্ জন আর মার্গারেটা। আমরা দুদল মসজিদে দেখা করবো।'

সুতরাং এই ব্যবস্থাই পাকা হলো। জুম্মা মসজিদের আয়তাকার চারমিনার ভবনটি সে রাত্তিরে যেন লাইটহাউসের ভূমিকা নিয়েছিল। দলে দলে বিপন্ন মানুষ আসছে। একতলার জাফ্রি বসানো বারান্দায় ইতিমধ্যেই কয়েক শ' পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে। আরও আসছে। বাপেরা কাঁধে করে তিন-চারটি সন্তান বয়ে আনছে। মায়েদের মাথায় গেরস্থালির জিনিসপত্র। অনেকের কাঁখে কোলের বাচ্চা। সারা পথ নোংরা জল মাড়িয়ে এখানে আসছে মানুষগুলো। স্বল্পপরিসর বারান্দায় সবাই মিলে সোরগোল করছে। মসজিদের ভেতরে তখন ভীষণ অবস্থা। অন্ধকারের মধ্যে ভয় পাওয়া বাচ্চাদের চিৎকার, মেয়েদের ঝগড়া, কান্না, শ্বাসবন্ধকরা গুমট গরম—সব মিলিয়ে অসম্ভব চেহারা হয়েছে ওখানে। একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। কুলকুল করে বন্যার জল বাড়ছে। বন্যার জল ছুঁই ছুঁই করছে একতলার বারান্দা। সবাই তাই দোতলায় উঠতে চাইছে। হঠাৎ মসজিদের ছাত থেকে হুড়হুড় করে জল গড়িয়ে এল। দোতলার গ্যালারি ডুবে গেল জলে। কয়েকজন যুবক তাড়াতাড়ি দরজা ভেঙে ছাতের মুখে বেড়া দেবার চেষ্টা করলো। অতগুলো মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে জায়গাটা গুমট হয়ে গেছে। কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। বাচ্চারা চেঁচাচ্ছে ভয় পেয়ে। দু-একটা পেটরোগা বাচ্চা পায়খানা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। হঠাৎ একজন দম আটকে মারা গেল। সোরগোল তখন তুমুল হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি মৃতদেহটা হাতে হাতে পাচার হয়ে গেল বাইরে। কে যেন তখন গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে জলের ধাক্কায় ভিতরে মাটি আলগা হয়ে বস্তির চালাঘরগুলো ভেঙে পড়ছে। সেই শুনে নতুন করে বিলাপ শুরু করলো মানুষগুলো।

রেল লাইনের পাশের নিচু জমিতে ছোট্ট কুষ্ঠ কলোনিটা প্রায় জলের তলায় চলে গেছে। কলোনিতে ঢোকার একটু আগে সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন কোভালস্কীর পিঠের ওপর চড়ে বসলো মার্গারেটা। কলোনির ভেতরে গিয়ে ওরা দেখলো একজন মানুষও ঘর ছেড়ে চলে যায় নি। ছোটদের ছাতের ওপর তুলে দিয়েছে বড়রা। একটার ওপর আর একটা খাটিয়া চাপিয়ে নিরাপদ করেছে আশ্রয় ব্যবস্থা। যারা অক্ষম তাদের সব ওপরের খাটিয়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনি অস্থায়ী এক পিরামিডের ওপর আনোয়ারকে বসে থাকতে দেখা গেল। দিব্যি জাঁকিয়ে বসে ফিক ফিক করে হাসছে। তাকে দেখে কোভালস্কী উচ্ছ্বসিত হলো। চেঁচিয়ে বললো, 'আনোয়ার তুমি ওখানে? আর আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

'আমায় খুঁজছেন? কেন? আমি তো বেশ আছি! তাছাড়া এবারই কি প্রথম বন্যা হলো নাকি?'

আনোয়ারের কথা শুনে কোভালস্কী স্তম্ভিত। সুখে-দুঃখে এমন উদাসীন স্থিতধী মানুষ সে আগে দেখেনি। আনোয়ারকে দেখে কোভালস্কী যেন অনুপ্রাণিত হলো। তার মনে হলো এরাই যথার্থ অমৃতের পুত্র। ঈশ্বরের পার্শটিতেই এদের ঠাঁই হওয়া উচিত। আনোয়ারের কথার জবাবে কোভালস্কী বললো, 'ঠিক তা নয়। তবে বৃষ্টি পড়ার তো বিরাম নেই! এমনভাবে চললে তোমরা সবাই যে ভেসে যাবে ভাই!'

বললো বটে, কিন্তু কি প্রতিকার সে করতে পারে? কোভালস্কীর মনে হলো কত অর্থহীন তার এই ফাঁকা আশ্বাস! সে কি পারবে এই অক্ষম মানুষদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে? ওরা নিজেরাই ত কতবার হারিয়ে যাচ্ছে বন্যার জলে? এখন তার লোকবল দরকার। অন্য সাহায্যও দরকার। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? প্রতিকারের ব্যবস্থা শুনে সবাই চুপ। এই অবস্থায় লোকবল পাওয়া প্রায় হাস্যকর শোনাচ্ছিল যেন। হঠাৎ যেন জাদুবলে কোভালস্কীর সামনে একটা লোকের উদয় হলো। মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে লোকটার ছোট চোখ দুটো দারুণ তীক্ষ্ম। কান দুটো কুলোর মতন দুপাশে ঝুলে আছে। মুখখনা চৌকো মাপের। দুগালের হনু বের করা। দেখলেই মনে হয় লোকটা ধূর্ত এবং মধুলোভী। মার্গারেটা আর অ্যারিস্টট্ল্ জনের দিকে চেয়ে লোকটা বললো, 'কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা বলি।'

জন বললো, 'বলুন!'

'শুধু আমাদের কর্তাই পারেন ওদের এখান থেকে সরাতে।'

'কে আপনাদের কর্তা?'

'হে' হে'! তাও বলে দিতে হবে? এদের ভগবান। এই বস্তির সব মানুষের ভগবান।' একটু থেমে লোকটা ফের বললো, 'আমি গিয়ে কর্তাকে বলছি। তবে সায়েব যদি আসেন খুব ভাল হয়। বোঝেনই তো!

পাকা গাঁথুনির চারতলা ইমারতটি যেন জলের বুকে গড়বন্দী কেল্লার মতন দেখাচ্ছে। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, ঘর, বারান্দার দিকে তাকালেই বাড়িখানার মজবুত কাঠামো মালুম করা যায়। প্রতিটি তলার ধাপ এত উঁচু যে বন্যার জল ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে নি। জেনারেটর বসিয়ে ঘরে ঘরে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলের বুকে আলোর কিরণ ঝকমক করছ। ছোট ছোট ঢেউগুলো শক্ত ইমারতের গায়ে আছড়ে পড়ছে। শব্দ হচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ। আয়োজনের ঘটা দেখে কোভালস্কী চমকে উঠেছিল। তার মনে হলো বোধহয় ভেনিস শহরের চীফ্ ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবনে ঢুকেছে সে। সেইরকমই পাকাপোক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তবে এমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও আনন্দ নগরের বিধাতাপুরুষ যেন নির্লিপ্ত। যথার্থই বিধাতাপুরুষ তিনি। তাই মানুষের সুখ-দুঃখেও এত অবিচলিত। এমনকি লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও কোনরকম তারতম্য হয় নি। তার মণিময় হর্ম্যের অন্তঃপুরে বাইরের কোন কলকোলাহলই পৌঁছয় নি। মানুষের ব্যথার ডাক তার কানে ঢোকে না। এক নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততার মধ্যে দিব্যি তার বহুমূল্য পর্যাঙ্কের উপর সে সুখাসীন হয়ে আছে। তাই ছেলের সঙ্গে সর্বাঙ্গে কাদামাখা কোভালস্কীকে ঢুকতে দেখেও লোকটার ব্যাঙের মতন মুখখানায় এতটুকু বিস্ময়ের ছায়া পড়লো না।

বরং কোভালস্কীকে অমন অবস্থায় দেখে স্থূল একটু পরিহাস করলো বস্তির বিধাতাপুরুষ। 'আসুন ফাদার। গুড ইভিনিং। তারপর ফাদার! হঠাৎ কি মনে করে

এই ঝড়জলের বিকেলে আপনার আগমন? আজ যে দেখি আমার ঘরে বসন্তের হাওয়া বইছে! তা বলুন সায়েব, কি করতে পারি আপনার জন্যে?’

কথাটা বলেই হাতে তালি দিল সে। সংগে সংগে উর্দিপরা চাপরাসী ট্রে করে চা আর সরবত দিয়ে গেল। কোভালস্কীর সারা গা দিয়ে তখন টপটপ করে কাদা-জল ঝরছে। ইতস্তত করে কোভালস্কী বললো, ‘কুষ্ঠরোগীদের জন্যে আসতে হলো।’

‘আবার তারা?’ বলতে বলতেই লোকটার কপাল কুঁচকে গেল। ‘মনে হচ্ছে ওই ভাগ্যবানদের জন্যেই আপনাকে দর্শন করার সৌভাগ্য হচ্ছে আমার। তা এবার কি হলো ওদের?’

‘ওরা সবাই জলবন্দী হয়ে আছে। এখুনি না সরাতে পারলে ওরা সবাই ডুববে। সেইজন্যেই আপনার কাছে এলুম। এখুনি আমার কিছু লোক চাই। আর একখানা নৌকো।’

বড়সড় একটা আয়ের পথ বন্ধ হবার আশংকা না ক্ষিপ্ত মানুষের হামলার ভয়, কোনটা যে আসল কারণ কে জানে! কিন্তু কোভালস্কীর মুখের কথা শেষ না হতেই লোকটা যেন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর তালি দিয়ে অশোককে ডেকে পাঠালো। অশোক ঘরে ঢুকতেই তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে আড়ালে কিছু-ক্ষণ কথা বললো লোকটা। ইতিমধ্যে পরিবারের আরও ক’জন মানুষ ঘরে ঢুকেছে। কোভালস্কী দেখলো একটা অচিন্ত্যপূর্ব কর্মব্যস্ততা এসে গেছে লোকগুলোর মধ্যে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ব্যবস্থাপনা শেষ। একটা ছোট নৌকো এল। দশ-বারোজন অনুগ্রহপুষ্ট লোকও রেডি। এরা সবাই ওর পোষা লোক। এদের নিয়ে বেরোবার সময় কোভালস্কী দেখলো বেঁটে মোটা বিধাতাপুরুষটি কিঞ্চিৎ উত্তে-জিত হয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। ততক্ষণে নৌকাটা জলে ভাসানো হয়েছে। দাঁড় টেনে চালাবার আগে কোভালস্কী ওপর দিকে তাকালো। জানলার ফ্রেমে লোকটার মুখখানা আবছা দেখা যাচ্ছে। তারপরেই কোভালস্কী যা শুনলো তা সে কখনও ভুলবে না। লোকটার খসখসে শক্ত কণ্ঠস্বর যেন জলের বুকে পাক খেতে খেতে তার কানের ওপর আছড়ে পড়লো। নৌকার ওপর বসে থাকা অশোকের উদ্দেশে লোকটা চেঁচিয়ে হুকুম দিল, ‘অশোক, ওদের সবাইকে নিয়ে সোজা আমার এখানে আসবি। আজ রাত্তিরে ওরা সবাই আমার অতিথি। বুঝলি?’

ম্যাক্স লোয়েব তার মোটাসোটা সর্বাঙ্গ ভেজা শরীরটা নিয়ে নড়বড় করতে করতে এসে দুধের টিনগুলোর ওপর ধুপ করে বসে পড়লো। গতকালের রাতটা তার জীবনের কঠিনতম রাত ছিল। সারারাত প্রায় ধস্তাধস্তি করে বন্দনাকে নিয়ে জলবন্দী মানুষগুলোকে উদ্ধার করেছে তারা। আজ তার শরীরে এতটুকু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। তাই ভোর হবার সংগে সংগেই নিজের ঘরখানায় চলে এসেছে ম্যাক্স। সকাল থেকে আজ আর বৃষ্টির সেই ভয়ংকর বেগটা নেই। বন্যার জল থিতু হয়েছে। কাল সারারাত ধরে হাত উঁচু করে ওষুধের বাক্স এখানে ওখানে নাড়ানাড়ি করতে হয়েছে তাকে। বন্দনা মেয়েটার মনপ্রাণ যেন এই আর্ত বিপন্ন মানুষগুলোর নাড়িনক্ষত্র জানে। কোথায় কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কোন্ বিপন্ন মানুষটা চলৎ-শক্তিহীন, কার ক্ষয় রোগ হয়েছে, কে চোখে দেখে না—সব তার জানা। কয়েকজন যুবক স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে দল করে সে এ বস্তি ও বস্তি থেকে মানুষগুলোকে

উম্ধার করে মসজিদে নিয়ে গেছে। এমনকি বোবা কালা একজন নবপ্রসূতিকেও তার বাচ্চা সমেত উম্ধার করেছে বন্দনা। শুধু একজনকেই সে উম্ধার করতে পারলো না। একটু দেরি করে ফেলেছিল ওরা। তাই ঈশ্বরই যেন এগিয়ে এসে কোল পেতে তাকে টেনে নিলেন। টিম্ নিয়ে বন্দনা যখন গিয়ে পৌঁছলো, ততক্ষণে সব শেষ। এ হলো সেই কানা-বৃন্ধা কুষ্ঠরোগিণী, যাকে মা বলতো কোভালস্কী। প্রতি হপ্তায় যাঁর ঘরে গিয়ে দুদণ্ড বসে প্রার্থনা করতো। ওরা যখন গিয়ে পৌঁছলো, তখন বৃন্ধার জীর্ণ শরীর ছেড়ে আত্মা মুক্তি পেয়েছে। সাধের জপের মালাগাছাটি বুড়ির কব্জির সংগে জড়ানো। ক্ষয় হয়ে যাওয়া মুখখানি এক স্বর্গীয় প্রশান্তিতে মাখামাখি। সেই আশ্চর্য দৃশ্যটি দেখতে দেখতে বন্দনা অস্ফুট স্বরে বললো, 'শেষ পর্যন্ত তোমার কষ্টের শেষ হলো মা। তুমি মুক্তি পেলে। যে মুক্তির জন্যে দিনরাত বিধাতাপুরুষকে ডাকতে, সেই মুক্তিই তিনি তোমায় দিলেন। কোল পেতে টেনে নিলেন তোমায়।' কথাগুলো বলার সময় বন্দনার চোখের কোণে টলটল করে উঠলো জল। শাড়ির কোণে জলটুকু মুছে ম্যাক্সের সাহায্যে বুড়ির দেহটা জল থেকে টেনে তুললো সে।

এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মধ্যে বন্দনার সরল কথাগুলো ম্যাক্স লোয়েবকে এত মুগ্ধ করলো যে তার উল্লেখ না করে পারলো না। দিন কয়েক পরে সীলভিয়াকে সব ঘটনা জানিয়ে শেষে লিখলো, 'সেই রাত্তিরে প্রথম বুঝলাম যে ঠিক এমনটি আমি আর কখনও হতে পারবো না।'

নৌকো ভর্তি হয়ে প্রথম কুষ্ঠরোগীর দল এসে পৌঁছতেই আপ্যায়নের ঘটা দেখে কোভালস্কী হতবাক। তার মতন হৃদয়বান মানুষও ভাবে নি এমন ব্যাপার-স্যাপার হবে। আনোয়ারকে প্রায় কোলে করে নামাল অশোক। তারপর খাটিয়ার ওপর তাকে শুইয়ে দিল। ছোট ছোট উলংগ বাচ্চাগুলো নৌকো থেকে নেমে হি হি করে কাঁপছিল। তাই দেখে কর্তার বাড়ির মেয়েরা দামী শাড়ি ছিঁড়ে তাদের হাত পা মুছিয়ে দিল। মোটাসোটা গিন্নীমা এক গা গয়না পরে গরম গরম ভাত আর মাংস পরিবেশন করা শুরু করলো। তবে গৃহস্বামীর সেবারত রূপটা দেখেই সবচেয়ে অবাক হলো কোভালস্কী। সেই পুরনো দাম্ভিক নিষ্ঠুর মানুষটার বদলে যাকে দেখলো সে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কোভালস্কীর মন থেকে সেই বীভৎস উৎকট বোমাবাজির নিষ্ঠুর ছবিটা তখন পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোভালস্কী দেখলো কর্তা নিজে দাঁড়িয়ে আংটি পরা হাত বাড়িয়ে হতভম্ব লোকগুলোকে অভ্যর্থনা করছে। হাতে ধরে যত্ন করে নৌকো থেকে নামাচ্ছে। নিজের হাতে গা হাত মুছিয়ে দিচ্ছে, চা-খাবার দিচ্ছে। কে বলবে এই লোকটাই গুণ্ডাসর্দার।

এই বিধ্বংসী বন্যাপ্লাবন যেন একটা ব্যাপারে কোভালস্কীকে খুব নাড়া দিয়েছিল। সে অবাক হয়ে দেখলো বন্যাপ্লাবম যেন মানুষে মানুষে ভেদরেখাটি সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। শুধু যে হিন্দুর ঘরে মুসলমান পরিবার ঠাঁই পেল তা নয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেবার একটা অনুকূল বাতাস বইতে লাগলো সর্বত্র। স্বার্থ নয়, সেবাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। ছেলেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জল ভেঙে অক্ষম মানুষদের উম্ধার করছে। রিক্সাওলারা বিনাভাড়ায় অসুস্থ বৃন্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিচ্ছে। মসজিদের ভেতরে জলবন্দী মানুষের খাবার-দাবার যোগাচ্ছে রাস্তার হোটেলওলারা। কোভালস্কীর জীবনে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

সেদিন অমন বিপর্যয়ের মধ্যেও ঈশ্বরকে ভোলে নি মানুষগুলো। খানিকক্ষণের জন্যে ঘরে গিয়েছিল কোভালস্কী। ঘরের মেঝেয় টলটল করছে জল। কিন্তু আশ্চর্য! যীশুর ছবির তলায় দুটি মোমবাতি জ্বলছে। পরে সে জেনেছিল বন্যার ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবার সময় কালীমা ওই বাতি দুটি জেলে দিয়ে গেছে। বড়ভাই স্তেফানের ঈশ্বরকে আঁধারে ফেলে রেখে যায় নি কালীমা। হয়ত তাঁর করুণা চেয়েছে, যেন বৃষ্টি থামিয়ে দেন তিনি।

কিন্তু করুণা কেউ করেন নি। খ্রীশ্চানের ঈশ্বর, হিন্দুর ভগবান, ইসলামের আল্লা, এ'রা কেউ মানুষের কাতর প্রার্থনা শোনেন নি। মানুষের আর্তস্বর তাঁদের কানে যায় নি। তাই মানুষের চোখের জলের দিন আরও বেড়ে চললো। ইতিমধ্যে ম্যাক্সের আশঙ্কা সত্যি হয়েছে। ঘরে ঘরে ভেদবমি আর জ্বরবিকারে ভুগছে মানুষ। না আছে ওষুধ, না সেবা। রোগীদের অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থাও নেই। ফলে যা অনিবার্য তা-ই হলো। বিনা চিকিৎসায় ঘরে ঘরে মরতে লাগলো মানুষ। যে সব মড়ার দাহ হলো না বা কবর দেওয়া গেল না, সেগুলো জলে ডোবা রাস্তায় ফেলে দেওয়া হলো। একদিন ম্যাক্স জলে পড়ে থাকা এইরকম তিনটে শব মাড়িয়ে ফেলে-ছিল। সবচেয়ে বিপত্তি ঘটাল পানীয় জলের অভাব। সর্বত্র থৈ থৈ করছে জল অথচ কোথাও এক বিন্দু খাবার জল নেই। এক ফোঁটা খাবার জলের জন্যে মানুষগুলোর হাহাকার যেন বেড়েই চলেছে। কেউ ছাতা পেতে বৃষ্টির জল ধরছে, কেউ বৃষ্টিতে ভেজা ন্যাকড়া থেকে সামান্য খাবার জল জোগাড় করছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই রাস্তার জমা জল আকণ্ঠ খেয়ে নিচ্ছে সরাসরি। পানীয় জলের মতন খাদ্যবস্তুরও আকাল হয়েছে বস্তিতে। স্বেচ্ছাসেবীদের দিনরাত পরিশ্রমেও এই অভাব মেটেনি। এরই মধ্যে সালাউদ্দিন কোথা থেকে একটা নৌকা যোগাড় করে আনলো। তারপর নৌকার ওপর বড় বড় দুটো গামলা বসিয়ে বড় রাস্তার খাবার হোটেলগুলো থেকে চাল আর আটা ভিক্ষে করে মসজিদের জলবন্দী মানুষদের মধ্যে বিলি করে দিতে লাগলো।

এমন দুর্যোগেও সবচেযে যা বিস্ময়কর তা হলো জীবনের এগিয়ে চলা। ম্যাক্সের একবারও মনে হয়নি যে জীবন কোথাও থেমে গেছে। সেদিন জলে ডোবা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল ম্যাক্স। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বুক জলে দাঁড়িয়ে কেমন হাসাহাসি, নাচানাচি করছে। মাথার ওপরে ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছিল তখন। ওদের সামনে একটা উঁচু তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে যে লোকটা প্লাস্টিকের খেলনা বেচছে, তারও যেন কোন হুঁস নেই।

আটদিন আটরাত্রি ধরে এই তাণ্ডব চললো। যেন স্বর্গলোক থেকে দেবতারা নির্মমভাবে তাঁদের ক্রোধ ছুঁড়ে দিচ্ছেন মর্ত্যের মানুষের দিকে। আটদিনের পর থেকে একটু একটু করে তাঁদের ক্রোধ প্রশমিত হলো। হ্রাস পেতে লাগলো বন্যার তাণ্ডব। তবে একমাস সময় লাগলো রাস্তার জল সরতে। কলকাতা যেন আবার আশায় বুক বেঁধেছে। ধীরে ধীরে ভাঙাচোরা রাস্তায় যানবাহন বেরোচ্ছে। বিধ্বস্ত নগরী একটু একটু করে স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রায় শতাধিক মাইল রাজপথ বন্যার জলে ভেঙেচুরে গেছে। প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ তাদের যথাসর্বস্ব খুইয়েছে। কয়েক হাজার বাড়িঘর হয় ধসে পড়েছে নয়ত নড়বড়ে হয়ে গেছে। শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। টেলিফোনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। জলের সরবরাহ নেই। সে এক ভয়াবহ অবস্থা যেন।

তবে বস্তি এলাকায় এই বিভীষিকাময় ছবিটা আরও প্রত্যক্ষ। জল সরে যেতে আনন্দ নগরের চেহারা হয়েছে নোংরা জলাভূমির মতন। কেমন আঠাল, পচা দুর্গন্ধযুক্ত, চটচটে একরকম বস্তু সর্বত্র থকথক করছে। মাঝে মাঝে জলাভূমির শোভা বর্ধন করেছে কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর, টিকটিকির শব। খুঁজলে একটা দুটো মানুষের মড়াও মিলবে এই শবমিছিলের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ মাছি পরমানন্দে পচা গলা শবের ওপর বসছে। তারপর উড়ে যাচ্ছে জ্যান্ত মানুষের সংসারে। অনেক পাড়ায় রোগ-মহামারী শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মণ মণ প্রতিষেধক বিলি হচ্ছে পাড়ার স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে। বন্দনা এবং অ্যারিস্টট্ল্ জন নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে এগুলো ছড়াবার ব্যবস্থা করছে। সর্বক্ষণ এইসব ঘাঁটাঘাঁটি করায় অনেক স্বেচ্ছাসেবক অসুস্থ হয়ে পড়লো। অনেকেরই হাতে পায়ে ছোটখাট অস্ত্রোপচার করলো ম্যাক্স।

হপ্তা দুই পরে কোভালস্কী তার নিজের ঘরে ফিরলো। দু-হপ্তায় না কামানো দাড়ি গোঁফের আড়ালে মুখখানি ঢাকা। অনেকে আগেই ফিরে এসেছে কালীমা আর অন্য হিজড়ারা। কোভালস্কী ফিরেছে দেখে কালীমা যেন ছুটে এল। তারপর তার হাত দুটি ধরে গভীর স্বরে বললো, 'আসুন বড়ভাই স্তেফান! এ ক'দিন আমরা আপনার জন্যেই বসে আছি।'

ঘরে ঢুকে কোভালস্কী স্থির। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। ঘরখানি ধুয়ে মুছে-তকতকে করে রেখেছে হিজড়ারা। যীশুর ছবির সামনে সুন্দর করে আলপনা এঁকেছে। ওরা যেন কোভালস্কীর যীশুকে আপনজনের মতন ভালবেসে ফেলেছে। এ যেন লোকদেখানো শ্রদ্ধাভক্তি নয়। এ ওদের অন্তরের বস্তু। কোভালস্কীও তার হৃদয় উজাড় করে ওদের ধন্যবাদ দিল। তারপর যীশুর ছবির সামনে ধ্যানে বসলো। কতদিন পরে সে আজ ধ্যানে বসেছে! কতক্ষণ সে ধ্যান নিমগ্ন ছিল কে জানে। হঠাৎ দরজার মুখে কার ছায়া পড়ায় সে চোখ তুলে চাইলো। সামনে দাঁড়ানো রোগা, শীর্ণ চেহারার একজন দাড়িওলা মানুষ। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকতেই কোভালস্কী তাকে চিনতে পারলো। কিন্তু কত রোগা হয়ে গেছে মানুষটা!

কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল দুজনে। তারপর হাসারিই প্রথম কথা বললো। কোভালস্কীর সামনে এক বাণ্ডিল নোট রেখে সে বললো, 'স্তেফানভাই! আজ আমার বড় সুখের দিন। এবার আমি নিশ্চিন্দিতে মরতে পারবো। দেখুন, এই ক'দিনে কত ট্যাকা কামিয়েচি! আর আমার মনে খেদ নেই গো সায়েব! এবার মেয়ের জন্যি একটি ভাল পাত্তর দেখে দুটি হাত এক করে দিলেই আমার ছুটি।'

সত্তর

লোকটার সব সম্পত্তি যেন স্তূপ করে রাখা আছে ওই তামার টাট্খানার ওপর। একটা শাঁখ, একটা হাতঘণ্টী, গঙ্গাজলের ঘট, মধুপর্কের বাটিতে ঘি আর পঞ্চপ্রদীপ। ওর নাম হরি গিরি। তেতাল্লিশ বছরের মাঝবয়সী এই মানুষটা বস্তির একমাত্র পুজারী ব্রাহ্মণ। হরি গিরি থাকে তেলেঙ্গীদের পাড়ায় একটা চালাঘর নিয়ে। বস্তির সবচেয়ে দরিদ্র হলো এই তেলেঙ্গীরা। ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে হরি গিরির স্বভাবটাও দীন হয়ে গেছে। ছোটখাট মানুষ, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে,

কপালের ওপর মস্ত একটা আঁচিল। যে ঘরে সে থাকে তার সামনেই মা শীতলার মন্দির। মা শীতলা হলেন বসন্ত রোগের দেবী। দেবীর ললাট রক্তবর্ণ, মাথায় রুপোর মুকুট, গলায় সর্পমালা। কলকাতার মা জননী কালীর চেয়েও এ'র রূপ ভয়ংকরী। তবে বস্তিতে হরি গিরির খ্যাতি প্রতিপত্তির কারণ অন্য। সবাই জানে হরি গিরি সন্তোষী মার ভক্ত পূজারী। সন্তোষী মাতা গজানন গণেশের কন্যা এবং তাঁর বরেই অনূঢ়া কন্যারা স্বামী লাভ করে। হিন্দুধর্মে যতরকম অনুষ্ঠান আছে তার মধ্যে পুরোহিতের আয়পয় বেশী হয় বিয়ের অনুষ্ঠানেই। হরি গিরি আজকাল তাই ঠিকুজি মিলানো শিখেছে। দিনক্ষণ দেখে ঠিকুজি মিলিয়ে সে বর-কনের দু-হাত এক করিয়ে দেয়। এতেই বস্তিতে তার প্রতিপত্তি বেড়েছে। হাসারির সংকটের কথাও সে শুনেছিল। একদিন বিকেল নাগাদ হাসারির ঘরে গেল হরি গিরি। তারপর তার মেয়ের জন্ম মাস, সময়, দিন সব টুকে নিয়ে বললো, 'মেয়ের বিয়ে বলে কতা, ভাবনা ত হবেই! তবে আমি যখন ভার নিলুম, তখন তোমায় অত ভাবতে হবে না। শিগগিরই তোমার জন্যে একটা সুখবর আনছি।'

তা কথা রেখেছে হরি গিরি। ক'দিন বাদেই হাসারিকে সে সুখরবটা দিয়ে গেল।

'তোমার মেয়ের দিনক্ষণ দেখলুম গো! ভারি লক্ষ্মী মেয়ে তোমার। তা ভাল একটি পাত্রের খোঁজও এনেছি। একেবারে রাজযোটক। রাজী থাক ত বলো। এ বিয়ে হলে মেয়ে তোমার সুখে থাকবে।'

হাসারির আগ্রহ দেখে একটু চুপ করলো হরি গিরি। তারপর বললো, 'ছেলে-টিকে আমি চিনি। ওরা জাতে কুমোর। পাশের বস্তিতে ওদের দুটো কুমোর-চাকি আছে। খুবই সদ্বংশজাত ওদের পরিবারটি।' তারপর হাসারির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'ছেলের বাপ যে খুব শিগগির তোমার সংগে দেখা করতে চায়!'

যাকে অভিভূত হওয়া বলে তাই হয়েছে হাসারি। সটান ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের গোড়ায় উপুড় হয়ে পড়লো। তারপর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে গদগদ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তবে ভক্ত হলেও পুরোহিত বোকা নয়। সে জানে শুকনো কৃতজ্ঞতায় চিঁড়ে ভেজে না। সুতরাং পুরোহিতও হাসারির মতন গলে গেল না। হাতটি বাড়িয়ে দিল গুরুদক্ষিণার জন্যে। শুরু হলো একটি হাসি-কান্নার কাহিনী যাতে অনেক মোচড় আছে। যে গল্পের মধ্যে কোভালস্কীও একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে ঘটনাচক্রে। সাধারণত বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয় আত্মীয়স্বজনদের সামনেই। কিন্তু দেনা-পাওনার কথাটা সবার সামনে হয় না। দুপক্ষই চায় ব্যাপারটা জানা-জানি না হ'ক। বিয়ের কথা পাকা করার আগে বরের বাপ ওই দেনা-পাওনার কথাটাই বলতে আসছে। কোভালস্কীর ঘরখানাই মনে মনে স্থির করে রেখেছে হাসারি। কথাবার্তার সময় কোভালস্কীকেও উপস্থিত থাকতে বলবে সে।

সেই ব্যবস্থাই হয়েছে। বরের বাপকে নিয়ে পুরোহিত এসে যীশুর ছবির সামনে বসলো। হাসারির সংগে কোভালস্কীও উপস্থিত। কোভালস্কী সকৌতুকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। আজকের এই আলোচনায় যাদের বিয়ে তারা কেউ উপস্থিত নেই। ওদের বাদ দিয়েই এই আলোচনা। শুভদৃষ্টির আগে অমৃতা নাকি তার হবু বরকে চোখে দেখতে পাবে না। এ সভা অভিভাবকদের। মন-জানা-জানি নয়। বিষয়-আশায় জানাজানির আলোচনা-সভা এটা। প্রথমে দু-তরফে কুশল বিনিময় হলো। অভিবাদন প্রত্যাভিবাদন হলো। তারপর মূল বিষয়টি আলোচনার

জন্যে পাড়া হলো। ছেলের বাপের চেহারাটা দেখেই কোভালস্কীর মনে হয়েছে ওর স্বভাবটি একটু চড়া। স্বাস্থ্যবান না হলেও লোকটা রোগা নয়। মুখখানা সদাই অপ্রসন্ন। মাথার চুল দিব্যি পাট করে আঁচড়ান। লোকটা প্রথমেই দুম্ করে বলে উঠলো, 'আমার ছেলেটি কিন্তু খুব গুণের। আমি চাই ওর বউও গুণের মেয়ে হ'ক।'

আলাপের গোড়াতেই এমন কথার তাৎপর্য যে কি, তা সবাই বোঝে। লোকটা তার ছেলের স্বভাব-চরিত্র বা রূপের কথা বলতে চায় নি। দেনা-পাওনার কথাই বলতে চাইছে সে। হাসারি যেন তার গুণবান ছেলের ন্যায্য দামটি দিতে দ্বিধা না করে। হাসারি নিজেও এই পারোক্ষ ইঙ্গিতটুকু বুঝলো। মনে মনে বললো, 'এঃ! ইটি যেন চাঁদ চাওয়া আবদার হলো গো!' তাই ছলনা নয়, খানিকটা হতাশ চোখেই সে কোভালস্কীর দিকে তাকালো। সামান্য একটু মৌখিক আশ্বাস সে পেতে চাইছে ওই সজ্জন মানুষটার কাছ থেকে। সে-ই জোর করে কোভালস্কীকে আলোচনায় এনেছে। তার ধারণা, এই বিদেশী মানুষটিকে ওরা সমীহ করবে। ও'র সামনে বাড়াবাড়ি করে কথা বলবে না। কিন্তু হাসারি মনস্তত্ত্ববিদ নয়। সে সাদামাটা মানুষ। কি থেকে কি হয় সে অত বোঝে না। তাই সাহেবের উপস্থিতি যে প্রতিপক্ষদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় হবে তা সে বোঝে নি। ছেলের বাপের ধারণা হলো যে মেয়ের বাপ অক্ষম হলে সে অভাবটা সায়েবই পুষিয়ে দেবে।

বাপের মুখে ছেলের গুণগান শুনে পর্যন্ত হাসারির মন ছটফট করছিল। তার মেয়েও যে গুণের এ কথাটি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নইলে মানুষগুলোর 'পেত্যয়' হবে না। সুতরাং সে-ও বলে উঠলো, 'আমার মেয়েটিরও অনেক গুণ।'

'তাই নাকি! তাহলে ত আপনি মেয়ের উপযুক্ত যৌতুক দেবেন ঠিক করেছেন?'

'নিশ্চয়ই।' বেশ গর্বভরেই উত্তর দিল হাসারি।

ছেলের বাপ বাঁকা চোখে ন্যাকাবোকা হাসারির দিকে চেয়ে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর মুখে ছোট্ট একটু হাসি ফুটিয়ে বললো, 'তাহলে আসুন, দেনা-পাওনার কথাটাই আগে পাকা করে ফেলি।'

এদেশে মেয়ের বিয়ের যৌতুক দুভাগে দেওয়া হয়। নবোঢ়ার জামা-কাপড়, গয়না-গাঁটি হলো একভাগ। এর ষোলআনা অধিকার কনের। অন্য ভাগ হলো সেই-সব উপহারের সামগ্রী যেগুলি তাকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। হাসারির সাধ ছিল দুভাগের যৌতুক সামগ্রীর ফর্দ সে-ই তৈরি করে দেয়। ফর্দটি যে খুব বড় তা নয়। তবে প্রতিটি জিনিসের জন্যেই তাকে জলকাদা ভেঙে অনেক ছুটোছুটি করতে হবে। ইদানীং শরীরে আগের মতন বল নেই। এত ধকল সয় না শরীরে। যেটুকু বল সঞ্চয় হয় তার বেশী খরচ হয়ে যায় এই অনভিপ্রেত পরিশ্রমে। শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তবিন্দু ঝরে পড়ে যেন। তবুও এই ত্যাগটুকু তার কাছে আজ বড় মধুর। যৌতুক দ্রব্যের তালিকা সত্যিই বড় নয়। দুটো সুতির শাড়ি, দুটো ব্লাউস, একটা গায়ের কাপড়, কিছু বাসন-কোশন আর ক'টা গিল্টির গয়না। এগুলো কনের যৌতুক। বরের জন্যে আছে দুখানা ধুতি, কয়েকটা ফতুয়া আর একটা পাঞ্জাবি। সামান্যই যৌতুক। খুবই সামান্য। তবে আজকের দিনে এরই দাম হাজার দুয়েক টাকা। তাই দিন আনা দিন খাওয়া গরিব রিক্সাওলা বাপের কাছে এই চাপটুকুই অনেক।

এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে তালিকা শুনছিল হবু বরের বাপ। শেষ হলে একটু

অবাক হবার ভান করে বললো, 'ব্যস!'

বিষণ্ণ হাসারি মলিন মুখে মাথা নেড়ে সায় দিল। তবে আশ্বাসও দিল। বললো, 'আজ্ঞে! মেয়ের সত্যিই অনেক গুণ। দ্যাখবেন, সবাইকে সেবা দিয়ে সব পুষিয়ে দেবে।'

'তা হয়ত দেবে। কিন্তু গয়নাটা বড্ড কম হয়ে গেল। কি বলো পুরুত?' বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে হবু বরের বাপ গুছিয়ে বসে বললো 'এক কাজ করুন!'

'বলুন।'

'যা আছে থাক। ওর সঙ্গে দুটো পায়ের আঙুটি, একটা ব্রোচ্ আর সোনার একটা টিকলি জুড়ে দিন। খরচের খুব বেশী হেরফের হবে না।' একটু থেমে লোকটা ফের বললো, 'আর আমাদের জন্যে কি কি দিচ্ছেন?'

হঠাৎ বরের বাপের কথার মাঝখানেই পুরোহিত যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। এতক্ষণ সরু চোখে সে হাসারির হাবভাব লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এখন কি মনে হওয়ায় নিজের পাওনার কথাটা সেরে ফেলতে চাইল সে। সরাসরি হাসারিকে উদ্দেশ করে বললো, 'তোমাদের দেনা-পাওনার কথা পরে হবে। আগে আমার পাওনার কথাটা সেরে ফেল দিকি! পুরুত বিদেয় কি দিচ্ছ? কিছু কি ভেবেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেবেচি বৈকি! আপনার জন্যি দুখানা ধুতি আর ঠাকুরানীর জন্যি একখানা শাড়ি।'

পুরোহিত খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো হাসারির দিকে। তারপর খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে হাসতে হাসতে বললো, 'বলো কি য়াঁ? তুমি কি মস্করা কচ্চো নাকি গো? দুখানা ধুতি, একখানা শাড়ি! ভিক্ষে দিচ্চ পুরুতকে?'

পুজারীর নির্মম, নিষ্ঠুর কথাগুলো যেন ছুরির ফলার মতন তীক্ষ্ন। কোভালস্কীর মনটা ছটফট করে উঠলো ব্যথায়। সে স্পষ্ট দেখতে পেল হাসারির কপালখানা ঘামে জবজব করছে। কি করুণ, অসহায় দেখাচ্ছে মানুষটাকে! মনে মনে কাতর প্রার্থনা করলো কোভালস্কী। 'হে প্রভু! দস্যু দুটো ওর সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যেতে চায়। মাথার চুলটাও বিকিয়ে যাবে ওর। ওকে রক্ষা করো প্রভু!'

ভরসার কথা কালীমা তার দলবল নিয়ে দরজার মুখে আঠার মতন সেঁটে আছে। ওরা আড়ি পেতে দেনা-পাওনার কথা শুনছে। মাঝে মাঝে বাইরেও খবর দিয়ে আসছে। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক আলাপের পরেও সমস্যার জট খুললো না। দাবি থেকে এক চুলও নড়বে না কেউ। কথায় বলে লাখ কথার বিয়ে। তা কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। সমস্যাটাও সহজ নয়।

তিনদিন পরে ওই একই ঘরে ফের আলোচনায় বসলো ওরা। সেদিন হবু জামাইয়ের বাপ আর পুরুতের জন্যে সামান্য দুটো যৌতুক এনেছে হাসারি। খুবই সামান্য দুখানা গামছা। এটা নাকি রীতি। মেয়ের বাপের কর্তব্য। তা অসৈরণ হয় এমন কিছু জেনেশুনে করবে না হাসারি। কিন্তু এ ক'দিনের দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় 'শরীলটা' যেন ভেঙে গেছে অনেক। শ্বাস নিতে বড় কষ্ট। কাশটাও বেড়েছে। ম্যাক্স নামে ওই 'ছায়েব' ছোকরার চিকিৎসার গুণে ক'টা দিন বেশ ভাল ছিল হাসারি। এখন আবার সেই আগের অবস্থা। শরীরের যা অবস্থা! কখন কি হয়ে যায় কে জানে! সর্বক্ষণ একটা আতঙ্ক তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অমৃতার বিয়ের আগে 'পেরাণটা' না খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়! কিন্তু না। কর্তব্যটি তাকে পালন

করতেই হবে। সে তাই মনে মনে স্থির করেছে যে, ওদের সব বায়নাই সে যথাসম্ভব মেনে নেবে। কিন্তু প্রথমেই গোলমাল করে দিল পুরুত। কথা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই এক লম্বা দাবির ফিরিস্তি দিল। ফর্দ শুনে দুই বাপই অবাক। তা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হাসারির। তাই দুই নাচার বাপই বেঁকে বসলো শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু পুরুতও নাছোড়, একগুঁয়ে। শেষমেশ ভয় দেখিয়ে বললো, 'তাহলে আমায় ছেড়ে দাও তোমরা। আমি এর মধ্যে নেই।'

হাসারিও রেগে গেল। বলে উঠলো, 'তাই যায়েন। আমরা তাহলে অন্য পুরুত খুঁজি!'

পুরোহিতের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ভাবটি গোপন করে হো হো করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, 'কিন্তু যাবে কোথায় তুমি? তোমার মেয়ের ঠিকুজি ত আমার কাছে! ঠিকুজি ছাড়া অন্য বামুন কি বিয়ে দিতে রাজী হবে? যদি হয় তো দ্যাখ!'

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করলো। লোকটার শয়তানি কথাবার্তা শুনে দরজার পাশে আড়ি পাতা মেয়েরা হিহি করে হেসে উঠলো। লজ্জায় ক্ষোভে হাসারির তখন মাটির সঙ্গে মিশে যাবার মতন অবস্থা। উঠোনে দাঁড়িয়ে মেয়েরা কত কি মন্তব্য করছে। কেউ বললো 'পুরুতটা নচ্ছার!' কেউ বললো, 'শয়তানের বাচ্চা!' সবাই সন্দেহ করছে বরের বাপের সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই ষড় আছে। কিন্তু ঘরের ভেতরে হাসারির তখন কোণঠাসা অবস্থা। যেন এক কানাগলিতে এসে আটকে গেছে ও। বেরিয়ে আসার পথ নেই। হঠাৎ দারুণ কাঁপুনি শুরু হলো ওর। হাসারি বুঝতে পারছে উত্তাল স্রোতের মতন জ্বর আসছে। দেখতে দেখতে প্রবল জ্বরের ঘোরে তার নিস্তেজ শরীরটা আলুথালু হয়ে উঠলো। চোখ দুটো জবা ফুলের মতন রক্তবর্ণ। সেই ঘোর লাগা চোখে পুরুতের দিকে চেয়ে মনে মনে হিংস্র গর্জন করে উঠলো। 'আমার মেয়ের বিয়ে যদি ভাঙে, তুমার জ্যান্ত ছাল চামড়া খুলে নেব শয়তান!' কিন্তু অন্তরের এই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলো না হাসারি। পুরোহিত তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ খপ্ করে ওর হাতখানা ধরে ফেললো হাসারি। তারপর সেই টকটকে লাল চোখে একরাশ মিনতি নিয়ে ভিক্ষে চাইল সে। 'এজ্ঞে! আর এট্টু বসুন। এট্টু ভাবতে দিন আমায়!'

'ভাবনার কিছু নেই হাসারি। আমাকেও সংসার করতে হয়। একশোটা টাকা দিয়ে দাও, সব মিটমাট হয়ে যাবে।'

হাসারি তাকাল হবু বরের বাপের দিকে। দুজনেই অসহায় হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। পুরোহিত আর একবার তাড়া দিল। 'কি হলো?'

অগত্যা ট্যাঁক থেকে নোটের একটা বান্ডিল বের করে পুরুতের হাতে দিল হাসারি।

হাতে টাকা পেয়েই পুরোহিত যেন অন্য মানুষ। প্রসন্ন, উদার হয়ে উঠলো লোকটার নিষ্ঠুর, কুটিল মুখখানা। আর কোন বাধা নেই। আবার কথা চলতে পারে। বস্তুপক্ষে, বস্তির অখ্যাত দুটি গরিব, দুঃস্থ ছেলে-মেয়ের বিয়ের কথার কত ঘটা! রাজা-রাজড়ার ছেলেমেয়ের বিয়েতেও বোধহয় এমন কথার ঘটা হয় না। বিয়ের দিনক্ষণ পাকা হবার আগে ওরা দু-তরফ মোট আটবার আলোচনায় বসলো। তবুও যৌতুকের ব্যাপারে পাকা নিষ্পত্তি হলো না। এর মধ্যে কত হুমকি, অনুনয়, চোখের জল আর আনন্দখুশীর কৃপাবাতাস বয়েছে। কিন্তু একটা না একটা

নতুন বায়না তুলে প্রায় নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া ব্যবস্থাটা ভণ্ডুল করে দিয়েছে বর পক্ষ। একবার দাবি হলো সাইকেল চাই। পরের দিন বায়না হলো ট্রানজিস্টর দিতে হবে। সঙ্গে আরও একটা সোনার গয়না এবং একখানা ধুতি। বিয়ের ঠিক দিন ছ'য়েক আগে একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্যে সম্বন্ধ ভেঙে যাবার উপক্রম হলো। বরপক্ষের ওরা দাবি করলো যে তারা মোট বারোখানা ধুতি চেয়েছিল। হাসারির দাবি ওরা ছ'খানা ধুতি চেয়েছিল। এই টানাপোড়েনে দুপক্ষই অনড়। শেষ পর্যন্ত হবুবরের একা কাকা এসে কোভালস্কীর শরণাপন্ন হলো। 'সায়েব! আপনিই পারেন এটা মিটিয়ে দিতে। আপনার ত অভাব নেই! শুনেছি আপনি খুব বড়মানুষ!'

মোটকথা, দিনের পর দিন ধরে এই চাপান-উতোর দুর্বল হাসারির প্রাণ কণ্ঠাগত করে দিল যেন। মানুষটার আর সেই উৎসাহ নেই। একেবারে পাথর হয়ে গেছে সে। একদিন সকালবেলা স্ট্যান্ড থেকে গাড়িটা নিয়ে চলতে গিয়ে কেমন মাথা ঘুরে গেল তার। তখন মনে হচ্ছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন। 'হ্যাঁ তাই বটে! মনে হচ্ছিল কোথায় নেমে যাচ্ছি কোন্ অতল গর্তে। আমার নয়নের সামনে বন্‌বন্ করে গাড়ি, ঘোড়া, মানুষগুলো ঘুরছে। যেন নাগরদোলায় চেপে আমার চারপাশে ঘুরছে অরা। হঠাৎ শুনতে পেলুম বাঁশির তীক্ষ্ন আওয়াজ। তারপর সব ঘোর আঁধার।' আর কিছু মনে পড়ে না হাসারির। কখন হাত থেকে রিক্সার ডাণ্ডা দুটি খসে গেছে কে জানে! জ্ঞানহারা হয়ে গাড়ির পা-দানির ওপর লুটিয়ে পড়লো হাসারি।

কতক্ষণ এমনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিল কে জানে! হঠাৎ চোখ খুলে দেখলো মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একটা চেনা মুখের আদল। খানিকক্ষণ ঠাহর করে দেখে বুঝতে পারলো মানুষটা মুসাফির। রিক্সা মালিকের সাকরেদ। ঘুরে ঘুরে ভাড়ার টাকা আদায় করতে বেরিয়েছে সে। হাসারিকে ওই অবস্থায় দেখে ওর বোধহয় ধন্দ হয়েছিল। তাই ঝুঁকে বোঝবার চেষ্টা করছিল ওর অবস্থাটা। হাসারিকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে মুসাফির ওর গালে টোকা দিয়ে বললো, 'এতো 'বাঙ্‌লা' খেয়েচ শালা যে মাথা তুলতে পারচো না?'

হাসারি জবাব দিল না। কোনরকমে হাতটা তুলে নিজের বুকের খাঁচাখানা দেখিয়ে বললো, 'বাঙ্‌লা নয় গো! মনে হচ্ছে আমার মোটর গাড়ি আর বোধহয় চলবেক না।'

'তুমহার মোটরগাড়ি?'

মুসাফির অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু একবারটি দেখেই বুঝতে পারলো ইঙ্গিতটা। একটু চিন্তিত হলো সে। তারপর দুঃখিত স্বরে বললো, 'হাসারি ভাই! তুমহার মোটর যদি না চলে, তবে তোমায় যন্তরটি ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের বুড়ো মালিককে ত তুমি জানো। বড় একগুঁয়ে মানুষ আছে ও। ও বলে, "হামার দরকার যোয়ান বলদ কচি পাঁঠা লয়।"

হাসারি মাথা নেড়ে সায় দিল মুসাফিরের কথার। ঠিক কথাই বলে বিপিন। সংসারে সবাই চায় যোয়ান বলদ। কিন্ত এখন সে আর তেজী যোয়ান নেই। আখ মাড়াই যন্ত্রে ফেলে ওর রসকস শুষে নিয়েছে। তাই ক্ষোভ করলো না। প্রতিবাদ জানালো না। মুসাফিরের ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। শহরের আইন-কানুন আলাদা। যে মানুষটির মোটর চলে না সে ত মরা মানুষের সামিল! বেঁচে থাকার

অধিকারটি খুইয়ে বসেছে সে। এই নির্দয় শহরে প্রথম যেদিন পা দিল, সেদিনই এই মূল্যবান শিক্ষাটি সে পেয়েছিল। তারপর যেদিন ঠেলাগাড়ির সেই হতভাগ্য মজুরটিকে সে হাসপাতালে নিয়ে গেল, সেদিন তার অভিজ্ঞতাটা পাকা হয়েছিল। তারপর ত কত ঘটনা চাক্ষুস করেছে সে। রিক্সার হাতলের ওপর রামের দেহটা লুটিয়ে পড়তে দেখেছে সে। তার চোখের সামনেই তিলতিল করে মরেছে রামচন্দর। এই শহর তার সব শক্তি লুঠ করে নিয়েছে। একটু একটু করে তার শরীরটি ক্ষয় করে দিয়েছে। রোদ, জল, শীত, খিদে আর সর্বোপরি অমানুষিক হাড়ভাঙাখাটুনিতে শরীর নামক সত্তাটাই লোপ পেয়ে গেছে যেন। আজ অবশিষ্ট আছে এই হাড় ক'খানা। তাও নিজের অধিকারে নেই এরা। মমতা-ভরা চোখে তাকালো গাড়িখানার দিকে। এই সেই গাড়ি—একদিন যার হাতলদুটি ধরে এই নির্মম শহরে সে বাঁচার লড়াই করতে নেমেছিল। কত চেনা এর এই দুটি হাতল, এই পর্দা ঢাকা সীটখানি আর কালো রঙের সারা শরীরটা। কত হাজার মাইল চলেছে এর এই চাকা দুটি! এর পর্দা ঢাকা ছেঁড়া সীটের ওপর বসে কত ভালবাসার কথা বলেছে প্রেমিক-প্রেমিকারা! কত জলবন্দী অসহায় মানুষ এই ভাঙাচোরা গাড়িখানি আশ্রয় করে বর্ষার দিনগুলো পাড়ি দিয়েছে! রিক্সার হাতল দুটির দিকে ঠায় চেয়ে রইল হাসারি। এরাই তার শত্তুর। এই ডাণ্ডা দুটির জন্যেই এত ক্লেশ আর পীড়ন সইতে হয়েছে তাকে। পিচ গলা রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত পা দুটি টেনে টেনে কত হাজার মাইল পথ চলেছে, তা সে জানে না। সে শুধু জানে, এক একবার চাকা ঘুরেছে আর ভাগ্যচক্রের এক একটি বাঁধন আলগা হয়েছে। এর একটি করে আবর্তন যেন অভিশাপ থেকে মুক্তির আশ্বাস। এবার সেই জট সম্পূর্ণ মুক্ত হলো। আর চাকা ঘুরবে না। শেষ হলো তার খেলাভাঙার খেলা।

হাসারি তাকাল! সাইকেলের দুদিকে দুপা দিয়ে মুসাফির চেয়ে আছে তার দিকে। অবসন্ন ক্লান্ত গলায় হাসারি বললো, 'তাই হ'ক মুসাফিব। গাড়িখানা তুমি নিয়েই যাও। আর কাউকে দাও। সে খুশী হ'ক। আমিও মুক্তি পাই।'

তখন ধীরে ধীরে উঠে বসেছে হাসারি। ঊনিশশো নিরানব্বুই নম্বরের গাড়িখানা ক্লান্ত পায়ে টেনে নিয়ে গেল পার্ক সার্কাস স্ট্যাণ্ডে। তখনও অনেক রিক্সাওলা কাজে বেরোয় নি। ওদের সকলের কাছে বিদায় নিল হাসারি। ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তাগড়া যোয়ান একটা ছেলেকে ইসারায় ডেকে পাঠাল মুসাফির। ওর হাতেই রিক্সাগাড়িটা তুলে দেবে সে। এরা সবাই বিহার বা বাংলার গ্রাম থেকে তাড়া খেয়ে শহরে এসেছে পেটখোরাকি যোগাড় করতে। খরা বন্যায় চোট খেয়ে পালিয়ে এসেছে শহরে। এদের সবারই আশা-আকাঙ্ক্ষা একদিন না একদিন রিক্সার হাতল দুটি হাতে নিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় যাত্রী নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। ওই যোয়ান তাগড়া ছেলেটার সেই স্বপ্ন আজ বুঝি সফল হলো।

ছেলেটার কাছে হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়ালো হাসারি। তারপর হাতের আঙুলের সংগে জড়ানো পিতলের ঘণ্টীটা খুলে ছেলেটার হাতে তুলে দিল। যেন অধিকারটাই ন্যস্ত করলো ছেলেটার হাতে। খানিক পরে কোমল স্বরে বললো, 'বাবা! এটিকে যত্ন করে রেখ! বিপদে-আপদে এই-ই তোমায় রক্ষে করবে। এটিই তোমার রক্ষেকবচ!'

মন ভেঙে গেছে হাসারির। শরীরটি আগেই ভেঙেছিল। হাসারি বুঝতে পারছে ভিতরের যন্তরটি ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে। তাই ঘুরপথ হলেও ফেরার

সময় কঙ্কালওলার দোকানে হাজির হলো সে। হাড় ক'খানার বকেয়া টাকাটি আদায় করতে হবে। দোকানী এবারও অনেকক্ষণ ধরে খ্‌ুটিয়ে খ্‌ুটিয়ে তাকে দেখলো। তারপর হাড় বেচার দ্বিতীয় কিস্তির টাকাটা ওর হাতে দিল। দোকানী আশ্বস্ত হয়েছে হাসারির শরীরের অবস্থা দেখে। মানুষটা যে ক্ষয়ের পথ ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, দোকানী তা বুঝেছে।

যৌতুকের ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হতে আরও দিনতিনেক সময় নিল। এর মধ্যে দু তরফেই অনেক গরম গরম কথাবার্তা হয়েছে। যা হ'ক, মোটামুটি একটা রফা হলো। হিন্দুর বিয়ের একটা প্রাক্-বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। এর নাম পাকা দেখা। সেদিনই যৌতুকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। বিয়ের মতনই ধুমধাম হয় সেদিন। ফুল-মালা দিয়ে ঘর সাজানো হয়। পুরোহিত আসে। মন্ত্রপাঠ হয়। সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ের অভিভাবকরা কন্যা সম্প্রদান করে আত্মীয়স্বজনদের সামনে। সুতরাং হাসারিকে এর ব্যবস্থাদি করতে হলো। কিন্তু যৌতুকের কথা বলার সময় একটু অবাঞ্ছিত উত্তেজনা হলো। পরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটলো যেগুলি অভি-প্রেত নয়। বরপক্ষের লোকেরা যৌতুক দ্রব্যগুলো ফর্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইলো। শুধু তাই নয় প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে তাদের দাম যাচাই করে নিতে লাগলো। রুষ্ট কোভালস্কীর মনে হচ্ছিল, সে বোধহয় বড়বাজারের কোন দোকানে ঢুকেছে। লোকগুলোর সামনে স্তূপ করা আছে যৌতুকের জিনিসপত্র। এটা নাড়ছে। ওটা দেখছে। দাম অনুযায়ী শাড়িটা কেন সুন্দর নয়! ট্রানজিসটর রেডিওর অবস্থা এত করুণ কেন? ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর সামনে হাসারির অসহায়তা আরও করুণ হয়ে উঠছিল যেন। কোভালস্কীর মনে হলো নির্দয় লোকগুলোর এক একটা অভিযোগ যেন হাসারির বিপন্ন বুক থেকে টেনে বার করে নিচ্ছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। বিয়ের আগের দিনেই শুরু হলো আর একটা নাটক। দলবল নিয়ে বরপক্ষের লোকেরা এল বিয়ের আয়োজন দেখতে। তখনই হাসারি জানতে পারলো যে বর-যাত্রীর সংখ্যা হবে একশ' জন। সুতরাং তাদের আপ্যায়নের জন্যে যেন যথেষ্ট খাবারদাবার মজুত থাকে। বরযাত্রীর সংখ্যা শুনে হাসারি ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো, 'সে কি কথা? আমাদের কথা হয়েছিল পঞ্চাশ জন বরযাত্রী আসবে। আপনিও রাজী হয়েছিলেন।'

'না। তেমন কথা হয় নি।'

বাদানুবাদ চললো দুপক্ষে। যারা শুনছে তারা হাসাহাসি করলো। ইতিমধ্যে কয়েকজন ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা মেলাতে বসলো। আরও কয়েক পদ ভোজ্যবস্তু বাড়াতে চাইল ওরা। হাসারি তখন মরিয়া। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আত্মরক্ষা করে চলেছে সে। শেষ পর্যন্ত ওদের চাপের মুখে সম্মত হলো সে। হতাশ বিপন্ন মানুষ-টাকে মানতে হলো ওদের বায়না।

'বেশ, তাই হবে। কিন্তু দয়া করে অত বরযাত্রী আনবেন না। অন্তত কুড়িজন মানুষ কম আনুন।'

'অসম্ভব। দশ জন কম হতে পারে।'

আবার সেই টানাপোড়েন। শেষ পর্যন্ত রফা হলো ওরা বারোজন মানুষ কম আনবে। হাসারির দুশ্চিন্তা তখনও কাটে নি। হয়ত আবার একটা আপত্তির কথা তুলবে। যেটি সে আশঙ্কা করেছিল এবার সেটিই ঘটলো। বিয়ের সময় গড়ের বাদ্যির কথা তুললো ওরা। জানতে চাইলো কতজন বাদ্যিওলা আসবে। মোট ছ'-

জনের দল আসবে শুনে বরপক্ষ অবাক। সে কি কথা? এমন গুণের বরের বিয়েতে শুধু ছ'জনের দল? হাসারি অনেক চেষ্টা করলো ওদের বোঝাতে। ওদের বস্তির সেরা দল এরা। তবুও রাজী হলো না ওরা। অন্তত আরও দুজন বাজনদারকে দলে ঢোকাতে হবে। এবারও হাসারিকে মানতে হলো ওদের দাবি। কিন্তু এতেই থেমে গেল না ওরা। আরও দাবি আছে ওদের। পরের দাবি শুধু ওদের নয়। পুরোহিতেরও। দাবিও বিচিত্র। বিয়ের সময় জেনারেটর চাই। পাঁজি-পুঁথি দেখে প্রায় মাঝরাতে অমৃতার বিয়ের লগ্ন স্থির করেছে পুরোহিত। সুতরাং সংগত কারণেই জেনারেটরের দরকার। বিয়ের আসর আলোয় উজ্জ্বল না হলে যেন বিয়েই মানায় না। হয়ত গূঢ় কোন আধিদৈবিক কারণে, বা জ্যোতিষ গণনার কারচুপির দরুন, এদেশের অধিকাংশ বিবাহই বেশী রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। যথার্থ কারণটি যে কি কোভালস্কী তা জানে না। তবে আনোয়ার এবং মিতার বিবাহ লগ্ন যে সময়ে স্থির হয়েছিল, অমৃতার বিয়েও সেই সময়েই স্থির হয়েছে। তাই এক্ষেত্রেও জেনারেটরের দাবিটি হাসারির মানা উচিত।

কিন্তু হাসারি তখন যথার্থই মূক হয়ে গেছে। মানুষগুলোর নিষ্ঠুর দাবির বহর শুনে হতবাক হয়ে গেছে সে। ওর পিঠ ঘামের সংগে সেঁটে গেছে দেওয়ালে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। মনে হলো বোধহয় বমি করবে সে। তখন নিশ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। আবার যেন পায়ের তলার মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে। ওদের মুখগুলো, ঘরের দেওয়ালটা—সব যেন অস্পষ্ট ছবির মতন চোখের ওপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। গলা দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছিল। কান পাতলে হয়ত শোনা যেত মানুষটা যেন বলছে, 'আমি দিতে পারবো না। কিছুতেই না। আমি জানি অমৃতার বিয়েতে ওরা আমায় শুষে নিতে চায়।' কিন্তু বরের বাপের জেনারেটরের দাবিটা হয়ত নেহাত অন্যায্য ছিল না।

কারণ, লক্ষ লক্ষ যে সব বস্তিবাসী আলোর অভাবে নিত্য অন্ধকারে জীবন কাটায়, তাদের কাছে আলোর রোশনাই ছাড়া কোন উৎসবই মানায় না। তারা জানে অফুরন্ত আলোর ঝলমলানির মধ্যে দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে যাবার একটা স্পর্ধা আছে। আনোয়ারের বিয়ের রাতেও ওরা এই স্পর্ধাটা পেয়েছিল। কিন্তু হাসারি সত্যিই শূন্য হয়ে গেছে। তাই চেষ্টা করলেও এই স্পর্ধাটুকু বস্তিবাসীকে সে দিতে পারবে না। ফলে বরপক্ষের লোকগুলোর জিদ সত্ত্বেও সে তার শূন্য হাতখানা দেখিয়ে বিমর্ষ হয়ে মাথা নাড়লো। যে মানুষটা জীবনের শেষবেলার হাতছানি পেয়েছে, তার কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে কর্তব্য পালন করা এমন কোন দায় নয়। কিন্তু এটুকু সাশ্রয়ও আজ হাসারির নেই। ইতিমধ্যেই মহাজনের কাছে বউয়ের আংটি, দুল আর শম্ভুর কুড়িয়ে পাওয়া ঘড়িটা বন্ধক রেখে সে ঋণ নিয়েছে। সুতরাং ঋণ নেবার অবস্থাও আজ আর তার নেই। তাই চরম লাঞ্ছনার কাছে সে আত্মসমর্পণ করলো। প্রায় আর্তনাদ করেই হাসারি বলে উঠলো, 'না। না। 'আর চেও না তোমরা।' থেমে থেমে দম নিয়ে বলছিল সে। 'আমার আর কিছুই নাই গো! আমি শ্যাষ হয়ে গেচি। একটি কানা কড়িও নাই। তবুও তোমরা যদি জোর করো, ত এ বিয়ে ভেঙে দিতি হবে আমায়!'

বিয়ের ঠিক চোদ্দ ঘণ্টা আগে এইরকম এক অন্ধ প্রতিকারহীন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, তা বোধহয় কেউ ভাবে-নি। এ যেন সম্বন্ধ ভেঙে যাবার অবস্থা। হাসারি অপারক হয়ে হার মেনে নিয়েছে। এতকাল সে লড়াই করেছে। কিন্তু আজ

তার চোখে আপোসের ছায়া। যেন সে কোথায় হারিয়ে গেছে। কোভালস্কী পাথর হয়ে চেয়ে রইল হাসারির দিকে। ধাপ্পা হ'ক আর না হ'ক, বরপক্ষের মানুষগুলো তখনও গোঁ ছাড়ে নি। কিন্তু সামান্য লাইটের জন্যে নিশ্চয়ই বিয়ের মতন বড় ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দেওয়া যায় না! নিরুপায় কোভালস্কী ভাবলো এ অবস্থায় মানুষটাকে সাহায্যের একটু আশ্বাস দেওয়া হয়ত অনুচিত হবে না। তাই সে বললো, 'শোনো হাসারি ভাই! এখানে কাছাকাছি একটা পাড়ায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। অনায়াসেই একটা কেব্‌ল্‌ বসিয়ে চার-ছ'টা আলোর পয়েন্ট সেখান থেকে টানা যায়। তাতেই যথেষ্ট আলো হবে তোমার ঘরে আর বারান্দায়।'

কোভালস্কীর কথা শুনে দারুণ আশ্বস্ত হলো হাসারি। ওর চোখ দুটি যেন কৃতজ্ঞতায় ছলছল করছে। কোভালস্কীর মনে হলো মানুষটার কৃতজ্ঞ চোখের কিরণ সারাজীবন ধরেই তাকে আলো দিয়ে যাবে।

কিন্তু লড়াইয়ে পুরো জয় তখনও হয়নি। বিয়ে বসতে আর সাত ঘণ্টাও দেরি নেই। নতুন একটা বিপত্তি দেখা দিল। তবে এবার হাসারি নিজেই দায়ী। হঠাৎ তার মনে হয়েছে লোককে বিয়ের ঘটা দেখাতে হবে। লোকে বিয়ের ঘটা টের পায় দুটো ঘটনা থেকে। একটা হলো জমকাল পোশাক পরে, বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে বরের মিছিল করে আসা, আর অন্যটা হলো ধুমধাম করে বিয়ের উৎসব সাজানো। বরকে কেমন করে আনা হবে তা জানতে চাইল হাসারি। সে দেখেছে বস্তির বিয়েতেও ঘোড়ায় চড়ে বর বিয়ে করতে আসছে। তাই বরের বাপের কাছে কথাটা তুললো সে। কিন্তু লোকটা যেন তেমন আমল দিল না হাসারির কথায়। খুবই তাচ্ছিল্য করে বললো, 'কেন? রিক্সায়?'

রিক্সা শুনে আচমকা দমবন্ধ হবার উপক্রম হলো হাসারির। কোনরকমে তাকে সামলে দিল কোভালস্কী। কিন্তু মানুষটা এমন এক ধাক্কায় সত্যিই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটু পরে ক্ষিপ্ত স্বরে বললো, 'কিসে আসবে বললেন? রিক্সায়? রিক্সায় আসবে বর?'

বরের বাপ বোধহয় এমন এক চড়া জবাব আশা করেনি। কি বলবে সেও ভেবে পেল না। উত্তেজনায় হাসারির চোখ দুটো তখন জ্বলছে। বরের বাপের দিকে আগুনভরা দৃষ্টিতে চেয়ে হুমকি দিয়ে উঠলো সে, 'না। রিক্সায় চড়ে বর আসবে না। আমার মেয়ে বিয়ে করবে না সে বর। আমি ট্যাক্সি চাই। মিছিল চাই। নইলে বিয়ে হবেক না।'

বরপক্ষ হতবাক। কোভালস্কীও ভেবে পাচ্ছে না কি বিহিত হবে। প্রায় দৈবানুগ্রহে বিহিতের একটা উপায় করে দিল ট্যাক্সিওলা মানিক। দুই পরিবারের মনান্তরের ব্যাপারটা জেনে খুশী হয়েই বর আনার জন্যে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল সে। হাসারি অভিভূত হয়ে গেল মানুষটার উদারতায়। পুরনো সেই দিনটার কথা মনে পড়ে গেল তার। এই গাড়িতে বসেই জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটা সে দেখতে পেয়েছিল সেদিন। মীটার নামক যন্ত্রটার মধ্যে কেমন বৃষ্টির ফোঁটার মতন টুক-টুক করে টাকার অঙ্কগুলো ঝরে পড়ছে! ব্যাপারটা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল হাসারি। আজ তার মনে হচ্ছে এই ট্যাক্সিখানাই মেয়ের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। সুখের সংসার উথলে উঠবে তার। আর তার মনে ক্ষোভ নেই। মন থেকে সব মেঘ সরে গেছে।

এর ঠিক কয়েক ঘণ্টা পরেই হাসারি যা দেখলো বোধহয় সেটুকু দেখার জন্যেই

এতকাল সে বসে ছিল। মেয়ের বধূসাজ দেখে চোখে আর পলক পড়ছে না তার। খুশীতে উপচে পড়লো তার চোখদুটি। চেঁচিয়ে কোভালস্কীকে ডেকে উঠলো হাসারি, 'দ্যাখো বড়ভাই! চেয়ে দ্যাখো আমার মেয়ের দিকে! কেমন সোন্দর দেখাচ্ছে ওকে!'

অমৃতাকে সবাই আজ খুব সাজিয়েছে। ওর পরনে লাল বেনারসী শাড়ি। শাড়ির গায়ে হলুদ বুটি। লজ্জায় মুখটি আনত। মুখের ওপর পাতলা ওড়না ঝুলছে। দুটি পা আলতা পরা। পায়ে মল, হাতে বাজু। মেয়েকে নিয়ে অমৃতার মা উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। উঠানের মাঝখানে একটা কুশাসন বিছানো আছে। অমৃতাকে সেই আসনের ওপর দাঁড় করাল ওরা। সামনে হোমের আগুন জ্বলছে। এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। ছবিটা দেখতে দেখতে হাসারির মুখখানা খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। তার মনে হচ্ছিল, যেন জীবনের মধুরতম দৃশ্যটি সে আজ দেখলো। মন থেকে তখন সব অন্ধকার মুছে গেছে। ভয়ংকর সেই পুরনো দুঃস্বপ্নের ছবিগুলো যেন যাদুকাঠির ছোঁয়ায় কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কী দারুণ বিভীষিকাময় সেইসব দৃশ্য! ভীষণ শীতের রাত্রে ফুটপাতের ওপর শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে অমৃতা। কী-ই বা বয়স তখন তার! ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের ডাঁই করা উচ্ছিষ্ট থেকে খুঁটে খুঁটে খাবার বের করছে। কখনও চৌরঙ্গীর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কচি কচি হাতে ভিক্ষে করছে। এখন এই মুহূর্তে হাসারির মনে হলো সে জিতেছে। লড়াইয়ে সে হারে নি। ভাগাহত জীবনে সে হার স্বীকার করে নি। একটা দারুণ প্রতিশোধ নিতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত।

ঝম্ করে করতালের আওয়াজে হাসারির স্বপ্ন ভেঙে গেল। তার মানে বর এসেছে। সত্যিই তাই। দলবল নিয়ে বাজনদারেরা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। ঝমাঝম বাজনা বাজছে। মেয়েদের মতন ঢঙ্ করে ছেলেরা নাচছে, গাইছে। সবাই খুশীতে ডগমগ। আজ যেন খুশীর বান ডেকেছে এই হিন্দু পাড়ায়। কোভালস্কী চেয়ে আছে বরের দিকে। যেন আরব্যরজনীর গল্পের রাজপুত্র নেমে এল আকাশ থেকে। ভেঁপুর আওয়াজ, করতালের ঝমাঝম শব্দ, গান, নাচ—সব মিলিয়ে এক চোখ-ঝলসান দৃশ্য যেন। বরের মাথায় সলমা চুমকি বসানো টোপর পরা। নতুন ঝলমলে পোশাকে বরকে দেখাচ্ছে রাজা-মহারাজার মতন।

বরের মুখের সামনে কাপড় ফেলা। বিয়ের আগে বরের মুখ দেখবে না কনে। এটাই রীতি। পুরোহিতই এ অনুষ্ঠানের প্রধানপুরুষ। সে ঋত্বিক। তার নির্দেশেই রীতিপালন হচ্ছে। পুরোহিতের ইঙ্গিত পেয়ে বর কনের পাশে গিয়ে বসলো। তারপর শুরু হলো হিন্দু বিয়ের নানা মনোরম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের কত খুঁটি-নাটি, কত আচার-বিচার! মাঝে মাঝে দেবভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করছে পুরোহিত। কত হাজার হাজার বছর ধরে ঋষিরা এই ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করে এসেছেন। কী গভীর, বাঙ্ময় এর ব্যঞ্জনা! অবশ্য মন্ত্রপাঠের অর্থ কেউ বুঝছিল না। কোভালস্কীর মনে হলো হয়ত পুরোহিতও না বুঝেই মন্ত্রোচ্চারণ করছে।

একটা ব্যাপার সবাই লক্ষ্য করেছে। কনের ডানপাশের আসনটি ফাঁকা। এই সম্মানিত আসনটি হাসারির জন্যেই নির্দিষ্ট। কিন্তু হাসারি নেই। শূন্য আসনে কেউ উপবিষ্ট নেই। তবে এই সম্মানিত আসনটি যার জন্যে সে ছেড়ে দিয়েছে, তাকে সবাই চেনে। স্তেফান কোভালস্কীর জন্যেই আসনটি ছাড়া আছে। কোভালস্কী

যেন তার দুঃখের দিনের একমাত্র সাথী, তার বিশ্বস্ত সখা, তার বিবেক। কিন্তু স্তেফান ভাইও ওখানে বসে নেই। যখন বর এল তখনই হাসারিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো হাসারি। পর পর বার কয়েক দারুণ কাঁপুনি উঠলো শরীরে। তাড়াতাড়ি মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল কোভালস্কী। খানিক আগেও যে চোখ দুটি খুশীতে ঝলমল করেছে সে চোখ দুটি বোজা। মুখের ওপর যন্ত্রণার কালো ছাপ। শরীরটা কেমন যেন শক্ত আর স্থির। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের শক্ খেল মানুষটা। তারপর শীর্ণ বুকখানা ওঠানামা করতে লাগলো। ঠোঁট দুটি তখন খুলে গেছে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো। একবার চেয়েই কোভালস্কী বুঝতে পারলো বুকের ভেতরে দারুণ শ্বাসকষ্ট পাচ্ছে সে। তাড়াতাড়ি হাসারিকে টানটান করে শুইয়ে দিল কোভালস্কী। তারপর বুকের ওপর জোরে জোরে চাপ দিয়ে ম্যাসাজ করতে লাগলো। মানুষটার শরীরটা যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা ক'খানা হাড়। তার আঙুলের চাপে ওর বুকের হাড়-পাঁজরায় শব্দ হচ্ছে ক্যাঁচকোঁচ। এইভাবে অনেকক্ষণ ম্যাসাজ করলো কোভালস্কী। কোভালস্কীর পরনের নতুন সাদা পাঞ্জাবিটা তখন ঘামে ভিজে সপ্-সপ্ করছে। হঠাৎ মনে হলো হাসারির কংকালসার বুকের মধ্যে খুব ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। মনে মনে খুশী হলো কোভালস্কী। তার পরিশ্রম সার্থক হলো। ক্ষীণ হলেও মানুষটার হৃদ্‌যন্ত্রটা আবার সে চালু করতে পেরেছে। কিন্তু কোভালস্কী জানে এই সাফল্য সাময়িক। এখনই হয়ত বুকের ধুকপুকানি থেমে যাবে। একে স্থায়ী করতে আরও কিছু করতে হবে তাকে। এবার সে যা করলো তার চেয়ে মহৎ কাজ আর হয় না। নিচু হয়ে হাসারির মুখের ওপর নিজের মুখ-খানা চেপে ছন্দোময় ফুৎকারের সাহায্যে মানুষটার ক্ষয় হয়ে যাওয়া ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ভরে দিতে লাগলো। ফ্রাটারনিটির একজন ধর্মযাজকের কাছে ঘটনার বিবরণটি এইভাবে দিয়েছিল কোভালস্কী।

'ধীরে ধীরে চোখ খুললো হাসারি। চোখের জলে যেন সাঁতার কাটছে তার চোখ দুটি। বুঝতে পারলাম ওর শরীরে তখন খুব কষ্ট। একটু জল খাওয়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কষ বেয়ে জল গড়িয়ে গেল। খুব ক্ষীণভাবে সে তখন শ্বাস নিচ্ছে। একবার মনে হলো যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে অনেক লোকের কথাবার্তা আর আনন্দোচ্ছ্বাসের আওয়াজ ভেসে আসছে। বোধহয় সেই শব্দটাই শুনতে পেয়েছে হাসারি। ম্লান একটু হাসলো হাসারি। বিয়ে যে হচ্ছে তা সে বুঝতে পেরেছে। তাই ওই তৃপ্তির হাসি। হয়ত সেইজন্যই কিছু বলতে চাইছিল সে। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ওর মুখের কাছে আমার কান নিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম ও যেন বলছে, "বড় ভাই! বড় ভাই!" বোধহয় আরও কিছু বলতে চাইল সে। কিন্তু কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'খানিকক্ষণ পরে আমার হাতখানা ধরে মোচড়াবার চেষ্টা করলো হাসারি। বেশ জোর ওর আঙুলে। খুব অবাক হলাম জোর দেখে। সাঁড়াশীর মতন শক্ত ওর আঙুলের হাড়। এতদিন ধরে যে এই হাতদুটো দিয়েই সে রিক্সা চালিয়েছে তা বুঝতে পারছিলাম। শক্ত করে হাতটা ধরে মিনতি ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে হাসারি। কিছু যেন বলতে চাইছে, অথচ পারছে না। সেই অক্ষম চেষ্টা ওর দুচোখের ভাষায়। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর বললো, "বড়ভাই বড়ভাই!" এরপর বাংলায় কিছু একটা বললো। মনে হলো ওর ছেলে আর বউয়ের কথা বলছে। যেন মিনতি

করছে, "বড় ভাই! অরা রইলো। অদের এটু দ্যাখবেন!" আমার বুকটা তখন অজান্তেই কেঁপে উঠেছিল। তবুও ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। বেশ বুঝতে পারছি, মানুষটার শেষ সময় বুঝি ঘনিয়ে আসছে। ও নিজেও তা বুঝতে পেরেছিল। তাই নানাভাবে হাত নেড়ে আমায় বোঝাতে চাইছিল যেন সবার অলক্ষ্যে চোরের মতন ও চলে যেতে পারে। মানুষটার যেন আতঙ্ক হয়েছে এমন ভাবে হঠাৎ চলে গেলে বিয়েটা যদি পণ্ড হয়ে যায়! তাই এই হুড়োহুড়ি, ব্যস্ততা। আমার নিজেরও ওই রকম আশংকাই হয়েছিল। তাই মানিককে ডেকে তখুনি ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে বললাম।

'রাত তিনটে নাগাদ কালীমা, শম্ভু আর মানিককে নিয়ে নিঃশব্দে হাসারিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কেউ জানতে পারে নি। বস্তির ধর্মবাপ কয়েক বোতল 'বাঙলা' পাঠিয়েছিল। সেই খেয়ে সবাই বেসামাল হয়ে ঘুমচ্ছে। হাসারি বুঝতে পেরেছিল যে চিরকালের মতন নিজের ঘরখানা আর চেনা মানুষগুলোকে ছেড়ে যাচ্ছে সে। তাই ঘুমিয়ে পড়া মানুষগুলোর দিকে দুহাত জড়ো করে নমস্কার করলো সে। আজ ওর ছুটি হলো। তাই বিদায় চেয়ে নিল সকলের কাছ থেকে।

'এর পরের ঘটনা একটুখানি। খুব তাড়াতাড়িই সেটা ঘটলো। ভোর পাঁচটা নাগাদ আবার শুরু হলো দারুণ কাঁপুনি। সারা শরীরে ভীষণ একটা ধ্বস্তা-ধ্বস্তিভাব। হঠাৎ ফাঁক হয়ে গেল তার ঠোঁট দুটো। আর বন্যার মতন ধমকে ধমকে মুখ দিয়ে চলকে পড়লো রক্তস্রোত। আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তারপরই গলায় একটা ঘড়ঘড়ানি শব্দ হলো। বুঝতে পারলাম সব শেষ হয়ে গেল। হাঁ করা মুখটা বন্ধ করে দিলাম। খোলা চোখ দুটো বুজিয়ে দিলাম। তার-পর পাশে বসে মৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা করলাম।'

ঘণ্টাখানেক সময়ও পেরোয় নি। হঠাৎ দরজায় দারুণ ধাক্কাধাক্কির শব্দ হলো। ঘরের মধ্যে হাসারির মৃতদেহের পাশে কোভালস্কী আর মানিক স্থির হয়ে বসে আছে। মৃতদেহের গায়ের ওপর একটা সাদা চাদর বিছানো। মাথার কাছে গাঁদা ফুলের মালা। মানিক গিয়ে দরজা খুললো। বাইরে তখনও আবছা অন্ধকার। মানিক কেবল ঠাহর করতে পারলো দুজন কালো মানুষ চৌকাঠের ওপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি চাই?'

মানিকের দিকে চেয়ে বয়স্ক লোকটা বলো, 'আমরা ডোম।' চুক্তি মত মড়াটা লিতে এয়েচি!'

একাত্তর

গির্জার ঘণ্টার আওয়াজের দিকে আঙুল উঁচিয়ে কোভালস্কী বললো, 'আমার ভাই-বোনেরা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ওই শোনো!'

বলতে বলতে চোখ বুজে আত্মস্থ হয়ে গেল কোভালস্কী। ধোঁয়ায় ছাওয়া আকাশের খিলান থেকে জলস্রোতের মতন গড়িয়ে আসছে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। লেডি অফ দ্য লভিং হার্ট গির্জার আলোকোজ্জ্বল চূড়া থেকে ঘোষিত হলো সেই অমোঘ বাণী, 'খ্রীষ্ট, আমাদের পরিত্রাতা খ্রীষ্ট ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন।'

ক্রিস্‌ম্যাস্‌ ঈভের মধ্যরাত তখন।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে মহানগরীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তেও একই ঐকতানসুরে অনুরণিত হচ্ছিল, 'খ্রীষ্ট জন্মালেন!' কলকাতায় খ্রীশ্চানরা সংখ্যালঘু হলেও খ্রীষ্টের জন্মোৎসবটি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, মহাবীর বা পয়গম্বর মহম্মদের অনুরূপ মহামানবদের জন্মোৎসবের মতনই নিষ্ঠা এবং আনন্দের সঙ্গে পালিত হয়। এদেশে যে কুড়িটি ধর্মোৎসব সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ধার্য হয়ে আছে, তার মধ্যে বড়দিনও একটি। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের মিলনের মধ্যে এদেশের মানুষের এই ভবগদ্ভক্তির অভিব্যক্তি এক বিরল বৈশিষ্ট্য যেন।

অন্ধকারে আলোকোজ্জ্বল গির্জাটি অভিষেক উৎসবের সময় কোন মহারাজার প্রাসাদভবনের মতন ঝলমল করছিল। গির্জার মাঠে ভোজনপাত্রের একটি প্রতিরূপ তৈরি করে মডেলের সাহায্যে বেথ্‌লেহেমের আস্তাবলের মধ্যে খড়ের শয্যায় খ্রীষ্টের জন্ম দেখানো হচ্ছে। গির্জার মাঠের কয়েক গজ দূরেই ফুটপাতের ওপর সেই কনকনে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় তখন হিহি করে কাঁপছিল হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ। রঙচঙা জামাপ্যান্ট পরে অনেক মানুষ গির্জায় এসেছে। মেয়েরা পরেছে ঝলমলে শাড়ি। বাচ্চাদের সাজপোশাক দেখে মনে হয় ওরা যেন রাজার ছেলে। গির্জার ভেতরটায় গিজগিজ করছে সুবেশ মানুষেরা। গির্জার বেদীটি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। গায়কদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাটাও ফুলের তোড়া দিয়ে সাজানো। সুন্দর এই গোলাপ এবং গাঁদা ফুলগুলি এনেছে আনন্দ নগরের একজন খ্রীশ্চান মহিলা। অলৌকিকভাবে তার স্বামী রোগমুক্ত হওয়ায় কৃতজ্ঞ মেয়েটি এই ফুলগুলি নিয়ে এসেছে। গির্জার থামগুলিও মালা এবং পাতায় ঢেকে বিজয় তোরণ করা হয়েছে। গির্জার দেওয়ালে অসংখ্য ফলকের গায়ে শোভা পাচ্ছে গত দুশ' বছরে এখানে সমাধিস্থ হওয়া সব ইংরেজ নারী এবং পুরুষের নামধাম বৃত্তান্ত।

হঠাৎ পটকাবাজির আওয়াজে উৎসবের রাত কেঁপে উঠলো। বেজে উঠলো অরগ্যানের গম্ভীর সুর। অরগ্যানের বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভক্তেরা তখন শিশু ভগবানের আবাহন সঙ্গীত গাইছে। এমন সময় গির্জার মধ্যে ঢুকলো রেকটর আল্‌বের্তো কার্দিয়েরো। তার পরনে লম্বা ঢিলা সাদা জোব্বা। জোব্বার গায়ে লাল সিল্কের পটি। এই পবিত্র পোশাকে কার্দিয়েরোকে খুবই অভিজাত দেখাচ্ছিল। রেক্টরকে পরিবেষ্টন করে আছে নিম্ন পদাধিকারী যাজকগণ এবং 'কয়ার' গায়করা। এদের নিয়ে যথাযথ শিষ্টাচারসম্মত ভাবে রেক্টর এগিয়ে গেল সুসজ্জিত বেদিকার দিকে। এই মধ্যরাত্রির ম্যাস্‌ (Mass) উৎসবে যোগ দিতে আজ ম্যাক্স লোয়েবও এসেছে। জীবনে এই প্রথমবার এমন এক নৈশ উপাসনায় যোগ দিল সে। তার অবাক লাগছিল এই আড়ম্বর দেখে। যেখানে দারিদ্র্য এত নিষ্ঠুর সেখানে এই আড়ম্বর চোখে বড় দৃষ্টিকটু লাগে। ম্যাক্স অবশ্য জানতো না যে এই সমারোহ-পূর্ণ 'ম্যাস' উৎসবের যাজ্ঞিক আলবের্তোই একদিন কোভালস্কীকে আনন্দ নগরে যেতে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল। সে চেষ্টা করেছিল কোভালস্কী যেন গরিবের সঙ্গে বাস না করে। তার ধারণা এতে চার্চের মান-সম্মান খেলো হয়ে যাবে। ওদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্রীতদাস হয়ে যাবে বিদেশী পুরোহিত।

শুধু এখানেই নয়, সারা কলকাতাতেই তখন ধুমধামের সঙ্গে ধর্ম-উপাসনা শুরু হয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের পরিচ্ছন্ন সেন্ট টমাস গির্জার সামনে তখন দলে দলে

খ্রীশ্চান ভক্তের ভিড়। ট্যাক্সি, রিক্সা এবং প্রাইভেট গাড়ি চড়ে তারা উপাসনায় যোগ দিতে আসছে। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের রাস্তাগুলো আলোর মালায় সেজে ঝলমল করছে। ক্রিস্‌ম্যাস্‌ 'ক্যারল' সংগীতের সুরে অনুরণিত হচ্ছে কলকাতার রাতের আকাশ। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছেলেরা বস্তির কারখানায় তৈরি ছোট ছোট সান্টা ক্লজ আর বড়দিনের গাছ বিক্রি করছে। রাস্তার সব দোকানগুলি খোলা। শোকেসের মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে নানা স্বাদের মদের বোতল, খাদ্যসামগ্রী, ফলমূল এবং বিশেষ রকমের মিষ্টান্ন। বড়লোক বাড়ির ধনী গিন্নীরা চাকর সংগে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছে। খাবার-দাবার কিনে বাড়ি ফিরে তারা মধ্যরাত্রির ভোজ-নোৎসব পালন করবে। ফ্লুরি নামে সুবিখ্যাত কেক পেস্ট্রির দোকানে পা ফেলার জায়গা নেই। পরিবারের সবাইকে নিয়ে দোকানের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষ। জায়গা নেই অন্য রেস্টোর‍্যান্টেও। এক জায়গায় ঠাঁই না পেলে অন্য ভোজনাগারে ছুটে যাচ্ছে মানুষ। পীটার ক্যাট, তন্দুর, মুলাঁ র‍ুজ্‌—সর্বত্রই ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রব। পার্ক হোটেল এবং গ্র্যান্ড হোটেলেও অনুরূপ অবস্থা। গ্র্যান্ড হোটেলে দুজন মানুষের রাত্রের খানা ও পিনার খরচ তিনশ' টাকা। দিন কয়েক আগে হাসারি পাল নামে কলকাতার একজন রিক্সাওলা প্রায় এই দামেই তার শরীরের হাড় ক'খানা বেচে দিয়েছিল।

আনন্দ নগরেও তখন মহোৎসাহে বড়দিনের উৎসব পালিত হচ্ছিল। বস্তির সব খ্রীশ্চান পরিবারেই আলোর মালা আর রঙিন পতাকা দিয়ে ঘর সাজানো হয়েছে। লাউডস্পিকার মারফত 'ক্যারল' সংগীত প্রচার হচ্ছে। সব খ্রীশ্চান পরিবারই নিজের নিজের ঘর যথাসাধ্য সাজিয়েছে। ঘরে আজ কোভালস্কী নেই। মার্গারেটা তার ঘর-খানা চুনকাম করিয়ে দিল। ঘরের মেঝেটা আলপনা দিয়ে চিত্রিত করে দিল। যীশুর ছবির নিচে ছোট্ট একটা প্রতীক ভোজনপাত্র রেখে, পবিত্র বাইবেলের সেই পাতাটি খুলে রাখলো, যেখানে যীশুর জন্মবৃত্তান্তটি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। পাশে রাখলো মোমবাতি এবং ধুপকাঠি। তারপর ফ্রেমের গায়ে গাঁদা এবং গোলাপের মালা ঝুলিয়ে চাঁদোয়ার আকার করে দিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঘরখানা একটি ছোট্ট ভজনালয়।

আনন্দ নগরের সব খ্রীশ্চানের কাছে কোভালস্কীর বস্তি ঘরের মাথার উপর বাঁশের আগায় ঝোলানো জ্বলজ্বলে বাতিটি এক সুন্দর প্রতীক তারকারূপে আদৃত হয়েছে আজকের এই রাতটিতে। এই সুন্দর কল্পনাটি এসেছে অজিত এবং সালাউদ্দিনের মাথা থেকে: বাঁশের আগায় বাতিটি ঝুলিয়ে প্রতীকতারকা তৈরির অভিনব কল্পনাটি ওদের। বস্তির হতাশ মানুষের কাছে ওরা যেন আশার বাণী পেঁৗছে দিতে চায়। ওরা যেন বলতে চায়, 'তোমরা ভয় পেও না। তোমরা একা নও। তোমাদের পাশে পরিত্রাতা এসে দাঁড়াবেন। আজ রাত্রে খ্রীশ্চানদের ঈশ্বরের জন্মগ্রহণের আগেই আমাদের মধ্যে পরিত্রাতা এসে গেছেন।'

ফাদার কার্দিয়েরোর সম্মতি নিয়েই সে রাত্রে কোভালস্কী যেন 'পরিত্রাতা'রূপেই বস্তির খ্রীশ্চান ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ালো। কনকনে শীতে মাথায়, ঘাড়ে একটা শাল জড়িয়ে নিয়েছে কোভালস্কী। মার্গারেটার ঘরের সামনের জমিতে জনা পঞ্চাশ খ্রীশ্চান ভক্ত এসেছে। ওদের সবার কাছে খ্রীষ্টের নৈশ ভোজনের স্মরণ উৎসবের কথা বলবে সে। এখানে দাঁড়িয়ে এই বস্তিতে তার প্রথম 'ম্যাস্‌' উৎসবের কথা মনে পড়লো তার। সেদিনও ঠিক এই জায়গাতে কাঠের এই তক্তার ওপরেই 'ম্যাস্‌'

উপাসনার অনুষ্ঠান করেছিল। কত বছর আগের কথা তা? পাঁচ, ছয় না সাত? কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যৎ ছাড়া সময়কে কি মাপতে পারে কেউ? এই পৃথিবীতে বর্তমানকে সফল ভাবে টপকে যাওয়াই ত অনেকের জীবনের প্রধান সমস্যা? তাহলে? লাউড্‌স্পিকার থেকে ভেসে আসছে আনন্দগীতি। রাত্রির আকাশ ভরিয়ে দিয়েছে এই 'ক্যারল।' শুনতে শুনতে কোভালস্কীর মনে হলো এটা যেন বন্দী-শিবির নয়। এই আনন্দ নগর যথার্থই আনন্দ নগর, খ্রীষ্টীয় আশ্রম এটি। আগেও অনেকবার সে এইভাবে ভেবেছে। কিন্তু বড়দিনের এই উৎসব রাত্রে সেই প্রত্যয়টাই যেন দৃঢ় হয়ে গেঁথে গেল তার মনে। আজ সে জোর দিয়ে বলতে পারে যে, মানুষের ত্রাণ এবং মুক্তির জন্যে ঈশ্বর যখন মানবাকার নিয়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর মহান বাণী এইসব দুঃস্থ, নিপীড়িত মানুষের মধ্যেই যথার্থ মূর্ত হয়। কোভালস্কীর কাছে আনন্দ নগর এবং বেথ্‌লেহেম আলাদা নয়। দুই স্থানই পবিত্র তীর্থধাম। শুকনো রুটির টুকরাটি নৈবেদ্যস্বরূপ স্বর্গের উদ্দেশে নিবেদন করার আগে, কোভালস্কীর মনে হলো, এই মানুষগুলোকে কিছু বলা দরকার। তারপর সেই কামড় দেওয়া শীতের মধ্যে আবছা আলোয় বসে থাকা মানুষদের দিকে চেয়ে সে বললো, 'যে কোন মানুষই ধন-দৌলত চিনতে পারে। তার পুজো করতে পারে। কিন্তু কেবল একজন গরিব মানুষই দারিদ্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্য খুঁজে পায়। কারণ কেবল সে-ই জানে যে ঐশ্বর্য আছে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, সুখের মধ্যে নয়।'

কথাগুলো সবে বলেছে তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। প্রথমে একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠলো। তার পিছু পিছু এল গরম বাতাসের ঝলক। ফুলের মালা ছিঁড়লো, তারার মতন মিটমিট করা আলোগুলো নিভে গেল, ঘরের মাথা থেকে দু-একখানা টালি খসে পড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের বুক চিরে উঠলো ভয়ঙ্কর একটা ডাক। কোভালস্কী চিন্তিত। থমথম করছে আকাশ। আবার বর্ষা নামবে না কি? কিন্তু ঝড় থেমে গেল। বর্ষাও তখুনি নামলো না। কোভালস্কী আবার শুরু করলো বলতে, 'এই ধনে ধনী বলেই গরিবরা অত্যাচার আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। তাই যীশু যখন গরিবের ঘরে জন্মাতে চান, তখন তিনি চান মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথাটা জগতের সবাইকে গরিবরাই বলুক।

'আনন্দ নগরের ভাই-বোনেরা, সেই আশার শিখাটি তোমরাই ধরে রেখেছ। তোমাদের বড়ভাই তোমাদের কথা দিচ্ছে সেই দিন এল বলে, যখন বাঘ আর সাপের সঙ্গে মানুষের শিশু আর পাখিরাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমতে পারবে। সেদিন পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মানুষ হবে সকলের ভাই-বোন।'

কোভালস্কী ওদের কাছে মার্টিন লুথার কিং-এর কথা বললো। বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখতো লুথার কিং। কোভালস্কী বললো, একটু আগে যখন সে ওদের কাছে তার মনের কথা বলছিল, তখন মার্টিন লুথার কিং-এর একটা ধ্যানরত ছবি সে যেন দেখতে পেল। ছবির গায়ে কিং লিখেছে যখন সে ধ্যান করছিল, তখন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে। ভার্জিনিয়ার পাহাড়তলীতে এক মস্ত অন্নসত্র বসেছে। পংক্তিভোজে সবাই আসন নিয়ে তৃপ্তি করে খাচ্ছে। পাশাপাশি বসে খাচ্ছে ক্রীতদাসেরা আর তাদের মনিব। প্রেমের সেই অন্ন ভাগ করে খাচ্ছে তারা। আজ বিকেলে এখানে আসার আগে কোভালস্কীরও মনে হয়েছিল যে, লুথার কিং-এর স্বপ্নটা

অলীক নয়। সে নিশ্চিত যে এ স্বপ্ন সত্যি হবে। সেই দিনটি নিশ্চয়ই আসবে, যখন ধনী-নির্ধন, মূর্খ-জ্ঞানী, দাস-প্রভু, অত্যাচারী-পীড়িত, সবাই এক টেবিলে বসে সদাব্রতের অন্ন ভাগ করে গ্রহণ করবে। কথা ক'টা বলে শুকনো রুটির টুকরোটা আকাশের দিকে তুলে নিবেদন করলো কোভালস্কী।

ছাতের মাথায় আকাশটা তখন থমথম করছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠছে আকাশের বুক। কোভালস্কী সেই চকিত আলোয় দেখলো একটা অতিকায় কালো মেঘ ধেয়ে আসছে বিপুল বেগে। একটু পরেই অবিশ্রান্ত গোলা-বর্ষণের মতন মেঘের ডাক শুরু হলো। একটা দমকা বাতাস উঠলো। ক্ষুব্ধ বাতাস যেন শুষে নিতে চাইছে ওদের। তার পরেই মেঘের বুক চিরে জলস্রোতের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মানুষগুলো তখন বিপর্যস্ত। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সবাই। তুমুল কোলাহল উঠেছে তখন। সেই কোলাহল ছাপিয়ে কোভালস্কী শুনতে পেল অ্যারিস্টটল্ জন চীৎকার করছে, 'সাইক্লোন! সাইক্লোন!'

তখন শহরের আর একদিকে আলিপুরের এক সমৃদ্ধ আবাসিক অঞ্চলে এক বিরাট ভবনের মধ্যে একজন মাঝবয়সী পাঞ্জাবি শিখ খুব মনোযোগ দিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব শুনছিল। পাঞ্জাবি শিখের নাম টি. এস. রঞ্জিত সিং। রঞ্জিত সিং কলকাতার মানুষ নয়। তার বাড়ি পাঞ্জাবের অমৃতশর জেলায়। কলকাতায় এসেছে চাকরি সূত্রে। বলাবাহুল্য তার আগ্রহটা পুরোপুরি সরকারী। এটাই তার কাজ। আলিপুরের আবহাওয়া আফিসের সে একজন কর্মী। আজ এই ক্রিস্‌ম্যাস্ ঈভে সে নাইট ডিউটি দিচ্ছে। এই বিশাল ভবনটাকে ঘিরে রেখেছে প্রায় শতাধিক বছরের পুরনো ক'টা বট গাছ। এটাই কলকাতার আবহাওয়া আপিস। এই কেন্দ্রের অ্যান্‌টেনা-গুলিতে সঙ্কেতবার্তা পেঁাছে দেয় সমুদ্রতীরে অবস্থিত বিভিন্ন আবহাওয়া কেন্দ্রগুলি। এই সংকেতবার্তা আসে বঙ্গোপসাগর, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এমন কি সুদূর রেঙ্গুনের কেন্দ্র থেকেও। সঙ্কেতবার্তা গ্রহণ করা ছাড়াও এই আবহাওয়া আফিসের পরীক্ষাগারে উপমহাদেশ এবং চারপাশের সমুদ্রের আলোকচিত্র তোলা হয় দিনে দুবার। আবহমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ নোয়া ৭ (NOAA 7) এবং সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ মেটীয়র (Meteor) থেকে এই ছবি তোলা হয়। এই উপমহাদেশের পশ্চিমতটে অবস্থিত আরব সাগর এবং পূর্ব তটের বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত অঞ্চলটাই হলো কুটিল হিংস্র সামুদ্রিক ঝড়ের (hurricanes) উৎপত্তিস্থল, আবহাওয়াবিদগণ যার নামকরণ করেছেন সাইক্লোন। সমুদ্রতল এবং উচ্চমালভূমির মধ্যে বায়ুমণ্ডলীর চাপ এবং তাপমাত্রার বিভিন্নতার দরুন প্রায়ই নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে ঘূর্ণিবার্ত্যার সৃষ্টি হয় তার অন্তর্নিহিত শক্তি একাধিক মেগাটোন-ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও বেশী। এই সব ঘূর্ণিঝড়ই উপমহাদেশের সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলোতে ক্ষ্যাপা দৈত্যের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। এর ধ্বংসলীলায় প্রতিবছরই হাজার হাজার মানুষ মরে। তাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। কখনও বা ইংল্যাণ্ডের মতন একটা বিরাট অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়ে মাসের পর মাস জলের তলায় ডুবে থাকে। ভারতবর্ষের স্মৃতিতে এই বীভৎস তাণ্ডব দুঃস্বপ্নের মতন সারা বছর ধরেই অম্লান হয়ে জেগে থাকে।

তবে সে রাত্রে অমন ভয় পাবার কারণ রঞ্জিত সিং দেখে নি। সবরকম নিম্নচাপ থেকেই যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ওঠে তা নয়। বিশেষতঃ শীতের মরসুমে এমন নিম্ন-

চাপ অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া, আজই সকাল সাতটা নাগাদ মার্কিন উপগ্রহ (NOAA 7) যে ছবিটা পাঠিয়েছে সেটাও খুব নিরীহ। অন্তত সে ছবি দেখে আশ্বস্ত হওয়া যায়। ছবিতে যদিও কিউমিউলাস্ (Cumulus) মেঘের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে, তাহলেও সেটা তেমন ভয়াবহ নয়। সেই বিরাট মেঘপুঞ্জ কলকাতা থেকে অন্তত আটশ' মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ক্রমশ তা উত্তর-পূর্ব দিকে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের দিকে সরে যাচ্ছে। টেলিপ্রিন্টার যোগে বিভিন্ন সমুদ্রতীরের আবহাওয়া স্টেশন থেকে শেষ যে বার্তাটা পেয়েছে সেটা এসেছে বড়জোর একঘণ্টা আগে। সে বার্তায় যদিও সমস্ত অঞ্চল জুড়ে নিম্নচাপের লক্ষণ ধরা পড়েছে, তাহলেও সেটা খুবই হাল্কা। ঘণ্টায় বাতাসের গতিবেগ তিরিশ মাইলেরও কম। অতএব রঞ্জিত সিং-এর ভয় পাবার কোন কারণই নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই সে টিফিন বাক্স খুলে বসলো। যতটা সম্ভব স্ফূর্তি করে ক্রিস্‌মাস্ ঈভ পালন করবে সে। বউয়ের নিজের হাতে রান্না করা খাবার-দাবারগুলো বার করলো সে। মধ্যরাতের ভোজনটি নেহাত মন্দ হবে না। মাছের কালিয়ায় সাদা পনিরের টুকরো ভাসছে, একটা নিরামিষ সব্‌জি আর নান্‌রুটি। ছোট একটা রাম্-এর বোতলও বের করলো সে। সম্প্রতি সরকারী কাজে সিকিমে গিয়েছিল রঞ্জিত। বোতলটা সেখান থেকেই কেনা। বাইরে তখন ঝড়ের মাতন শুরু হয়ে গেছে। সার্সীতে ধাক্কা লেগে থরথর করে কাঁপছে সেগুলো। কিন্তু রঞ্জিতের ভ্রূক্ষেপ নেই। এক গ্লাস পানীয় তৃপ্তি করে খেয়ে সে খাবার নিয়ে বসলো। খাওয়া শেষ করে আর এক গ্লাস পানীয় খেল। তারপর পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলে টেলিপ্রিন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। না, কোন বার্তা নেই। অতএব বিবেক তার শুদ্ধ। সুতরাং নিঃশঙ্ক মনে সে নিজের সীটে গিয়ে বসলো। 'যাক, আরও একটা দিন নিশ্চিন্তে কাটানো গেল!' মনে মনে কথা ক'টা বলতে বলতেই দু চোখ বুজে এল তার।

প্রায় দুটো নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রঞ্জিত। খটাখট শব্দ হচ্ছে। অর্থাৎ টেলিপ্রিন্টার চলছে। হুড়মুড় করে বার্তাবাহী যন্ত্রটার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো বার্তা আসছে বিশাখাপত্তম স্টেশন থেকে। মাদ্রাজের উত্তরে যে ঘূর্ণিঝড় ঘনীভূত হয়েছে, তার গতিবেগ ঘণ্টায় একশ' কুড়ি নট্ (Knot), অর্থাৎ ঘণ্টায় একশ' তিরিশ মাইলের কিছু বেশী। খানিকক্ষণ পরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও সমর্থনসূচক একই সঙ্কেত এল। অর্থাৎ আগের দিনের মৃদু নিম্নচাপটাই ভয়ঙ্কর সাইক্লোনের চেহারা নিয়েছে। তার মানে মেঘবাহন ইন্দ্রের বজ্ররোষ এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে বঙ্গোপসাগরের বুকে। সাগর উত্তাল হবে। মথিত হবে সাগরগর্ভ।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে ইন্দোনেসীয়ার একটা মালবাহী জাহাজ থেকে সাহায্যের আবেদন এল। ঝড়ের মুখে পড়ে ত্রাহিত্রাহি অবস্থা হয়েছে জাহাজটার। তাই এস্. ও. এস্ পাঠিয়েছে। এ সঙ্কেতটাও অর্থবহ। বুঝিয়ে দিল যে বিপদ আসন্ন। ঝড়ের অবস্থান উত্তরে ১৭°২৫′ লঘিমা আর পূর্বে ৯১°১০′ দ্রাঘিমা। এই-স্থান থেকেই বোঝা যায় যে সাইক্লোনটি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রকূল থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এবং দিক পরিবর্তন করে কলকাতার দিকে ধেয়ে আসছে।

রঞ্জিত সিং আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। তখনই ওপরওলা চীফ ইঞ্জিনীয়ার এইচ. পি. গুপ্তকে টেলিফোনে খবরটা জানালো। এই বাড়িরই আর

একদিকে গুপ্ত সাহেবের কোয়ার্টার। সেখানেই সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিল সে। খবর পেয়েই সে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। এরপর খবর দিল কলকাতার আকাশ-বাণী ভবনে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় বেতার দপ্তরেও বার্তা পাঠাল রঞ্জিত। সবশেষে খবর দিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ক্যাবিনেট অফিসে যাতে ব-দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী-দের আসন্ন ভীতিকর এই সাইক্লোন ঝড় সম্বন্ধে আগেভাগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়। এগুলো করে রঞ্জিত তার টেবিলের পিছনের ব্র্যাকেটের ওপর রাখা (Console) রেডিওটেলিফোনটি তুললো। এই যন্ত্রটি মারফত সরাসরি হেডকোয়ার্টার্সের সর্বোচ্চ ভবনটির মাথায় অবস্থিত অতি আধুনিক রাডার যন্ত্রটির যোগাযোগ করা যায়। ফাইবারগ্লাসের গোল ছাতের মাথায় রাডারের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন য়্যাণ্টে-নার সাহায্যে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ঝড়ের সংকেতটি যে শুধু নির্ভুলভাবে পায় তা নয়। অন্তত চারশতাধিক মাইল দূরের ঝড়ের অবস্থান, তার আয়তন, পরিসর, গতিবেগ, তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু (eye), বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্যগুলোও সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু খ্রীশ্চানদের সেই উৎসবরাত্রে অতি আধুনিক এই রাডার যন্ত্রটি চালু ছিল না। তাছাড়া আকাশনীল রঙের যে ঘরের মধ্যে গত দশ বছরের সাইক্লোন বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের আলোকচিত্রগুলো সুন্দরভাবে টাঙানো আছে, সে ঘরটাও তালাবন্ধ ছিল। ফলে পরদিন, অর্থাৎ বড়দিনের সকাল সাতটার আগে পর্যন্ত রাডার চালু হলো না, তথ্যগুলিও লিপিবদ্ধ হলো না।

বাহাত্তর

আনন্দ নগরে ছ'বছর নির্বাসনে কাটিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসা আশিস সে রাত্তিরে ভয়ে, আতঙ্কে ঘুমোতেই পারলো না। শুধু একা সে নয় বউ ছেলেমেয়ে সবাই। সারারাত ধরে ঝড়জল হয়েছে সমানে। আর ওরাও সবাই মিলে ঝড়জলের তাণ্ডব থেকে তার কুঁড়েটি বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কুঁড়েখানি তখন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। হরভঙ্গ গ্রামের বেশীরভাগ মানুষই আশিসের মতন কুঁড়েঘরে থাকে। প্রায় সবাই বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু। গ্রামের অধিকাংশ জমিই অনুর্বর। এই বন্ধ্যা জমিতেই কায়ক্লেশে চাষবাস করে তারা জীবিকা চালায়। বোধহয় পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র অঞ্চল হলো এই বিস্তীর্ণ জলাভূমি অঞ্চল। সবটাই নাবাল জমি। প্রায়ই সমুদ্রের নোনা জলে ডুবে থাকে। কোথাও কোন পাকা সড়ক নেই। কোথাও পৌঁছতে হলে নদী-নালা বাঁক পেরিয়ে যেতে হয়। প্রতি বছরেই বন্যাপ্লাবনে ঘেরা থাকে এই বিশাল অঞ্চল। ফলে মানুষজনের কাছে প্রায় অগম্য অঞ্চলটা অজন্মাই থেকে গেছে। মানুষ যেমন এখানে আসতে চায় না, এরাও চায় না মানুষকে। এই বিস্তীর্ণ নাবাল অঞ্চলটিতে প্রায় বিশ লাখ চাষী থাকে। কিন্তু সম্বৎসর ধানের যা ফলন হয় তাতে ওদের পেট ভরে না। যাদের এক ছটাক জমিও নেই তাদের জীবনযাপন আরও কঠিন। পরিবার ছেলেমেয়েদের মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দিতে জেলেরা প্রাণ সংশয় করেও দুর্গম জায়গায় পড়ে থাকে। কিন্তু মাছ শিকারের যথেষ্ট সরঞ্জাম না থাকায় শিকার করাও দুরূহ হয় তাদের কাছে। যারা ক্ষেতখামারে দিনমজুরী করে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ধান রোয়া আর ফসল কাটার সময় ছাড়া তাদের হাতে কাজ থাকে না। ফলে বছরের ছ'-

মাস প্রায় অভুক্ত থাকে তারা। তখন সুন্দরবনের গভীর গহন অঞ্চলে ঢুকে তারা চুরি করে গাছ কাটে, মধু সংগ্রহ করে। অনেকেই বাঘের পেটে যায় নয়ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলটি মাপে প্রায় ইংল্যাণ্ডের সমান। কিন্তু আমাজনের মতন দুর্ভেদ্য এই বনাঞ্চল শ্বাপদসঙ্কুল। মানুষখেকো বাঘ আছে, বিষধর সাপ আছে, হিংস্র কুমীর আছে। ফলে প্রতি বছরেই 'তিন চারশ' নিরীহ মানুষ এদের হাতে প্রাণ হারায়।

আনন্দ নগর থেকে ফেরার সময় তার আর্থিক অবস্থার উন্নতির একটি নিদর্শন সঙ্গে করে এনেছিল আশিস। একটি ট্র্যানজিস্‌টর্ রেডিও। সেদিন ঠিক ছ'টার সময় আশিস তার ট্র্যানজিস্‌টর্‌টা চাল করে দিল। আবহাওয়ার গোলমালের দরুন বেতারযন্ত্রটি ঠিক মতন কাজ করছিল না। কিন্তু বিঘ্ন সত্ত্বেও নির্দয়ভাবে বেতার-যন্ত্রটা থেকে বারংবার একটা ঘোষণাই হয়ে যাচ্ছিল তখন। কানের কাছে যন্ত্রটাকে ধরে ঘোষণাটা শুনতে পেল আশিস। ঘোষণা শুনেই মনস্থির করে ফেললো আশিস। এখনই ঘর-সংসার ফেলে তাকে চলে যেতে হবে। সুতরাং ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে সেই ঝড়জলের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো ওরা। পিছনে পড়ে রইলো যত্ন করে সাজানো সংসারটা। কত সাধ করে শান্তা তার সংসারখানা সাজিয়েছিল। ঘুচে গেল সেই সাধ-আহ্লাদ। বস্তির সেই অভিশপ্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওদের। কত অভাব আর বঞ্চনার জীবন : তার মধ্যেই সব সুখ বিসর্জন দিয়ে একটা একটা করে পয়সা জমিয়েছে। তারপর গ্রামে এল। নিজের ঘর-সংসার পেল শান্তা। একটু একটু করে সাজিয়ে তুললো সুখের ঘরকন্না। ঘর হলো, বাগান হলো, পুকুর হলো, জমিজিরেত হলো। এখন তার দুটো বলদ আছে, একটা দুধেলা গাই আছে। ধানের মরাই আছে। বীজ রাখার ঘর করেছে তারা। ঘরে সম্বৎসর কৃষিসার মজুত থাকে। হায়! আজ সব গেল। হু হু করে কেঁদে ফেললো শান্তা। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে আশিসেরও। কিন্তু কী সান্ত্বনা সে দিতে পারে? তবুও শান্তাকে সান্ত্বনা দিল আশিস। 'কেঁদ না বউ! আবার ফিরে আসবো আমরা!' কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে বিধাতাপুরুষ বোধহয় হাসলেন। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস উঠেছে তখন। স্তম্ভিত আশিস দেখলো ওদের ঘরখানার নড়া ধরে ঘূর্ণিবাতাস যেন পাখির খাঁচার মতন সেটাকে ধরে দূরে ফেলে দিল। বৃষ্টির জল আর চোখের জলে মাখামাখি হয়ে গেল শান্তার চোখ দুটো।

হঠাৎ হাল্কা সবুজ স্ক্রীনের গায়ে যেন সাদা রঙের একটা শামুকের ছবি ভেসে উঠলো। শামুকটির মধ্যস্থলে যেন একটি কালো ছিদ্র বিন্ধ হয়ে আছে। তার-পরেই স্ক্রীনের বাঁদিকে মাথার কাছে গোলাপী হরফে ডিজিট্যাল ক্রনোমীটার ঘড়ির নির্ভুল সময় ঘোষিত হলো। সকাল সাতটা বেজে ছত্রিশ মিনিট। ঠিক এখনই কলকাতার র‍্যাডার যন্ত্রে এই দুর্বৃত্ত ঘূর্ণিঝড় ধরা পড়েছে। ঝড়ের সঠিক অবস্থান উত্তরে ১৯° লঘিমা এবং পূর্বে ৮৯°৪৫' দ্রাঘিমা। অর্থাৎ তিনশ' পাঁচ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই দৈত্যাকার ঝড়। ঝড়ের লক্ষ্যস্থলের পরিসর প্রায় বাইশ মাইল। এই মুহূর্তে সমুদ্রতীরবর্তী সবক'টি আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে যে সঙ্কেতবার্তা এসেছে তা থেকেও বোঝা যায় যে ভয়াবহ এই ঘূর্ণিঝড় বাইশ মাইল জায়গা নিয়ে শুরু করেছে তার মারণক্রিয়া। সাধারণভাবে একে বড়সড় ঘূর্ণিঝড় বলা গেলেও আবহাওয়াবিদদের সাংকেতিক পরিভাষায় এর নাম 'সাইক্লোন ঝড়।' ততক্ষণে আধ ঘণ্টা পরপর দফাওয়ারি সঙ্কেতবার্তা আসতে শুরু করেছে। সাইক্লোনের 'আই'

বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে স্ক্রীনের গায়ে। মধ্যের এই কালো ছিদ্রটিই সাইক্লোনের 'আই'। ক্রমশ কালো ছিদ্রটি কেন্দ্র করে দুধের মতন সাদা বৃত্ত সৃষ্টি হলো এবং সাদা আবরণের আড়ালে লুকিয়ে গেল। স্ক্রীনের গায়ে ফুটে ওঠা ছবিটা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, ঘূর্ণিঝড় ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে এবং কয়েক লক্ষ টন জলবিন্দু ধারণ করে রেখেছে এর স্ফীত উদরে।

রাডার টেক্‌নিশিয়ান হরিশ খান্না আজই কলকাতার আবহাওয়া অফিসে যোগ দিয়েছে। ছোটখাট রোগা চেহারার হরিশ বেশ চটপটে। স্ক্রীনের গায়ে ভেসে ওঠা ঝড়ের ছবি দেখেই সে রেডিওটেলিফোন যোগে আবহাওয়া কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়ে খবরটা পেঁছে দিল। এর আগে সে বোম্বাই আবহাওয়া কেন্দ্রে রাডার টেক্‌নিশিয়ান রূপে কাজ করেছে। বোম্বাইও সাইক্লোন অধ্যুষিত অঞ্চল। সুতরাং ঝড়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তার যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। এর আগে কখনও ঝড়ের 'আই' এমনভাবে সাদা আবরণে ঢেকে যেতে সে দেখেনি। অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি-পাতের সম্ভাবনা আছে এই সঙ্কেত-চিত্রে। সুতরাং মন্তব্যসহ খবরটা পাঠানোর পর, তার নিজের পুরনো ছাতাটা নিয়ে সে এই উঁচু বাড়ির ছাতে উঠলো। ছাত থেকে সারা শহরটাকে যেন দুহাতের আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা যায়। বৃষ্টির ছাটে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তবুও মাথার ওপরে পুরনো ছাতাটা ধরে হরিশ খান্না কলকাতার একটা সামগ্রিক রূপরেখা ধরবার চেষ্টা করছিল। ওই তো হাওড়া ব্রিজের ইস্পাতের জাফরির কাজ! ওর ঠিক পিছনেই আনন্দ নগর বস্তিবাড়ির ছাত, বাঁ-দিকে গোলাপী রঙের জমকালো স্টেশন-ভবনটি। মধ্যিখান দিয়ে বয়ে চলেছে গেরুয়া রঙের গঙ্গার জল। এপারে বিস্তীর্ণ সবুজ ময়দান, লাল ইঁটের তৈরি লম্বা রাইটার্স বিল্ডিংস। তারপরেই শুরু হয়ে গেল গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু উঁচু বাড়িগুলো। বড়দিনের ছুটির সকালে মহানগরী কলকাতা তখন সবে চোখ খুলেছে। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত ঘনঘন বিপদবার্তা শুনেই মহা-নগরীর ঘুম ভাঙলো সেদিন।

তবে ভরসার কথা, দুর্বৃত্ত এই ঝড়টা তখনও অনেক দূরে, সমুদ্রের মধ্যিখানে স্থির হয়ে অবস্থান করছিল। কাল রাত থেকে শহর কলকাতার বুকের ওপর ঝড় এবং বৃষ্টির যে নির্মম কষাঘাত চলছে, শহর কলকাতার এটা আগাম পাওনা মাত্র। আসন্ন দুর্যোগের অগ্রগামী দূত।

যা স্বাভাবিক তার উল্টো কাজ করেই ছাব্বিশ বছরের যোয়ান ধীবর সুভাষ নস্কর তার প্রাণটা বাঁচিয়ে ফেললো। প্রায় নিজের অজান্তেই অদ্ভুত এই বিপরীত কাজটা করে ফেললো সে। গ্রামটাকে ডুবিয়ে দিতে তখন বিপুল বেগে জলস্রোত ধেয়ে আসছে। আশ্রয় নেবার কোন চেষ্টাই করলো না সুভাষ। পাঁচিলের মতন উঁচু হয়ে আসা জলস্রোতের মধ্যে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। সমুদ্রের জল আর বৃষ্টির জল মিলে তখন কলকল শব্দে সমস্ত গ্রামটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই খরস্রোতের মধ্যে তার নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দিল সুভাষ। তখন স্রোতের টানে প্রায় ছ' মাইল দূরে চলে এসেছে। তার চারপাশে থৈ থৈ করছে জল। কে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। শুধু একাই সে একটা ভাঙা দেউলের কপাট ধরে ঝুলে রইল। বেলা তখন প্রায় দশটা। তখুনি এই ঘূর্ণিঝড়টা ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ওপর থেকে ডাঙার ওপর আছড়ে পড়েছে।

সারা অঞ্চলটা জুড়ে তখন কুম্ভীপাকের দৃশ্য। প্রকৃতির দারুণ রোষে বিপর্যস্ত

হয়ে গেছে ধরণী। যেমন ঝড়ের বেগ, যেমন কুটিল, নিষ্ঠুর জলের খলখল হাসি, তেমনি যেন লক্ষ ফণা তোলা লকলকে আগুনের শিখা। ব্যাপারটা ঘটলো চোখের পলকে। হঠাৎ চোখ ঝলসান একটা বজ্রপাত হলো। মস্ত একটা আগুনের গোলা আকাশের বুক থেকে ছিটকে মাটির দিকে সবেগে ধেয়ে এল। মেঘের বুকে ঘন হয়ে জমে থাকা দামিনী দৃপ্ত তেজে ঝাঁপিয়ে পড়লো দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর মাথায়। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গাছ। প্রায় একশ' কুড়ি মাইল জায়গা নিয়ে শুরু হলো সেই অগ্নিকাণ্ড। বাতাসের টানে সমুদ্রতীরের অগভীর জলরাশি থেকে একটা স্তম্ভ উঠে ঘুরতে ঘুরতে জলের পাঁচিলটাকে ঠেলা মেরে তখন এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জলের স্রোতে আর বাতাসের ঠেলায় বাড়িঘর ডুবলো, কুঁড়ে ভাঙলো, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ধসে পড়লো গাছ। থেঁতলে, পিষে চৌরস করে দিল ভূপৃষ্ঠ। মাছধরা জেলে-নৌকোগুলোর ঝুঁটি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল কয়েক মাইল দূরে। বাস এবং ট্রেনের বগীগুলো ধরে খড়ের আঁটির মতন ছুঁড়ে দিল যেন। কয়েক লক্ষ মানুষ আর গবাদিপশু ভেসে গেল জলের তোড়ে। সমুদ্রের নোনা জলে ডুবে গেল হাজার হাজার মাইল কৃষি জমি। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোয়েতেমালার মতন একটা অঞ্চল সাগর এবং বৃষ্টির জলে প্লাবিত হলো এবং তিরিশ লক্ষ অধিবাসীর অস্তিত্ব মুছে গেল মানচিত্র থেকে।

একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছবার আগেই আশিসরা ধরা পড়ে গেল বন্যার কবলে। তবে কোনরকমে একটা উঁচু টিলার কাছাকাছি এসে পড়ায় সে যাত্রা বেঁচে গেল ওরা। টিলার মাথায় ছোট্ট একটা মসজিদ। ক্রুদ্ধ জলস্রোতকে কোনরকমে এড়িয়ে ওরা এখানে এসে পৌঁছেছে। মসজিদের মধ্যে হাজার হাজার পলাতক মানুষ এসে আগেই আশ্রয় নিয়েছে। কোনরকমে বউ আর ছেলেমেয়েদের টানতে টানতে মসজিদের কাছে নিয়ে এল আশিস। কিন্তু এ স্থানও নিরাপদ নয়। পায়ের তলায় হুহু করে জল বাড়ছে। যেন রাগে ফুঁসছে জলস্রোত। কোনরকমে জানলার একটা ধাপির ওপর সবাইকে টেনেটুনে তুলে নিল আশিস। তারপর সেইরকম ঝুলন্ত অবস্থায় একদিন, এক রাত কাটালো। পায়ের তলা দিয়ে দুরন্ত তুরঙ্গের মতন বন্যার জল বয়ে চলেছে। মাথার ওপর অঝোর ধারাপাত। দ্বিতীয় দিনের সকালে আশিস গুণে দেখলো আশ্রয় পাওয়া মানুষের সংখ্যা কমে কমে কুড়িজনে এসে ঠেকেছে। রাতের অন্ধকারে কে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে! এক সময় দেখলো যে জলে ভেসে যাওয়া একটা গাছের গুঁড়িকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দুটি প্রাণ ভেসে চলেছে অনির্দেশ্য লক্ষ্যের দিকে। হঠাৎ কি হয়ে গেল। মস্ত একটা জলের প্রবাহ এসে ওদের তলিয়ে দিল কোথায়।

আতঙ্ক চললো ঠিক দশ ঘণ্টা ধরে। এই দশটি ঘণ্টায় প্রকৃতির চণ্ড রোষ মানুষকে যেন খেলনার মতন তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে। তাকে দলেছে, পিষেছে, ছুঁড়ে দিয়েছে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে। দশ ঘণ্টা পরে ঝড়ের রোষ কমলো। তার নিষ্ঠুর রক্তবর্ণ চোখ শ্রান্ত হয়েছে তখন। তাই দৃষ্টি ঘুরিয়ে সে আবার ফিরে গেল সমুদ্রের দিকে। এই ঘটনার ঠিক দু-দিন পরে পরিবারবর্গ নিয়ে আশিস আর প্রথম দফার পলাতকরা ছোট্ট ক্যানিং শহরে এসে পৌঁছলো। ওদের দেখে তখন মনে হচ্ছে না যে ওরা মানুষ। কয়েকটা হতশ্রী চেহারার জীব, খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছলো ক্যানিংয়ে। দুর্বল মানুষগুলো একজন আর একজনকে ধরে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটছে টলতে টলতে, ঘুমন্ত মানুষের

মতন। মাইলের পর মাইল ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেছে ওরা। খানা-ডোবা পেরিয়ে, মড়ার গায়ে হোঁচট খেতে খেতে ওরা এতটা পথ আসছে। আর একটুও শক্তি নেই মানুষগুলোর। তাই দাতব্য ডাক্তারখানার দোরগোড়ায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। যে নার্স মেয়েটি এই ডাক্তারখানা চালাচ্ছে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল মানুষগুলোর দুরবস্থা দেখে। একের পর এক আসছে ওই অবক্ষয়ী মানুষের মিছিল। কালো আকাশের পটভূমিতে এই প্রায়-মৃত মানুষের মিছিল দেখতে দেখতে দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে এল। এতদূর থেকেও মানুষগুলোর দৈন্যাবস্থা দেখতে পাচ্ছে সে। কারও মাথায় হাঁড়ি-বাসনের পোঁটলা। কারও কোলে বাচ্চা। যে হাঁটতে পারছে না তাকে ধরে ধরে টেনে আনছে। ওদের সামনে পৃথিবী যেন আর কোন আশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ওরা এতটা পথ এসেছে মৃত্যু দেখতে দেখতে। হয়ত চোখের সামনে মা, বাবা, ভাই, বোনকে ভেসে যেতে দেখেছে। জলের টানে তলিয়ে যেতে দেখেছে প্রাণাধিক প্রিয় ছেলেমেয়েদের। তাসের বাড়ির মতন ভেঙে পড়তে দেখেছে ঘর-সংসার। তবুও এসেছে। কারণ ওরা এখনও মরে নি। তাই বাঁচতে চায়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কলকাতা যেন বেহুঁশ। মানুষের এতবড় সর্বনাশের আঁচটুকুও তার গায়ে লাগে নি। এই দুটো-তিনটে দিন শহরের মানুষ যেন জানতেই পারে নি সমুদ্রের ধারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কি ভয়াবহ কাণ্ড হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে টেলিফোনের লাইন কাটা, বেতারযন্ত্র নীরব, পথঘাট জলে ডোবা। রাস্তায় বাস নেই, ট্রেন চলছে না। শহর যেন বিচ্ছিন্ন একটা সত্তা। অবশ্য কর্তৃপক্ষও মনেপ্রাণে চাইছিল না শহরের হুঁশ ফিরুক। অভিযোগ ত একটুখানি নয়! দূরদৃষ্টির অভাব যেমন আছে, তেমনি উপেক্ষা তাচ্ছিল্যের নালিশও আছে। দুর্নাম, নিন্দের ভয়ে তাই ওরা চাইছিল আরও ক'টা দিন এমনি নিঃশব্দ থাকতে। সুতরাং সরকারী প্রচার মাধ্যম থেকে যেদিন প্রথম বার্তা ঘোষণা করা হলো সেদিন মানুষের এই সর্বনাশের ছবিটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে। তাই বেশ হাঁকডাক করেই বলা হলো যে এটা সাধারণ ঝড়। শুধু তাই নয়, দাবি করা হলো যে ভারতের সমুদ্রতীরে এমন ঝড় প্রতিবছরই হয়। সুতরাং আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। তবে কর্তৃপক্ষ সতর্কও হলো। সত্য যাতে জানাজানি না হয়, তাই সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চলটা পুলিস এবং সীমান্ত রক্ষী দিয়ে ঘিরে রাখলো।

ফলে উপদ্রুত অঞ্চল থেকে শহরের বুকে চুঁইয়ে পড়া পলাতকদের প্রথম দলটার বিপন্ন চেহারা দেখেই চমকে উঠলো শহর। খবরের কাগজওলারাই মাতামাতি করলো বেশী। সত্য ত জানাজানি হলোই, সংবাদপত্রও তীক্ষ্ণ হলো সমালোচনায়। ক্ষয়ক্ষতির যে ছবিটা তারা আঁকলো তা নির্মম। মৃতের সংখ্যা বললো দশ-বিশ হাজার। ভেসে যাওয়া গবাদি পশুর সংখ্যা বললো পঞ্চাশ হাজার। ধসে যাওয়া ঘরবাড়ির সংখ্যা দুলক্ষ। সমুদ্রের নোনা জলে পতিত হয়ে যাওয়া আবাদি জমির পরিমাণ দশলক্ষ একর ইত্যাদি। এছাড়াও আছে। প্রায় পনেরশ' মাইল লম্বা বাঁধ ভূমিসাৎ হয়েছে, তিন-চার হাজার নলকূপ খারাপ হয়ে গেছে এবং প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ হয় অনাহারে নয়ত বা শীতের কামড়ে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে রয়েছে। সবচেয়ে বেদনার ব্যাপার হলো যে এই অসহায় জলবন্দী মানুষগুলোর কাছে তখন পর্যন্ত কোন সংগঠিত ত্রাণ ব্যবস্থাই পৌঁছয় নি।

পৃথিবীর সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই ত্রাণব্যবস্থা নিয়ে রাজনীতি হয়। দল-

উপদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষগুলোর হতাশা আর দারিদ্র্য এত তীব্র আর ব্যাপক ছিল যে সাহায্যের প্রয়োজনটা অনেক বেশী বোধ করছিল সবাই। তবুও দিল্লি আর কলকাতার কর্তৃপক্ষদের পুরো তিনদিন সময় লাগলো একমত হয়ে ত্রাণ এবং উদ্ধারের কাজটা হাতে নিতে। এরই মধ্যে স্বার্থসন্ধানী কিছু মানুষ বন্যার্তদের দারিদ্র্য আর অসহায়তার সুযোগটা পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিল। বিভিন্ন মিশন এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীদের মতন গেরুয়া পোশাক পরে এইসব স্বার্থান্বেষী লোকগুলো ত্রাতার ছদ্মবেশ নিয়ে পীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গেরুয়া পরলেও এরা কপট সন্ন্যাসী। ভণ্ড, প্রতারক। মানুষের হিতৈষী নয়। বন্যা প্লাবনের খবর পেয়েই দিল্লী, বোম্বাই থেকে এরা ছুটে গেল বন্যাবিধ্বস্ত দক্ষিণবঙ্গে। গেরুয়া পোশাকের জন্যে পুলিস এদের আটকে দিল না। একে গেরুয়া বসন, তায় নগ্নপদ সন্ন্যাসী। সুতরাং অনাথ আতুরের বড় আপনজন এরা। এদের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীও আছে। জোড়ায় জোড়ায় আর্ত মানুষের মধ্যে মিশে সেবার কাজ শুরু করে দিল এরা। এত সেবা আর প্রেম বিফল হবার নয়। দগ্ধ হৃদয়গুলি কৃতার্থ হয়ে গেল প্রেমের এই ছোঁয়া পেয়ে। বাচ্চাদের সেবাই ওদের প্রধান কাজ যেন। আকস্মিক বিপর্যয়ে অনেক শিশুই বাপ-মা হারিয়েছে। ফলে বাপ-মায়ের মতন স্নেহ পেয়ে ছেলেমেয়েরা ধন্য হয়ে গেল। একজন মাঝবয়েসী বিধবা ত এদের আন্তরিক সেবায় অভিভূত হয়ে গেল। তার কথাতেই বোঝা গেল এই সাধুরা যেন প্রেমের অবতার। ওরাই এসে পরামর্শ দিল, ওদের হাতে বিধবার একমাত্র মেয়েটিকে তুলে দিতে। 'মা! তোমার মেয়েটিকে আমাদের হাতে দাও। আমরাই ওকে মানুষ করবো। দেখবো, শুনবো। তোমার কোন দায়িত্ব থাকবে না। একটু বড় হলে ওর একটা কাজ জুটিয়েও দেব। তারপর দু-তিন মাস পরে যখন তোমার কাছে ও আসবে তখন মাইনে বাবদ চার-পাঁচশ' টাকাও পাঠিয়ে দেব ওর হাতে। এখন এই নাও একশ' টাকা, তোমার পেটখোরাকি।' ওদের কথা শুনে বিধবা মেয়েটি সেদিন এত স্বস্তি পেল যে সটান পায়ের ওপর শুয়ে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর মেয়েকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। মেয়ের সঙ্গে সেটাই তার শেষবার সাক্ষাৎ। সন্ন্যাসীর পোশাক পরা লোকগুলো আর ফিরে আসে নি। বিধবাও মেয়ে ফেরত পায় নি। সে জানতো না যে এরা কেউ সন্ন্যাসী নয়। এরা ভেকধারী। মেয়ে বেচাকেনার দালাল এরা।

তবে শহরের সব মানুষ ভণ্ড, প্রতারক নয়। অন্তত সাধারণ শহরবাসীর মানসিকতাটিতে কোন তঞ্চকতা যে নেই ম্যাক্স তার অনেক প্রমাণ পেয়েছিল। মানুষের এই বিপর্যয়ে তার পাশে দাঁড়াবার সে কি আকুল সাধ! সারা শহরে যেন এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বিশেষ করে গরিব বস্তিতে এই উৎসাহটা যেন সবচেয়ে বেশী। এখানে ওখানে ধর্না দিল তারা। গেল বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে। দরজায় দরজায় ভিক্ষের ঝুলি পেতে দাঁড়ালো। মন্দির, মসজিদ, চার্চ, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ক্লাব, শিক্ষায়তন, যে যা দিচ্ছে তাই নিচ্ছে তারা। কাপড়-চোপড়, চাল, ডাল, মোমবাতি, ঘুটে, কয়লা, দেশলাইকাঠির বাক্স, তেল, চিনি—যে যা দিল তাই জড়ো করলো ঝুলিতে। মানুষের সেবার জন্যে যে দেশ এমনভাবে একমন একপ্রাণ হতে পারে, জগতের কাছে সে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। গরিব লোকে যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দান করছে। বিদেশী ম্যাক্সের কাছে ব্যাপারটা যেন অভিনব মনে হচ্ছিল। জনসেবার প্রেরণা নিয়ে উদ্বুদ্ধ হলো কত নাম-না-জানা প্রতিষ্ঠান। মোটর সাইকেল,

ট্যাক্সি, লরি এমন কি ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে শহরে এসে পড়া আর্তদের কাছে সাহায্য পেঁৗছে দিল তারা। সেবার কাজে আর কোন বাধাবাধি রইলো না। সবাই এক হয়ে যেন এক বহুবর্ণ নকশা তৈরি করেছে। কেউ মিশন থেকে এসেছে, কেউ ধর্মস্থান থেকে, কেউ আফিস-কাছারি থেকে, কেউ ক্লাব থেকে, কেউ ইউনিয়ন থেকে, কেউ রাজনৈতিক দল থেকে। সবারই এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য। আনন্দ নগর বস্তি থেকেও সেবাদল তৈরি হলো। মিউচুয়্যাল এইড্ কমিটির তরফ থেকে কোভালস্কীর নেতৃত্বে বেশ বড়সড় একটা ত্রাণদল তৈরি হলো। মার্গারেটা, ম্যাক্স, বন্দনা, সালিউদ্দিন, য়্যারিস্টট্ল্ জন ছাড়াও আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবী এল এই দলে। মানবসেবার কাজে সবাই উদ্বুদ্ধ। এমন কি বোবা গোগুাও দলের সঙ্গে যেতে চায়। সেও সেবা করতে চাইছে। একটা পুরো লরি ভাড়া করে ওরা দক্ষিণ-বঙ্গে যাবে। সঙ্গে নিল ওষুধ, গুঁড়ো দুধ, চাল, কম্বল, আর তাঁবু। দুটো ফোলানো ভেলা আর শক্তিশালী মোটরযন্ত্রও যোগাড় হয়ে গেল। বস্তির মাফিয়া-কর্তা আর ম্যাক্সের বাবা আর্থার পাঠিয়েছে এই দুটো অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। সাজ-সরঞ্জাম জুটলেও লরি নিয়ে বেরোতে এক সপ্তাহ দেরি হয়ে গেল ওদের। যে দরকারী কাগজটির অভাবে ওরা যাত্রা স্থগিত রেখেছে, তার নাম রোড্ পারমিট। একটা পুরো হপ্তা এ-আপিসে ও-আপিসে চু দিয়ে বেড়ালো ম্যাক্স আর কোভালস্কী। কিন্তু পাত্তা পেল না কোথাও। উপরন্তু এই মূল্যবান দলিলটি যাতে এই দু-জন বিদেশী সাহেবের হস্তগত না হয়, তার জন্যেও তদ্বির-তদারক হলো। কোভালস্কী দেখলো এই প্রথমবার বিদেশী সাহেব বলে ওরা তেমন খ্যাতির সম্মান পেল না। বরং লোকগুলো যেন এই সাহেব দুজনের মধ্যে সিয়া (CIA) নামক এক জুজুর অস্তিত্ব সর্বক্ষণই টের পাচ্ছিল। শেষমেশ নিরাশ হয়ে একটা মধুর মিথ্যের আশ্রয় নিল কোভালস্কী। যে বাবুটি পারমিটের কাগজ সই করে, তার কাছে গিয়ে কোভালস্কী বললো, 'আমরা কিন্তু মাদার টেরেসার সঙ্গে কাজ করছি!' ব্যস! এতেই যেন ম্যাজিকের মতন কাজ হলো। মাদার টেরেসার নামমাহাত্ম্য আছে। নাম শুনেই শ্রদ্ধা-ভক্তিতে যেন নুয়ে পড়লো বাবুটি। তারপর ভক্তিতে গদগদ হয়ে বললো, 'মাদার টেরেসার সঙ্গে কাজ করছেন? সে কথা ত বলবেন আগে? জানেন, ওঁকে আমরা কত ভক্তি করি?'

কোভালস্কী অবলীলায় ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলো। বাবুটি ততক্ষণে পারমিটের কাগজ রেডি করে ফেলেছে। সই করে মোহর দিয়ে কাগজখানা কোভালস্কীর হাতে দিল বাবুটি। তারপর বললো, 'তাহলে আর দেরি করবেন না। লরি নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়ুন।' একটু থেমে বাবুটি ফের গদগদ স্বরে বললো, 'মাদার টেরেসা! কত মহান মানুষ উনি। দেবীর মতন ওঁকে আমরা দেখি। আমি হিন্দু হলেও সব পুণ্যাত্মাদেরই আমরা ভক্তি করি।

দ্বীপে যাওয়া যেন নরকে পেঁৗছানো। মাত্র দশ মাইল রাস্তা। কিন্তু দুর্গম এইটুকু পথ! বস্তুতপক্ষে, পথ বলতে কিছু নেই। কাদা আর পাঁকের মধ্যে ডুবে গেছে সারাটা রাস্তা। থৈ থৈ করছে জল। ভাঙা জাহাজের মতন এখানে ওখানে পড়ে আছে লরিগুলো। জায়গাটা দেখাচ্ছে নৌ সমাধির মতন। মাথায় লাল পাগড়ি পরা ড্রাইভারের কালসিটে পড়া মুখখানা বীভৎস দেখাচ্ছে। স্কি প্রতিযোগীর মতন জলের বুকের ওপর দিয়ে লরিটা এঁকে বেঁকে নিয়ে চলেছে সে। দরদর করে ঘামছে আর আপনমনে গালাগালি করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চলছে

হোঁচট খেতে খেতে। বনেট সমান উঁচু জলের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে পায়ে পায়ে পিছলে যাচ্ছে লরির চাকা। আরও কিছুটা যেতেই বেঁচে থাকা প্রথম দলটা দেখতে পেল ম্যাক্স। এক-আধজন নয়। কয়েক হাজার মানুষ বুকজলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মাথার ওপরে বাচ্চারা। কেউ কেউ উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে, কখন ত্রাণ আসবে। কি ভয়াবহ অবস্থা ওই মানুষগুলোর! পরে সীলভিয়াকে জানাবার সময় ম্যাক্স লিখলো, 'অমন দুরবস্থা সবার! ছ'-সাতদিন ধরে ওরা হাঁ করে বসে আছে। খিদে তেষ্টায় হাঁকপাঁক করছে। ত্রাণের গাড়ি দেখেই ওরা তাই জলের ওপর দিয়ে খলবল করতে করতে গাড়ির দিকে ছুটে এল। কি অবর্ণনীয় দুরবস্থা ওদের! কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়লো, কেউ পিছলে গেল। প্রায় জনাকুড়ি লোক ততক্ষণে লরি ধরে ওপরে উঠে পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল যে ওরা কাড়াকাড়ি শুরু করে দেবে এবার। কোভালস্কী আর সালাউদ্দিন চিৎকার করে ওদের বলতে লাগলো যে আমরা সবাই ডাক্তার। আমাদের সঙ্গে কোন খাবার-দাবার নেই। আছে শুধু ওষুধ। শেষ পর্যন্ত গাড়িটা ওরা ছেড়েই দিল। আরও কিছুটা যাবার পর আর এক দল আর্তলোক আমাদের গাড়িটা ছেঁকে ধরলো। ভাগ্যক্রমে ওদের মধ্যে কোভালস্কীর একজন চেনা মানুষ ছিল। আনন্দ নগরের একটা ছোট্ট রেস্টোর‍্যাণ্টে প্রায়ই খেতে যেত সে। কোভালস্কীও মাঝে মাঝে সেখানে যেত। লোকটা একজন জঙ্গি কমিউনিস্ট। পার্টির তরফ থেকে এইসব উদ্বাস্তুদের গড়েপিঠে নিতে ওকে এখানে পাঠিয়েছে। লোকটাও কোভালস্কীকে চিনতে পারে। তাই এ যাত্রাতেও অলৌকিকভাবে আমরা রেহাই পেয়ে গেলাম। কিন্তু গাড়ি যেন তখন আর চলতে চাইছিল না। য়্যারিস্টট্‌ল্‌ জন আর সালাউদ্দিন জলে নেমে গাড়িটিকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু বেশীক্ষণ ওদের রাস্তা দেখাতে হলো না। আর একটু চলবার পর বার দুই হিক্কা তুললো, দু-একবার কাশলো, তারপর চিরকালের মতন থেমে গেল গাড়ির হৃদয়। ইঞ্জিনের মধ্যে জল ঢুকে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গাড়ি।

'লরিটা মাঝ রাস্তায় থেমে যেতে আমরা ভেলা দুটো জলে ভাসালাম। ভেলার মধ্যে খাবার-দাবার ওষুধপত্র ভর্তি করে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ততক্ষণে রাত হয়েছে। কোথাও একটুকরো আলো নেই। উঃ! সে কি ভয়াবহ অন্ধকার। মাইলের পর মাইল ঘুটঘুট করছে। কিন্তু অসংখ্য জোনাকির ঝিকমিকে আলোয় সমস্ত পরিবেশটা ন্যাড়াগাছ, ধসে পড়া কুঁড়ে আর ধুলোকাঁকর ভরা ঝোপঝাড়ে কেমন যেন ভুতুড়ে লাগছিল। এখানে ওখানে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে পড়ে আছে। ইতিমধ্যে নৌকায় যেতে যেতে অনেক মানুষ সেই তারে শক্‌ খেয়ে মরে গেছে। হঠাৎ অনেক মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম। সেই সঙ্গে ঢোলের আওয়াজ। একটা উঁচু গ্রামের ভাঙা ঘরবাড়ির মধ্যে আশ্রয় নেওয়া বেশ কয়েকশ' মুসলমান গ্রামবাসী অন্ধকারে উৎসুক হয়ে সাহায্যের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওরা আঁচ করতে পেরেছে যে আমরা সাহায্য নিয়ে এসেছি। তাই চিৎকার করে আমাদের বিজয়ীর সম্বর্ধনা দিল। ওদের এই সম্বর্ধনার ঘটা আমি জীবনে ভুলবো না। আমার সারা গা তখন শিউরে উঠেছিল উত্তেজনায়। সামান্য এক গ্রাস খাবার জুটবে এই আশ্বাসেই মানুষগুলো যেন নতুন করে বেঁচে উঠলো। কিন্তু আমরা কি এনেছি তা ওরা তখনই জানতে চাইল না। মোল্লারা খাতির করে আমাদের নিয়ে একটা ছোট্ট মসজিদে গেল আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া জানাতে। এসব

তোমারই দয়া, তাই ত আল্লাহ্‌ এতসব পাঠিয়েছেন।'

সে রাত্রে ম্যাক্স একটা আশ্চর্য করুণ ছবি দেখে যেন চমকে উঠলো। ওদের ঘিরে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে নাচছে, গান গাইছে। ক'টা দিন অভুক্ত থাকার পর ওরা আজ প্রথম দুটি খেতে পাবে, তাই এত খুশী। কিন্তু কিরকম ধামার মতন বড় ওদের পেটগুলো! একবার তাকিয়েই ম্যাক্স বুঝলো যে ওদের পেটগুলো খালি। কিন্তু কিলবিল করছে কৃমি। কৃমিতে ফুলে উঠেছে ওদের উদর। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অথচ ওদের ছোট্ট শরীরের আধখানা জুড়েই শুধু পেট। ম্যাক্সের মতন কোভালস্কীও তাকিয়ে ছিল আর একটা ছবির দিকে। ছেঁড়া কাপড় পরা চিরদুঃখী মা কোলের মধ্যে কাঠির মতন শুকনো বাচ্চা নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। মায়ের চোখে নালিশ নেই, হাহুতাশ নেই। পাষাণমূর্তির মতন স্থির। যেন বিশ্ব-সংসারের দারিদ্র্য আত্মস্থ করেছে ওই নারী। তাই সময়কে ছাড়িয়ে অনন্তকালের দুঃখকে বরণ করেছে ছেলে কোলে নিয়ে ওই পাথর প্রতিমা, বাংলার চিরদুঃখী মা। কোভালস্কীর মনে হলো যেন দুঃসময়ের প্রতীক দেখলো ওই চিরদুঃখী মায়ের মধ্যে।

হায় কোভালস্কী! তুমি ভেবেছিলে মানুষের সব দুঃখ তুমি দেখেছ। সকলের ব্যথার ভার নিতে পেরেছ! ওদের ব্যথা বুঝেছ। কিন্তু না। ধূর্ত জগৎ তোমায় ঠকিয়েছে। অসহায় নিরীহ মানুষের সব কষ্টটুকুর স্বাদ তুমি এখনও পাও নি। এ রহস্য জানতে তোমায় আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। চোখ চেয়ে দেখ! এই দুঃখসাগরে মানুষ কত অসহায়! কিন্তু নিরীহ গরিব মানুষের এত ব্যথা কেন? হে প্রেমের ঠাকুর! কেন তুমি মুখ ফিরিয়ে আছ? কেন তোমার বিচার নিরপেক্ষ নয়? যারা বঞ্চিত, জন্মাবধি যারা কিছুই পায় নি, কেন তাদের প্রতি তুমি ক্ষমাহীন, নিষ্ঠুর? কেন? কেন? দীপের আলো, ফুলের মালা আর ধূপের ধোঁয়ার সুরভির মধ্যে মন্দিরের দেবতা কি পারেন ওই অসংখ্য অসহায় মৃত মানুষের পচা গন্ধটা মুছে দিতে?

যথার্থই তখন মড়ার পচা গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মরছে কুকুর বেড়ালের মতন। কিন্তু এত মড়ার গতি কি করে হবে? কর্তৃপক্ষ দাক্ষিণ্য দেখিয়ে কিছু ডোম পাঠিয়েছিল। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই ডোমগুলো পালিয়ে গেছে। এই শবাস্থিশালায় হিন্দু-মুসলমান মড়া চিনে তারা কি করে আলাদা করবে? কাকে পোড়াবে আর কাকেই বা গোর দেবে? অথচ চেনাটা নির্ভুল হওয়া দরকার। যাহক, ডোমেরা চলে যাবার পর জেলখানা থেকে অপরাধীদের পাঠানো হলো মড়ার গতি করতে। কিন্তু দু-একদিন কাজ করার পর তাদের উৎসাহও তেমন রইল না। শেষ পর্যন্ত সেনাবিভাগ থেকে সৈন্য পাঠানো হলো। তারা বিশেষ আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে নির্বিচারে মৃতদেহ পুড়িয়ে দিতে লাগলো। অচিরেই সারা দ্বীপভূমিটা তখন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডু হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে মড়া পুড়ছে। মনে হচ্ছিল পোড়া মড়ার দুর্গন্ধ বুঝি শহর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

যারা বেঁচে রইলো এখন শুধু তাদেরই সেবা ও চিকিৎসা দরকার। কিন্তু সে কাজটা একটুখানি নয়। কোভালস্কী তার দলবল নিয়ে প্রায় মাসখানেক ওই গ্রাম-টাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক মাইল জুড়ে চিকিৎসা চালাল। অনেক মানুষের চিকিৎসা করলো ম্যাক্স। কম্‌প্রেস্‌ড্‌ এয়ার ডার্মো-জেট (Compressed-air

Dermo-jet) দ্বারা প্রায় পনেরো হাজার অসুস্থ মানুষকে টিকা দিল, প্রায় কুড়ি হাজার বাচ্চার কৃমির চিকিৎসা করলো এবং পাঁচিশ হাজার বিপন্ন মানুষের মধ্যে খাবার-দাবার বিলি করাল। হয়ত প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্য খুবই সামান্য। সাগরে এক ফোঁটা জলবিন্দু ফেলার মতন। কিন্তু মাদার টেরেসা বলেন, এক ফোঁটাই সই! তবু একটা ফোঁটাও ত পড়লো! নইলে সেটুকুও পড়তো না। মাসখানেক পরে যেদিন ওরা আনন্দ নগরে ফিরবে, সেদিন সকালে এই সহৃদয় উপকারী মানুষ-গুলোর সম্মানে গ্রামের লোকেরা একটা উৎসবের ব্যবস্থা করলো। বন্যা প্লাবনে ওদেব ঘর-সংসার ভেসে গেছে, নোনা জল ঢুকে জমি-জিরেত নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নাচ-গান করেই ওদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাল ওরা। কোভালস্কী এমন অভি-ভূত কখনও হয় নি। তার মনে হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। তিনি বলেছিলেন, দুঃখ বড়, কিন্তু দুঃখকে জয় করতে পারে বলে মানুষ আরও বড়। উৎসব যখন শেষ হয়ে আসছে তখন ছেঁড়া কানি পরা একজন বাচ্চা মেয়ে মাথায় শিশিরধোয়া একটা পদ্মফুল পরে কোভালস্কীকে একটা উপহার দিল। গ্রামের সব মানুষের তরফ থেকে অভিনব উপহার এনেছে মেয়েটি। শামুকের খোলা দিয়ে তৈরি ছোট্ট ক্রুশচিহ্নের সঙ্গে যীশুর ছবি আঁটা। ছবির তলায় একটা কাগজের গায়ে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে যীশুর বাণী লেখা আছে। বড় বড় হরফে লেখা সেই বাণী চেঁচিয়ে পড়ার সময় কোভালস্কীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে যেন খ্রীষ্টের উপদেশ তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছে।

'ভাইগণ! তোমাদের মঙ্গল হক। তোমরা যখন আমাদের কাছে এসেছ, তখন আমরা সর্বস্ব হারিয়েছি। তখন আমাদের বুক থেকে আশার আলো নিভে গেছে। তোমরা ক্ষুধিতকে অন্ন দিলে, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিলে, রুগ্নকে সেব পরিচর্যা দিলে। তোমাদের ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমাদের জন্যেই আমরা আবার বাঁচার স্বাদ ফিরে পেয়েছি।

'হে আমাদের ভাইগণ, এখন থেকে তোমরাই আমাদের মনের মানুষ হলে। তোমরা চলে যাচ্ছ। তাই আমাদের মন ব্যথায় ভরে উঠেছে। আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে বলি, যেন তিনি তোমাদের মঙ্গল করেন। তোমাদের দীর্ঘজীবন দান করেন। ইতি।

তোমাদের বন্যার্ত ভাইগণ'

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। দুর্যোগ আর নেই। দুঃসময় কেটে গেছে। সেদিন সকালে আনন্দ নগর বস্তিতে সত্যিই যেন আনন্দের হাট বসেছে। সবাই হাসছে, গাইছে, আনন্দ করছে, বাজি ফাটাচ্ছে। পটকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ম্যাক্সের। ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। কি ব্যাপার? আজ কি কোন পুজোর উৎসব? এত ধুম কেন? কিন্তু তেমন ত কিছু আগে শোনে নি? সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। চা মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। ম্যাক্স যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ দেখলো নাচতে নাচতে বন্দনা আসছে। ফুলের মালায় তার দু-হাত জোড়া। আসামী মেয়েটার সারা শরীর দিয়ে আহ্লাদ যেন ফুটে বেরোচ্ছে। ছোট ছোট দুই চেরা চোখে খুশী নাচছে। ভারি অবাক লাগছে ম্যাক্সের। কী এমন হলো যার জন্যে এত খুশী? তার কেবলই মনে হচ্ছিল, 'পোড় খাওয়া এই মানুষগুলো যেন কিছুতেই ভেঙে পড়ে না। কী দুর্বার জীবনীশক্তি এদের! দুঃখের চাবুক খেয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কিন্তু আশা ছাড়ে নি। ভাগ্যের অভিশাপকে জয় করতে প্রাণপণে লড়াই

করে চলেছে। এই অপ্রতিরোধ্য তেজ নিয়েই এরা জন্মায়। তাই কোন আঘাতেই এরা মরে না।'

ততক্ষণে বন্দনা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ম্যাক্সের দিকে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'ম্যাক্সভাই শুনেছ?'

ম্যাক্সকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে, এক পাক নেচে উঠলো বন্দনা।

'সে কি? শোন নি? আমরাও যে রাশিয়া, চীন, ইংরেজের মতন শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠলাম! আর কিসের ভয়! হাতে হাতে খড়্গ ধরে এবার আমরাও এগিয়ে যাব।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?' বললো ম্যাক্স।

'জমিতে ফসল ফলবে, গাছে ফুল ধরবে, ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে। আমরা পেট পুরে খেতে পাব, পরনের কাপড় পাব, প্রাণভরে নাচতে পারবো। আর কেউ গরিব থাকবে না। সেই আকাশ-চাওয়া স্বপ্ন আজ সার্থক করলেন আমাদের দেবী দুর্গা।'

'দেবী দুর্গা?'

'আমাদের জননী ইন্দিরা গান্ধী! একটু আগে রেডিও মারফত উনি দেশের মানুষকে জানিয়ে দিলেন।' একটু চুপ করে বন্দনা ফের বললো, 'আজ সকালে আমরা যে আনবিক বোমা ফাটালাম, ম্যাক্সভাই! শোন নি তুমি?'

সমাপ্ত

এই কাহিনীতে আনন্দ নগরের বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার কথা যা লেখা হয়েছে, তার কিছুই আজ আর নেই। সেই অবস্থার অনেক বদল হয়েছে ইতিমধ্যে। বস্তি-বাসীর জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। একজন ফরাসী যুবতী শিক্ষিকা একদিন আনন্দ নগর বস্তি দেখতে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে ছাত্রীদের কাছে তার দেখা বস্তির কথা এত আবেগের সঙ্গে তিনি বলেন যে, ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় একটা সমিতি গড়ে তুললো তাদের শিক্ষিকাকে নিয়ে। এই সমিতির সভ্যেরা বস্তির মিউচুয়্যাল এইড্ কমিটির কাছে বছর বছর সাহায্য পাঠাতে লাগলো। সমিতি শুরু হয় তিনশ'জন সভ্য নিয়ে। তারপর ফরাসী লাভী (Lavie) পত্রিকায় একটা লেখা বেরনোর পর সভ্য সংখ্যা প্রায় দশগুণ বেড়ে যায়। একবছর পরে ওই পত্রিকায় দ্বিতীয় লেখাটি বেরোল। তখন সভ্য সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। এখন সমিতির প্রায় সাত হাজার সভ্যের দানের টাকায় বস্তির মধ্যে চিকিৎসা এবং সমাজ-সেবার একটা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। সহৃদয় একজন বাঙালী ডাক্তার সেন এই মিউচুয়্যাল এইড্ কমিটির প্রেসিডেন্ট। এই বাঙালী ডাক্তার সেনের এক সগৌরব অতীত ঐতিহ্য আছে। গত তিরিশ বছর ধরে নিরলসভাবে ইনি বিনামূল্যে গরিবের চিকিৎসা করে চলেছেন। পরবর্তীকালে আরও দুজন ভারতপ্রেমিক ফরাসী যুবক এখানে এসে বস্তিবাসীর সঙ্গে থেকেছে। তারা এসেছিল দলটাকে সাহস দিতে, প্রেরণা দিয়ে চাঙ্গা করতে। ইওরোপ থেকে আসা সাহায্যের টাকা নিয়ে বস্তির মানুষরা নিজেরাই নানারকম সংগঠন করলো। দাতব্য চিকিৎসালয়, অপুষ্ট রিকেটি বাচ্চাদের সেবার জন্যে হোম্, মাতৃসদন, অসহায় এবং গরিব বৃদ্ধা-দের বিনামূল্যে আহার দেবার জন্যে সুপ কিচেন, যুবকদের হাতের কাজে প্রশিক্ষণ

দেবার জন্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি। তাছাড়া বস্তির মধ্যে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের প্রচার হতে লাগলো খুব বলিষ্ঠভাবে। সময়ে যাতে রোগ নির্ণয় করা যায়, তার জন্যে টিকা দেবার ব্যবস্থা করাও এই কর্মসূচির অন্তর্গত হলো। ক্রমে এইসব কাজগুলো আনন্দ নগরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো। গ্রামীণ বিকাশের কর্মসূচির মধ্যে জলসেচন কাজটা ঢোকানো হলো। গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হলো। অনেক অনগ্রসর এবং দরিদ্র অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে দাতব্য হাসপাতালও তৈরি করে দেওয়া হলো। এই বিরাট কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছে বস্তির মানুষরাই মিউচুয়্যাল এইড্ কমিটির কর্তৃত্বাধীনে। কোভালস্কীর ঘরেই কোন এক সন্ধ্যায় যার গোড়াপত্তন হয়েছিল। আসলে বন্দনা, মার্গারেটা, সালাউদ্দিন, ষ্ট্যারিস্টটল্ জন এবং অজিতরাই এর প্রধান প্রেরণা। ওদের সঙ্গে আছে প্রায় আড়াইশ ভারতীয় সেবা কর্মী। আর আছে স্থানীয় কিছু ডাক্তার, নার্স এবং কিছু বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী। এরা সবাই মিলে মানবসেবার এই মহান উদ্যোগের ঠাসবুননটি তখন সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে।

পাশাপাশি কর্মোদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পৌর প্রতিষ্ঠান। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অনুদান নিয়ে এক বিরাট বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হলো। উন্নয়নের আঁচ তখন আনন্দ নগরও পেয়েছে। সেই পুরনো চেহারা আর নেই। কাঁচা রাস্তা পাকা হলো। কোথাও রাস্তা উঁচু করা হলো। অনেক নতুন পাকা পায়খানা বানানো হলো, নলকূপ বসানো হলো, ইলেকট্রিক কেবল্ বাড়িয়ে আলো ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এই বদলের দরুন এমন ঘটনা ঘটলো, যা আগে ঘটে নি। এখন রিক্সা এবং ট্যাক্সি চেপে বস্তির অন্তঃপুরেও চলে যাওয়া যায়। ফলে অনেক মধ্যবিত্ত কর্মচারী, বা ছোট ব্যাপারিরাও বস্তির মধ্যে ঘর নিয়ে থাকতে চাইলো। হাওড়া রেলস্টেশনের অদূরেই এই বস্তির লোকালয়। স্টেশন এলাকা থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ। তাছাড়া কলকাতারও কত কাছে। তাই পনেরো-বিশ মাইল দূরে গিয়ে থাকার চেয়ে কাছাকাছি থাকতে চাইলো লোক। ঘরের চাহিদা বাড়ার দরুন ঘরের ভাড়াও বেড়েছে। বেড়েছে গয়নার বন্ধকী কারবারীর সংখ্যা। গত দুবছরে মহাজনদের সংখ্যা দশগুণ বেড়েছে। বস্তির অর্থনীতিতে একটা বড় বদলের ইঙ্গিত দেয় এই ঘটনাগুলো। বস্তির মধ্যে তিন-চারতলা উঁচু ইমারত উঠছে। সেখানে আসছে নতুন নতুন আবাসিক। যারা পুরনো এবং গরিব তারা অনেকেই আনন্দ নগর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

এই নতুন ব্যবস্থার প্রথম বলি হলো হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীরা। আনন্দ নগরে এরাই সবচেয়ে গরিব এবং অভাগা। এতদিন যে লোকের আশ্রয়ে তারা থাকতো, সেই খুঁটি আর নেই। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির গড্ ফাদারও বদলে গেছে। আনন্দ নগরে এখন নতুন দুঁদে মস্তান সর্দার এসেছে। তার কড়া হুকুমেই কুষ্ঠরোগীদের আনন্দ নগর ছেড়ে চলে যেতে হলো। জোর নেই বলে এরা প্রতিবাদও করলো না। প্রায় রোজই ছোট ছোট দলে তারা চলে গেল এতদিনের ঘর-সংসার ছেড়ে। অবশ্য পঙ্গু আনোয়ার আর তার বউ ছেলেমেয়ের জন্যে মাদার টেরেসার এক কুষ্ঠাশ্রমে একটু জায়গা করে দিতে পারলো কোভালস্কী। তবে কুষ্ঠরোগীরা বিতাড়িত হলেও আট হাজার গরু-মোষের খাটালটা মানুষের সঙ্গে দিব্যি থেকে গেল আনন্দ নগরে।

ঝড়ের ঠিক তিন হপ্তা পরে শান্তাদের নিয়ে আশিস আবার ফিরে এসেছে

ওদের ভাঙা গ্রামে। গ্রামের এবং ঘরদোরের চেহারা দেখে কান্না পেল তার। তবে হাল ছেড়ে দিল না। নতুন উৎসাহ নিয়ে অমানুষিক খেটে কয়েকদিনের মধ্যেই ভাঙা ঘরদোর গুছিয়ে ফেললো ওরা। বস্তিতে থাকার সময় দুঃখকে ভাগ করে নিতে শিখেছে আশিস আর শান্তা। জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয় ওদের এই অভিজ্ঞতা। তাই গ্রামে ফিরে হারিয়ে যাওয়া খেইটা ধরতে পারলো আশিস। শুধু গতর দিয়ে নয়, হৃদয় উজাড় করে গ্রামের সবাইকে নিয়ে সংস্কারের কাজে হাত দিল। পতিত জমি উদ্ধার করলো, ভূমি উন্নয়নের ব্যবস্থা করলো। সবাইকে তাদের কৃষিজীবী পেশায় ফিরিয়ে আনলো আশিস। শান্তাও চুপ করে বসে নেই। পুরুষরা যখন ক্ষেতে-খামারে কাজ করছে, তখন মেয়েদের স্বাবলম্বী করতে সবাইকে নিয়ে শান্তা হাতের কাজের শিল্পকেন্দ্র তৈরি করলো। সমবায় প্রথায় ভূমিউন্নয়ন আর কৃষিকাজের সূচনা করলো আশিস, যাতে তারা স্বনির্ভর হয়।

আশিসের গ্রামে ফিরে আসাটা গ্রামের মানুষকে যেন নতুন প্রেরণা দিয়েছে। শুধু গ্রামের মানুষ নয়, শহরের বস্তিবাসীরাও তখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। আশিসের দৃষ্টান্ত ওদের চোখ খুলে দিল। তাই বিরল হলেও কিছু কিছু বস্তিবাসী গ্রামে ফিরে যেতে শুরু করলো। ইদানীং গ্রামের পরিবেশেও নতুন নতুন কর্মসূচির পরিকল্পনা হচ্ছে এবং তাদের রূপায়ণ হচ্ছে। কাজকর্মের বহর দেখে গ্রামের মানুষ তাই নতুন আশায় বুক বাঁধলো। তারা মনে মনে স্থির করলো গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবে না। কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য জীবিকা নেবে না। বাঙালী কৃষক আগের চেয়ে আত্মসচেতন হতে চাইছিল। ঘরের দোরগোড়াতেই জীবনযাপনের দরকারি উপকরণ গুছিয়ে রাখতে চাইছিল তারা। এ চেষ্টা নিষ্ফল হলো না। সমবায় প্রথায় কৃষি আন্দোলনের কল্যাণে, এ রাজ্যের অর্ধেক জেলাতেই এখন বছরে দুটি করে ফসল তোলা হচ্ছে। কোথাও কোথাও তিনটিও। ফলে এ রাজ্যের হাজার হাজার ভূমিহীন চাষী সারা বছর ধরেই ক্ষেতমজুরের কাজ পাচ্ছে। এটা ওদের নিশ্চিন্ত জীবিকা। তাই এই নিশ্চিত জীবিকা ছেড়ে শহরের উচ্ছিষ্টান্নের খোঁজে তারা আর শহরে যেতে চাইল না। তাছাড়া, কলকাতাই এখন আর রুজি-রোজগারের একমাত্র কেন্দ্র নয়। পূর্বভারতের অন্য রাজ্য যেমন বিহার উড়িষ্যার অনেক জায়গাতেই বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ পরি-কাঠামো। ফলে যথেষ্ট কর্মোদ্যোগের সম্ভাবনা শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। তাই বিশ বছর আগেও কলকাতার যে টান ছিল, সে টান আর নেই। কল-কাতার টানে অন্য রাজ্যের মানুষ জীবিকার জন্যে এখন আর আগের মতন বন্যার মতন ছুটে আসছে না। কলকাতার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখতে হলে এই একমুখী গতি বেঁধে দিতে হবে। বস্তি এবং ফুটপাতের মানুষকে তাদের আপন ঘরে ফিরে যাবার পরিবেশ গড়ে দিতে হবে। কলকাতাকে চাপমুক্ত রাখার সেটিই হবে শুরুর কাজ।

ম্যাক্স লোয়েব ফিরে গেছে আমেরিকায়। সীলভিয়ার সঙ্গে তার বিয়েও হয়েছে। এখন সে বস্তি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ঘটা করে বলে। তার ধারণা, বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে ভারতবর্ষের কোন বস্তিতে থাকার মধ্যে যে দুঃসাহ-সিকতা আছে, তার সঙ্গে শুধু মহাকাশ অভিযানেরই তুলনা হয়। এখন সারা পৃথিবী থেকে দলে দলে যুবক-যুবতী ডাক্তাররা আনন্দ নগরে এসে থাকছে। এখানে এসে তারা মাসের পর মাস বস্তির মানুষের সঙ্গে কাটিয়ে যায়। ম্যাক্সের

বিশ্বাস, এই ক'টা মাস বস্তিতে থেকে জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা পুরোপুরি বদলে গেছে। জীবনে জীবন যোগ করে অগণিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে সে। এখন তার মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষই আপন, কেউ পর নয়। মিয়ামিতে স্বামী-স্ত্রী মিলে একটা সংগঠন করেছে তারা। কোভালস্কীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আনন্দ নগরের এইড্ কমিটির নামে তারা নিয়মিত ওষুধ আর চিকিৎসা যন্ত্রপাতি পাঠায়। তাছাড়া ম্যাক্স নিজেও প্রায়ই চলে আসে এখানে। এখনও সে জনে জনে বলে বেড়ায়, 'আমার আনন্দ নগরের ভাইদের মুখের হাসি আমার জীবনে যে আলো জেবলেছে, তা কখনও নিভবে না।'

একদিন হাসারি পালের বিধবা বউ অলকা ছুটতে ছুটতে কোভালস্কীর দোরগোড়ায় এসে হাজির। তার হাতে সর্বাঙ্গে ছাপ মারা একখানা ব্রাউন রঙের সরকারি খাম। অলকা তখন হাঁপাচ্ছে। খামখানা কোভালস্কীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'স্তেফান দাদা! আজ সকালে আপনার নামে এই খামখানা এয়েচে গো!'

খামটা হাতে নিয়েই কোভালস্কী বুঝলো যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে এটা এসেছে। বুকখানা ধক্ করে উঠলো তার। 'হা ঈশ্বর! এর ভেতরে না জানি কি হুকুম আছে! হয়ত এই মুহূর্তেই আমায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে!' চিঠিটা বের করে অনেকক্ষণ টাইপ করা লেখার দিকে চেয়ে রইল সে। লাইন ধরে বারবার পড়তে লাগলো। অনেকক্ষণ পড়ার পর চিঠির অর্থ যেন বোধ-গম্য হলো। চিঠিতে লেখা আছে, 'এতদ্দ্বারা ভারত সরকার স্তেফান কোভালস্কীকে এ দেশ বাস করার যোগ্যতাপত্র প্রদান......' চিঠির বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট দিনে এবং আইনসম্মতভাবে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার শপথ নেবার পর এবং ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সাপেক্ষে স্তেফান কোভালস্কীকে এ দেশের নাগরিকত্ব-প্রদান সাব্যস্ত হলো।

পোলীশ ধর্মযাজক স্তেফান কোভালস্কী তখনও চেয়ে আছে চিঠিখানার দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে বার দুই থেমে থেমে বললো, 'এখন থেকে আমি ভারতীয় নাগরিক!' তার মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে যেন বস্তির হৃদয়স্পন্দনটি সে শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি বারান্দার থামটা ধরে সামলে নিল। তারপর চোখ বুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যখন চোখ খুললো তখন গলায় ঝোলানো ক্রুশচিহ্নটি হাতের মধ্যে রাখা। অনেকক্ষণ নিবিড়ভাবে তাকিয়ে রইল সেটির দিকে। ক্রুশের গায়ে দুটি তারিখ খোদাই করা আছে। মায়ের কথামতই এই তারিখ দুটো খোদাই করিয়েছিল কোভালস্কী। একটা তার জন্ম-দিনের তারিখ। অন্যটি যাজকপদে অভিষেকের তারিখ। তখন ঝরঝর করে কাঁদছে সে। চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। সে জানে এ অশ্রু আনন্দের। সে দেখলো ফলকের গায়ে আর একটা নাম জ্বলজ্বল করছে। অনেক অনেক বছর আগে যখন সে 'প্রেমানন্দ' নাম নিয়েছিল, তখন এই নামটাও খোদাই করিয়েছিল সে। হ্যাঁ, এখন থেকে সে আর স্তেফান কোভালস্কী নয়। এখন থেকে সে 'প্রেমানন্দ।' আনন্দ নগরের এই বঞ্চিত, দরিদ্র, ভাঙাচোরা মানুষদের আপনজন। এখন থেকে এই বিরাট পরিবারের সে-ও একজন হলো। কোভালস্কী তখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছে কি করবে। 'প্রেমানন্দ' নামটির তলায় যে ফাঁকটুকু আছে সেখানে আজকের তারিখটা খোদাই করে রাখবে, কারণ আজকের এই দিনটি যে তার জীবনের তৃতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ দিন।

পাঠকের প্রতি

প্রিয় বন্ধু,

আমার লেখা 'দি সিটি অফ জয়' যাঁরা ধৈর্য সহকারে আদ্যোপান্ত পড়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। টি.ভি.তে বা রেডিওতে যাঁরা আমার সাক্ষাৎকার শুনেছেন কিংবা চিঠি লিখে আমায় অনুপ্রাণিত করার চমৎকার ঔদার্য দেখিয়েছেন, এই ধন্যবাদ তাঁদেরও প্রাপ্য।

আমি ও আমার স্ত্রী কলকাতার যে হতদরিদ্র শিশুদের সেবার ব্রত নিয়েছি, সেই কাজে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাহায্য করতে চেয়ে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার লোক চিঠি লিখেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে এখানেই আমি তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

কিছুদিন আগে জেমস্ স্টিভেনস্ কুষ্ঠ রোগীর সন্তানদের জন্য কলকাতায় 'উদয়ন' নামে একটি সদন খোলেন। সেখানকার ১৫০ জন ছেলেমেয়ের ভার নিয়েছি আমরা। এবং তাদের ভরণ-পোষণের খরচ চালানোর জন্য প্রতি বছর আমাদেরকে 'উদয়নে' প্রচুর টাকা পাঠাতে হয়। এই টাকার কিছুটা আসে আমার প্রাপ্য রয়্যালটির অংশ থেকে এবং বাকিটা 'অ্যাকশন এইড ফর লেপারস্ চিলড্রেন অফ ক্যালকাটা' সংস্থার সদস্যদের দেওয়া দান থেকে। এই সংস্থাটি ১৯৮২ সালে আমিই গঠন করি।

আমরা যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করি, তা পুরোটাই সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সহায়হীন শিশুদের কল্যাণের কাজে। অফিস, কর্মচারী বা অন্য কোনো খাতে একটি পাই পয়সাও আমরা খরচ করি না। প্যারী শহরে আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকি, তারই একটি ঘরকে আমরা সংস্থার সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করি। এবং দপ্তরের কাজে যাঁরা সহায়তা করেন তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছাসেবী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় গির্জার কয়েকজন মহিলা, অবসরপ্রাপ্ত এক জেনারেল ম্যানেজার এবং আমার স্ত্রীর পাঁচ বোন।

ভারতে টাকা পাঠাবার সময় আমরা বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখি যাতে প্রতিটি পয়সা ঠিক লোকের হতে পেঁছিয় এবং সঠিক উদ্দেশ্যে খরচা হয়। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। কারণ, আমাদের সংস্থা ছোট—স্বাভাবিক কারণেই আমরা চাইও ছোট রাখতে—ফলে প্রতিটি খুঁটিনাটি হিসেব যাচাই করে দেখা সম্ভব।

'উদয়ন' ছাড়াও সম্প্রতি আমরা কলকাতার বস্তি এলাকায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য গঠিত তিনটি আবাসের দায়িত্ব নিয়েছি। এই আবাসগুলির প্রতিষ্ঠাতা জনৈক ভারতীয় যাজক। তিনি নিজেও দীনদরিদ্র মানুষদের সঙ্গেই জীবন কাটান।

আর্থিক ভাবে এই তিনটি আবাসকে (যেখানে প্রায় ১৫০ জন প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে আছে) সহায়তা করা ছাড়াও আমরা এখান থেকে প্রখ্যাত ফরাসী স্নায়ু-রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্রদ গ্রসকে কলকাতায় পাঠিয়েছি। পোলিও বা বোন টি.বি.তে যে সব বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তাদের কতটা উপকার করা যায়, ক্রদ তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। এর আগে নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়া একটি বাচ্চাকে আমরা ফ্রান্সে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। ক্রদই তার দেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। এখন সেই ছেলেটি নিজে নিজে টাইপ করতে পারে এবং অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম অঙ্গ সংস্থাপনে পারদর্শী আরেকজন ফরাসী চিকিৎসককেও আমরা পাঠিয়েছিলাম। তাঁর সাহায্যেও অনেকে এখন আগের চেয়ে ভাল ভাবে বাঁচতে পারছে।

অদূরে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গ্রামে সৌরশক্তি চালিত জলোত্তলন পাম্প বসানোর পরিকল্পনা আমাদের আছে। উপযুক্ত সেচের সুবিধে পেলে চাষী-দের আর আকাশের দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকতে হবে না, রুটি রুজির জন্য কলকাতাতেও আত্মনির্বাসনের দরকার হবে না। আমাদের আশা, কলকাতার সমস্ত বস্তিবাসীরাই একদিন না একদিন নিজেদের ভিটেতে ফিরে গিয়ে চাষ-আবাদ করে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার চালাতে পারবে।

আপনাদের সকলের সাহায্য পেলে, আমরা আরো বেশী কাজ করতে পারব। তবে আবারও বলছি, আমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড আমরা সীমিত রাখতে চাই। 'রেড ক্রস' বা রাষ্ট্রসংঘের মতো আমাদের সংস্থা বিশাল নয়। নিজেদের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে আমরা কোনো কাজে হাত দিতে চাই না।

আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনারা যে কোনো দান এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেনঃ 'উদয়ন', পি.ও. বক্স ১০২৬৪, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

'দি সিটি অফ জয়' সর্বত্রই বিপুল 'বেস্ট সেলার'। এই বই যত বিক্রি হয়, কলকাতার গরিবদের ততই মঙ্গল। কেননা, আমার প্রাপ্য রয়্যালটির অর্ধেক আমি তাদেরকে দিচ্ছি। পোপ দ্বিতীয় জন পল সস্ত্রীক আমাকে ভ্যাটিকান প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই বই সম্পর্কে আলোচনার জন্য। তিনি বলেছেন, 'সারা বিশ্ব বইটি থেকে প্রেরণা পাবে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেডিও ও টি.ভি.তে 'টু ডে শো', 'ল্যারি কিং শো' এবং 'সেভেন হানড্রেড ক্লাব' সহ ১২০টিরও বেশী অনুষ্ঠানে 'দি সিটি অফ জয়' নিয়ে আলোচনার জন্য আমি আমন্ত্রিত হয়েছি। 'দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'বইটি আমার মনে চিরকালের জন্য রেখাপাত করেছে।' এবং 'দি ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার সমালোচক লিখেছেন, 'দি সিটি অফ জয় যাঁরা পড়েছেন তাঁরা আরো একটু সমৃদ্ধ হয়েছেন।'

উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে একটা চিঠির খানিকটা তুলে দিচ্ছি। ক্যালি-ফর্নিয়ার সেবাস্টোপোলের কারেন এবারহার্ডট লিখেছেন, 'দি সিটি অফ জয় আমি ক্রীসমাসের উপহার পেয়েছি। এরকম ভাল বই আগে কখনও পড়ি নি। গোগ্রাসে বইটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করার পরই অনুভূতি হচ্ছে, আমারও অবশ্যই কিছু করার আছে।'

বলতে শ্লাঘা বোধ করছি, 'দি সিটি অফ জয়' খুব শিগ্গির বড় মাপের চলচ্চিত্র হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই এই বই খ্রীস্টফার পুরস্কার পেয়েছে। মর্যাদা-পূর্ণ এই মার্কিন পুরস্কারে প্রতি বছর ভূষিত করা হয় সেই বইকে যা এই বিশ্বকে আরো একটু সুন্দর করে তোলে।

সুতরাং অনুরোধ করছি বইটি পড়ে দেখুন এবং আপনার আত্মীয়, বন্ধুদেরও পড়তে উৎসাহিত করুন। কারণ এটা এই পৃথিবীরই অজ্ঞাত নায়কদের গৌরব-গাথা। তারাই শুধু জানে, প্রেম, ভালবাসা ও অপরের অংশীদারির প্রকৃত অর্থ কী।

এই চিঠিটি আপনাদের পরিজনদের দেখালেও আমাদের উপকার করা হবে। বিন্দু বিন্দু জলেই তো সিন্ধুর উৎপত্তি। আমাদের আদর্শের পিছনে রয়েছে সেই সুমহান ভারতীয় প্রবচনঃ নিজেকে উজাড় করে না দিলে সব দানই মিথ্যে হয়ে যায়। আমার বিনীত অনুরোধ আপনারাও সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে এই নীতিতেই বিশ্বস্ত থাকুন।

আমাদের সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

ঈশ্বর সর্বদা আপনাদের মঙ্গল করুন।

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহ। দোমিনিক ল্যাপিয়ের

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার স্ত্রীর নামও দোমিনিক। সর্বাগ্রে আমি তাঁকেই অকুণ্ঠ চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার গবেষণা কাজের প্রতিমুহূর্তে এবং 'সিটি অফ জয়' লেখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আমার অবিচ্ছেদ্য সহযোগী।

কোলেৎ মদিয়ানি, পল ও ম্যানুয়েলা আঁন্চিওতা, এবং জেরার্ড বেকার্সকেও ধন্যবাদ। আমার পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করেছেন এবং ভারত সম্পর্কে তাঁদের বিস্তারিত জ্ঞানের মাধ্যমে আমাকে বিভিন্ন অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন ও নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার ভারতীয় বন্ধুদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার গবেষণায় তাঁরা উদারভাবে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, ভারতে থাকার দিনগুলিকে ফলপ্রদ ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। আলাদা আলাদা ভাবে সকলের নামোল্লেখ করতে হলে পাতার পর পাতা লেগে যাবে। তাহলেও বিশেষভাবে এঁদের নাম উল্লেখ করতেই হয়—নাজেস আফরোজ, অমিত, অজিত ও মিতা ব্যানার্জি, মেহবুব আলি, পিয়েরর সিরাক, তপন চ্যাটার্জি, রবি দুবে, বহরম দুমেশিয়া, পিয়েরর ফালো, ক্রিস্টাইন ফার্নাণ্ডেজ, জর্জেস অ্যাণ্ড অ্যানেৎ ফ্রেমন্ত, লিও অ্যাণ্ড ফ্রাঁসোয়া, আদি কাতগর, অশ্বিনী ও রেণু কুমার, আনোয়ার মল্লিক, হরিশ মল্লিক, অমর নাথ, জাঁ নেভু, কের্মেলিয়া পাঞ্জাবী, নলিনী পুরোহিত, গাস্ত রোবের্জ, ইমানুয়েল অ্যাণ্ড মেরি-দোমিনিক রোমাটেট, জেমস অ্যাণ্ড লোলিতা স্টিভেন্স, বেবি থাণ্ডানি, অমৃতা ও মালতি ভার্মা এবং ফ্রান্সিস ওয়াকজিয়ার্গ।

জিওফ্রে মুরহাউসের বই 'ক্যালকাটা' পড়ে পুরনো কলকাতা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পেয়েছি।

এছাড়া নানান অঞ্চলে সমীক্ষা চালানোর সময় বিশেষত আলেকজান্দ্রা অ্যাণ্ড ফ্র্যাঙ্ক অবয়নো, জ্যাকুইস আর্চার গিলবার্ট অ্যাণ্ড অ্যানেৎ এতিয়েন, জাঁ অ্যাণ্ড ডেভিড ফ্রিডম্যান, লুই অ্যাণ্ড অ্যালিস গ্রাঁদজ, জ্যাকুইস অ্যাণ্ড জেন্নি লাফ, এডিলেড ওরিফাইস, মেরি-জিন মঁতাঁৎ এবং তানিয়া সায়ামা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আমার বন্ধু ও সাহিত্য বিষয়ক এজেন্ট মরটন এল. জ্যাঙ্কলোর আগ্রহ ও আস্থা এবং আমার প্রকাশকদের সহায়তা ছাড়া এ বই কোনোদিনই আমার পক্ষে রচনা করা সম্ভব হত না। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আরো অনেকেরই প্রাপ্য। তাদের মধ্যে আছেন পারীর রবার্ট লাফ ও তাঁর সহকর্মীরা, নিউ ইয়র্কের টম গিনজবার্গ, হেনরি রিথ, স্যাম ভন, কেট মেডিনা, বেটাসি নোলান, ডন এপস্টাইন ও সহকারিবৃন্দ, বার্সিলোনার মারিও লা ক্রুজ, মিলানের গিয়াম কার্লো বোনোচিনা ও কার্লো সার্তোরি, মিউনিখের পিটার গুটম্যান, অ্যামস্টারডামের আঁতোআইন অ্যাকবেল্ড এবং পরিশেষে আমার বান্ধবী, সহযোগী ও এই বইয়ের ইংরাজী ভাষার অনুবাদিকা ক্যাথারিন স্পিঙ্ক। স্পিঙ্ক নিজেও অনেক বই লিখেছেন। এর মধ্যে 'দি মিরাক্‌ল্‌ অফ লাভ' মাদার টেরেসাকে নিয়ে লেখা।

বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই মার্সাইয়ের মিডিয়াটেক কম্পিউটার এজেন্সির কর্মী এবং প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল ম্যানেজার জাঁ ক্লদ অবিন এবং অ্যাপল্‌ ডিপার্টমেন্টের ডিরেকটর হার্ভি বোদেজকে। বিভিন্ন তথ্য সংযোজন ও পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনায় তাঁরা আমাকে প্রবৃত্তিগত ভাবে সাহায্য করেছেন।

এই বইয়ের রসদ সংগ্রহে যে সব ভারতীয় বন্ধু আমার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন অথচ অজ্ঞাতনামা থাকতে চান, পরিশেষে তাঁদের সকলকে আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা জানাই।